অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

সম্পাদনা
ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪ এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্ষর-বিন্যাস
অতনু পাল
কম্পিউটার টুডে
৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর
অরিজিৎ কুমার
দ্য ক্রিয়েশন
২৪ বি/১বি ডা. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

একশো সত্তর টাকা

প্রাসঙ্গিক

ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়েছিল রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডের ভূমিকায়। এখন এখানে আমরা মূলত আলোচনা করবো প্রথমত ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালায় গান্ধীজীর ভূমিকা ও প্রভাব বিষয়ে এবং দ্বিতীয়ত সত্যাভিজ্ঞতা ও সত্যাসত্য প্রসঙ্গে।

এই দুটি বিষয় নিয়েই আলোচনা জরুরি ও প্রাসঙ্গিক। রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় সত্যাসত্য উপন্যাসমালা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, সত্য নিয়ে যে-কোনো আলোচনার জন্য আমাদের যেতে হবে ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালার আলোচনাতেও। (কেননা) লেখকের ভাষায়, 'একদিক দিয়ে দেখলে ক্রান্তদর্শীকে সত্যাসত্যের সিকোয়েল বলতে পারো। .... এতে মহাত্মাজীকে এনেছি। যিনি মূর্ত সত্যাগ্রহী।'

এও বোঝা যাচ্ছে বিষয়দুটি (গান্ধী বিষয়ক ও সত্য বিষয়ক) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তারা পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত, কেননা গান্ধী নিজে আবার হলেন মূর্ত সত্যাগ্রহী।

অসহযোগের দিনে লেখক ছিলেন গান্ধীর অন্ধ ভক্ত। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়ে তিনি গান্ধীর সমালোচক হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিকল্প কোনো পন্থার সন্ধান না পেয়ে, বিকল্প কোনো নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে না পেরে তিনি আবার গান্ধীর কাছেই ফিরে আসেন। তখন কিন্তু অন্ধ ভক্ত হিশেবে নয়, অসহিষ্ণু সমালোচক হিশেবেও নয়। কী হিশেবে তা বোঝানোর জন্যে তিনি গোটা একটা বই লেখেন : গান্ধী।

এই বইটি ক্রান্তদর্শী উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্ব। গান্ধীর সমগ্র এপিক সংগ্রামটি নিয়ে নতুন এক মহাভারত তথা এপিক উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেও লেখক তা পরিত্যাগ করেন কারণ তার উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। ক্রান্তদর্শী গান্ধী জীবনের শেষ দশকের সঙ্গে জড়িত। তিনি এই উপন্যাসের তথাকথিত নায়ক বা প্রধান চরিত্র নন, তাঁর জীবন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবনের ভিতরেও সক্রিয়, অর্থাৎ তিনি হলেন এই উপন্যাসের চালকশক্তি বা গাইডিং ফোর্স।

ক্রান্তদর্শী উপন্যাসে গান্ধীজীর ভূমিকা পর্যালোচনা করার আগে আমরা গান্ধী সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ধারণা ও মূল্যায়ন বিষয়ে কিছু বলবো। তাঁর মতে গান্ধীকে বোঝা ভার, বোঝানো ভার। 'আমরা বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে একরকম বুঝি। তাও গভীরভাবে নয়। গান্ধীজীকে বোঝা তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য জবাহরলাল প্রমুখেরও সাধ্য নয়। লেখক নিজেকে গান্ধী বিশেষজ্ঞ বলেন না, গান্ধীবাদীও বলেন না। গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও মূল্যায়ন একপ্রকার সাক্ষ্য।

এই সাক্ষ্য অনুসারে, গান্ধীজী জন্মত দ্বিজ। বর্ণাশ্রমেও তাঁর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বলেন, 'জাত হচ্ছে অস্পৃশ্যতার উঁচু নীচু ধাপ।' তিনি হরিজন পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ দেন। অন্য একটি বিবাহে হরিজনকে করেন পুরোহিত। তাঁর কাম্য হয় জাতপাতহীন সমাজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন বেদ-উপনিষদের ধারায় অভিষিক্ত, গান্ধীজী তেমনি জৈন-বৈষ্ণব ধারায়। পরে বাইবেলের ও

গীতার। তাঁর অহিংসা জৈন ও বৈষ্ণবের অহিংসা। আর নন-ভায়োলেন্স খ্রীস্টীয় নন-ভায়োলেন্স। তলস্তয় যার উদ্‌গাতা। তিনিও সেটা পান দুখোবর সম্প্রদায়ের জীবন থেকে। তারা যুদ্ধে যেত না, জোর করে ধরতে এলে বরঞ্চ জেলে যেত। আদি খ্রীস্টানরা কায়িক শ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করত। ব্রেড লেবার তাদের রীতি। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে তলস্তয়ের 'কিংডম অভ্ গড' কল্পনাটি গান্ধীজীর অনুবাদে হয়েছিল 'রামরাজ্য'।

নিজের জীবনটাকে গান্ধী করেছিলেন যোদ্ধার জীবন। যেমন গীতার অর্জুনের। কিন্তু এই অর্জুন সশস্ত্র নন, নিরস্ত্র। স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র হয়ে নিরস্ত্রতাকেই তিনি অস্ত্রে পরিণত করেছেন। অস্ত্রের প্রয়োজন তো শত্রুকে বধ করার জন্যে নয়। শত্রুকে জয় করার জন্যে। জয় যদি নিরস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা হয় তবে তার চেয়ে মানবিক ও তার চেয়ে আধুনিক আর কী হতে পারে। যার আর কোনো অস্ত্র নেই, তার আত্মিক অস্ত্র আছে। সে মরে গিয়েও জয়ী হতে পারে। মরে গিয়েই জয়ী হতে পারে।

যে অহিংসা জীবনের সর্ববিধ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে কখনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারে না। এমনি করেই গান্ধী রাজনীতিক্ষেত্রে এসে হাজির হন। নয়তো শুরুতে সেরকম কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না। আর রাজনীতির মূলগত প্রশ্নগুলো নিয়েই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা, যুদ্ধকালে যুদ্ধে যোগ না দেবার স্বাধীনতা। দৃশ্যত রাজনৈতিক হলেও তলে তলে নৈতিক প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন। নৈতিক বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিছক রাজনৈতিক হলে হতেন না। প্রশ্নগুলির মতো উত্তরগুলিও নৈতিক হবে এই ছিল তাঁর ধ্যান।

তিনি যখন চান এক হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আরেক হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তখন তাঁর এক চোখ ছিল রাজনীতির উপরে, আরেক চোখ অর্থনীতির উপরে, আর দুই চোখই মূলনীতির উপরে, যে মূলনীতির সার কথা সত্য ও অহিংসা। সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন এই শর্তে যে তাঁর অনুগামীরা সত্যনিষ্ঠ তথা অহিংসানিষ্ঠ থাকবেন। অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে, অন্যায়কারীকে ঘৃণা না করে ভালোবেসে, সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস পন্থা। ক্ষুরধার পন্থা। এ পন্থা যারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না।

কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্ব যাঁরা বরণ করলেন তাঁরা সত্য ও অহিংসাকে মেনে নিলেন পলিসি হিশেবে, মূলনীতি হিশেবে নয়। অহিংসা তাঁদের কাছে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। গান্ধী অহিংস পন্থার জন্যে দেশের লোককে প্রস্তুত করতে বলেছিলেন কয়েকপ্রকার গঠনকর্ম দিয়ে। সত্যাগ্রহী যারা হবে তারা গঠনকর্মীও হবে। শুধুমাত্র গঠনকর্ম নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও স্বরাজের পথ প্রশস্ত করা হবে।

শুধু জন-সত্যাগ্রহ নয়, কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধে গান্ধীজীকে কখনো কখনো ব্যক্তি-সত্যাগ্রহও করতে হয়েছে। গান্ধীজী বলতেন সত্যাগ্রহ হচ্ছে যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প। সমাজবিপ্লবের অন্য নাম তো শ্রেণীযুদ্ধ। তাই যদি হয় তবে শ্রেণীযুদ্ধেরও একটা নৈতিক বিকল্প আছে। তাতে যারা বিশ্বাস করে তারাও নিজেদের বিশ্বাস মতো জনগণের মনের জমি আবাদ করতে পারে। সেদিক থেকে বাইবেল, গীতা, তলস্তয়, রাস্‌কিন, থোরো প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক। অবশ্য পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে চলবে হাতেকলমে পরীক্ষা। একদিক থেকে কোয়েকারদের সঙ্গেও গান্ধীজীর তুলনা হয়, কারণ তারাও ছিল যুদ্ধবিরোধী, শান্তিবাদী, বিবেকচালিত প্রতিরোধকারী।

গান্ধীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো ছিল চমকপ্রদ। বল্লভভাই তাঁর সতীর্থদের বলেছিলেন যে বাপু যতবার সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসলে তাঁর সময়জ্ঞান ছিল লেনিনের মতোই টনটনে। বিপ্লব ঘটাতে হলে ঘটাতে হবে একদিন আগেও না, একদিন পরেও না। এটা সাধারণ যুক্তির ব্যাপার নয়, 'রাজনৈতিক প্রতিভা'র ব্যাপার। তেমনি, বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় গণ-অভ্যুত্থান

ঘটাতে হবে ঠিক লগ্নটিতে। জনগণের নাড়ীতে হাত রেখে বসে থাকতেন গান্ধীজী। আর কারো তাঁর মতো নাড়ীজ্ঞান ছিল না।

গান্ধী ছিলেন প্রকৃত জনগণমনস্ক, মূর্ত সত্যাগ্রহী, নির্ভীক অহিংসক। ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই অহিংসা অবলম্বন করেছেন। প্রাণও দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীর বৈশিষ্ট্য হলো বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনেও অহিংসার প্রয়োগ করা, একটার পর একটা ইস্যুতে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে নামা। ইতিহাসে অহিংসার নজীর অনেক আছে, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির বলপরীক্ষা গান্ধীর নেতৃত্বেই প্রথম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নজীর অনেক আছে, কিন্তু সক্রিয় সত্যাগ্রহের এপিক উদাহরণ অভূতপূর্ব। গান্ধীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীর হাতেই অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি। একই কালে জীবনদর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি।

কিন্তু আজকের ভারতে গান্ধীজী কোথায়? গান্ধীপন্থীরা কোথায়? গান্ধীর বাণীর কী দশা? যে বাণী তাঁর জীবনের থেকে অভিন্ন। কেউ যদি তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করে, সেই অনুসারে কাজ না করে, সবাই যদি তাঁর মতবাদে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে বুদ্ধের বেলা যা হয়েছে তাঁর বেলাও তাই হবে। নিজ বাসভূমে পরবাসী।

সংগ্রামের আর কোনো দরকার না থাকলে যে গান্ধীও হয়ে যান অদরকারি। গণ-সত্যাগ্রহের প্রয়োজন না থাকলে জনগণও যে অনাবশ্যক। কেবল পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের সময় তাদের মনে পড়ে। নির্বাচনের পরে আবার যে কে সেই। কিন্তু সঙ্গত কারণে সত্যাগ্রহের যুগ তো চলে যায়নি। উপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হলে লোকে তাদের নিজেদের গরজেই গান্ধীজীর মতো একজন নেতার সন্ধান করবে ও তাঁকে সারথির আসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশে রথের দড়ি টানবে।

সংক্ষেপে এই হলো গান্ধীজী সম্পর্কে লেখকের ভাষ্য ও সাক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে সত্য বিষয়েও কিছু কথা বলতে হয়। প্রথমত গান্ধীনীতির সার কথা সত্য ও অহিংসা। গান্ধীপন্থা যারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না। দ্বিতীয়ত অহিংসা ও গান্ধীনীতির বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম। তৃতীয়ত গান্ধীপন্থীরা হবেন প্রকৃত অর্থে সত্যনির্ভর, সত্যকেন্দ্রিক, সত্যচালিত, সব মিলিয়ে গান্ধীজী যাকে সর্বার্থে বলেছেন সত্যাগ্রহী। এই সত্য এমন সর্বব্যাপক ও সমুচ্চ যে শেষ বয়সে গান্ধী বলেন, আগে আমি বলতুম ভগবানই সত্য। এখন বলি সত্যই ভগবান।

লেখকের মতে গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম হওয়া উচিত দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ। এই দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তারই নাম হয় সত্যাগ্রহ। বলা বাহুল্য, এই সত্য বলতে যা বোঝায় তা পার্সনাল নয়, তা নৈর্ব্যক্তিক। সত্যে যাদের বিশ্বাস তারা হয়তো নিরীশ্বরবাদী, তবু তারাও ঈশ্বরবিশ্বাসীর মতো শ্রদ্ধেয়।

ক্রান্তদর্শী সেই সত্যগাথা। বিশেষত ক্রান্তদর্শীর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। নতুন মহাভারত লেখা হলে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করেই লেখা হবে, এ লেখকের বহুদিনের বিশ্বাস। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে একটি মহাকাব্যের বিষয় একথা সে সংগ্রাম সারা হবার আগেই আমার মনে হয়েছে। একদিন না একদিন কেউ না কেউ নতুন এক মহাভারত লিখবেন। তার নায়ক হবেন গান্ধী। একাধারে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ।'

ক্রান্তদর্শীকে যদি ওই নতুন মহাভারতের এক সম্ভাব্য খসড়া রূপে ধরা যায়, তাহলে তার তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মূল পর্বগুলি হলো ৪৬-এর দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগ, ভারতের স্বাধীনতা ও গান্ধীহত্যা। ভারতের স্বাধীনতাতেই শেষ নয়, কুরুক্ষেত্রের জয়ই যেমন শেষ কথা নয়, তার পরে আছে যুধিষ্ঠিরের নৈরাশ্যময় মহাপ্রস্থান ও কৃষ্ণের শোচনীয় বিনাশ, ক্রান্তদর্শীতেও তেমনি তার অনুরূপ অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স

আছে — গান্ধীজীর মহানির্বাণ।

দাঙ্গা, দেশভাগ, ভারতের স্বাধীনতা, গান্ধীহত্যা প্রভৃতি বড় বড় ও মহা মহা ঘটনা লেখক বর্ণনা ও অঙ্কন করেছেন কী ভাবে? যে সমস্ত ঘটনার অধিকাংশই আবার বড়সড় ট্র্যাজেডী। বিচলিত না হয়ে বর্ণনা করতে পেরেছেন তো? এটি জরুরি প্রশ্ন, বিশেষত যখন অবিচলিত না হলে কথাসাহিত্যের জগতে সিদ্ধি নেই।

প্রথমত তিনি ঘটনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে — কংগ্রেসের দিক থেকে, মুসলমানদের দিক থেকে, ইংরেজদের দিক থেকে। ফলে দৃষ্টি একতরফা হয়নি। দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে অনেকগুলি ভূমিকার সহাবস্থান ঘটায় — 'আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক' — নিরাসক্ত না হলেও এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় থেকেছে।

লেখক উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি গড়েছেন সযত্নে, সমবেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে। জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্রগুলির সংসারজীবন দুয়ের কথাই এসেছে। লেখক মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়কে মিলিয়েছেন। ঘরোয়া জীবনের বর্ণনায় রসবোধ ও অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গান্ধী চরিত্রটি আঁকা হয়েছে প্রমাণ সাইজের চেয়ে বড় আকারে। আশেপাশের চরিত্রের চেয়ে মাথাউঁচু। বিরাট ও মহান।

গান্ধীজীর এপিক সংগ্রাম যে ভাবে সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। গান্ধীর নিজের কথায় সেটা একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং। পনেরোই আগস্টের পরিসমাপ্তি ওই মহাসংগ্রামের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি নয়। তা নিয়ে ইতিহাস লেখা যায় কিন্তু আর্টের চাহিদা মেটে না। 'এপিক যাঁরা লিখবেন তাঁরা পনেরোই অগাস্টের অর্ধসমাপ্তিকে সমাপ্তি ভেবে ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলবেন না। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবেন। অবশেষে পাবেন গ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।' তিরিশে ও একত্রিশে জানুয়ারি।

পনেরোই অগাস্ট গান্ধীকে যার থেকে বঞ্চিত করেছিল এই দুটি দিন তাই তাঁকে দিল। গৌরবময় সমাপ্তি। 'সেইজন্যেই কি জীবন দেবতা তিরিশে জানুয়ারির ঘটনা ঘটালেন? তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একত্রিশে জানুয়ারির শেষ সৈনিক অপসরণ?'

'সাফল্য মহান্ আত্মার জন্যে নয়। অনেকবার মনে হয়েছে, গান্ধী এমন সফলকাম কেন? তিনি কি তবে মহাত্মা নন? আবার মনে হয়েছে, আশ্চর্য। যীশুর মতো এতোদিন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়নি। এ নিয়তি এড়ালেন কী করে? এ নিয়তি এড়ানো গেল না। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি তো নিয়তি। তাঁর মতো চরিত্রের সেইটেই পরিণতি। হ্যাপি এণ্ডিং তাঁর মতো কাহিনীর জন্যে নয়।' তাঁর মতো নায়কের জন্যে, আগেই বলেছি, গ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

সেই গৌরবময় সমাপ্তির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে — 'পরের দিনই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসহযোগে তিনি মৃত্যুবাণের সম্মুখীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্তুতভাবে ভগবানের নাম করেন, 'হে রাম। হে রাম।' তাঁর মুখমণ্ডলে মন্দের আভাস নেই। তাঁর সাধনা সার্থক। তাঁর জীবন সুসমাপ্ত। ওই তাঁর ক্রুশিফিকশন।' (— গান্ধী)

"সৌম্য তো একেবারে পাথর। কান্না তার বুক ঠেলে ওঠে, তবু সে কাঁদে না। কাঁদতে পারে না। ভাবে, শহীদ হওয়ার অধিকার কি সকলের আছে? বুকভরা প্রেম, বুক পেতে গুলী, মুখে ইষ্টনাম, দুই হাত জোড় করে বিদায় নমস্কার। মৃত্যুর পরে পরমা শান্তি, পরমা তৃপ্তি। জগন্মাতার কোলে ঘুমিয়ে পড়া শিশু। মৃত্যু, কোথায় তোমার জয়? শ্মশান, কোথায় তোমার জ্বালা। এ যেন ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ।

সৌম্য একটু দূর থেকে বাপুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সোনাদি ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, 'ভাই, এমন দৃশ্য দু'হাজার বছরে একবার দেখতে পাওয়া যায়। ক্রুসিফিকশন। এবারেও সেই শুক্রবার। আমরা ধন্য। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী।" (— ক্রান্তদর্শী)

উপন্যাসে এরপর লেখক দেখান যে — গান্ধী চেয়েছিলেন দীনদুঃখীর সঙ্গে এক হয়ে যেতে, কেমন করে তাঁর আত্মা সকলের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। নির্বাণের ভিতর দিয়ে এক। ক্রুসিফিকশন যদি ঘটল তবে রেসারেকশনও কি ঘটবে না ঃ এই আশ্বাস ও আশাবাদ দিয়ে ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালা শেষ হয়। জীবনভর সাধনার তিনটি বুলেটে অবসান হতে পারে না, গান্ধীকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু গান্ধীর জীবনে জীবন লাভ করে সারা দেশ ও সারা বিশ্বও নতুন করে জাগবে — লেখকের এই বিশ্বাস অন্যত্রও প্রকাশ পেয়েছে ঃ জাতির জীবনে শতাব্দী কিছু নয়/ কতকাল পরে মার্কসের হলো জয়।/ সেইরূপ হবে গান্ধীর ব্রতসিদ্ধি/ শতাব্দী ধরে প্রভাবের পরিবৃদ্ধি।

কেমন লেখা ক্রান্তদর্শী, গুণমানের দিক থেকে? প্রথম খণ্ড শেষ করে লেখক একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, 'প্রথম খণ্ড শেষ করে যে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তা নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালোভাবে আর করা গেল না। মানুষ যা ভাবে সবসময় তা হয় না। তবে যেটা হয় সেটাও কিন্তু কম নয়। এ আমি আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। জীবনের কোনো ঘটনা বা নিজের কোনো সৃষ্টি হয়তো best হলো না কিন্তু next to the best হতে পারে। ক্রান্তদর্শী যতটা লিখেছি হয়তো খুব ভাল হয়নি, তবে খারাপও হয়নি।' আর ক্রান্তদর্শীর চারটি খণ্ডই প্রকাশিত হওয়ার পর আর একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লেখক আমাকে বলেন যে ক্রান্তদর্শীই তাঁর সবচেয়ে ম্যাচিওর লেখা। সেই সাক্ষাৎকার থেকে একটু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করছি।

— আপনি নিজেকে বৃদ্ধ বলেন না। কিন্তু বৃদ্ধের একটা অর্থ প্রাজ্ঞ। সেই অর্থে আপনার বৃদ্ধত্ব ও বার্দ্ধক্য অর্জনের অভিজ্ঞতা একটা মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। বৃদ্ধ বয়সের আয়নায় আপনি নিজেকে কী রকম দেখছেন তা। একটি ফরাসি প্রবচন আছে — যৌবনে যদি থাকতো প্রজ্ঞা, বার্দ্ধক্যে যদি থাকতো কর্মক্ষমতা! প্রবাদের এই আক্ষেপ আপনার মধ্যে পরিপূরণ পেয়েছে। বার্দ্ধ্যকের প্রজ্ঞা ও যৌবনের কর্মক্ষমতা — যে সময় থেকে আপনার মধ্যে এই দুই গুণের মিলন ঘটেছে তখন থেকে আপনার লেখায় গুণগত ও ভাবগত কী কী পরিবর্তন এসেছে তা সুন্দর বোঝা যায় সত্যাসত্যের সঙ্গে ক্রান্তদর্শীর তুলনা করলে। এ-বিষয়ে কিছু বলুন।

— প্রাজ্ঞ হয়েছি কিনা জানি না। এখনো তো কতো বাজে কাজ করি। বাজে লেখা লিখি। তবে লিখতে লিখতে লেখার ক্ষমতা বাড়ে। ডাক্তার যেমন রোগী মারতে মারতে শেষে ধন্বন্তরী হয়। বিচারক যেমন ভুল করতে করতে শেষে নির্ভুল হন। লিখতে লিখতে তেমনি সত্যিকারের লেখক হয়। এটা অভিজ্ঞতার দিক। আর একটা আছে অন্তর্দৃষ্টির দিক। যেটা কোনো লেখকের অল্প বয়সেই থাকে। কারও বেশি বয়সে আসে। সব মিলিয়ে লেখার ম্যাচিওরিটি। ক্রান্তদর্শীতে যৌবনের প্রাণশক্তি নেই। তবে জীবনের অনেক কথা এখানে পরিপূর্ণভাবে বলতে পেরেছি। যা ঘটেনি তা দেখার চেষ্টাও আছে। অতিক্রান্ত দৃষ্টি। মনে হয় ক্রান্তদর্শীই আমার সবচেয়ে পরিপূর্ণ লেখা। এতে রূপের বন্দনা, প্রকৃতির বন্দনা এসব প্রায় নেই। বদলে জাতির সত্য, যুগের সত্য ধরার চেষ্টা আছে। মনে হয় না ক্রান্তদর্শীর চেয়ে ম্যাচিওর লেখা আর লিখতে পারবো। এক যদি বিনুর বই (২য় খণ্ড) - এ পারি। আপাতত ক্রান্তদর্শীই বোধহয় আমার বেষ্ট লেখা, লিটারেরি অ্যাচিভ্‌মেন্ট হিসেবে, এক নিঃশ্বাসে লেখা, থেমে থেমে লেখা নয় বলে অনেক সূক্ষ্ম কারিকুরি বাদ দিতে হয়েছে, তবু।

সমাপ্তিতে ক্রান্তদর্শীর সম্ভাব্য পাঠকদের উদ্দেশে এই কথা বলতে হয় যে, এই উপন্যাস কোনো প্রথাগত উপন্যাস নয়। এই উপন্যাস বর্ণনাত্মক নয়, বিশ্লেষণধর্মী। এখানে নিছক গল্প বলা হয়নি, এ হচ্ছে নভেল অভ আইডিয়াজ। এর সংলাপও নয় শুধুই কথোপকথন, বিদগ্ধ বিতর্ক তা। এপিক বিষয় ও অপ্রচলিত শৈলীর দরুন এই উপন্যাস মেজাজে ও ধরনে একেবারে আলাদা। সুতরাং সকলে এর পাঠক হবেন না, যাঁরা হবেন তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও দরে উঁচু। আর সেইরকম উপযুক্ত পাঠকই লেখক চান, তেমন পাঠক স্বল্পসংখ্যক হলেও তাঁর আক্ষেপ নেই — যতদিন থাকবে একটি পাঠক/ততদিন লিখব যে করেই হ'ক।

পাঠককে ক্রান্তদর্শী পড়তে হবে যত্ন করে, সময় নিয়ে, মনোযোগ সহকারে। আর সেইভাবে পড়তে পারলে পাঠক এই উপন্যাস থেকে যা-যা পাবেন তা ও এমন কিছু পাবেন যা সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায় না ও সম্ভবত গোয়া ছাড়া আর কোনো বাংলা উপন্যাসেই পাওয়া যাবে না।

ধীমান দাশগুপ্ত

ক্রান্তদর্শী

তৃতীয় পর্ব

ভূমিকা

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে লজ্জাকর অধ্যায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাহাঙ্গামা। প্রথমে কলকাতায়, তারপরে নোয়াখালীতে, তারপরে বিহারে। পরের বছর এর জের চলে পাঞ্জাবে। সেইখানে চরম সীমা।

সেই লজ্জাকর অধ্যায় বাদ দিলে আমার এই উপন্যাসের সত্যতাহানি হবে। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না ভাবীকালের পাঠকদের কেন দেশভাগ প্রদেশভাগ হলো। অথচ এর বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে আমার স্বাস্থ্যহানি হবে। এতই নিষ্ঠুর সে অধ্যায়। আটত্রিশ বছর পরেও আমরা প্রকৃতিস্থ হতে পেরেছি কি-না সন্দেহ।

বাংলার তৎকালীন গভর্নর তৎকালীন সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে কলকাতার দাঙ্গার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Somme-এর যুদ্ধে তিনি যে বীভৎসতা দেখেছিলেন কলকাতার দাঙ্গার বীভৎসতা তারই সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর চোখের সামনেই একটা লোক খুন হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় গলিত শব। কেউ সৎকার করছে না। মেথররাও ছোঁবে না। সৈনিকদের দিয়ে সৎকার করাতে হয়। এমনি অনেক কথা।

গভর্নরের রিপোর্টের মতো আরো কয়েকজন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বড়লাটকে লেখা। বড়লাট আসতে চেয়েছিলেন। গভর্নর তাঁকে বারণ করেন। সময় অনুপযোগী। বড়লাট বিচলিত হয়ে গান্ধীজীকে ও জবাহরলালজীকে অনুরোধ করেন মুসলিম লীগকে কিছু কনসেসন দিতে। তা না হলে লীগপন্থীরা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবেন না। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট অঙ্গহীন হবে। তেমন একটা গভর্নমেণ্ট গঠন করা সমীচীন হবে না। নেতারা বলেন, তা হলে আমাদের আমন্ত্রণ করার প্রয়োজন কী ছিল? কনসেসন আমরা যা দিয়েছি তার বেশী দেওয়া সাধ্য নয়। দাঙ্গা বাধিয়ে কনসেসন আদায় করা তো ব্ল্যাকমেল।

গান্ধী ও নেহরু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। তখন অ্যাটলী ওয়েভেলকে নির্দেশ দেন যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদের নিয়ে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করতে। যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁরা আপাতত বাইরে থাকুন। ওয়েভেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই করেন। লীগপন্থীরা বিনা কনসেসনেই পরে যোগ দেন। কিন্তু একটা নতুন খেলা খেলেন। একজন তফশীলি হিন্দুকেও মুসলিম লীগের ভাগ থেকে একটা আসন দিয়ে কংগ্রেসের উপর টেক্কা দেন।

আমার উপন্যাসের এই পর্বটিতে ১৯৪৬ সালের শেষপর্যন্ত কাহিনীর গতি এগিয়েছে। কিন্তু কেউ যেন না মনে করেন যে আমি উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেছি। ইতিহাস আরো বেশী জায়গার দাবী রাখে। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার' নামক বারো খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে এই পর্বটিকে দুই খণ্ড দিয়েছেন। প্রত্যেকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা বড়ো মাপের হাজারের মতো। বিষয়বস্তু অত্যন্ত

গোপনীয়। পঞ্চাশ বছরের আগে প্রকাশ করতে মানা। তবে ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ত্রিশ বছর পরে প্রকাশ শুরু হয়েছে। নেতারা কে কী বলেছেন, কে কী চেয়েছেন এসব তো আছেই, সরকারপক্ষে কে কী বলেছেন বা লিখেছেন তাও আছে।

এই দুই খণ্ডের দাম দেড় হাজার টাকার মতো। এর পরের চার খণ্ডের দাম পাঁচ হাজার টাকার মতো। আমার সামর্থ্য কী আমি এত হাজার টাকা খরচ করি? আমার বন্ধু বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট শ্রীঅরুণকুমার দত্ত পুরো বারো খণ্ডের সেট কিনেছেন। তাঁরই সৌজন্যে আমি মাঝখানকার চার খণ্ড পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এর পরে আরো দু'খণ্ড বাকী। কী করে তাঁকে আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব? এই বইগুলি না পড়লে আমার চোখ ফুটত না। আমি একতরফা বিচার করতুম।

জিন্না সাহেবের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার আছে। লর্ড ওয়েভেলের দিক থেকেও। বিচার যিনি করবেন তাঁকে সব দিক বিবেচনা করতে হবে। সুহ্‌রাবর্দীও শয়তান ছিলেন না। আমাকে আমার অনেক ধারণা সংশোধন করতে হয়েছে। বাংলার লাট বারোজ সাহেবকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। বড়লাট লর্ড ওয়েভেলকেও। বারোজ বাংলার পার্টিশন সমর্থন করেননি। ওয়েভেল বাংলার একাংশ হিন্দুদের দিয়ে যাবার কল্পনা করেছিলেন। সেটা তিনি করতেন আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে, অপসরণকালে। আশ্চর্যের ব্যাপার সর্দার বল্লভভাই সেটার প্রস্তাব করেছিলেন ১৯৪৬ সালেই। ওয়েভেল তখন রাজী হননি।

যেসব তথ্য ত্রিশ বছর আগে কেউ জানত না সেসব আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জানত কী করে? আর সকলের মতো তারাও ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিল। ভুল ধারণা থেকে কত কী ঘটে! ঔপন্যাসিক কী করে তাকে অঘটিত করবে? যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। ঔপন্যাসিক তার যুগকে অতিক্রম করতে পারে না।

ওয়েভেল নিজেই জানতেন না ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবেন। আরো পনেরো বছর ভারত শাসন করবেন না আরো আঠারো মাসের মধ্যে শাসন গুটিয়ে নেবেন? ইউরোপীয় অফিসারদের অধিকাংশই ঘরমুখো। তাঁরা ক্ষতিপূরণ আশা করেন। পেলে ভালো, না পেলেও তাঁরা যাবেনই। বেসরকারী ইউরোপীয়রা ব্যবসাবাণিজ্য ফেলে চলে যেতে উদ্‌গ্রীব নন, কিন্তু তাঁদের পরিবারদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সরকারও দিতে বলছেন। জিন্না যদি জেহাদ ঘোষণা করেন তা হলে শ্বেতাঙ্গরাও রক্ষা পাবেন না। আর জয়প্রকাশ নাকি শ্বেতাঙ্গবধের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য শ্বেতাঙ্গরাও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে জড়ো হয়ে আত্মরক্ষা করতেন। তারপর বদলা নিতেন।

ইন্টারিম গভর্নমেন্ট সচল হলেও কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী অচল হয়েছিল। মাইনরিটি যদি যোগ না দেয় তবে মেজরিটি কি তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটলী জানিয়ে দেন যে মেজরিটির তৈরি শাসনতন্ত্র তাঁর সরকার অনিচ্ছুক অংশগুলির উপর চাপিয়ে দেবেন না। ফলে ভারত ভাগ হয়ে যাবে। আমরা ডিসেম্বর শেষ করি ভারতভাগের সম্ভাবনা নিয়ে, যদি মুসলিম লীগ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে না যায়। তাকে কিছু কনসেসন যদি দাও তা হলেই সে যাবে। কংগ্রেস তাতে নারাজ। এসব কথা পরের পর্বের জন্যে হাতে রাখছি। সেটাই শেষ পর্ব।

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। এক ।।

প্যারিসের পতনের খবর শুনে স্বপনদা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদেছিলেন। তখন তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে কেউ ছিলেন না। দীপিকাদির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। পাঁচ বছর বাদে বার্লিনের পতনের সংবাদ পেয়ে তিনি সেই যে কাঁদতে শুরু করলেন চব্বিশ ঘণ্টা পরেও তার বিরাম নেই। বৌদি তো জেরবার।

"তুমি যে একজন প্রচ্ছন্ন নাৎসী তা যদি আমি জানতুম তা হলে তোমাকে বিয়ে করতুম না। হিটলার মরেছে তাতে তোমার কী? কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার!" বৌদি ব্যঙ্গ করেন।

" না, না , আমার এ শোক হিটলারের জন্যে নয়। জার্মান জাতির জন্যে । ওরা পরাজিত, পরাধীন, দ্বিধাবিভক্ত। বিসমার্কের ঐক্যসাধনা সমাপ্ত করতে এসে হিটলার সেটাকে ধ্বংস করে গেলেন। বুদ্ধিমান হলে তিনি জানতেন কোথায় থামতে হয়। থামা উচিত ছিল মিউনিক চুক্তির পর। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানভাষী অঞ্চলটা গ্রাস করে দাঁড়ি টানা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া গ্রাস করা হয়ে গেছে। তা হলে জার্মান জাতির ঐক্য সাধনার আর কী বাকী থাকতে পারে। তা নয়। মাথায় ঘুরছিল সাতশো বছরের স্বপ্নসাধ। 'ড্রাঙ্ক নাখ অস্টেন'। পূব মুখে অভিযান। পূব দিকে দিগ্বিজয়। টিউটনিক অর্ডারের সন্ন্যাসীরা যা আরম্ভ করেছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরি এক ব্রহ্মচারী তাই শেষ করবেন। হিটলার শুধু বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আসেননি, এসেছিলেন টিউটনিক অর্ডারের অসমাপ্ত কর্ম সমাধা করতে। বলটিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড টিউটনদের জন্যে চাই। স্লাভদের ভূমি কেড়ে নিতে হবে। স্লাভরা হবে স্লেভ। এই সাতশো বছরে দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বড় কম হয়নি। স্লাভরা এবার পশ্চিম মুখে অভিযান চালিয়ে বার্লিনসমেত পূর্ব জার্মানী গ্রাস করেছে। ওদের রাহুগ্রাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিনদেরও রাহুগ্রাস। এরা গ্রাস করেছে পশ্চিম জার্মানী। গোটা জার্মানীর এবার পূর্ণ গ্রাস। এমন এক রত্তি জায়গা নেই যেখানে জার্মানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জার্মান রাষ্ট্রই নেই। জার্মান সরকারই নেই। তবে সন্ধি হবে কার সঙ্গে কার? সন্ধি না হলে শান্তি হবে কী করে?। শান্তি বৈঠক বসবে কী করতে? আমি তো চোখে আঁধার দেখছি, রানু । ছেড়ে দাও গো, কেঁদে বাঁচি।" স্বপনদা কাতর কণ্ঠে বলেন।

"বিসমার্ক পই পই করে বারণ করেছিলেন দুই ফ্রন্টে লড়তে। কাইজার কর্ণপাত করেনি। হিটলারও না। মস্কো, লেনিনগ্রাড, স্টালিনগ্রাড কেড়ে নিতে গেলে বার্লিন, লাইপৎসিগ, ভাইমার হারাতে হয়। জার্মানরা সাতশো বছর ধরে স্লাভদের জ্বালিয়েছে । এবার দু'শো বছর ধরে স্লাভদের দ্বারা জ্বালাতন হোক। সন্ধি! কিসের সন্ধি! সন্ধির মর্যাদা কি জার্মানরা মানে? কাইজার বলেছিলেন, স্ক্র্যাপ অফ পেপার। হিটলার তো ততটুকুও স্বীকার করেনি। এই তো জার্মান ঐতিহ্য! সন্ধি করলে সন্ধির খেলাপ হবেই।

বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে জার্মানী ভাগাভাগী করে নিয়েছে। যতদিন না নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধে ততদিন শান্তি অবধারিত।" বৌদি আশ্বাস দেন।

স্বপনদা বিলাপের স্বরে বলেন, "কেন বৃথা স্তোক দিচ্ছ, রানু ? বাঘে গোরুতে দুর্দিনের সময় একঘাটে জল খায় বলে কি সব সময় একঘাটে জল খায়? পরে একদিন বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে গোরুর ঘাড়ে। গোরু যদি মোষ হয়ে থাকে তবে সেও তার শিং দিয়ে বাঘকে জব্দ করে। বাঘে মহিষে লড়াইয়ের অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। সেইরকম একটা লড়াই একদিন বেধে যাবে দুই প্রতিবেশী শিবিরে। যদি না ইতিমধ্যে একটা বাফার স্টেট খাড়া হয় আর দুই শিবিরের সৈন্যদল জার্মানী পরিত্যাগ করে। বাফার স্টেটই এর সমাধান।"

বৌদি তর্ক করেন। "ওটা যে ভবিষ্যতে বাফার থাকবে এর গ্যারান্টি দেবে কে? একটা পার্টি যাবে, আরেকটা পার্টি আসবে, পার্টির বড়ো কর্তা নয়া নাৎসী হিটলার। তিনিও ছদ্মনামে এক সৈন্যদল গড়ে তুলবেন। অন্য নামে অস্ত্র তৈরি করবেন। তুমি কি মনে কর প্রত্যেক বারেই রুশ মার্কিন একজোট হবে? হিটলার একদিকেই বেশী করে ঝুঁকবেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মাখামাখি করবেন। ব্রিটেনের সঙ্গে কোলাকুলি করবেন। মার্কিনের সঙ্গে গলাগলি করবেন। পরের বার দুই ফ্রন্টে লড়াই নয়। কেবল পূব মুখে অভিযান। রাশিয়া কেন তেমন ঝুঁকি নেবে? আধখানা জার্মানী হাতে রাখাই ওর বিচারে নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বলা বাহুল্য সেটা হবে কমিউনিস্ট শাসিত অংশ। হয়তো অত বেশী লালচে নয়।"

"তুমি দেখছি ক্রিপ্টো-কমিউনিস্ট। তা নইলে সোভিয়েটের দিকে টেনে বলতে না। স্টালিনের উচিত ছিল নিজের জায়গা ফেরৎ পেয়ে সেইখানে দাঁড়ি টানা। বড়ো জোর পোলাণ্ড অধিকার করে তাকে বাফার স্টেট করা। কিন্তু ওঁরও মাথায় ঘুরছে বিপ্লবকে জার্মানীতে রফতানী করা। জার্মান কমিউনিস্টদের মদত দেওয়া। তা নইলে বার্লিন পর্যন্ত ধাওয়া করার কি সার্থকতা থাকতে পারে? রাশিয়ানরা ধাওয়া না করলে ইঙ্গ-মার্কিনরাও ধাওয়া করত না। জার্মানীর খানিকটা স্বাধীন ও সার্বভৌম থেকে যেত।" স্বপনদার ধারণা।

"ওটা তোমার ভুল। দুই শিবিরই একবাক্যে দাবী করেছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। সেটা মেনে নিলে স্বাধীন ও সার্বভৌম জার্মানী বলে কিছু থাকে না। তার ধড়টা আস্ত থাকতে পারত, কিন্তু তার হাড় -গোড় ভেঙে দেওয়া হতো। মিলিটারি ও আধা মিলিটারি হচ্ছে হাড়গোড়। দুই শিবিরই পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দখলদার ফৌজ মোতায়েন করত। জার্মানরা ভাঙবে, তবু মচকাবে না। পরাজিত হবে, তবু বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। যা হবার তা হয়েছে। এতে শোক করবার কী আছে? সুখী হবারই বা কী আছে? আমি কাঁদবও না, হাসবও না। এই নরমেধযজ্ঞ যে শেষ হয়ে এসেছে এই আমার কাছে যথেষ্ট। এখন দেখা যাক জাপান আর কতদিন খাড়া থাকে। ইটালী তো ইতিমধ্যেই কাৎ হয়েছে। মুসোলিনি নিপাত।" বৌদি বলেন।

নিচের তলায় একটা সোরগোল শোনা গেল। এল্‌ফ কাকে যেন ঢুকতে দিচ্ছে না, ঘেউ ঘেউ করছে। বাবলী বলছে, "এল্‌ফ, লক্ষ্মীটি, ওকে পথ ছেড়ে দে। ও খাবার নিয়ে এসেছে।" বৌদি নেমে গিয়ে দেখেন ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামানো হয়েছে মিষ্টির ভাঁড় আর মাছের ঝাঁকা। বিরাট কাতলা মাছ। বাবলীদের ভেড়ীর মুটে বয়ে নিয়ে উপরে যেতে চায়, এল্‌ফ তাকে আগলে রাখছে।

"বৌদি, তুমি এল্‌ফকে বুঝিয়ে বলো দেখি পমেরানিয়া এখন আমাদের দখলে। কাজেই এল্‌ফ এখন আমাদের কুকুর।" বাবলীর লজিক।

"ব্যাপার কী, বাবলী?" বৌদি আশ্চর্য হন। "এসব কেন?"

"কেন? তুমি কি জানো না যে আমরাই জিতেছি? এটা আমাদের ভিকট্রি সেলিব্রেশন। বার্লিন যার জার্মানী তার। তবে সবটা নয়, এই যা আফসোস। বর্বর, বনমানুষ, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পিশাচ, রাক্ষস,

শয়তান হিটলার নরকে গেছে। কিন্তু যাবার আগে আমাদের সঙ্গে শঠতা করে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাকে ডেকে এনে আধখানা জার্মানী ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ওরাও জয়ের অংশীদার। কী অন্যায়!"

বৌদি কোনো মতে হাসি চেপে তাকে উপরে নিয়ে যান। তার সঙ্গের লোকটিকে নিচের তলায় দিয়ে যান চাকরদের জিম্মা। তাদেরই একজন উপরে নিয়ে যায় মিষ্টি আর মাছ।

উপহার দেখে তো স্বপনদা হতবাক্। ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেন, কেন?

"আজ হমারা ঈদ হ্যায়। আজ আমাদের বিজয়া দশমী। আমরা মহিষাসুরকে পরাস্ত করেছি। মহিষাসুর শুধু পরাস্ত নয়, নিহত। শুনছি স্বহস্তে নিহত, কিন্তু সেটা বোধহয় মার্কিন অপপ্রচার। সত্য বোধহয় এই যে সোভিয়েট বোমারু ওর গুহা তাক করে বোমা বর্ষণ করেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তবে ওর লাশ দাখিল করে প্রমাণ করতে পারা যাচ্ছে না যে বোমার ঘায়েই মৃত। ও তো কম ফন্দীবাজ নয়। ইতিহাসের জন্যে একটা ধাঁধা রেখে দিয়ে গেছে। জীবিত না মৃত। মৃত হলে কার হাতে নিহত।" বাবলী বকবক করে যায়।

স্বপনদা ধরা গলায় বলেন, "থ্যাংস, চকোলেট, কেউ মারা গেলে তার সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলতে হয়, আপাতত মন্দ কথা বলতে নেই। এটাই সভ্য সমাজের রীতি। হিটলার এখন সব নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, সেটা একটা ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গ। ভাবীকালের উপর ছেড়ে দাও সেই ভূমিকার বিচারভার। আমি আজ বিচার করব না, শুধু বলব হিটলার জার্মানীকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করে জার্মানদের হৃদয় জয় করেছিলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকেও ত্রাণ করেছিলেন তিনি। এর জন্যেও জার্মানরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যস্, এইপর্যন্ত। এর পরের অধ্যায়টা সম্বন্ধে আমি মৌন।"

"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আরো ঠিক হতো যদি বলতে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকে বুর্জোয়াদের ত্রাণ করেছিল সে। কিন্তু নীট ফল কী হলো? আধখানা জার্মানী তো কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হাতে পড়ল। জার্মান বাসিন্দারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। খালি পূর্ব জার্মানী থেকে নয়, সোভিয়েট অধিকৃত পোলাণ্ড থেকেও, বলটিক থেকেও। তাদের সবাই যে বুর্জোয়া তা নয়। শ্রমিক কৃষকরাও আতঙ্কিত। কারণটা শ্রেণীগত নয়, জাতিগত। এক জাতি অপর এক জাতির দাস হয়ে থাকতে রাজী নয়। হিটলার দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে অন্য জাতিকে দাস করতে হয়। শুধু কি তাই? কেমন করে জেনোসাইড করতে হয়। স্লাভরা যদি এর বদলা নেয় তা হলেই হয়েছে!" বৌদি শঙ্কা প্রকাশ করেন।

"ওটা তোমার ভ্রম, বৌদি। আমরা শ্রেণীশত্রুকে খতম করতে পারি, কিন্তু জাতিকে জাতি নিকাশ করতে পারিনে। জার্মানরা যা করেছে তার প্রতিফলের ভয়ে পালাচ্ছে। আমরা তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিনে। ওরা থাকুক, মার্ক্সবাদের কলমা পড়ুক। তাতে আমাদেরি বল বাড়বে।" বাবলী অভয় দেয়।

স্বপনদা মৌনভঙ্গ করেন। "কিন্তু মার্শাল স্টালিন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ভুলটা করবেন যদি চার্চিল ও ট্রুম্যানকে বার্লিনের আধখানা ছেড়ে দেন। শুনছি সেইরকম চুক্তি হয়েছে। চুক্তির খেলাপ করলেই লড়াই। না করলেও ঝগড়াঝাটি। ভাবা যায় না বার্লিন কী করে ভাগ হবে। লাইন টানা হবে কোথায়। আমার তো ভাবতে গিয়ে কান্না পাচ্ছে।" স্বপনদা চোখে রুমাল দেন।

"ন্যাকামি রাখো। মালপোয়াতে ভাগ বসাও। নয়তো সব আমরা দুই বান্ধবীতেই সেবা করব। বৈষ্ণবদের ভাষায়। হ্যাঁ, ভাই, তোমাদের গৃহদেবতা কি রাধাগোবিন্দ?" বাবলীকে শুধান বৌদি।

"ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। সঙ্গে রাধা আছেন বইকি। তিনিই তো প্রধানা গোপী। ঠাকুরঘরের ধারে কাছে মাছ মাংস চলে না। ওটা আমরা শতহস্ত দূরে বসে খাই। নিরামিষ হেঁসেল থেকে আমিষ হেঁসেলও তেমনি দূরে। পুরনো বাড়ী, পুরনো প্রথা। জীবিকাটাও তো পুরনো। আমি হচ্ছি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। না, না, প্রহ্লাদকুলের দৈত্য।" বাবলী হেসে ওঠে।

"তা তোমাকে দৈত্যের মতো দেখতে হলে তো? এত নরম মেয়ে কী করে এত ভয়ঙ্কর কর্ম করে তার মর্ম আমি আজও বুঝতে পারিনে। ক্ষীরের ছুরি বলে একটা কথা আছে। তুমি কি সেই ক্ষীরের ছুরি? সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়লে কেমন করে?" বৌদি কৌতূহলী হন।

"সে অনেক কথা, বৌদি।" বাবলী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। "আচ্ছা, একটুখানি বলি। আমি রোমান্টিক প্রেমে পড়েছিলুম। প্রেমটা দেশপ্রেমের আকার নিয়েছিল। পাগলিনী কী না করতে পারে। সে পাগলামি এতদিনে সেরে গেছে। তিনি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছেন। বুর্জোয়া সংসার। দেখে শিউরে উঠি। ভাগ্যিস, বিয়ে করিনি। এ সমাজে বিয়ে করলে আর কিছু করা যায় না। আমাকে বিয়ে করবেই বা কে।"বাবলী দেঁতো হাসি হাসে।

"কেন, তোমার কমরেডদের মধ্যে তেমন কেউ কি নেই? সবাই কি চিরকুমার থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?"বৌদি প্রশ্ন করেন।

"না, সবাই নন। তাই যদি হতো আমাদের কমিউন ভেঙে যেত না। গেল যত না সরকারী নেকনজরে তার চেয়ে বেশী নিজেদেরই ঘরসংসার করার বাসনায়। মেয়েদের দুর্বলতা কোথায়, জানো তো? ওরা বয়স থাকতে মা হতে চায়। এ সমাজে বিয়ে না করে মা হওয়া যায় না। দেশশুদ্ধ লোক কমিউনিস্ট হলেও এ সংস্কার কাটিয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। কমিউনিস্ট কন্যারাও বিয়ের জন্যে আপস করবে। বরপণ দিয়ে বিয়ে করবে। যদি না এক সর্বশক্তিমান ডিকটেটর চরম দণ্ড দিয়ে ওসব বন্ধ করেন। আর,সব শিশুকে বৈধ বলে গণ্য করেন। আমাদের হবু ডিকটেটররা বোনের বা মেয়ের বিয়ের সময় সমাজের কাছে কেঁচো। তবে বলা যায় না, বিপ্লবের পরে নতুন হাওয়া বইতেও পারে। আগে তো মেয়েদের প্রত্যেককে জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে বিয়ে না করে মা হলে কারো জীবিকা যাবে না। সন্তানের জন্যেও সুব্যবস্থা হবে। তখন ছেলেরাই ছুটবে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে।" বাবলী স্বপ্ন দেখে।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" বৌদি ভরসা দেন। "তখন তোমাকেও আমরা পাত্রস্থ করব, বাবলী।"

"ততদিনে আমার মা হবার বয়স পেরিয়ে গিয়ে থাকবে, বৌদি।" বাবলী বলে।

স্বপনদা ও প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে বলেন, "মরার আগে হিটলার তাঁর দুই মহাশত্রুকেও মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছেন। কান ধরাধরি করে বসে থাকুন ওঁরা ইউরোপের মধ্যিখানে যতদিন পারেন। কিন্তু একচুল এদিক ওদিক হলেই বেধে যাবে মহামারী। এটা একটা আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। ইতিহাসে আর কখনো এমনটি দেখা যায়নি। এর থেকে বোঝা যায় হিটলার লোকটা কত বড়ো চালবাজ। এটা কার জিৎ? হিটলারের না স্টালিন, চার্চিল, ট্রুম্যানের? এর উত্তর তোমরা এই মুহূর্তে পাবে না। পাবে ত্রিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বাদে। যখন দেখবে তোমরা ওখানে বসে আছো স্বেচ্ছায় নয়, হিটলারের ইচ্ছায়। হিটলার নেই, তাঁর ভূত আছে। সে ভূত পেছন থেকে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। তোমাদের ফ্রী উইল একটা মায়া। তোমাদের প্রত্যেকটি পলিসি আগে থেকে ডিটারমিনড্। তখন বুঝবে যে গায়ের জোরে জেতাটাই জিৎ নয়। সত্যিকার জিৎ হচ্ছে যুদ্ধজয়ের পর শান্তিজয়। ভিকট্রি সেলিব্রেশনের দিন আসবে সেইদিন যেদিন শান্তি স্থাপিত হবে। সে শান্তি মার্কিন সৈন্যদের ফেরৎ পাঠাবে আমেরিকায়, রুশ সৈন্যদের রাশিয়ায়, ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্রিটেনে। ইউরোপের সব ক'টা রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করে ইউনাইটেড স্টেটস অভ্ ইউরোপ প্রতিষ্ঠা করবে। রাশিয়া বাদে। তার আলাদা একটা ইউনিয়ন। সংযুক্ত ইউরোপ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ের একটা সমন্বয় খুঁজে বার করবে। গণতন্ত্রই হবে মূলভিত্তি। কিন্তু নামকা ওয়াস্তে গণতন্ত্র নয়। বিশের দশকে আমরা যারা ইউরোপে বাস করছি এই স্বপ্নই ছিল তাদের জীবনের স্বপ্ন। ত্রিশের দশকে ঘোরতর স্বপ্নভঙ্গ। চল্লিশের দশকে সেই ভাঙা স্বপন জোড়া লাগবে বলে মনে হয়

না। তবে একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস বলে একটা সংস্থা গড়ে উঠছে। লীগ অভ্ নেশনস আমাদের বড়ো আশা দিয়েছিল। পরে হতাশ করে। ইউনাইটেড নেশনস যদি তারই অনুসরণ করে তবে আশা না রাখাই ভালো।"

বৌদি বাবলীর দিকে চেয়ে রঙ্গ করেন। "বিয়ে করলে বরের কাছে এইরকম লেকচার শুনতে হবে। শুনতে শুনতে একরকম ইমিউনিটি জন্মাবে। এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। উনি এইখানে বসেই ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করছেন। সে মহাদেশে আমিও কিছুদিন বাস করেছি। একদা ওদের মিলনের সূত্র ছিল এক খ্রীস্ট, এক খ্রীস্টধর্ম, এক খ্রীস্টীয় সঙ্ঘ। রাষ্ট্র অনুসরণ করবে সঙ্ঘকে। সম্রাট অনুসরণ করবেন সঙ্ঘগুরুকে। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের হাজারো গরমিল। ইউরোপ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় প্রথমে ধর্মের নামে, পরে ভাষার নামে। এখন হতে যাচ্ছে মতবাদের নামে বা সমাজবিন্যাসের নামে। সংযুক্ত ইউরোপ একটা কথার কথা। রোমান এম্পায়ার, হোলি রোমান এম্পায়ার, নেপোলিয়নের এম্পায়ার, হিটলারের বর্ণচোরা এম্পায়ার, কোনোটাই টেকেনি। স্টালিনের যদি তেমন কোনো পরিকল্পনা থাকে সেটাও ব্যর্থ হবে। রাশিয়া ঠিক ইউরোপ নয়। ইউরেশিয়া — "

বাবলী বাধা দিয়ে বলে, "আমরা আর জায়গা বাড়াতে চাইনে। আমরা পশ্চিম জার্মানীর বা পশ্চিম ইউরোপের মাটি মাড়াব না। আমেরিকার ছায়া মাড়াব না। মহামতি স্টালিন প্রত্যেকটি চুক্তি মান্য করবেন। আমাদের জপমন্ত্র ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" শুনে সবাই হেসে খুন। এল্‌ফ পর্যন্ত।

এর পরে ওঠে জুলির প্রসঙ্গ। স্বপনদা বলেন, "শুনছি ক্যারামেল নাকি ছাড়া পেয়েছে। কই, আসে না তো?"

"আসবে কী করে? ওর মা যে ওকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। সেই শর্তেই ওকে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। ছাড়া দেবার প্রধান কারণ ওর মাথার একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়েছে।" বাবলী যতদূর জানে।

"বলো কী! মাথা খারাপ হয়েছে!" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

"মাথা ওর কবে ভালো ছিল? তবে খারাপও ছিল না। এরপর যেতে হবে ওকে দেখতে। না সেটাও নিষেধ?" বৌদি সুধান।

"না, না, সেটা নিষেধ নয়। আমি একদিন দেখা করে এসেছি। বলেছি, যা হবার তা হয়ে গেছে। মাফ করিস, ভাই। জুলি তা শুনে খুশি হয়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, জানিস্ না বোধ হয়, আমি এখন এন্‌গেজ্‌ড। যার সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড সে এখন জেলে। আমি ওকে বলেছি যে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, সরকার এবার কংগ্রেসওয়ালাদের ছেড়ে দিয়ে মিটমাটের কথাবার্তা চালাবে। তা শুনে জুলির সে কী রাগ! তখনি টের পাই যে ওর মাথার ইস্ক্রুপ আলগা। বলে নিজের মা যদি শত্রু হয় তবে মানুষ কী করতে পারে! বেশ তো ছিলুম আমি জেলে। সবাই আমাকে তোয়াজ করত। সাহেবরা পর্যন্ত! গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে ওদের মধ্যে একটা পিঠুটান এসেছিল, কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে নেতাজী সুভাষ আসছেন শুনে ওদের চাপা উল্লাস। আমাকে দিনে দশবার প্রশ্ন করে, আর কত দেরি? আমি কেমন করে বলব কত দেরি? মনটা খারাপ হয়ে গেল শুনে যে ইম্ফল অবধি এসে ওঁরা ফিরে যান। কিন্তু ফিরে যাওয়া মানে তো বরাবরের জন্যে ফিরে যাওয়া নয়। আরো ভালো করে তৈরি হয়ে আবার এগিয়ে আসতেও তো পারেন। আমি ঠিক জানতুম যে নেতাজী রবার্ট ব্রুসের মতো বার বার ট্রাই করবেন। শেষে একদিন সফল হবেন। সেটা হবে দেশব্যাপী বিপ্লবের সিগনাল বিপ্লবী জনতা এসে ইংরেজদের তৈরি এই বাস্তিল দুর্গ ভেঙে আমাকে উদ্ধার করবে। আমি হাঁক দেব, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অমনি ওরাও প্রতিধ্বনি করবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আহা, সে কী উন্মাদনা! সে কী উদ্দীপনা! সে কী গৌরব! সে কী গর্ব! আমি বাংলাদেশের জোন অভ্ আর্ক। আমার নিজের মা আমাকে অসময়ে জেল থেকে বার করে এনে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকার থেকে নাকি

জানিয়েছিল যে আমার মাথার ঠিক নেই। কী করে ঠিক থাকবে শুনি? ইম্ফল থেকে নেতাজী ফিরে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে? লেনিন যদি পেট্রোগ্রাড থেকে ফিনল্যাণ্ডে ফিরে যেতেন তোর মাথার ঠিক থাকত? অবশ্য তুই তখন শিশু। আমার মা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। বেরোতে দিচ্ছে না। তবে বেশী দিন নয়। বিপ্লবী জনতা একদিন বাস্তিল ভাঙার পর এ বাড়ীর সদর দরজাও ভাঙবে। আমাকে নিয়ে মিছিলে বেরোবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জুলির মুখে এইসব শুনে আমি তো একেবারে থ! ও যে কোন্ মূর্খের স্বর্গে বাস করছে তা ও নিজেই জানে না।" বাবলী দুঃখ করে।

"কাঁদিয়ে ছাড়লে। আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়লে!" স্বপনদা আবার চোখে রুমাল দেন। এবার ক্যারামেলের জন্যে কান্না।

" সত্যি, কান্না পাবার মতো ব্যাপার।" বৌদিরও দৃষ্টি সজল।

"বিবাহ!" স্বপনদা বিধান দেন, "এই ব্যাধির একমাত্র ভেষজ বিবাহ। ক্যারামেলের বরকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। হিটলার হেরেছে, মুসোলিনি হেরেছে, তোজো আর কদ্দিন? বাধছে তো ওই বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ নিয়ে। সেইজন্যে যুদ্ধশেষের বিলম্ব হচ্ছে। তার আগে কি ওরা কংগ্রেসওয়ালাদের ছাড়বে? অসম্ভব নয়। জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দম ফুরিয়ে গেছে। একবার জাপানীদের সঙ্গে লড়ে ও একবার ইংরেজদের অনুগত জওয়ানদের সঙ্গে লড়ে ওরা ক্লান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বই যথেষ্ট নয়। দম দম যদি না থাকে তবে খেল্ খতম। আমার মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্তি আসন্ন। ওঁরা বেরিয়ে এলে ওঁদের দলবলকেও বার করে আনবেন।"

সত্যই জাপানের পরাজয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে সরকার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেন। কথাবার্তা যাতে সুগম হয় তার জন্যে কংগ্রেস কর্মীদেরও দফায় দফায় খালাস করা হয়। সৌম্যকে যেদিন ছাড়ে তার আগে জাপানে পরমাণু বোমা পড়েছে ও জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে।

জুলি তো হাতে স্বর্গ পায়। তার মন খারাপ থেকেই মাথা খারাপ। মন এখন ভালো, তাই মাথা এখন ভালো। তবু তার আক্ষেপ, "কোথায় সেই জনতা যে আমাকে বাস্তিল ভেঙে উদ্ধার করত আর আওয়াজ তুলত, ইনকিলাব জিন্দাবাদ? ওরা বোধহয় অপেক্ষা করছে কবে বাবলীরা ডাক দেবে। আমরা ন্যাশনালিস্টরা শ্রান্ত ক্লান্ত। ওরা কমিউনিস্টরা তরতাজা। জোয়ার এলে ওরাই তার সুযোগ নেবে।"

সৌম্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। "আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব আমরা তা করেছি। ফাঁকি দিইনি। ফলাফল আমাদের হাতে নয়। ভগবানের হাতে। ভগবান না মানলে ইতিহাসের হাতে। জনগণ যদি আমাদেরকেই বেশী বিশ্বাস করে তো আমাদের আগে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। যদি ওদেরকেই বেশী বিশ্বাস করে তবে ওরাই আমাদের আগে স্বাধীনতা আনবে, বিপ্লব ঘটাবে। এতে আফসোসের কী আছে? দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তিই তো আসল। আমরা নিমিত্তমাত্র। ওরাও তাই। মুক্তি যতদিন না আসে ততদিন আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাব। যার যেমন নীতি। আমি নীতি পরিবর্তন করব না। সত্য আর অহিংসাতেই অবিচল থাকব। বছর তিনেক আগে যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তার সংশোধন করতে হবে। এই দুই বছর আমি তাই নিয়ে খুব ভেবেছি। বাপুকে আমরা পুরোপুরি মান্য করিনি। সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে তাঁকেও কতকটা অমান্য করেছি। এই ডবল অমান্য কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। তা হলেও আমাদের সান্ত্বনা আমরা নিষ্ক্রিয় বসে থাকিনি। দেখা যাক্ দেশ কোন্‌টা বেশী পছন্দ করে। আমাদের সক্রিয়তা না বাবলীদের নিষ্ক্রিয়তা।"

দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীর রূপযৌবন অপেক্ষা করতে পারে না। একদা মহাত্মার আপ্তবাক্য ছিল "এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট।" সৌম্য কি সেটা মান্য করবে না অমান্য করবে? জুলির মা প্রসঙ্গটা পাড়লে সে বলে, "একবার বাপুর সঙ্গে কথা বলে আসি। দেখি তিনি কী বলেন। ইতিমধ্যে একবার আশ্রমেও ঘুরে আসতে হবে। দেখি সেটা কী

অবস্থায় আছে। জুলি কি পারবে সেখানে তিষ্ঠতে? আশ্রম ছেড়ে আমিই বা যাই কোথায়? বিহারের গণ্ডগ্রামে? জুলি কি পালিয়ে আসবে না?"

জুলি মুখ খুলতে যাচ্ছিল, ওর মা কথা কেড়ে নেন। "তা জুলিও তো সফ্‌ট নয়। কতরকম দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে সীজন্‌ড। তোমার দুশ্চর তপস্যায় ও তোমার সাথী হবে।"

এই স্থির হলো যে গান্ধীজী অনুমতি দিলে বিয়ে একটি শুভদিন দেখে হবে। তা সে হিন্দু, ব্রাহ্ম, সিভিল যে মতেই হোক। জুলি তা শুনে কাঁদতে বসে। আনন্দের কান্না। ওর মা সৌম্যকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, "জুলি তোমার গলগ্রহ হবে না। ওর বাবা ওর জন্যে যথেষ্ট রেখে গেছেন। ওর মাও তো কিছু দেবে। তবে, হ্যাঁ, ওর শ্বশুর ওর মাসোহারা বন্ধ করবেন। বিয়ের পর তো জুলি ওঁর ছেলের বৌ থাকবে না। মাসোহারার টাকা জুলি নিজের জন্যে খরচ করত না। ওটা ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপে লাগত। ওটা বন্ধ হলে ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপও বন্ধ হবে। আপদ যাবে। ও মেয়ে রাজনীতির জন্যে নয়। ঘরসংসারের জন্যে। তুমি দেখবে ওর ভোল ফিরে যাবে।"

"এই তো আমি চাই। ওর ভোল ফিরলেই আমি খুশি হব। রাজনীতি ওর স্বভাববিরুদ্ধ। সঙ্গদোষে ও সন্ত্রাসবাদী হয়েছিল। পরে হয়েছে বিপ্লবী নায়িকা। এটা ওর সত্যিকারের ভূমিকা নয়। কিন্তু, মাসিমা, বিয়ে করলেও যে আমরা গৃহী হতে পারব তা নয়। সুদিনের জন্যে সবুর করতে হবে। কে জানে, আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য ভাবী শাশুড়ীকে একটা চমক দেয়।

"না, না। ওটা ভাবা যায় না। না, না। ওটা মুখে আনা যায় না। জুলিকে কখনো জানতে দিয়ো না। ও মারা যাবে। আমিও।" তিনি কম্পমান।

স্বপনদা ও বৌদি আসেন দেখা করতে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুনে স্বপনদা বলেন, "শুভস্য শীঘ্রম্‌। মহাত্মার অনুমতির কী দরকার? নিজের ছেলের বিয়ের বেলা তো অমন কোনো শর্ত নির্দেশ করেননি যে আগে স্বরাজ তারপরে বিয়ে। দেবদাস যা পারে সৌম্যও তা পারে।"

বৌদি বলেন, "এটা হলো ব্যারিস্টারের যুক্তি। কিন্তু গান্ধীজী আইন অমান্য করতে করতে আইনকানুন সব ভুলে গেছেন। ওঁর কাছে ব্রতটাই বড়ো। দেবদাসের বোধ হয় তেমন কোনো ব্রত ছিল না। যেমন সৌম্যর।"

এর পরে কথাবার্তার মোড় ঘোরে। স্বপনদা বলেন, "তোমাদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সৌম্য। যুদ্ধ থেমেছে তোমাদের আন্দোলনের ফলে নয়, পরমাণু বোমা ব্যবহারের ফলে। আমি তো নিন্দাবাদের ভাষা খুঁজে পাইনে। ছি ছি! এ যে চূড়ান্ত অমানবিকতা। হিউমানিজমের যুগ যে শেষ হয়ে গেল। এ কোন্‌ যুগে আমরা পৌঁছলুম। অহিংসার নাম তো কেউ মুখেও আনতে চায় না। যেমন বিদেশে তেমনি এদেশে। একে তো পরমাণুর আঘাতে আমি শয্যাশায়ী, তার উপর এ কী অবিশ্বাস্য সংবাদ। এটা কি সত্যি।"

"কোন্‌ সংবাদের কথা বলছেন, স্বপনদা?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"আমার সহপাঠী সুভাষ নাকি প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। তাইপে জায়গাটা কোথায়? গেলই বা কেন সেখানে?" স্বপনদার কণ্ঠরোধ হয়।

জুলি চিৎকার করে ওঠে, "সব ঝুট হ্যায়। ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডা।"

ওর মা ওকে টেনে নিয়ে যান শোবার ঘরে। সেখানে ও পাগলের মতো চেঁচামেচি করে। বৌদিও পিছু পিছু যান ওকে শান্ত করতে।

সৌম্য দারুমূর্তির মতো নির্বাক। স্বপনদা ওর হাতে হাত রাখেন। চাপ দেন।

॥ দুই ॥

স্বপনদা ও দীপিকাদি জুলির খোঁজ নিতেই এসেছেন। জুলির সঙ্গেই গল্প করতে চান, তাই ওর মা ওকে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর ভাবী জামাতাকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "শুনলে তো ওর কথা? কেউ যদি বলে পাগল তা হলে কি ভুল বলবে? গভর্নমেণ্ট ওর দায়িত্ব নিতে নারাজ। আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। আমি ওকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। পাছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়ে। তুমি এসেছ। খুব ভালো হয়েছে। পৃথিবীতে একটিমাত্র পুরুষ আছে যে ওকে সুখী করতে পারে। সুখী হলেই ওর পাগলামি সেরে যাবে। আশ্রমে বা সেবাগ্রামে না গিয়ে তুমি এখানেই কিছুদিন থেকে যাও। রোজ ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। কখনো স্টীমারে করে। কখনো মোটরে করে। কখনো ট্রেনে করে। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরবে। দুপুরের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে সাজিয়ে দেব। আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গ পেয়েই ওর মতিগতি বদলাবে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেইদিন ওর বিয়ে দেব। যে মতে বলবে সেই মতে। ইতিমধ্যে যদি মহাত্মার অনুমতি নিতে হয় তো চিঠি লিখতে পারো। সশরীরে সেবাগ্রামে যেতে হবে কেন?"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "বিয়ে করলে আমার মন পড়ে থাকবে স্ত্রীর কাছে, পরে ছেলেমেয়ের কাছে। অন্তত আধখানা মন তো পড়ে থাকবেই। সংগ্রামের সময় এগিয়ে যাব কী করে? সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটা একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত। যিনি সত্যাগ্রহীদের সেনাপতি তিনি যদি নিকট ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহের জন্যে আমাকে চান তা হলে বিয়ে পেছিয়ে দিতেই হবে। যদি তার দেরি থাকে তা হলে হয়তো বা তাঁর অমত হবে না। বিয়ে আমি করবই। কথা যখন দিয়েছি তখন কথার নড়চড় হবে না। জুলি যদি রাজী হয় তো ওকেও আমি বাপুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। তাতে সুফল হতে পারে।"

"কোথায় উঠবে ওখানে?" মিসেস সিন্‌হা জানতে চান।

"আমি যেখানে উঠি। সোনাদির কুটীরে। কেশবন্ তাঁর স্বামী। দু'জনেই বিলেতফেরৎ। গান্ধীজীর গঠনকর্মে যোগ দিয়েছেন। স্বরাজের রূপরেখা তৈরি করেছেন। আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।" সৌম্য জানায়।

"আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমাকে দু'তিন সপ্তাহ ভাবতে দাও। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গগুণে জুলির অবস্থার রূপান্তর দেখি। ও মেয়ে যদি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যায় তা হলে তাঁর মুখের উপর কী যে বলে বসবে কে জানে। হয়তো বলবে, আপনার নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হবে না। কেন আমি পাঁচ বছর অপেক্ষা করব?" জুলির মা আন্দাজে বলেন।

"ঠিকই বলেছেন, মাসিমা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হয় কি না সন্দেহ। আমাদের বিচারে পূর্ণ স্বাধীনতা হচ্ছে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার স্বাধীনতা। তৃতীয় মহাযুদ্ধ কবে বাধবে,জানিনে। কিন্তু যদি বাধে তবে আমরা ওর মধ্যে নেই। আমরা নিরপেক্ষ। ব্রিটেন কি আমাদের এই স্বাধীনতা দেবে? এর চেয়ে কম নিয়ে আমরা কী করব? ব্রিটেনের জুনিয়র পার্টনার হব? গান্ধী থাকতে তা সম্ভব নয়। আমি থাকতেও সম্ভব নয়। আমাকে শহীদ হতেই হবে। জুলির যখন সেরবার মতো অবস্থা হবে তখন একথা ওকে আমি বলব। ওর যদি আপত্তি থাকে আমাকে বিয়ে না করাই ভালো। বাগ্‌দানের বাধ্যবাধকতা থেকে ওকে আমি রেহাই দেব। ও হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হবে।" সৌম্য বলে দুঃখের সঙ্গে।

"তুমিও দেখছি আরেক পাগল। আবার এক মহাযুদ্ধ? আবার ভারতকে জড়ানো? আবার তার

বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ। কিন্তু, বাছা, সেটা তো পঁচিশ বছরের আগে নয়। ততদিনে তোমার বয়স হয়ে থাকবে আটষট্টি, জুলির ষাট। বিয়ে করে থাকলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হয়ে থাকবে। তারা বিয়ে করে থাকলে তাদেরও ছেলেমেয়ে । সত্তর বছর বয়সে যদি কেউ শহীদ হয় — না হলেই ভালো — তবে এখন থেকেই ভয় পাইয়ে দেবার মতো কিছু নয়। জুলি আপত্তি করবে সেটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বরণ করবে না। এখন থেকে এসব সম্ভাবনার কথা তুলে বিয়েটাকে কেঁচে যেতে দিয়ো না। তা হলে ও মেয়ে আর কোনোদিন প্রকৃতিস্থ হবে না। ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সিপাই বিদ্রোহের ঘোঁট পাকিয়ে কী এক আজব তত্ত্ব বানিয়েছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠী । আমি তো তার মাথামুণ্ডু বুঝিনে। জুলির যে মাথা খারাপ হবে এর আশ্চর্য কী? তুমি যদি ওকে সেবাগ্রামে নিয়ে গিয়ে তোমার সোনাদির কাছে শিক্ষানবীশ করতে পারতে তা হলে আমার আপত্তি কী ছিল? কিন্তু আমার একমাত্র শর্ত বিয়েটা তার আগে হওয়া চাই। মেয়েদের জীবনে বিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন আনে। মাতৃত্ব আনে আরো গভীর পরিবর্তন। এসব অভিজ্ঞতার পরে তুমি ওকে যা করতে বলবে ও তাই করবে। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তোমার কন্তরবা হবে। আমার মেয়েকে আমি ভালো করেই চিনি। তুমি আর গড়িমসি না করে ওকে একটা চান্স দাও। তোমাকে তো ও বেঁধে রাখছে না। তুমি যদি নিজেকে দায়গ্রস্ত মনে করো তা হলে ওকে আমার কাছে থাকতে দিয়ো। আমি ওকে রাজনীতি করতে দেব না। সেবাকর্ম করতে দেব। আমার নার্সারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকবে। যতদিন না ওর নিজের ছেলেমেয়ে হয়।" জুলির মা প্রাণ খুলে বলেন।

"ও নিজেই সেটা পছন্দ করবে না, মাসিমা। ও আমার সঙ্গেই থাকতে চায়। সুখে দুঃখে আমার সাথী হতে চায়। মনে করুন আমি একজন সরকারী কর্মচারী। পূর্ববঙ্গই আমার কর্মস্থল। আমার স্ত্রী আমার কর্মস্থলেই বাস করবে। সেবাকর্ম যদি করতে চায় সেইখানেই করবে। যেমন করছে আমার বন্ধু মানসের বৌ যূথিকা। জুলির বন্ধু মিলিকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়। মিলি চলে গেছে ওর বরের সঙ্গে বিলেতে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে ওর বেশ বনিবনা। জাতিগত জীবনে সংঘর্ষ । সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে জুলিরও একই বরাত হতো। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আরেক রকম বরাত হবে। দেশ স্বাধীন হলেও আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে না। নিচের থেকে ধাপে ধাপে অথরিটি গড়ে তুলতে হবে। উপরে উপরে ক্ষমতা হস্তান্তর আমার আদর্শ নয়। উপরে উপরে ক্ষমতা ক্যাপচার তো আমার আদর্শ নয়ই। জুলির সঙ্গে আমার আদর্শের অমিল আগেও ছিল, পরেও থাকবে। যেমন সুকুমারের সঙ্গে মিলির অমিল। সুকুমার লিখেছে লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে নিরঙ্কুশ হয়েছে। ইণ্ডিয়াকে ওরা কানাডার মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে প্রস্তুত, শুধু ভারতীয় নেতাদের একমত হতে হবে। ওরা খুব শীগগির দেশে ফিরছে। সুকুমার আর মিলি। ইংলণ্ডের সঙ্গে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করবে। মিলি ততটা নয়, সুকুমার যতটা। কংগ্রেস নেতাদের হাত করতে বড়লাট ওয়েভেল সক্রিয়। তবে গান্ধীজীকে ভোলানো অত সহজ নয়। ভবী ভোলে না।" সৌম্য হাসে।

"মিঞা বিবি রাজী, কী করবে কাজী? ইংলণ্ড রাজী, কী করবে গান্ধী? লেবার পার্টি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কংগ্রেস পার্টিও হাত বাড়িয়ে দেবে। তারপরে দু'পক্ষের হ্যাণ্ডশেক । অ্যামিকেবল সেটলমেণ্ট। জেলযাত্রা ঢের হয়েছে। আর নয়। মানুষের ত্যাগশক্তিরও একটা সীমা আছে। সবাই তো আর মহাত্মা নয়। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ,জবাহরলাল, এঁরা পঁচিশ বছর ধরে জেলে যাচ্ছেন আর আসছেন। এঁরা আর কদ্দিন বাঁচবেন? মিটমাটের এই তো সময়। গান্ধীজী যদি এঁদের উপর দরাদরির ভার ছেড়ে দেন এঁরা দেশকে বিকিয়ে দেবেন না। অন্তত এইটুকু বিশ্বাস এঁদের উপর থাকা উচিত। অন্যান্য দেশের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তুলনায় এঁরা কেউ নিরেস নন। এঁরাও সমান যান। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন এখন না তোলাই ভালো। গভর্নমেণ্ট চালাতে গেলে কিছুটা ভায়োলেন্স তো দরকার

হবেই। সেই ভয়ে যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্টের দায়িত্ব না নেয় তো ইংরেজই থেকে যাবে। কংগ্রেসকে বাস্তববাদী হতে হবে। আদর্শবাদ নিয়ে গান্ধী থাকতে চান থাকুন। তুমিও তাঁর সঙ্গে। জুলিও তোমার সঙ্গে। আমি বাস্তববাদী। তাই সুকুমারের প্রচেষ্টার সমর্থন করি। কবে আসছে ওরা?'' তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

'' জাহাজ ছেড়েছে নভেম্বরে। ওরা সমুদ্র পথেই আসতে চায়। সেটাই সস্তা। আরাম তাতেই বেশী। বাচ্চা আছে সঙ্গে।'' সৌম্য মনে করিয়ে দেয়।

জুলির মা ড্রয়িং রুমে ফিরে যেতেই স্বপনদা বলে ওঠেন, ''শুভস্য শীঘ্রম্, আপনি আর দেরি না করে শাঁখ বাজিয়ে দিন। ওসব গান্ধী টান্ধী বাজে ওজর। উনি কি পোপ আর সৌম্য কি রোমান ক্যাথলিক? জানেন তো, বিয়ের সময় রোমান ক্যাথলিকদের পোপের অনুমতি নিতে হয়। ওটা অবশ্য একটা ফর্মালিটি। বিশপরাই পোপের হয়ে অনুমতি দেন। পোপের এত সময় কোথায় যে কোটি কোটি ক্যাথলিকের বিয়ের কাগজপত্র দেখবেন? আমরা হিউমানিস্টরা পোপ-টোপ মানিনে। গান্ধীজীর আশীর্বাদ অবশ্যই চাই। কিন্তু অনুমতি? যদি না দেন? সৌম্য বাপের সুপুত্রের মতো আজ্ঞাবহ হবে। কিন্তু ক্যারামেল কেন সে অপমান সহ্য করবে?''

''কিন্তু বাপুকে যে ও বাপের মতো মানে।'' জুলির মা বলেন।

''পোপ কথাটার মানেও বাপু। তাঁকে বাপের মতো মানতে মানতে ক্যাথলিকরা বিবাহের মতো প্রাইভেট ব্যাপারে তাদের লিবার্টি হারিয়েছে। গান্ধীভক্ত ভারতীয় জনগণেরও সেই দশা হবে না তো? আমি বলি, সৌম্য, তুমি চোখ বুজে ঝুলে পড়ো। আমি বাপুর কাছে আপীল করে অনুমতি আনিয়ে নেব।'' স্বপনদা হাসেন ও হাসান।

সৌম্য বুঝিয়ে বলে, ''ক্যাথলিকদের সঙ্গে তুলনা ঠিক নয়। গান্ধীজীর কাছে সবাই আশীর্বাদ চায়। অনুমতি চায় কেবল তারাই যারা কথা দিয়েছে যে দেশ মুক্ত না হলে বিয়ে করবে না। তখন তো জানা ছিল না যে দেশের স্বাধীনতার এত দেরি হবে। জানলে কথা দিতুম না। দিয়েছি যখন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে সুধাব আমার অঙ্গীকার থেকে আমি খালাস পেতে পারি কি না। জুলি যদি আমার সহকর্মী হতে রাজী হয় বাপু খালাস দিতে রাজী হতে পারেন।''

''তার মানে ক্যারামেলকে তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে। তুমি কি তাতে রাজী হবে, ক্যারামেল?'' স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

''ও যদি আমাকে গ্রহণ করে ওর জন্যে আমি সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী। স্বাতন্ত্র্য আবার কী?'' জুলি আবেগের সঙ্গে বলে।

স্বপনদা তারিফ করে বলেন, ''মহাত্মা চৌধুরী, এই কন্যা একদিন তোমার কস্তুরবা হবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দু'জনেরই পায়ের ধুলো নেবার জন্যে গ্রাম গঞ্জ থেকে বুলক প্লেনে করে হাজার হাজার মানুষ আসবে। ক্যারামেল তোমার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে রাজী। আর ওর বৌদিকে দেখছ তো? বিয়ের পরেও সমানে চাকরি করে যাচ্ছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না।''

বৌদি এটা প্রত্যাশা করেননি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো হাসি দিয়ে রাগ চাপেন। বলেন, ''এই প্রচ্ছন্ন হিটলারটির বদ্ধমূল ধারণা নারীজাতির প্রকৃত স্থান হচ্ছে রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর আর ঠাকুরঘর। হাইকোর্টে আজকাল মহিলা ব্যারিস্টাররাও প্র্যাকটিসে নেমেছেন। তা দেখে এঁর যা আতঙ্ক! আমি অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে নিজ গুণে চাকরি পেয়েছি। নিজ গুণেই চাকরি করে যাচ্ছি। এটা পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নয়। তাই এঁর যত আক্রোশ। নারীকে ইনি স্বনামী হতে দেবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে আজকাল পুরুষরাই স্ত্রীর পদবী ধারণ করে যুক্তনামা। নতুন সেক্রেটারী অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া

লর্ড পেথিক-লরেন্স বিয়ের আগে ছিলেন পেথিক। মিস্ লরেন্সের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে হলেন পেথিক-লরেন্স।"

মিসেস সিন্‌হা স্বপনদার পক্ষ নিয়ে তর্ক করেন। "বিয়ের পরে যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি বা প্র্যাকটিস করে ঘরসংসারে শ্রী থাকে না, ছেলেমেয়েরা আদর যত্ন পায় না, চাকরবাকর লুটে পুটে খায়। স্বামীও তো স্ত্রীর জন্যে ত্যাগস্বীকার করছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে আসছে। ত্যাগটা একতরফা নয়। কিন্তু একালের মেয়েদের দোষ দেওয়া যায় না। বেশী লেখাপড়া শেখালে বড়ো চাকরির উচ্চাভিলাষ জাগবেই। যে মেয়ে ডক্টরেট পেয়েছে সে মেয়ে বিয়ের পরে ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করবে না, সুক্তুনি রাঁধবে না। সেইজন্যেই তো আমি জুলিকে বেশী লেখাপড়া শেখাইনি। বিয়ে দিই স্কুল শেষ করার আগেই। তার ফল হয়েছে শোচনীয়।"

স্বপনদার মাথায় ঘুরছিল হিটলার। খাপছাড়া ভাবে বলেন, "হিটলারকে খাটো করার চেষ্টা বৃথা। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ব্রহ্মচারী।"

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে যায়। দীপিকা বৌদি এবার তাঁর কর্তার বক্তব্য বিশদ করেন। "বার্লিনের পতন আর হিটলারের নিধন সংবাদ শুনে উনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন, হেক্টরের নিধন। ট্রয়ের পতন। সেই যে উনি শয্যা নেন তার পরে চব্বিশ ঘণ্টা দরজা বন্ধ। মস্কো রেডিও, বি বি.সি., ভয়েস অভ্ আমেরিকা আমি একাই শুনি। হিটলারের মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়নি, দাহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দাহ করা হয়েছে তার সঙ্গিনী এফা ব্রাউনের মৃতদেহকেও। হিটলারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে নাকি এফার সঙ্গে আইন অনুসারে বিবাহ। তা হলে আর ব্রহ্মচর্য রইল কোথায়? কান্নাও পায়, হাসিও পায়। ওঁকে বলিনে। পাছে শক্ পান। কিন্তু বেশীদিন না বলেও থাকা যায় না। শুনে বলেন, যে মানুষ মাছ খায় না, মাংস খায় না, মদ খায় না, তামাক খায় না, টাকা খায় না সে মানুষ বামাচারী হতে পারে না। ওটা প্লেটোনিক সম্পর্ক। ব্রতসিদ্ধির পর ওদের যথারীতি বিবাহ হতো। পতির সঙ্গে সতী একই চিতায় আরোহণ করেছেন। ব্রতসিদ্ধি হবার নয়। জয়ের আশা নির্মূল। পরাজয়ের গ্লানি অসহ্য। নাটক হিসাবে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডী। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।"

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "আমার মনে আছে এক মুসলমান ফকিরনীর কণ্ঠে শুনেছি 'চণ্ডিদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দু'জন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।' হাজার বছর পরে হিটলার আর এফা ব্রাউন সম্বন্ধেও ওদেশের লোকসঙ্গীতে অনুরূপ পদ শোনা যাবে।"

স্বপনদা খুশি হয়ে বলেন, "লোকসঙ্গীতের ধারা ওদেশে এখনো শুকিয়ে যায়নি। ব্যালাড সিঙ্গার এখনো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আর বেহালা বা ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে ব্যালাড শোনায়। জার্মানদের মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য। তবে এমন দুর্ভাগা জাতি আর নেই। অনেকটা আমাদেরই মতো। এবার তো ওরাও পরাধীন। আমরাও পরাধীন। আমরা একদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হলেও হতে পারি, কিন্তু রুশের হাত থেকে ও মার্কিনের হাত থেকে জার্মানদের মুক্তি আমার দূরদৃষ্টির বাইরে। সৌম্য, তুমিও তো জার্মানী দেখে এসেছ। তোমার কী মনে হয়?"

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, "ভারত যদি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হয় তবে জার্মানীও ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হবে। সত্যাগ্রহই হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প। বিদ্রোহ বিপ্লবেরও। এটা যদি ভারতের বেলা উপযোগী হয়ে থাকে তো জার্মানীর বেলাও উপযোগী। আমরা যারা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে গান্ধীপন্থা অনুসরণ করে চলেছি তারা সারা বিশ্বের জন্যে পায়ের চিহ্ন রেখে যাচ্ছি।"

"দূর পাগলা।" স্বপনদা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। "যারা এতকালের খ্রীস্টকে ছেড়েছে তারা একালের গান্ধীকে ধরবে? কেন ওরা নতুন করে পেগান হতে গেল এ নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছ? আমি তো

অন্ধকারে আলো খুঁজে পাচ্ছিনে। রাজনীতি অর্থনীতির ভিতরে এর উত্তর নেই। সমাজনীতির ভিতরেও না। দর্শনের ভিতর থাকলেও থাকতে পারে।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে দীপিকাদি বলেন, "কই, সৌম্য, তুমি তো বললে না জুলির জন্যে তুমি কী বিসর্জন দেবে? না, বিসর্জনটা একতরফা হবে? যেমন তোমার স্বপনদার ধারণা।"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, " আমার যা কিছু ছিল সব কিছু আমি দেশের জন্যে বিসর্জন দিয়েছি। তার মানে ট্রাস্টীদের হাতে দিয়েছি। জুলির খাতিরে ওদের একজন সরে যাবে। জুলিও একজন ট্রাস্টী হবে। গ্রামে গিয়ে বসলে খাওয়া পরার কষ্ট হবে না। পরিশ্রম করলে স্বচ্ছন্দেও থাকা যায়। কিন্তু শহরের মায়া কাটাতে হবে। গ্রামের ধন শহরে এনে খরচ করা চলবে না।"

স্বপনদা দীপিকাদিকে মুখ খুলতে দেন না। বলেন, "আমার প্রশ্ন হলো হিটলার যদি পেগানই হবেন তা হলে মদ্য মাংস বর্জন করবেন কেন? পেগানরা তো আস্ত শুয়োর পুড়িয়ে খেত। এখনো ইংরেজ অভিজাতরা তাই করে। আমার মতে হিটলার ছিলেন প্রচ্ছন্ন হিন্দু, হিন্দুদের মতো তাঁর অগ্নিসংস্কার হলো। হিন্দুদের মতোই তাঁর বিবাহিতা পত্নী সতী হলেন।"

বৌদি হাসতে হাসতে বলেন, "তুমি দেখছি ডেভিল্‌স্ অ্যাডভোকেট। আমি কিন্তু জানিয়ে রাখছি আমি সহমরণে গিয়ে সতী হব না। যদি তুমি আগে যাও। পুরুষের মতো নারীও একটি ব্যক্তি। তার জীবন তার, মরণও তার।"

সেদিন আলাপ আলোচনার পর এই স্থির হয় যে সৌম্য যাবে সেবাগ্রামে মহাত্মার অনুমতি প্রার্থনা করতে। আগে অনুমতিলাভ। তারপরে আর সব। কবে বিয়ে, কোন্ মতে। বিয়ের পর জুলি কোথায় থাকবে। আশ্রমে না শ্বশুরবাড়ীতে না মায়ের কাছে। অনুমতি না পেলে কিন্তু অচল অবস্থা। তখন কর্তব্য স্থির করার জন্যে আবার বৈঠক বসবে। স্বপনদা ও দীপিকাদি আসবেন।

এমন সময় সৌম্য এক ফ্যাসাদ বাধায়। "আমার তো বাবা নেই, বাপুই আমার বাবা। বাপের কাছে ছেলে মুখ ফুটে বলে না, বাবা, আমি বিয়ে করতে চাই। এদেশের রেওয়াজ কন্যাপক্ষের একজন মুরুব্বি গিয়ে বরকর্তার কাছে প্রস্তাবটা পাড়বেন। বর এমন ভাব দেখাবে যেন ভিজে বেড়ালটি। কিছুই জানে না। এক্ষেত্রে মুরুব্বি হতে হয় কনের মাকেই। কিন্তু তাঁকে সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার অত্যাচার। যদিও বাপু খুব খুশি হয়ে রাজী হতেন। তাঁর দিদি তো অসুস্থ মানুষ। জুলির মুরুব্বি বলতে আমি একজনকেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি স্বপনদা।"

স্বপনদা ফোঁস করে ওঠেন। "আমি যাব পোপের সঙ্গে অডিয়েন্স যাচ্ঞা করতে রোমে! পোপ যদি অনুমতি না দেন আমার মুখ থাকবে?"

"তা হলে, চল, সৌম্য, আমিই তোমার মুরুব্বি হয়ে যাই। আমার আর্জি শুনে তোমার বাপু কিছুতেই 'না' বলতে পারবেন না। বললে আমি ধর্না দেব। জুলি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী থাকে তো আরো ভালো। ওর মুখ দেখলে পাষাণও গলে যায়। সারা জীবন কেবলি একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে আসছে। শেষ ধাক্কা নেতাজীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ।" বৌদি সমবেদনার সঙ্গে বলেন।

"বিলকুল ঝুট হ্যায়।" জুলি জ্বলে ওঠে। "ওটা আত্মগোপনের ছলনা। মার্কিনদের চোখে ধুলো দিয়ে রুশ দখলী অঞ্চলে চলে গেছেন।"

বৌদি তা শুনে বলেন, "তা হলে জুলির না যাওয়াই ভালো। আমি ওসব বিতর্কিত প্রশ্ন এড়িয়ে যাব।"

স্বপনদা ঘোরতর আপত্তি করেন। "গৃহকর্তাকে একলা ফেলে গৃহিণী কখনো ফেরার হন? আমি ফেরারি পরোয়ানা জারি করব না? ধর্না! ধর্না দেবে তুমি! আমার মাথা কাটা যাবে না! কাগজে কাগজে টি টি পড়ে যাবে না?"

জুলির মা হেসে বলেন, "স্বপন ওর বৌকে কত ভালোবাসে দেখছ তো। দেখে শেখ। একটা দিনও চোখের আড় করবে না।"

"না, মাসিমা, এর একটা প্র্যাকটিক্যাল কারণ আছে। রানু না থাকলে ওর কুকুর এল্‌ফকে আমি সামলাতে পারব না। তা হলে কুকুরকেও সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যেতে হয়। সে বেচারার উপর অত্যাচার।"

তখন এই স্থির হয় সেবাগ্রামে গিয়ে সৌম্য সোনাদিকে অনুরোধ করবে কন্যাপক্ষের মুরুব্বি হতে। সোনাদি সহায় হলে অনুমতি সহজলভ্য।

জুলি বায়না ধরে সেও সৌম্যর সঙ্গে সেবাগ্রামে যাবে। সোনাদিদের অতিথি হবে। ওর মা সেটা এককথায় খারিজ করেন। "কনের দিক থেকে ঝোলাঝুলি লজ্জাকর ব্যাপার। আমাদেরও তো মানসম্ভ্রম আছে।"

আসল কারণ পুলিশকে তিনি কথা দিয়েছেন যে জুলিকে চোখে চোখে রাখবেন। যদিও তার আর দরকার নেই, জেলগুলো খালি হয়ে গেছে। গোলমাল যা তা ওই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তিন প্রধানের বিচার নিয়ে। এর মধ্যে রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, " কদম কদম বঢ়ায়ে যা।" সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও সে রেকর্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করছে।

সোনাদিকে সৌম্য চিঠি লেখে। যতদিন না তাঁর উত্তর আসে ততদিন সে কলকাতায় থাকবে। সোদপুর আশ্রমের কাজ সেরে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। ভাবী বরবধূ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় আসবে। যদিও তাদের পরিচয় পনেরো যোল বছরের তবু প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ কেউ কোনোদিন পায়নি। প্রেম নিবেদন তো দূরের কথা। স্বরাজের জন্যে মুলতুবি রেখে দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে স্বরাজের খুব বেশী দেরি নেই। ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। এখন মুসলিম লীগকে নিয়েই ভাবনা।

একদিন গঙ্গা পার হওয়ার সময় জাহাজে তাঁর সঙ্গে দেখা। "চিনতে পারছেন? সেই পুরনো পাপী। আপনাদের সিভিল সার্জন। ক্যাপটেন ল। পরে মেজর ল। শেষ সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর যাত্রার আগে। তার পরে প্রায় ছ'বছর কেটে গেছে। এ কন্যাটি কে? মঞ্জুলিকা সিন্‌হা? সিভিল সার্জন ক্যাপটেন সিন্‌হার মেয়ে? ক্যাপটেন মুস্তাফীর মেয়ে মধুমালতীর বান্ধবী?"

সৌম্য চিনতে পারে। জুলি পারে না। ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। "সিভিল সার্জন ডাক্তার ঘটকের কন্যা কৃষ্ণকলি। বারনা বলে জানে সকল লোক। বাপ মায়ের অমতে ওয়াকি হয়ে যুদ্ধে যায়। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে নিজের ঘরেই ঠাঁই পাচ্ছে না। ওয়াকি বলে সমাজেও একঘরে। এখন থাকে ওর বান্ধবী সবিতার ওখানে। সেও ছিল ওয়াকি। ওরা ইঙ্গবঙ্গ। তাই এমন গোঁড়া নয়। যুদ্ধকালে ইংরেজের মেয়ে যদি ওদেশে ওয়াকি হতে পারে বাঙালীর মেয়ে হবে না কেন? এরা বীরাঙ্গনা। তাই বীরপুরুষকে দেখে এক আঁচড়ে চিনতে পারে। সিঙ্গাপুরে নেতাজী আমাকে জাপানীদের বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চিকিৎসাভার দেন। মেজরকে বানিয়ে দেন ব্রিগেডিয়ার। ফৌজের সঙ্গে আমিও ফ্রন্টে গেছি। অ্যাকশন দেখেছি। জয় করে এগিয়ে এলে নেতাজী আমাকে মেজর জেনারেল বানাতেন। দুর্ভাগ্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমরা আবার চেষ্টা করব। ট্রায়, ট্রায় এগেন। তিনি বলতেন, ডিফিট ইজ আ ওয়ার্ড নট ফাউণ্ড ইন মাই ডিক্সনারী। জাপানীরা যে আচমকা আত্মসমর্পণ করবে এর জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কোথায় যে অন্তর্হিত হলেন কেউ সঠিক বলতে পারে না। মাঝখান থেকে আমি পড়ে যাই ফাঁপরে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চোখে আমি একজন ট্রেটর। চেনা জানা সাহেবরা সার্টিফিকেট দেন যে চিকিৎসায় আমার হাতযশ আছে বলে বিদ্রোহী ফৌজ আমাকে বন্দিশালা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তারের কর্তব্য হলো চিকিৎসা, তা সে শত্রুরই হোক আর মিত্রেরই হোক। কাউকে তো আমি মারিনি, বরং কতকগুলি লোককে বাঁচিয়েছি। তারা দুই পক্ষের লোক। কোর্ট মার্শাল

থেকে ব্যাঙ্ক পেয়েছি, কিন্তু চাকরিটি গেছে। র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি কাগজে কলমে ক্যাপটেনও নই। চাকরি গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, লাহা পরিবার গরিব নয়। কিন্তু র‍্যাঙ্ক কেড়ে নিয়েছে। কী অন্যায়! আমি যাচ্ছি বিলেতে আপীল করতে। মাতাল ফিলিপের কাছ থেকে অপ্রমত্ত ফিলিপের কাছে! ব্রিটিশ জাস্টিসের উপর আমার আস্থা আছে।"

জুলি লাল হয়ে বলে, "মাফ করবেন, ব্রিটিশ জাস্টিস না ব্রিটিশ ইনজাস্টিস? আমার বাবা প্রথম মহাযুদ্ধে টার্কদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধের ডেস্‌প্যাচে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপটেনের উপরে তাঁকে উঠতেই দেওয়া হয় না। কী অপরাধে জানেন? জালিয়ানওয়ালাবাগ তিনি বরদাস্ত করেননি। হুজুর বাহাদুরদের দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি বিলেত যাচ্ছেন, যান। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে আপনাকে আমরা নেতাজীর বিশ্বস্ত চিকিৎসক হিসাবে সম্মানের পদ দেব না। সার্জন জেনারল তো নয়ই, ইনস্পেকটর জেনারল অভ্‌ প্রিজন্‌স পদও আপনার কপালে নেই। ক্ষেমা ঘেন্না করে আবার সেই সিভিল সার্জন।"

"তা বলে কি আমার জীবনের এই সাধটা অপূর্ণ থেকে যাবে? মরার আগে একবার বিলেত দেখতে পাব না? আর এই যে বীরাঙ্গনা এর কি এদেশে কোনো ভবিষ্যৎ আছে? তোমাদের হাতে ক্ষমতা এলে তোমরা কি একে ছেই ছেই করবে না? এ মেয়ে ওয়াকি হলেও নেতাজীর পরম ভক্ত। আমি তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী বলে আমাকেও এ মেয়ে বীরপুরুষ বলে পূজা করে। আমার সম্বর্ধনা সভা যখন যেখানে হয় তখন সেখানে হাজির হয়। সভা তো লেগেই রয়েছে। লোকে নেতাজী আর আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের খবর শুনতে পাগল। আমি ছিলুম তাঁর কাছের মানুষ। হাঁড়ির খবর জানতুম। তা বলে তো হাটে হাঁড়ি ভাঙা যায় না। তাঁর অনুমতি নিতে হবে আগে। প্রথমে জানতে হবে তিনি এখন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। ওই যে রটেছে প্লেন দুর্ঘটনা ওটা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু যা বলছিলুম এই যে বীর তরুণী এর কী জানি কেন আমার মতো এক বৃদ্ধকে ভালো লেগেছে। এককালে আমার স্বপ্ন ছিল বিলেত যাব, আই. এম. এস. হব, মেম বিয়ে করব, তার কোনো সম্ভাবনা দেখছিনে। তাই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার কথা ভাবছি। ওর মা কিছুতেই রাজী নন। সোনার বেনের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে। ওর বাবা আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, ওয়াকিকে কেউ বিয়ে করবে না। ও মেয়ে ওল্‌ড মেড হবে। আমরা মারা গেলে ওকে দেখবে কে? ওর বান্ধবী সবিতাই বা কদ্দিন আশ্রয় দেবে? শুনছি সবিতারও পাত্র জুটেছে। আমরা যদি ঝরনাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করি আত্মীয়রা কেউ আসবে না। কিন্তু তুমি যদি ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে কর তা হলে আমরা দু'দিন গালমন্দ করে পরে ঠাণ্ডা হব। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছ, তুমি ক্ষত্রিয়। ঝরনাও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজ করেছে, সেও ক্ষত্রিয়াণী। তোমাদের বিবাহ অসবর্ণ নয়। পালিয়ে যাওয়ার আইডিয়াটা তিনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেন। আমি সেটাকে একটু পল্লবিত করি। কলকাতা থেকে জাহাজে চড়ে সোজা লণ্ডন। সঙ্গে ঝরনা। বিয়ে তো জাহাজেও হতে পারে। তবে ঝরনা যদি চায় জাহাজে ওঠার আগেই সেরে নিতে পারি। কী বলো, ডারলিং।" লাহা ওর দিকে সানুরাগে তাকান।

"বিশ্রী কালো মেয়ে, তিরিশের উপর বয়স, ওয়াকি বলে অপবাদের পাত্রী, গুরুজন আমাকে পাত্রস্থ করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমিও বিলেত যেতে চাই। কোয়ালিফিকেশন আরো বাড়াব। বিয়ের কথা তার পরে ভাবা যাবে। যদি ততদিন আপনার মেম বৌ না মিলে থাকে। জাহাজে আমি আপনার সঙ্গিনী হব। জীবনসঙ্গিনী হব কি না সেটা পরের কথা।" ঝরনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। ইস্পাতের ফলার মতো ঋজু দীঘল গড়ন। ঈষৎ পুরুষালি চেহারা। টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

লাহা ওর হাত ধরে বলেন, "সৌম্য সাক্ষী, জুলি সাক্ষী, গঙ্গা সাক্ষী, অন্তরীক্ষ সাক্ষী, তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি এন্‌গেজ্‌ড। যার কাছে আমি হীরো সেই আমার কাছে হীরোইন। গায়ের রং

নিয়ে আমি কী করব? মনের রংটাই আসল। ইউ আর আ লাভলী গার্ল। তিরিশ নয়, উনিশ।"

।। তিন ।।

স্বপনদার জন্যে প্রচণ্ড শক অপেক্ষা করছিল। এটা তাঁকে একেবারে কাৎ করে দেয়। নাৎসীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বিনা বিচারে আবদ্ধ ইহুদী, পোল ও জিপসীদের গ্যাস চেম্বারে পুরে গণহত্যা। সর্বমোট ষাট লক্ষের মতো। যুদ্ধকালে এসব গোপন ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সভ্য জগৎ শিউরে উঠছে। যারা ঘটি যাদের উপর ঘটানো হয়েছে তারা দুই পক্ষই সভ্য। এ কেমনতরো সভ্যতা? মানবিক না দানবিক?

হিটলার সম্বন্ধে তাঁকে নতুন করে ভাবতে হয়। বোমার মুখে যারা পড়ে তারা নারীও হতে পারে, শিশুও হতে পারে, তাদের মৃত্যু ইচ্ছাকৃত খুন নয়। কিন্তু গ্যাস চেম্বারে পুরে যাদের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন গ্রামে বাস করত। তাদের বাড়ী থেকে একে একে ধরে বেঁধে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বলিদানের জন্যেই। লক্ষ লক্ষ বাল বৃদ্ধ বনিতা, তাদের আর কোনো দোষ নেই, তারা ইহুদী বা পোল বা জিপসী। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এক একটা জাতির বংশলোপের অভিযান। যেমন মশককুল বিনাশের জন্যে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ।

"ব্রহ্মচারী নয়, ব্রহ্মদৈত্য।" স্বপনদা অস্ফুট স্বরে বলেন।

তা শুনে বৌদি মন্তব্য করেন, "চোখ একটু একটু করে ফুটছে। আরো ফুটবে। তবে হিটলারকে তুমি হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে পাবে না। পেতে পারো বরং খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যে। হিটলারই সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট যার আসার কথা খ্রীস্টের পুনরাগমনের পূর্বে।"

স্বপনদা খ্রীস্টীয় থিয়োলজি পড়েননি। পড়তে আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁর অধ্যয়নের সীমা ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও শিল্প অবধি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যেটুকু থিয়োলজি পান সেইটুকুই তিনি জানেন। যেমন দান্তের ডিভাইন কমেডির ভিতর দিয়ে। কিংবা মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট'র।

নেপথ্যে রিহার্সলের পর বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে অভিনীত এক মহানাটক হচ্ছে মহাযুদ্ধ। হিটলার, মুসোলিনি, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন, পেতাঁ, দ্য গল, সুভাষ প্রভৃতি তার কুশীলব। প্রেক্ষাগৃহে বসে পাঁচ ঘণ্টা ধরে উপভোগ করা যায়। আর সব নাটকের মতো, উপন্যাসের মতো, আর্টের মতো এটাও হচ্ছে মায়া। মহাযুদ্ধ যখন, তখন মহামায়ার মায়া।

হিন্দুদের দুটি মহাতত্ত্ব আছে যা দিয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের অর্থ বোঝানো হয়। লীলাময়ের লীলা। মহামায়ার মায়া। যে নাটকে প্রেমের দৃশ্য নেই লীলাময়ের লীলা বলে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। মহামায়ার মায়া বলে ব্যাখ্যা করলে তবু কতকটা বোধগম্য হয়।

স্বপনদার মুখে 'মহামায়ার মায়া' শুনে বৌদি জিজ্ঞাসা করেন, "কবে থেকে তুমি মায়াবাদী হলে?"

"কেন? আমি কি বলেছি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া?" দাদা জবাব দেন, "আর্ট মাত্রেই মায়া। আর এটা তো মহানাটকের বিষয় — এই মহাযুদ্ধ, যা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। মায়া! মায়া! মহামায়ার মায়া। এ ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। অর্থ এর রাজনীতিতে নেই, অর্থনীতিতে নেই, সমাজনীতিতে নেই, ধর্মনীতিতেও নেই। ওসব যেন আঁধার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজা, যে বেড়াল সেখানে নেই।"

বৌদি সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, "বুঝতে পারছি তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার স্বধর্মভ্রষ্ট হবে কেন? তুমি হিউমানিস্ট। তোমার ধর্ম হিউম্যানিজম। মহামায়ার মায়া তোমার মুখে মানায় না। তোমার পক্ষে ওটা একটা পরাজয়। তুমি কেন ডিফিটিস্ট হবে?"

"দ্যাখ, রানু, যে কোনো একটা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়েই আমি মর্মে আঘাত পাই। আর এ তো কোটি কোটি হত্যাকাণ্ড! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী ও শিশুর নিধন। একদিকে পরমাণু বোমা, আরেক দিকে গ্যাস চেম্বার। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ব্যভিচার। আসল খুনী সৈনিকরা নয়, বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরাই। মানুষকে এরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিছু দিয়েছে বইকি। কিন্তু কত দামে? পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর মহামারী। তাও বেছে বেছে ঠগ উজাড় নয়, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা বলতেন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন। সারভাইভাল অভ্ দা ফিটেস্ট। কিন্তু এই শতাব্দীতে দেখা গেল যোগ্য অযোগ্য সবাই এক নৌকায় ডুবেছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে গোটা পৃথিবীটাই টাইটানিক জাহাজের মতো সবাইকে নিয়ে ডুববে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন একটা ফ্যালাসী।" স্বপনদা অভিযোগ করেন।

"বেশ তো, তোমরা সাহিত্যিকরা সে ফ্যালাসী শুধরে দাও। নাটক লেখ, উপন্যাস লেখ, গল্প লেখ। তুমি তো কেবলি ভাবছ আর ভাবছ। রদ্যাঁর ভাবুকের মতো। কলম ধরে লিখছ না কেন? বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরা যে অনিষ্টটা করছেন তোমরা সাহিত্যিকরা সেটাকে ইষ্ট দিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারো। ইভিল যত প্রবল হোক না কেন গুড তার চেয়েও প্রবল হতে পারে। শয়তান যত শক্তিশালী হোক না কেন ভগবান তার চেয়েও শক্তিশালী। যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে ভাবতে চাও তো শয়তানকেও বাদ দিয়ে ভাবো। কোথাও যদি ভগবানের হাত দেখতে না পাও তো শয়তানের হাতই বা দেখতে যাও কেন? আজকের দুনিয়ায় যেসব ফোর্স কাজ করছে হিটলার, স্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট হচ্ছেন তাদের হাতের যন্ত্র। ওঁরা কেউ ব্যক্তিগত খামখেয়ালির দ্বারা চালিত হয়ে মারাত্মক সব সিদ্ধান্ত নেননি। নৈর্ব্যক্তিক চাপ তাঁদের বাধ্য করেছে। প্রাইভেট লাইফে কেউ হয়তো খারাপ লোক নন। পাবলিক লাইফে প্রত্যেকেই কম বেশী খারাপ। বৈজ্ঞানিকরাও তাই, যদি রাষ্ট্রের অর্থ গ্রহণ করেন। তুমি স্বাধীন ব্যারিস্টার। তোমার মতো স্বাধীনতা কার? তুমি তোমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করো। অন্যের ব্যভিচার নিয়ে ওল্ড মেডদের মতো যত কুটকচালি করতে যাও কেন?"

"আমি ওল্ড মেড!" স্বপনদা করুণ কণ্ঠে বলেন।

"ওল্ড মেড বলিনি। বলেছি ওল্ড মেডদের মতো। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে? কবে লিখবে তোমার ক্লাসিক উপন্যাস? কবে থেকে শুনে আসছি তুমি এই লিখবে, ওই লিখবে, কিন্তু লিখতে তো হাত ওঠে না। মাদাম বোভারীর ব্যভিচারের মতো ব্যভিচারই তোমার প্রিয় বিষয় মনে হচ্ছে। লেখ না কেন একটা মুখরোচক কেচ্ছা। তোমাদের ব্যারিস্টার মহলে তো পরকীয়া প্রেমের অভাব নেই। পরকীয়াকে পরে স্বকীয়াও করা হচ্ছে। স্বকীয়াকে পরকীয়া।" বৌদি রসিয়ে রসিয়ে বলেন।

" লিখি আর তারপরে লাইবেলের মামলায় জড়িয়ে পড়ি। এদেশে 'মাদাম বোভারী' লেখার মতো ঝকমারি আর নেই।" স্বপনদা সহাস্যে বলেন।

"চিরন্তন ত্রিভুজ না হলে কি চিরায়ত সাহিত্য হয়? পশ্চিমের আদি কবি হোমারের 'ইলিয়াড' কি এর সেরা দৃষ্টান্ত নয়?" বৌদি পরিহাস করেন।

"তা যদি বলো ভারতের আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণও তাই। হেলেন, পারিস, মেনেলাউস। রাম, রাবণ, সীতা। রাবণ সীতার সতীত্বহানি করেনি, এই যা তফাৎ। তবে অযোধ্যার লোক সেটা বিশ্বাস করল না। তাই শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডী।" স্বপনদা দরদের সঙ্গে বলেন।

"মধ্যযুগেও তো একই থীম। এদিকে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস। ওদিকে দান্তে, পেত্রার্কা। পরকীয়া না হলে চিরায়ত সাহিত্যই হয় না। তার মানেই চিরন্তন ত্রিভুজ। এ সমস্যা তিন হাজার বছর আগেও ছিল, তিন হাজার বছর পরেও থাকবে। তুমি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে দিনরাত ভাবছ, কিন্তু এক আধ শতাব্দী পরে এসব সমস্যা বাসী হয়ে যাবে। হিটলারের আমলের কোনো চিহ্নই থাকবে না। চার্চিলকেও লোকে ভুলে যাবে। স্টালিনের ডিকটেটরশিপ রাশিয়ানদের অসহ্য হবে। রুজভেল্টের নিউ ডীল তাঁর

সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে। জাপান আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু তার এটুকু শিক্ষা হয়েছে যে পার্ল হারবারে বোমা ফেললে হিরোশিমায় বুমেরাং হয়। ওটা জার্মানদেরও শিক্ষার সূত্র। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতেপড়ে এ শিক্ষা হতো না। পরকে মেরে তার হাতে মরাও একপ্রকার পরোক্ষ আত্মহত্যা। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এটা আরো পরিষ্কার হবে।" বৌদির বিশ্বাস।

"তৃতীয় মহাযুদ্ধ কি সত্যি বাধবে?" স্বপনদার সন্দেহ।

"বাধলে আশ্চর্য হব না। না বাধলে আনন্দিত হব। মানবজাতির উপরে তোমার যতখানি ভরসা আমার ততখানি নেই। তুমি ধরে নিয়েছ এ জাতি দিন দিন আরো বিজ্ঞ হবে। আমি কিন্তু দেখছি যতবার নতুন কোনো যন্ত্র বা নতুন কোনো অস্ত্র উদ্ভাবন করছে ততবার ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ফলে প্রগতিটাই হয়েছে দুর্গতির সঙ্গে একাত্ম। এর যদি কোনো প্রতিকার খুঁজে বার করতে পারো তো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখ। নয়তো মন দাও চিরন্তন বিষয় নিয়ে চিরায়ত কথা নাটক উপন্যাস রচনায়। যদি সে ক্ষমতা থাকে।" বৌদি গুরুজনের মতো উপদেশ দেন।

"একেই বলে কান্তাসম্মিত।" স্বপনদা হাসেন। "তুমি ছাড়া আর কে আমার উপর মাস্টারি করবে? কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাগুলো আমাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে আমি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পাঁচ দশ পৃষ্ঠার বেশী লিখতে পারিনে। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেরাজ ভরে গেছে। একদিন না একদিন সমাপ্ত করব বলে সংরক্ষণ করছি। কিন্তু মনের মতো মুড পাচ্ছিনে। ডসটয়েভস্কির মতো যদি অন্নাভাব থাকত তা হলে পেটের জ্বালায় সমাপ্ত করতুম আর প্রকাশকের হাতে দিয়ে প্রাণরক্ষা করতুম। বাবা যা রেখে গেছেন তা তোমার আমার পক্ষে ঢের। আর একজন কি দু'জন এলে অবশ্য গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হবে। তার জন্যেই তো ব্যারিস্টার হয়েছি। বই লেখার চাড় নেই। ডসটয়েভস্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অফুরন্ত সৃষ্টি করতে পারছিনে। যাঁর অন্নাভাব নেই তার থাকে রবি ঠাকুরের মতো ড্রাইভিং ফোর্স। যে ফোর্স ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে যায় হাওড়া থেকে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। বঙ্কিমের ভিতরেও সে ফোর্স ছিল। কিন্তু ছিল না মাইকেলের ভিতরে। হয়তো থাকত ব্যারিস্টার না হলে।"

ইতিমধ্যে সৌম্যর চিঠি পেয়ে সোনাদি লিখেছেন, "তোমরা বিয়ে করতে চাও শুনে পরম আনন্দিত হয়েছি। বাপু আজকাল কারো বিয়েতে বাধা দেন না। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়েও উদার। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের চেয়েও উৎসাহী। তিনি এত জোরে জোরে হাঁটছেন যে আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিনে। যেমন কায়িক অর্থে তেমনি মানসিক অর্থে। আগে ছিলেন কট্টর বর্ণাশ্রমী। এখন কাস্টলেস সোসাইটির প্রবক্তা। অসবর্ণ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনো বিবাহে তিনি আশীর্বাদ করেন না। তাঁর সব চেয়ে পছন্দ ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহ। হরিজনকে পুরোহিত করাও তাঁর আর একটি নীতি। এতে ব্রাহ্মণদের মনোপলিতে হাত পড়ে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের ঘাঁটি পুণা। সেখান থেকে প্রায়ই হত্যার হুমকি আসে। বাপুকে সাবধান করে দিলেও তিনি গা করেন না। বলেন, মরতে তো একদিন হবেই। স্বধর্মে নিধনই শ্রেয়। আমার ধর্ম সত্য আর অহিংসা।"

এর পর আসল কথা। "তোমাদের বিয়েতে বাপু সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। তবে তুমি যদি দেশের মুক্তির জন্যে আবার লড়তে চাও তবে তোমাকে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে। নয়তো দু'জনে মিলে গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করো।"

আক্কেল গুড়ুম। চিঠিখানা সৌম্য জুলিকে দেখায় না। তার মাকেও না। সটান চলে যায় স্বপনদার কাছে।

"অ্যাঁ!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। ছুটে আসেন বৌদি। চিঠি পড়ে তিনিও আঁতকে ওঠেন। "অ্যাঁ!"

"ওলড ম্যান গান্ধীর ওই এক অবসেসন। ব্রহ্মচর্য! এক বছরেই স্বরাজ হবে এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে অনেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কোথায় এক বছর! কেটে গেছে

পঁচিশ বছর। ব্রহ্মচর্যে অটল রয়েছে এমন সত্যাগ্রহীর সংখ্যা কজন ! তুমি যদি তাদের একজন হতে চাও তা হলে বিয়ের জন্যে বাগ্‌দান করে ভুল করেছ। ইংরেজ কোন্ দুঃখে ভারত ছাড়বে। এখন সে আপদ্‌মুক্ত। আবার লড়তে হবে। তবে অহিংসভাবে কি না সন্দেহ। গান্ধীর দিন গেছে। সুভাষের দিন এখনো যায়নি। তবে সুভাষ যদি না ফেরে কমিউনিস্টরাই সহিংসভাবে লড়বে। তুমি গঠনের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থেকো। তা হলে একটি অনিচ্ছুক বধূর উপরে ব্রহ্মচর্য চাপিয়ে দিতে হবে না। ওর সম্মতি থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ও সম্মতি দেবে। মিলনবাসনার সঙ্গে রয়েছে মাতৃত্বের বাসনা। এসব বাসনা চরিতার্থ না হলে যা হয় তা ফ্রয়েড পড়লে জানতে পারবে। মানসিক অসুখের প্রধান কারণ রিপ্রেসন। এটা মেয়েদের বেলাই বেশী। পুরুষরা তো এদিক ওদিক চরে বেড়াতে পারে। মেয়েদের সে স্বাধীনতা নেই। জুলির মা গোপন করতে চাইলে কী হবে? জুলি এখন অর্ধ পাগল। আস্ত পাগল হবে তুমি যদি বিয়ের পরে ওর উপর ব্রহ্মচর্য চাপাতে যাও। হিটলারের মতো ব্রহ্মচারী আর কে ? কিন্তু তিনিও এফা ব্রাউনের উপর ব্রহ্মচর্য চাপাননি।" স্বপনদা অম্লানমুখে বলে যান।

বৌদি ফিক করে হাসেন। "তুমি কী করে জানলে? তুমি কি ওদের বেড চেম্বারে আড়ি পেতেছিলে?"

"মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হিটলার যে এফাকে বিয়ে করেন এটা কৃতকর্মকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্যেই। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় মৃত্যু আসন্ন ভেবে গ্যেটেও তাই করেছিলেন। অসাধারণদের সঙ্গে সাধারণদের তফাৎটা এইখানে যে সাধারণরা আগে বিয়ে করে, তারপরে সহবাস করে।" স্বপনদা উত্তর দেন।

"আমি কেবল ভাবছি আমার দেশোদ্ধারের প্রতিজ্ঞার কী হবে। ওটা কি তবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়? অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা জেলে যাবে, জরিমানা দেবে, জায়গা জমি হারাবে, কেউ কেউ প্রাণও হারাবে। আর আমি কিনা বিয়ে করে বৌ নিয়ে নিরাপদে ঘরসংসার করব? আশ্রমে বাস করে ঘরসংসার করা বিসদৃশ দেখাবে। আশ্রমের বাইরেই থাকতে হবে। বাইরে থেকে আশ্রম চালানো যেন বাড়ী থেকে আপিস আদালত চালানো। আশ্রম ওভাবে চালানো উচিত নয়। আশ্রমেই বাস করতে হবে জুলিকে আর আমাকে। আলাদা একখানা কুঁড়ে ঘরে। কিন্তু আশ্রমের নিয়মই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন। বিবাহিত কর্মীদের তাই করতে বলা হয়। যারা পারে না তারা বাইরে বাসা নেয়। তারা কেউ আশ্রমের পরিচালক নয়। আমাকে পরিচালকের দায়িত্ব ছাড়তে হবে দেখছি। কিন্তু সে দায়িত্ব নেবে কে? মুক্তিযুদ্ধেও থাকব না, আশ্রম পরিচালনাতেও থাকব না, এতদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম সেটা কি তবে বৃথা যাবে? দেশ লাভবান হবে না?" সৌম্য উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "সত্যাগ্রহ বিগিন্‌স অ্যাট হোম। সত্যটা এক্ষেত্রে কী? সত্যটি এই যে তুমি একটা মেয়েকে বিবাহ করবে বলে বাগ্‌দত্ত হয়েছ। দেশের স্বাধীনতা যদি আজ আসে তবে কাল তাকে তুমি বিয়ে করবে। তার পরে যথারীতি ফুলশয্যা। ব্রহ্মচর্যের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা কবে হবে কেউ জানে না। দু'বছর পরেও হতে পারে, দশবছর পরেও হতে পারে। আরো একবার সংগ্রামের প্রয়োজন যদি হয় তবে সেটা যে গান্ধীজীর নেতৃত্বেই হবে এটা তোমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার কাছে নয়। জবাহরলাল তো ব্যারিস্টারের গাউন এঁটে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তিন সর্দারের মামলায় আসামী পক্ষের কৌসুলী হয়েছেন। অমনি করে আস্ত ফৌজটাকেই তিনি আপনার করবেন। দরকার হলে ওদের নিয়ে লড়াইয়ে নামবেন। তখন কোথায় গান্ধী আর কোথায় তুমি। সত্যাগ্রহই বা কোথায়। তুমি যাও, মহাত্মাকে বুঝিয়ে বলো যে বিয়ের পরে ব্রহ্মচর্য স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। রাস্‌কিন তো তাঁর অন্যতম গুরু। রাস্‌কিনের বেলা কী হয়েছিল তিনি কি তা জানেন না?"

"কী হয়েছিল?" বৌদি কণ্ঠক্ষেপ করেন।

"সে কী ! তুমি জানো না?" স্বপনদা আশ্চর্য হন। "কিন্তু রাতের পর রাত যায়, মাসের পর মাস

যায়, বছরের পর বছর যায়, পাঁচ বছরেও বিয়ের জল পড়ে না। রাস্‌কিনের বিশ্বাস ওতে নরনারীর দেহমনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। বেচারি এফি অতিষ্ঠ হয়ে বিখ্যাত চিত্রকর মিলেসের সঙ্গে ইলোপ করেন। তার পরে রুজু হয় সেই প্রসিদ্ধ মামলা। পাঁচ বছরেও কনসামেশন হয়নি। রাস্‌কিন নপুংসক। বিবাহ বাতিল। মিলেসের সঙ্গে এফির বিবাহ ফলপ্রসূ হয়। সাবধান, সৌম্য! অশরীরী প্রেম সারা জীবন স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু অশরীরী বিবাহ যে কোনো দিন আদালতের বিচারে বাতিল হবার যোগ্য। ক্যারামেল পরের হবে না, কিন্তু সেও একদিন গৃহত্যাগ করতে পারে। সেই যে একটা কথা আছে, অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। তেমনি, অতি আদর্শবাদী না পায় ঘরণী। তোমাকে ঘরণীহীন হয়ে ধরণী ত্যাগ করতে হবে।"

সৌম্য এত কথা জানত না, শুনে তাজ্জব বনে।

স্বপনদা সৌম্যর মুখ দেখে সদয় হয়ে বলেন, "সব মেয়ে এফি নয়। বার্নার্ড শ'র সঙ্গে যখন শার্লটের বিয়ে ঠিক হয় তখন শার্লটই জেদ ধরেন বিয়ের পরে তাঁর বন্ধু যেন তাঁর গায়ে হাত না দেন। অর্থাৎ বিয়ের পরেও তাঁরা বন্ধু ও বন্ধুনী। সখা ও সখী। সম্ভব, সম্ভব, এই সম্পর্কটাও সম্ভব। লোকে কী মনে করবে, তাই একসঙ্গে থাকতে হলে বিবাহ বলে একটা অনুষ্ঠান করতে হয়। একসঙ্গে থাকাটাই আসল, বিয়েটা লোক দেখানো। তা তোমরা ইচ্ছে করলে বিবাহিত বন্ধু ও বন্ধুনী হতে পারো। যদি ক্যারামেল সম্মতি দেয়। বলা যায় না, দিতেও পারে। কিন্তু সেটা হয়তো মন থেকে নয়, শুধু বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার আগ্রহে। ইউরোপে এর নাম কম্পানিয়নেট ম্যারেজ। এদেশেও এর নজীর আছে। কিন্তু ক্যারামেল যে রকম মেয়ে তার সম্মতিটা পরে অসম্মতিতে দাঁড়াতে পারে। ও কি মা না হয়ে সুখী হবে ভেবেছ?"

সৌম্য সামলে নিয়ে বলে, "ওর অসম্মতির আভাস পেলে বাপুকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি চাইব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে সোনাদির চিঠিখানা দেখাতে সাহস হচ্ছে না। ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করতে পারে। তখন হয়তো আশ্রমে বাস করতে নারাজ হবে। গঠনের কাজে সহযোগিতা করবে না। সবচেয়ে ভালো হতো ইংরেজরা যদি আজকেই ভারত ছাড়ত।"

"আহা! সেইখানেই তো গোল। সব চেয়ে যেটা ভালো সেটা কি কোথাও কখনো হয়েছে না হবে? মানুষকে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি ও ক্যারামেল দু'জনে দু'জনাকে ভালোবাসো। এ ভালোবাসা দীর্ঘকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড আর জেল এর ব্যাঘাত ঘটায়নি। এ ভালোবাসার জয় হবেই। দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে একে অযথা ঘোরালো করার মানে হয় না। তোমার কৌমার্য ভঙ্গ হবে, অথচ ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হবে না এটা একটা অবাস্তব অনুশাসন। তুমি এর বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করো। পোপ কি অভ্রান্ত? পোপের অমনতরো দাবীর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে গিয়েই প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এদেশেও তাই হবে। গান্ধীজীর সত্ত্বেও। তুমিই ভারতের মার্টিন লুথার হতে পারো। তিনি ক্যাথলিক সন্ন্যাসী থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রটেস্টাণ্ট হয়ে বিবাহ করেন। তখন থেকেই প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রীরা বিবাহ করে আসছেন।" স্বপনদা সৌম্যকে উসকে দেন।

তা লক্ষ করে বৌদি বলেন, "সৌম্য যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্রব ছেড়ে দিয়ে গঠনের কাজ নিয়ে থাকে তবে গান্ধীজী কৌমার্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যভঙ্গেরও অনুমতি দেবেন। ইচ্ছা করলে সে আর কারো নেতৃত্বে সংগ্রাম করতেও পারে, আর কেউ ব্রহ্মচর্যের উপর এতখানি জোর দেবেন না। তবে আমি যতদূর বুঝি বিবাহিত ব্রহ্মচারী একটা নতুন কনসেপ্ট। ক্যাথলিক বা প্রটেস্টাণ্ট কোনো সম্প্রদায়েই এ কনসেপ্ট নেই। থিওসফিস্টদের মধ্যেই এর চল দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরই সমসাময়িক সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীদের মধ্যেও। পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরেও এর পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। এ সাধনা সর্বসাধারণের জন্যে নয়। বাছা বাছা স্ত্রীপুরুষের জন্যে। সৌম্য আর জুলি যদি তাদের পর্যায়ে পড়ে তো

সভ্যতাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।"

দরদী শ্রোতা পেয়ে সৌম্য বলে, "আমার যে কী সঙ্কট তা কেমন করে বোঝাব, দাদা, বৌদি! আমি ছিলুম দেশের কাছে সত্যবদ্ধ, তার পরে হলুম নারীর কাছে সত্যবদ্ধ। এক সত্যের সঙ্গে আরেক সত্যকে মেলাই কী করে? বিয়াল্লিশ সালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজরা সেই বছরই ভারত ছাড়বে,তার মানে ভারত সরকার গদী ছাড়বে। জন রীডের 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড' পড়েছেন নিশ্চয়। আমার মাথায় তেমনি ঘুরছিল থার্টি ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড। সেই ধারণার বশে আমি জুলিকে বাগ্দান করি। তখন তো খেয়াল ছিল না যে জাপানীরা ভারতের দিকে পা বাড়াবে না, বার্মায় তটস্থ থাকবে। এখন আমি কথা রাখতে গিয়ে সঙ্কটে পড়ে গেছি। আমার উদ্ধারের উপায় কী? বাপুর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ? কেন, তিনি এমন কী নতুন কথা বলেছেন? রামকৃষ্ণদেব আর সারদামণি দেবী এঁরাও তো ছিলেন বিবাহিত ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী। জুলি যদি রাজী হতো আমার তাতে আপত্তি থাকত না। তবে সেটা সারাজীবনের জন্যে নয়। আমারও ইচ্ছা করে ঘরসংসার পাততে, সন্তানের পিতা হতে।আমার আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। ব্রহ্মচর্যব্রতধারী সন্ন্যাসী নয়। কিন্তু যার দেশ পরাধীন তাকে স্বাধীনতার জন্যে লড়তে হবে। লড়াই যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন আরামে ঘরসংসার করা চলবে না। তাই বলে কি একটি মেয়ে তার জন্যে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করবে? যৌবন বয়ে যেতে দেবে? জরাগ্রস্ত হবে? সন্তানের জননী হবে না? স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে না? অ্যাবনর্মাল হবে? আমি বড়ো আশা করেছিলুম যে জুলি সুকুমার দত্তবিশ্বাসকে বিয়ে করে সুখী হবে। তা তো হলো না। জুলির আমাকেই পছন্দ। কোনোদিন ওকে আমি ভোলাবার চেষ্টা করিনি। বরং দাড়িগোঁফ রেখে হোঁদলকুৎকুতের মতো চেহারা করে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আমি যা খাই তা কি ও কোনোদিন খাবে? আকাঁড়া চালের ভাত, অড়হরের ডাল, কাঁচা আনাজ, সিদ্ধ তরকারির ঘোঁট। জুলিকে নিবৃত্ত করতেই চেয়েছি। কিন্তু কমলী নেহি ছোড়তি। বিয়ে ওকে করতেই হবে। বিয়ের পর বিয়ের সুখ দিতেই হবে। দুঃখও যে দিতে হবে না তা নয়। বিরহের দুঃখ। ওর যা মতিগতি ও কখনো গ্রামে বা আশ্রমে থাকবে না। কিছুদিন পরে পালিয়ে আসবে কলকাতা শহরে। ওর মায়ের কাছে। ওকে সুখী করার জন্যে আমিও কর্মস্থল ছেড়ে চলে আসব নাকি? তা হয় না। পুরুষের কাছে তার কর্মক্ষেত্রই যথাস্থান। শেষপর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে দু'জনের দুই কর্মক্ষেত্র। সেটা মেনে নিয়েই বিবাহিত জীবন। তাতেও আমি রাজী। তবে আপাতত আমরা একসঙ্গে থাকার কথাই ভাবছি। জুলি আপাতত আমার আশ্রমেই বা তার আশেপাশেই থাকবে। সোনাদি যেমন আছেন সেবাগ্রামে। তার আগেই বিয়েটা যেন চুকে যায়। কিন্তু আরো আগে আমাকে একবার আশ্রমে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে।"

বৌদি সহানুভূতির সুরে বলেন, "ভেবো না, সৌম্য। সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক করে দেবে প্রকৃতি। সে তোমার বাপুর চেয়েও বলবান। তার কাছে কত ঋষি মুনি হার মেনেছেন। তাঁদের আশ্রমে কী না হতো! প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে আপস করতে হয়। তোমাদেরও করতে হবে। বাপুকে মান্য করতে গিয়ে প্রকৃতিকে অমান্য করলে তার ফল হবে মানসিক বিকার। এর মধ্যে আমি কোনো নৈতিক স্খলন দেখিনে। হিন্দুদের গৃহস্থ আশ্রমে পতিপত্নীর সহবাসই সুনীতি।"

স্বপনদা জুড়ে দেন, "রাজনীতি ছেড়ে দিলে বাপুও তোমাদের গৃহস্থের মতো আচরণ করতে বলবেন। তবে সংগ্রামের বেলা ডাকবেন না। কী আসে যায়?"

সৌম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার অংশ থাকবে না। তপস্যা ব্যর্থ যাবে!"

স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দেন। "ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম এত বেশী ভায়োলেন্ট হবে যে তাতে তোমার অংশ থাকতেই পারে না। যদি না তুমি সুভাষের মতো জঙ্গী নেতা হও। তা যদি হও তবে

তোমার বাপুর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ অনিবার্য।"

"না, না। আমি কখনো আমার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হব না। উদ্দেশ্য যেমন মহৎ হবে উপায়ও তেমনি বিশুদ্ধ হবে। মিলিটারিজমের সাহায্য নিলে পরে তার সঙ্গে লড়তে পারা যাবে না। স্বাধীন ভারত মিলিটারিস্ট হলে সেটা কি আমার সহ্য হবে? আবার আমি জেলে যাব। বাপুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অসম্ভব। সত্য আর অহিংসা তো আমি বিসর্জন দিচ্ছিনে। সেখানে স্থির থাকছি। অস্থিরতা কেবল ব্রহ্মচর্যের বেলা। আরো কিছুদিন লাগবে মনঃস্থির করতে। দেশকে ভালোবাসা আর নারীকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাপুর সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আমার বোঝাপড়া হবে। কিন্তু এখন নয়। এখন তিনি সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার পর বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পলিসি নির্ধারণ নিয়ে ব্যস্ত। বড়ো বড়ো নেতাদেরই সময় দিতে পারছেন না। আমাকে দিলে কতটুকু সময় দেবেন? বাপুর সঙ্গে বোঝাপড়া ধীরে সুস্থে হবে। আপাতত জুলির সঙ্গে বোঝাপড়া তো হোক। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি যদি ওর হাত না ধরি ও সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের টানে তলিয়ে যাবে।" সৌম্য উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

"ঠিক বলেছ। সাবাশ!" বৌদি তারিফ করেন। "এবার আমার একটা পরামর্শ শোন দেখি। তুমি জঙ্গী নেতা হবে না। কিন্তু তার বদলে হবে জংলী নেতা। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে তোমার মুখ চোখ ঢেকে যাবে, সেটা কোন্ বৌ পছন্দ করবে? বিয়ের আগে হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে এসো। তখন তোমাকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাবে।"

সৌম্য হো হো করে হাসে।

স্বপনদা হাসি থামিয়ে বলেন, "দেশমাতার চল্লিশ কোটি সন্তান। তুমিই একমাত্র নও। কিন্তু ক্যারামেলের তুমিই একমাত্র বর। তুমি না থাকলেও সংগ্রাম দিব্যি চলবে, ফলাফলের এমন কিছু ইতরবিশেষ হবে না। কিন্তু তুমি না থাকলে ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তা হলে বুঝতে পারছ তোমার উপস্থিত কর্তব্য ওর পাশে দাঁড়ানো। ওকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। কোথায় থাকবে, কী খাবে, এসব প্রশ্ন গুরুতর নয়। তুমি দেখবে ও তোমার সঙ্গেই আশ্রমে বা গ্রামে থাকবে। আকাঁড়া চালের ভাত আর অড়হরের ডাল খাবে। তবে হজম করতে পারবে কি না সন্দেহ। প্রেমে পড়লে বা প্রেমে পড়ে বিয়ে করলে মেয়েরা সব দুঃখ সইতে পারে। সইতে পারে না কেবল স্বামীর ভালোবাসার শরিক। সেদিক থেকে তুমি ঠিক থাকলেই হলো। অন্য কোনো নারী তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তোমার ওই জঙ্গলটিই ওদের ভয় পাইয়ে দেবে। খবরদার, ওটি সাফ করতে যেয়ো না। রাজপুত্তুর হলেই তুমি গেছ। তোমাকে নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হবে। তবে ক্যারামেল যদি তোমাকে সভ্য ভব্য করতে চায় সেকথা আলাদা। বৌরা নিজেরাই কাঁচি ধরে শিল্পকর্ম করে,জানো তো। তুমিও হয়তো একদিন একটি শিল্পকর্মে পরিণত হবে।" এই বলে স্বপনদা শাসান ও হাসান।

।। চার ।।

শিয়ালদা স্টেশন। চিটাগং মেল। সৌম্যকে তুলে দিতে এসেছে জুলি, সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীর ড্রাইভার। ট্রেন ছাড়তেই জুলি রুমাল নেড়ে বিদায় দেয়। সৌম্য কিছুক্ষণ বাইরে মাথা বাড়িয়ে তাকায়। তারপর সন্ধ্যা বেলা সংবাদপত্রে মুখ ঢাকে।

একটু দূরে বসেছিলেন এক পরিচিত সহযাত্রী, সন্তোষ সাধুখাঁ। কুশল প্রশ্নের পর তিনি কথাবার্তা জুড়ে দেন। "গান্ধী মহারাজের ওটা কি সত্যিকার অসুখ, না ডিপ্লোমাটিক অসুখ? অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংএ হাজির না থাকার অজুহাত? আছেন বোম্বাইতে, যোগ দিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির

বৈঠকে, অথচ এ. আই. সি. সি'র বেলা অসুস্থ!"

সৌম্য জুলির কথা ভাবছিল। ভাবনার ছেদ পড়ায় মনে মনে বিরক্ত হয়। বলে, "আজকাল তিনি কথায় কথায় গুরুদেবের গানের একটি পঙ্‌ক্তি আওড়ান। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' ওঁর ছেলেরা এখন সাবালক হয়েছে। বাপের কথায় ওঠে না, বসে না। মানে মানে সরে থাকাই বুড়ো বাপের পক্ষে শ্রেয়। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা ওরাই নিজেদের বিবেচনায় নেবে। ফলাফলের জন্যে নিজেরাই দায়ী হবে। আপৎকালে কংগ্রেস একটা সৈন্যদল। অন্য সময় একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। একজনের নির্দেশে নয়, অধিকাংশের মতে কাজ করবে। আজকের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতারা সাবালক পুত্রের মতোই ব্যবহার করবেন। তাঁদের মধ্যেও সে রকম একটা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে জবাহরলালের মধ্যে। মনে হচ্ছে তিনিই বাপের বড় ছেলে। যদিও বয়সে বল্লভভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে ছোট। বাপু তো অনেক আগে থেকেই ঘোষণা করে বসে আছেন যে জবাহরলালই তাঁর উত্তরাধিকারী।"

সন্তোষবাবু তা শুনে বলেন, "জবাহরলালের নেতৃত্ব কি কংগ্রেসসুদ্ধ সবাই মেনে নেবে? দেশসুদ্ধ তো দূরের কথা।"

"তা যদি বলেন দেশসুদ্ধ লোক কি গান্ধীজীকেই মানে? তাঁকে ভক্তি করে সবাই, কিন্তু কেউ তাঁর একটি কথাও মানে না। উপায় হিসাবে অহিংসার উপরে কারো বিশ্বাস নেই। গত মহাযুদ্ধে জার্মান পক্ষে দু'কোটি আর রুশ পক্ষে দু'কোটি লোক মারা গেছে। এ ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষেও বহু লোক মরেছে। কিন্তু কোথাও কি হিংসার প্রেস্টিজ কমেছে? আমাদের এ দেশেও না। বাপু এখন রাশ ছেড়ে দিচ্ছেন। কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় অন্য পথ নিতে চায় নিতে পারে। তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে কংগ্রেস নির্বাচনে নামবে। যদি জেতে আবার মন্ত্রিত্ব করার আহ্বান পেলে আবার মন্ত্রিত্ব করবে। অবশ্য জিন্না সাহেব যদি বাগড়া না দেন। তিনি পাঁচ বছর আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছেন যে তুলকালাম কাণ্ড করবেন।" সৌম্য স্মরণ করে।

"বাপ রে, বাপ! জিন্না সাহেব! গান্ধীজী সতেরো বার তাঁর দরবারে হাজির হয়েছেন। তিনি একবারও রিটার্ন দেননি। দ্বিতীয় এক বড়লাট আর কী! বড়লাটকেও কি তিনি তোয়াক্কা করেন। সিমলা বৈঠকটা তো তাঁর জেদের জন্যেই ভেস্তে গেল। ওয়েভেল চেয়েছিলেন লীগের বাইরে থেকে একজন ইউনিয়নিস্ট মুসলমান। তাঁরা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। জিন্না বাদ সাধলেন। লীগপন্থী ভিন্ন আর কেউ মুসলিম প্রতিনিধি হতে পারে না। যাঁর অনমনীয় জেদের কাছে রাজপ্রতিনিধি পর্যন্ত নতজানু। তিনি তুলকালাম কাণ্ড করলে কংগ্রেস নাচার।" সন্তোষবাবু বলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। সৌম্যর মাথায় গান্ধী টুপী দেখে জনতার ভিতর থেকে একজন মৌলবী বলে ওঠেন, "দাদাজী, এমন দিন ছিল যখন জিন্না সাহেবই মহাত্মাজীকে বাঁচাবার জন্যে বোম্বাই থেকে বারডোলী ছুটে যান। তাঁর দৌড়ের জন্যেই তো সেবার গণ সত্যাগ্রহ শুরু হবার আগেই বন্ধ হলো। অসময়ের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাঁর দলের লোকদের বাদ দিয়ে সাত আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করলে তাঁর মান থাকে কোথায়? আরো আগে সাধারণ নির্বাচনের সময় মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলিতে লীগ প্রার্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী মুসলমানদের খাড়া করা হয়েছিল। মুসলমানে মুসলমানে লড়াই বাধিয়ে দেওয়াটা কি ইংরেজ শাসকদের মতো হিন্দু শাসনপ্রত্যাশীদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নয়? গান্ধী মহাত্মাকে চেপে ধরলে তিনি বলবেন তিনি কংগ্রেসের সদস্যও নন। কায়দে আজমের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর ওই একই কৈফিয়ৎ। তিনি কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবার অধিকারী নন। আবার সাধারণ নির্বাচনের দিন আসছে। আবার তেমনি ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হতে যাচ্ছে। দাদাজী, আপনি কি সেটা ভালো মনে করেন? যদি না মনে করেন তো গান্ধী

মহাত্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে আপসে আসন ভাগ করে নেয় তা হলে তার সুর বদলে যাবে। সে আর পাকিস্তানের ধুয়ো ধরে নির্বাচনের কেল্লা ফতে করতে চাইবে না। আমরা মুসলমানরাও বুঝি যে পার্টিশন আমাদের পক্ষেও ভালো নয়। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমানদের কাছে হার মানতেও আমরা নারাজ। ওঁরা দেশের জন্যে জেলে গেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের দিক থেকে চিন্তা করলে কায়দে আজমের মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত নয়। আমিও তো এক কালে কংগ্রেসে ছিলুম। জেলেও যে যাইনি তা নয়। কিন্তু এখন আমার বিচারে কায়দে আজমের হাত শক্ত করাই সব মুসলমানের কর্তব্য।"

সৌম্য হতবাক্‌। জাপানীদের আক্রমণের মুখে যাদের বাঁচাতে সে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়েছিল তারাই এত সহজে ভুলে গেল কংগ্রেসের কী ভূমিকা আর লীগেরই বা ভূমিকাটা কী। মহাত্মার কথা ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে। যাক গে।

"দেখুন, মিঞা ভাই, আপনি নিজেই তো একদিন কংগ্রেসে ছিলেন। আপনার নিজেরও একটা দাবী আছে কংগ্রেস থেকে দাঁড়াবার। দলে ভারী হলে মন্ত্রী হবার। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মতো নির্যাতন সহ্য করেছে কে? খান্ আবদুল গফ্ফার খান নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না, মন্ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনিও গান্ধীজীর মতো নিঃস্পৃহ সত্যাগ্রহী। আমিও তাঁদের অনুগামী। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে না লড়ত, মন্ত্রিত্ব না চাইত তা হলে সত্যাগ্রহ আরো ভালো জমত। দেশের স্বাধীনতা আরো গৌরবময় হতো। কিন্তু পলিসি স্থির করতে হয় পার্টির নাড়ী টিপে। নির্বাচনে নামতে না দিলে কংগ্রেস ভেঙে দু'খানা হতো। মন্ত্রিত্ব করতে না দিলেও তাই। ফলে যা হবার তা হয়েছে। গান্ধীজীর হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি একফোঁটাও বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই। কংগ্রেস মুসলমানদেরও পার্টি। যাঁরা পাকিস্তান চান না তেমন মুসলমানের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। মুসলমানরা একবাক্যে পাকিস্তান চাইলে তাঁদের গায়ের জোরে বাধা দেওয়া কংগ্রেস নীতি নয়। আপসও নয় কংগ্রেসের নীতি। কংগ্রেসের নীতি অহিংস অসহযোগ। মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস যাবে বনবাসে।"

মৌলবী সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, "অহিংস অসহযোগের বংশীধ্বনি শুনে আমিও তো কুলত্যাগ করেছিলুম, দাদাজী। কুলত্যাগ বুঝলেন না? স্কুলত্যাগ। মদের দোকান পিকেট করতে গিয়ে মাস ছয়েক বন্দীও ছিলুম। সেসব দিন কি ভোলা যায়? তার পরে এল উল্টোরথের দিন। প্রায় সবাই সুড়সুড় করে স্কুলে কলেজে ফিরে যায়। আমিও। অহিংস অসহযোগের উপর বিশ্বাস টলে যায়। নেতাদের অনেকেই কাউন্সিলে গিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়বার নতুন কায়দা শেখান। মনে হলো সেইটেই ঠিক পথ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর আমার অগাধ আস্থা। হিন্দু মুসলমানকে একজোট করতে হলে চাই নির্বাচিত সদস্যদের দু'পক্ষের একটা চুক্তি। তার নাম বেঙ্গল প্যাক্ট। মুসলমান সদস্যদের কথা হলো শতকরা পঞ্চান্নটি চাকরি তো মুসলমানদের এমনিতেই পাওনা। তার উপর আরও পঁচিশটা দিতে হবে, যাতে তারা এগিয়ে থাকা হিন্দুদের ধরে ফেলতে পারে। তা হলে দাঁড়ায় শতকরা আশি। অবশ্য সাময়িকভাবে। দেশবন্ধুর দরাজ দিল্। তিনি এককথায় রাজী। কিন্তু মুশকিল বাধায় হিন্দু জনমত। আশি দূরের কথা, পঞ্চান্নতেও হিন্দুদের আপত্তি। তার মানে হিন্দুরা বরাবর এগিয়ে থাকবে, মুসলমানরা কোনো দিন তাদের ধরতে পারবে না। কংগ্রেস লীগের লখনউ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের হিন্দুদের সংখ্যানুপাত কম বলে তারাই পাবে ওয়েটেজ। শতকরা পঞ্চাশের বেশী। তারা কম করে পঞ্চাশে রাজী হতে পারে। তার কমে নয়। বি.সি. চ্যাটার্জির ফরমুলা হলো ফিফটি ফিফটি। মুসলিম প্রতিনিধিরা নারাজ। অমনি করে বেঙ্গল প্যাক্ট ফেঁসে যায়। হিন্দু মুসলিম একজোট হয় না। দেশবন্ধু কাউন্সিলের ভিতরে গিয়েও ভোটের জোরে সরকারকে হারাতে পারেন না। তাঁর পলিসি ব্যর্থ হয়। তিনি মনের দুঃখে মারা যান। তখন থেকেই কংগ্রেসের উপর আমাদের অনাস্থা শুরু। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে

ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদের পর কংগ্রেসের মুখোস খুলে গেছে। তা বলে সব মুসলমান লীগপন্থী বনে গেছে তা নয়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি আর কোনো দল দিচ্ছে না। যে দল দিচ্ছে তারই ভোটে জেতার সম্ভাবনা বেশী। পাকিস্তান যদি হয় ভোটের জোরেই হবে। গায়ের জোরে নয়। সারা ভারতে মুসলমানদের ভোটের জোর হিন্দুদের তুলনায় কম, সারা ভারত পেলে মুসলিম লীগ ভোটের জোরে শাসন করতে পারবে না। তাই ভারতের একটা অংশই চায়। সমস্তটা নয়। আপনারা তো দুই - তৃতীয়াংশই পাবেন, তবে অহিংস অসহযোগ করতে যাবেন কোন্ দুঃখে?"

"বাঙালী হিন্দু, পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখ, উত্তরপশ্চিমের পাঠান, এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান চাপিয়ে দিলে এরা তো বিদ্রোহ করবেই। করবে আসামের হিন্দু ও খ্রীস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও। যদি আসামকে পাকিস্তানের সামিল করা হয়। বিদ্রোহ যাতে গৃহযুদ্ধের আকার না নেয় সেইজন্যেই তো আমাদের অহিংস অসহযোগ। আমাদের মানে গান্ধীজীর অনুগামীদের। কংগ্রেসের হয়ে আমি কথা বলতে পারব না। তিনি নিজেও পারবেন না। সেকালের যাঁরা নো-চেঞ্জার একালে তাঁরাও হয়েছেন প্রো-চেঞ্জার। কাকে নিয়ে কাজ করবেন গান্ধীজী? জিন্না সাহেব কি বুঝতে পারছেন না যে গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তার চেয়ে জবাহরলাল, বল্লভভাই ও আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ? পাকিস্তান আপসে পেতে হলে এঁদের সঙ্গেই আপস করতে হবে। গান্ধীজী আপস করবেন না। দরকার হলে অহিংস অসহযোগ করবেন।"

"আপস কে না চায়, দাদা?" মৌলবী সাহেব একান্ত আন্তরিকভাবে বলেন, "কিন্তু তার একটা পদ্ধতি আছে। চাই আর একটা কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট। যেমনটি হয়েছিল লখনউতে ১৯১৬ সালে। উদ্যোক্তা হয়েছিলেন টিলক মহারাজ আর জিন্না সাহেব। আহা, টিলক মহারাজ যদি থাকতেন তা হলে কি জিন্না সাহেব পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করতেন! তেমনি চাই আবার এক বেঙ্গল প্যাক্ট। দেশবন্ধু যদি অকালে চলে না যেতেন তা হলে কি বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের আজকের এই হাল হতো? কাগজ খুললেই খিস্তি খেউড়! মুসলমানমাত্রেই রাবণ, হিন্দুমাত্রেই রাম। কিংবা হিন্দুমাত্রেই শয়তান, মুসলমানমাত্রেই ফেরেস্তা। কই, আপনাকে তো শয়তানের মতো দেখায় না, আর আপনিই বলুন, আমিও কি রাবণের মতো দেখতে?"

সন্তোষ সাধুখাঁ বলে ওঠেন, "আরে না, না, ভাই সাহেব। আপনাকে বরঞ্চ পীর সাহেবদের মতো দেখতে। আমরা হিন্দুরা পীরদের খুব মানি। আপনিই মিটিয়ে দিন না আজকের এই বৃথা কলহ। হিন্দু কি মুসলমানকে ছেড়ে বাঁচতে পারে, না মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে? পাকিস্তানের প্রস্তাবটা তো পরস্পরকে এলিয়েন করার পরিকল্পনা। মুসলমানের রাজ্যে হিন্দু থাকবে না, থাকলে এলিয়েন হিসাবে থাকবে। আর হিন্দুর রাজ্যে মুসলমান থাকবে না, থাকলে সে হবে এলিয়েন। হিন্দু মুসলমানের অতীতের সম্পর্ক কি ছিল এলিয়েনের সঙ্গে এলিয়েনের সম্পর্ক? সিরাজের জন্যে হিন্দুরা যত কেঁদেছে আর কে তত কেঁদেছে? এই বিভেদ নবাবী আমলে ছিল না। এটা ইংরেজেরই সৃষ্টি। ইংরেজ বিদায় নিলেই এর বিলোপ ঘটবে। আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কে জানেন? তিনি প্রথম সারির গান্ধীবাদী কর্মী সৌম্য চৌধুরী। সম্প্রতি দু'বছর জেল খেটে ফিরছেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়াতে গিয়ে এই দুর্ভোগ।"

"গোস্তাকী মাফ করবেন, দাদা।" মৌলবী সাহেব সশ্রদ্ধ হয়ে বলেন, "ছোট ভাইয়ের নাম গোলাম রহমান। আপনি বাইরে এসেছেন, ভালোই হয়েছে। বাইরে না এলে বুঝতে পারতেন না পদ্মানদীর জল কতদূর গড়িয়েছে। আপনাকে বাইরেই থাকতে হবে, আবার জেলে গেলে চলবে না। জেলে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন। গান্ধী মহারাজও খেই হারিয়ে ফেলেছেন। সমস্যাটা শুধু ইংরেজদের থাকা না থাকা নিয়ে নয়। হিন্দুদেরও থাকা না থাকা নিয়ে। মুসলমানদেরও থাকা না থাকা নিয়ে। সিরাজের আমল থেকে আমরা সবাই এখন বহুৎ দূরে সরে এসেছি। পরস্পরের উপর বিশ্বাস চলে গেছে। ইংরেজদেরকে

যেমন কংগ্রেসওয়ালারা ভারত থেকে সরতে বলছেন তেমনি কংগ্রেসওয়ালাদেরও লীগওয়ালারা বলছেন পাকিস্তান থেকে সরতে। ইংরেজরা ভারত ছাড়লে হিন্দুরাই সমগ্র ভারত পাবে, তাই মুসলমানরা চায় ভারতের একাংশ। মুসলিম ভারত বা পাকিস্তান। এই ভাগাভাগির থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট আর বেঙ্গল প্যাক্ট। জিন্না সাহেবের সঙ্গে দরাদরি করতে হবে মহাত্মা গান্ধীকে। হক্, নাজিম, সুহরাবর্দীর সঙ্গে দরাদরি করতে হবে শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদকে।"

সৌম্য অন্যমনস্কভাবে বলে, "আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি শর্তে। আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তারপরে নেতাদের মধ্যে দরাদরি বা ভাগাভাগি হবে। যাবার বেলা ওরা লীগনেতাদের হাতেই সারা ভারত সঁপে দিয়ে যাক।"

এবার আরো কয়েকজন তর্কে যোগ দেন। তর্ক করতে করতে সবাই যখন অন্যমনস্ক তখন ট্রেন এসে দাঁড়ায় রানাঘাট স্টেশনে। বহু যাত্রী নেমে যায়। বহু যাত্রী ওঠে। হঠাৎ এ কী! এ কে! জুলি!

"কেমন আছো, সৌম্য? কষ্ট হচ্ছে না তো? যা ভিড়!" জুলি বলে।

"তুমি এলে কোত্থেকে?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"মেয়েদের কামরা থেকে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এক মিনিটের মধ্যেই মনঃস্থির করি যে তোমার সঙ্গেই যাব। নইলে তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরব। ড্রাইভারকে বলি মাকে জানাতে। আর চেকারকে বলি প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিতে। এখানে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়ায়? একটা টেলিগ্রাম করতে হবে মুস্তাফী মেসোমশায়কে যে, তোমার সঙ্গে আমিও আসছি।" জুলি এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"কী কাণ্ড! লোকে ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি ইলোপ করছি।" প্ল্যাটফর্মে নেমে টেলিগ্রাফ অফিসের খোঁজে যেতে যেতে বলে সৌম্য। আর কেউ শুনতে পায় কি না কে জানে!

"সেটা ভুল। আমিই তোমার সঙ্গে ইলোপ করছি।" জুলি হাসে।

গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে দেখে হুড়মুড় করে ওরা দু'জনেই সৌম্যর কামরায় উঠে পড়ে।

জুলিকে উঠতে দেখে তিন চারজন পুরুষ জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হন। সে হাত জোড় করে মাফ চায় ও ধন্যবাদ দেয়। আসন করে নেয় সৌম্যর পাশাপাশি। বলে, "পরের স্টেশনেই আমি নেমে যাব।"

পরের স্টেশনে গাড়ী অল্পক্ষণ থামে। সেখানে নামা নিরাপদ নয়। এর পরে পোড়াদা জংশন। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে ওরা উপবাস ভঙ্গ করে। তারপর যে যার কামরায় যায়।

গোয়ালন্দে নেমে ওরা চাঁদপুরের স্টীমারে ওঠে। এবার আর ঠাঁই ঠাঁই নয়। একসঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন। একসঙ্গেই ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা নদীর রূপ অবলোকন। গল্পগুজব। নানা কথা।

"রাইন ট্রিপ মনে পড়ে যায়। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। ছিল সুকুমার।" জুলি বলে সসঙ্কোচে।

"আমারও মনে পড়ে। আমিও নিঃসঙ্গ ছিলুম না। ছিলেন আমার এক বিদেশিনী বান্ধবী।" সৌম্য বলে অসঙ্কোচে।

"তা হলে তুমি ওঁকেই বিয়ে করলে পারতে? জুলির অভিমান।"

"ক্ষেপেছ! তাঁর সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক নয়। বিয়ে করলে করতুম অলকাকে। কিন্তু তা হলে আমাকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে হতো। আমার জীবনের ধারাভঙ্গ হতো। অলকার ভালো বিয়ে হয়েছে। ও সুখেই আছে।" সৌম্য তাকে ভোলেনি।

"অলকাকে নিয়ে রাইন ট্রিপ করলে না কেন তাই ভাবছি। তোমার মতো স্বদেশী মানুষের কেন

বিদেশিনী বান্ধবী?" জুলি কটাক্ষ করে।

"উনিও ভারতভক্ত আর শান্তিবাদী। আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। আমি তো লঘুচেতা নই যে একে আপন ওকে পর ভাবব। স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, আবার লড়ব, কিন্তু শত্রুভাবে নয়, বন্ধু ভাবেই।" সৌম্য বলে।

"সেইখানেই তো তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ ও পথভেদ। তোমার বিশ্বাস ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তন হবে। যেন প্রত্যেকেই এক একটি অ্যানড্রুজ সাহেব বা মীরা বেন। গান্ধীজীর ওই এক ধারণা। অন্তঃপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে কষ্ট যা সইবার তা আমাদেরই সইতে হবে। ওদের নয়। কেন, ওদের নয় কেন? সত্যি, ভগবানের কী অবিচার। রাশিয়া আর জার্মানী ধ্বংস হয়ে গেল, ইংলণ্ডের গায়ে আঁচড়টি লাগল না। যেটুকু লাগল সেটুকু ধর্তব্যই নয় । কী ভাগ্যবান ওরা। জিতে গেল শঠতার জোরে। কমিউনিস্ট রাশিয়া, তার সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটেনের আঁতাত। অবিকল প্রথম মহাযুদ্ধের মতো। যেন বিপ্লবটা মায়া। দেখে শুনে গা জ্বালা করে। বাবর্চীটা জিতে গেল।" জুলির ক্ষোভ।

"ওসব হলো উচ্চ রাজনীতি। কার সাধ্য বোঝে। সবাই তো ধরে নিয়েছিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী থাকবেন। জার্মানীকে লড়তে দেবেন রাশিয়ার সঙ্গে। রাশিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে। ব্রিটেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। কিন্তু চার্চিল হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নতুন শত্রু হিটলারকে টিট করতে পুরনো শত্রু স্টালিনের সঙ্গে হাত মেলালেন। মান অপমান তুচ্ছ করে ছুটে গেলেন মস্কোতে, খোশামোদ করলেন, 'মার্শাল স্টালিন।' 'মার্শাল স্টালিন!' যেন কতকালের ইয়ার। খানাপিনার বহর কত! চার্চিলের পেট টইটম্বুর। একটা আস্ত শুয়োর ছানাকে রোস্ট করে এনে চার্চিলের সামনে রাখা হয়। পেটে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। খেলে গোটা খেতে হতো। কেটে নিলে চলত না। চার্চিল মাফ চান। তখন স্টালিন সেটাকে নিজের পাতে টেনে নিয়ে অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করেন। চার্চিল তো হাঁ। ওদিকে হিটলার হলেন পরম নিরামিষাশী। সসেজটুকুও মুখে তুলবেন না। যেটা শশার মতো সব জার্মান কামড়ে কামড়ে খায়।" সৌম্য নিজে নিরামিষভোজী।

"ভগবানের কী অবিচার! নিরামিষ খায় যে হাতী তারই হয় হার। আমিষ খায় যে সিংহ তারই হয় জিৎ। তুমি ভাবছ গান্ধী জিতবেন। সরকার হারবে। দুরাশা! সেটা তোমাদের দুরাশা।" জুলি সহানুভূতির স্বরে বলে।

"গান্ধী জিতবেন কেন বলছ? সত্যাগ্রহ জিতবে। সত্য আর অহিংসা মিলে যে অস্ত্র তার নাম সত্যাগ্রহ। এ অস্ত্র পরাজয় জানে না ও মানে না। তবে এর জয় যুদ্ধক্ষেত্রে জয় নয়, যা সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর জয় প্রতিপক্ষের হৃদয়কন্দরে। প্রতিপক্ষ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাত মেলাও। আর ঝগড়া নয়। এখন থেকে সদ্ভাব। গান্ধী আরউইন চুক্তি। তেমনি একটা চুক্তি হতে পারত লিনলিথগাউর সঙ্গে। হলো না। হতে পারে ওয়েভেলের সঙ্গে। হচ্ছে না। হতে পারে তাঁর পরে যিনি আসবেন তাঁর সঙ্গে। এখন থেকে আশা ছাড়বেন কেন? বাপু চিরকাল আশাবাদী।" সৌম্যও তাই।

"গান্ধী-বড়লাট চুক্তি ওই একবারই হয়েছিল। আর হয়নি, হবেও না। ওটা ব্রিটিশ পলিসি নয়। ওরা জিন্নাকেও গান্ধীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। জিন্না সেটা জানেন বলেই গোঁ ধরে বসে আছেন তাঁর পাকিস্তান চাই। তাতে গান্ধীর জয় নয়, পরাজয়। আমি তো আশাবাদের লেশমাত্র কারণ দেখছিনে। লড়তে আবার হবেই। আর সেটা অহিংসমতে নয়। কিন্তু আমি আর লড়তে চাইনে। বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে পারলেই ধন্য হব।" জুলি আন্তরিকতার সঙ্গে বলে।

"তোমাকে আমি আর লড়তে বলব না। কিন্তু আমি লড়তে চাইলে তুমি যেন বাধা না দাও।" সৌম্যর আকুল মিনতি।

"বাধা দেওয়া দূরে থাক আমি তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব। যদি না খোকাখুকুরা বাধা

দেয়।" জুলি স্মিত হেসে বলে।

"তার মানে কি দুটি?" সৌম্য কৌতুক করে।

"দুটি না হলে ভাইবোনের জুটি হয় না। সেটাই তো কাম্য। তবে কে বলতে পারে কী হবে না হবে?" জুলি গম্ভীর হয়ে যায়।

"আমি চাইনে যে আমার ছেলেমেয়েরা ব্রিটিশ প্রজা হয়। তোমারও চাওয়া উচিত নয়। সবুর করতে হবে।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"সবুর করতে করতে মা হবার বয়স পার হয়ে যাবে। যারা জন্মাতে চায় তারা জন্মাতে পারবে না। এ কী রকম অহিংসা। আমি তো মনে করি ব্রহ্মচর্যও একপ্রকার হিংসা।" জুলি বেপরোয়া ভাবে বলে।

সৌম্য চমকে ওঠে। "কই, একথা তো কোনোদিন শুনিনি। তোমার মুখেই প্রথম শুনছি। কোথায় পড়েছ? কে লিখেছে?" সৌম্য জানতে চায়।

" কোথাও পড়িনি। কেউ লেখেনি। এটা আমার মৌলিক চিন্তার ফল। আবার বলছি, ব্রহ্মচর্য একপ্রকার হিংসা। যারা জন্মাতে চায়, জন্মাতে পারত, তাদের প্রতি হিংসা।" জুলিও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"যাদের অস্তিত্ব নেই তারা জন্মাতে চাইবে কী করে? ওটা তোমার সন্তানকামনার কল্পরূপ।" সৌম্য হেসে উড়িয়ে দেয়।

"তুমি কি বলতে চাও যে জন্মের আগে তোমার অস্তিত্ব ছিল না? আমার অস্তিত্ব ছিল না? বলতে পারো সাকার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু নিরাকার অস্তিত্ব? যেমন পরমাত্মার।" জুলি চেপে ধরে।

সৌম্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আত্মা থাকলে তার অস্তিত্বও থাকে। সাকার ভাবেই হোক আর নিরাকার ভাবেই হোক।

"আত্মার অস্তিত্ব যদি থাকে তবে নিরাকার আত্মা সাকার হতে চাইবে, তোমার আমার কল্যাণে সাকার হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমি তো স্পষ্ট অনুভব করি যে অজ্ঞাত শিশুরা জন্মানোর অপেক্ষায় আছে। কী করবে, বেচারিরা অসহায়। একটি মা থাকাই যথেষ্ট নয়, একটি বাপও থাকা চাই। বাপ না থাকলে মা-ও অসহায়। পৃথিবীতে কত রকম দুঃখ আছে। এটাও এক রকম দুঃখ।" জুলি করুণ কণ্ঠে বলে।

"তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, জুলি। তোমাকে যারা পাগলী বলে তারাই পাগল। তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারা কঠিন। তোমার মতো বুদ্ধিমতী নারী ওই একজনই ছিলেন। সাবিত্রী। যমকেও তর্কে হারিয়ে দিলেন। তুমি কি পূর্ব জন্মে সাবিত্রী ছিলে?" সৌম্য সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে সুধায়।

"সব মেয়েই সাবিত্রী। কেউ কম, কেউ বেশী। সবাই তো আর শতপুত্র চায় না। কারো কারো একটিই যথেষ্ট।" জুলি উত্তর দেয়।

সৌম্য হেসে বলে, "হিসেব করে দেখছি ক'বার যমজ, ক'বার ত্রয়ী, ক'বার চতুষ্টয় জন্মালে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে শতপুত্র হয়। সাবিত্রীদের শুধু দীর্ঘজীবী নয়,দীর্ঘযৌবনা হতে হবে।"

"পোড়া কপাল। মেয়েরা কি কুকুর বেড়াল যে একসঙ্গে এতগুলির জন্ম দেবে? পয়োধর তো মোটে দুটি।" জুলিও হাসে।

বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা চাঁদপুরে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। নদীর জলে লক্ষ তারা।

বাকীটুকু রেলপথে আবার। ট্রেনে ওঠার আগে দু'জনে মিলে ভোজনাগারে নৈশ আহার সেরে নিতে যায়

"টেলিগ্রাম ওঁরা পেয়েছেন কি না কে জানে! তোমার জন্যে তৈরি থাকবেন, হয়তো আমার

জন্যে নয়। কেন ওঁদের বিব্রত করা? তার চেয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া ভালো। কী বলো, সৌম্য?'' জুলিই অর্ডার দেয়।

''এমনিতে পৌঁছতে দেরি হবে। সময়ে আহার বিধেয়। কিন্তু বেশী নয়। ওঁদের ওখানে না খেলে ওঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন।'' সৌম্য অনুমান করে।

ট্রেনে ওঠার সময় চেকার বলেন, ''আপনার তো সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট। আপনি থার্ড ক্লাসে কেন?''

''পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তেমনি, পড়তে যাচ্ছি গান্ধীবাদীর হাতে, থার্ড ক্লাসে যেতে হবে সাথে। তবে এতে যদি কোনো থার্ড ক্লাস যাত্রীর জায়গায় টান পড়ে তবে আমাকে স্বস্থানে যেতে হবে।'' এই বলে জুলি আসন ছেড়ে দাঁড়ায়।

''না, না, আপনি বসুন। এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি, ম্যাডাম। এঁকে তো আমরা বহুবার দেখেছি। ইনি কোথায় এতদিন ছিলেন! বেশ কয়েক বছর দেখিনি মনে হয়।'' চেকার জিজ্ঞাসু হন।

''দেখবেন কী করে?'' সৌম্য উত্তর দেয়। ''গান্ধীজী থাকবেন জেলে আর আমরা থাকব বাইরে, এটা কি ভালো দেখায়? ইনিও জেলখানায় আটক ছিলেন।'' সৌম্য জুলির দিকে তাকায়।

''আমার কী সৌভাগ্য!'' চেকারের উক্তি প্রতি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়।

''অমন করলে আমি কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসেই পালাব।'' জুলি শাসায়।

''না, না, আপনারা আরাম করে বসুন। আপনারা এঁদের আরো একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিন।'' সহযাত্রীদের বলে চেকার নেমে যান।

গল্প করতে করতে সময় কেটে যায়। লোকের যা স্বভাব, অচেনার সঙ্গেও চির চেনার মতো আলাপ জমায়।

স্টেশনে সৌম্যকে ও জুলিকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন স্বয়ং ক্যাপটেন মুস্তাফী। সঙ্গে ও কে? ও যে মিলি!

''মিলি? সত্যি তুই?'' জুলি ওকে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তোলে। ''কই, বেবী কই? কী যেন ওর নাম?''

''রণ। যুদ্ধের সময় জন্ম। ইংরেজদের মুখেও উচ্চারণ করা সহজ। রণকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। ঠিক সময়ে খায়, ঠিক সময়ে শোয়। আমি এসব বিষয়ে ইংরেজদের মতোই কড়া।'' মিলি জুলিকে জড়িয়ে ধরে।

''তারপর, সৌম্য, কবে শুভকর্ম সম্পন্ন হবে? আর কোন্‌খানে? আমরা সপরিবারে যোগ দেব।'' মুস্তাফী বলেন।

''চাল নেই, চুলো নেই, বিয়ে! যেন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, লড়াই। গান্ধীবাদীরা একটা ধরে, আরেকটা করে না। যতদিন না দেশ মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু জুলির মা অপেক্ষা করতে চান না। আমার বাপুও অনুমতি দিয়েছেন। এখন একটা আস্তানার জন্যেই আটকাচ্ছে।'' সৌম্য জানায়।

''আচ্ছা, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।'' তিনি আশ্বাস দেন।

''না, সুকুমার আসেনি। পরে আসবে। আমি প্লেন ধরে পালিয়ে এসেছি।'' মিলি বলে জুলির জিজ্ঞাসার উত্তরে।

।। পাঁচ ।।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তার হিসাবনিকাশ করতে বসে মানস দেখছে বাংলাদেশ যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়নি তবু এখানে ত্রিশ লক্ষের মতো মানুষ মারা গেছে। এত মানুষ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা আমেরিকায় মারা যায়নি। এমন কী, ভারতীয় সৈনিকদের মৃত্যুসংখ্যাও এত বেশী নয়। আর সবাই মারা গেছে যুদ্ধবিগ্রহে, বাঙালীরা মারা গেছে দুর্ভিক্ষে। ওদের তবু সান্ত্বনা আছে, ওরা ফ্যাসিস্ট অসুরদের পরাস্ত বা নিপাত করেছে। বিশ্বকে করেছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার। ওদের প্রাণদান সার্থক। কিন্তু এদের কী সান্ত্বনা!

এই ত্রিশ লাখ লোক তো দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেমে প্রাণ দিতে পারত। তা হলে অন্তত একটা প্রদেশ তো স্বাধীন হতে পারত। এদের প্রাণদান সার্থক হতো। এদের গৌরব গাথা গান করতেন গায়করা, গ্রথিত করতেন কবিরা। চিত্রকররা আঁকতেন এদের বীরত্বের ছবি। ভাস্কররা গড়তেন এদের বীরোচিত মূর্তি। এদের নিয়ে লেখা হতো নাটক ও যাত্রা। কিন্তু এদের মৃত্যুর জন্যে কোথায় সেই গৌরববোধ? দুঃখ, শোক, করুণা, বিবেকের দংশন ও অসহায়তার জন্যে লজ্জা, এছাড়া যদি আর কিছু থাকে সেটা সরকারের অব্যবস্থার উপরে অভিশাপ। এ সরকার খুনী সরকার। শয়তান সরকার। স্যাটানিক গভর্নমেণ্ট। কথাটা হামিদের।

বছর দুই আগে কলকাতার রাস্তায় হামিদের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে ট্রাম থেকে নামেন। বলেন, "কোথায় যাচ্ছেন? চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। অনেকদিন পরে দেখা। কিছু বলতে চাই।"

হ্যাঁ, তিনবছর বাদে দেখা। হামিদ ও তার সঙ্গীর পরণে খাকসারদের মতো খাকি পোশাক। হাতে বেলচা নেই। এই যা তফাৎ।

"এইমাত্র ইস্তফাপত্র পেশ করে আসছি।" হামিদ মানসকে চমকে দেন। "চীফ সেক্রেটারি নিতে চান না। আমি বলি নিতেই হবে। এ সরকারের হুকুম আমি তামিল করতে পারিনে।"

মানস জানতে উদ্‌গ্রীব। "ব্যাপার কী, হামিদ!"

"আমার মহকুমায় কেউ না খেয়ে মারা যায়নি। আমি যেমন করে পারি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি ও রাখতুম। সরকারের এতে এক পয়সা খরচ হয়নি ও হতো না। কিন্তু আমার ব্যবস্থাটা ওঁদের পছন্দ নয়। যাতে ব্যাপারীদের মুনাফা সেটাই ওঁদের পছন্দ। মানুষের প্রাণ ওঁদের কাছে তুচ্ছ। আমার উপরে রাগ আমি ব্যাপারীদের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছি। লোকে আমার উপর খুশি, সরকার অখুশি।" হামিদ এক নিঃশ্বাসে বলে যান।

"তা বলে আপনি ইস্তফাপত্র দিতে গেলেন কেন? ছুটি চাইতে পারতেন। কিংবা অন্য কোনো পদে বদলী।" মানস তাঁর মঙ্গলের জন্যেই বলে।

"না, জজ। তা হয় না। দুর্ভিক্ষের জন্যে সরকারী কর্মচারী মাত্রেই দায়ী। আপনিও। প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে। আপনারও উচিত ইস্তফাপত্র দেওয়া। ছুটি নিয়ে বিবেককে এড়ানো যায় না।" হামিদ চলতে চলতে বলেন।

ট্রামে করে ওঁরা তিনজনে মিলে মানসের বন্ধু স্বপনদার ওখানে যায়। দুই খাকসার চা খেয়ে এক আনা করে চায়ের পিরিচে রেখে দেন। ওঁরা বিনামূল্যে কিছু নেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও না।

মানস দুঃখ করে বলে, "আমার বন্ধু ব্যথা পাবেন।"

কিন্তু ওঁরা অবুঝ। ওঁদের নিয়ম ওদের মানতে হবে।

হামিদকে জেরা করে মানস জানতে পেরেছিল যে তাঁর বিরোধটা যাঁর সঙ্গে তিনি খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সুহরাবর্দী। কিন্তু দোষটা পুরোপুরি মন্ত্রীরও নয়। বর্ধনের কাছে মানস শুনেছিল যে মার্চ মাসের শেষের দিক কলকাতার বাজারে ধানচাল মজুত ছিল মাত্র দশদিনের উপযোগী। অগত্যা নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হয়, মফঃস্বল থেকে অবাধে ধান চাল কলকাতায় আসে। মফস্বলের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় ধানচালের চলাচলে বাধা না দিতে। বাধা দিতে গেলে শাস্তি। মফস্বলে টান পড়লে সরকার থেকে ধান চাল 'ডাম্প' করা হবে। ধান চালের বান বইয়ে দেওয়া হবে। ব্যাপারীদের ভয় দেখানো হয়, মজুত করেছ কি আঙুল পুড়িয়েছ। কে কার কথা শোনে। ওরা যে-কোনো দামে কেনে। যে-কোনো দামে বেচে। দাম আরো বাড়বে বলে ধরে রাখে, লুকিয়ে রাখে। গোপন মজুতদার কে নয়? যে নিজের বাড়ীর জন্যে ছ'মাসের খোরাক কিনে রাখে সেও দোষী। ওদিকে আরেকজন ছ'দিনের খোরাক কিনতে পাচ্ছে না। যাদের ক্রয়শক্তি কম, যারা একসঙ্গে বেশীদিনের খাদ্য কিনতে পারে না তাদের সংখ্যাই তো বেশী। সরকার তাদের জন্যে রেশন ব্যবস্থা করেননি। সেটাই হলো গোড়ায় গলদ।

বাংলাদেশের অবস্থা দেখে সাবধান হন যুক্তপ্রদেশের সরকার। গভর্নর হ্যালেট তখন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা জেলে। তিনি একটা ইকনমিক বোর্ড গঠন করেন। তার সেক্রেটারি করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর রুদ্রকে, রুদ্র তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে বোর্ডের কাজ নিয়েই থাকেন। আর হ্যালেট স্বয়ং বোর্ডের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বোর্ড গম চালের গতিবিধির খুঁটিনাটি খবর রাখে। বাছা বাছা আই. সি. এস. অফিসারদের জেলার শাসনকার্য থেকে সরিয়ে এনে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা বুলডগের মতো পাহারা দেন। ব্যাপারীরা চোরাবাজারি বা মজুত করতে গেলে খ্যাঁক করে কামড় দেন। গম চাল সবাই সব সময় কিনতে পারে, মজুত করার দরকার হয় না। মানস যে সময় ছুটিতে ছিল সে সময় যুক্তপ্রদেশেও অন্নাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সরকার সতর্ক থাকায় ব্যাপারীদের পৌষমাস আর সাধারণ ক্রেতাদের সর্বনাশ হয়নি।

ছুটি থেকে ফিরে হামিদের মুখে তার অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনে ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেখে মানসও বিবেকের জ্বালায় দগ্ধ হয়। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেই কি এর প্রতিকার হবে? একটি মানুষও কি প্রাণে বাঁচবে? হামিদকে একথা বোঝায়, নিবৃত্ত হতে বলে। ইস্তফাপত্র ফেরৎ নিতে পরামর্শ দেয়। হামিদ বলেন, "না, জজ। এরা নরঘাতক, এরা মহাপাপী। আমি কেন পাপের ভাগী হব?"

উচ্চতর পদগুলিতে তখন মুসলিম অফিসারদের প্রভূত চাহিদা। দু'দিন বাদে পদোন্নতি। হামিদকে ছাড়তে চায় কে? কিন্তু তিনি কেবল নিয়মনিষ্ঠ নন, নীতিনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি শয়তানী সরকারের সঙ্গে আপস করেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান আলীগড়ে। সেখানে তালা তৈরি করেন। বেকার সমস্যার সমাধান করতে তাঁর যেটুকু সাধ্য। হিংসা অহিংসা ব্যতীত আর সব বিষয়ে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাঁর মিল। মানসকে তিনি একজন গান্ধীবাদী মনে করেন বলেই তার সঙ্গে এমন সাযুজ্য। কিন্তু অহিংসায় তাঁর অবিশ্বাস।

শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, শত সহস্রমারী ভবেৎ ধন্বন্তরি। রেশন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতি হয়। তার জন্যে দরকার হয় প্রোকিয়োরমেন্ট ব্যবস্থার। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও এ দুটি রহিত হয়নি, হবেও না কলকাতার ক্ষুধা আর কলকাতার লোকের ক্রয়শক্তি অব্যাহত থাকতে। মানস চিন্তা করে কলকাতার বিকেন্দ্রীকরণের। আবার যদি মন্বন্তর হয় গ্রামের লোক এসে কলকাতা লুট করবে। বিপ্লব ডেকে আনবে কলকাতার অপরিমিত ভোগ।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যুর অভিশাপ মানসকে দু'বছর কাল বিষাদগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে যে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে হলে চাই

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে হাতে এসেছিল টাটা বিড়লার পরিকল্পনা। তার কিছুদিন পরে গান্ধীজীর পরিকল্পনা। সেও তার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে মেতে ওঠে। যেন কত বড়ো অর্থনীতিবিদ্‌! স্বরাজই যথেষ্ট নয়। চাই নিউ অর্ডার। নতুন শৃঙ্খলা। নতুন করে বাঁচা।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের শোচনীয় মৃত্যু বৃথা হবে না, যদি তাদের দেশের লোক নতুন করে বাঁচতে পারে। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে নীতিধর্ম। নিছক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে মানস আরো গভীরে যায়, তার থেকে আরো গভীরে। তার প্রতীতি দৃঢ় হয় যে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের খাতে যে ব্যয়টা হবে সেটা বন্ধ না হলে বা খুব কম না হলে সাধারণ মানুষের অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় চিকিৎসায় বাসস্থানে টান পড়বেই। রাষ্ট্রকে বন্দুক আর মাখন এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবেই। বন্দুক বেছে নিলে মাখনের অভাব হবেই। মাখন দূরের কথা, রুটিও পর্যাপ্তভাবে মিলবে না। মানুষ আধপেটা খেয়ে তিলে তিলে মরবে।

কিন্তু বন্দুক বেছে না নিলে দেশরক্ষার বেলা সৈনিকরা কি খালি হাতে লড়বে? সৈনিকরা হেরে গেলে নাগরিকরা কি অসহযোগ ও গণসত্যাগ্রহের জোরে আত্মরক্ষা করতে পারবে? স্বাধীন ভারতকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। উত্তরগুলি যদি গতানুগতিক হয় তবে দরিদ্রতম দেশবাসীর ভাগ্যে আবার ক্রয়শক্তির অভাব ও তার থেকে অন্নাভাব আছে।

মানস গান্ধীবাদীদের সঙ্গে একমত হয় যে ভারতের গ্রামগুলিকে অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করতে হবে। যাতে তাদের ওসব কিনতে না হয়। আলো হাওয়া জল তো কেউ কেনে না। তেমনি, মোটা চাল আর মোটা কাপড়ও কেউ কিনবে না। নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেরাই উৎপাদন করবে ও নিজের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত হলেই বিক্রী করবে। ফাঁপা টাকার লোভে বিক্রী করলে পরে পশতাতে হবে। মন্বন্তর থেকে যদি লোকে এইটুকু শিখে না থাকে তবে লোকশিক্ষার জন্যে আবার মন্বন্তর অবতীর্ণ হবে। যুদ্ধও তো সেইরকম এক লোকশিক্ষা। গত দুই মহাযুদ্ধ থেকে দুনিয়ার লোক যদি নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকতা শিখে না থাকে তবে তাদের শিক্ষার জন্যে যুদ্ধও আবার অবতীর্ণ হবে। ভারতের লোক দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ দেখেনি। না দেখলে শিখবে কী করে?

তিনবছর আগেকার যুদ্ধবিরোধিতা ছিল ত্বক্‌গভীর। কংগ্রেসনেতারা যদি বড়লাটের পরিষদে যেতেন ও যুদ্ধ চালাবার ভার নিতেন যুদ্ধবিরোধিতা রূপান্তরিত হতো যুদ্ধোন্মাদনায়। সেটা জাপানের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওদিক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন তা হলে যুদ্ধোন্মাদনার মোড় ঘুরে গিয়ে হতো ব্রিটিশবিরোধী। কোথায় অহিংসা আর কোথায় তার প্রেস্টিজ? জনমানসে তার শিকড় কোথায়?

জনগণকে যদি অসামরিক প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত না রাখা হয়, যুদ্ধের দিন তাদের ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র না জোটে তা হলে তারা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করবে, না স্বদেশী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করবে? আগস্ট অভ্যুত্থান ইংরেজদের হটাতে ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতের জন্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার না হয়ে কংগ্রেস সরকার যদি যুদ্ধে নামে আর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে অভুক্ত রেখে পরলোকে পাঠায় তা হলে কেরেনস্কি সরকারের মতো সে সরকারেরও পতন হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে যদি বোঝায় অক্ষমতারও হস্তান্তর তা হলে দেশের লোক যেমন ইংরেজকে ক্ষমা করছে না তেমনি কংগ্রেসকেও ক্ষমা করবে না।

তবে দোষটা পুরোপুরি ইংরেজদের নয়। কলকাতার নাগরিকদেরও। তাদের ক্রয়শক্তি দিয়ে তারা গ্রামবাসীদের মুখের গ্রাস কিনে নিয়েছে। বোকার মতো ওরা কাঁচের বদলে কাঞ্চন বেচে দিয়েছে। টাকা নিয়ে মানুষ করবে কী, সে টাকা দিয়ে যদি ন্যায্য দামে খাবার কিনতে না পাওয়া যায়। যদি খাবার

কিনতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়? শহর ও গ্রামের মধ্যে এটা স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়, এটা শোষক শোষিত সম্পর্ক। এর জন্যে ইংরেজকে দায়ী করা আত্মপ্রবঞ্চনা। যদি স্বাধীনতার পরেও শোষক শোষিতের সম্পর্ক থাকে তা হলে শোষিতরা একদিন দলবদ্ধ হয়ে শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব বাধাবেই। সেটা অহিংসার থেকে হিংসার মোড় নিতে পারে।

ইংরেজরা তো একদিন না একদিন যাবেই, তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কলকাতার যদি বিকেন্দ্রীকরণ না হয় তবে বিপত্তি অনিবার্য। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ত যদি মাথায় ওঠে তবে মরণ অবশ্যম্ভাবী। তেমনি, সারা বাংলাদেশের বিত্তব যদি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় তবে গ্রামগুলো মরবে, গ্রামবাসী জনগণ মরার আগে মারবে। সমস্যাটা যুদ্ধকালেই সঙ্গীন হয়, শান্তিকালে নয়। তাই শান্তিকালে সবাই নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায়। সময়ে সাবধান হলে এই মন্বন্তর নিশ্চয়ই এড়ানো যেত। যে পরিকল্পনা এটা এড়াতে শেখায় সেই পরিকল্পনাই শ্রেয়।

মন্বন্তরের সময় দেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতিগতি দেখে মানসের মোহভঙ্গ হয়েছিল। বিদেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতোই তাঁরা মুনাফা উপাসক। সৎ অসৎ যে কোনো উপায়ে তাঁরা মুনাফা লুটবেনই। অমনি করে ক্যাপিটাল বাড়াবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তরিত হয় তবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হবে দেশীয় ধনপতিদের হাতে হস্তান্তরিত। গান্ধীজী বলছেন বটে ধনপতিদের স্বেচ্ছায় ট্রাস্টী হবার কথা, কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় না হন তবে তাঁর উপর জোর করে ট্রাস্টীশিপ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একপ্রকার না একপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। নইলে সোশিয়াল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না। কংগ্রেসকে বুর্জোয়া অপবাদ বহন করতেই হবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের জায়গা নেবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। মানস এর পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। পক্ষে নয় এইজন্যেই যে এতে ধনসম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত হবে না, গরিবের পেট ভরবে না। বিপক্ষে নয় এইজন্যেই যে সদ্য স্বাধীন দেশের জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্র প্রবর্তন, তা না করে একলম্ফে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হতে গেলে ডিকটেটরদের কবলে পড়তে হবে। তারা সিভিলও হতে পারে, মিলিটারিও হতে পারে।

স্বাধীনতার পর যা হবার হবে, আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। দুই শতকের বিদেশী শাসন তো অপসৃত হোক। বিদেশী সৈন্যদেরও যেতে হবে, নইলে বিদেশী শাসন প্রকারান্তরে থেকেই যায়। গান্ধীজীর প্রথম শর্তই হলো বিদেশী সৈন্যদের বিদায় নিতেই হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত বিদেশীদের সৃষ্ট দেশীয় সৈন্যদলকেও ভেঙে দিতে হবে। এ কাজটা কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে পড়ে না। যাদের হস্তান্তর করা হবে তাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এটা যেমন সিভিল সার্ভিসের বেলা তেমনি আর্মি নেভী এয়ার ফোর্সেরও বেলা। ব্রিটেন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করে তা হলে যারা সিংহাসন অধিকার করবে তারা বিদেশীদের সৃষ্ট সিভিল সার্ভিস তথা আর্মি নেভী এয়ার ফোর্স বিলোপ করতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে বোঝায় এক মালিকের হাত থেকে অপর এক মালিকের হাতে তুলে দেওয়া। আর ক্ষমতার হস্তান্তর না করে সিংহাসন ত্যাগ করা বলতে বোঝায় ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত সামরিক ও অসামরিক যাবতীয় কর্মচারীর চাকরি খতম। তাদের মধ্যে যারা বিদেশী তারা বিদেশে গিয়ে ক্ষতিপূরণ ও পেনসন দাবী করবে। যারা ভারতীয় হলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তারাও ব্রিটেনে গিয়ে ক্ষতিপূরণ ও পেনসন দাবী করতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তর হলে তাঁদের চাকরি খতম হবে না। পূর্ব শর্ত সংরক্ষিত হলে চাকরির জের চলবে।

কলকাতা থেকে সিভিলিয়ান বন্ধু প্রমোদকুমার পুরকায়স্থ তাঁর বিভাগীয় কাজে মানসের স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা গেল যে ইংরেজ অফিসাররা দলবলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথাই ভাবছেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের দিতে হবে ক্ষতিপূরণ ও আনুপাতিক পেনসন। পেনসনের হার গণনা করা কঠিন নয়, সেটা একটা আইনে গণনা করে রাখা হয়েছে। সেটা এতদিন ইংরেজদের বেলাই

খটত, আবার ভারতীয়দের বেলাও খাটবে। মানস চাইলে যখন খুশি আনুপাতিক পেনসন নিয়ে সরে পড়তে পারবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার যদি ক্ষমতার হস্তান্তর না করে ভারত ত্যাগ করে তবে মানসকেও বিলেতে গিয়ে আনুপাতিক পেনসন আদায় করতে হবে। আর যদি ক্ষমতার হস্তান্তর করে যায় তবে স্বদেশে থেকেই নতুন সরকারের কাছ থেকে আনুপাতিক পেনসন পাবে।

মানস বলে, "খাসা খবর। কিন্তু ক্ষতিপূরণের কী হবে?"

পুরকায়স্থ বলেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ অফিসাররা যখন ঈজিপ্ট থেকে বিদায় হন তখন যে হারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন সেই হারে ক্ষতিপূরণ চাইবেন কি না তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন। ইনফ্লেশনের দরুন বর্ধিত হারে চাইতে পারেন। কিন্তু লাগে টাকা দেবে কোন্ সেন? ব্রিটিশ সরকার না ভারত সরকার? চুক্তি অনুসারে দিতে বাধ্য ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সেই বাধ্যতাটাকেও ব্রিটিশ সরকার হস্তান্তরিত করতে পারেন, যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ হস্তান্তরের প্রত্যাশায় ইংরেজরা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে আর ঝগড়াঝাটি করতে চান না। তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরে গেলে আজকাল নতুন চাকরি পাওয়া যায়। যুদ্ধের পর অনেক পদ খালি আছে। দেরি করলে সেসব পদ ভর্তি হয়ে যাবে। তাড়াটা ইংরেজ অফিসারদেরই। ওঁরা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে ভারতে ওঁদের রাজত্ব গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভেদনীতির সাহায্যেও না। মুসলমানরাও অধীর। হিন্দুদের তো কথাই নেই।"

পুরকায়স্থ এর পরে যা বলেন তা শুনে মানস তো হাঁ। বাংলাদেশ নাকি দু'ভাগ হবে। কলকাতা, চব্বিশপরগণা আর বর্ধমান বিভাগ মিশে যাবে বিহারের সঙ্গে । বাদবাকী সামিল হবে পাকিস্তানের।

"দূর! বাজে কথা! এটাও কি ইংরেজদের মুখে শোনা?" মানস সুধায়।

"না, এটা ওদের মুখে নয়। একজন কংগ্রেস নেতার মুখে। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে একটা আপসের সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন। ইংরেজ কখনো কংগ্রেসের হাতে সারা ভারত সমর্পণ করবে না। মুসলিম লীগকেও তো কিছু দেবে। কিন্তু সারা বাংলা, সারা পাঞ্জাব, সারা আসাম দিলে কংগ্রেস বাকীটা নেবে না। আবার গণ আন্দোলন করবে। আবার জেলে যাবে। ইংরেজ অফিসারদের ভারতে আটকে রাখবে। ওঁরা যদি থাকতে না চান তো আপস করবেন। এক হাতে কংগ্রেসের সঙ্গে, আরেক হাতে লীগের সঙ্গে। তার মানেই হলো পার্টিশন। সব দিক রক্ষা করতে গেলে বাংলাদেশে পার্টিশন চাই। যেমন হয়েছিল আমাদের ছেলেবেলায়। চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই বিন্দুতে এসেছে। যাকে বলে পূর্ণ বৃত্ত। তবে সেবার পূর্ববঙ্গ ভারতেই ছিল। এবার যাবে পাকিস্তানে। ফলে বাকী দেশটার নাম হবে হিন্দুস্থান।" পুরকায়স্থ যতদূর জানেন।

"না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না।" মানস চেঁচিয়ে ওঠে।

তা শুনে যূথিকা ছুটে আসে। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

মানসের উত্তর শুনে সে হেসে কুটি কুটি। "কালনেমির লঙ্কাভাগ। কারা এঁরা? কে এঁদের পোঁছে? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। বাংলাদেশ কখনো ভাগ হতে পারে? অসম্ভব! অবাস্তব। গাঁজা।"

মানস উত্তেজিত হয়ে বলে, "শুধু তাই নয়, বিহারের সঙ্গে মার্জার।"

পুরকায়স্থ ওদের ঠাণ্ডা করে বলেন, "বিহারে যতরকম খনিজ আছে আর কোথাও তত নেই। সেসব খুঁড়ে বার করলে আরো চার পাঁচটা জামশেদপুর গড়ে উঠবে। মার্জার হলে বাঙালীরই লাভ। পূর্ববঙ্গে আছে কী? চা, পাট, মাছ। ওর থেকে আর কতটুকু লাভ হবে?"

মানস মেনে নিতে পারে না। "পূর্ববঙ্গে আছে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা, মহানন্দা, গোরাই, মধুমতী, ইছামতী। পূর্ববঙ্গে আছে বাংলাদেশের প্রাণ। বাংলাদেশের হার্টল্যাণ্ড। 'কলকাতা', 'কলকাতা' করে তোমরা পাগল। কলকাতার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমরা পূর্ববঙ্গ বিকিয়ে দেবে। কলকাতায় আছে

কী? আফিস, আদালত, সওদাগরী কোম্পানীর হাউস। সবই তো ইংরেজের কীর্তি। তোমাদের গর্ব করবার মতো কী আছে? ওটা একটা ব্যাড বার্গেন। ওতে রাজী হওয়া মানে মুসলিম লীগের কাছে যুদ্ধে হার মানা। ওরা যেন যুদ্ধে জিতে কংগ্রেসওয়ালাদের উপর পার্টিশন চাপিয়ে দিচ্ছে। কংগ্রেস কি হেরে গেছে? লীগ কি জিতে গেছে? হোক না গৃহযুদ্ধ। দেখা যাক না কে হারে কে জেতে। জিতলে সমস্তটাই কংগ্রেস পাবে। সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। হারলে সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। আর নয়তো দেশ ও প্রদেশ ভাগ হয়ে যাবে তলোয়ারের ধারে।"

যূথিকা উৎসাহ দিয়ে বলে, "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। এটা কিন্তু কৌরব পক্ষের কথা নয়, পাণ্ডব পক্ষের কথা। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ল না তারা কোন্ সুবাদে দেশের এক ভাগ চায়?"

পুরকায়স্থ হাসেন। "শুনেছিলুম আপনারা দু'জনে অহিংসাবাদী, গান্ধীশিষ্য। কিন্তু আপনাদের জঙ্গী চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঢাল তরোয়াল পেলে আপনারাও লড়াইয়ে নেমে পড়বেন, ইংরেজকে তাড়াতে নয়, মুসলমানকে হারাতে।"

"ওমা, মুসলমানকে হারাতে কে বলেছে?" যূথিকা অনুযোগ করে। "আমরা মুসলমানদের পর ভাবিনে, ওরাও আমাদের আপন। কথা হচ্ছিল পাকিস্তানপন্থীদের নিয়ে। যারা পাকিস্তানপন্থী নয় তাদের নিয়ে নয়।"

"আজকের পরিস্থিতিতে দুই অভিন্ন হয়ে উঠছে, মিসেস মল্লিক। অশিক্ষিতদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু শিক্ষিতরা প্রায় সকলেই পাকিস্তানপন্থী। যাঁরা নন তাঁরা ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি আফিসেই এক একটি পাকিস্তান ব্লক। এ এক অদ্ভুত মেন্টালিটি। এঁদের সঙ্গে যুক্তি বৃথা, তর্ক বৃথা। এঁদের ইনস্টিংক্ট এঁদের বলছে যে ইংরেজ আর বেশীদিন থাকবে না, তখন কংগ্রেসই রাজা হবে। দিল্লীতে কংগ্রেস রাজা হলে বাংলার গভর্নরও হবেন কংগ্রেসের আজ্ঞাবহ। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরাও তাঁর বশংবদ হবেন। সুযোগ সুবিধা হিন্দুরাই বেশী পাবে। কারণ কংগ্রেস কার্যত হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। দু'চারজন মুসলমান আছেন বলে কি কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান? তার কাছে অপক্ষপাত প্রত্যাশা করা যায় না। তা ছাড়া মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই যে দরকার। ওরা বহুকাল থেকে পশ্চাৎপদ। কী করে এগোবে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের পেছনেই থাকে? চাকরির প্রতিযোগিতায় হিন্দুরাই জিতবে। প্রমোশন হিন্দুরাই পাবে। যে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু সে প্রদেশেও চাকরিবাকরিতে তারা হবে সংখ্যালঘু। ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুর পদোন্নতি হবে, মুসলমানের তাতে কী? পাকিস্তান বানিয়ে দাও, দেখবে মুসলমানেরও পদোন্নতি হবে। এই যাদের মেন্টালিটি তাদের সঙ্গে মারামারি করে কী হবে? ভাগাভাগি করাই শ্রেয়। একভাবে না একভাবে করতেই হবে ভাগাভাগি। দেশ ভাগ না করলে ক্ষমতা ভাগ। ক্ষমতা ভাগ না করলে দেশ ভাগ। দেশ ভাগ করলে প্রদেশ ভাগ। আমি তো রাজী হব না পাকিস্তানে চাকরি করতে। মল্লিকের কথা আলাদা। উনি তো চাকরিই করবেন না।"

"না, আমি চাকরিই করব না। আমার জীবনে অন্য কাজ আছে। কিন্তু আমাকে অবাক করছে এই ভাগাভাগির জল্পনা কল্পনা। কেন, মিলে মিশে কাজ করতে পারা যাবে না কেন? কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল কেন সম্ভব হবে না? দিল্লীতে সম্ভব হলে কলকাতায়ও হবে। কলকাতায় হলে দিল্লীতেও হবে। গভর্নর হবেন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। কোনো একটি দলের আজ্ঞাবহ নন। তিনি একজন পার্শী বা খ্রীস্টানও হতে পারেন। আমাদের আদর্শ হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শীর সমন্বয়। মহামানবের সাগরতীরে। ভারত মহাসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না ভারতবর্ষকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। বঙ্গোপসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না বাংলাদেশকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। মুসলিম লীগের পার্টিশন প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারিনে। কিন্তু মুসলিম অফিসার ক্লাস যদি একবাক্যে পাকিস্তান দাবী

করেন তা হলে তো আমি বন্দুক নিয়ে তাঁদের সঙ্গে লড়তে পারব না। হিন্দু অফিসার ক্লাস যদি রণবিমুখ হন তা হলে তো অফিসে অফিসে গৃহযুদ্ধের কথাই ওঠে না। তার আগে আমি চাকরিই ছাড়ব।" এই বলে মানস দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

যূথিকা রাগ করে বলে, "তুমি ডিফিটিস্ট। মুসলিম অফিসার ক্লাস সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় নয়। দেশভাগ চাকুরেদের স্বার্থ হতে পারে, চাষীদের স্বার্থ নয়,মজুরদের স্বার্থ নয়। সকলের বৃহত্তর স্বার্থেই দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে।"

"দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে, এই পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি একমত, দিদি। কিন্তু তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে, এতদূর যেতে আমি নারাজ। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখুন যুদ্ধের কী পরিণাম। কোথায় জার্মানীর ঐক্য। প্রোলিটারিয়ানরা গ্রাস করেছে আধখানা জার্মানী। ওদের হাত থেকে কেড়ে নিতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তবে হয়তো ওরাই কেড়ে নেবে বাকী আধখানা। মুসলমানদের অধিকাংশই প্রোলিটারিয়ান। ওরা যদি একধার থেকে কমিউনিস্ট বনে যায় ভারতের একভাগ তো জয় করে নেবেই, বাংলাদেশের বেশীর ভাগই ওদের দখলে যাবে। যুদ্ধ না করে সন্ধি করে মুসলিম লীগকে দিলে ক্ষতি কী? আমি তো মনে করি মুসলিম লীগই লেসার ইভিল।" পুরকায়স্থ বলেন।

"একমত হতে পারছিনে।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "মুসলিম লীগ হচ্ছে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। আর কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্র না মানলেও সামাজিক ন্যায় মানে, সুতরাং একদিক থেকে প্রগতিশীল। সুতরাং লেসার ইভিল।"

"আপনি কি জানেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে? কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের পক্ষে। ওদের লক্ষ্য জমিদারি উচ্ছেদ,ফসলের তেভাগা ইত্যাদি। পাকিস্তানে সেসব সুগম হবে।" পুরকায়স্থ শুনেছেন।

"মুসলিম লীগ কারো বন্ধু নয়। কমিউনিস্টদেরও একদিন সায়েস্তা করবে। একবার ইসলাম বিপন্ন বলে শোর তুললেই মুসলিম চাষীরাই হিন্দু কমিউনিস্টদের কাস্তে নিয়ে কোপাবে আর মুসলিম মজুররাই হাতুড়ি দিয়ে পেটাবে। মুসলিম কমিউনিস্টরাও পার পাবে না, নাস্তিক বলে ফাঁসীকাঠে ঝুলবে। মুসলিম শাসনে নাস্তিকের ক্ষমা নেই। পৌত্তলিকের থাকলেও থাকতে পারে।" মানস বলে।

যূথিকা রাগ করে বলে, "ইভিল তো ইভিল,তার আবার লেসার কী? গ্রেটার কী? তার সঙ্গে সন্ধি কিসের? মানুষ তোমরা নও তো, মেষ! তোমাদের কেউ সম্মান করবে না।"

এই বলে রান্নাঘরে যায়। অতিথির জন্যে রাঁধতে। দুই বন্ধুতে অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে। সরকারী বদলী ও প্রমোশন।

"ইংরেজরা কেউ যুদ্ধের সময় হোমে যায়নি। অনেকেই সাত আট বছর হলো হোম থেকে নির্বাসিত। জানেন তো ওরা হোম বলতে অজ্ঞান। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোম আমার কেমন লাগল। হা হা! ইংলণ্ড কি আমার হোম? এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ওরা সবাই এখন ঘরমুখো। কিন্তু ছুটি দিচ্ছে কে? একসঙ্গে পাঁচশো কি ছ'শো অফিসারকে ছুটি দিলে শাসন চলবে ঠিকই, কিন্তু সেটা ব্রিটিশ শাসন হবে না। তা বলে সবাইকে জোর করে আটকে রাখাও যায় না। ছুটি নিয়ে বহু ইংরেজ যাচ্ছে। তাদের জায়গায় বহু পদ খালি হচ্ছে। এই তো বর্ধন প্রমোশন পেয়ে দিল্লী চলল। 'দিল্লী চলো' স্লোগানটা এখন আমাদের মুখে মুখে। আমি ভাবছি দিল্লীকা লাড্ডু পাইলেই খাইব। আপনি?" পুরকায়স্থ সুধান।

"না, ভাই। আমার দাঁত ভেঙে যাবে। পেটে সইবে না। আমি বাংলায় লিখি। যেখানে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক সেখানেই আমার স্থান। যেখানে বাংলাদেশের মাটি,জল,মানুষ সেখানেই আমার স্থিতি। 'দিল্লী চলো' নয়, 'পল্লী চলো' এই আমার স্লোগান। যাক, বর্ধনের জন্যে আমি আনন্দিত।"

মানস যূথিকাকে খবরটা দেয়।

।। ছয় ।।

অনেক দিন বাদে সৌম্যদার চিঠি। সে আশ্রমে ফিরে গিয়ে জীর্ণসংস্কার করছে, সেই সঙ্গে তৈরি করছে একটি কুটির। সেখানে জুলির সঙ্গে সংসার পাতবে। বাপু অনুমতি দিয়েছেন। তবে একটা শর্ত আছে, সেটা মুখে বলবে। ভাবনায় পড়েছে। আপাতত বিবাহ স্থির। স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। জুলির মা আর ওকে সামলাতে পারছেন না। তাঁরও তো বয়স হয়েছে।

"আপাতত আমরা মুস্তাফীদের অতিথি। জুলি মিলিকে ও তার বাচ্চাকে সঙ্গ দেয়। আমি বেশীর ভাগ সময় আশ্রমে ও ভাণ্ডারে কাটাই, মাঝে মাঝে পরিদর্শনে যাই। বিয়েটা কোনো একটা আশ্রমে হবে। সেবাগ্রামে তো যেতে পারছিনে, তার বদলে সোদপুরে যাবার কথা ভাবছি। এতে জুলির মায়ের ভার হালকা হবে। তা ছাড়া যে মেয়ের বিয়ে তারা ঘটা করে একবার দিয়েছেন সেই মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্তব্য নয়। যাকে একবার সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। জুলি এখন স্বাধীনা নারী। আমরা সিভিল ম্যারেজের আগে কোয়েকারদের প্রথা অনুসরণ করব। ওদের সোসাইটিতে একটা ঘর থাকে। সেই ঘরে গিয়ে ওরা বিবাহের বইতে নাম সই করে। আমরাও তাই করব। তবে আশ্রমের কর্মীদের মিষ্টিমুখ করাব। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু জুলির ইচ্ছায় রবীন্দ্রসঙ্গীত আর আমার ইচ্ছায় লালনগীতি হবে। তার উপর যদি আরেকটি গান যোগ করতে হয় তো বাপুর প্রিয় গান 'লীড কাইণ্ডলি লাইট'। ও গান আমাকেও বিচলিত করে। আমি মনে মনে জপ করি 'ওয়ান স্টেপ ইনাফ ফর মী'।

জুলির মা বলেছেন তিনি তাঁর বাড়ীতে একটা পার্টি দেবেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। আমি বলেছি বর সাজতে পারব না। আমি যা পরি তাই পরব। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা জওহর কোট। মাথায় গান্ধী টুপী। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি বা কোলহাপুরী চপ্পল। কী বলো? খুব খারাপ দেখাবে? হংসো মধ্যে বকো যথা। ইঙ্গবঙ্গ ব্যারিস্টার ডাক্তার অধ্যাপকের সভায় ইতর জন। যাক, জীবনে একবার তো? জুলিকে খুশি করার জন্যে আমি রাজী হয়েছি।

এখন এক আজব সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা জানতুম না যে মিলি সুকুমারকে ফেলে তার ছেলেকে নিয়ে আগে ভাগে আসবে। মা বাবাকে দেখবার জন্যে আর তাঁদের নাতি তাঁদের দেখাবার জন্যে সে প্লেনে জায়গা পাওয়া মাত্রই চলে আসে। সুকুমার ছুটির অপেক্ষায় আর সেইসঙ্গে জাহাজের অপেক্ষায় লণ্ডনে থেকে যায়। মন্দ কী? অমন তো কত হয়। কিন্তু মিলি তো জুলিকে এখানে প্রত্যাশা করেনি। জুলির উপস্থিতি প্রথম দিকে ও আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই ওর ব্যবহারে একটা শীতলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটা জুলির বেলা। আমার বেলা নয়। আমার বেলা উষ্ণতা। আমি তোমার মতো মনস্তত্ত্ববিদ্ নই। নারীচিত্ত আমার কাছে রহস্যময়। আমার মনে হয় মিলির বিশ্বাস জুলি এখনো সুকুমারকে ভালোবাসে। আর জুলির বিশ্বাস মিলি এখনো আমাকে। এদের সম্পর্কটা অহেতুক ঈর্ষার। একদিন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, তার আগে সরে পড়াই শ্রেয়। আতিথ্যেরও একটা অলিখিত মেয়াদ আছে। কিন্তু আমাদের কুটির এখনো বাসযোগ্য হয়নি, হলেও আমরা বিয়ের আগে সেখানে থাকতে পারিনে। বিয়ে তো সেই অগ্রহায়ণে। জুলির মা ইঙ্গবঙ্গ হলেও পাঁজি মানেন।

এখানে আমার বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের দরজা খোলা। কিন্তু এক বাড়ীতে দু'জনের জন্যে দুটো ঘর কোথায়? তা হলে আমাদের ঠাঁই ঠাঁই হতে হয়। তাতে জুলির বিষম আপত্তি। জুলিকে আমি কলকাতা ফিরে যেতে বলি। কিন্তু আমাকে সে একলা ফেলে যাবে না। এখন থেকেই সম্পত্তির মতো

দখল নিচ্ছে। বিয়ে না হতেই এই। বিয়ের পরে আমাকে বোধহয় সিন্দুকে পুরবে ও সিন্দুক পাহারা দেবে। কিন্তু একদিন বাগ্‌দান করার পর আর পেছিয়ে যাওয়া চলে না। এগিয়েই যেতে হবে, যা থাক কপালে। বাপু আমাকে দিয়েছেন গঠনের কাজ। তিন বছর অবহেলা করেছি রাজনীতির ঝড়ঝাপটার খর্পরে পড়ে। জনগণের সেবা করা হয়নি। তাদের দুর্দশাও বেড়ে গেছে। জনসেবাও এক ঈর্ষাপরায়ণ নারী। রাজনীতি তার সপত্নী। তারপর জুলির মা দিয়েছেন জুলির ভার । তাকে রাজনীতির মত্ততা থেকে সামলাতে হবে। রাজনীতিও ক্রমশ হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। একদল হাতিয়ার শানাচ্ছে ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। আরেক দল হাতিয়ার শানাচ্ছে হিন্দুকে ভিটেছাড়া করতে। একদলের লক্ষ্য স্বাধীনতা। আরেক দলের লক্ষ্য পাকিস্তান। এ রাজনীতি জুলির জন্যে নয়। আমার জন্যে তো নয়ই।

বিয়ের পর জুলিকে নিয়ে যেতে চাই তার শ্বশুরবাড়ী। সেখানে ওরা যদি ওকে বধূরূপে বরণ করে তা হলে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে বৌভাত হবে। সবাইকে বসিয়ে দেওয়া হবে পঙ্‌ক্তিভোজনে। হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ হরিজন ভেদ মানা হবে না। যারা মানে তারা বাদ পড়বে। তাদের কিছু চালকলা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে। জুলি রান্নার কাজে পটু নয়। তবু গোটা দু'তিন পদ রাঁধবে। যদি দেখি সরষের ভিতরেই ভূত, পরিবারের ভিতরেই আপত্তি, তা হলে বৌভাতের আয়োজন করব না, গ্রামের পাঠশালার জন্যে কিছু চাঁদা ধরে দিয়ে চলে আসব। পরে যদি কখনো আগ্রহ দেখি তখন যাব। তখন হবে বিলম্বিত বৌভাত। সমাজ সংস্কার তড়িৎগতিতে হবার নয়। মহাত্মা গান্ধীও একেত্রে অসহায়। তবু তিনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য। ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহ। অপরের বিবাহে হরিজনের পৌরোহিত্য । মহারাষ্ট্রের মতো রক্ষণশীলদের দুর্গে।

জুলির ও আমার আশা যূথিকা ও তুমি আমাদের শুভকর্মে যোগ দেবে। কিন্তু এই সামান্য কারণে ছুটি নিতে যেয়ো না। তারিখটা কবে পড়বে ঠিক হয়নি। সে সময় ছুটি থাকলে এসো। গ্রামের বাড়ীতে যদি যাই তা হলে ফেরবার সময় তোমাদের ওখানে ঘুরে আসতে পারি। তোমাদের অসুবিধে না হলে দু'একদিন থেকে যেতেও পারি। দীপক আর মণিকাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।"

যূথিকা চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে পড়ে ।হাসতে হাসতে বলে, " যেমন মিলি তেমনি জুলি। বিপ্লববাদীই হোক, আর রাজবন্দীই হোক, মেয়েলি ঈর্ষা যাবে কোথায়! এ তো ভারী মজার কথা। সৌম্যদাকে নিয়ে ত্রিভুজ! জুলিকে ও বাড়ী থেকে সরাতেই হবে। আর কোথাও যদি জায়গা না থাকে আমাদের এখানে আছে। গভর্নমেণ্ট কি আমাদের সন্দেহ করবে? তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো? বিয়ে তো এখানেও হতে পারে। এখানেও গান্ধীবাদীদের আশ্রম আছে।"

"কিন্তু সৌম্যদা যদি তার স্বস্থান ত্যাগ করে গঠনের কাজে আরো একবার অবহেলা হবে। গঠনের কাজ হচ্ছে সংগঠনেরও কাজ। অহিংসভাবে সংগঠনের। আবার যদি সংগ্রামে নামতে হয় তবে অহিংসাত্মক সংগঠনের প্রয়োজন হবে। মন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে কংগ্রেস গঠনের কাজে মন দেয়নি, মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পরেও আপসের ভাবনাই ভেবেছে, আর নয়তো সংগ্রামের ভাবনা। যখন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল, গণ সত্যাগ্রহের ডাক এল, তখন দেখা গেল সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু নেই। যে যেমনভাবে পারে লড়েছে। সংহতভাবে একটা সৈন্যদল যেমনভাবে লড়ে তেমন ভাবে নয়। এটাকে মরাল ইকুইভালেন্ট অভ্‌ ওয়ার বলা শক্ত। বাপু বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে এটার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। সৌম্যদাও বোঝে রেল লাইন ভেঙে, টেলিগ্রাফের তার কেটে যা হয় তা একপ্রকার বিদ্রোহ, তা অন্যপ্রকার যুদ্ধ নয়। লোকের মন এখন যুদ্ধের নৈতিক বিকল্পের দিকে নয়, আসল যুদ্ধের দিকে ঝুঁকছে। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের মতো প্রেস্টিজ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিদ্রোহী জনতারও নেই। ওই যে শাহ্‌নওয়াজ, সায়গল আর ধিলন ওদের সম্মান এখন সর্বভারতীয় বাদ দিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও বেশী। একদল জাতীয়তাবাদী যদি ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার জন্যে হাতিয়ারে শান দেয় তবে আশ্চর্য

হবার কী আছে? কিন্তু অবাক হচ্ছি শুনে যে আরেকদল হাতিয়ারে শান দিচ্ছে হিন্দুদের ভিটেছাড়া করে পাকিস্তান হাসিল করতে।" মানস উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

"বেশ তো, পলাশী আর পানিপথ দুটোই পর পর হয়ে যাক। দেখা যাক কে জেতে কে হারে।" যূথিকা পরিহাস করে।

"এসব হলো দারুণ সীরিয়াস ব্যাপার। ঠাট্টা তামাশার বিষয় নয়। কত মানুষ মরবে, কত মানুষ ঘরছাড়া হবে, কত মানুষ সম্বল সম্পত্তি হারাবে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এ তো শুধু রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ।" মানস প্রমাদ গণে।

"তোমার মতো স্বপ্নদ্রষ্টাদের কপালে স্বপ্নভঙ্গ আছে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই সারা হলে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে। সেটা হবে পানিপথের কাছাকাছি কোনোখানে। যেখানে আফগানরা মারাঠাদের হারিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেস যদি হেরে যায় দিল্লী আগ্রা হারাবে। পাঞ্জাব সিন্ধু তো হারাবেই। বাংলাদেশেও একটা বলপরীক্ষা হবে। কোথায় কবে বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি যে ইংরেজদের যারা সশস্ত্র সংগ্রামে হারাবে তারা সশস্ত্র মুসলমানদের কাছে হার মানবে না। যুদ্ধ হলে তাতে দুই পক্ষেরই বহু মানুষ মরে, ঘরছাড়া হয়, বহু মানুষ সম্বল সম্পত্তি হারায়। ইহাই নিয়ম। দেশের লোক যদি অহিংসার চেয়ে হিংসা পছন্দ করে তো তার লজিকসম্মত পরিণামের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। দু'শো বছর পরাধীনতার পরেও মুসলমান প্রধানদের মানসিক পরিবর্তন হয়নি। আবার সেই মুসলিম রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান। একটা দিনও সবুর করবেন না। ইংরেজরা যাবার আগেই তাঁদের মসনদে বসিয়ে দেবেন। আর হিন্দুরাও যে মারাঠা রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান না তা নয়। এবার অন্য নামে। এইটুকু যা পরিবর্তন হয়েছে।"

মানস খেই হাতে নিয়ে বলে, "বিস্ফোরণ তো আমাদের জীবনে একবার ঘটেছিল। বাসা না পেয়ে আমরা তখন বোস দম্পতির অতিথি। কী একটা তুচ্ছ কারণে খাবার টেবিলে মিসেস বোসের সঙ্গে তোমার বচসা বেধে যায়। মিসেস বোসের সঙ্গে মিটমাট হলো না। পরের দিন ওদের বাড়ী থেকে বিদায়. বিদায়কালেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তুচ্ছ কারণের পেছনে ছিল একটা গুপ্ত কারণ। মিসেস বোসের সন্দেহ বোস তোমাকে পুজো করেন। বোসের অতীতটি তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ও রকম ঘটনা জুলি মিলির বেলাও ঘটতে পারে। সৌম্যদার যাবার জায়গা আছে, সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। জুলির সঙ্গে একবাড়ীতে থাকতেই হবে এমন কী কথা আছে? ওটা বিলেতের বোর্ডিং হাউস নয়। জুলি কলকাতায় ওর মায়ের কাছে ফিরে যাক, বিয়ের নোটিস দিক, শাড়ী শাঁখা আংটি কিনুক। সৌম্যদা নিজের আশ্রমে গিয়ে কুটির নির্মাণ শেষ করুক। বিয়ের তারিখ জানতে পেলে আমরা ভেবে দেখব যোগ দিতে যাব কি না। কিন্তু বর্ধন যদি দিল্লী চলে গিয়ে থাকে ওর ওখানে ওঠা হবে না। উঠতে হবে স্বপনদার ওখানে, যদি বৌদি রাজী হন। তোমার সঙ্গে ওঁর এখনো দেখা হয়নি। তা ছাড়া আমরা গেলে দীপক আর মণিকেও তো নিয়ে যেতে হবে। অতিথিসেবার ভার বেড়ে যাবে। বিলেতফেরৎ অধ্যাপিকার উপর এত বেশী ভার চাপানো কি ঠিক হবে? উদিতার কথা আলাদা। ওর বিয়েতে আমার একটু হাত ছিল। সেটা ও ভোলেনি।"

যূথিকা সেই পুরাতন বিস্ফোরণের কথা ভাবছিল। তার খেয়াল হয়নি যে ওর মূলে ছিল মেয়েলি ঈর্ষা। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, "আমারই বোঝা উচিত ছিল যে মিসেস বোসের পক্ষে ওটা স্বাভাবিক। বোসের পুরনো ডায়েরি উনি পড়েছিলেন। তাতে বহু বান্ধবীর উল্লেখ। না, বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। কেন ওরা ও বাড়ীতে এতদিন আছে? একসঙ্গে থাকার আনন্দ তো সারাজীবন ধরে পাবে। সৌম্যদাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখ যে বিয়ের আয়োজন করার জন্যে জুলির উচিত কলকাতায় এসে মায়ের কাছে থাকা। কিংবা আমাদের কাছে। এখানেও আশ্রম আছে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন।

তা হলে আমাদের আর কোথাও গিয়ে আর কারো অতিথি হতে হবে না। তুমি হবে বরের বেস্ট ম্যান আমি হব কনের ব্রাইডস্‌মেড। কী মজা! ওরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে মধুমাস কাটাবে। যাকে ইংরেজীতে বলে হানিমুন। মুন মানে এখানে চাঁদ নয়। মাস। মধুচন্দ্র হচ্ছে ভুল অনুবাদ।"

"বাঃ! কলকাতায় মায়ের ওখানে ওয়েডিং পার্টি। সেটা হবে না?" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"যা বলেছ! আমাদের বেলা সেটা হয়নি। পনেরো বছর কেটে গেছে। কী কঠিন প্রাণ!" যূথিকার চোখে জল আসে।

"ও প্রসঙ্গ থাক!" মানস ওটা ধামাচাপা দেয়। ওর শ্বশুর শাশুড়ী এখনো ভুলতে পারেননি যে তাঁরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রানী ভবানীর কী যেন হন। ওদিকে প্রচণ্ড সাহেব। খানাপিনা সাজপোশাক চালচলন বিলকুল সাহেবী।

যূথিকা তার বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে। একান্ত আদরের ধন। ছেলেবেলা থেকে মনে মনে স্থির করে রেখেছে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রার মতো সেও স্বয়ংবরা হবে, নিজের পতি নিজে নির্বাচন করবে। বাপ মা এতে রাজী হবেন কেন? তাঁরা মেয়ের বিয়ের জন্যে যথারীতি উদ্যোগী হন। মেয়ের ষোল বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় পাত্র অন্বেষণ। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন বাড়ীতে বসে না থেকে সে কলেজে পড়ুক। দিল্লীতে তাকে মিরান্দা হাউসে দেওয়া হয়। সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে সেও হয়ে ওঠে একজন ফেমিনিস্ট। আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো বিবাহে পতিনির্বাচনের অধিকারও নারীর সহজাত অধিকার। এর জন্যেও দরকার হলে লড়তে হবে। লড়াইটা নিজের গুরুজনের সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়বে তারা কি জীবনসঙ্গী মনোনয়নের স্বাধীনতার জন্যে লড়বে না? জীবনটা কার? তাদের না তাদের মা বাপের? মেয়ে ভুল করবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু বাপ মাও কি ভুল করেন না? তাঁদের ভুলের জন্যে কত মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে।

ধনপতি রায়চৌধুরী কড়া মেজাজের লোক। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার মেজাজও চড়া। তাঁরা মেয়ের মতামতকে এক কড়াও দাম দেন না। তাঁদের চোখে মেয়ের সেই গৌরীদান কি রোহিণীদানের বয়স। আট কি নয় বছর। যেন কলেজের মেয়ে নয়, পাঠশালার মেয়ে। চাকরবাকরদের মতো সেও যোহুকুম। তাঁরা তাঁদের ফরমাস মতো পাত্রের অন্বেষণে ঘটক লাগান। তার পেছনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। ফরমাস মতো পাত্র হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কুলীন। বনেদী জমিদারবংশীয়, যদিও জমিদারি বলতে এখন গুঁড়ামাত্র আছে। বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান, নিদেনপক্ষে ইঞ্জিনীয়ার। সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, ইংরেজী বলবে সাহেবী টানে। পর্দার আড়ালে থাকলে বাঙালী বলে চিনতে পারা যাবে না। লাস্ট, বাট নট লীস্ট, কার্তিকের মতো রূপবান। এক এক করে অনেকগুলি পাত্রকে খারিজ করে শেষপর্যন্ত যাঁকে পছন্দ হয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের উঠতি ব্যারিস্টার, কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী আছে, নাটোর মহকুমায় পৈত্রিক ভদ্রাসন। কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। তাঁরও আছে পানদোষ, জুয়ার আসক্তি, মাঝে মাঝে তিনি অন্যত্র রাত কাটান। তাঁর বৌ তা সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ী ফিরে গেছেন। আর আসবেন না। ওঁরাও বড়লোক।

যূথিকা ঘৃণার সঙ্গে এ সম্বন্ধ খারিজ করে। এমন স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটানো যেন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে বেঁচে থাকা। মা রাগ করেন, বাবা বকেন। অভিমানী মেয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে। তখন ওঁরা বলেন, "আচ্ছা, তুই নিজেই কাকে বিয়ে করবি স্থির কর। কিন্তু মনে রাখতে হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন, বনেদী জমিদারবংশীয়, জমিদারি লাটে উঠলেও চলে, বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান বা আর কিছু, সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, উচ্চারণ সাহেবদের মতো, পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনে বাঙালী বলে চিনতে পারা যাবে না, সব শেষে কার্তিকের মতো রূপবান।" যূথিকা জবাব দেয়, "রাজকন্যারা রাজপুত্র খুঁজে বেড়ায় না। রাজপুত্ররাই রাজকন্যার খোঁজে সাত সমুদ্র তেরো

নদী পার হয়। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব।" বি. এ. পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে তাজমহল দেখতে গিয়ে মানসের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দ্বিপাক্ষিক। পালিয়ে গিয়ে বান্ধবীর বাড়ীতে গোপনে বিবাহ।

ধনপতিবাবুরা তখন সিমলায়। যূথিকা তার বরকে নিয়ে তাঁদের প্রণাম করতে যায়। শৈলবালা দেবী পা সরিয়ে নিয়ে বলেন, "আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শুদ্দুরটা আমার পা ছুঁয়ে দিল।" ধনপতিবাবু সাহেবী কেতায় হ্যাণ্ডশেক করে বলেন, "মিস্টার মালিক, ইউ মে রাইজ টু বি আ কমিশনার সাম ডে। অর আ হাইকোর্ট জজ পরহ্যাপস। আই উইশ ইউ লাক। বাট ইউ আর নো ম্যাচ ফর মাই হাই-বর্ণ ডটার।" মানস তো থ। তাকে প্রকারান্তরে বলা হলো লো-বর্ণ। ক্রোধে তার সর্বশরীর জ্বলে যায়। সে থর থর করে কাঁপে। তার পরে তোৎলাতে তোৎলাতে দেয় মুখের মতো জবাব। "আমি ইংরেজীতে কথা বলি ইংরেজের সঙ্গেই। বাঙালীর সঙ্গে নয়। আপনি যা বলেছেন তা ফিরিয়ে নিন।" তিনি ক্ষেপে গিয়ে বলেন, "আই কল আ স্পেড আ স্পেড। অ্যান আপস্টার্ট অ্যান আপস্টার্ট।"

যূথিকার মুখ তখন রক্ত রাঙা। শিবকে এই কথা বলেছিলেন দক্ষ। সে কি সতীর মতো দেহত্যাগ করবে? মানসের দিকে বিহ্বলভাবে তাকায়। মানস আপনাকে সামলে নিয়ে বলে, "আমরা তিনশো বছর ধরে বাদশাহী তালুক ভোগ করে এসেছি। মোগল সরকারকে এক পয়সা খাজনা দিইনি। ব্রিটিশ সরকারকেও না। বংশমর্যাদায় আমরা কারো চেয়ে খাটো নই। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি জাতে উঠতে চাই বা আপনার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে অর্ধেক রাজত্ব পেতে চাই তা হলে সেটা আপনার ভুল। আমাদের বংশে কেউ কখনো পণ যৌতুক নেয়নি। আমিও নেব না।"

ধনপতিবাবু বলেন, "বাট ইউ ক্যান নট বি আ ব্রাহ্মিন। ইয়োর সন উইল বি আ চণ্ডাল।" তারপর যূথিকার দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে বলেন, "চুজ বিটুইন ইয়োর ফাদার অ্যাণ্ড ইয়োর সো-কলড হাজব্যাণ্ড।"

যূথিকাও তেমনি তেজী মেয়ে। বলে, "চুজ বিটুইন ইয়োর ডটার অ্যাণ্ড ইয়োর সো-কলড হাইকাস্ট।"

ওরা যেমন হাত ধরাধরি করে এসেছিল তেমনি হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। মা চেঁচিয়ে বলেন, "চলে যাবার আগে গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যা।"

যূথিকা এক এক করে সব খুলে দেয়, আংটি ছাড়া। সেটা মানসের দেওয়া। একটা দৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ীর চাকরবাকর 'হাঁ' 'হাঁ' করে ছুটে আসে। কোনো পক্ষ নত হয় না। ধনপতিবাবুকে বিমর্ষ দেখায়. এতটা তিনি চাননি। কিন্তু তাঁরও তো মান আছে। তিনিও নত হন না। কিন্তু মানসকে ডেকে নিয়ে শাসান, "আমি কোর্টে গিয়ে মামলা করব যে আপনি আমার নাবালিকা কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছেন। সে বিয়ে বাতিল হবার যোগ্য। আমি তার গার্জেন। বাতিলের প্রার্থনা করছি।"

মানস আশ্চর্য হয়ে বলে, "সে কী! যূথিকা তো বিয়ের সময় ডিক্লেয়ার করেছে তার বয়স বিশ বছর।"

"সেটা চাপে পড়ে। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে মেয়েদের বয়স লেখা থাকে না। আমার মেয়ে আমারই মতো জিনিয়াস। ও তেরো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে। এখন ওর বয়স সতেরো। আমি হোরোস্কোপ দেখাতে পারি।" ধনপতিবাবু বলেন।

"তা হলে আদালতেই আপনার সঙ্গে মোকাবিলা হবে।" মানস পাল্টা দেয়।

এবার যূথিকা ভেঙে পড়ে। "বাবা, তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও ত্যাগ করো। তোমার সম্পত্তি আমি চাইনে। কিন্তু আমার বিয়েটা বাতিল করতে যেয়ো না। একবার বিয়ে হয়েছিল শুনলে

আর কেউ আমাকে বিয়ে করবে না। তোমার সেই ব্যারিস্টার সুপাত্র মিস্টার সান্যালও না। মানসের কী! সে পুরুষ মানুষ। সে হয়তো আরো ভালো বৌ পাবে। আমি কি ওকে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি? কড়ি দিয়ে কিনিনি, কিন্তু দড়ি দিয়ে বেঁধেছি। আদালতে দাঁড়িয়ে বলব যে আমিই অগ্রণী হয়ে বিয়ের নোটিস দিয়েছি। আর আমার দেওয়া বয়সের অঙ্ক যদি মিথ্যা হয়ে থাকে আমারই তো সাজা হবে। এ বিবাহ তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আর দু'দিন বাদে যে গ্রাজুয়েট হবে তার নিজের ইচ্ছার কি কোনো মূল্য নেই?"

'আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।'

তারপর থেকে দেখা সাক্ষাৎ চিঠিপত্র বন্ধ। যেমন দেবা তেমনি দেবী। নাতি হয়েছে খবরের কাগজে দেখেও তাঁর মন নরম হয়নি। ও যদি ছুঁয়ে দেয় তা হলে তো তাঁকে দিনে দশবার স্নান করতে হবে। নাতনি হয়েছে সেটাও খবরের কাগজে দেখে থাকবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন।

ওঁরা সিমলা থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় বাড়ী কিনেছেন। ছেলেরা বিলেতে পড়াশুনা করে লায়েক হয়েছে। একজন তো মেম বিয়ে করেছে। তাতে জাত যায়নি। সে যে ছেলে। দুঃখের বিষয় ওরাও বোনের খোঁজ নেয় না। যূথিকাও গায়ে পড়ে স্বামীর জন্যে অপমান ডেকে আনতে চায় না। শিবের জন্যে সতীর মতো সে দেহত্যাগ করেনি, পার্বতীর মতো পুত্রকন্যা নিয়ে ঘর সংসার করছে। পুরনো প্রসঙ্গ উঠলে মানসকে মনে করিয়ে দেয়, "তোমাকে আমি ছাড়িনি। ছাড়ব না। বাপ মাকেও কি ছেড়েছি? না, তাঁরাই আমাকে ছেড়েছেন।"

এসব দেখে শুনে মানসের বিশ্বাস হয় না যে বিপ্লব কখনো এমন দেশে হবে যেখানে মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতেও বর্ণান্ধ। বিপ্লব যদি হয় তবে সেটা শ্রেণীযুদ্ধ নয়, বর্ণযুদ্ধ। হাই-বর্ণ বনাম লো-বর্ণ। হাই-বর্ণকে সম্পূর্ণরূপে নতশির করতে হবে, আর লো-বর্ণকে আত্মসম্মানে উচ্চশির। জন্মগত কারণে কেউ উপরে নয়, কেউ নিচে নয়। একটি বিশেষ জাতে জন্মেছে বলে কতক লোক চিরকাল উপরে, কতক লোক চিরকাল নিচে এর ওলট পালটই বিপ্লব। এটা ঘটবে যখন লোকে বুঝতে পারবে যে কেউ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায় না, কেউ পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্র হয়ে জন্মায় না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সনাতন বলে চালাবার জন্যে কর্মবাদ বা জন্মান্তরবাদকে ব্যবহার করা অনুচিত। বর্ণাশ্রমীরাই এটা করেছে, বৌদ্ধরা এটা করেনি।

আহত হয়ে মানস বলেছিল যূথিকাকে, "জুই, তুমি ধীবরকন্যা সত্যবতী হলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতুম। তোমার পরিচয় তুমি।"

"তা হলে আমি ত্যাজ্য কন্যা না হয়ে তুমি ত্যাজ্য পুত্র হতে। আমি কি তাতে সুখী হতুম?" যূথিকা দরদের সঙ্গে বলে।

মানস স্বীকার করে হিন্দু সমাজের ধাপের পর ধাপ। উচ্চতর নিম্নতর অসংখ্য পইঁঠা। ওর বাবা একসময় শঙ্কিত হয়ে সুধিয়েছিলেন, "তুই নাকি গয়লানী বিয়ে করতে যাচ্ছিস?" না, সে চেয়েছিল চাষানী বিয়ে করতে। বলে না।

মানসের মা নেই, বাবা তাঁর বৌমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাতে কিন্তু প্রমাণ হলো না যে যূথিকা যদি গোপী হতো তিনি তেমনি উদার হতেন। মানস মনে প্রাণে ব্রাহ্ম, কিন্তু হিন্দু সমাজভুক্ত। সমাজকে সে ভিতর থেকেই সংস্কার করতে চায়। জাতের বিচার একদিনে দূর করতে পারা যাবে না, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপক হলে তার থেকে হুল চলে যাবে। শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে তাকে হেনস্তা হতে হবে না।

তার বিবাহ যেমন প্রতিলোম বিবাহ সৌম্যদার বিবাহও তেমনি অনুলোম বিবাহ। ওর আত্মীয়রা কি জুলিকে সাদরে গ্রহণ করবে? হয়তো মানসের মতো অবমাননা হবে বেচারির। এই পনেরো বছরে সমাজ অনেকটা বদলেছে। তবে শহর অঞ্চলেই।

সৌম্যদার বিয়েতে মানস যোগ দিতে পারে না। দায়রার মামলায় আটকে পড়েছিল। তা ছাড়া স্বপনদাকে লিখতে তার মনে দ্বিধা ছিল। টেলিগ্রাম করে ক্ষমা চায় ও অভিনন্দন জানায়। আশা করে অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

সৌম্যর পরিকল্পিত বিবাহ পদ্ধতি জুলির অনুমোদন পায় না। অনুষ্ঠান আশ্রমেই হয়, কিন্তু সংক্ষেপিত হিন্দু মতে। শালগ্রাম বাদ, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র বাদ নয়। স্ত্রী আচার বাদ, কিন্তু হোম বাদ নয়। সম্প্রদান বাদ, কিন্তু পরস্পরকে বরণ বাদ নয়। সাত পাক বাদ, কিন্তু সপ্তপদী বাদ নয়। সঙ্গীত বাদ, কিন্তু শঙ্খধ্বনি বাদ নয়। দর্শকদের সকলের মিষ্টিমুখের প্রয়োজন ছিল। জুলিই জনে জনে মিষ্টান্ন বিতরণ করে । এর পরে ওরা রেজিস্ট্রি অফিসে যায়।

জুলির মা বাড়ীতে পার্টি না দিয়ে হোটেলেই ডিনার দেন। জুলির কথায় নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা সংক্ষেপিত করেন। স্বপনদা, দীপিকাদি, বাবলীও নিমন্ত্রিত । স্বপনদা বাবলীকে বলেন, "চকোলেট, এর পর তোমার পালা।" বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "বিয়ে একটা বুর্জোয়া ব্যাপার।"

সৌম্য তার কাকার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিল তা একজন বাস্তববাদীর লেখা। "রাষ্ট্রে তোমরা যেসব পরিবর্তন ঘটাতে চাও সেসব লোকে সমর্থন করতে রাজী, কিন্তু সমাজের বেলা তারা ঘোর রক্ষণশীল। জাত ভেঙে বিয়ে করলে সমাজও ভেঙে যায়। বিধবার বিয়ে তো পাপ। তোমরা আপাতত বাইরেই থাকো, আমি এখানকার জনমত পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করি। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের দল যদি জেতে আর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তা হলে আমি একজন মন্ত্রীকেই এখানে ধরে নিয়ে আসব আর তিনিই তোমাদের অভ্যর্থনা করবেন।"

দেশের বাড়ীতে যাওয়া হয় না। শান্তিনিকেতনে দিন তিনেক থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মানসও সপরিবারে গিয়ে রবিবারটা কাটায়।

জুলি কি আর সেই জুলি? লজ্জানম্র লক্ষ্মী বৌ। ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ। উড়নচণ্ডী বিপ্লবী নায়িকা নয়। জোন অভ্ আর্ক নয়। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে জ্বলজ্বলে টিপ। বদনে আনন্দের উদ্‌ভাস বিয়ের জল পড়ে স্নিগ্ধ।

সৌম্যকেও আগের মতো শুষ্ক কাষ্ঠ মনে হয় না। তারও পরিবর্তন হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে রসের আস্বাদন পেয়েছে । যূথিকা মানসের কানে কানে বলে, "জুলি এখন বিজয়িনী। সৌম্যদা বিজিত। শিব আর পার্বতী।"

।। সাত ।।

যূথিকা ও জুলি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যায়। সৌম্যর সঙ্গে গল্প করে মানস। বিবাহের প্রসঙ্গ যেন ফুরোতে চায় না।

"দেশ যতদিন না মুক্ত হয়েছে ততদিন আমাকে ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। এ ছাড়া আমি আর কোনো কথা ভাবিনি, মানস। কিন্তু দেখলুম বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে আমাদের জিৎ হলো না । আরো একবার লড়তে হবে। কবে, কতদিন পরে কেউ বলতে পারে না। বাপু বেঁচে আছেন আরো একবার লড়বেন বলে। একশো বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার কথাও বলছেন। তার মানে পরের বারের সংগ্রামের জন্যে আরও পঁচিশ বছর সময় নিচ্ছেন। তা বলে আমিও কি বিবাহের জন্যে আরও পঁচিশ বছর সময় নিতে পারি? জুলির হতাশা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তার আশা ছিল গান্ধীজী যা পারলেন না নেতাজী তা পারবেন। কিন্তু ইম্ফলে তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জিৎ হয়নি। ইংরেজকে তা হলে তাড়াবে কারা? কমিউনিস্টরা? এ চিন্তা ওকে পাগল করে তোলে। ও বিপ্লব বলতে বোঝে রাষ্ট্র

বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব নয়। এখন ওর সব আশা ভরসা নির্মূল । ওর মা আমাকে ওর ভার নিতে বলেন। মা না বললেও আমি ওর অবস্থা বিবেচনা করে আপনা থেকে নিতুম। এদেশে বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা যায় না। ওদেশে অবশ্য সেরকম নজীর আছে। সেটা তোমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে। ভালো করেই বুঝতে পারি যে জুলিকে বিয়ে না করলে ওর অবস্থা আরো খারাপ হবে। সোনাদিকে লিখি, তিনি বাপুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেন। কিন্তু—"

মানস সৌম্যর মুখে দুষ্টু হাসি দেখে বলে, "কিন্তু কী?"

"কিন্তু শর্ত আছে।" সৌম্য সবটা একনিঃশ্বাসে বলেন না।

"শর্ত। কী শর্ত ।" মানস কৌতূহল দমন করতে পারে না।

"তোমার মাথায় ঢুকবে না। সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকবে না। আমিও কি ভাবতে পেরেছি?" সৌম্যর চোখে মুখে হাসি।

"আরে বলোই না। অত ধানাই পানাই কেন?" মানস অধৈর্য হয়।

"বিবাহের শর্ত ব্রহ্মচর্য।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

মানস আর সইতে পারে না। "গান্ধীজী একটা কিল্-জয়।"

সৌম্য গান্ধীজীর পক্ষ নেয়। "আমরা গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরাও একটা ফৌজ। ফৌজে থাকতে হলে কতকগুলো কানুন মানতে হয়। এটাও সেইসব কানুনের একটা। যদি গঠনের কাজ নিয়ে থাকি, সত্যাগ্রহে যোগ না দিই, তা হলে বিবাহের পর ব্রহ্মচর্যের বাধ্যবাধকতা নেই। গঠনের কাজও দেশের কাজ। গঠন থেকেই সংগঠন গড়ে উঠবে। সংগঠন ছাড়া গণ সত্যাগ্রহ সম্ভব নয় । এবার সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। অসংগঠিত জনতা যা করেছে তা গণ সত্যাগ্রহ নয়। তার ব্যর্থতা গণ সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা নয়। গান্ধীজীর ব্যর্থতা তো নয়ই। আমি আপাতত গঠনকর্মেই আত্মনিয়োগ করছি। তাই বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য পালন করছিনে। কিন্তু সত্যাগ্রহের সময় যখন আসবে তখন?"

"আবার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে।" মানস উপহাস করে।

"তুমি কি মনে করেছ আমি পারব না?" সৌম্য কঠোরভাবে বলে।

"এটা কি তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি ব্রহ্মচারী হলে তোমার স্ত্রীও ব্রহ্মচারিণী হতে বাধ্য হয়? কেন ওকে তুমি বাধ্য করবে? কী অধিকার আছে তোমার? তুমি ওর অনুমতি চাইতে পারো, কিন্তু ও যদি অনুমতি না দেয়? অবশ্য সেও যদি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চায় সে কথা আলাদা। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক জোর জবরদস্তির সম্পর্ক নয়। একজন আরেকজনের উপর ব্রহ্মচর্য বা সত্যাগ্রহ চাপিয়ে দিতে পারে না। ভুলে যেয়ো না যে নারীরও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। তাকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখলে সে কষ্ট পায়। তোমার অন্তরে প্যাশন নেই,তা আমি জানি। কিন্তু কম্প্যাশন তো আছে। কী করে তুমি একটি নারীকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখবে? কষ্ট দেবে?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

সৌম্য খপ করে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "কী করে তুমি জানলে আমার অন্তরে প্যাশন নেই, শুধু কম্প্যাশন আছে? আমার প্যাশন আমি সাবলিমেট করেছি। দেশের মুক্তির জন্যেই সে প্যাশন। নারীর মধুর রসের জন্যে নয়। গান্ধী, জবাহরলাল, সুভাষ এঁদের অন্তরেও প্যাশন আছে। সে প্যাশন দেশের মুক্তির জন্যে। নারীর সঙ্গে মিলনমাধুরী তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি। আমার আশঙ্কা আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

মানস তাকে আশ্বাস দেয় যে সবাই ব্রহ্মচারী না হলেও দেশ স্বাধীন হবে। আমেরিকা হয়েছে,ইটালী হয়েছে, আয়ারল্যাণ্ড হয়েছে। কোথাও ব্রহ্মচর্যের এমন মাহাত্ম্য নেই। সংগ্রামের নেতারা কেউ মহাত্মা নন। শুধু ভারতের বেলাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে সংগ্রামের নেতাদের মহাত্মা হতে হবে। আর মহাত্মা হতে হলে ব্রহ্মচারী হতে হবে। এ দেশের জনগণ ব্রাহ্মণ বলতেই অজ্ঞান, সন্ন্যাসী বলতেই মন্ত্রমুগ্ধ নেতারাও হয় ব্রাহ্মণ, নয় সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই তাঁদের এত প্রেস্টিজ। তবে মুসলমান বা শিখদের মধ্যে

এ কুসংস্কার নেই। তাদের মধ্যে যে কেউ বীরপুরুষ হয়নি তা নয়। বীরপুরুষরা বরং বহুভোগী। দেশকে মুক্ত করা বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের কাজ। তাঁদের নিয়েই মহাকাব্য বা নাটক রচিত হয়।"

"সে কথা ঠিক।" সৌম্য স্বীকার করে। "জুলিকেও আমি ব্রহ্মচারিণী হতে বলিনে। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মচারী হই, ও যদি ব্রহ্মচারিণী হতে না চায়, তবে সে এক মহা অশান্তির ব্যাপার হবে। বাপু কলকাতা আসবেন শুনেছি। তাঁকে একলা পেলে জিজ্ঞাসা করব এহেন সমস্যার সমাধান কী।"

"নারীকেই আত্মবলি দিতে হবে, এ ছাড়া আর কী? কস্তুরবাকে তিনি আত্মবলি দিতে প্রণোদিত করেছেন। জুলিকেও কস্তুরবা হতে বলবেন। কিন্তু ও কেন শুনবে? তুমি কি বিয়ের আগে ওকে গান্ধীজীর শর্তের কথা জানিয়েছ?" মানস সৌম্যকে বেকায়দায় ফেলে।

"না, ভাই। জানালে ও হয়তো মারতে আসত। ওর প্রথম বিবাহে ফুলশয্যা হয়নি। ও ব্রহ্মচারিণী থেকে গেছে। দ্বিতীয় বিবাহেও তাই হলে ও কি ক্ষমা করবে? দেশের নেতারা ওকে নিরাশ করেছেন। আমি ওর স্বামী হয়ে যদি ওকে নিরাশ করি ও কি মারমুখী হবে না?" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

এর পর মানস চিন্তা করে বলে, "গান্ধীজীর উচ্চাভিলাষ তিনি সেক্সলেস হতে চান। তার মানে একজন বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর কি মঞ্জুশ্রী। তাঁর পাল্লায় পড়ে তুমিও আরেকজন বোধিসত্ত্ব। ক্ষিতিগর্ভ কি সামন্তভদ্র। তোমার পাল্লায় পড়ে বেচারি জুলি যে কী হবে তাই ভাবছি।" মানস রহস্য করে।

সৌম্য হেসে ওঠে। "আমার পাল্লায় পড়ে ও মা হতে চায়। একটি ছেলের ও একটি মেয়ের। এর পরে তো ওর কোনো চাহিদা থাকার কথা নয়। সেক্স ব্যাপারটা তো সন্তানার্থে। মানুষ তার উপর আরো কিছু আরোপ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য তো প্রজনন। সমাজেরও অভিপ্রায় পৌর্বাপর্য রক্ষা। যাকে বলে পিতৃঋণ শোধ। ঋণমুক্ত হবার পর আমাদের উভয়েরই কর্তব্য মিলনকামনাকে কায়িক স্তর থেকে আত্মিক স্তরে উন্নীত করা। যৌবন তো ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক বছর পরে আমার হবে বানপ্রস্থের বয়স। আর জুলির চেঞ্জ অভ্ লাইফ। এমনিতেই দাঁড়ি টানতে হবে।"

"বিরতি হয়তো একদিন আপনি আসবে। কিন্তু জোর করা বিরতির পরিণাম ভয়াবহ। যে প্রকৃতির দোহাই তুমি দিয়েছ সেই প্রকৃতিই কামনাপূরণের প্রবর্তনা দেয়, সন্তান থাকা সত্ত্বেও। স্ত্রী নারাজ হলে স্বামী অন্যত্র যায়, স্বামী নারাজ হলে স্ত্রী অশান্ত হয়। সব চেয়ে ভালো হচ্ছে দু'জনের পায়ে পা মিলিয়ে চলা। শয্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া মহা অনর্থকর। একবার বিয়ে করলে তারপর থেকে তুমি আর ফ্রী নও। তোমার ফ্রীডম আসবে জুলি যেদিন স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বলবে, আর চাইনে। কামনার কোনো বয়ঃসীমা নেই। সন্তানধারণের বয়স পার হয়ে গেলেও নারী পুরুষকে আকর্ষণও করতে পারে, তার দ্বারা আকৃষ্টও হতে পারে। তখন আর অন্তঃসত্ত্বা হবার ভয় ওর থাকে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে আরো অনেকদিন ভোগসুখ চাইতে পারে। যদি না রোগে শোকে জর্জর হয়।" মানস যতদূর জানে।

সৌম্য কী যেন ভাবছিল। বলে, "বেদ উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ন স্ত্রী, ন পুমান্। ব্রহ্ম শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। তোমরা ব্রাহ্মরা তাঁকে বানিয়েছ পুংলিঙ্গ। যিনি পুরুষও নন, নারীও নন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে হলে ন স্ত্রী ন পুমান্ হতে হবে। এটাই তো লজিক। এদিক থেকে বাপুই লজিক্যাল। তিনি আগে বলতেন ভগবানই সত্য। আজকাল বলেন সত্যই ভগবান। সত্য শব্দটি ব্রহ্ম শব্দটির মতো ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে ক্লীবলিঙ্গই হতে হয়। সেটাই এখন তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক সাধনা। সত্য আর অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য তিনটিই তাঁর কাছে এক, একটিই তিন। আমার কাছে এখনো হয়নি, কবে হবে তা নির্ভর করছে দীর্ঘজীবনের উপরে। পরের বারের সংগ্রামে যদি যোগ দিই তবে জেলে যেতে হবে না, সেটা সকলে পারে। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে হবে কিংবা পেছন থেকে ছোরা

খেতে হবে। সত্যাগ্রহ মানে জেলযাত্রা নয়। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়া নয়। বাপু আমাকে গঠনের কাজে নিযুক্ত রেখে বাঁচিয়ে দিতে চান, কিন্তু আমার ভিতরে একজন সৈনিক আছে, সে তোমার মতো নীরব সাক্ষী হতে নারাজ। সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সম্ভবত মার খেয়ে মরবে।"

"গড ফরবিড।" মানস বলে ওঠে। "তুমি এখন বিবাহিত গৃহস্থ, তুমি আর স্বাধীন নও। জুলির অনুমতি না নিয়ে তুমি প্রাণ দিতে পারবে না। ওকে বিধবা করার কী অধিকার আছে তোমার? ও ক'বার বিধবা হবে? যদি ছেলেমেয়ের মা হয় তবে বিধবা হয়ে আরো কষ্ট পাবে। তোমাকে বাপু গঠনের কাজে একনিষ্ঠ হতে বলেছেন। তোমাকে তাঁর নির্দেশ মানতে হবে।"

এর পর ওঠে মিলির প্রসঙ্গ। একান্ত কুণ্ঠা আর সঙ্কোচের সঙ্গে সৌম্য মানসকে বিশ্বাস করে বলে, "একচক্ষু হরিণের মতো আমি একটা দিকই দেখেছি, আরেকটা দিক দেখিনি। জুলির দিকটা দেখেছি, মিলির দিকটা দেখিনি। এখন বুঝতে পারছি একই বাড়ীতে দুই নারী থাকতে পারে না। এমন কী, একই শহরেও না। মিলির বিলেত ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছি, কিন্তু মিলি নাকি স্থির করেছে যে ওর ছেলেকে স্বদেশেই মানুষ করবে, বিদেশে নয়। ওদিকে সুকুমার লণ্ডনের শহরতলী ব্রেন্টে সস্তায় পেয়ে বাড়ী কিনেছে, সেইখানেই সেটল করবে। ছেলেকে বিলেতের ভালো প্রাইভেট স্কুলে পড়াবে। তার পর অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে। ছেলে যখন দেশে ফিরবে তখন সে একজন কেষ্ট বিষ্টু হয়ে ফিরবে। যেমন শ্রীঅরবিন্দ। সুকুমারের মটো হচ্ছে বেস্ট এডুকেশন, নট স্বদেশী এডুকেশন। মিলির মটো ঠিক বিপরীত। ছেলে দেশের পড়া সাঙ্গ করে বিদেশে যাবে। যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মিলি তার ছেলের মঙ্গলের জন্যে দেশে থেকে যেতে চায়, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে বিলেতে বসবাস করতে নারাজ। এই নিয়ে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। সুকুমার দেশে ফিরে কী করবে? ভেরেণ্ডা ভাজবে? তবে ও তুখোড় লোক। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আর কৃষ্ণ মেনন তো জবাহরলালের ভক্ত। লেবার পার্টিতে ওঁর যথেষ্ট প্রভাব। এখন তো লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের সম্ভাবনা নিকটবর্তী। জবাহরলাল ইচ্ছে করলে মেননকে আর মেনন ইচ্ছে করলে সুকুমারকে দেশে ফিরিয়ে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। মিলি কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। চার্চিল এখন গভর্নমেন্টে নেই, তবু অপোজিশনে তো আছেন। ভারতসংক্রান্ত প্রশ্নে ব্রিটিশ জনমত চার্চিলের মুখের দিকে তাকিয়ে, অ্যাটলীর মুখের দিকে নয়। চার্চিলের পার্টির সঙ্গে জিন্নার পার্টির সম্পর্ক তেমনি নিবিড় যেমন লেবার পার্টির সঙ্গে নেহরুর পার্টির। কংগ্রেস যদি লীগের সঙ্গে মিটমাট না করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করবে না। কংগ্রেস কী করে পার্টিশনের ভিত্তিতে দেশকে স্বাধীন করবে? পাকিস্তান তো ব্রিটেনের তাঁবেদার হবে। বোমা রিভলভারের দিন আবার আসছে। স্টেন গান, গ্রেনেড ইত্যাদিও জোগাড় করতে হবে। মিলিকেও আবার আসরে নামতে হবে। সুকুমারের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নেও তার বিরোধ। ইংরেজরা আর সব বিষয়ে ভালো, কিন্তু হাড়ে হাড়ে সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্য ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ছাড়লেও মুসলিম লীগের বকলমে ভারতের মাটিতে এক পা রাখবে। তার নাম কি স্বাধীনতা? কখনো নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা। তার জন্যে সিপাইদের নিয়ে লড়তে হবে। দশ বছর দেরি হবে? হোক না দশ বছর দেরি? নেতারা ততদিন বাঁচবেন না। নাই বা বাঁচলেন? নতুন নেতার উদয় হবে।"

মানস অবাক হয়ে শোনে। জিন্না চার্চিল অ্যাকসিস আর নেহরু লেবার অ্যাকসিস দুটোই সত্য। কী করে এদের মধ্যে মিটমাট হবে ভগবান জানেন। গান্ধীজী অবশ্য চুপ করে থাকবেন না, হয় জেলে ফিরে যাবেন, নয় মরণপণ অনশন করে স্বর্গে চলে যাবেন। সৌম্য যদি গান্ধীর নিয়তির নিজের নিয়তির সঙ্গে সংযুক্ত করে তবে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জুলি কি তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে পারবে? আর ওই যে মিলি ওই বা কেন আসমান থেকে নেমে এসেছে ঠিক এই মুহূর্তে? সৌম্যকে কেন মুশকিলে

ফেলেছে? দুই নারীর মাঝখানে পড়ে বেচারা কি ও শহরে তিষ্ঠতে পারবে? ওর হাতে গড়া আশ্রম ওকে ছাড়তে হবে।

যূথিকা ও জুলি দীপক ও মণিকাকে নিয়ে ফিরে আসে। জুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "আহা, এমন না হলে আশ্রম! কী নেই এখানে। নাচ, গান, বাজনা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। নাচের ক্লাস চলছিল, অনুমতি নিয়ে আমিও একটু নাচলুম। ওঁরা বলেছেন আমি যদি এখানে থাকি আমাকেও নাচের ক্লাসে ভর্তি করে নেবেন। কে একজন দক্ষিণী মন্তব্য করেন, ইউ আর আ বর্ন ডান্সার। এই আশ্রম আর ওই আশ্রম! কার সঙ্গে কার তুলনা! এই, তুমি কেন ওখান থেকে এখানে চলে এস না? আলাদা একটা বাড়ী করে তোমার কাজ তুমি করবে, আমার কাজ আমি করব। নাচ, গান, ছবি আঁকা এইসব আমার কাজ। আফসোস হচ্ছে আগে কেন এখানে আসিনি, নাচ গান ছবি আঁকা শিখিনি। বিবাহিতা ছাত্রীও দেখলুম। কারো কারো বয়স আমারই মতো। এই, তুমি কেন আমাকে এখানে ভর্তি করে দাও না। উত্তরায়ণে গিয়ে রথীদা ও বৌঠানের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। ওঁরা আমাকে পেলে খুব খুশি হবেন। থিয়েটারে একটা পার্ট দেবেন। আহা, থিয়েটার! কী চমৎকার! বললেন আমাকে যা মানাবে। কার পার্টে, জানো? 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর পার্টে। হ্যাঁ, আশ্রমে যদি থাকতে হয় তো এই হচ্ছে সেই আশ্রম। মহর্ষি ও মহাকবির স্বপ্ন।"

"জুলি যা বলছে তা ভেবে দেখবার মতো। এটাও আশ্রম। এখানে এলে বা এর কাছাকাছি নতুন একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, ওর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে। তুমি বাপুকে চিঠি লিখে ওঁর অনুমতি নাও। জুলিকে যদি রাজনীতি ভুলিয়ে দিতে চাও এই সেই পরিবেশ।" মানসের পরামর্শ।

সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে, "জুলিকে নয়, মিলিকে। ওর ছেলের পড়াশুনার পক্ষে এই পরিবেশই আদর্শ। জুলির যদি ছেলেমেয়ে হয় ওরাও একটু বড়ো হলে এখানে আসবে। তখন জুলিও আসবে তাদের নিয়ে থাকতে। কিন্তু আমার কি সে স্বাধীনতা আছে? ওখানে আমি হাজার জন কাটুনীকে দিয়ে সুতো কাটাই, তাদের পেছনে আমার বছরে খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। তারপর স্থানীয় তাঁতীদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিই। তাতেও খরচ হয় লাখ দেড়েক টাকা। ছুতোর, কামার, রংরেজদের পেছনেও অনেক টাকা খরচ হয়। তা ছাড়া আশ্রমের কর্মীরা আছেন। ভাণ্ডার চালাতেও খরচ হয়। এখানে যদি আসি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আবার সেই চলি চলি পা পা। কতকাল লাগবে তত বড়ো আকার দিতে। সেই সময়টা ওখানে দিলে ওখানকার আশ্রম দ্বিগুণ বড়ো হতে পারে। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করতে। গঠনকর্মের মাধ্যমে। আমি যে খরচটা করি তার সিংহের ভাগ পায় মুসলমানরা, তারাই স্থানীয় সংখ্যাগুরু। ব্যয়ের চেয়ে আয় অনেক কম। ফী বছর লোকসান দিতে হয়। খাদি এখনো আত্মনির্ভর হয়নি। সঙ্ঘ থেকে ভর্তুকি দেয়। এই উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের যে ঐক্য গড়ে তুলেছি সেটা মুসলিম লীগ তথা হিন্দু মহাসভা উভয়েরই চক্ষুশূল। পালিয়ে এলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে কী রকম প্রোপাগাণ্ডা হচ্ছে, জানো? বাবুরা দেশের জন্যে জেল খাটছেন, তাঁরা দেশকে ভালোবাসেন। কিন্তু দেশকে ভালোবাসলে কী হবে, দেশের মানুষকে যে ভালোবাসেন না। মুসলমানকে তাঁরা ক্ষমতার অংশ দেবেন না। ইংরেজকে তাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানকেও তাড়াবেন। ইংরেজও বিদেশী, মুসলমানও বিদেশী। ইংরেজও বিধর্মী, মুসলমানও বিধর্মী। ইংরেজও বিজেতা, মুসলমানও বিজেতা। এক ঢিলে দুই পাখী মারছেন। পাকিস্তানই একমাত্র রক্ষাকবচ।"

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। বলে, "তোমাকে কাসাবিয়াঙ্কার মতো ওই জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সৌম্যদা। চারদিকে আগুন ধরে গেলেও। পলায়ন বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু সত্যাগ্রহীর

কাজ নয়।"

জুলি ক্ষেপে গিয়ে বলে, "তা হলে তুমিই বা কেন ওখানে বদলী হয়ে যাও না? তুমিও তো হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চাও।"

মানস এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলে, "আমি তো চাকরি থেকে অকালে অবসর নিতে যাচ্ছি।"

"তার মানে তুমি এস্‌কেপিস্ট। ছি ছি, মানসদা।" জুলি টিটকারি দেয়।

এবার যূথিকা তার স্বামীর পক্ষ নেয়। "ওর এই সিদ্ধান্তটা পাঁচবছর আগে নেওয়া হয়ে গেছে। শুধু যুদ্ধশেষের অপেক্ষা। আর আনুপাতিক পেনসনের।"

"সে কী, মানসদা, তুমি আমাদের বিষম বিপদের মুখে ফেলে নিজে নিরাপদ হতে চাও। যদিও তোমরা আমাদের শত্রুপক্ষের লোক তবুও তোমরা থাকলে আমরা নিরাপদ বোধ করি।" জুলি অন্তর থেকে বলে।

"এতকাল তো দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে ইটপাটকেল খেয়ে এসেছি, আজ হঠাৎ ফুলের তোড়া কেন? কবে থেকে আমাদের কদর বেড়ে গেল?" মানস সুধায়।

"হিন্দু অফিসার একটি কমলে হিন্দুর রক্ষকও একটি কমে। দেখছ না পরিস্থিতি কেমন ঘোরালো হয়ে আসছে? ইংরেজকে তাড়াতে গিয়ে শুনছি মুসলমানকেও তাড়াতে যাচ্ছি। যা স্বপ্নেও ভাবিনি। মুসলমান হচ্ছে ফ্রেশ অভ্ মাই ফ্রেশ, ব্লাড অভ্ মাই ব্লাড। কিন্তু এখন ওদের শেখানো হয়েছে যে ওরা আলাদা একটা নেশন, ওদের জন্যে আলাদা একটা দেশ চাই, যে তাতে নারাজ হবে সেই তার শত্রু আমরা কি নারাজ না হয়ে পারি? গোটা বাংলাদেশটাই নাকি ওদের পাওনা। না দিলে ইংরেজকে ছেড়ে আমাদেরকেই ওরা তাড়াবে। আর নয়তো সুলতানী আমল ও নবাবী আমলের মতো পদানত করে রাখবে। আমরা কি ইংরেজকে বিদায় দিতে যাচ্ছি মুসলমানের প্রজা হতে?" জুলির মোক্ষম প্রশ্ন।

"কিন্তু তোমার ওটা ভুল যে আমি একজন হিন্দু অফিসার। না, আমাকে ধর্ম দেখে চাকরিতে নেওয়া হয়নি। যোগ্যতা দেখে নেওয়া হয়েছে। ধর্ম দেখে যাদের নেওয়া হয়েছে তারা মুসলমান। তাদের তুমি মুসলিম অফিসার বলতে পারো। কিন্তু আমরা ইণ্ডিয়ান অফিসার। আমরা ইণ্ডিয়ানদের সবাইকার রক্ষক। হিন্দু মুসলমান ভেদ বিচার করব না। অপরাধ নির্বিশেষে দণ্ড দেব। মুসলিম লীগ আমাদের খুব বেকায়দায় ফেলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এখনো আমাদের বিশ্বাস করে। আমি কি তাদের জন্যে কম ভেবেছি,কম করেছি? সৌম্যদাও ওদের জন্যে কম ভাবেনি, কম করেনি। তুমিও কম ভাববে না, কম করবে না। বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন প্রীতিপূর্ণ ছিল তেমনি প্রীতিপূর্ণ থাকবে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজই পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু হিন্দুর রক্ষক।" মানস উত্তর দেয়।

"পশ্চিমবঙ্গে বসে তুমি তো ওকথা বলবেই। যেতে যদি পূর্ববঙ্গে আর দেখতে যদি কী অবস্থা তবে তোমার মত বদলে যেত। তা তো নয়, তুমি চাকরি ছেড়ে পালাবার তালে আছো।" জুলি আবার টিটকারি দেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সপ্তপদী আমি চাইনি, জুলিই চেয়েছিল। বেচারিকে এখন আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে হবে। বিপদের ভয়ে আমি কি পেছপা হতে পারি? আমি যে গান্ধীজীর সৈনিক। বিপদের সঙ্গে আত্মার জোরে লড়ব। জুলি থাকবে আমার পাশে। জুলিই আমার শক্তি।"

"আচ্ছা, সৌম্যদা," যূথিকা সুধায়, "সপ্তপদী হয়েছে বলে কি স্ত্রীকেই স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে, স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে নয়, কস্তুরবাকেই গান্ধীজীর অনুসরণ করতে হবে, গান্ধীজীকে কস্তুরবার নয়? আমাদের বিয়েতে সপ্তপদী হয়নি। তার জন্যে আমার মনে খেদ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি সপ্তপদী না হয়ে ভালোই হয়েছে। আমি জুলির চেয়ে স্বাধীন। ও বেচারিকে তোমার মতো সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে

যেতে হবে।"

"ও না হলে আমাকে শক্তি জোগাবে কে?" সৌম্য সহাস্যে পাল্টা সুধায়।

"কেন? এতদিন কে জুগিয়েছিল?" যূথিকা জেরা করে।

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "ভারতমাতা। বন্দে মাতরম্।"

"তা হলে ভারতমাতাই আবার জোগাবেন। জুলিকে তুমি শান্তিনিকেতনে থাকতে দাও। পরে ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে।" যূথিকা বাজিয়ে দেখে।

"তবে তাই হোক। আপাতত আমার আশ্রম আমাকে টানছে। আমাকে যেতেই হবে। জুলি, তুমি কালকেই নাচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ো।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

জুলির মুখ শুকিয়ে যায়। "রাগ করলে নাকি? আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি? তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে যাব।"

মানস হেসে বলে, "রাশিয়াতে একটা প্রবাদ আছে, ছুঁচ যেদিকে যায় সুতো সেইদিকে যায়। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক যেন ছুঁচ সুতোর সম্পর্ক । ছুঁচ না হলে সুতো অকেজো। সুতো নাহলে ছুঁচ অকেজো। তবে ছুঁচই আগে আগে যায়। সুতো অনুসরণ করে।"

তা শুনে যূথিকা ফোড়ন কাটে । "শোন, শোন। এই ছুঁচটির পিছু পিছু এই সুতোটিকেও বাংলাদেশে কাঁথাখানা এফোঁড় ওফোঁড় করতে হয়েছে । কোথাও কি দুটো বছর থাকতে দিয়েছে ? একবার বাদে। জুলি, তোমার ভাগ্যে বদলী নেই। তুমি ভাগ্যবতী।"

"সে তো আরো ভাবনার কথা। সারাজীবন ওখানেই কাটাতে হবে নাকি? যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!" জুলি আঁতকে ওঠে ।

"কেন ইংরেজ মিশনারিরা কি সারাজীবন ভারতে কাটান না? গান্ধীবাদী গঠনকর্মীরাও আরেক রকম মিশনারি। কোথাও একটা স্কুল, কোথাও একটা হাসপাতাল, কোথাও একটা কুষ্ঠসেবাশ্রম নিয়ে মিশনারিরা বসে যান। তোমরাও তেমনি বসে যাবে। তা হলেই তো লোকের উপর তোমাদের নৈতিক প্রভাব পড়বে। খাদির কাজ একটা বিজনেস নয়। লোকে যদি সেটাকে টাকা পয়সার নিরিখে বিচার করে তবে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শোষণহীন সমাজ সংস্থাপন । নইলে আর্থিক লোকসান দিতে দিতে তোমরা একদিন দেউলে হবে। তখন আশ্রম গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যাবে।" মানস যেমন অনুমান করে।

"নেহাৎ ভুল বলেনি মানস।" সৌম্য স্বীকার করে। "আমরা এখনো লোকের মনের মধ্যে গভীর ভাবে শিকড় গাড়তে পারিনি। গভর্নমেন্ট সব তছনছ করে দিয়েছে। লোকে 'হাঁ', 'হাঁ' করে ছুটে আসেনি। পুলিশের সামনে শুয়ে পড়েনি। যেসব কর্মী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের বাদ দিয়েও আরো কয়েকজন কর্মী ছিল গঠনকর্মে রত । তারা নিঃশব্দে সরে পড়ে । রুখে দাঁড়ায় না।"

"মানসদা," জুলি নিবেদন করে, "আমি কিন্তু গান্ধীবাদীও নই,মিশনারিও নই। মতবাদের দিক থেকে সৌম্য যেমন স্বাধীন আমিও তেমনি স্বাধীন । তবে কার্যকলাপের বেলা আমাকে সতর্ক হতে হবে, যেন গঠনকর্ম বা সত্যাগ্রহ বাধা না পায়। আপাতত আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এ রাজনীতি আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। আমি চাই বৈপ্লবিক রাজনীতি, অথচ কমিউনিস্ট পার্টির ডিকটেটরশিপ নয়। রাশিয়ায় ওরা ধনিকদের মালিকানা রাষ্ট্রসাৎ করেছে, কিন্তু শ্রমিকদের মালিকানা বা মালিকানার অংশ দেয়নি। তারা শ্রম দেয়, পারিশ্রমিক পায়, যেমন বাড়ীর চাকর। চাকরে মালিকে অনেক তফাৎ । রাষ্ট্রের চাকর বলে পরিচয় দেওয়াটা কি খুব গৌরবের ? সরকারী চাকুরে হিসাবে তুমি,মানসদা,কি খুব একটা গৌরব বোধ করো ? কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও কি তোমার গৌরব বৃদ্ধি পাবে? শ্রমিকরা যেদিন জানবে যে তাদের কারখানার তারাই মালিক, প্রত্যেকেই মালিকানার অংশীদার, সেইদিনই সত্যিকার সমাজতন্ত্র।

তার জন্যে যদি আমার ডাক পড়ে আমি আবার রাজনীতিতে যোগ দেব। কিন্তু স্বামীর সম্মতি নিয়ে।"

যূথিকা রঙ্গ করে। "সন্তানের সম্মতি নেবে না? না তুমি সন্তান এড়াতে চাও? না তুমি ওদেরকে বাপের ঘাড়ে চাপাতে চাও?"

"কী যে বলো,যূথীদি! আমি কি কখনো মা না হয়ে পারি? আশা করি ওরা ততদিনে বড়ো হয়ে থাকবে। কোথায় বিপ্লব! তার কোনো লক্ষণই আমার চোখে পড়ছে না। বিশ্ব পরিস্থিতি তার অনুকূল ছিল তিন বছর আগে। যুদ্ধের মাঝখানে। আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এলোপাথাড়ি নরহত্যায় কোনো ফল হবে না। 'ভায়োলেন্স ফর ভায়োলেন্স সেক' আমার মটো নয়। সমষ্টি যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে গোষ্ঠী সেখানে সফল হতে পারে না। তা দিয়ে হয়তো কতক লোককে কতক সময়ের জন্যে জাগানো যায়। কিন্তু তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সৌম্য আমাকে অহিংসায় দীক্ষা দেয়নি। তবে আমি নিজেই উপলব্ধি করছি যে এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হিংসা সম্ভব নয়, যদি না আর্মিকে তার মধ্যে ধরি। অথচ আর্মি যে ক্ষমতা হাতে পেয়ে হাতছাড়া করবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।"

মানস বলে, "সৌম্যদা, জুলি তোমার মতো পজিটিভ গান্ধীবাদী না হলেও নেগেটিভ গান্ধীবাদী। হাস্যকর শোনায়, কিন্তু আমরা অনেকেই তাই। যারা দু'বেলা 'অহিংসা' 'অহিংসা' করে তারাই যে গান্ধীবাদী তা নয়। যারা দু'বেলা হিংসাকে এড়িয়ে চলে তারাও গান্ধীবাদী। আর, বোন জুলি, তোমাকেও একটা কথা বলি। চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের মালিক আর শ্রমিক একই লোক। কেউ শোষকও নয়, কেউ শোষিতও নয়। যে ক্যাপিটাল জোগায় সে শ্রমও জোগায়। এই হলো থিয়োরি। প্র্যাক্‌টিসে কিছু অদল বদল ঘটতে পারে। যে দেশে কোটি কোটি মানুষ বেকার বা অর্ধ বেকার সে দেশে চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বিপুল হতে পারে। তবে ভারী শিল্পের বেলা এ ব্যবস্থা খাটবে না. চাই প্রচুর মূলধন, সুদক্ষ শ্রমিক, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, করিৎকর্মা ম্যানেজার, দূরদর্শী ডাইরেক্টর। রেল, জাহাজ, প্লেন সমস্তই আমাদের দেশে বানাতে হবে। প্রকৃতিদত্ত খনিজের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক, কিন্তু মালিকানা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া যাক। শ্রমিকরাও শেয়ার হোলডার হোক। যেই শ্রমিক সেই আংশিকভাবে মালিক। গান্ধীজীকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে।"

।। আট ।।

ওদিকে দুই বন্ধুতে তর্ক করতে করতে পৌঁছে যায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে। মানস বলে, "তীর ধনুকের যুগ কবে শেষ হয়েছে। এবার কামান বন্দুকের যুগও গেল। শুরু হলো পারমাণবিক অস্ত্রের যুগ। এখনও তোমরা অহিংসার স্বপ্ন দেখবে, সৌম্যদা? বাস্তবের দিকে তাকাবে না।"

"পরমাণু অস্ত্র নতুন। অহিংসা চিরন্তন। ইটার্নাল ভেরিটির অন্যতম। এর পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা যা করেছি তাই শেষ নয়, ভবিষ্যতে আরো কত পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। কেবল ভারতে নয়, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, জার্মানীতে, জাপানে, ইংলণ্ডে, আফ্রিকায়। মহাত্মা থাকবেন না, আরো কত সাধক জন্মাবেন। মিলিটারিস্টরা মঞ্চ জুড়ে থাকবে, এ কখনো হতে পারে না। নিজেরাই মারামারি করে নিপাত যাবে। এরা যদি বাঁচে তো অহিংসার কল্যাণেই বাঁচবে। অহিংসার ভবিষ্যৎ পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে সুদূরপ্রসারী। আমরা বার বার ব্যর্থ হব, কিন্তু সেই ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।" সৌম্য নিশ্চিতরূপে জানে।

"হ্যাঁ, কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে তোমরা মোকাবিলা করবে কেমন করে?" মানস জানতে চায়।

"দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করে। যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মরতে যদি হয় তো নৈতিক প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হবে। টলস্টয় হলে বলতেন অপ্রতিরোধ। গান্ধী কিন্তু

অপ্রতিরোধের নয়, আত্মিক প্রতিরোধের শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছেন। নৈতিক প্রতিরোধ আর আত্মিক প্রতিরোধ একই কথা। পারমাণবিক অস্ত্র যার হাতে আছে তার কি শুধু হাতই আছে? হৃদয় নেই, বিবেক নেই, আত্মা নেই? বোমা ফেলবার আগে সে দশবার ভাববে। নেহাৎ পাষাণ হয়ে থাকলে ফেলতেও পারে। তার জন্যে আমরা তৈরি। আমরা মরে গিয়ে তাকে সারাজীবন অনুতাপের আগুনে জ্বালিয়ে রেখে যাব। তার নিজের আত্মীয় স্বজনরাই তার নিন্দা করবে। তার দেশের লোক তার জন্যে লজ্জিত হবে। তার দেশের সরকার তার নামটা পর্যন্ত চাপা দেবে। সে নিজেও যে চিরদিন বাঁচবে তা নয়। সেও একদিন মরবে। তার সে মৃত্যু আমাদের মৃত্যুর মতো গৌরবের হবে না। এক ঢিলে এক লক্ষ পাখী মারার যে বাহাদুরি সেই বাহাদুরি নিয়ে সে কতক লোকের কাছে বীরপুরুষ বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রও তাকে ভিক্টোরিয়া ক্রস বা সেই জাতীয় পদক দিয়ে সম্মানিত করবে। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে ঠিক সেই পরিমাণে নেমে যাবে। রাক্ষসের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ থাকবে না।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের হাতেও যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকত তোমরা কি এত সহজে ছুঁড়ে ফেলে দিতে রাজী হতে? না তোমরাও পাল্টা আঘাত করতে? ওদের দেশের এক লক্ষ পাখী মেরে ওদের দুরস্ত করতে? থাকত যদি জাপানীদের হাতেও ও রকম একটা পারমাণবিক বোমা তা হলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রতিফল মার্কিনরাও পেতো। হয়তো প্রতিফলের আশঙ্কায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণই করত না। এইবার দেখবে দেশে দেশে পারমাণবিক বোমা তৈরির হিড়িক পড়ে যাবে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর ট্যাঙ্ক তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। স্বাধীন ভারত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লেগে যাবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা সেই লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধন খাটাবেন।" মানস অনুমান করে।

সৌম্য তার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "মিলিটারিজমের সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমও এদেশে খুঁটি গাড়বে। যে মুদ্রার এপিঠ মিলিটারিজম সেই মুদ্রারই ওপিঠ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম। স্বাধীন ভারতের মতিগতি হবে স্বাধীন ইংলণ্ডের মতোই। গান্ধীজীর মিশন শুধু দেশকে স্বাধীন করা নয়, দেশকে একটা পৃথক পথ দেখানো। সেটা যুদ্ধবিরোধিতা, সুতরাং মিলিটারিস্টদের বিরোধিতা। সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের বিরোধিতা। কিন্তু স্বাধীনতা যতই নিকটবর্তী হয়ে আসছে মিলিটারির উপর নির্ভরতা ততই বেড়ে যাচ্ছে। আর মিলিটারিকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করার জন্যে কলকারখানার উপর নির্ভরতাও সেই পরিমাণে বেড়ে চলেছে। আমাকে একদিন আমার নিজের দেশের মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে হবে। সেদিন আমি জুলিকেও সঙ্গে পাব কি-না কে জানে। ও আমাকে ভালোবাসে বলে আমার ব্রতকেও ভালোবাসে এমন কথা বলতে পারব না। আমরা কেউ কারো মতবাদে হস্তক্ষেপ করতে চাইনে।"

ছেলেমেয়েদের তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করতে ছেড়ে দিয়ে দুই বান্ধবীতে বাক্যালাপ চলছিল অন্য এক ঘরে। শেষের কথাগুলো জুলির কানে যায় না।

"ওকে আমি একলা ছাড়তে পারিনে, যূথীদি। ওখানে গেলে ও মিলির পাল্লায় পড়বে। মিলি দেখতে আরো টকটকে হয়েছে।" জুলি নিশ্বাস করে বলে।

"কিন্তু সৌম্যদা তো তোমাকেই বেছে নিয়েছে। মিলির দিকে ও ফিরে তাকাবে কেন? তোমার কি সন্দেহ—" যূথিকা কী যেন বলতে চায়।

"আরে, না, না। ও রকম কিছু নয়।" জুলি তাড়াতাড়ি থামায়। "সৌম্যকে মুগ্ধ করতে পারে এমন অপ্সরা ভূভারতে নেই। থাকলে অনেকদিন আগেই ওর তপোভঙ্গ হতো। কিন্তু মিলি যে ওকে ভালোবাসে এটা তো নির্জলা সত্য। আমার কাছে অপ্রিয় সত্য। মিলি আর বিলেত ফিরে যেতে চায় না। ও কী বলে, শুনবে?" জুলি গলা খাটো করে।

"কী বলে? প্রাণেশ্বর? হৃদয়বল্লভ?" যূথিকা জুলিকে ক্ষ্যাপায়।

"দূর!" জুলি ক্ষেপে যায়। "সুকুমারদা নাকি স্বপ্নে বলে ওঠে, 'জুলি! জুলি!' তাও একদিন কি দু'দিন নয়। পাঁচবছরে পঁচিশ দিন। কোন্ বৌ এতটা সহ্য করবে? মিলি আমাকে খোঁটা দেয়। আমার নাকি ওকেই বিয়ে করা উচিত ছিল। তা হলে মিলি বিয়ে করতে পারত সৌম্যদাকে। আমি নাকি ওকে বঞ্চিত করেছি। আমার এমন রাগ হয়!"

"রাগ করতে নেই। এর একটা মোক্ষম দাওয়াই আছে।" যূথিকা হাসতে হাসতে বলে, "সুকুমার আবার যখন স্বপ্নে বলে উঠবে, 'জুলি! জুলি!' তখন মিলিও স্বপ্নে বলে উঠবে, 'সৌম্য! সৌম্য!' এমন সুরে বলবে যাতে ওর স্বপ্ন ছুটে যায়। ও স্পষ্ট শুনতে পায়। বুনো ওলের ওষুধ বাঘা তেঁতুল। দেখবে ও আর স্বপ্নে মিলির নাম মুখে আনবে না।"

"বাঃ! তোমার সবতাতেই ঠাট্টা। মিলিকে আমি বলতে যাব আমার বরের নাম মুখে ধরতে। স্বপ্নে মহড়া দিতে দিতে বাস্তবেও ধরবে। ও যদি আর বিলেতে ফিরে না যায় সুকুমারদা স্বপ্নে কার নাম বলে ওঠে তা আর শুনতে হবে না। সেপারেশন আপনি হয়ে যাবে। বেচারা সুকুমারদার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ও একজনকে হারিয়েছে। আরেকজনকেও হারালে ওর বুক ফেটে যাবে। মিলির উচিত ওর কাছে ফিরে যাওয়া।"

"কান টানলে মাথা আসে। মিলি ফিরে না গেলে সুকুমারও ফিরে আসে। চেষ্টা করলে চাকরি বাকরি এদেশেও মিলবে। শুনছি ইংরেজদের এদেশ থেকে মন উঠে গেছে। মানসের এক বন্ধুকে তাঁর ইংরেজ বন্ধু নাকি বলেছেন, বিশ্বাস করুন, এদেশে আমরা আর একদণ্ডও থাকতে চাইনে, কিন্তু থাকতে বাধ্য হচ্ছি। মাইনরিটিদের প্রতি আমাদের একটা বাধ্যবাধকতা আছে। আমার মনে হয় সুকুমারও এদেশে থেকে যাবে। সেপারেশন হবে না। তোমাকেও যতরকম আবোল তাবোল বকতে হবে না।" যূথিকা একটু কড়া হয়।

"আমি কিন্তু আমার মানুষটিকে একলা ছেড়ে দেব না।" জুলি আবার বলে।

"কক্ষনো ছেড়ে দিয়ো না। চোখে চোখে রেখো। আমি যা পনেরো বছর ধরে করে এসেছি। ছুঁচ যেখানে যাবে সুতো সেখানে যাবে। আশ্রম উঠে আসবে কেন? আশ্রম যেখানে আছে সেখানে থাকবে। সৌম্যদা ওখানে গিয়ে থাকবে। তুমিও আশ্রমের সংলগ্ন কুটিরে গিয়ে থাকবে। শিকড় না গাড়লে কোনো স্থায়ী কাজ হয় না। আমাদের দেখছ তো? কোথাও শিকড় গাড়বার জো নেই। প্রত্যেকটি জায়গায় নতুন করে শুরু করতে হয়। কাজের মাঝখানে বদলীর হুকুম। এই হলো সরকারী চাকরির অভিশাপ। এতে সব চেয়ে কষ্ট ছেলেমেয়েদের। ওরা ওদের সহপাঠী আর খেলার সাথীদের কাছ থেকে বার বার বিচ্ছিন্ন হয়। ছাড়াছাড়ির বেদনা ভুলতে পারে না। আর বাগান? বাগান করেছ কি বদলী হয়েছ। ইংরেজ অফিসার মহলে একটা পরিহাস আছে, বাগান শুরু করো, আর বদলী হয়ে যাও। কী যন্ত্রণা বলো দেখি? তোমাদের এ যন্ত্রণা পোহাতে হবে না। হ্যাঁ, তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে ওদের ওইখানেই মানুষ করবে। বেড়ালছানার মতো ঠাঁইবদল করবে না। এসব কথা মনে রেখো।' যূথিকা উপদেশ দেয়।

ওদিকে মানস বলছে সৌম্যকে, "তুমি যেমন নীতিগতভাবে শস্ত্রবিরোধী আমিও তেমনি শাস্ত্রবিরোধী। শাস্ত্রের দাপট সহ্য করতে না পেরে কত হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। হতে হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দাবী করছে পাকিস্তান। বাকী আছে যারা তারাও ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। 'এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে'। মার্কসবাদই এ যুগের ইসলাম।"

সৌম্য হেসে বলে, "মুসলমানদেরও শাস্ত্র আছে, তারও দাপট আছে। আর কমিউনিস্টদেরও কি শাস্ত্র নেই? তারও কি দাপট নেই? মানুষ এক শাস্ত্রের খর্পর থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেক শাস্ত্রের খর্পরে পড়েছে। আমরা গান্ধীশিষ্যরা নতুন কোনো শাস্ত্র প্রচার করিনে। পুরনো শাস্ত্রেরই নতুন ব্যাখ্যা দিই। এই যে হরিজন আন্দোলন চলেছে সেটাও নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে। ওরা অস্পৃশ্য নয়, কারণ ওরা হরিজন।

যেমন বৈষ্ণবজন। বৈষ্ণবজনের আবার জাত বিজাত কী? সমাজ মানুষকে নানা ভাগে বিভক্ত করে। ভগবান তা করেন না। ব্রহ্মার নামে শাস্ত্র যা চালিয়েছে তা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়ে থাকে তো ব্রাহ্মণদেরই বানানো। ব্রাহ্মণরা মাথাও নয়, ক্ষত্রিয়রা বাহুও নয়, বৈশ্যরা উরুও নয়, শূদ্ররা পা-ও নয় । তাতেও অস্পৃশ্যতার ব্যাখ্যা হয় না। পা থেকে যদি কায়স্থরা হয়ে থাকে,নবশাখরা হয়ে থাকে, কই,তারা তো কেউ অস্পৃশ্য নয়? অস্পৃশ্যরা তা হলে এল কোথা থেকে? যুদ্ধে পরাজয় বা সেইরকম কোনো দুর্বিপাক থেকে । দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রাও শ্বেতাঙ্গদের কাছে অস্পৃশ্য।"

"তোমরা শাস্ত্রকে বর্জন করবে না, সে সাহস তোমাদের নেই। শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা করবে না, সে সাহসও তোমাদের নেই । শাস্ত্রের বাক্য অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থ পরিবর্তন করবে, এই পর্যন্ত তোমাদের দৌড়। তোমরাও সনাতন হিন্দু, তবে সনাতন ঠিক পুরাতন নয়। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমিও চাইনে,তার সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে আমিও চাই, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা পুরনো এমারতের এখানে ওখানে একটুআধটু মেরামত করে বাইরের চুনকাম ফেরানো। হরিজন বা বৈষ্ণবজন তো সকলেই, তুমিও, আমিও। ভগবান যদি মানি তো আমরা সবাই ভগবানের লোক। তা হলে শুধু ওই কয়েকটি জাতের মানুষকে হরিজন বলে চিহ্নিত করা কেন? বর্ণগর্বিতরা একভাবে যাদের চিহ্নিত করছে তোমরাও তাদের অন্যভাবে চিহ্নিত করছ শুধু নামটা আরো মোলায়েম শোনাচ্ছে। পেশা যেমনকে তেমন থাকবে, স্টেটাস যেমনকে তেমন থাকবে, শুধু ছোঁওয়াছুঁইর বালাই থাকবে না। চণ্ডাল ব্রাহ্মণের পা ছুঁতে পারবে।" মানস ঠেস দিয়ে বলে।

"সেবাগ্রামের আশ্রমে তো আজকাল ব্রাহ্মণীর সঙ্গে হরিজনের বিবাহও দেওয়া হচ্ছে। বিবাহের পর হরিজন ব্রাহ্মণীর পা ছুঁতেও পারবে। এটা কি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়?" সৌম্য জিজ্ঞাসা করে।

"কিন্তু ব্রাহ্মণ হরিজন ভেদ তো গেল না।" মানস উত্তর দেয়।

"যাবে। বাপুর আদর্শ কাস্টলেস সোসাইটি । জাতিভেদশূন্য সমাজ। সেই আদর্শের দিকেই তিনি ধীরে ধীরে চলেছেন। এত ধীরে যে তোমরা টের পাচ্ছ না। এটাও একপ্রকার সমাজবিপ্লব। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের অনুমোদন আছে। প্রতিলোমের নেই। তবে দুটো একটা নজির পাওয়া যায়। আমরা প্রতিলোমটাকে জলচল করে দিচ্ছি। অনুলোমেও উৎসাহ দিচ্ছি। তুমি কি মনে কর মনুসংহিতাকে প্রকাশ্যে খারিজ করলে ফল এর চেয়ে ভালো হবে? না সবাইকে ব্রাহ্মদীক্ষা দিতে হবে?" সৌম্য চেপে ধরে।

"আরে, না, না। ব্রাহ্মদীক্ষা আমিও নিইনি। আমরা কেউ কারো ধর্মবিশ্বাস বদলাইনি বা ছাড়িনি। কিন্তু আমরাও জানিনে ছেলেমেয়েরা কী বলে পরিচয় দেবে। শুধুমাত্র হিন্দু, না কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ। এর চেয়ে ব্রাহ্ম অনেক সোজা। ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহের সন্তানদের বেলা পরিচয় দেওয়া আরো শক্ত হবে। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বোষ্টম বলে একটি জাতের প্রবর্তন হয়েছে। ধর্ম সম্প্রদায় থেকে জাত। গান্ধীজীও হয়তো তেমনি একটি জাত প্রবর্তন করে যাচ্ছেন না তো?" মানস সংশয়ান্বিত।

"না, না। নতুন একটা জাত তাঁর অভিপ্রেত নয়। বিয়ে যারা করছে তারা কেউ কারো জাতের পরিচয় দিচ্ছে না। তাদের সন্তানরাও দেবে না। তারা হিন্দু, তারা ভারতীয়। তারা মানুষ । এ ভাবেও পরিচয় দেওয়া যায়। মুসলমান বা খ্রীস্টানদের তো তার চেয়ে বেশী কিছু বলতে হয় না। হরিজনদেরও আমরা শেখাব হরিজন বলে পরিচয় না দিতে। নয়তো একটা হীনম্মন্যতা থেকে যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পেশা বদল করা সহজ নয়। মুসলমান হয়েও, খ্রীস্টান হয়েও যারা পেশা বদল করেনি তারা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও তাঁতীরা মোমিন নাম নিয়েছে। জেলেরা ধাওয়া বলে পরিচয় দেয়। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ খ্রীস্টান ও অব্রাহ্মণ খ্রীস্টানে দুস্তর ভেদ। সকলের এক পেশা সম্ভব নয়।

আমরা চিন্তিত।" সৌম্য স্বীকার করে।

ওদিকে যূথিকা বলছে জুলিকে, "আশ্রমের জীবন যে রসকষ বর্জিত হবে এমন কী কথা আছে। কই,রবীন্দ্রনাথের আশ্রম তো তেমন নয়। পণ্ডিচেরীতে দিলীপকুমার তো গানের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তুমিও গাইবে, বাজাবে। বোলপুরে আজকাল গ্রামোফোনের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে। চল, তোমাকে একসেট নৃত্যনাট্যের রেকর্ড কিনে দিই। আমার উপহার।"

জুলিকে ইতিমধ্যে শাড়ী উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাই সে রেকর্ড নিতে কুণ্ঠা বোধ করে। যূথিকা ওর আপত্তি কানে তোলে না। ওকে বোলপুরে নিয়ে যায়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'তাসের দেশ', ও 'চণ্ডালিকা' এই ক'টার সেট মজুত ছিল। আরো কয়েকখানা খুচরো রেকর্ডও জুলির জন্যে কেনা হয়। নিজের জন্যেও খান কতক। জুলি টাকা বার করতে গেলে যূথিকা ওর হাত চেপে ধরে। হেসে বলে, "মণির বিয়ের সময় দিয়ো।"

"খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। মণির জন্যেও দু' একখানা রেকর্ড কিনতে হবে।" জুলি খুঁজে বার করে রবীন্দ্রনাথের ও কাজী নজরুলের দু'খানা রেকর্ড। তার একখানা দীপকের জন্যে, একখানা মণিকার জন্যে।

"কাজী নজরুলের রেকর্ড তুমি নিজের জন্যেও কিনতে পারতে, জুলি। তোমার আশ্রমে মুসলমানদের আকর্ষণ করতে হলে নজরুল গীতিকার মতো আর কী আছে? আব্বাসউদ্দীন? হ্যাঁ, আব্বাসউদ্দীনেরও খানকয়েক রেকর্ড নিয়ে যেয়ো।" যূথিকা পরামর্শ দেয়। জুলি বেছে বেছে কেনে।

কেনাকাটা সেরে ওরা যখন ফেরে তখন মানস বলে,"কোথায় হারিয়ে গেছলে তোমরা? আমরা তো দিশেহারা।"

"জুলির আশ্রমবাসকে সরস করার জন্যে রেকর্ডের সন্ধানে অভিযান। নইলে আশ্রমে ওর মন টিকবে না। সৌম্যদা কি ওকে বেঁধে রাখতে পারবে? নিজে তো শুকনো কাঠ। কঠোপনিষদ্ আওড়াবে।" যূথিকা তার ও জুলির কেনা রেকর্ডগুলো দেখায়।

"এর পরে জুলি চাইবে নাচের রেকর্ড। দেশী নাচের রেকর্ড হয় না। বিলিতী কিনতে হবে। সেকেলে ওয়াল্টজ না একেলে জ্যাজ? বিলিতী নাচ তো পার্টনার না হলে হয় না। পার্টনার হবে কে?" সৌম্য সকৌতুকে সুধায়।

"কেন? তুমি হবে না?" যূথিকা সৌম্যকে খোঁচায়।

"আমি! আমি ওর লাইফ পার্টনার হয়েছি, ডান্স পার্টনার হইনি। এ বয়সে আর মানাবে না, বোন।" সৌম্য আফসোস জানায়।

"তোমার ওই নকল দাড়িগোঁফ খুলে ফেললে দিব্যি মানাবে। তোমার বয়সও দশ বছর কমে যাবে" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"সৌম্যদা, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। ঘুম থেকে জেগে একদিন আবিষ্কার করবে যে তোমার গোঁফ দাড়ি নির্মূল। জানো তো, জুলি অহিংসা মানে না। অসি ধারণের তার আপত্তি নেই। কাঁচি ধারণ বা ক্ষুর ধারণ তো তার কাছে ছেলেখেলা।" মানস ভয় দেখায়।

"তুমি তো আমাকে বিলেতে দেখেছ। তখন কি আমার গোঁফ দাড়ি ছিল? যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে মিশতে হলে এ ছাড়া আর কী উপায় আছে? যেখানে জনগণ বলতে বোঝায় সাধারণত মুসলমান সেখানে তাদের জাগাতে হলে নান্যঃ পন্থাঃ।" সৌম্যর চোখে হাসি।

জুলি এতক্ষণ চুপটি করে শুনছিল। এবার ফিক করে হেসে বলে, "আমার ছেলেবেলায় বেলুচিস্তানে অমন অনেক মুসলমান দেখেছি। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি কেবল মুসলমানই আছে? হিন্দুও নেই?"

"ওটাই তো আজকের দিনের সব চেয়ে বড়ো ধাঁধা। বাংলাদেশটাকে যারা বেলুচিস্তানের সঙ্গে জুড়তে চায় তারা কি জানে না যে এখানে হিন্দুও বাস করে? তা হলে কেন বলে পাকিস্তান?" মানস আশ্চর্য হয়।

"দ্যাখ, সৌম্যদা", যূথিকা যোগ দেয়, "মুসলমানকে বাঙালী বানিয়েছে যে দেশ তাকেই ওরা বানাতে চাইছে দ্বিতীয় এক বেলুচিস্তান। এর পরে ওরা ভাত ছেড়ে লুচি ধরবে।"

"না, না, লুচি নয়। ওই যে বলেছে বেলুচি। ছেলেবেলায় ওখানে তোমরা কী খেতে, জুলি?" মানস জেরা করে।

"অত কি আমার মনে আছে? নান রুটি বোধ হয়। ভাত খেয়েছি কি-না মনে পড়ে না। বাবা যখন বাংলাদেশে বদলী হয়ে আসেন তখন সাহেবিয়ানা ছেড়ে বাঙালিয়ানা ধরেন। তবে ভাত খুব বেশী খেতেন না। একবেলা কয়েক চামচ। রাত্রে চাপাটি। আশ্রমে সেই অভ্যাস বজায় রাখব। সৌম্যও আমাকে আপ রুটি খানায় স্বাধীনতা দিয়েছে। আমিও ওকে খানাপিনার স্বাধীনতা দিয়েছি। ওর দাড়ি গোঁফও আমার চক্ষুশূল নয়। কেনই বা হবে? রবীন্দ্রনাথেরও তো দাড়ি গোঁফ ছিল। না থাকলে কি ঋষির মতো দেখাত? আমার কাছে সৌম্য একজন ঋষি কি মুনি। মুসলমানদের কাছে যদি পীর কি ফকির হয় তবে মন্দ কী?" জুলি সগর্বে বলে।

সৌম্যই এ বিতর্ক মিটিয়ে দেয়। "পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও আমি দাড়ি রাখতুম। কারণ দেশী ক্ষুরকে আমি ভয় করি। দাড়ি কামাতে বললে হয়তো ছাল উপড়ে নেবে। আর বিলিতী ক্ষুর তো আমরা বয়কট করেছি। নিরাপদ স্বদেশী ক্ষুর যেদিন বাজারে বেরোবে সেদিন আমি গোঁফ দাড়ি মুড়িয়ে মানসের মতো চিরতরুণ হব।"

যূথিকা ওটাকে গায়ে পেতে নিয়ে বলে, "ঋষিবাক্য কি সত্য না হয়ে যায়? দশবছর বাদে মানসকে দেখে লোকে ভাববে তরুণ আর আমাকে দেখে তরুণস্য বৃদ্ধা ভার্যা। আর নিরাপদ স্বদেশী ক্ষুর যদি তখনো না বেরোয় তবে সৌম্যদাকে দেখে লোকে ভাববে বৃদ্ধ আর জুলি যদি নৃত্য গীতের অনুশীলন করে তবে তাকে দেখে বলবে বৃদ্ধস্য-তরুণী ভার্যা।"

জুলি তার গালে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চুমো খায়। "এ মেয়েটা এত মিথ্যে বকতে পারে। দশবছর বাদেও আমি থাকব তরুণী! আমার খুকু ততদিনে মণির মতো বড়ো হয়ে থাকবে।"

মণি কোথায় ছিল, ছুটে এসে বলে, "মা, বাড়ী চল। রেকর্ড বাজিয়ে শুনব।" সারাদিন হৈ চৈ করে ক্লান্ত।

"হ্যাঁ, এইবার বিদায় নিতে ও দিতে হবে, জুলি আর সৌম্যদা। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! তবে বেলুচিস্তানে আমরা আর কোনোদিন যাচ্ছিনে। মানে পূর্ববঙ্গে। দিল্লীতে পড়াশুনা করে উর্দু যেটুকু শিখেছিলুম বাংলাদেশে বাস করে সব বিলকুল ভুলে গেছি। আবার নতুন করে শিখতে এ বুড়ো বয়সে তকলিফ হবে।" যূথিকা ভারাক্রান্ত স্বরে বলে।

গুরুদেবের খাতিরে শান্তিনিকেতনের উপরে মানস ও যূথিকার একটা মায়া ছিল। অবসর নিয়ে সেখানে এসে শিকড় গাড়বার আশায় এক টুকরো জমি কিনে রেখেছিল। সেটা এক বন্ধুপুত্রের নির্বন্ধে। সে বেচারি অকালে মারা যায়, অন্য দিক থেকেও বাধা আসে। তাই ওরা আপাতত ওমুখো হতে চায় না।

জুলি বলে, "কই, তোমাদের কোথায় কী আছে দেখাতে নিয়ে গেলে না যে? কে জানে আমরাও হয়তো একদিন বেলুচিস্তান থেকে এসে জুটব। কিনতে চাইব তোমাদের কাছাকাছি এক রত্তি জমি।"

হিরণ্যদাকে খবর দিতেই তিনি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। "আরে, আপনারা! আসছেন শুনলে আমি আপনাদের জন্যে রতন কুঠিতে ব্যবস্থা করতুম। উঠেছেন কোথায়? থাকা হবে কদ্দিন? একদিন এখানে শাকান্ন ভোজন করতে আপত্তি আছে?"

"না, হিরণ্যদা। সেটা সম্ভব হবে না। এঁরা আমাদের বন্ধু ও বান্ধবী। সৌম্য ও মঞ্জু চৌধুরী। সম্প্রতি বিয়ে করে এখানে মধুমাস কাটাতে এসেছেন। কিন্তু একমাস থাকবেন না, এঁদের নিজেদের আশ্রমে ফিরে যাবেন। সে আশ্রম চলে গান্ধীজীর ধারায়। সেটাকে গুরুদেবের আশ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় কি-না এঁরা ভেবে দেখছেন। অনেকদিন সাক্ষাৎ হয়নি, তাই আমরাও এসেছি এঁদের সঙ্গে একটা দিন কাটাতে। সৌম্যদার গান্ধীবাদী বন্ধু সুধীর নন্দীর দোতালাটা খালি পড়ে আছে। সেখানেই এঁরা উঠেছেন। আহারাদি যখন যেখানে সুবিধে। আর আমরা তো সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে যাব। দুপুরের টিফিন সঙ্গে করে এনেছিলুম। আপনাকে খবর দিলে আপনারা সাড়ম্বরে ভুরিভোজন করাতেন। তার চেয়ে বড়ো কথা আপনার অফিস কামাই হতো। রবিবার আমার ছুটি, আপনার তা নয়।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"ছি ছি! আপনি আমাকে এত পর ভাবেন, মানসবাবু। আমার ছেলেমেয়েরা যে আপনাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। চলুন, ভিতরে চলুন। যূথিকা দেবী, আপনিই আগে। আর আপনারা, সৌম্যবাবু ও মঞ্জু দেবী, আপনারা যে কারা তা আমার জানতে বাকী নেই। এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। ছাত্ররা টের পেলে আপনাদের রক্ষা নেই। ধরে নিয়ে গিয়ে সম্বর্ধনা দেবে। গভর্নমেণ্টকে ওরা ভয় করে না। কর্তাদেরও না। গান্ধীজী কিছুদিন পরে এখানে আসছেন, জানেন নিশ্চয়।"

"আমি তো ওটা গোপনই রেখেছিলুম। আপনি কী করে জানলেন?" সৌম্য অবাক হয়। জুলিও।

"সেবাগ্রামে সোনা থাকে না? আমি যে ওর একটি দাদা। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।" হিরণ্যবাবু বলেন।

জমি দেখা ছেড়ে গল্পস্বল্পেই সময় কেটে যায়। হিরণ্যবাবু একটি গল্পের ঝুড়ি। যেমন গুরুদেব সম্বন্ধে তেমনি গান্ধীজী সম্বন্ধে তিনি না জানেন এমন কাহিনী নেই। সুভাষচন্দ্রের কাছে গান্ধীজীর টেলিগ্রাম শান্তিনিকেতনে যখন পৌঁছয় তিনি ছিলেন সুভাষের সঙ্গে। সুভাষ কী উত্তর দেন তাও তিনি দেখেছিলেন। টেলিগ্রামেই উত্তর।

চা জলখাবার না রীতিমতো নৈশভোজ? বিরজা দেবীর স্বপাক।

"কাকিমা", নোটন জানতে চায় "আপনারা কবে বাড়ী করছেন?"

"তোমার কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করো।" যূথিকা উত্তর দেয়।

মানস বলে, "এই জেলায় আমার দেড় বছর হয়েছে। আরো দেড় বছর তো এ জেলায় আছি। এর মধ্যে মনঃস্থির করলে চলবে। ভাবছি বদলীর হুকুম পেলে আর কোথাও যাব না, পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। অকালে অবসরের দরখাস্ত করে দেব। শুনছি আনুপাতিক পেনসন মিলবে। ইউরোপীয়ানরা যদি ক্ষতিপূরণ পায় আমরাই বা পাব না কেন? অবশ্য যদি ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। ক্ষতিপূরণ না পেলে প্রোভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় বাড়ী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। না, আমার যে অন্য কোনো সঞ্চয় নেই। গোটা কতক লাইফ ইনশিওরান্স পলিসি বাদে। সেগুলোর ম্যাচিয়োর হতে অনেক দেরি।"

"দিল্লী দূর অস্ত্।" মন্তব্য করেন হিরণ্যদা।

"তার মানে কী হলো,বাবা।" নোটন ভেবে পায় না।

"কংগ্রেস কবে দিল্লী পৌঁছবে,ইংরেজ কবে দিল্লী ছেড়ে যাবে, আই.সি. এস. অফিসারদের ভাগ্যে কবে ক্ষতিপূরণের শিকে ছিঁড়বে, তারপর বাড়ী তৈরি হবে। ইতিমধ্যে নির্মাণের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।" হিরণ্যদা দুঃখিত।

মুখফোড় বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। কিন্তু কথাটা তো সত্যি।

এমনি করে রাজনীতি এসে পড়ে। সৌম্য বলে, "গান্ধীজীর মনোভাব যতটুকু জানি তিনি শর্তাধীন স্বাধীনতা গ্রহণ করবেন না। তোমাদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো একটা শর্ত। এদেশের গরিব

করদাতারা তোমাদের হাতীর খোরাক জোগাবে কেন? সেটা যদি জোগাতে হয় ওদেশের করদাতারাই জোগাবে। কংগ্রেস যদি গান্ধীজীর কথা শোনে দিল্লী থেকে দূরেই থাকবে। যতদিন না ইংরেজ বিনা শর্তে স্বাধীনতা দিতে উদ্যোগী হয়। উদ্যোগটা ওদেরই গরজ। ওদেরই তো দায়িত্ব। শুধু যে নির্মাণের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাই নয়, সব কিছুর খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর দরুন আপনি ঘটবে এক বিস্ফোরণ। একটা মিউটিনি কি জেনারেল স্ট্রাইক।"

জুলি খেতে খেতে বলে, "একটা রেভোলিউশন।"

হিরণ্যদা টিপ্পনী কাটেন, "তার পরের দিন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা।"

জুলির মুখে কথা জোগায় না। সৌম্যও মূক। মানস বলে, "ওয়ার অভ্ সাকসেসন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব।"

বিদায়কালে জুলি একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে। "হিরণ্যবাবু, বললেন না তো সেই দুটি টেলিগ্রামের বয়ান কী ছিল।"

হিরণ্যবাবু স্মরণ করে বলেন," মহাত্মার টেলিগ্রামের মর্ম ছিল, সুভাষ, তুমি কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্যে নির্বাচনে দাঁড়িয়ো না। আর সুভাষবাবুর টেলিগ্রামের মর্ম ছিল,মহাত্মাজী,আশীর্বাদ করুন আমি যেন নির্বাচনে জয়ী হই। এসব হলো ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকের কথা।"

পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কার কী লাভ। জুলি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সৌম্য তাকে থামিয়ে দেয়। মোটরে করে ওদের নন্দীদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে মানস সপরিবারে স্বস্থানে ফিরে যায়। পথে যেতে যেতে মণি সুধায়, "মাসিমা কেমন করে জ্যাঠাইমা হলেন।" আর দীপক জবাব দেয় "জ্যাঠামশায়েরই মেসোমশায় হওয়া উচিত ছিল।"

।। নয় ।।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। একমাস যেতে না যেতে সরকারী চিঠি আসে। বদলীর হুকুম। আবার পূর্ববঙ্গে। বার্লোর পদোন্নতি হয়েছে। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। মানস যেন পত্রপাঠ তাঁকে রিলিভ করে।

"আবার পূর্ববঙ্গে।" যূথিকার মাথায় বাজ পড়ে। "আবার সেই জেলায়। সৌম্যদা আর জুলি যেখানে।" মুখে হাসির আমেজ।

"না, এবার ওর চেয়ে বড়ো জেলা। ওর চেয়ে বড়ো পদ। ওর চেয়ে বেশী দায়িত্ব। খুব সীনিয়র না হলে কাউকে ওখানে পাঠানো হয় না। বোধহয় লোকের অভাব, তা না হলে আমাকে পাঠানো হতো না। ইংরেজরা এখন একে একে সরে যাচ্ছে।" মানসের আন্দাজ।

"কিন্তু তুমি যে বলছিলে এখান থেকে বদলী করলে অবসরের দরখাস্ত করবে।" যূথিকা মনে করিয়ে দেয়।

"কিন্তু এখন নয়, আরো দেড় বছর কি দু'বছর বাদে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এখন শিকেয় ঝুলে রয়েছে। ইউরোপীয়ানরা না পেলে তো আমরা পেতে পারিনে। ওরা পেলে আমাদের একটা ক্লেম হয়,তবে সে ক্লেম গ্রাহ্য হবে কি না কে বলতে পারে। জিন্না সাহেব বাগড়া না দিলে এতদিনে কিন্তু দিল্লীতে বড়লাটের শাসন পরিষদের আমূল পরিবর্তন হতো। এবার তাতে একজনও ইংরেজ থাকতেন না। ডিফেন্সও হস্তান্তরিত হতো। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটারও একটা কিনারা হতো। আমি তো অসময়ে আঁধারে ঝাঁপ দিতে পারিনে। যারা দু'তিন বছর অপেক্ষা করবে তারা ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমি আগে ভাগে গেছি বলে পাব না, এমন কী তাড়া আছে আমার?" মানস খুঁজে পায় না।

"তা হলে তুমি আবার পদ্মা পার হচ্ছ?" যূথিকা খুশি নয়।

"তুমি যদি পদ্মা পার হতে না চাও তোমাকে এ পারেই রেখে যাব। এবার কিন্তু আমাকে তিন বছরের আগে বদলী করবে না। যদি না ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে যায়।" মানস অতটা নিশ্চিত নয়।

"পাগল। তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দিতে পারি? তুমি যেখানে আমি সেখানে। ছুঁচ আর সুতো।" যূথিকা ছায়ার মতো অনুগতা।

ভাবনা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে। কিন্তু সরকারী চাকরির দাবী যে তাদের দাবীর চেয়ে বড়ো। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা তাদের ছেলেমেয়েদের দার্জিলিং-এর মিশনারি স্কুলে পাঠায়। কিংবা কলকাতায় হস্টেলে রেখে পড়ায়। মানস ও যূথিকা তাদের সন্তানদের কাছে রাখতে চায়। যতদিন না তাদের কলেজে যাবার বয়স হয়।

গভর্নমেণ্টকে লিখে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে নেয় মানস। এরই মধ্যে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁকে অল্প কথায় বোঝায় যে মন্বন্তরের জন্যে প্রধানত দায়ী কলকাতার ক্ষুধা ও ক্রয়শক্তি । তিনি বলেন আরো কেউ কেউ একথা তাঁকে জানিয়েছে। তিনি আরো খুঁটিনাটি জানতে চান, মানস যদি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করে তা হলে তিনি আরো সময় দিতে পারবেন।

কলকাতা মানসের পথে পড়ে। গান্ধীজীর একান্ত সচিব প্যারেলালের সঙ্গে কথা বলে দিন স্থির হলো, কিন্তু ক্ষণ স্থির হলো না। কলকাতায় গিয়ে টেলিফোনে জানা গেল ক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে গান্ধীজীর প্রাতর্ভ্রমণের সময়। বালীগঞ্জ থেকে সোদপুরে গিয়ে শীতকালের ভোর ছ'টার সময় তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে — মানে, ছুটতে ছুটতে— অর্থনীতি আলোচনা করা মানসের পক্ষে অসম্ভম হতো না, কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল যূথিকাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। তাই আবার টেলিফোন করে অন্যসময় চায় কিন্তু রাজকুমারী অমৃত কওর বলেন, অসম্ভব। কাজেই মানসও অক্ষমতা প্রকাশ করে।

বর্ধন থাকলে মানস সপরিবারে তারই অতিথি হতো। অগত্যা স্বপনদার উপর আতিথেয়তা চাপাতে হয়। তিনি বলেন, "জায়গার টানাটানি নেই। তোমরা দু'খানা ঘর নিতে পারো। কিন্তু কলকাতায় রেশনিং হবার পর থেকে আমরা মহা মুশকিলে পড়েছি। রেশনে যেটুকু দেয় সেটুকুতে আমাদেরই কুলোয় না। বাধ্য হয়ে চোরাবাজারে কিনতে হয়। আমরা কি চোর। ন্যায্য দাম দিয়ে বরাবর কিনেছি, এখনো পারি। কিন্তু সরকার থেকে দর যেমন বেঁধে দিয়েছে পরিমাণও তেমনি বেঁধে দিয়েছে। এখন যার দরকার সে পায় না, যার দরকার নেই সে পায়। তারপর সে কালোবাজারে বেচে। কী করব । বাধ্য হয়ে কিনি।"

মানস বেশ অস্বস্তি বোধ করে। বলে,"আমরা রাতের বেলা ভাত খাইনে। দিনের বেলা খুব কম খাই। তার জন্যে তোমাকে চোরাবাজারে চাল কিনতে হবে না। আমরা রেস্টরাণ্টে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসব।"

দীপিকাদি স্বপনদার উপর চটে যান। বলেন, "এটা তোমার এলাকা নয়, আমার এলাকা। আমিই এ বাড়ীর গৃহিণী। আমি অতিথি অভ্যাগতের জন্যে রোজ একটু একটু করে যথেষ্ট চাল জমিয়েছি। দুপুরে সবাইকে ভাত পরিবেশন করা হবে। চাইলে রাত্রেও। কালোবাজারে কিনতে হবে না। তবে বাড়ীতে পার্টি থাকলে অন্য কথা।"

"পার্টি তো দিতেই হবে। যূথিকার খাতিরে। যূথিকা এই প্রথম আমাদের বিয়ের পর এল। একটা ভোজ তো ওর পাওনা। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সৌম্যও কলকাতায় এসেছে। ওর সঙ্গে ওর বৌ ক্যারামেলও। ওদিকে ওদের বান্ধবী মধুমালতী ও তার স্বামী সুকুমার দত্তবিশ্বাসও কলকাতায় উপস্থিত। এদের সবাইকে ডাকলে চকোলেটকেও ডাকতে হয়। ওর কমরেড চানুই বা বাদ যায় কেন? কী বলো,

রানু? টেবিলে ধরবে তো? নয়তো বুফে ডিনার।" স্বপনদার প্রস্তাব।

দীপিকাদি সম্মত। "বুফেই আরো ভালো। ওটাই আজকাল চলতি। যে যার পছন্দমতো খাবার তুলে নিয়ে যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে। ঘুরে ঘুরে খেতে পারে। বসে বসে খেতে চায় তো সেটাও চলবে, তবে বিনা টেবিলে। যুদ্ধের দৌলতে এসব পার্টি ইনফরমাল হয়েছে। পোশাকের দিক থেকেও তাই। একটার পর একটা যুদ্ধ এসে একটার পর একটা কনভেনশন ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে।"

স্বপনদা ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, "এদিকে খোরাকের রেশনিং পোশাকের রেশনিং হয়েছে। বিলেতে আজকাল ওয়েস্টকোট কেউ পরে না। কোর্টই বা পরতে পায় ক'জন? এটা বুশ শার্টের যুগ। অভাবে স্বভাব নষ্ট। নইলে ইংরেজদের মতো ফর্মাল কে? পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে গিয়েও ওরা একা একা ডিনার জ্যাকেট পরে খাবে। খাবে নয়, খেত।"

যূথিকা সবিনয়ে নিবেদন করে, "দেখুন, দিদি, আমার খাতিরে এত বড়ো আয়োজন করতে হবে না। আমি অপ্রতিভ হব। আপনার যেমন একটা নিজস্ব পরিচয় আছে আমার তেমন কিছু নেই। আপনি একজন বিদুষী ও অধ্যাপিকা। আমি বি. এ. পাসও করিনি। স্বামীর পরিচয়েই আমার পরিচয় কিন্তু তিনিও তো আর চাকরি করতে চান না। শুধু লেখা নিয়ে থাকতে চান। এদেশে লেখকের সম্মান কোথায়? লেখকের স্ত্রীর তো দূরের কথা। আমি যদি নিজে একটা কিছু করতে পারতুম। আমি কি একটি ব্যক্তি নই? আমার কি ব্যক্তিসত্তা নেই? আমিও কি যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করতে পারিনে? অফিসার শ্রেণীর মহিলারা স্বামীদের মর্যাদার ধার করা আলোকে আলোকিত। আমিও সেইরকম একজন। একজন কেরানীর স্ত্রীও আমার চেয়ে সুযোগ্য। অথচ আমার সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু তলে তলে এমন ঈর্ষাদ্বেষ যে সুযোগ্যদের সহযোগিতা পাইনে। যারা আসে তারা একটা না একটা ফেভার চাইতে আসে। সব রকম বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কিছু না কিছু কাজ করতে পারা যায়, যাতে পাঁচজনের উপকার হয়, কিন্তু বদলীর জ্বালায় কাজ আধখানা হয়ে পড়ে থাকে। জজের কাজ জজের পদাধিকারী চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু জজ গৃহিণীর কাজ পরবর্তী জজগৃহিণীর দ্বারা হবার নয়। এত খারাপ লাগে হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ফেলে আসতে! আমার পিয়ানো বাজানোর শখ ছিল। বিয়ের পর ক্রমাগত বদলী হতে হতে সে শখেও জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। টিউন নষ্ট হয়ে যায়, টিউনার পাওয়া যায় না।"

"সত্যি! এর মতো দুঃখের কথা আর নেই। কত বড়ো একটা বিদ্যা যন্ত্রসঙ্গীত। আমার তো সে বিদ্যা নেই। যার আছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা, ভাই, আপনারা কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন না কেন? এখানে টিউনার পাওয়া যায়। নির্বিঘ্নে বাজাতে পারবেন।" দীপিকাদি সহানুভূতি জানান।

"কলকাতায় বদলী!" যূথিকা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "কলকাতা চাইলে চাটগাঁয় পাঠায় অন্তত আমাদের অভিজ্ঞতা তাই। 'কলকাতা', 'কলকাতা' করে সবাই পাগল। আমরা কিন্তু মফস্বলেই ভালো থাকি। বড়ো বড়ো বাড়ী, বিশাল হাতা, চারদিকে খোলা মেলা জায়গা! বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে সুখ আছে। এখানে তো দম বন্ধ হয়ে আসে।"

দীপক আর মণিকা এল্ফকে নিয়ে জমে গেছে। এতদিন পরে সেও দু'জন গুণগ্রাহী পেয়ে খোশ মেজাজে রকমারি খেলা দেখাচ্ছে। মুখে করে নিয়ে আসছে একটার পর একটা জিনিস। জুতো, ছাতা, ঝাঁটা, পেয়ালা, পিরিচ, চামচ। বই, খাতা, পেনসিল, কলম। স্বপনদা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে আসেন। এল্ফ খাটের তলায় আশ্রয় নেয়। সেখানে একখানা পুরনো হাড় লুকনো ছিল। সেখানা চিবোয়। তাতে দীপকের তীব্র আপত্তি।

"এল্ফ কোন্ জাতের কুকুর, জ্যাঠাইমা?" সে দীপিকাদিকে সুধায়।

"পমেরানিয়ান। পমেরানিয়া এখন রাশিয়ার অধীনে চলে গেছে। বেচারি এল্ফ বোধহয় সেইজন্যে

আজকাল বিমর্ষ।" দীপিকাদি বলেন।

"তা নয়।" স্বপনদা হাসেন। "ওর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, আমরা ওর জুড়ি খুঁজে পাচ্ছিনে। ও এখন আমার বই খাতা লুটপাট করে বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। দেখি, ওর বৌ যদি কোথাও মেলে।"

ব্ল্যাক আউট উঠে গেছে। কলকাতা এখন আবার আলো ঝলমল। স্বপনদার বাড়ীর জানালাগুলো থেকে কালো পর্দা সরানো হয়েছে,কিন্তু শার্সির কালো রং এখনো মুছে যায়নি। জানালা খোলা রেখে মানস রাস্তার দৃশ্য দেখছিল। স্বপনদা তার পাশে আসন নিয়ে বলেন, " তোমার সঙ্গে কতকাল কথাবার্তা হয়নি। তুমি আজকাল কী লিখছ? কই, কোথাও তো তেমন চোখে পড়ে না।"

"চিত্রকলায় যামিনী রায় যা করছেন সাহিত্যে আমিও সেইরকম কিছু করতে চেষ্টা করছি । রস আছে মাটির ভিতরে। পীপলের অন্তরে। পীপলের সঙ্গে একাত্ম না হলে রসে অনুমগন হতে পারা যাবে না। বিদগ্ধ সাহিত্য তো ঢের হয়েছে। আর কেন?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"যামিনীদার ছবি আমারও ভালো লাগে। কিন্তু তাতে বিংশ শতাব্দীকে পাইনে। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমারও তো একটা অন্তর আছে। সে অন্তরও তো নীরস নয়। আমাকে বাদ দিয়ে পীপল নয়। পীপলের তেমন ব্যাখ্যা সাহিত্যকে একদিন বন্ধ্যা করবে। যেমন করেছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। এর নাটের গুরু অবশ্য টলস্টয়। ফোক আর্ট নিশ্চয়ই ভালো আর্ট । কিন্তু বড়ো আর্ট নয়। পরে আমাদের দেশেও একটা ক্লাসিকাল সাহিত্য ছিল, সেটা সংস্কৃত ভাষায় রচিত । আমাদের দেশের ঘড়ির কাঁটা বহু শতাব্দী ধরে বন্ধ ছিল। ইউরোপের ঘড়ির কাঁটা বন্ধ ছিল না। তাই ওদেশের ঘড়ির সঙ্গে এদেশের ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়েছে। অনেকটা মিলেও গেছে। আমাদের কর্তব্য ওদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টি করা। লোকসাহিত্য তোমার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু নিয়ামক নয়। যামিনীদাকে এ তত্ত্ব বোঝানো যাবে না। তাঁর স্থানজ্ঞান টনটনে, কালজ্ঞান তেমন নয়। অমন করলে ঘড়ির কাঁটা আবার বন্ধ হবে ।" স্বপনদা সাবধান করে দেন।

মানসের দৃষ্টি জনগণের উপরে। মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না, তাকে ক্ষুধার অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সুধা জোগাতে হবে। নয়তো সে সুরা পান করবে। সুধা কী? যা তার হৃদয়কে স্পন্দিত করে। হৃদয়ের লক্ষ্য ভেদ করে। হৃদয়ে বিঁধে থাকে। সে ভুলতে পারে না। এই যেমন ছড়া, ব্যালাড, রূপকথা, উপকথা। কালের ছাপ তার উপর পড়ে না, তা নয়। কিন্তু সে কালজয়ী। টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা'র অনেকগুলি যেমন।

"কিন্তু পরেও তো তিনি আরো লিখেছিলেন।" স্বপনদা বলেন। "নিজের তত্ত্ব নিজে অনুসরণ করেছিলেন কি? করেননি, কারণ 'রেজারেকশন' ওভাবে লেখা যেত না। ওই ধরনের উপন্যাস রূপকথা বা উপকথা মার্গীয় নয়। ওটাও একটা বলবার মতো কাহিনী । জরুরি। না বললে নয়। যা একমাত্র টলস্টয়ই বলতে পারতেন। জনগণ আজ বুঝতে না পারে কাল বুঝবে। কোনো সৃষ্টিই রসিকের জন্যে অপেক্ষা করে না। রসিক পরে আসে, আবিষ্কার করে, উপভোগ করে। গরম গরম লুচি ভেজে পাতে দিলে পেট ভরে, কিন্তু প্রাণ ভরে না। পীপলকে নিয়ে পপুলার বই কি কম লেখা হচ্ছে? টলস্টয়কে বা রবীন্দ্রনাথকে সে কাজ করতে হবে কেন? তাঁরা লিখবেন 'গোরা'। তুমিও কি তেমনি কোনো বিরাট বিষয়, মহৎ বিষয়, খুঁজে পাচ্ছ না? ওসব চুটকি লিখে যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করছ ভজন কীর্তনই তারা ভালো বোঝে । তুলসীদাস তার চূড়ান্ত করেছেন। চণ্ডিদাসও।"

মানস জানতে চায় স্বপনদা কী লিখছেন।

"আমি। আমি কী লিখছি!" স্বপনদা হকচকিয়ে যান। "দ্যাখ, মানু, আমি পপুলার লেখক নই হতেও চাইনে । আমি নিঃসঙ্গ লেখক । নিঃসঙ্গই থাকতে চাই। যতবার চেষ্টা করি গোষ্ঠী বা গ্রুপ গঠন করতে ততবারই ব্যর্থ হই। এটা প্যারিস নয়। সেখানে 'ট্র্যানজিশন' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে আমিও

ছিলুম। কিন্তু সে রকম একটা পত্রিকাও এদেশে হয় না, সে রকম একটা লেখকগোষ্ঠীও না। একক লেখককেই তার নিজস্ব থিয়োরি, তার নিজস্ব মতবাদ তার নিজস্ব ধরনে ও নিজস্ব আঙ্গিকে পরিবেশন করতে হয়। এর জন্যে চাই দারুণ মনের জোর। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। প্রতিদিন রেওয়াজ। যেমন সঙ্গীতের। আমার কি তেমন মনের জোর আছে? আত্মবিশ্বাসও নড়বড়ে। আর প্রতিদিন রেওয়াজের সময় কোথায়?''

''কিন্তু তোমার তো বলবার মতো কাহিনী ছিল। তুমি যদি না বলে যাও আর কে বলবে? শিল্পীর কাছে এটা একটা দায়। তুমি দায়মুক্ত হবে কী করে?'' মানস চাপ দেয়।

''আমি কাফকা বা জয়েস নই। সেইখানেই আমার দুর্বলতা। নইলে আমার হাতে যে মালমশলা আছে তা দিয়ে কত কী গড়া যায়। না, আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।'' স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

''তুমি যদি লাভাবর্ষণ না করো কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি একটি জীবিত আগ্নেয়গিরি। ভিসুভিয়াস কি এটনা। একদা তুমি লাভাবর্ষণ করেছিলে এটাই তোমার একমাত্র পরিচয়। তোমাকে সক্রিয় হতে হবে। এদেশে তুমি মনের মতো গোষ্ঠী কোনো দিনই পাবে না। ওদেশের তুলনা এদেশে অচল। ওদেশে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে একটা তত্ত্বকে ঘিরে। যেমন ইমপ্রেসনিস্ট, এক্সপ্রেসনিস্ট, সুররিয়ালিস্ট, এগজিস্টেনশিয়ালিস্ট। এদেশে তেমন কোনো পরিষ্কার পার্থক্য নেই। লেখকেরা দল বাঁধেন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে। কিংবা রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে। তা বলে তুমি নিষ্ক্রিয় হবে কেন?'' মানস তর্ক করে।

''নাটক লিখতে চাই। কিন্তু স্টেজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এদেশে যদি মস্কো আর্ট থিযাটার থাকত তা হলে আমিও কি চেকভের মতো 'চেরি অরচার্ড' লিখতে পারতুম না? সেটা আমারও একটা প্রিয় বিষয়। মাড়োয়ারিরা বাঙালী জমিদারদের আম বাগান ও গোলাপবাগ কিনে নিচ্ছে। বাগানবাড়ী কিনে নিয়ে কারখানা তৈরি করছে।'' স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

''তা হলে তো অবশ্যই লিখতে হয় 'বাগানবাড়ী' বলে একটা নাটক। না, 'চেরি অরচার্ডে'র মতো সেন্টিমেন্টাল হলো না।'' মানস ফরমাস দেয়।

স্বপনদা অনেকক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর বলেন, ''এই যুদ্ধ আমার সর্বপ্রকার মোহভঙ্গ করে গেছে। মানুষ মরেছে, মানুষ আবার জন্মাবে, বাড়ীঘর ভেঙেছে, বাড়ীঘর আবার গড়ে উঠবে। কিন্তু সেই যুগটাকে তুমি পাবে কোথায় যে যুগে তুমি আমি ইউরোপে ছিলুম? এ যুগে আমি জল বিনা মীন। তুমি কী তা আমি জানিনে। বোধ হয় গান্ধীজীর উপর আশা রেখে নিশ্চিন্তে আছো। ভাবছ গান্ধীই ভারত, ভারতই গান্ধী। ইংরেজ চলে গেলে কী হবে সেটা রঙিন চশমা দিয়ে দেখছ। খোলা চোখে যখন দেখবে তখন মোহমুক্ত হবে।''

''ভারতের ঐক্য বলতে বোঝায় প্রথমত ইংরেজের দেওয়া ঐক্য, দ্বিতীয়ত গান্ধীজীর দেওয়া ঐক্য। তৃতীয় কোনো ঐক্য নয়। ইংরেজ থাকবে না, সেটা ধরে নিতে পারি। কিন্তু গান্ধীও থাকবেন না, তিনিও সদলবলে বিদায় হবেন, এটা যদি মেনে নিই তো ভারত কি আর এই ভারত থাকবে? বলকানে পরিণত হবে।'' মানসের কাছে সেটা একরকম সুনিশ্চিত।

''বলকান হয়েও কি বাংলার ঐক্য থাকবে? যেরকম লক্ষণ দেখছি জিন্না সাহেবের দুই নেশন থিয়োরির হাড়িকাঠে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হবে। জিন্নার কথা হলো তিনি হিন্দুর একাধিপত্য সহ্য করবেন না। আর গান্ধীর একাধিপত্য কি-না হিন্দুর একাধিপত্য। তিনি যদি একটু কম হিন্দু হতেন তা হলে মিটমাটের আশা ছিল। কিন্তু হিন্দুকে তিনি কম হিন্দু হতে, মুসলমানকে কম মুসলমান হতে, শিখকে কম শিখ হতে বলবেন না। অতি মাত্রায় ধর্মপ্রাণ হলে কী হয় তা জার্মানীর ইতিহাসে দেখেছ। ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট মিলে মারামারি করে দেশ ভাগ করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার বলেছিলেন যে সবাই যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে এ সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যায়। সেটাও তো ধর্মীয় সমাধান। সবাই

মুসলমান হয়ে গেলেও শিয়া সুন্নীর বিরোধ থাকবে। ধর্মীয় নয়, এমন সমাধান যদি চাও আমেরিকার দিকে তাকাও। আর নয়তো রাশিয়ার দিকে। আমেরিকা ধর্মকে রাজনীতির আসরে নামায়নি। আর রাশিয়া তো গির্জা থেকেও তাড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট না হলে ভারত তার ঐক্য রাখতে পারবে না।'' স্বপনদার বিশ্বাস।

''তা না হলে বাংলাই বা তার ঐক্য রাখবে কী করে? হিন্দুর প্রাধান্য মুসলমান সইতে পারে না, মুসলমানের প্রাধান্য হিন্দুর কাছে অসহনীয়। গান্ধীর প্রভাব, কংগ্রেসের প্রভাবও ক্ষীণ। সুভাষের প্রভাবই প্রবল। কমিউনিস্টরাও তলে তলে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। শুনছি তেভাগা না কী যেন একটা ইস্যুতে লড়াই করবে। তা হলেও বাঙালী বাঙালীই। হিন্দু মুসলমান কমিউনিস্ট নির্বিশেষে। কাল সকালে তোমাকে মীর সাহেবের ওখানে নিয়ে যাব।'' স্বপনদা প্রস্তাব করেন।

মানস রাজী হয়ে যায়। ওঁর সঙ্গে তার পত্রালাপ ছিল।

''আসুন, আসুন। কবে এলেন?'' মীর সাহেব মানসকে স্বাগত করেন।

''কালকেই। এবার বদরীর পথে।'' মানস উত্তর দেয়।

''কই, লেখা তো তেমন দেখিনে।'' তিনি অনুযোগ করেন।

''পুরনো ধরনে লিখতে চাইনে। নতুন ধরনে লেখার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজে দেখাতে পারছিনে। দেশের জন্যেও চিন্তিত।'' মানস জানায়।

''চিন্তার কারণ আছে বইকি। জিন্নার নাম বাঙালী মুসলমানরা কেউ কোনোদিন করত না। এখন সকলের মুখে মুখে। হিন্দু আর মুসলমান দুই ধর্ম বলে জানতুম। এখন শুনছি দুই নেশন। শিক্ষিতরাই এ তত্ত্ব প্রচার করে অশিক্ষিতদের মাথা খাচ্ছেন। ইংরেজদের কাছ থেকে এঁরা নাকি গোটা বাংলাদেশটাই এঁদের ভাগে পাবেন। তাও স্বতন্ত্রভাবে নয়। পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে। এঁদের মতে ভারত বিভাজ্য, বাংলাদেশ অবিভাজ্য। এঁরা ভুলে গেছেন যে চল্লিশ বছর আগে ইংরেজরাই বাংলাদেশকে দু'ভাগ করেছিল। একীকরণটা ইংরেজদের ইচ্ছায় হয়নি। হিন্দু মুসলমানের মিলিত ইচ্ছাতেই হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব সে সময় চালু থাকলে মিলিত ইচ্ছা থাকত না। এই আজগুবি তত্ত্বের ফলে মিলিত ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। বাঙালী বিভক্ত হবে। বাংলা বিভক্ত হবে।'' মীর সাহেব অতিথিচর্যা করতে বলেন।

মানস জানতে চায় মীর সাহেব এর বিরুদ্ধে কিছু লিখছেন কিনা। একজন বিশিষ্ট ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে মুসলিম সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া কি তাঁর কর্তব্য নয়?

''লিখছি বইকি। মনে করিয়ে দিচ্ছি বঙ্গভঙ্গের সময়কার কথা। তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িকতাবাদী বহু মুসলমান নেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবী করলেও ঢাকার নবাবের মতো বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেননি। তাঁদের ইস্তাহারে বলেন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও বাঙালীরা এক নেশন। সুতরাং বাংলাদেশ দু'ভাগ হওয়া উচিত নয়। সেদিন যদি বাঙালীরা এক নেশন না হতো তাহলে কাটা বাংলা অত সহজে জোড়া লাগত না। আর তাতে মুসলমানদেরই মেজরিটি হত না। তোমরা মেজরিটি পেয়েছ, মেজরিটির জোরে সরকার চালাতে পারছ, আপাতত না হলেও কালক্রমে সরকারী চাকরিতেও তোমাদেরই মেজরিটি হবে। মেজরিটি পেয়েও তোমরা সন্তুষ্ট নও। তোমরা চাও টোটালিটি। বাঙালী জাতির হোমল্যাণ্ড হবে মুসলিম জাতির একার হোমল্যাণ্ড। সেখানে অমুসলমান থাকবে না। যেমন মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে অমুসলমান ভোটদাতা থাকে না। গোটা প্রদেশটাই হবে সেপারেট ইলেকটোরেট। শুধু মুসলমানদের জন্যে। তোমরা ভেবেছ হিন্দুবর্জিত বাংলাদেশে কেবল তোমরা বাঙালী মুসলমানরাই থাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে কোটি কোটি উর্দুভাষী মুসলমানও এসে ভাগ বসাবে। তারাও মুসলিম জাতি বা নেশন। তোমরা তাদের ফেরাতে পারবে না। পাকিস্তান বলতে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ফেডারেশন

বোঝায় তা পাঞ্জাবী পাঠান সৈন্যদলও এসে হাজির হবে। মিলিটারি পাওয়ার তো তাদেরই হাতে, তোমাদের হাতে নয়। সিভিল পাওয়ারও যে তোমাদেরই হাতে থাকবে তেমন নিশ্চয়তা কে দেবে? মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ড তো অবাঙালীদের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁরাই চালাবেন। বাংলাদেশ সরকারও তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে চলবে। যারা তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সুখ দুঃখের সাথী, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমরা খাল কেটে কুমীর ডেকে আনতে চাও। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ বাধবে না? তখন কে তোমাদের বাঁচাবে? বাঙালী হিন্দুরাও কি নির্বিবাদে তাদের হোমল্যাণ্ড ছাড়বে? আধখানা কেটে নেবে না?'' মীর সাহেব সিগারেট বাড়িয়ে দেন।

''নো, থ্যাঙ্কস। আমি সিগারেট খাইনে।'' মানস বলে, ''কিন্তু আপনার কথা থেকে মনে হয় আপনার মতে বাঙালীরা একটা নেশন। তা হলে ভারতীয়রা কী? ভারত কি একটা নেশন-স্টেট না একটা নেশন সমবায়?''

''ভারত শাসন আইনে নেশনের কোনো স্বীকৃতি নেই। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী যদি ডাকা হয় সেইখানেই এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অবশ্য ইণ্ডিয়ান নেশনকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছে। অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কিন্তু তা করেনি। ভারতীয় মুসলমানরা প্রথমে ভারতীয় না প্রথমে মুসলমান এ প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। জিন্নার মতো যাঁরা কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদের অনেকেই ডিগবাজি খেয়েছেন গান্ধীর উপরে রাগ করে। তিনি আগে ইংরেজদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট না করে আগে মুসলমানদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট করবেন না। জিন্না চান আগে মুসলমানদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট, পরে ইংরেজদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট। এখনো অনেকের ধারণা মুসলমানরা হিন্দু নয় বলে ভারতীয় নয়।'' মীর সাহেব হাসেন।

স্বপনদার মৌনভঙ্গ হয়। তিনি সায় দেন। ''এইটেই সব কথার সার কথা। ভারতীয় হিন্দুরা আগে হিন্দু কি আগে ভারতীয় এতে কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের আর কোনো হোমল্যাণ্ড নেই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা যদি ভারতকে আপনার হোমল্যাণ্ড মনে করত তা হলে পাকিস্তানের চিন্তাই তাদের মাথায় আসত না। ভারত হোমল্যাণ্ড নয়, অতএব ভারতের যে অংশটা মুসলিমপ্রধান সেই অংশটাই হোমল্যাণ্ড। সেটা বাংলাদেশ না হয়ে যুক্তপ্রদেশও হতে পারত। এর মধ্যে জন্মভূমির প্রতি মমতা নেই। আছে সংখ্যার জোরের উপর নির্ভরতা। হিন্দু মুসলমানে গৃহযুদ্ধ বাধলে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিই হবে মুসলিম পক্ষের ঘাঁটি আর হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি হিন্দুপক্ষের ঘাঁটি। একপক্ষ অপর পক্ষকে ঘাঁটিচ্যুত করতে না পারলে ঘাঁটিভাগই হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জার্মানীর ইতিহাসে তিন শতাব্দী পূর্বে এই জিনিসটি ঘটে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট তিন দশক ধরে লড়াই করে এইভাবে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে। তবে মাথার উপরে থাকেন এক নির্বাচিত সম্রাট। তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যতবার সম্রাট নির্বাচন হয় ততবার ক্যাথলিক প্রার্থীই সম্রাট হন। কিন্তু কালক্রমে বলীয়ান হন প্রটেস্টাণ্ট অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির রাজন্যগণ। বন্দোবস্ত ভেঙে যায়। বিসমার্কও সমগ্র জার্মানীকে ঐক্য দিতে পারেন না। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়া ও প্রটেস্টাণ্ট প্রাসিয়া এক নেশন হলেও একাকার হয় না। একজনের জায়গায় দু'জন সম্রাট হন। একজন হাঙ্গেরিসমেত অস্ট্রিয়ার, অন্যজন প্রাসিয়াকে বাড়িয়ে নিয়ে জার্মানীর। এর পরে আসে হিটলারের পালা। তিনি হন একচ্ছত্র অধিনায়ক। এটা কিন্তু সম্ভব হতো না, যদি তিনি ক্যাথলিক বলে পরিচয় দিতেন। তিনি না ক্যাথলিক, না প্রটেস্টাণ্ট। তিনি খ্রীস্টানই নন। তিনি পেগান। কে প্রটেস্টাণ্ট, কে ক্যাথলিক এ ভেদবুদ্ধি ছেড়ে জার্মানরা সবাই না হোক বেশীর ভাগই জড়ো হয় হিটলারের পতাকাতলে। জার্মান ঐক্যের প্রাথমিক শর্ত শুদ্ধ ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে ওঠা। হিটলারের স্বৈরতান্ত্রিক জোর জুলুমের আমি সমর্থন করিনে, কিন্তু ক্যাথলিক হয়েও প্রটেস্টাণ্টদের প্রিয়তম নেতা একমাত্র তিনিই হয়েছিলেন, কারণ একমাত্র তিনিই জার্মানীকে ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট

দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তুলে এক নেশন করতে পেরেছিলেন।"

মীর সাহেব সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, "সর্বনাশ। আপনি হিন্দুকে হিন্দুত্ব আর মুসলমানকে ইসলাম ভুলিয়ে দিতে চান নাকি? পারেন তো হিন্দুকে মুসলমানের সঙ্গে ও মুসলমানকে হিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করুন। কিন্তু হিন্দুকে হিন্দুত্বের থেকে ও মুসলমানকে মুসলমানত্বের থেকে বিযুক্ত করতে পারবেন না, গুপ্ত সাহেব।"

"আমি ধর্ম ত্যাগ করতে কাউকে বলব না, কিন্তু রাষ্ট্রকে বলব সেকুলার হতে। রাষ্ট্র হবে হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষের একতার আর কোনো সূত্র নেই। যদি না সে হয় চির পরাধীন।" স্বপনদা সুনিশ্চিত।

"আপনি দেখছি কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছেন। ওরা ধর্ম মানে না, ঈশ্বর বা আল্লাহ্ মানে না। ওদের রাষ্ট্র সেকুলার।" শিউরে ওঠেন মীর সাহেব।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও সেকুলার। তা বলে ওখানকার লোকজন ধর্মহীন নয়। ঈশ্বরবিশ্বাসহীন নয়। হিন্দু মুসলমানের যদি তাতেও আপত্তি থাকে একদিন কমিউনিস্টরাই সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবে। বাহুবলে, এই যা দুঃখ।" স্বপনদা শেষ কথা বলেন।

।। দশ ।।

একই গাড়িতে এসেছিল জুলি আর মিলি, মিলির ছেলে রণ, সৌম্য আর সুকুমার। মিলিকে পেছনে ফেলে জুলি এগিয়ে যায়, তার হাত ধরে রণ আর তাদের পথ দেখিয়ে এলক।

ওদিকে দীপক আর মণি অপেক্ষা করছিল। মণি ছুটে এসে রণকে কেড়ে নেয়। মিলি তা দেখে বলে, "চোরের উপর বাটপাড়ি।"

তখন জুলি যূথিকার কাছে নালিশ করে। "রণ যদি আমাকে বেশী পছন্দ করে সেটা কি আমার অপরাধ?"

যূথিকা রণকে ডেকে বলে, ইংরেজীতে, "কাকে তোমার বেশী পছন্দ। মাকে না মাসীকে?"

রণ একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে বলে, "মাসীকে।"

মিলি শক পাবার ভান করে বলে, "বাপ যাকে পছন্দ করে ছেলেও তাকে পছন্দ করে? জুলি কি জাদু জানে?"

সুকুমার তা শুনে বলে, "মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। কে না জানে? কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন? জুলি তো অনেকদিন আমাকে কিক আউট করেছে। আমি ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে মিলির গোলে ঢুকেছি। লাথি খাবার সে যে জ্বালা তা কি আমি কখনো ভুলতে পারি? মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি। বলে উঠি, 'জুলি। জুলি। তুমি আমাকে পদাঘাত করলে।' মিলি সবটা শুনতে পায় না, তাই আমাকে ভুল বোঝে।"

যূথিকার শিক্ষা জুলির মনে ছিল। সে মিলির দিকে চোখ টিপে বলে, "মিলিও তো মাঝে মাঝে সুখস্বপ্ন দেখে। বলে ওঠে, 'সৌম্য। সৌম্য। তুমি কবে তোমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে?' কিন্তু স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। তা নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। আমি তো কিছু মনে করিনে।"

মিলি কপট কোপ দেখায়। "আমি স্বপ্নে কী বলি না বলি তোর তা জানার কথা নয়। বল, বল, কে তোকে বলেছে?"

"কেন? ওটা কি তোর মনের কথা নয়? অবচেতন মনে যে যা চায় সেইটেই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। যাক, তোর বিয়ে হয়ে গেছে, আমারও বিয়ে হয়েছে। এখন আর ওসব কথা নয়। রণ যা বলেছে তা

শুনে তোর মনে কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, রণকে আমি জিজ্ঞাসা করছি। রণ, কাকে তুই বেশী ভালোবাসিস? মাকে না মাসীকে?" জুলি প্রশ্ন করে।

রণ উত্তর দেয়, "মাকে।" প্রশ্ন আর উত্তর ইংরেজীতে।

"সাবাস। এতেই তো প্রমাণ হয়ে গেল ওর বাপও ওর মাকে বেশী ভালোবাসে। বাপকা বেটা। বেটাকা বাপ।" যূথিকা রসিকতা করে।

স্বপনদা সুকুমারকে ধরে নিয়ে যান তাঁর স্টাডিতে। বলেন, "কতদিন ইউরোপে যাইনি। যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারিনে। বিয়ে করলে মানুষ আর স্বাধীন থাকে না। আমার উনি ইংরেজদের উপর হাড়ে চটা। ওরা নাকি মুসলিম লীগের বকলমে ভারতের উপর অঙ্কুশ রাখতে চায়। তোমার তো লেবার পার্টির হাঁড়ির খবর জানা। তুমি কি মনে করো যাঁহা টোরি তাঁহা লেবার? যাঁহা চার্চিল তাঁহা অ্যাটলী?"

সুকুমার পাইপ টানতে টানতে বলে, "ব্রিটেনে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে, স্বপনদা। লেবার পার্টির রংটা লাল নয়, গোলাপী। তার যে প্রোগ্রাম সেটাও সেই রঙের। এখন থেকে ওয়েলফেয়ার স্টেট। তাতে একজনও নাগরিক বেকার থাকবে না। সবাই কাজ পাবে। এখন থেকে কেউ অচিকিৎসিত থাকবে না, ওষুধপত্রও বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে পাওয়া যাবে। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইনশিওরান্স প্রভৃতির উচ্চতম শৃঙ্গগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত হবে। তাতে সামাজিক নিরাপত্তা বাড়বে। একলম্ফে এর চেয়ে বেশী এগোনো যায় না। লেবার পার্টির নেতারা বাস্তববাদী। টোরি দলের দশা এখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লিবারলদের মতো। তাঁদের যুগ গেছে। তাঁরা যে আর কোনোদিন ফিরে আসবেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে লেবার যদি দুর্বলতা দেখায় তার পক্ষপাতীরা তাকে ভোট না দিতেও পারে। গণতন্ত্রে কেউ চিরন্তন নয়।"

"কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলুম ভারত সম্পর্কে লেবার পলিসি কি একই রকম না আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ?" স্বপনদা জেরা করেন।

"খুবই আশাপ্রদ। লেবার পার্টি এতদিন বিশেষ কিছু করতে পারেনি, কারণ যুদ্ধকালে ওটা ছিল সর্বদলীয় সরকার। চার্চিল বড়ো কর্তা। অ্যাটলী ছোট কর্তা। ক্রিপ্‌স বিফল হয়ে ফিরে গেলেন। দুর্ভাগ্য! আবার তাঁকে পাঠাবার কথা হচ্ছে। এবার যেন তাঁকে বিফল হতে না হয়। ব্রিটেনের সর্বশ্রেণীর রাজনীতিকরা উপলব্ধি করছেন যে সাম্রাজ্য রাখতে হলে তাকে কমনওয়েলথে রূপান্তরিত করতে হবে। কমনওয়েলথে ব্রিটেনেরই প্রাধান্য, কিন্তু কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটেনের হাতের পুতুল নয়। এই যুদ্ধে দেখা গেল আমেরিকার সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার নিকটতর সম্পর্ক। আমেরিকাই তাকে রক্ষা করতে পারে, ব্রিটেন নয়। কানাডার বেলা একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। ভারতকে রক্ষা করা যে মোটেই সহজ নয় তা তো জাপানী আক্রমণের সময় প্রমাণিত হলো। ভারতীয়রাই যদি জাপানকে স্বাগত জানাত তা হলে তো ভারতরক্ষা অসম্ভব হতো। সে কাজটা তারা করেনি। কংগ্রেসের আন্দোলন অ্যান্টিব্রিটিশ হলেও প্রো-জাপানীজ ছিল না। কর্তারা তখন বিশ্বাস না করলেও পরে বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেস জাপানকে ডাকেনি, ডাকত না। সরকারের ভার পেলে জাপানকে রুখত। এর থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল যে কংগ্রেস সরকারের ভার পেলে সোভিয়েট রাশিয়াকে ডাকবে না, রুখবে। কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাসযোগ্য। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায়। তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু তাই বলে যাঁরা ব্রিটেনের পুরাতন সখা বা সহযোগী তাঁদের তো পথে বসানো যায় না। পরিস্থিতিটা কতকটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর আয়ারল্যাণ্ডের মতো। আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের হাতে হস্তান্তর ততদূর পর্যন্ত সমীচীন যতদূর পর্যন্ত আলস্টরের প্রটেস্টান্টরা সম্মত। ওঁরাও একটা প্রয়োজনীয় পক্ষ। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগ। কংগ্রেস যদি এটা মেনে নেয় তবে ক্ষমতার হস্তান্তর অযথা বিলম্বিত হবে না। কিন্তু গান্ধীজী কি এটা মানবেন? ক্রিপ্‌স বা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। গান্ধী তাঁদের কাছে একটি

ধাঁধা। নেহরু তেমন নন। তবে সব চেয়ে মুশকিল জিন্নাকে নিয়ে। এটা তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, তবু তাঁকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। নইলে টোরি সমর্থন পাওয়া যাবে না। চার্চিল বিরূপ হবেন।"

"জিন্না কখনো কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে দেবেন না। আর গান্ধী কখনো দুই উত্তরাধিকারী স্বীকার করবেন না। বৃথা চেষ্টা।" স্বপনদা বলেন, "আচ্ছা, গান্ধীকে বাদ দিয়ে কি কংগ্রেসের সঙ্গে আর জিন্নাকে বাদ দিয়ে কি মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট সম্ভব নয়?" সুকুমার আশ্চর্য হয়। "ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কেন এই দুই বৃদ্ধের দ্বারস্থ হতে হবে?"

"এই দুই বৃদ্ধকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড আর লীগ হাইকমাণ্ডকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কেন্দ্রীয় সরকার চালাবেন যাঁরা তাঁরা এঁদেরই মনোনীত সদস্য। কিন্তু একমত হয়ে চালাতে না পারলে স্বদেশী সরকার একবছর কি দু'বছর বাদে ভেঙে যাবে। তখন সেই বড়লাটই নিজের হাতে সরকারের ভার নেবেন। যেমন গভর্নররা নেন কংগ্রেসের মন্ত্রীদের প্রাদেশিক সরকার পরিত্যাগের পর। বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নরের শাসন চলেছে ছ'বছর ধরে। তেমনি বড়লাটেরও শাসন চলবে কে জানে ক'বছর ধরে। সেটা অবশ্য স্বদেশী শাসন নয়, তবু অরাজকতার চেয়ে ভালো। বড়লাট যদি গদী ছেড়ে দেন তা হলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তার সুযোগ নিয়ে জনতা উন্মাদ হবে। নিরীহ নাগরিকদের কে রক্ষা করবে? পুলিশের আনুগত্য কার প্রতি? আর্মির মাথা কে? জঙ্গীলাটও তো থাকবেন না। শূন্যতা পূরণের শক্তি কি একা কংগ্রেসের আছে না একা লীগের আছে? থাকতে পারে দুই পার্টি যদি একজোট হয় তবে সেই জোটের। এই কথাটাই জিন্না সাহেব বলে আসছেন পঁচিশ বছর ধরে। তাঁর মতে হিন্দু মুসলমানের একতাই হচ্ছে স্বরাজ। অর্থাৎ কংগ্রেস লীগ চুক্তিই হচ্ছে স্বরাজ। সে রকম একটা চুক্তি হয়েছিল ১৯১৬ সালে। তারই ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারের আংশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ হয়। এবার যেটা চাই সেটা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। এবার আংশিক নয়, পূর্ণ। গোড়ার দিকে ইংরেজ বড়লাট থাকবেন। পরে বড়লাট নিযুক্ত হবেন কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সুপারিশে। ক্ষমতা বলতে তাঁর বিশেষ কিছু থাকবে না। যেমন নেই ব্রিটেনের রাজার। প্রায় সমুদয় ক্ষমতাই কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হবে। প্রকৃত ক্ষমতা নির্বাচিত মন্ত্রীদেরই, লাটসাহেবদের নয়। এরই নাম ভারতের স্বাধীনতা তথা ভারতের ঐক্য। পরে রাজন্যরাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে প্রজাপ্রতিনিধি পাঠাবেন। আরো পরে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বছর পাঁচেক তো লাগবেই। কিন্তু মূল কথা হলো কংগ্রেস লীগ সমঝোতা। তার মানে হিন্দু মুসলিম একতা। সেটা ইংরেজরা উপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারে না। আমাদেরই নিচের দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজ গান্ধী জিন্না ভিন্ন আর কাদের নেতৃত্বে হতে পারে? ত্রিশবছর পূর্বে যে ভূমিকা ছিল টিলক ও জিন্নার তেমনি এক ভূমিকাই এখন গান্ধী ও জিন্নার। না, এঁদের বাদ দেওয়া যায় না। না গান্ধীকে, না জিন্নাকে। বিশুদ্ধ কংগ্রেস শাসন বা বিশুদ্ধ লীগ শাসন কোনোটাই ধোপে টিকবে না। হাত মেলাতেই হবে। যে কোনো সম্মানজনক শর্তে।" স্বপনদা একজন প্রোফেটের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

"কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়।" সুকুমার সংশয় প্রকাশ করে। "ইংরেজের দেওয়া অ্যাওয়ার্ড কি উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য হবে না?"

"হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু সেটা যেন বাপ-মায়ের দেওয়া বিয়ে। ভালোবাসার বিয়ে নয়। টিঁকে যেতেও পারে। বলা যায় না। কিন্তু না টিকলে কী হবে, জানো তো? সেপারেশন ও ডিভোর্স। পার্টনারশিপ কার্যকর না হলে পার্টিশন বা সিসেশন। সেটা অশুভ চিন্তা।" স্বপনদা জিব কাটেন। টেবিলে হাত ঠেকিয়ে বলেন, "টাচ উড।"

ওদিকে সৌম্যর সঙ্গে মানসের কথাবার্তা। মানস জানতে চায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি-না।

"হয়েছে বইকি। সেইজন্যেই তো কলকাতায় আসা।" সৌম্য জানায়।

"সেই প্রসঙ্গটা তুলেছিলে?" মানস ইঙ্গিত করে।

"কোন্‌টা?" সৌম্য না বোঝার ভান করে।

"বিবাহিত ব্রহ্মচর্য।" মানস মুখ ফুটে বলে।

"পনেরো বছর প্রতীক্ষার পর আমরা বিয়ে করেছি শুনে বাপু নরম হন। জুলির মুখ দেখে ওঁর মায়া হয়। আমরা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারিনি শুনে তিনি মৃদু হাসেন। বলেন, তোমরা গঠনের কাজ নিয়েই থেকো। তাতেই দেশের মুক্তি হবে। দেশ মানে তো দেশের গরীব দুঃখী।" সৌম্য বিবরণ দেয়।

"তাহলে তুমি এখন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত।" মানস প্রীত হয়।

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহের দায় থেকেও মুক্ত। আবার যখন সত্যাগ্রহের দিন আসবে বাপু আমাকে ডাক দেবেন না। সেদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং-এ তিনি যা বলেছেন সদস্যদের মুখে তা শুনে আমার মাথা হেঁট। রেললাইন ওপড়ানো, ট্রেন ডিরেল করা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, সাঁকো ওড়ানো, স্টেশন পোড়ানো, থানা দখল, আদালত দখল, কাছারি দখল, জাতীয় সরকার গঠন করে দণ্ডদান প্রভৃতি যা নিয়ে আমাদের গর্ব তা তিনি ভায়োলেন্সের প্রয়োগ বলে না-মঞ্জুর করেন। তবে আমরা যে সেদিনকার পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি এর জন্যে পিঠ চাপড়ে দেন। তার তাৎপর্য কাপুরুষতার চেয়ে ভায়োলেন্স ভালো।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

"তোমার কি ধারণা আবার বড়ো মাপের সত্যাগ্রহের দরকার হবে? তা যদি না হয় তবে ছোট মাপের সত্যাগ্রহে তুমি নাই বা যোগ দিলে। বিয়ে করেছ। সংসার হয়েছে। এখন স্থিতি চাই।" মানসের মতে।

"নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হলো না তাঁরা সত্যাগ্রহের জন্যে তৈরি থাকছেন। বরং তৈরি হচ্ছেন সাধারণ নির্বাচনের জন্যে। সামনের সাধারণ নির্বাচন যুগান্তকারী হবে। কারণ মুসলিম লীগ মুসলিম নির্বাচকদের কাছে পাকিস্তানের একখানি মনোহর প্রাণচিত্র তুলে ধরবে। গুজরাতী বণিক ঝীণাভাই খোজানীর পুত্র মহম্মদ আলী ঝীণা তাঁর পিতৃনামকেই করেছেন তাঁর পদবী। সেটি এমনভাবে লেখা হয় যাতে ইংরেজের মুখে জিনা আর ভারতীয়ের মুখে জিন্না। এখন মুসলমানের মুখে হয়েছে জিন্নাহ্। শুনলে মনে হবে আরবী ভাষার শব্দ। যেমন আল্লাহ্। ইসলামের খলিফাদের মতো ইহলোকের আদর্শ রাষ্ট্রে নিয়ে যাবেন সবাইকে পাকিস্তানের রাস্তা ধরে। কংগ্রেস এবার বিস্তর মুসলিম ভোট হারাবে। কংগ্রেস যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টানের ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিনিধি এ দাবী দুর্বল হবে।" সৌম্য চিন্তিত।

"তার ফলে কি কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া ব্যাহত হবে?" মানস সুধায়।

"বোঝাপড়া মানে গিভ অ্যাণ্ড টেক। কংগ্রেস খালি দেবে, লীগ খালি নেবে, এর নাম বোঝাপড়া নয়। লীগকেও কিছু দিতে হবে। তা হলেই কংগ্রেসও কিছু দেবে। পাকিস্তানও বাপু দিতে পারেন, তার বিনিময়ে যদি পান তিনটি বিষয় পরিচালনার জন্যে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকার।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"সেটা কোথাও ধোপে টেকেনি।" মানস মনে করে অবাস্তব।

পাশের ঘরে যূথিকা সুধায় মধুমালতীকে, "এটা কি ঠিক যে তুমি আর বিলেতে ফিরে যেতে চাও না? রণকে এ দেশের ছেলে করবে?"

"হ্যাঁ, তাই। সেইরকমই ভাবছি। কিন্তু ওর বাবার ভিন্ন মত। ওর বাবা লণ্ডনের শহরতলীতে আমার নামে বাড়ী কিনেছে। আমার বাবাও ওর সঙ্গে একমত। আমার বাবা বলেন দেশে এখন গণ্ডগোল চলবে। দুশো বছরের সাম্রাজ্য হঠাৎ ভেঙে গেলে অরাজকতা অনিবার্য। আমরা যে বাংলাদেশে থাকতে পারব তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? মুসলিম লীগ নাকি লোক বিনিময় করবে বলে শাসাচ্ছে। আমাদের ঘর-বাড়ী নাকি দখল করবে বিহারী মুসলমান। আর আমরা নাকি ঘর-বাড়ী পাব বিহারে।

কলকাতার ভাগ্য অনিশ্চিত। হয়তো দীপিকাদিদেরও যেতে হবে পাটনায়। পাটনা থেকে কোনো মুসলিম ব্যারিস্টার এসে বসবেন এখানে।" মিলি উত্তর দেয়।

দীপিকাদি পাশের সোফা থেকে শুনতে পেয়ে বলেন, "দেখব এ বাড়ী থেকে আমাকে সরায় কোন্ গভর্নমেণ্ট। তার আগে স্টেন গান জোগাড় করব।"

"আপনার স্টেন গান কোন্ কাজে লাগবে, দীপিকাদি, গোরা সৈন্যরা যাবার আগে যদি পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে বসিয়ে দিয়ে যায় আর তাদের হাতে কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যাবতীয় মারণাস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে যায়? দেখবেন কলকাতা শহর সাতদিনের মধ্যেই তিনভাগ খালি হয়ে যাবে। বাঙালীতে ছেয়ে যাবে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, আর তাদের জায়গা ভরে যাবে অবাঙালী মুসলমানে। কলকাতায় থাকার ইচ্ছে যদি থাকে তবে ভালো ছেলের মতো কমনওয়েলথে যোগ দিতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের এক টুকরো রাখতে পারা যাবে। ফোর্ট উইলিয়ামে শিখ সৈন্য মোতায়েন হবে।" মধুমালতী ভরসা দেয়।

"এরই নাম স্বাধীনতা? ধ্যেত্তেরি!" দীপিকাদি মুখ ফিরিয়ে নেন।

"তা হলে ফোর্ট উইলিয়াম ক্যাপচার করার সংকল্প নাও। বিহার থেকে হিন্দু সৈন্য এসে লড়াই করে দখল নেবে। সত্যিকার স্বাধীনতার মূল্য গৃহযুদ্ধ। রাজী?" মিলিকে দেখে মনে হয় সে সিরিয়াস।

"গৃহযুদ্ধ কেন? বিপ্লব কেন নয়।" বাবলী বলে ওঠে এক কোণ থেকে। "রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। রেডিও স্টেশন, রেল স্টেশন, পোর্ট অধিকার। গভর্নমেন্ট হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং, লাল বাজারের উপর লাল নিশান। পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যরাও লাল নিশানের মহিমা বোঝে। ওরা আমাদের দিকেই চলে আসবে।"

মিলির নজর পড়ে জুলির উপরে। " তুই চুপ করে আছিস যে।"

"বিপ্লব যদি অহিংস হয় আমি অংশ নেব, নয় তো নয়।" জুলি উত্তর দেয়।

"সে কী রে! তুই কবে থেকে অহিংসাবাদী হলি?" মিলি বিস্মিত হয়।

"বিয়ের পর থেকে। ও আমার জন্যে ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করেছে। আমি ওর জন্যে হিংসা ত্যাগ করেছি। বাপু আমারও বাপু। কাল দর্শন করে এলুম। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন।" জুলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলি হো হো করে হেসে ওঠে। "ব্রহ্মচর্যত্যাগ একটুও কঠিন নয়। হিংসা ত্যাগ একটুও সহজ নয়। তুই ঠকে গেছিস, জুলি। বোকা মেয়ে।"

যূথিকা জুলির পক্ষ নেয়। "পনেরো বছর অপেক্ষার পর বিয়ে। ওর বিয়েটা ভেঙে গেলে কার কী লাভ? ভেঙে যাবেই ওর বর যদি সত্যাগ্রহী হয় আর ও হত্যাগ্রহী। জুলি ঠকে যাবে তখনি। আশা করি ঠকবে না।"

"না, না। বিয়ে ভেঙে যাবে না। আমি আবার ভায়োলেণ্ট হলে ও আবার ব্রহ্মচারী হবে।" জুলি সরল মনে বলে।

মিলি, যূথী, বাবলী সবাই হেসে ওঠে। দীপিকাদি গম্ভীরভাবে বলেন, "পুরুষের হাতে ওটাও একটা অস্ত্র। ফেমিনিস্টদের জেনে রাখা উচিত।"

হংসো মধ্যে বকো যথা সে ঘরে একমাত্র পুরুষ ছিল চানু। সে পুরুষদের পক্ষ নেয়। "না, দিদি, ওটা একটা অস্ত্র নয়। সবাই কি সৌম্য চৌধুরী?"

ওদিকে সৌম্য বলছিল মানসকে, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে না, ডেস্‌পারেট ডিজিজেস কল ফর ডেস্‌পারেট রেমিডিজ। আমাদের এদেশের ডেস্‌পারেট ডিজিজ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ থাকতে এর মূলোচ্ছেদ হবে না। সুতরাং ইংরেজকেই সর্বাগ্রে উচ্ছেদ করতে হবে। ওরা দেশ ছেড়ে চলে

যাক এটা কেউ চায় না। ওরা গদী ছেড়ে দিক এইটেই গান্ধীজী চান। শূন্যতা পূরণের জন্যে ওরা যদি মুসলিম লীগকে গদীতে বসিয়ে দেয় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। দুশো বছরের ইংরেজ রাজত্ব যদি হাওয়া হয়ে যায় পাঁচ দশ বছরের মুসলিম লীগ রাজত্বও ধোঁয়া হয়ে যাবে। তবে মুসলিম মাইনরিটির জন্যে কতকগুলো সেফগার্ড সত্যিই আবশ্যক। ওরা যদি মাইনরিটি স্টেটাসে সন্তুষ্ট হয় তা হলে ওদের জন্যে ও ওদের মতো মাইনরিটিদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হিন্দু মেজরিটিকে তিনি পরামর্শ দেবেন। মেজরিটির উপরেও কড়া নিয়ন্ত্রণ চাই। তা না হলে সেও অত্যাচার করবে। হিন্দুরা যে দেবতা তা নয়। মুসলমানরা যে শয়তান তাও নয়। কিন্তু সম্প্রতি মুসলমানদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ওরা মাইনরিটি স্টেটাস চায় না। চায় মেজরিটি স্টেটাস। সারা ভারতে নয়, ভারতের মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে ও সেগুলিকে একত্র করে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রে, যার নাম পাকিস্তান। জিন্না সাহেব দশ বছর আগেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিলেন। এখন তিনি পক্ষপাতী শুধু নন, ঘোর পক্ষপাতী। ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জিন্নার বা মুসলিম লীগের নয়। বরং ঠিক উল্টোটি। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা উদার ছিলেন তাঁরাও হয়ে উঠছেন অনুদার। এক্ষেত্রে ডেসপারেট রেমিডি হচ্ছে ইংরেজের গদীতে জিন্নাকে বসানো। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে সহযোগিতা চাইলে সহযোগিতা পাবেন। দেশের অমঙ্গল তথা হিন্দুর অমঙ্গল করলে পাবেন অহিংস অসহযোগ। যতদিন না অন্তঃপরিবর্তন হয়।”

“ডেসপারেট রেমিডি বলতে কি বোঝায় এমন এক গভর্নমেন্ট যা ন্যাশনালও নয়, ডেমোক্রাটিকও নয়? দেশের লোক যা চায় তা কেবল বিদেশী শাসনেরই নয়, অগণতান্ত্রিক শাসনেরও অবসান। সারা ভারতের উপর মুসলিম লীগের কর্তৃত্ব কি হবে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব? কাদের কাছে ওদের জবাবদিহি? সব নাগরিকের কাছে, না কেবলমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের কাছে? যারা কর দেবে তারা যদি বলে তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা ধার্য না হলে কর দেবে না তা হলে জিন্না সাহেব কেমন করে কর আদায় করবেন? কর আদায় করতে না পারলে সৈন্যদের মাইনে দেবেন কী করে? হিন্দু ও শিখ সৈন্যরা কি বিদ্রোহ করবে না? জিন্না সাহেব একথা জানেন বলেই সারা ভারত চান না, আধখানা ভারত চান। তিনি কনফেডারেশনে রাজী হলে গান্ধীজীও পাকিস্তানে রাজী হবেন, ভারতের ঐক্য বজায় থাকবে। কিন্তু গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে যা হয় তাই হবে। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ভিত্তি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রে জাতের বিচার বা ধর্মের বিচার নেই। ভারতে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। জাতেরও বিচার আছে, ধর্মেরও বিচার আছে। ফল হয়েছে এই যে বাংলার মুসলিম মন্ত্রীরা কেবলমাত্র তাঁদের সম্প্রদায়ের নির্বাচকদের কাছেই দায়ী। একই কথা খাটে মুসলমান বাদ দিয়ে আর সব সম্প্রদায়ের 'সাধারণ' নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের বেলায়ও। অর্থাৎ হিন্দুদের বেলায়ও। আইনসভাকে দুটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করলে মন্ত্রীমণ্ডলীকেও দুটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করতে হয়। লিবারল কনসারভেটিভ হতে পারে, কনসারভেটিভ লিবারল হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান হতে পারে না, মুসলমান হিন্দু হতে পারে না। বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিসমিল্লায় গলদ। এমন একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারা যায় না যার উপর উভয় সম্প্রদায়ের আস্থা আছে। নয়তো একটা গোটা সম্প্রদায়ই বিরোধীপক্ষে পরিণত হয়। বাংলাদেশে তারা হিন্দু, বিহারে তারা মুসলমান। সারা ভারতে যদি কংগ্রেস মেজরিটি শাসনভার পায় তবে সারা ভারতেও বিরোধীপক্ষ হবে মুসলমান? ডেসপারেট রেমিডি হিসাবে মুসলিম লীগকে সারা ভারতের শাসনভার দিলে হিন্দু সম্প্রদায় হবে বিরোধীপক্ষ। সেই সঙ্গে শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও। এর নাম পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী নয়। এটা একপ্রকার ডেসপটিজম। সোজা কথা ইংরেজরা মোগলদেরই মসনদে বসিয়ে দিয়ে যাবে। তা দেখে মারাঠা, রাজপুত, শিখ বিদ্রোহ করবে। ভারত খণ্ড বিখণ্ড হবে। এটা একটা সমাধানই নয়। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। মুসলিম লীগ বিপাকে পড়ে কংগ্রেসকে সাধবে তার

সঙ্গে মসনদে বসতো। কিন্তু মেজরিটি হতে দেবে না, নিজেও মাইনরিটি হবে না। ওরকম জোড়াতালি দেওয়া সরকার দু'দিনেই ভেঙে যাবে। তখন কংগ্রেস যদি শাসনভার নেয় লীগ হবে বিরোধীপক্ষ। সেই সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ও। একমুঠো কংগ্রেসী মুসলিম কি মুসলিম বিদ্রোহ ঠেকাতে পারবে? কংগ্রেস সরকার কি অহিংসভাবে বিদ্রোহ দমন করতে পারবে? আবার সেই পদত্যাগ। এবার লীগ মসনদে বসবে না। ইংরেজও না। দেশ আপনা থেকে বলকান হয়ে যাবে।" মানস আশঙ্কা করে।

ওদিকে মিলি বলছিল যূথিকাকে, "ভাই, আমি যদি এদেশে থেকে যাই তো আমার বরও এসে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে বসবে। তখন শুরু হবে আবার জুলির সঙ্গে প্রেম। তাই ভাবছি আবার ওদেশে ফিরে যাব।"

জুলি তখন অন্য ঘরে বাচ্চাদের খাওয়া দেখছে। শুনতে পায় না। যূথিকা বলে, "ভাই, তোমার এ সন্দেহ অমূলক। জুলি এখন ওর বর আর ঘর নিয়ে ভাবে ভোর। ও এখন ওর বরের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিচ্ছে। হিংসা ছেড়েছে, তবে অহিংসা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ওর অতীতের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুকে গেছে। ওর সাবেক শ্বশুর ওকে মাসোহারা পাঠাতেন, ওর বিয়ের পরেও পাঠাতে ভোলেননি। ও ফেরৎ দিয়ে মাফ চেয়েছে। সুকুমারদার দিকে ও ফিরেও তাকায় না। তবে তোমাকে ও সন্দেহ করে। সৌম্যদাকে নিয়ে।"

"দূর। আমি ওকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি নাকি? আমিও ওর প্রতিদ্বন্দ্বী নই। কিন্তু সুকুমার যে কিছুতেই জুলিকে ভুলতে পারছে না। বছর বছর স্বপ্ন দেখছে ওকে। স্বপ্নে কথা বলছে। আমার তো সমুদ্রপথে আসারই কথা। আকাশপথে উড়ে এলুম কেন ছেলেকে নিয়ে? ওর স্বপ্নের জ্বালায়ই তো?" মিলি কবুল করে।

ওদিকে সুকুমার বলছিল স্বপনদাকে, "এই মরা দেশে আপনার মতো জীয়ন্ত সাহিত্যিক পড়ে আছেন কী করতে? এখানে কে আপনাকে চিনবে? চলুন ওদেশে, লিখুন ইংরেজীতে, থাকুন ব্লুমসবেরীর আশেপাশে। পাব-এ আড্ডা দিন। মেম্বার হোন অ্যাথীনিয়াম ক্লাবের। আপনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এদেশ কি বাঁচবে? ইংরেজরা চলে গেলে তাদের পরেই প্লাবন। হিন্দু মুসলমানে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছে একদল টিয়াপাখী। জানে না যে বিপ্লবের প্রথম শর্তই হচ্ছে হিন্দু জনগণের টিকিচ্ছেদ আর তাদের পুরোহিত কুলের উপবীতদাহ। টিকিও থাকবে, পৈতেও থাকবে, সাম্যও হবে, এর মতো আত্মপ্রবঞ্চনা আর নেই। আর মুসলমানরা যদি পণ করে থাকে যে প্রত্যেকটি বালককে সারকামসাইজ করবেই তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে ওদের সাম্য কোনোদিনই হবে না। ওদের বেলা বিপ্লবের প্রথম শর্তই হচ্ছে ত্বক্‌ছেদন নয়, ত্বক্‌রক্ষণ। এটা ওরা পেয়েছে ইহুদীদের কাছ থেকে। ইহুদীরা বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও আদিম সংস্কার ছাড়বে না। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এরা এখন বেখাপ। জার্মানীতে তো বেখাপ ছিলই। জায়নিস্টরা প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবার আয়োজন করছে। ওরা ফিরে যাবে দু'হাজার বছর পূর্বে। তুমি আমি বিংশ শতাব্দীর সন্তান, আমরা মনে করি মধ্যযুগের মুসলিম রাষ্ট্রে বা গুপ্তযুগের হিন্দু রাষ্ট্রে বা দু'হাজার বছর পূর্বের ইহুদী রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে বসবাস করা ভালো।"

স্বপনদা ফরাসী ধরনে দুই কাঁধ তুলে বলেন, "বিবাহের পর কেউ স্বাধীন নয়। তুমিও না আমিও না। এখন আমরা বনের পাখী নই, খাঁচার পাখী।"

ওঁরা নিচে নেমে এসে দেখেন বুফে ডিনার শুরু হয়ে গেছে।

"এই যে চকোলেট! কখন এলে? এই যে কমরেড চানু! মস্কোর কী হালচাল? এস, ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। সুকুমার দত্তবিশ্বাস। লণ্ডনের সোশিয়ালিস্ট। কমরেড অপরাজিতা সেন, ওরফে বাবলী, ওরফে চকোলেট। কমরেড প্রণব লাহিড়ী, ওরফে চানু। মস্কোর কমিউনিস্ট। সম্প্রতি এঁরা অর্ধেক

ইউরোপ, অর্ধেক জার্মানী, আর অর্ধেক বার্লিন জয় করেছেন।" স্বপনদা একটা প্লেট হাতে করে ঘুরে ঘুরে আলাপ করেন।

"বড়ো আনন্দিত আমি দেখে আপনাদের।" সুকুমার ইংরেজী থেকে তর্জমা করে বলে, "আমার হৃৎপিণ্ডটাও লাল। আমি সতেরো আঠারো বছর হলো ব্রিটেনবাসী। ইদানীং বি. বি. সি.-তে চাকরি করি। লাল ন্যাকড়াকে জন বুল ডরায়। তবে আমার পার্টির সম্প্রতি জয় হয়েছে। আমি ওদেরই মতো গোলাপী।"

স্বপনদা ওকে সাবধান করে দেন। "এদের সঙ্গে ইয়ার্কি করো না, সুকুমার। ইংরেজরা যদি চলে যায় আর হিন্দু মুসলমানে গৃহযুদ্ধ বেধে যায় তবে এরাই ফোর্ট উইলিয়াম ক্যাপচার করবে। লালবাজার তো লাল হয়েই রয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংও লাল। ওদিকে রেড রোডও লাল রঙের নাম বহন করছে। এক এক করে সব কিছু লাল হয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট হাউস, রেডিও স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, শেয়ালদা স্টেশন, এয়ারপোর্ট, রিভার পোর্ট। সবশেষে দিল্লীর লাল কেল্লা। সর্বত্র উড়বে লাল ঝাণ্ডা।"

"কক্ষনো না।" প্রতিবাদ করে জুলি। "লালকেল্লা নেতাজীর লক্ষ্য। আমরাই সেখানে ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়াব। তবে ফোর্ট উইলিয়াম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সেখানে হয়তো মুসলিম লীগের সবুজ নিশান উড়বে। আমাদের মুসলিম ভাইদের সঙ্গে তো আর আমরা মারামারি করতে পারিনে। লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ।"

দীপিকাদি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, " ফোর্ট উইলিয়াম আমরাই জিতে নেব।"

মিলি হাততালি দিয়ে বলে, "আমরাই। আমরাই। আমি দেশেই থেকে যাব। রণও থাকবে। সুকুমার, তুমিই বিলেতে ফিরে যাও।"

যূথিকা রঙ্গ করে, "গো ব্যাক, সাইমন।"

সুকুমার কোণঠাসা হয়ে বলে, "আমি নেহরু বলে একটি ঘোড়ার উপর বাজী রেখেছি। বাজী জিতলে এই দেশেই চাকরি নিয়ে বসে যাব।"

।। এগারো ।।

ডিনারের পর বিলিতী কেতা মেনে মহিলারা অন্য ঘরে যান। পুরুষরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। স্বপনদা রিফ্রিজেরাটর থেকে একটি বোতল বার করে, বলেন, "বোর্দো। আমার সমবয়সী। বিশ বছর আগে ফ্রান্সে কেনা। আরো তিনটে ছিল, খরচ হয়ে গেছে, এটিই এখন সবে ধন নীলমণি। এরও তো প্রায় শেষ দশা। বিশিষ্ট অতিথি না হলে খুলিনে। সুকুমার আজকের দিনের চীফ গেস্ট।"

তা শুনে সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে পানপাত্র হাতে টোস্ট প্রস্তাব করে। "টু দ্য হেলথ অভ দ্য লাস্ট রোমান্টিক অভ বেঙ্গলী লিটারেচার, স্বপনমোহন গুপ্ত।"

স্বপনদা তখনো তাঁর পরিবেশন সারা করেননি। "সৌম্য তো মহাত্মা হতে চলেছে। মানসও আমাদের মতো দুরাত্মা নয়। এই দুর্লভ পানীয় আমি অপাত্রে অপচয় করব না। কমরেড চানু, তুমি তো ভডকা ছাড়া আর কিছু ঠোঁট দিয়ে ছোঁবে না। তোমার জন্যে এখন ভডকা পাই কোথায়? তোমাদের তিনজনকে কফিই দিচ্ছি। কারো আপত্তি আছে?"

সৌম্য আর মানস আপত্তি করে না। চানু স্বপনদার দিকে এমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় যে তাঁর মায়া হয়। তাঁর মনে পড়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি। সার ফিলিপ সিডনীর মতো তিনি নিজের গ্লাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।"

চানু সঙ্কোচের সঙ্গে তুলে নিয়ে মুখে দেয়। এদিক ওদিক তাকায়। বাবলী দেখছে না তো?

স্বপনদা নিজের জন্যে আরেক গ্লাস ঢেলে চানুর দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার পার্টি তোমাকে নির্ঘাত পার্জ করবে। যদি টের পায় যে তুমি প্রোলিটারিয়ানদের প্রিয় পানীয় ভডকা ছেড়ে বুর্জোয়াদের মতো ক্ল্যারেট ধরেছ। পাবেই, চকোলেট তোমার মুখের গন্ধ থেকে টের পাবে।"

বেচারা চানু বাবলীর ভয়ে তেষ্টা ভুলে যায়। স্বপনদার দয়া হয়। তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন, "প্রাণ ভরে পান করো। ওটুকুতে নেশা হবে না। বাবলী ভালো করেই জানে যে অনেকেই ডুবে ডুবে জল খায়।"

এর পর তাঁর খেয়াল হয় যে টোস্টের উত্তরে কিছু বলতে হয়। "সুকুমার আমাকে যে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে আমি তার যোগ্য নই। এই তো মানস রয়েছে। এ কি কম রোমান্টিক? চানুদের দলেও রোমান্টিক কবি আছেন। তবে তাঁরা বর্ণচোরা রোমান্টিক। আগেকার দিনে প্রেমে পড়ার বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়ে যেত। রোমান্সের অবকাশ ছিল না। এখন তো মেয়েরাও ছেলেদের কলেজে যাচ্ছে। কো-এডুকেশনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। রোমান্টিক প্রেমের এই শেষ নয়, শুরু। কার কী মতবাদ সেটা তুচ্ছ। কার কী অনুভূতি সেইটেই আসল। মেয়েরা এখনো নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। যখন পারবে তখন দেখবে রোমান্টিকতায় সাহিত্য প্লাবিত হবে। যেমন হয়েছিল ইউরোপে গত শতাব্দীর প্রথম পর্বে। ইউরোপের বিচারে আমিই হয়তো লাস্ট, কিন্তু এদেশের বিচারে তা নই। ধন্যবাদ, সুকুমার। আমিও তোমার স্বাস্থ্য পান করি।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে মানস সুধায় সুকুমারকে, "এত নেতা থাকতে নেহরুর উপর বাজী রেখেছ কেন?"

"কংগ্রেস যেটাকে স্বাধীনতা বলছে সেটা ক্ষমতার হস্তান্তর ছাড়া আর কী? হস্তান্তর যারা করবে তারাই স্থির করবে কার হাতে হস্তান্তর করা যায়। নেহরু হচ্ছেন হ্যারো আর কেমব্রিজে শিক্ষিত। ইংরেজদের কাছে তাঁদেরই একজন। সোশিয়ালিস্টদের কাছেও তেমনি একই পালকের পাখী। বিলেতফের্তা অবশ্য আরো আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই শুধুমাত্র ব্যারিস্টার। এই যেমন গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, ভুলাভাই, লিয়াকৎ আলী। তাঁদের কারো হাতে ভারতের ভার দিলে ব্রিটেনের সঙ্গে কালচারাল ইউনিটি থাকবে না। জানো তো, আমি ফেবিয়ান সোসাইটির বহুদিনের সভ্য। লেবার গভর্নমেণ্টের কয়েকজনও তাই। আমি ন্যাশনাল লেবার ক্লাবেরও বহুদিনের মেম্বর। ক্লাবে গিয়ে প্রথম কাজ বার থেকে এক পেয়ালা মদ কেনা, কেউ সঙ্গে থাকলে তাকেও কিনে দেওয়া। তারপর লাউঞ্জে বসে মদ হাতে আড্ডা দেওয়া। লেবার পার্টির কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে আলাপ হয়। লেবার গভর্নমেণ্টের রাজা উজীরদের সঙ্গেও পরিচিত হই। ভিতরের খবর জানতে পারি। আসছে, আসছে, অবিলম্বে আরো এক কিস্তি রিফর্মস আসছে। এবার সেন্টারে। পুরোপুরি ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়েই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হবে। পরে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটবে। প্রত্যেক গভর্নমেণ্টের একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেণ্ট থাকেন। ভারতের বেলা প্রেসিডেন্টের কথা ভাবা যায় না। তা যদি হয় ব্রিটেনের রাজা ভারতেরও রাজা হতে পারেন না। ইংরেজরা সবাই রাজভক্ত। মায় শ্রমিক শ্রেণী। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করার মতো মহাপাপ তাদের দ্বারা হবে না। কিন্তু রাজাকে নামে মাত্র রাজা করতে তাদের বাধে না। কার্যত প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা। তেমন লোক ভারতে নেহরু ভিন্ন আর কে? তবে এর পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। মুসলিম লীগকেও সঙ্গে নিতে হবে। তা নইলে টোরি অপোজিশন বাগড়া দেবে। চার্চিল থাকতে মুসলমানদের ডুবিয়ে দেওয়া চলবে না। ওঁর কাছে মুসলমান মানেই লীগপন্থী মুসলমান। কাজেই বেশ কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। কেউ বলতে পারছেন না শেষ পর্যন্ত কী হবে। ক্রিপ্‌স কী যেন মুসাবিদা করছেন। তাঁর পেট থেকে কিছু বার করা অসম্ভব। তিনি মদ স্পর্শ করেন না। নিরামিষাশী।" সুকুমার একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

স্বপনদা দুই কাঁধ উঁচু করে বলেন, "এ জগতে সব কিছুই অনিশ্চিত, কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত।

জিন্নাকে নিয়ে কেউ গভর্নমেন্ট চালাতে পারবেন না। জিন্নাকে বাদ দিয়েও কেউ গভর্নমেন্ট চালাতে পারবেন না। জিন্না হচ্ছেন সেই দিল্লীকা লাড্ডু যাকে খেলেও পশ্তাতে হয়, না খেলেও পশ্তাতে হয়। নেহরু যদি গভর্নমেন্ট গঠনের দায়িত্ব নেন তাঁকেও পশ্তাতে হবে।"

মানস তর্ক করে, "কেন? ইংরেজরা কি পলিসি পরিবর্তন করতে পারে না? সরকার মনোনীত সদস্যদের গোষ্ঠী যদি নিরপেক্ষ থাকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসেরই তো মেজরিটি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রথা অনুসারে যে দলের মেজরিটি সেই দলের দলপতিকেই তো গভর্নমেন্ট গঠন করতে বলা হয়। আপাতত ভুলাভাই দেশাই করতে পারেন, পরে উপনির্বাচনে জিতে জবাহরলাল করবেন।"

"তা হলে তো জিন্না কোনো দিনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাঁর দল কোনো কালেই মেজরিটি হবে না। সেই জন্যেই তো তিনি পাকিস্তান দাবী করছেন। পাকিস্তান হলে সেখানেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। মুসলিম লীগ হবে মেজরিটি পার্টি। মুসলমান সম্প্রদায় হবে মেজরিটি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়কে নেশন বলা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু তারও নজীর আছে। ইহুদীরাও সেই কথা বলে ইহুদীস্থান দাবী করছে। ইংরেজরা এখন দোমনা। না পারে আরবদের চটাতে, না ইহুদীদের। এক্ষেত্রেও তাই। না পারে হিন্দুদের চটাতে, না মুসলমানদের।" সুকুমার ইংরেজদের পক্ষ নেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সেইজন্যেই বাপু বলেন, তোমরা হয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাও, নয় মুসলিম লীগের হাতে। আর নয় তো কারো হাতে ক্ষমতা না দিয়ে অমনি ভারত ছেড়ে যাও। দিনকতক অরাজকতার পর যে পারে সে গভর্নমেন্ট গঠন করবে। প্রাদেশিক স্তরে গভর্নমেন্ট গঠনে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও লীগ, কোথাও অন্যান্য দল এগিয়ে আসবে। কেউ বাধা দেবে না। গোলমাল যা হবে তা কেন্দ্রীয় স্তরেই। সেটাও মিটে যাবে, কংগ্রেস যদি জিন্নাকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ দেয়। নেহরুকে সবুর করতে হবে।"

"তা হলে আমার বাজী রাখা নিষ্ফল।" সুকুমার হতাশার ভান করে।

"ব্রিটিশ কর্তারা জিন্না সাহেবের হাতে একটা ভীটো ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বড়লাটের উপরেও ভীটো প্রয়োগ করে সিমলা বৈঠক বানচাল করলেন। এরপরে সেক্রেটারি অভ্ স্টেটের উপরেও তাই করবেন। ক্রিপ্‌স কেন মিছিমিছি আসছেন? জিন্নার হাতে ভীটো যতদিন থাকবে গান্ধীজী ততদিন সবুর করবেন। বয়স বাড়তে বাড়তে যদি একশো বছর হয় তা হলেও তিনি ধৈর্য ধরবেন। এমন দিন আসবে যেদিন ব্রিটিশ কর্তারাই অধৈর্য হবেন। সে কথা ভেবে বাপু আর নতুন কোনো আন্দোলনের কথা বলছেন না। তা হলেও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। যদি ডাক আসে তবে সাড়া দিতে হবে। গঠনের কাজই সেই প্রস্তুতি। তবে কংগ্রেস আপাতত নির্বাচনে নামবে ও সফল হলে প্রাদেশিক স্তরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে।" সৌম্য যতদূর জানে।

মানস তাকে সতর্ক করে দেয়। "জিন্না সাহেব বলেছেন কংগ্রেস যদি আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে ও তাঁর দলকে বখরা না দেয় তবে তিনি তুলকালাম কাণ্ড করবেন। এদিকে আমাদের এখানকার কংগ্রেস নেতারাও প্রত্যাশা করছেন যে এখানকার প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলের তাঁরাও শরিক হবেন। নয়তো তাঁরাও সহ্য করে যাবেন না। কারো কারো মাথায় প্রদেশ ভাগের চিন্তাও ঘুরছে। বাপু কি এসব জানেন না? তাঁর একশো বছর বয়স মানে তো আরো পঁচিশ বছর। কে ততদিন ধৈর্য ধরবে? বাংলা আর পাঞ্জাব তো বিপ্লবীদের লীলাক্ষেত্র।"

"ট্র্যাজেডী ঘনিয়ে আসছে।" স্বপনদা বেদনার স্বরে বলেন, "কর্ম থেকে কর্মফল এটাই তো সাধারণ নিয়ম। কজ্ থেকে এফেক্ট। কিন্তু ইতিহাস পড়লে মনে হয় এফেক্ট আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কজ্ তার দিকে অনিবার্যভাবে এগোয়। যেমন চুম্বকের টানে লোহা। যুদ্ধ বলো, বিপ্লব বলো, এক একটা চুম্বক। ঘটনার লোহা অপ্রতিরোধ্য গতিতে তার দিকে এগিয়ে যায়। দেশ গৃহযুদ্ধের অভিমুখে

চলেছে, আমি নীরব দর্শক।"

"আমি নীরব দর্শক হতে নারাজ।" মানস দৃপ্তকণ্ঠে বলে।

"আমিও কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারি? আমি সত্যাগ্রহী। প্রতিরোধই আমার কর্তব্য। সত্যাগ্রহীর অভিধানে অপ্রতিরোধ্য বলে কোনো শব্দ নেই। মানব ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতক মানুষ প্রতিরোধ করে আসছে। সহিংসভাবেই বেশী, অহিংসভাবে কম। আজকের দিনে তাদের কর্তব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। গৃহযুদ্ধও তো যুদ্ধ। তার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ চাই। দেশ যে গৃহযুদ্ধের অভিমুখেই অগ্রসর হচ্ছে এর কি কোনো সন্দেহ আছে? মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি। কতরকম আজব তত্ত্বই না শুনছি। মুসলিম লীগ নেতারা বলছেন হিন্দু আর মুসলমান দুই নেশন। যেমন ইংরেজ আর আইরিশ। হিন্দু মহাসভার নেতারা বলছেন হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, আর মুসলমানরা এলিয়েন। যেমন ইংরেজরা এলিয়েন। তফাতের মধ্যে এই যে মুসলমানরা রেসিডেন্ট এলিয়েন। এসব কথা শুনলে কার না গা জ্বালা করে? কে না মারমুখো হয়? হিন্দুস্থানে মুসলমানরা যদি এলিয়েন হয়ে থাকে তবে সেই এলিয়েনদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র স্থাপন করলেই মামলা মেটে। নয়তো মামলায় লড়ো। হামলায় পড়ো। ইংরেজরাই বিচারক হয়ে একটা রোয়েদাদ দিয়ে নিষ্পত্তি করুক। আমরা একটা রোয়েদাদ দেখেছি। আরেকটা দেখতে চাইনে। জানি যে ইংরেজরা অপক্ষপাত নয়। কংগ্রেস তাদের শত্রু, লীগ তাদের মিত্র। শত্রুর চেয়ে মিত্রের দিকেই ওরা ঝুঁকবে। সেটাই স্বাভাবিক। শেষকালে দেখা যাবে হিন্দুর হাতে মুসলমানের কান আর মুসলমানের হাতে হিন্দুর কান ধরিয়ে দিয়ে ওরা ক্ষমতার হস্তান্তর করেছে। ক্ষমতা পেয়ে আমাদের প্রথম কাজই হবে কৌরবে পাণ্ডবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কেউ কি অমন একটা কৃত্রিম সীমান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? বাংলা আর বিহারের মধ্যে কোথায় প্রাকৃতিক সীমান্ত? পাঞ্জাব আর যুক্তপ্রদেশের মধ্যেই বা কোথায়? রোয়েদাদ মেনে নেওয়ার চেয়ে গৃহযুদ্ধই শ্রেয়, কিন্তু সেটাই বা অবশ্যম্ভাবী হবে কেন? একপক্ষ যদি বলে, আমরা যুদ্ধ করব না, তার বদলে সত্যাগ্রহ করব, তোমরা যদি একতরফা যুদ্ধ করতে চাও তো করো, তা হলে তেমন একতরফা যুদ্ধ আপনি থেমে যাবে। মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে এই কয়েক বছরে হিংসার প্রেস্টিজ, সামরিক শক্তির প্রেস্টিজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। জঙ্গী মনোভাব সর্বত্র। লোকের ধারণা অহিংসা হচ্ছে দুর্বলের অস্ত্র। সবলের অস্ত্র হিংসা। হিন্দুদের মধ্যেও একটা জঙ্গী মনোভাব ব্যাপক। শিখদের মধ্যে তো কথাই নেই। আর মুসলমানদের তো জঙ্গী ঐতিহ্য। আমরা কোন্ পক্ষকেই বা বলব যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহ করতে? নৈতিক প্রতিরোধ করতে? দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে আমরাই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের মার খেয়ে প্রাণ হারাব।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"এই পাগলের সঙ্গে ক্যারামেলের বিয়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। এখন আর সংশোধনের উপায় নেই। মেয়েটা আবার বিধবা হবে ভাবতেও কষ্ট হয়।" স্বপনদা উত্তেজিত হয়ে বলেন।

"ঘটনার গতি ভালোর দিকেও যেতে পারে। সব চেয়ে খারাপটা আমরা ধরে নেব কেন? ইংরেজরা সকলেই কি লীগের দুই নেশন তত্ত্বের সমর্থক ও পার্টিশনের পক্ষপাতী? লেবার পার্টি সেটা পরিহার করতেই চেষ্টা করছে ও করবে। গৃহযুদ্ধও ইংরেজরা কেউ চায় না।" সুকুমার বিশ্বাস করে।

"দ্যাখ, সুকুমার, ইংরেজরা কী চায় না চায় সেটা তাদের বিদায় মুহূর্তে অবান্তর। ভারতীয়রা কী চায় না চায় সেইটেই বড়ো কথা। ভারতীয়দের অধিকাংশ চায় অবিভক্ত ভারত। কিন্তু আরেক অংশ পণ করেছে কিছুতেই হিন্দুদের আধিপত্য বা প্রাধান্য স্বীকার করবে না। দেশকে দু'ভাগ করে একটা ভাগের উপর মুসলিম আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে। তার জন্যে যদি দরকার হয় গৃহযুদ্ধে নামবে। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে তৃতীয় পক্ষেরই মধ্যস্থতা চাই। তৃতীয় পক্ষ যতই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেন কোনো পক্ষের দাবী পুরোপুরি মঞ্জুর করবে না, করতে পারে না। এটা এথিকাল প্রশ্ন নয় যে একপক্ষে ন্যায়, অপর পক্ষে অন্যায়। এটা পলিটিকাল প্রশ্ন। অনুরূপ প্রশ্নে জার্মানী একদা দু'ভাগ হয়েছে। জার্মানী

আর অস্ট্রিয়া। নেদারল্যাণ্ডস একদা দু'ভাগ হয়েছে। হলাণ্ড আর বেলজিয়াম। আয়ারল্যাণ্ডও এই শতাব্দীতেই দু'ভাগ হলো। আইরিশ ফ্রী স্টেট আর উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট তো একই ত্রাণকর্তার উপাসক। তাদের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য? হিন্দু আর মুসলমান তাদের তুলনায় অনেক বেশী পৃথক। এই পার্থক্যের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবেই। ইংরেজ থাকতেও যা, না থাকতেও তাই। এটাই আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। ইংরেজরা যদি না আসত এইরকমই হতো। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্‌। আমরা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতে পারি, কিন্তু মারামারি করতে গেলে ব্যর্থ হব। বৃথা রক্তক্ষয়। তেমনি একতরফা সত্যাগ্রহ আর আত্মবলিও বৃথা। শহীদ হতে হলে এই ইস্যুতে নয়। অন্য কোনো ইস্যুতে। যার একদিকে ন্যায়, অপর দিকে অন্যায়। তার সময় হয়তো পরে আসবে।" স্বপনদা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন।

"কী যে বলো, স্বপনদা।" মানস স্থির থাকতে পারে না। "তুমি কি ডিফীটিস্ট? মুসলিম লীগের কাছে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে? ওরা কি সব মুসলমানের প্রতিনিধি? তার প্রমাণ কী? সামনের সাধারণ নির্বাচনে জিততে পারবে? পাঠানরা ওদের দিকে নয়, পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা ওদের দিকে নয়, বাংলার কৃষক প্রজা মুসলমানরা ওদের দিকে নয়। অথচ ইংরেজরা ধরে নিচ্ছে যে সব মুসলমান ওদের দিকে। এটা ইংরেজদের অন্ধতা। ইচ্ছাকৃত অন্ধতা। নেলসনের মতো কানা চোখে টেলিস্কোপ লাগানো। রোয়েদাদ কখনো নয়। দরকার হলে লড়তে হবে। হিংসা অহিংসা উভয়েরই আশ্রয় নিতে হবে। ফাইট ইট আউট।"

"আমিও বলি রোয়েদাদ কখনো নয়। কিন্তু আমি এটাও বলি, হিংসা কখনো নয়। লড়তে যদি হয় তবে অহিংস পদ্ধতিতে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত নই। ইংরেজদের সঙ্গেও না। লীগপন্থী মুসলমানদের সঙ্গেও না। আমরা মিটমাটের জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করব। যতদিন পারি গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখব। বেধে গেলে মাঝখানে দাঁড়াব। ফলাফল আমাদের হাতে নয়। ভগবানের হাতে।" সৌম্য চোখ বুজে ধ্যান করে।

"তার আগে তোমাদের ক্ষমতার মায়া কাটাতে হবে। ইংরেজদের সর্বান্তঃকরণে বলতে হবে যে তোমরা ক্ষমতা চাও না। ওরা যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাক। নয়তো শূন্যতা সৃষ্টি করে যাক। তার পর যার ইচ্ছে সে ক্ষমতা দখল করুক। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। যেটা সম্ভবপর সেটা হচ্ছে এক একটা প্রদেশের ভার এক একটা দলকে দিয়ে যাওয়া। তখন গড়ে উঠবে কংগ্রেসের একটা ফেডারেশন, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য মুসলিম দলের একটা ফেডারেশন, রাজন্যদের একটা ফেডারেশন পরে হয়তো সকলের সম্মতি নিয়ে কনফেডারেশন গড়ে উঠবে। কিন্তু কোথাও সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি, হয়ে থাকলে হয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। এদেশে তার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যতদূর দৃষ্টি যায় ইংরেজ চলে গেলে ঐক্যও চলে যাবে। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্‌। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, এফেক্ট তেমনি কজ্‌কে টানে। সব নদী যেমন সমুদ্রের পানে ধায় সব কারণ তেমনি বিচ্ছেদের পানে। গান্ধীজী যদি বিচ্ছেদকে মিলনে রূপান্তরিত করতে পারেন তা হলেই ইংরেজ চলে গেলেও ঐক্য বজায় থাকবে। সে আশা আমি রাখিনে। তবে এখনো বিশ্বাস করি যে ভারত ভেঙে গেলেও বাংলা ভেঙে যাবে না। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্‌, বাট বেঙ্গলী ইউনিটি ইজ নট। কিন্তু কে জানে, সেটাও হয়তো লস্ট কজ্‌। ট্র্যাজেডীর উপর ট্র্যাজেডী।" স্বপনদার কণ্ঠে বিষাদ।

"তুমি আর একটি ক্যাসাণ্ড্রা।" মানস জ্বলে ওঠে। "কেবল ট্র্যাজেডীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেই জানো। তুমি ডিটারমিনিস্ট, ডিফীটিস্ট, পেসিমিস্ট। তোমাকে হিউমানিস্ট বলে মনে হয় না। হিউমানিস্ট হলে তুমি বলতে ভারতের ঐক্য বহু শতকের বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের চাকা মধ্যযুগের দিকে ঘুরতে

পারে না। মুসলিম লীগ বাগড়া দিতে পারে, টোরি পার্টি বাধা দিতে পারে, কিন্তু বিবর্তনের সূত্রে যে ঐক্য এসেছে সেটা ইংরেজ বিদায়ের পরেও আপনার পথ আপনি করে নেবে। গৃহযুদ্ধ অসম্ভব নয়, কিন্তু গৃহযুদ্ধে লিঙ্কনেরই জয় হয়, জেফারসন ডেভিসের নয়। এদেশেও নেহরুর জয় হবে, জিন্নার নয়। বাপুর নাম করছিনে, তিনি তো যুদ্ধবিরোধী। লড়তে হবে নেহরুকেই। কিন্তু হবেই বা কেন গৃহযুদ্ধ? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী যদি নেহরুকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, বাপু যেমন করেছেন। নইলে যেটা হবে সেটা ওয়ার অভ্ সাকসেসন। কংগ্রেস গোড়ায় বিফল হলেও আখেরে সফল হবে।" মানসের ভবিষ্যদ্বাণী।

"না, ভাই, আমরা যারা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরোধী তারা কখনো গৃহযুদ্ধ বা উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমর্থন করতে পারিনে। তবে অহিংস সংগ্রাম আমরা করতে পারি, যদি উপায়ান্তর না থাকে। কিন্তু সেটা বিদেশী শাসকদের সঙ্গেই, স্বদেশবাসী মুসলমান ভাইদের সঙ্গে নয়। জিন্না সাহেব আমাদেরই এক ভাই, তাঁর অনুগামীরাও আমাদের কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি ভাই। অর্জুনের মতো আমাদেরও দোটানা। সংগ্রাম করব, না করব না? অহিংস সংগ্রামও ক্রমে হিংসার বদলে প্রতিহিংসায় পথভ্রষ্ট হতে পারে। অনায়াসেই পরিণত হতে পারে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হবেই, আর সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হলে মিলন হবে কী করে? বিচ্ছেদই তো তার অনিবার্য পরিণাম। আমরাই ডেকে আনব পার্টিশন। ভারতেরও, বাংলারও। একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না। ঐক্য যাবেই, ঐক্য গেলে স্বাধীনতাও আসবে না। ঐক্য আর স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইংরেজরাই থেকে যাবে। যেতে চাইলেও চারদিক থেকে রব উঠবে, 'তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী।' না, অরাজকতার সামনে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের নেই। জাপানী আক্রমণের মুখে যেটা মন্দের ভালো ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মুখে সেটা মন্দ।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

ওদিকে দীপিকাদির কফির আসরে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিলি বলছিল জুলিকে, "এই একটা বদ্ অভ্যাস ওদেশে গিয়ে আমি পেয়েছি, কিন্তু আর সবই সদ্ অভ্যাস। অমন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন আমাদের এদেশে কোথায়? আমরা না জানি ঠিক সময়ে খেতে, না ঝি চাকরকে বিরাম দিতে, না বাইরে গিয়ে বাজার করতে, না নিজেরাই বয়ে আনতে। অথচ মুখে বিপ্লবের বুলি। কাজের সময় কাজ, আড্ডার সময় আড্ডা। কাজে ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে ওরা জানে না। কাজের সময় মুখ বুজে কাজ করে যায়, বড়ো জোর একটু আবহাওয়া নিয়ে মন্তব্য করে। আর আমরা? গল্প করতে পারলে আর কিছু চাইনে। যাক, ওসব বলে তোকে বোর করছি না তো? তুই নিজেও তো ওদেশে ছিলি। তোকে নতুন কথা আর শোনাব কী? হাঁ, একটা কথা সত্যি শোনাবার মতো। যুদ্ধকালে ইংরেজদের যে সঙ্ঘবদ্ধতা, যে ডিসিপ্লিন, যে আদেশ বা নির্দেশ মেনে চলা, যে কর্তব্যজ্ঞান তার তুলনা আমাদের দেশে কোথায়? আমরা সবাই রাজা, কেউ কারো অধীনে কাজ করব না। দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নীতিগত কারণে নয়, সেটা একটা মুখোশ। কারণটা ব্যক্তিগত। ইংরেজরা যে আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বা বেশী সাহসী তা আমি মানব না। কিন্তু তারা জানে কেমন করে বিপদ কালে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে কর্তব্য পালন করতে হয়। ওদের অগ্নিপরীক্ষার প্রহরে আমি ওদের দেখেছি। যাকে বলে ইংলণ্ডের ফাইনেস্ট আওয়ার। যখন নাৎসীরা আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে লণ্ডন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, একজনও ভয় পায়নি, পালায়নি। নাৎসীদের মার খেয়ে অটল থেকেছে বা অকাতরে মরেছে। নাৎসীরা ভেবেছিল ফ্রান্সের মতো ইংলণ্ডকেও কাবু করবে। জানত না চার্চিল কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সেই সঙ্গে কৌশলী। আমার দেশ আমেরিকাকে নামিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধে, তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। যা কেউ কখনো পারত না সোভিয়েট রাশিয়াকেও করেছেন ক্যাপিটালিস্ট ইংলণ্ডের মিত্র। ইংরেজরা যে জিতে গেল তার অর্ধেক কারণ তো তাদের ডিপ্লোমেসী। বাকীটা তাদের মনোবল। যাকে বলে মরাল। ছ'বছর

ধরে আমি সব দেখেশুনে যা শিখেছি তা হাজার পুঁথি পড়ে শেখা যেত না। না রে, ডিগ্রী আমি পাইনি। ছেলের মা হয়ে পড়াশুনায় মন দেব কী করে? রণই আমার ডিগ্রী।"

জুলি পরিহাস করে বলে, "তোর আর আশা নেই, মিলি। ঝাঁসীর রাণী হওয়া তোর ভাগ্যে নেই। রাণীর তো সন্তান ছিল না। হ্যাঁ, ছিল। তার নাম ঝাঁসী। ফাইনেস্ট আওয়ার ভারতেরও আসবে। বিদ্রোহী সিপাহীরা তোর দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

মিলি পাল্টা দেয়। "তোরও আশা নেই, জুলি। জোন অভ্ আর্ক হওয়া তোর অদৃষ্টে নেই। তার বদলে হবি কস্তুরবা গান্ধী। সিপাহী বিদ্রোহের দিন তোর কোনো ভূমিকা থাকবে না। ইংরেজরা তোকে ভুলেও ধরবে না, পোড়ানো দূরে থাক। তবে জনতা তোকে দেবী বলে ভক্তি করবে।"

দীপিকাদি ওদের মাঝখানে না বসলে ওরা হয়তো হাতাহাতি করত। তিনি রণকে আদর করতে করতে বলেন, "ততদিনে রণ বড়ো হয়ে থাকবে। ও-ই সিপাহীদের পরিচালনা করবে। সিপাহী বিদ্রোহের ঢের দেরি আছে, মিলি আর জুলি। তার আগে হিন্দু মুসলমানের একজোট হওয়া চাই। তার লক্ষণ কই?"

"সত্যি বলেছেন, বৌদি। এ সমস্যা তো ইংলণ্ডে ছিল না। থাকলে ওরাও একজোট হতো কি-না সন্দেহ। নেতাজী সুভাষ জাপানের যুদ্ধবন্দীদের একজোট করতে পেরেছিলেন, সেটা কিন্তু ভারতের বাইরে। দেশে ফিরে এসে তারা আবার বিভক্ত হয়ে গেছে। কতক চলে গেছে মুসলিম শিবিরে। লড়লে তারা লড়বে ইংরেজের সঙ্গে নয়, হিন্দুর সঙ্গে। ভারতের আজাদীর জন্যে নয়, পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। লক্ষণ শুভ নয়।" মিলি আফসোস করে।

"আমি, ভাই, সিপাহী বিদ্রোহের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মার্সিনারি। যার নিমক খায় তার বিরুদ্ধে লড়বে না, লড়লে ওই চর্বি টর্বি একটা কোনো অরাজনৈতিক ইস্যুতে লড়বে। আমি নির্ভর করি জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদ্রোহের উপরে। তবে তার জন্যেও চাই দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি। হাতিয়ার হাতে নয়, শুধু হাতে। এমন কোনো ইস্যুতে লড়তে হবে যেটা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে জীবন মরণের ব্যাপার। সেটা ঠিক এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। বাপু আমাদের নেতৃত্ব করে এসেছেন, তিনিই নেতৃত্ব করবেন। তাঁকে তো আমরা আরো পঁচিশ বছর পাচ্ছি। তিনি একশো বছর বয়স অবধি বাঁচবেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনের মতো একটা ইস্যু পাওয়া যাবে নিশ্চয়। আমরা অপেক্ষা করব। ক্ষমতার জন্যে যারা লোলুপ তাঁরাই আপসের কথা ভাবছেন। আর আপসের সম্ভাবনা দেখা দিলেই জিন্না তার সুযোগ নেবার জন্যে নুখিয়ে আছেন। কংগ্রেস কিছু পেলে তো লীগও কিছু খাবে। হিন্দুস্থান বলে একটা রাষ্ট্র হলে তো পাকিস্তান বলে একটা রাষ্ট্রও হবে। কিন্তু হিন্দুস্থান হতে দেব না আমরা। পার্টিশন হতে দেবই না। আমরা জাতীয়তাবাদী।" জুলি উদ্দীপ্ত স্বরে বলে।

"ঘটনা তোদের জন্যে অপেক্ষা করবে না, জুলি। অ্যাটলী চার্চিল নন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে, তাই নিয়ে কথাবার্তা চালাতে চান। তা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে চার্চিল শেষমুহূর্তে জিন্নার মুখ চেয়ে কাঁচিয়ে দিতে পারেন। তখন আমাদের লড়াই না করে উপায় থাকবে না। আর সে লড়াই তোদের বাপুর খাতিরে অহিংস হবে না। কিন্তু আমার বোধহয় ঝাঁসীর রাণী হওয়া চলবে না। রণ কবে বড়ো হবে, ততদিন কি লড়াই বন্ধ থাকবে?" মিলি গালে হাত দিয়ে বসে।

"এবার রোজা লুকসেমবুর্গ কী বলেন শোনা যাক।" দীপিকাদি বাবলীর দিকে তাকান। বাবলীর কোলে এলফ ছিল। তার দিকেও।

এল্‌ফের মুখে একখানা ক্র্যাকার ধরিয়ে দিয়ে বাবলী বলে, "ও কী, বৌদি, আপনিও পরিহাস শুরু করলেন? কার সঙ্গে কার তুলনা! আমি কি রোজা লুকসেমবুর্গের মতো অসাধারণ মনস্বিনী নারী!

তবে আজকের ভারতে আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে। আমরাও জনগণের মধ্যে সক্রিয়। দেশ যতদিন না সত্যিকার বিপ্লবের জন্যে তৈরি হয়েছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্যে নয়, ততদিন আমরা মার্ক টাইম করব। তার মানে ছোটোখাটো সংগ্রামের পায়চারি। এই যেমন তেভাগা আন্দোলন। আমাকে যে-কোনোদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। গ্রেপ্তার যদি না করে তবে আমার ঠিকানা অনির্দিষ্ট। এটা ঠিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় বলে অনেক কটু কথা শুনতে হবে। মিলি আর জুলি আমাকে দেশদ্রোহীও বলতে পারে। কিন্তু আপনি যেন বিশ্বাস করেন যে আমাদের লক্ষ্য সত্যিকার বিপ্লব।"

॥ বারো ॥

পরের দিন বিদায় নেবার সময় মানস বলে স্বপনদাকে, "তোমার বাড়ীতে তোমাকেই আমি কাল যা তা বলে অপমান করেছি। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ক্ষমা যদি করো তো নিজ গুণেই করবে।"

"দূর পাগলা! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মান অপমানের প্রশ্নই ওঠে না। তুমি এমন কী বলেছ যে আমার মানহানি হবে? তোমার বৌদি তো বলেন আমি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। হা হা হা! হাসব না কাঁদব! আরে বাবা, যাদের সঙ্গে দুশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসিনি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসেনি? তেমনি, যাদের সঙ্গে সাতশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসিনি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসেনি? তুমি আমি রাজনীতির লোক নই, আমরা সাহিত্যিক। অর্ধসত্য নিয়ে আমাদের কারবার নয়। আমরা পূর্ণসত্যের পূজারী। পূর্ণসত্যটা এই যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র শাসক শাসিতের নয়। কিংবা শুধুমাত্র শোষক শোষিতের নয়। ওরা এদেশ থেকে মহাপ্রস্থান করলেও একই পৃথিবীতেই বাস করবে। ওদের সঙ্গে মিত্র সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ঘৃণার চেয়ে বলবান হবে প্রেম। প্রেমই ওদের আপন করবে। আপন করবে আমাদেরও। আমি যদি সুদীর্ঘ অতীতের চেয়ে সুদীর্ঘতর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করি তবে আমি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজ হইনে, হই একজন প্রকৃত ভারতীয়। একই কথা খাটে মুসলমানদের বেলাও। ওরাও ভাবগতিক দেখে মহাপ্রস্থানের তালে আছে। কিন্তু আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায় নয়। ভারতেরই একটা ভাগ কেটে নিয়ে সেই ভাগটাকে আস্ত একটা রাষ্ট্রের আকার দিয়ে সেই আজব স্থানে। যার আনকোরা নাম পাকিস্তান। আদমের পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়ার সৃষ্টি। খ্রীস্টানরা যাকে বলে ইভ। আমাদের পাঁজরের একখানা হাড় কেটে নিলে আমাদের কষ্ট হবে বইকি। আদমেরও হয়েছিল। কিন্তু পরে তার থেকেই তো আসে মধুর রস। এবারেও তাই হবে। ওরাও আমাদের আপন হবে, আমরাও ওদের আপন। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। তবে একটু আধটু ফ্লার্ট করবে বইকি পরনারী বা পরপুরুষের সঙ্গে। এক যেখানে দুই হয়েছে সেখানেই এই রঙ্গ। আর এইজন্যেই তো স্বাধীনতা। আমরা কেন ধরে নেব যে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের চিরশত্রু হবে? না, হিন্দুস্থান নামটা আমি পছন্দ করিনে। ইণ্ডিয়া কি দোষ করল? ভারতের কী দোষ? বিনা দোষে ওদের তালাক দিতে নেই।"

মানস আশ্চর্য হয়। "বাংলাদেশ তা হলে পাকিস্তানে যাচ্ছে! তুমিও যাচ্ছ সেই সুবাদে। ভারতের হয়ে কথা বলার এক্তার তো তোমার নয়।"

"না, না, বাংলাদেশ পাকিস্তানে না যেতেও পারে। সে একাই একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে। এই অপশনটা তাকে দিতে হবে। আমরা বাঙালীরা হচ্ছি ভারতবর্ষের ফরাসী। ফ্রান্স যেমন অবিভাজ্য বাংলাদেশও তেমনি। বিপ্লব আমাদের রক্তে। হিন্দু মুসলমানের লড়াই আমাদের বিপ্লব ভুলিয়ে দেবে।

কলকাতা আমাদের প্যারিস। এখানেও যদি ওখানকার মতো ধর্মের জন্যে সেন্ট বার্থলোমিউজ্ ডে ম্যাসাকার হয় তবে সব মাটি। বাংলাদেশও ভাগ হয়ে যাবে।" স্বপনদা অন্য দু'এক কথার পরে বলেন, "Au revoir!" পুনর্দর্শনায় চ।

ট্রেনের কামরায় মানসরা চারজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। গুছিয়ে বসে যূথিকা সুধায় মানসকে, "তোমাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন? পূব বাংলায় ফিরতে তুমি চাওনি, তবু যেতে হচ্ছে। এইজন্যেই কি?"

"না, জুঁই। তা নয়। পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ব বাংলাই আমি পছন্দ করি। কিন্তু এই ছ'বছরে একটা ব্রেক হয়ে গেছে। জোড় মেলাতে সময় লাগবে। সেসব পরের কথা। যা নিয়ে আমি চিন্তিত তা স্বপনদার সঙ্গেও আমার ব্রেক ঠিক নয়, তবে পায়ে পা মিলছে না।"

"তাই নাকি? ব্যাপার কী?" যূথিকা বিচলিত হয়।

"স্বপনদা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। যা হবার তা হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর আমি যদি মনে করি সেটা ভুল পদক্ষেপ আমার তো কর্তব্য সেটা নিবারণ করা। তা না করলে পরের পদক্ষেপগুলোও ভুল পদক্ষেপ হবে। তখন নিবারণ করা আরো কঠিন হবে। স্বপনদার কী? ঐতিহাসিক নিয়তি বা গ্রীক ট্র্যাজেডী বলেই তিনি সব সহ্য করবেন। আর আমি ইমপোটেন্ট হয়ে ছটফট করব। আমাদের দুই বন্ধুর সম্পর্কে চিড় ধরেছে, জুঁই।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী? খুলে বলছ না কেন?" যূথিকা কৌতূহলী হয়।

"আহা, ধৈর্য ধরো। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে ইংরেজরা চলে গেলে ভারত কি আস্ত থাকবে, না ভাগ হয়ে যাবে? স্বপনদা ধরে নিয়েছেন যে দেশটা ভাগ হয়ে যাবে, সেটাই নাকি ভারতের নিয়তি। কিন্তু বাংলাদেশের বেলা আরো একটা অপশন আছে। বাংলাদেশ হতে পারে তৃতীয় এক স্বাধীন রাষ্ট্র। কারণ আমরাই এদেশের ফরাসী, ফ্রান্সের মতো বাংলাদেশও অবিভাজ্য। আর বিপ্লব নাকি আমাদের রক্তে। তবে তিনি আশঙ্কা করেন যে কলকাতায় যদি প্যারিসের মতো সেন্ট বার্থলোমিউজ ডে ম্যাসাকার পুনরভিনীত হয় তা হলে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবে।" মানস শঙ্কিত স্বরে বলে।

"বটে? কিন্তু ওই যে কী ডে বললে ওটাতে কী হয়েছিল? আমার ইতিহাসের জ্ঞান তোমার মতো ব্যাপক নয়।" যূথিকা জিজ্ঞাসু।

"ফরাসীদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত দিবস। তারিখটা ১৫৭২ সালের ২৪শে আগস্ট। রাজমাতার প্ররোচনায় রাজার আদেশে সেই রাত্রে যে নিধন পর্ব শুরু হয় তা দিনের পর দিন কয়েকদিন ধরে চলে ও প্যারিসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। শত শত প্রোটেস্টান্ট নিহত হয়।" মানস বর্ণনা করে।

যূথিকা শিউরে ওঠে। "ও প্রসঙ্গ থাক। বাচ্চারা এখনো ঘুমোয়নি। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবে।" সে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

"শোন, কাল কেমন মজা হলো। আমরা পাঁচজনে বসে একটা নতুন আবিষ্কার করলুম। খেলাটার নাম কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন জেলফেরতা — বাবলী আর মিলি আর জুলি। বৌদি আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন বিলেতফেরতা — বৌদি আর জুলি আর মিলি। বাবলী আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের চারজন বিবাহিতা— বৌদি আর মিলি আর জুলি আর আমি। বাবলী কোণঠাসা। পাঁচজনের দু'জন মা হয়েছে— মিলি আর আমি। আমরাই কোণঠাসা। পাঁচজনের একজন দু'বার মা হয়েছে— আমি। আমিই কোণঠাসা। অনার্স ভাগ করে নিই বাবলী আর আমি। এ তোমার দেশভাগ প্রদেশভাগের চেয়ে ভালো খেলা।" যূথিকা হাসে।

দীপক আর মণি ঘুমিয়ে পড়েছে অনুমান করে যূথিকাই আবার কথাবার্তার খেই হাতে নেয়। "তোমরা ভারতবর্ষের ফরাসীও নও, ইংরেজও নও, তোমরা ভারতবর্ষের গোল।"

উপরের বার্থ থেকে দীপক বলে ওঠে, "নর্থ পোল না সাউথ পোল?"

"না, বাবা। পোল মানে এখানে পোলাণ্ডের লোক। যেমন মাদাম কুরী। যেমন শোপ্যাঁ।" যূথিকা তার পিয়ানোয় শোপ্যাঁ বাজিয়ে শুনিয়েছে।

"মাদাম কুরী তো রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। আমিও ভাবছি সেই রকম একটা কিছু আবিষ্কার করব।" দীপক ইতিমধ্যেই ভাবুক হয়েছে।

"আগে তো বড়ো হও, তার পরে ওকথা ভাববে।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"ততদিনে সবাই সবকিছু আবিষ্কার করে থাকবে। আমার জন্যে কিছু বাকী থাকলে তো?" দীপক শুষ্ক কণ্ঠে বলে।

মানস তা শুনে গুরুদেবের কবিতা আওড়ায়, "ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, কিছু নাই তোর ভাবনা। নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।"

দীপক ঠাণ্ডা হলে যূথিকা আবার খেই ধরে, "তোমাদের মধ্যে রবীন্দ্র, অরবিন্দ, জগদীশ, অবনীন্দ্র হয়েছেন। পোলদের চেয়ে তোমরা কিসে কম? কিন্তু তাদের মতোই তোমরা আত্মকলহে জর্জর, তেমনি বিপ্লবপ্রেমিক। তাই তেমনি ভাগ্যহত। ওরা তেভাগা হয়ে যায়, ওদের দেশ ভাগ করে নেয় রাশিয়া, প্রাসিয়া আর অস্ট্রিয়া। আর তোমরা তো পলাশীতে যে রেকর্ড দেখালে সেটা বিশ্ব রেকর্ড। একমুঠো ইংরেজের হাতে হেরে গিয়ে তিন তিনটে প্রদেশ হারালে। সেটাও একরকম তেভাগা। পোলরা প্রায় দেড়শো বছর পরাধীন হয়ে কাটিয়ে দিল। তোমরাও তো দেড়শো বছর কাটালে, আর কদ্দিন কাটাবে কে জানে! স্বাধীন হলেও যে অবিভক্ত হবে তাও নয়। কেউ কেউ এখন থেকেই লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করো ভারতের রাজধানী আর কলকাতায় ফিরবে না। যতদিন তোমরা ভারতের রাজধানীর লোক ছিলে ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রেও তোমাদের নেতৃত্ব ছিল। সে নেতৃত্ব তোমরা বরাবরের মতো হারিয়েছ। একজন দেশবন্ধু কি একজন নেতাজী সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন না।"

মানস ঠেস দিয়ে বলে, "তুমি তো প্রায় আজন্ম দিল্লীওয়ালী। তোমার নিজের তো আমাদের মতো অবনতি বা অধোগতি হয়নি।"

"ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমি আসতে চাইনি, তুমি যখন কথাটা তুলেছ তখন শোন। দিল্লীতে বদলীর বছর এগারো বারো পর্যন্ত বড়লাটের দিল্লীর বা সিমলার বাড়ীতে যখনি বড়গোছের পার্টি হয়েছে আমার বাবাকেই তার তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে। আর আমাকেও তিনি সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। সেই সূত্রে বহু সাহেব মেম ও বিশিষ্ট ভারতীয় অতিথির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বার বার দেখাসাক্ষাতের ফলে আলাপও হয়েছে। বার বার আলাপের ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য মিস্টার জিনা।"

উপর থেকে দীপক বলে ওঠে, "জিন্না।"

"না, বাবা। জিনা। সাহেবী উচ্চারণ। তুমি এখনো জেগে। যাও, ঘুমবাবুর দেশে যাও। ওখানে খুব মজা।"

মানস উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। আরো শুনতে চায়। যূথিকা শোনায়। "জিনার মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ দেখেছি তা আর কারো মধ্যে নয়। সাহেবদের সঙ্গে তিনি সমানে সাহেব। কারো চেয়ে খাটো নন। বড়লাটের সঙ্গে তিনিও বড়লাট। নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, চির উন্নত মম শির। শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির। দেখে আনন্দ হয় যে সরকারী বা আধা-সরকারী মহলে এমন একজন ইণ্ডিয়ান আছেন যাঁকে লাট বেলাটরাও সমীহ করেন। গোখলেকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার বয়স পাঁচ ছয়। আবছা মনে পড়ে। সাহেব নন, দুর্ধর্ষ স্বদেশী। জিনার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সাহেব

হয়েও দুর্ধর্ষ। তাঁর চেয়ে আমার আরো ভালো লাগত মিসেস জিনাকে। তিনি কিন্তু মেমসাহেব ছিলেন না, ছিলেন আক্রমণশালী ভারতীয়। বড়লাটকে দিয়ে নমস্কার করিয়ে নেন। বলেছি সে কাহিনী। যে কথা বলিনি তা শোন। আমাকে দেখে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইওর ডটার? বাবা বলেন, ইয়েস, মি লেডী। মাই ওনলি ডটার। যাঁদের স্বামীরা লর্ড বা নাইট নন তেমন কোনো মহিলাকেই বাবা মি লেডী বলতেন না। মিসেস জিনাই একমাত্র ব্যতিক্রম। বাবার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে মিস্টার জিনা শীগগিরই নাইট হতে যাচ্ছেন। ঠিক জানিনে, তবে জিনাকে বার বার অতি উচ্চ পদ বা সম্মান অফার করা হয়েছিল। তিনি গ্রাহ্য করেননি। সেটা কিন্তু তিনি অসহযোগী বলে নয়। তাঁর নীতি ছিল আমি আপনারে ছাড়া কারেও করি না কুর্নিশ। সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধির হাত থেকে কিছু নিলে তো নত হতে হয়। যাক, মিসেস জিনার কথাই হোক। সেদিন তিনি আমাকে দেখে বলেন, আমারও যদি এইরকম একটি মেয়ে হতো! ঈশ্বর বোধ হয় আড়ি পেতে শোনেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন।"

উপর থেকে আওয়াজ আসে, "তোমার মতো একটি মেয়ে হয়?"

"দুষ্টু ছেলে। এখনো তুমি ঘুমবাবুর দেশে যাওনি।" মিষ্টি করে ধমক দেন তার মা। তার পর বলেন, "আহা বেচারি রতনপ্রিয়া। অকালে মারা যান। জিনার পারিবারিক জীবনে আর কী বাকী রইল? ওই কন্যাই তাঁর নয়নের মণি। তাঁর জন্যে আমি বেদনা বোধ করি। কিন্তু বুঝতে পারিনে হাসব না কাঁদব যখন শুনি যে তাঁর কন্যা তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করে চলে গেছে বিলেত। বর সার নেস্ ওয়াডিয়ার ছেলে নেভিল। নেভিল কিন্তু ডেভিল নয়। সে তাঁর ধনকুবের পিতার উত্তরাধিকারী হলে কী হবে, মুসলমান নয়, পার্শী খ্রীস্টান। বলা বাহুল্য, জিনার মাও ছিলেন পার্শী। রক্তেরও একটা টান আছে। আর বিয়ের বয়স হয়ে থাকলে মেয়ের কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই? জিনাকে বোঝায় কে? আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ। অবিকল আমার বাবার মতো। ভুলে গেলেন যে নিজেও তিনি রতনপ্রিয়াকে সার জাহাঙ্গীর পেতিতের অমতে বিয়ে করে নজীর রেখেছিলেন। সেইদিনই আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে জিনা আর সেই সেকুলার ইণ্ডিয়ান বা প্রায় ইউরোপীয়ান নন, নেতা হতে গিয়ে তিনিও হয়ে উঠেছেন গোঁড়া মুসলমান। সেই জিনা কখনো দেশভাগের কথা কল্পনাও করতেন না। এই জিনা শাইলকের মতো ছুরি আস্ফালন করছেন। এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেন। যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ, তাঁর দাবী তিনি আদায় করে নেবেনই।" যূথিকা সুনিশ্চিত।

মানস আত্মগত ভাবে বলে, "তা হলে বাপু আর প্রাণে বাঁচবে না। অনশনে দেহত্যাগ করবেন। তাতে যদি লীগপন্থীদের অন্তঃপরিবর্তন হয়।"

"বর্ণান্ধ ইংরেজ আর ধর্মান্ধ মুসলমান একই ধাতুতে গড়া। সে ধাতু ইস্পাত। তাদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো মহাত্মারও সাধ্য নয়। গতবারের অনশনে তো লক্ষ করলে। লর্ড লিনলিথগাউর বা মিস্টার জিনার কি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ পেলো। তাঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নির্মম। জিনা তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছেন, বার বার জেলে গিয়ে অপচয় করেননি। কংগ্রেস নেতারা যেমন করেছেন। এঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। তিনি একদম তাজা। বড়লাট যদি তাঁর দিকে ঝোঁকেন তা হলে কি আর রক্ষে আছে? একমাত্র ভরসা অ্যাটলী। কিন্তু তার বিপরীত দিকে চার্চিলও বিদ্যমান। ব্যাপারটা এমনভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে যে হাত দিয়ে জট খুলতে পারা যাবে না। কাঁচি দিয়ে কাটতেই হবে। তার মানে পার্টিশন। তা বলে শুধুমাত্র ভারতের নয়। লীগপন্থীদের সমঝিয়ে দিতে হবে যে পাঞ্জাবের তথা বাংলারও। তাতে যদি তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। তবে ইংরেজকে তাড়াতেই হবে। যত নষ্টের গোড়া ওদেরই ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি। তার থেকেই এসেছে জিনার ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট।" যূথিকা নিদ্রার উদ্যোগ করে।

"তা হলে জিনাকেই দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিয়ে বড়লাট বিদায় হোন। এই একমাত্র সমাধান।

আমরা ঝুঁকি নেব।" ইতি মানস।

"মরি মরি কী চমৎকার সমাধান! মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ শাসনের পর ফের মুসলিম শাসন, ভারতের ভাগ্যে যেন আর কোনো বিকল্প নেই! কিন্তু শিখ বলে এখনো একটা সম্প্রদায় রয়েছে। শিখেরা যখন ক্ষেপে গিয়ে যুদ্ধটুদ্ধ বাধিয়ে দেবে তখনি হবে সমস্ত তর্কের অবসান।" ইতি যূথিকা।

সকালবেলা স্টীমারযাত্রা। দীপককে তার নতুন জ্যাঠাইমা একজোড়া বাইনোকুলার কিনে দিয়েছেন, তাই চোখে লাগিয়ে সে নদীর দু'ধারের গ্রামে গঞ্জে কত কী আবিষ্কার করছে। আর মণিকাকে তিনি কিনে দিয়েছেন একটা মিহি নীল শাড়ী। তাই পরে সে ফুর ফুর করে পরীর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে তাদের মা তাদের দু'জনের উপর দুই চোখ রেখেছেন।

ওদিকে মানস জমে গেছে সহযাত্রী এক মুসলিম অফিসারের সঙ্গে। তিনি নানা স্থানে টুর করে বেড়াচ্ছেন। মানসের চেয়ে সিনিয়র, কিন্তু অন্য সার্ভিসের। তাঁর কাছে মানস শুনছে, "মফস্বলে আজকাল ইউরোপীয় অফিসার আপনি বিশেষ দেখতে পাবেন না। একধার থেকে বদলী হয়ে চলে যাচ্ছেন কলকাতায়। যাঁদের জায়গায় যাচ্ছেন তাঁরা যাচ্ছেন দিল্লী। নিত্য নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের খাতিরে। এর পেছনে কী যে রহস্য তা আপনার হয়তো জানা আছে, আমার অজানা। একজন ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছে গোপনে একটা ক্লু পেয়েছি। সাহেবরা আশঙ্কা করছেন যে সিপাহী বিদ্রোহের মতো একটা কিছু ধোঁয়াচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছিনে, ওঁরা পাচ্ছেন। যেখানে যত ইংরেজ আছে এক রাত্রেই সব ক'টাকে নিকেশ করবে। সবাই তো আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কে কাকে রক্ষা করবে? তাই সাবধানের মার নেই। দিল্লী, কলকাতা, বম্বের মতো বড়ো বড়ো শহরে ওরা র‍্যালি করছে। হয় প্লেন ধরবে, নয় জাহাজ ধরবে। যারা পালাবার সুযোগ পাবে না তারা দলবদ্ধ হয়ে লড়বে। তার আগে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে, দেশবাসীদের আশায় আশায় রাখবে।"

মানস বিস্মিত হয়। "না, আমি তেমন কোনো ক্লু পাইনি। তবে আমিও খবর পেয়েছি যে ইংরেজরা পেনসন ও ক্ষতিপূরণের হিসেব কষছে। এর থেকে অনুমান হয় কেন্দ্রে একটা রদবদল হতে যাচ্ছে, নতুন সরকার পুরনো সরকারের দায়দায়িত্ব হাতে তুলে নেবেন। ক্ষমতার হস্তান্তর মানে দায়িত্বের হস্তান্তর, দায়ের হস্তান্তর। তাই যদি হয় তবে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ কেন? আর তার আশঙ্কায় বড়ো বড়ো শহরে র‍্যালি করা কেন? যারা আপনি যাচ্ছে তাদের তাড়াতে গেলে তারাও তো ঘুরে দাঁড়াতে পারে, আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মসম্মানের জন্যে। বিদ্রোহীরা কি মনে করে ইংরেজরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গায়ের জোরে লাল কেল্লা বা মসনদ দখল করা অতি সহজ।"

"ঠিকই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক যে বহু লোকের হাতে বন্দুক, রিভলভার, স্টেন গান ইত্যাদি কী জানি কেমন করে এসেছে। বহু লোক যুদ্ধবিগ্রহের তালিমও পেয়েছে। তাদের ধারণা জন্মেছে তারা না জানি কত বলবান। আগামী জুলাই কি আগস্টে ঘটতে পারে একটা রাইজিং। যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডের ঈস্টার রাইজিং। সে রকম একটা সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে সরকার এখন নানা জায়গায় নতুন নতুন জেলখানা তৈরি করে রাখছেন। কিংবা পুরনো জেলখানার নতুন ওয়ার্ড। বিদ্রোহের আঁচ পেলেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফাটকে পুরবেন।" ভদ্রলোক ফিস্ ফিস্ করে বলেন।

"তার মানে ইংরেজরা ডানকার্কের মতো দৌড় দেবে না। আক্রমণের সম্মুখীন হবে। কিন্তু মানে মানে ক্ষমতার হস্তান্তর যদি হয়ে যায় তার কোনো দরকার হবে না, খান সাহেব। তবে আমি ভাবছি ক্ষমতার হস্তান্তরে পাকিস্তানের দাবী নিয়ে মুসলিম লীগ বাদ সাধবে না তো? জানিনে আপনি লীগপন্থী কি-না। হয়ে থাকলে মাফ করবেন।" মানস জিভ কাটে।

"আজকাল মুসলিম অফিসারদের মধ্যে লীগপন্থী নন ক'জন? এখন কি কংগ্রেসের বা কৃষক

প্রজাপন্থীদের তেমন প্রভাব আছে? মহাত্মা গান্ধীর উপরেও তেমন ভক্তি নেই। এখন কায়দে আজমের উপরে অগাধ বিশ্বাস। আর পাকিস্তান তো মুসলমানদের কাছে খেলাফতের পরিবর্ত। এতে তাদের ধর্মীয় ইমোশন পরিতৃপ্ত হয়। এটা যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তিতর্কের কমতি নেই, কিন্তু ধর্মীয় ইমোশন কোথায়? কেন আমরা ভারতরাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মাইনরিটি হব, যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মেজরিটি হতে পারি? ভারতমাতা বলতে আপনারা যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হন আমরা তেমন হইনে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে যেটা আবেগের পর্যায়ে পড়ে না, গণনার পর্যায়ে পড়ে। ইংরেজরা সরে গেলে যত উচ্চতর পদ খালি হবে সব আপনাদের ভাগ্যেই জুটবে, কেননা আপনারা সিনিয়র। আমরা চাই আমাদের ভাগেও পড়ুক। যদিও আমরা জুনিয়র। পাকিস্তান হলে আমরা চোখ বুজে তিনভাগের একভাগ পাই। মিলিটারিতে আরো বেশী। এককথায় বলতে পারি, স্বাধীনতা বলতে আপনারা বোঝেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি আর আমরা বুঝি হিন্দু মেজরিটির গ্রাস থেকে মুক্তি। এর জন্যে আলাদা একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ইংরেজরা যাবার সময় ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে যেতে পারে। চাই শুধু কংগ্রেসের সম্মতি।" খান সাহেব নিবেদন করেন।

মানস দুঃখিত হয়ে বলে, "আপনারা যদি ভারতীয় হতে না পারেন আমরাও পাকিস্তানী হতে পারব না। কংগ্রেস কী করে সম্মতি দেবে?"

খান সাহেব মুখ ফিরিয়ে একটু হাসেন। তারপর বলেন, "কংগ্রেস কী করবে তার নজীর আমরা দেখেছি। সেই নজীর থেকে বলতে পারি কংগ্রেসের নীতি হচ্ছে 'না গ্রহণ ও না বর্জন'। কার্যত গ্রহণ। পার্টিশন সে গ্রহণও করবে না, বর্জনও করবে না। কার্যত গ্রহণ করবে। আমাম বাংলাদেশ হবে পাকিস্তানের সামিল। আপনার যদি পাকিস্তানে থাকতে আপত্তি থাকে আপনি হিন্দুস্থানে বদলী হয়ে যাবেন। আপনার এমন কী হানি হবে?"

মানস বিশ্বাস করে না যে কংগ্রেস অমন কিছু করবে। কিন্তু ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা নেবার সময় যে দরাদরিটা হবে সেটা যে পার্টিশনের ভিত্তিতে হবে না তা কি সে জোর করে বলতে পারে? আর পার্টিশনের ভিত্তিতে যদি হয় তবে প্রদেশও ভাগ হয়ে যেতে পারে।

"হিন্দু মুসলমান যদি দুই নেশন হয়ে থাকে তা হলে বাংলাদেশও দুই নেশনের মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে পারে, খান সাহেব। আমাম বাংলাদেশ কি শুধুমাত্র মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড? হিন্দুদেরও নয়? বাঙালী হিন্দুদের হোমল্যাণ্ড তা হলে কোন্‌খানে? আমার মতো কয়েকজন অফিসার অন্য প্রদেশে বদলী হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা ঝাড়ে মূলে বদলী হতেপারে না। তেমন ব্যাপার যদি ঘটে তবে সমানসংখ্যক মুসলমানও উত্তরভারত থেকে ঝাড়ে মূলে বদলী হয়ে আসবে। তাতে বাঙালী মুসলমানের আখেরে লাভ হবে না ক্ষতি হবে?" মানস ভদ্রলোককে ভাবনায় ফেলে।

তিনি হাওয়া হয়ে যান।

যূথিকা এসে সুধায়, "ওই অচেনা অজানা মানুষটির সঙ্গে কী এত কথাবার্তা হচ্ছিল? তোমার যা স্বভাব। সবাইকে বিশ্বাস করে পেটের কথা বলবে। আমার তো সন্দেহ উনি গোয়েন্দা বিভাগের কেউকেটা।"

মানস অপ্রতিভ হয়ে বলে, "হতেও পারেন। কিন্তু আমিও এমন কিছু ফাঁস করিনি যা খুবই গোপনীয়।"

এর পরে স্টীমার থেকে ট্রেন। ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন থেকে মোটর। মোটর থেকে জজ কুঠি। বার্লো খালি করে দিয়ে গেছেন। একদিন বিশ্রামের পর জজ কোর্টে গিয়ে মানস চার্জ নেয় ও কাজকর্মের মধ্যে ডুবে যায়।

রাত্রে শুতে যাবার সময় একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। যূথিকাকে শোনায়। "ওই লোকটির

দেওয়া খবর যদি নির্ভরযোগ্য হয় তবে এই বছর জুলাই কি আগস্ট মাসে একটা রাইজিং প্রত্যাশা করা যায়। আয়ারল্যাণ্ডের যেমন ইস্টার রাইজিং।"

"ওমা! তাই নাকি?" যূথিকা চমকে ওঠে।

"তখন থেকেই আমি ভাবছি এর পেছনে কে থাকতে পারে? তুমি অনুমান করতে পারো?" মানস চোখ টেপে।

" কে? সুভাষচন্দ্র?" যূথিকা আন্দাজে বলে।

"সুভাষচন্দ্র এখন কোথায় কে জানে? ধরা পড়লে ওয়ার ক্রিমিনালস ট্রায়াল। আমার সন্দেহ আরেকজনকে।" মানস রহস্যটাকে ঘোরালো করে।

"বলো না গো, কে?" যূথিকার সবুর সয় না।

"জুলির বান্ধবী মিলি। মধুমালতী মুস্তাফী। ও যে বিলেত থেকে এসেছে সেটা এই উদ্দেশ্য নিয়ে।" মানস সন্দেহ করে।

"মধুমালতী দত্তবিশ্বাস।" যূথিকা সংশোধন করে। "কিন্তু তোমার সন্দেহ অহেতুক। মিলি মা হয়েছে। অমন অ্যাডভেঞ্চার করবে না।"

এর মাসখানেক বাদে বোম্বাইতে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীতে মিউটিনি। মানস খবরটা শুনে যূথিকাকে বলে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ। মিলির গন্ধ পাঁউ।"

যূথিকা বলে, "তুমি ভুল ঠাউরেছ। মিলি নয়, অশোকা।"

"মিলি খুব সম্ভব অশোকার দলেই ভিড়েছে। তুমি কলকাতায় বৌদিকে চিঠি লিখে মিলির খোঁজ নাও।" মানস পরামর্শ দেয়।

বৌদি উত্তর দেন, "মিলির দাদা বোম্বাইতে থাকেন। মহারাষ্ট্রকন্যা বিয়ে করেছেন। একটি বাচ্চাও হয়েছে। মিলি দেখা করতে গেছে।"

মানস বলে, "আমি ঠিকই অনুমান করেছিলুম সে এখন বোম্বাইতে। বাকীটা তর্কসাপেক্ষ।"

কিছুদিন পরে সুকুমারের চিঠি। সে তার বৌ আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাচ্ছে। এবার জাহাজে। ইতিমধ্যে একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। মিলি কী জানি কেমন করে মিউটিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আটক করে। সুকুমার তখন দিল্লীতে। বোম্বাই থেকে মিলির দাদার ট্রাঙ্ক কল পেয়ে বোম্বাই ছুটে যায় ও সরাসরি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মিলি যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ছিল ও নানা ভাবে সাহায্য করেছিল। লাট সাহেব তাকে ছেড়ে দেন ও ডেকে পাঠান। বলেন, "অবোধ বালিকা, এই নেভী আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব না, তোমাদের হাতেই দিয়ে যাব। তখন তোমরা একে শাসন করবে কী করে, যদি এই রেটিংদের অবাধ্য হতে শেখাও? আর্মি বা নেভী বা পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন নয়। এরা যদি অবাধ্য হয় তবে সর্বনাশ।"

"ঠিকই তো।" মানস বলে, "সিপাইদের যারা বিদ্রোহী হতে শেখায় তারা পরে আবার তাদের শাসন করতে পারে না। সেই বিদ্রোহীরাই পরে হয় শাসক। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ অমনি করেই কায়েম হয়। ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ কি কারো কাম্য? যাক, মিলি ফিরে গিয়ে ভালোই করেছে।"

"ভালো ওর সংসারের দিক থেকেও। স্বামী এক দেশে, স্ত্রী আরেক দেশে, ছেলে যে কার কাছে তাও অনিশ্চিত। ওরা ছাড়াছাড়ির অভিমুখেই যাচ্ছিল। হ্যাঁ, ফাঁড়া কেটে গেছে।" যূথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"আমি অতটা জানতুম না।" মানস বলে।

"তুমি কতটাই বা জানো? মিলি বেশীদিন এদেশে থাকলে ওর নিজের ঘর তো ভেঙে যেতই,

জুলির ঘরও ভেঙে দিত। সৌম্যদাকে ও ভুলতে পারেনি। ওর দৃঢ় ধারণা সৌম্যদা ওরই হতো, যদি না জুলি আর সুকুমার হঠাৎ কোনখান থেকে এসে হাজির হতো। মানুষের ভাগ্য অমনি করেই উলটো পালটা হয়ে যায়। কিন্তু একবার অদল বদল হয়ে গেলে পরে আর জোড় মেলানো যায় না। সৌম্যদার সঙ্গে মিলির ও সুকুমারের সঙ্গে জুলির আর কোনোদিনই মিলন হবার নয়। জুলির দুর্বুদ্ধি হবে না, মিলির সুবুদ্ধি হলেই বাঁচি। বেশ বোঝা যায় মেয়েটা অবোধ নয়, অসুখী।" যূথিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

"মিলিও ভালো, জুলিও ভালো, বাবলীও ভালো, দীপিকাও ভালো, কিন্তু সবার চাইতে ভালো যে আমার ঘরের আলো— তুই।" মানস ওকে বার বার চুমু খায়।

।। তেরো ।।

এই স্টেশনে মানসের একমাত্র চেনা অফিসার রমণীরঞ্জন নাগ। ন'বছর আগে অন্যত্র যিনি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন এখন তিনি এখানকার অ্যাডিশনাল এস. পি.। এ কেমন কথা?

এর উত্তরে তিনি বলেন, "বাঙালীকে বাঙালী না মারিলে কে মারিবে? নাম করব না, আপনারই সার্ভিসের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার নামে কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দেন, নাগ ইজ আ গুড দারোগা, বাট আ উইক পুলিশম্যান। শুনুন কথা। আমি রোজ স্যাণ্ডো করি, আমার ওজন একশো আশি পাউণ্ড। আমি কিনা উইক পুলিশম্যান।" এই বলে মাসল ফোলান।

অন্তরঙ্গ মহলে সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিশকে বলা হয় 'দ্য পুলিশম্যান'। সেই পদে নিযুক্ত হয়ে কেউ যদি কোনো একটি পরিস্থিতিতে দুর্বলতা দেখান তবে তাঁকে 'উইক' বলে অবিহিত করা ঐ শব্দটার অপপ্রয়োগ নয়। মানস তার সিনিয়রের পক্ষ নিতে পারত, কিন্তু নেয় না। বলে, "আমাদের এই জেলা ক্রাইমের দিক থেকে সর্বপ্রধান দুই জেলার অন্যতম। এখানে একজন ভালো তদন্তকারী অফিসারের দরকার। তিনি হিন্দু হলে আরো ভালো, কারণ হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু। সুতরাং নার্ভাস।"

"নার্ভাস যদি বলেন ইউরোপীয়ানরা এখন আরো নার্ভাস। বার্লো আপনার পূর্ববর্তী। তিনি কলকাতা বদলী হয়ে গেছেন। হ্যামিলটন আমার বস্, তিনিও শুনছি দিল্লী যাচ্ছেন। ইউরোপীয়ান বলতে একজনও থাকবেন না। অথচ ওঁদের পক্ষে এটা ছিল একটা প্রাইজ স্টেশন। কালে কালে কী না হয়! আপনার কি মনে আছে? আপনি যখন ডি. এম. ছিলেন আর আমি এস. পি. তখন আপনাকে আমি একবার গোপনীয় র‍্যালিং পয়েন্ট প্ল্যান দেখিয়েছিলুম। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সে রকম একটা প্ল্যান প্রত্যেক জেলাতেই রয়েছে। মিউটিনির ওয়্যারলেস মেসেজ পাওয়ামাত্র জেলার যেখানে যত ইউরোপীয়ান ও উচ্চপদস্থ ইণ্ডিয়ান আছেন তাঁদের সবাইকে রাতারাতি খবর দিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট একটি স্থানে জড়ো করতে হবে। সেখানেই তাঁরা পুলিশের হেফাজতে থাকবেন। পুলিশ তাঁদের রক্ষা করবে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু। সেখানেও যদি তাঁদের বাঁচানো অসম্ভব হয় তবে তাঁদের মিলিটারি প্রোটেকশন দিয়ে বৃহত্তর র‍্যালিং পয়েন্টে পাঠাতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে মিউটিনির সম্ভাবনা আঁচতে পেরে আগে ভাগেই মহিলা ও শিশুদের বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া। আর নিজেরাও কলকাতা বা দিল্লীতে বদলী হয়ে সেখানেই দরকারের সময় র‍্যালি করা। কিন্তু আমি ভাবছি এসব তো হলো ইউরোপীয়ানদের বেলা আপৎকালীন ব্যবস্থা, আমাদের মতো উচ্চপদস্থ ইণ্ডিয়ানদের বেলা কী হবে?" নাগ উদ্বেগের সঙ্গে সুধান।

"কেন, আপনি কি আশঙ্কা করছেন আরেকটা মিউটিনি আসন্ন? কই, কাগজে তো কোথাও তার আভাস নেই।" মানস যতদূর জানে।

"প্যানিকের ভয়ে ওরা জানলেও জানাবে না। দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। আমরা একটা

আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছি। বামপন্থীরা এর সুযোগ নিয়ে মিউটিনি বাধাবার ফিকিরে আছে। আর লীগপন্থী মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাবার।" নাগ উত্তর দেন।

দেশের অবস্থা যে অগ্নিগর্ভ এটা আরো একজনের মুখেও মানস শোনে। তিনি নিয়মিত ক্লাবে আসেন, টেনিসের পার্টনার হন। দেবাদিদেব গুহ। কেমব্রিজের র‍্যাংলার। না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, না বাংলাদেশের সরকার কেউ তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পদ দেননি। তাই তিনি অভিমান করে বাড়ীতে বসে আছেন। কবে ডাক আসবে সেই আশায়। বয়স বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশের কাছাকাছি। অবলম্বন পৈত্রিক জমিদারি। বিয়ে করেছিলেন, স্ত্রী মারা গেছেন, সন্তানাদি নেই। ঝাড়া হাত পা। থাকেন ইঙ্গবঙ্গ স্টাইলে। খেলার জন্যে ক্লাবে আসেন। টেনিসের অভ্যাস রেখেছেন। উত্তম স্বাস্থ্য। তাঁর শখ হচ্ছে যত রাজ্যের বই কাগজ কেনা ও পড়া। বিদ্যার জাহাজ। কখনো কোনো রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে কলেজের অধ্যাপকরাও তাঁর দ্বারস্থ হন। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরাও বাদ যান না। কী ইউরোপীয়ান, কী ইণ্ডিয়ান। পরিসংখ্যান তাঁর নখদর্পণে। অত আধুনিক লাইব্রেরী এখানে আর কারো নেই।

মানস নতুন বইয়ের সন্ধানে তাঁর লাইব্রেরীতে যায়। তিনি খুশি হয়ে বই দেখান। বলেন, "আপনি সর্বদাই স্বাগত। মনে করুন এটা আপনারই লাইব্রেরী।"

বলা বাহুল্য তিনিও আসেন মানসের কুঠিতে। যূথিকার সঙ্গে আলাপ হয়। পিয়ানো শুনতে চান। বাজালে শোনেন।

"ইউরোপ থেকে চলে এসেছি কবে! তবু তো ইংরেজ ছিল, তাই ওখানকার জীবনধারার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। ওরাও তো শুনছি যাবার মুখে। দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। ভারতে সবশুদ্ধ নব্বই হাজার ইউরোপীয় আছে। শতকরা একজনও নয়। সময় থাকতে যদি না পালায় তো আগুনে পুড়ে মরবে। তবে ওরা যেমন তুখোড় পলিটিসিয়ান ভারতীয়দের লেলিয়ে দেবে ভারতীয়দের গায়ে আর নিজেরা সালিশী করবে। বাধাবেও ওরা, মেটাবেও ওরা। আর লড়ে মরবে হিন্দু মুসলমান শিখ।" গুহ অনুমান করেন।

"গান্ধীজী থাকতে লড়াইই বা বাধবে কেন, বাধলে তিনিই বা থামাতে পারবেন না কেন? সালিশী যদি করতে হয় পার্শীরা করবে। কিন্তু ইংরেজ কেন? ওরা কবে থেকে নিরপেক্ষ হলো?" যূথিকা ভেবে পায় না।

"মুসলমানদের কথা হলো ওরা এদেশের রাজা ছিল, রাজত্ব হারিয়ে না হয় ইংরেজের প্রজা হয়েছে। তা বলে কি ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুর প্রজা হবে? তাদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পুরো না দিলে তার অর্ধেক দিতে হবে, কিন্তু গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে হিন্দু মেজরিটিকে সমগ্র ভারত দেওয়া চলবে না। গণতন্ত্র ব্যাপারটা মুসলমানরা তো নয়ই হিন্দুরাও যে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তা নয়, বহু হিন্দু ডিকটেটরশিপ পছন্দ করে। কংগ্রেসকে দেখছেন তো? কংগ্রেস হাই কমাণ্ডই কংগ্রেস। আর কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বলতে বোঝায় তিন প্রধান নেতা। যাঁদের গুরু গান্ধীজী। ওদিকে মুসলিম লীগও একটা হাই কমাণ্ড খাড়া করেছে, তার একজনমাত্র মেম্বর। তিনিই সর্বেসর্বা। জিন্না সাহেব একদা কংগ্রেস লীগ উভয়ের মধ্যে মেল বন্ধন করেছিলেন। এখন সে আশা ত্যাগ করেছেন। মেলবন্ধন লক্ষ্য নয় বলেই তিনি ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট মন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর একমাত্র ভরসা প্রস্থানকালে ইংরেজ সরকার রাজ্যত্যাগ করে একভাগ তাঁর হাতে দিয়ে যাবেন। না দিলে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়েরই বিরুদ্ধে। ইংরেজ কী করবে আপনিই বলুন, মিসেস মল্লিক। আমি তো দেখছি এর একমাত্র প্রতিকার ইংরেজকে যেতে না দেওয়া। ওরা থাকুক আরো দশ বিশ বছর। ইতিমধ্যে আমাদেরও গণতন্ত্র শিক্ষা হোক। দু'বছর মন্ত্রিত্ব করে ছ'বছর বনবাস গণতন্ত্র শিক্ষার সম্যক উপায় নয়। মল্লিক সাহেব কী বলেন?" গুহ মানসের দিকে তাকান।

"শুধু গণতন্ত্র নয়, জাতীয়তাবাদকেও আরো মজবুত করা চাই। আমাদের জাতীয়তাবাদ পুরোপুরি

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, এর অনেকখানি হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। মুসলমান বন্ধুরা তো বলবেনই, তোমাদের জাতীয়তাবাদ যখন অনেকখানি হিন্দু তখন ভারতের অনেকখানিই তোমরা নাও, বাকী স্থান আমাদের দাও। সেই বাকী স্থান হোক পাকিস্তান। আমাদের সেই স্থানে আমরা মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করব। ইংরেজের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। কেনই বা ইংরেজকে ধরে রাখতে চাওয়া? স্বাধীনতা দশ বছর বাদে নয়, বিশ বছর বাদে নয়, এক বছরের মধ্যেই হবে। আমি তাঁদের মুখের মতো জবাব দিতে পারিনে। এটা তো সত্য যে 'বন্দে মাতরম্'ই আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল সুর। আর মুসলমানরা কেউ ভুলেও সে সুর গুন গুন করে না। ন্যাশনালিজম আইডিয়াটাই ইসলামের সঙ্গে বেখাপ। তবে ইদানীং একটা পরিবর্তনের হাওয়া পালে লেগেছে। ওরাও ন্যাশনালিস্ট হবে, যদি মুসলিম ন্যাশনালিস্ট বা পাকিস্তানী ন্যাশনালিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারে। না, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নয়, মুসলিম ন্যাশনালিস্ট। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমরা ভারত ভাগ করতে চায় না, মুসলিম ন্যাশনালিস্টরা ও ছাড়া আর কিছু চায় না। লোকের ধারণা সব মুসলমান একমত। সেটা একটা ভুল ধারণা। জিন্না সাহেব হয়তো অধিকাংশ মুসলমানের প্রবক্তা। কিন্তু সব মুসলমানের প্রতিনিধি নন।" মানস রায় দেয়।

"কিন্তু জিন্না সাহেব যদি শয়তান হয়ে থাকেন তবে শয়তানকেও তার পাওনা দিতে হবে। গোটা কয়েক প্রদেশ তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা। সেখানেই মুসলিম ন্যাশনালিজমের তথা পাকিস্তানী ন্যাশনালিজমের পত্তন হোক। সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের চর্চা। জিন্নার মতো অমন একজন প্রতিভাশালী পুরুষের প্রতিভার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, সবাই মিলে তাঁকে কোণঠাসা করেছে। কোণঠাসা হলে একটা বেড়ালও আঁচড়ায় কামড়ায়, চোখের মণি উপড়ে নেয়। জিন্নার প্রত্যেকটি প্রস্তাবে আপত্তি না করলে কি নয়? ন্যাশনালিস্ট মুসলিম থেকে উনি মুসলিম ন্যাশনালিস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছেন এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। গোড়ায় তিনি ডেমোক্র্যাটই ছিলেন, ইদানীং মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটো প্রয়োগই তাঁর পলিসি। তাতে ব্যর্থ হলে পাকিস্তান অর্জন। এখন ইংরেজরা কী করে দেখা যাক।" গুহ যূথিকার দিকে তাকান।

"ওরা এই আগ্নেয়গিরি আগলে রেখে কার কী উপকার করবে, মিস্টার গুহ? আরো দশ বিশ বছর কি লাভাবর্ষণ ক্ষান্ত থাকবে? ওরা ডিভাইড না করেই কুইট করুক। সিভিল ওয়ার বাধবে না, আশা করি। মুসলিম লীগকে তার পাওনা সংখ্যার অনুপাতে দেওয়া হবে। উচ্চতর পদও ওরা পালা করে পাবে। আর যদি দেশ ভাগ অনিবার্য হয় তবে প্রদেশ ভাগও সেই সঙ্গে হবে। হিন্দুরাই বা কেন ফের মুসলমানদের প্রজা হবে? 'বন্দে মাতরম্' ওদের কণ্ঠে শোনা যায় না। 'আল্লা হো আকবর'ও হিন্দুদের কণ্ঠে মানায় না। কিন্তু আগে ইংরেজ যাক। তার পরে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি ভাগ করে নেব। পাকিস্তান ইংরেজের হাত থেকে নয়, ভাইয়ের হাত থেকেই ওরা পাবে।" যূথিকা ফয়সালা করে।

মানস বলে, "আমি কিন্তু দেশভাগ প্রদেশভাগ কোনোটাই সমর্থন করিনে। ভাগাভাগির ওই চাকরিবাকরির উপর দিয়েই যাক। নইলে আবার লোক ভাগের প্রশ্ন উঠবে। সব হিন্দু এক গোয়ালে, সব মুসলমান এক খোঁয়াড়ে। ঐতিহাসিক বিবর্তনটাই উল্টে যাবে। অমার্জনীয়।"

যূথিকা চুপ করে থাকে। গুহ বলেন, "আচ্ছা, আপনাদের আমি পরিসংখ্যান শোনাই। তার পরে বিবেচনা করবেন। সারা বাংলা আর আসাম জুড়লে মুসলমানদের সংখ্যানুপাত শতকরা একান্ন ছাড়িয়ে উনসত্তর শতাংশে। আর অমুসলমানদের সংখ্যানুপাত শতকরা আটচল্লিশ ছাড়িয়ে একত্রিশ শতাংশে। তা হলে মুসলমান অমুসলমানকে দাবিয়ে রাখে কী করে? একটা ভোটে জিতে কেউ কখনো নিজের সিদ্ধান্ত অপরের উপর চাপিয়ে দিতে পারে? নিক না ওরা গোটা বাংলা আর গোটা আসাম। সেটা আমাদেরও নেওয়া। এমন সময় আসবে যখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের লোক পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের উপর আধিপত্য করবে। পশ্চিমাদের মোট সংখ্যা হিন্দু মুসলমান শিখ মিলিয়ে তিন কোটি ষাট লক্ষের চেয়ে কিছু বেশী। আর পূরবিয়াদের সংখ্যা হিন্দু মুসলমান ট্রাইবাল মিলিয়ে সাত

কোটির চেয়ে একটু বেশী। একদিকে দুই তৃতীয়াংশ, আরেক দিকে এক তৃতীয়াংশ। আমরা যা বলব তাই হবে। কলকাতা হবে সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী।"

মানস হেসে ওঠে। "মাফ করবেন, মিস্টার গুহ, আপনার এই স্বপ্ন কোনোদিনই সার্থক হবার নয়। মুসলিম নেশনের জন্যে যাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্র উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা কোনো দিনই বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জিততে দেবেন না। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি এমন এক ফরমূলা উদ্ভাবন করবে যাতে সত্যিকার ক্ষমতা থেকে যায় পশ্চিমা মুসলমানদের হাতে। বাংলাভাষাকে তাঁরা আমল দেবে না, বাংলার রাজধানী কলকাতাকেও ক্ষমতার কেন্দ্র করবে না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় আটঘাট এমনভাবে বাঁধবেন যে ওয়েটেজ, ভীটো, প্যারিটি ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পশ্চিমাদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে। কিছুতেই কিছু না হলে মাইট ইজ রাইট তো তাঁদের দিকেই। কারণ পাঞ্জাবী মুসলমানদের হাতেই মিলিটারি পাওয়ার। ব্যালটের চেয়ে বুলেটের জোর বেশী। তার সঙ্গে মোল্লাদের যোগসাজস। জিন্না সাহেব ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে এসেছেন বলেই সিভিল পাওয়ারের মর্যাদা বুঝেছেন, পাকিস্তান হাসিল করে মুসলিম ঐতিহ্যের ভিতরে ফিরে গেলে মোল্লা আর মিলিটারিতে মিলে তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। পাকিস্তান এসেছে ইসলামের ইতিহাস থেকে। ব্রিটেনের বা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস থেকে নয়। যে ইতিহাসে জিন্না সাহেবের জন্ম। আপনার ও আমার জন্ম। পাকিস্তানে আমরা দম বন্ধ হয়ে মারা যাব, মিস্টার গুহ। যারা বাঁচবে তারা কচ্ছপের মতো খোলার ভিতর হাত পা গুটিয়ে নিয়ে বাঁচবে।"

"তা হলেও আমি গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতী নই, মিস্টার মল্লিক। এ প্রদেশে যাদের মেজরিটি তারা যদি পাকিস্তানে থাকতে চায় তো আমিও তাদের সঙ্গে থাকব। তাদের অদৃষ্টে যা ঘটবে আমার অদৃষ্টেও তাই ঘটবে। তারাই তো আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার আয় তো তাদের পরিশ্রম থেকেই আসে। তারা তো আমাকে ছাড়েনি, আমিও তাদের ছাড়ব না। আপনার কী? আপনি আজ এখানে আছেন, কাল বদলী হয়ে চলে যাবেন। আমি এ বয়সে বেদুইন হতে নারাজ।" গুহ মাথা নাড়েন।

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "সে কী! পাকিস্তান যদি হয় আপনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে বাস করবেন?"

"মিসেস মল্লিক, রাজা বদল ইতিহাসে কতবার হয়েছে। তা বলে কি প্রজারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছে? তবে এবারকার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। তুর্ক আর মোগল আমলে ছোটলোকরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ইদানীং মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তানী হয়ে যাচ্ছে। ওটা মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার মোহে না হিন্দুদের জায়গাজমি বেদখল করার লোভে তা বলা শক্ত। আজ যারা দলে দলে পাকিস্তানী হচ্ছে পরে তারা দলে দলে কমিউনিস্ট হবে। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করবে। আমাকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয় সেটা আমি কাফের বলে না আমি জমিদার বলে তা কী করে জানব? হিন্দু মুসলমানের বিবাদ কি ধর্মীয় বিবাদ না রাজনৈতিক বিবাদ না অর্থনৈতিক বিবাদ না সামাজিক বিবাদ? হয়তো সব ক'টা বিশ্লেষণই ঠিক। দেশের লোক ভিতরে ভিতরে পরস্পরের কাছে পর হয়ে যাচ্ছে। এই যে এস্ট্রেঞ্জমেন্ট এটা আপনারা সরকারী মহলে আঁচ করে থাকবেন। আমরা বাইরেও অনুভব করছি। ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া তখ্‌তে কংগ্রেস বসবে এটা ভারতের মুসলমান মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না। তেমনি ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া মসনদে মুসলিম লীগ বসবে বাংলার হিন্দু এটা মেনে নিতে পারছে না। এই হলো এস্ট্রেঞ্জমেন্টের হেতু।" গুহ অনুমান করেন।

জজ কুঠির মালী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, মা, ওই যে ওরা বলছে পাকিস্তান হবে সেটা কী?"

যূথিকা উত্তর দিয়েছিল, "পাকিস্তান হলে মুসলমানদের আপনার বলতে একটা রাজ্য হবে।"

"সে রাজ্যে আপনারা থাকবেন না?" মালী প্রশ্ন করেছিল।

"কেমন করে থাকব, বলো? আমরা যে হিন্দু।" যূথিকার উত্তর।

"না, মা, এটা ভালো নয়।" মালী দুঃখিত হয়।

এর কিছুদিন পরে এসে মালী নালিশ করে, "মা, মোল্লারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আমি যদি পাকিস্তানকে ভোট না দিই তবে আমি মারা গেলে আমাকে কেউ কাঁধ দেবে না। তা হলে কী হবে, মা? আমার দাফন হবে না?"

সাংঘাতিক নালিশ। কিন্তু যূথিকা নিরুপায়। মানসও তাই।

মালী ভোট দিয়ে এল ঠিকই। কাকে সেকথা মানস বা যূথিকা জানতেও চায়নি, সেও জানায়নি। ভোটের ফলাফল যখন জানা গেল তখন দেখা গেল লীগ প্রার্থীরা অন্য সব মুসলিম প্রার্থীদের পরাস্ত করে বাংলার আইন সভার ১২৩ টি মুসলিম আসনের ১১৫ টি জয় করেছেন। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৬২ টি।

মুসলিম লীগই তফসীলভুক্ত জাতি ও অন্যান্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করবে বোধ হয়।

এর পরে একদিন কামালউদ্দীন আহমদ বলে এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করতে আসেন। "আমাকে চিনতে পারছেন? কলকাতায় মীর সাহেবের ওখানে আলাপ। লিবারল হিউমানিস্ট গ্রুপ। মনে পড়ে?"

"বুঝেছি। কৃষক প্রজা দলের মুখপাত্র। তাদের এক পত্রিকার সম্পাদক। তা আপনি এখানে কেন? পার্টির কাজে এসেছেন?" মানস জানতে চায়।

"আমি এই জেলারই লোক। কলকাতায় কর্মোপলক্ষে থাকা। কাগজটা উঠে গেছে। এখন আমার পেশা ওকালতী। কিন্তু আজ আমি উকীল হিসাবে আসিনি। মীর সাহেব চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছেন। আলাপ করতে এসেছি।" কামালউদ্দীন বলেন।

একথা সেকথার পর নির্বাচনের প্রসঙ্গ ওঠে। "কাজী নজরুল লিখেছেন, কামাল, তুনে কামাল কিয়া, ভাই। আপনি কি কামাল করেছেন?" মানস সুধায়।

"এ বড়ো নিষ্ঠুর রসিকতা। আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমি যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি এর মানে আমি সাচ্চা মুসলমান নই, আমাকে বয়কট করা হবে, আমি উকীল হিসাবেও মুসলমানদের মামলা চালাতে পারব না। আমাকে বাধ্য হয়ে হিন্দুর উপর নির্ভর করতে হবে। তখন শুনতে হবে আমি একজন প্রচ্ছন্ন হিন্দু। কামাল তো নয়, কমল।" তিনি উত্তর দেন।

মানস দুঃখিত হয়। "কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টির অমন ভরাডুবি হলো কেন? ছিল কংগ্রেসের পরে সব চেয়ে বড়ো দল, এখন সব চেয়ে ছোট। মাত্র পাঁচটি আসন।"

"এর জন্যে দায়ী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড ও সেকেণ্ড। প্রথম জন কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড জারি করে বাংলার কংগ্রেসের দফা রফা করেছেন। কংগ্রেস কোনো কালেই বাংলাদেশের আইনসভায় মেজরিটি পাবে না, সুতরাং এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। দ্বিতীয় জন কৃষক প্রজা দলের প্রসাদে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করে আসেন। ভেবেছিলেন দেশ ভাগ হলে বাংলাদেশের জন্যে আলাদা একটা পাকিস্তান হবে, তিনিই সেখানকার প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাঁর কোনো উপরওয়ালা থাকবে না। লাহোরের সেই প্রস্তাবের উপর খোদকারি করে জিন্না সাহেব যা খাড়া করেছেন তা একাধিক নয়, একটিমাত্র পাকিস্তান। বাংলাদেশ তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ছাড়া আর কিছু নয়। হক সাহেব পাকিস্তানের উচ্চতম ক্ষমতার অধিকারী হবেন না। জিন্না সাহেব তাঁর উপরওয়ালা হবেন। হক সাহেবের জিন্নাবিরোধী ভাব দেখে মুসলিম লীগ তাঁকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু কৃষক প্রজা দলের চরিত্র আর অসাম্প্রদায়িক থাকে না। হিন্দুরা তাদের মুসলিম সাথীদের অবিশ্বাস করে। ক্রমশই মুসলিম জনমত পাকিস্তানের অভিমুখে যায়। কৃষক প্রজা দল পাকিস্তান চায়

না শুনে মুসলমান কৃষক প্রজারাও দলের উপর আস্থা হারায়। তাদের ধারণা পাকিস্তান হচ্ছে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। মুসলিম হিসাবে স্বার্থরক্ষা। দলপতির সঙ্গে দলের বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি এবারেও আসন লাভ করেছেন বটে, কিন্তু দলের টিকিটে নয়। লেবার পার্টির র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের মতো নিঃসঙ্গ। বোধহয় ভাবছেন মুসলিম লীগ তাঁকে নেতা করে নেবে। কিন্তু নেতা এখন সুহরাবর্দী। প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই। হক সাহেবকে অরণ্যবাস করতে হবে। যে নিজের দলকেই ডোবায় কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।" কামালউদ্দীন তিক্তস্বরে বলেন।

"একজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এত বড়ো বিপর্যয় তো ব্রিটেনেও হয়নি, কামাল সাহেব। নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।" মানস সন্দেহ করে।

"পাকিস্তানের হুজুগ। লীগপন্থীদের ছল বল কৌশল। ইস্পাহানীর টাকা। দুর্ভিক্ষের মরসুমে তো কম রোজগার করেনি। কিন্তু সকলের উপর জিন্না সাহেবের হাতযশ। এক ঢিলে তিনি দুই পাখী নয়, পাঁচ পাঁচটা পাখী মেরেছেন। প্রথমে মেরেছেন মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমানদের বা মুসলমানযুক্ত যতগুলো দল আছে সব ক'টা দল। কৃষক প্রজা, ইউনিয়নিস্ট, কংগ্রেস মুসলিম, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম, আহরার ইত্যাদি। তার পরে মেরেছেন জমিদার ও ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর শ্রেণীশত্রুদের। কমিউনিস্টরা পর্যন্ত এখন মারের ভয়ে পাকিস্তানের কলমা পাঠ করছে। পাকিস্তানে কোনোদিনই ওরা মাথা তুলতে পারবে না। বিপ্লবের পাখীটিকে খতম করে দিয়েছেন জিন্না। তার পরের ঘায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম জখম। ইণ্ডিয়ান নেশনের পা দুটো কেটে নিয়ে পাকিস্তান বানানো হবে। ইণ্ডিয়ান নেশন দাঁড়াবে কিসের উপর? এর পরের ঘায় ডেমোক্রাসী খতম। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষ থাকে, বিরোধী পক্ষই পরে নির্বাচনে জিতলে সরকার পক্ষ হয়। পাকিস্তানে বিরোধী পক্ষ বলে কেউ থাকবে না। কৃষক প্রজা, ইউনিয়নিস্ট প্রভৃতি তো হারাম। কংগ্রেস দল তো হিন্দু নেশনের সামিল, সুতরাং এলিয়েন। চারটে চিড়িয়ার পরে আরো একটা থাকে। বাংলা দেশে মুসলিম নেশনের নিশান উড়িয়ে অবাঙালী মুসলমানরা আসবেন বাংলাদেশ জয় করতে। তাঁরাই হবেন সিভিল ও মিলিটারি অফিসার। ধনিকও তাঁরাই, উচ্চতম পর্যায়ের রাষ্ট্রপতি, দলপতি ও সেনাপতিও তাঁরাই। আরবী, ফারসী, উর্দু শিখে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হতে না পারলে বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ থাকবে না। কিন্তু তাঁরা তো তখন আর বাঙালী মুসলমান নন, তাঁরা পাকিস্তানী ন্যাশনাল।"

মানস স্বীকার করে কায়দে আজমের বাহাদুরি আছে। কিন্তু মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীতে অন্যান্য দলগুলিকে হারিয়ে দিলেই তো ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার অন্যান্য দলগুলিকেও হারিয়ে দেওয়া হয় না। সেখানে যদি পাকিস্তান প্রস্তাব তোলা হয় অধিকাংশ ভোটে পরাজিত হবে। শেষপর্যন্ত দেখা যাবে নির্বাচনই ভবিষ্যৎ জয় নিয়ামক নয়।

"তা হলে কি গৃহযুদ্ধ?" কামাল সাহেব জিজ্ঞাসু।

"তা ছাড়া আর কী? পাঁচ পাঁচটা চিড়িয়ার সঙ্গে লড়তে হবে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ, আসামের হিন্দু ও ট্রাইবাল, বাংলাদেশের তথাকথিত বর্ণ হিন্দু, সর্ব ভারতের কংগ্রেস। গৃহযুদ্ধে এদের সবাইকে হারিয়ে দিলে শুধু পাকিস্তান কেন, তামাম হিন্দুস্থান কায়দে আজমের পদানত হবে। মোগল আমল আবার ফিরে আসবে। আমরা হিন্দুমাত্রেই আবার জিজিয়া কর দেব। যাদের উপর কর বসানো হবে তাদের প্রতিনিধিদের মতামত শুনতে হবে না। আইন সভা তুলে দিলেও চলবে। জিন্না সাহেবকে আমরা ডেমোক্রাট বলেই জানতুম। তিনি কোথায় নেমে গেছেন দেখে দুঃখ হয়। তিনি যখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা ছিলেন তখন তাঁর দলে হিন্দুও ছিলেন, পার্সীও ছিলেন। দলটি ছোট, কিন্তু তার হাতে ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। সে কখনো সরকারকে জিতিয়ে দেয়, কখনো কংগ্রেসকে। সেই দল ভেঙে তিনি হয়েছেন মুসলিম লীগের নেতা। এখন তাঁর হাতে ব্যালান্স অভ্

পাওয়ার নেই। যা নেই তাকে ফিরিয়ে আনতে চান প্যারিটির ছদ্মবেশে। কংগ্রেস কেন রাজী হবে? তাঁর শেষ ভরসা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নতুন এক রোয়েদাদ। এবার তার রূপ হবে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। কিন্তু কংগ্রেস যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে আইন অনুসারে দেশ ভাগ হবার নয়। হলে হবে বেআইনী ভাবে। তলোয়ারের জোরে। শুনছি পাঞ্জাবে তার তোড়জোড় চলছে। মুসলিম মেয়েদেরও হাতিয়ারের তালিম দেওয়া হচ্ছে। শিখরাও কম যায় না। বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল। অবস্থা যে অগ্নিগর্ভ তা আঁচ করতে পারছি। বাংলাদেশের মুসলমানরা লড়াই করে পাকিস্তান নিতে চায় তো দশ আনা পেতে পারে, ষোল আনা নয়। আসামে পেতে পারে ছয় আনা। তাতে কি তাদের মন ভরবে? বাংলা ভাগ, আসাম ভাগ কে চায়?'' মানস তো চায় না।

''না, না, বাংলা ভাগ নয় আসাম ভাগ নয়। ভাবতেই পারা যায় না। মুসলিম লীগ যদি তাতে রাজী হয় পরের বার নির্বাচনে হেরে যাবে। অবশ্য নির্বাচন যদি আবার হয়। অকারণে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষেপে গেলে তারা যে কতদূর যেতে পারে তা তো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ই প্রমাণ হয়েছে। না, বাংলাদেশকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেব না। হিন্দু মুসলমান একমত হয়ে যেটা করবে সেটাই হবে। কংগ্রেস লীগ একমত হবে কি-না সন্দেহ। কিন্তু তারাই তো সব নয়। সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চায়।'' কামাল এবার ওঠেন।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মুসলিম লীগ নেতা খান্ বাহাদুর মনিরুজ্জামান মানসকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পাশে বসিয়ে বলেন, ''চোখ বুলিয়ে দেখুন আজকের অতিথিদের অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে আমার ভেদবুদ্ধি নেই। আমার বন্ধুদেরও অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। কিন্তু রাজনীতি করতে গেলে ভেদজ্ঞান করতে হয়। নইলে ভোট মেলে না। এবার তো আমাকে মন্ত্রী করা হবে। সেটা নির্ভর করবে মুসলিম ভোটের উপরেই। কী করি, বলুন। এখানকার হিন্দুরাও তো চান যে আমি মন্ত্রী হয়ে জেলার কিছু উপকার করি। আমাকে দিয়ে যেটুকু সম্ভব সেটুকু নিশ্চয়ই করব। তাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই লাভ। পাকিস্তানের স্লোগান দিয়ে ভোটে জিতেছি বটে, কিন্তু পাকিস্তান আমার অন্তরের কথা নয়। ওটা একটা বার্গেনিং কাউন্টার। ওর বিনিময়ে কংগ্রেস নেতারা কী দেবেন দেখা যাক। যদি সারবান কিছু হয় তবে পাকিস্তান মুলতুবি রাখা হবে। দশ বছর শিকেয় তোলা থাকলেও কেউ তাড়া দেবেন না। পাকিস্তান চাই বলেছি। কবে চাই তা তো বলিনি। ধরুন, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যদি সব ক'টি প্রদেশে কোয়ালিশন হয়ে যায়— একটি বাদে— তা হলে কেনই বা লীগ পাকিস্তানের জন্যে চাপ দেবে?''

''একটি বাদে? কোন্‌টি বাদে?'' মানস কৌতূহলী হয়।

''উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। কংগ্রেস মুসলিমদের সঙ্গে লীগ মুসলিমরা এক টেবিলে বসবে না। কংগ্রেস মুসলিমদের সরে যেতেই হবে। হ্যাঁ, অন্যান্য প্রদেশেও। আর কেন্দ্রে যদি কোয়ালিশন হয় তবে কেন্দ্রেও। কায়দে আজমের আরো কয়েকটা শর্ত আছে, কিন্তু আমরা তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করব। কংগ্রেসের উপর বেশী চাপ দিলে কোয়ালিশনই হবে না, কোয়ালিশন না হলে পার্টিশনই আমাদের মতে একমাত্র বিকল্প। কিন্তু এই মুহূর্তে পার্টিশনের জন্যে আমরা ব্যগ্র নই। তার চেয়ে ব্রিটিশ শাসিত কেন্দ্রই ভালো। ইংরেজরা চলে যাক এটা আমাদের অন্তরের কামনা নয়।'' খান বাহাদুর কবুল করেন।

মানস হেসে বলে, ''কিন্তু ওরা তো আপনি চলে যাচ্ছে। বার্লো চলে গেছেন, হ্যামিলটন বদলীর হুকুম পেয়েছেন। আপনি কোথায় আছেন খান্ বাহাদুর? একদিন লাট সাহেবও চলে যাবেন, তারপর চলে যাবেন জঙ্গীলাট আর বড়লাট। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি একটা হবেই। আপনারা সেইরকম একটা স্কীম তৈরি করে কংগ্রেস নেতাদের দিন। জিন্না সাহেবকে বড়লাট পদ দিতে কংগ্রেস রাজী হতে পারে। গান্ধীজী ওপদ নেবেন না। কোনো পদই নেবেন না। জঙ্গীলাট পদটা একজন শিখ নেতাকে দিতে

হবে। তিনি হবেন ডিফেন্স মেম্বর। প্রধান মন্ত্রী বলে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে নেহরুর খাতিরে। মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কিন্তু ক্যাবিনেট থেকে বাদ দিলে চলবে না।"

খান্ বাহাদুর দুই কানে আঙুল দেন।

॥ চোদ্দ ॥

সেদিন খান্ বাহাদুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আখতারউজ্জামানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাপের অবকাশ হয়নি। আলাপের জন্যে একটা দিন ফেলা হয়েছিল। সেই অনুসারে তিনি সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে এসে বিলিয়ার্ড খেলায় যোগ দেন। বিলেতফের্তা ব্যারিস্টার। কলকাতায় প্র্যাকটিস করেন কিন্তু নিবাস এই শহরেই। সেই সূত্রে ক্লাবের মেম্বর।

খেলার পর ড্রিঙ্কস হাতে নিয়ে নিভৃত কক্ষে আলাপ। মানসের হাতে সফ্‌ট ড্রিঙ্ক। তাঁর হাতে ছোটো পেগ।

"চাচাজান প্রস্তাব করেছিলেন আমি যেন তাঁর কন্যারত্নকে উদ্ধার করি আর তাঁর প্র্যাকটিসের উত্তরাধিকারী হই। তিনি এখন থেকে মুসলিম লীগের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কায়দে আজম তাঁকে বিশেষ করে চেয়েছেন। কিন্তু আমি কি সহজে ধরাছোঁয়া দিই? বিলেত থেকে ফিরে আমি কলকাতায় বসেছি। এখনো এক বছর হয়নি। হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় আটকা পড়েছিলুম। আমি ক্যালকাটা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর মেম্বর। আমার জাতই আলাদা। আমি কি বার এসোসিয়েশনের মেম্বরের মেয়েকে সাদী করতে পারি? হলই বা পরভীন আমার সোদর চাচাতো বোন।" তিনি মশগুল হয়ে বলেন।

"সোদর চাচাতো বোন!" মানস ভুল ধরে।

"আহা! এদিককার লোক সেইরকম বলে। আদালতে শুনে থাকবেন। বলতে চায় আপন চাচাতো বোন। মুসলিম সমাজে অতি উত্তম সম্বন্ধ। কিন্তু ওই যে বলেছি আমার জাতই আলাদা। আমি বিলেতফের্তা ব্যারিস্টার। আমাকে তো আমার ব্যারিস্টার সমাজে সমানভাবে মেলামেশা করতে হবে। পরভীন আমার আদরের বোন। কিন্তু ওকে আমি মদ ধরাতে পারব না। ক্লাবে নিয়ে এসে টেনিস খেলাতে পারব না। মফস্বলের মুসলিম সমাজ আমাদের বয়কট করবে। কলকাতার জীবন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চাচাজানকে বলেছি আমি পাঁচ হাজারী মনসবদার না হয়ে সাদী করব না। লাগে লাগবে পাঁচ বছর।" তিনি জমিয়ে বসেন।

"চাচাজান ততদিন সবুর করবেন কেন?" মানস মন্তব্য করে।

"জানতুম। তিনি লোকাল বারের এক দু'হাজারী উকীলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বয়সটা একটু বেশী। আগেও তাঁর একবার বিয়ে হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। পরভীনের যেমন ভাগ্য। কাঁদছে। বিয়ের পর মেয়েরা অমন একটু আধটু কাঁদবেই। পরে সব সয়ে যাবে। চাচাজান যদি মন্ত্রী হন তাঁর দামাদ উকীল সরকার হবেন। তার পরে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। বৌকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন। ওদিকে আমার নিজস্ব একটা লাইব্রেরীই নেই। মিস্টার শরৎ বোস দয়া করে তাঁর লাইব্রেরীতে বসে পড়তে দিয়েছেন। ওয়ান অভ্ দ্য বেস্ট। নিজেও তিনি অগাধ পণ্ডিত। তাঁর রেয়ারিং প্র্যাকটিস। পলিটিক্সের জন্যে সময় কখন? নইলে নেহরুর সঙ্গে টক্কর দিতেন।" আখতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

"দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কী ভাবছেন?" মানস সুধায়।

"বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান তাঁর মতে এক মায়ের সন্তান। আক্ষরিক অর্থে। ধর্মটাই পৃথক, আর সব এক. কাজেই বাংলাদেশ দু'ভাগ করা চলবে না। হিন্দুরা যদি পাকিস্তানে থাকতে না চায় আর মুসলমানদের যদি অখণ্ড ভারতে আপত্তি থাকে তবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গ কেন নয়? কিন্তু কেউ তেমন

সাড়া দিচ্ছেন না। আমিই বোধহয় তাঁর একমাত্র সাগরেদ। তবে তিনি এবার সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে যাচ্ছেন, দিল্লীই হবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। কংগ্রেস থেকে তাঁকে পার্লামেন্টারি লীডার করার প্রস্তাবও এসেছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন দেশ যাতে অখণ্ড থেকে যায়। তার জন্যে অবশ্য মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা চাই। তার মানে জিন্না সাহেবের সঙ্গে। তিনিই তো মুসলিম লীগ। আর সবাই তাঁর ডিটো।" ব্যারিস্টার বলেন।

"আপনি কি আশাবাদী?" মানস প্রশ্ন করেন।

"সেদিন লক্ষ করলেন না মওলানা সাহেবের নাম উল্লেখ করায় চাচাজান কেমন কানে আঙুল দিলেন? আজাদ থাকতে জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। গান্ধীজীর সঙ্গে কথা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। তা হলে কি নেহরুর সঙ্গে? তিনিও তেমনি নাছোড়বান্দা। আসফ আলীকে, কিদ্‌ওয়াইকে, ডাক্তার খান্ সাহেবকে তিনি বর্জন করবেন না। এঁরা থাকতে কোয়ালিশন হয় কী করে? তবে বাংলাদেশে তেমন কোনো ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নেতা নেই যাঁকে বর্জন করার কথা উঠতে পারে। নওশের আলী তো নির্বাচনে হেরে গেছেন। কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সহজেই হতে পারে, আজাদ আর জিন্না যদি অনুমতি দেন। সেটা আবার নির্ভর করছে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী আর ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠনের উপরে। আপনার পক্ষে আশার একটা কারণ আছে।" আখতার বলেন।

"কী কারণ?" মানস জানতে চায়।

"ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে মেজরিটির শাসনতান্ত্রিক প্রগতিতে মাইনরিটি ভীটো দিতে পারবে না। ভীটো দেবার ক্ষমতা কারো হাতে নেই। নৌসেনাদের বিদ্রোহের পিঠ পিঠ এই ঘোষণার মর্ম ব্রিটেন আর দায়িত্ব বইতে চায় না। ঘাড় থেকে যত শীগগির পারে বোঝা নামাতে চায়। কিন্তু মিস্টার জিন্নার তো ভীটো ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যদি কংগ্রেস মুসলিম যান লীগ মুসলিম সেখানে যাবেন না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যদি কংগ্রেস মুসলিম যান লীগ মুসলিম সেখানেও যাবেন না। তার মানে একটা পা যদি অচল হয় আরেকটা পা চলতে পারে না। অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। অগত্যা জিন্নাকে তার দাম দিতে হবে। সে দাম পাকিস্তানও হতে পারে, তার বিকল্পও হতে পারে। যেখানে কংগ্রেস লীগ সদস্যদের সমান ওজন।" আখতার ইঙ্গিত করেন।

"কাউন্সেল অভ্ ডেস্‌পেয়ার। আরো দুটো একটা বিদ্রোহ না হলে কারো হুঁশ হবে না। আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ।" মানস হাল ছেড়ে দেয়।

"কংগ্রেস লীগ সদস্যদের সমান ওজন হলে কি অন্যায় হবে?" আখতার বিস্মিত।

"হবে না? পৃথিবীতে এমন কোন্ গণতন্ত্র আছে যার পার্লামেন্টে শতকরা বাইশ জনকে শতকরা পঞ্চাশটা আসন দেওয়া হয়? তা হলে অপর পক্ষের শতকরা আটাশটা আসন জোর করে কেটে নেওয়া হয়। যাদের আসন কাটা যাবে তারা বিদ্রোহ করবে না? কংগ্রেসের ভিতরে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটবে। হিন্দুদের ভিতরেও। ওজন তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আরো বাড়িয়ে প্যারিটি করা কারো সাধ্য নয়। অমন করলে কংগ্রেসও ইন্টারিম গভর্নমেন্টে বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যাবে না। মুসলিম লীগ গেলে খোলা মাঠে গোল দেবে। তাই হোক।" মানস বিরক্ত হয়।

"তা হলে বিকল্প নেই, মিস্টার মল্লিক।" আখতার ক্ষুণ্ণ হন।

মানস গম্ভীরভাবে বলে, "কত কাল পরে স্বাধীনতার সুযোগ এল। স্বাধীন হয়েই যদি মুসলমানরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁদের অংশের নাম হবে পাকিস্তান আর পাকিস্তানী মানে মুসলিম ও মুসলিম মানে পাকিস্তানী তবে একজনও হিন্দু পাকিস্তানে বাস করবে না। বাংলাদেশের সবটাই যদি পাকিস্তানের সামিল হয় তবে পৌনে তিন কোটি বাঙালী হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে বিহারে, ওড়িশায়, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে আশ্রয় নেবে। তাদের শূন্যতা পূরণ করবে ওইসব প্রদেশের সমসংখ্যক উর্দুভাষী

মুসলমান। ওরাই হবে শতকরা পঁয়তাল্লিশ। আসাম জুড়লে শতকরা আটচল্লিশ। তপ্ত কটাহ থেকে আপনারা ছিটকে পড়বেন জ্বলন্ত আগুনে। বাংলার লীগ পন্থী নেতারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কাগজে লিখেছে, লর্ড পেথিক-লরেন্স জিন্না সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, মিস্টার জিন্না, আপনি কি ইণ্ডিয়ান নন? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, না, আমি ইণ্ডিয়ান নই। তিনি হিন্দু নন বলে যে ইণ্ডিয়ানও নন এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই মনোভাব যদি নয় কোটি ভারতীয় মুসলমানের হয় তবে লোকবিনিময় রোধ করা যাবে না। এটা একটা সর্বনেশে থিওরি। ইংরেজ চলে যাচ্ছে বলে কোটি কোটি হিন্দু ও কোটি কোটি মুসলমানও যে যার ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার মন্দির মসজিদ ছেড়ে চলে যাবে এটা তো স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার নয়, অপব্যবহার।"

হকচকিয়ে যান আখতার সাহেব। এত কথা তিনি জানতেন না। বলেন, "যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। কেউ বাংলার বাইরে যাবে না, কেউ বাইরে থেকে আসবে না। দুঃস্বপ্ন। নাইটমেয়ার। জিন্না, লিয়াকৎ আলী এলেও আমরা তাঁদের ফেরৎ পাঠাব। ইচ্ছা করলে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে পারেন।"

"কিন্তু তাঁরা যেখানে যাবেন সেইখানেই তো হবে রাজধানী। তাতে কলকাতার কী লাভ? আমাদের পক্ষে দিল্লীই তো নিকটতর, লাহোর দূর অস্ত। যদি জানতুম যে কলকাতাই রাজধানী হবে, তার পূর্ব মহিমা ফিরে আসবে, তা হলে না হয় পার্টিশন সমর্থন করতুম। তবে ওই নামটা নয়। ওটা পালটে দিতে হতো।" মানস ইঙ্গিত করে।

সম্ভবপর নাম নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। কোনোটাই দু'জনের পছন্দ হয় না। আপাতত পাকিস্তানই মেনে নিতে হয়।

"ধন্যবাদ, মল্লিক সাহেব। আপনি আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। এবার আমিও আপনাকে এমন কিছু বলব যাতে আপনারও চোখ ফোটে।" আখতার বলেন।

"সে কেমন কথা?" মানস আশ্চর্য হয়।

"সাত বছর আগে আমরা বাঙালী মুসলমান ছিলুম। ইতিমধ্যে এমন কী হলো যার ফলে আমরা আজ পাকিস্তানী মুসলমান হয়েছি বা হতে চাইছি? সেটা আর কিছু নয়, কায়দে আজম আমাদের আশা দিয়েছেন যে বাঙালী মুসলমান হিসাবে শুধুমাত্র সীলেট নয়, পাকিস্তানী হিসাবে অসমীয়াভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল সমেত সমগ্র আসামই আমরা পাব। আমাদের ভূমিহীন চাষীরা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। দশ বিশ বছরের মধ্যে আসাম প্রদেশও মুসলমানপ্রধান ও বাঙালীপ্রধান হবে। তাতে আপনাদেরও তো লাভ। কিন্তু ওই যে আপনি বললেন, পাইকারী হারে লোকবিনিময় যদি হয়ে যায় তবে উর্দুভাষী মুসলমান এসে বাংলাভাষী মুসলমানদের কিস্তিমাৎ করবে।" আখতার স্বীকারোক্তি করেন।

"গুড গড, মিস্টার জামান।" মানস মাথায় হাত দিয়ে বসে। "এক ঢিলে ক'টা পাখী আপনারা মারবেন? পাঁচটা মেরেও সন্তুষ্ট নন। আরো একটা মারবেন? আসাম?"

"পাঁচটা পাখী কী বলছেন, বুঝতে পারলুম না।" আখতার বলেন।

কামালউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল মানস তার বিবরণ দেয়। "কামালউদ্দীনও জানতেন না যে আরো একটা পাখী মরবে।"

আখতার লজ্জিত হন। "কংগ্রেস কক্ষনো এতগুলো দাবী মানবে না। একমাত্র ভরসা ইংরেজ। তাদেরই বা এমন কী গরজ যে মুসলিম লীগের পক্ষ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে যাবে? বিশেষত যাবার মুখে। যদি সত্যি সত্যি যায়।"

"না গেলে মুসলিম লীগের সাহায্যে একটার পর একটা মিউটিনি দমন করতে হবে। দুর্ভিক্ষেরও

পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের দমন করার উপায়ও নিশ্চয় মুসলিম লীগ বাতলে দেবে। যেমন তেতাল্লিশ সালে দিয়েছিল। আমি তো বলি জিন্না সাহেবকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে ইংরেজরা তাঁর মাথার উপর রাজছত্র ধরুক। কংগ্রেস জেলে ফিরে যাক। মহাত্মা সেদিন কাকে যেন বলেছেন, জবাহরলাল কেন ওদের চোয়ালের ভিতর ঢোকার জন্যে ছুটে যাচ্ছেন? ব্যস্ততাটা জবাহরলাল আর আজাদেরই বেশী। গান্ধীজীর তো নয়ই, বল্লভভাইয়েরও নয়। বড়লাটকেই এঁদের কাছে ছুটতে হবে, এঁদেরকে বড়লাটের কাছে নয়। আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে বড়লাট কতদিন লাভাবর্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে দেখা যাক। লর্ড ওয়েভেল সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা থেকে অপসরণ করেছেন, এবার ভারত থেকেও অপসরণ করবেন। যদি সব দিক সামলাতে না পারেন। ওদিকে ইউরোপীয় অফিসাররা ঘরমুখো। তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও পেনশন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যেও একটা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট প্রয়োজন। সেটা গঠন করা জিন্না সাহেবের প্রথম কর্তব্য হবে, যদি তিনি বড়লাটের আমন্ত্রণ পান। এক ঢিলে দুই পাখী মারা তো পরের কথা।" মানস উপহাস করে।

"আপনি কি মনে করেন কংগ্রেস আবার জেলে ফিরে যাবে? আট আটটা প্রদেশের মন্ত্রীপদ ত্যাগ করবে? কেন্দ্রে অর্ধেক রাজত্বের প্রস্তাব উপেক্ষা করবে? আজাদকে বর্জন করলে এমন কী ক্ষতি হবে?" আখতার ভেবে পান না।

"আজাদ সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বন্দী হয়ে আসছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম গান্ধীজীরও পূর্বের। নৈতিক বলুন, রাজনৈতিক বলুন তাঁর দাবী কারো চেয়ে কম নয়। সাম্প্রদায়িক কারণে তাঁকে বর্জন করলে কংগ্রেস তার নিজের মুখে চূণকালি মাখবে। এর পরে যদি সংগ্রামের দরকার হয় একজনও মুসলমান কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেবে না। মুসলিম নির্বাচকদের ভোট কংগ্রেস প্রার্থীরাও বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন, তবে বহুল পরিমাণে নয়। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই আছে, তাই কংগ্রেসের শুধু হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয়। কংগ্রেস চায় সেকুলার স্টেট, আমেরিকা যার আদর্শ। দুঃখের বিষয় ইংরেজদের এটা বিশ্বাস হচ্ছে না, পাছে তাঁদের মুসলিম মিতাদের মামলা দুর্বল হয়। বেশ তো, তাঁরা তাঁদের মুসলিম মিতাদের নিয়ে যতদিন চালাতে পারেন, চালান। কে তাঁদের পায়ে ধরে সাধছে যে কংগ্রেসকেও সঙ্গে নিতে হবে, তার জন্যে আজাদকে বিসর্জন দিতে হবে। এটা ক্রিকেট নয়। কংগ্রেসকে ডাকলে সে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের তিনজন নেতাকেই নেহরুর সাথী করবে।" মানস যতদূর জানে।

"কিছু মনে করবেন না, মল্লিক সাহেব। আজাদের মহত্ত্ব আমিও মানি। কিন্তু ভারতের নিয়তি নির্ভর করছে কংগ্রেস লীগ মীমাংসার উপরে। জিন্নাকে বাদ দিয়ে সে মীমাংসা হতে পারে না। আজাদকে বাদ দিয়ে হতে পারে। তিনি যদি সরে দাঁড়ান মীমাংসা সুগম হয়।" আখতার বলেন।

মানস হেসে বলে, "কিন্তু তিনি সরে গেলেও তো ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা থেকে কংগ্রেসের ব্রুট মেজরিটি সরে যাবে না। সরকার মনোনীত সদস্যরা যদি নিরপেক্ষ থাকেন। জিন্নার মাথাব্যথার কারণ কংগ্রেসের ওই ব্রুট মেজরিটি। কংগ্রেস যেমন ব্রিটিশ সরকারের ব্রুট মেজরিটির কাছে সারেণ্ডার করবেন না। তাঁকে নিষ্কণ্টক করতে হলে কংগ্রেসের ব্রুট মেজরিটিকেও সরাতে হবে। শুধু আজাদকে নয়। ওয়েটেজ, প্যারিটি ইত্যাদি কত রকম দাবী ওঁর ঝুলিতে। সেসব একে একে বেরোবে। কংগ্রেস একে একে প্রত্যেকটি খারিজ করবে, কারণ তার মেজরিটির পায়ের তলায় রয়েছে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের অকুরন্ত সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের কারাবরণ। হাজার হাজার কর্মীর ত্যাগ ও সেবা। নেতাদের পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়। দীর্ঘকালের ঐকান্তিক সাধনার ফলে সে যদি মেজরিটি পেয়ে থাকে তবে সেটা জনসাধারণের আস্থার জোরে। গায়ের জোরে বা মন্ত্রের জোরে নয়। কংগ্রেসের সেই কষ্টার্জিত মেজরিটিকে ব্রুট মেজরিটি বা হিন্দু মেজরিটি বলে খাটো করতে গেলে মীমাংসা কারো সঙ্গেই হবার

নয়। না মুসলিম লীগের সঙ্গে, না ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে। আজাদের অবশ্য সরে যাবার সময় হয়েছে। তিনি ছ'বছর ধরে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট।"

"কিন্তু আমি বলছিলুম ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ও কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা। মীমাংসা তো সেই দুটি ফোরামেই হবে। সে দুটি ফোরামে যদি আজাদ থাকেন তবে জিন্না থাকবেন না বলেই আমার ধারণা। আর জিন্নাই তো হ্যামলেট নাটকের প্রিন্স অভ্ ডেনমার্ক। তিনি না থাকলে নাটক জমবে না।" আখতার ভবিষ্যবাণী করেন।

মানস চমকে ওঠে। সে কখনো এই লাইনে ভাবেনি। "কিন্তু এই আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে বড়লাট কী করে সরকার চালাবেন? কতদিনই বা চালাতে পারবেন? মীমাংসা জরুরি। মীমাংসা হবেই। নয়তো লাভাবর্ষণের সময় বিনা মীমাংসায় অপসরণ করতে হবে।" মানসও ভবিষ্যদ্বাণী করে।

"বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। গান্ধীর চেয়ে জিন্না দড়। এ বছরটা জিন্নার বছর। যেমন ১৯৪২ সালটা ছিল গান্ধীর বছর। জিন্না ডাক দিলে তুলকালাম কাণ্ড বাধবে।" আখতার আশঙ্কা করেন।

"তা যদি হয় তবে শাপে বর হবে। ইংরেজরা আরো আগে কুইট করবে। ডিভাইড করারও সময় পাবে না। আজাদও বাদ নন, জিন্নাও বাদ নন, বড়লাটই বাদ। ত্রিভুজের একটা ভুজ বাদ গেলে বাকী দুটোর মধ্যেই মীমাংসা হবে। এক দফা গৃহযুদ্ধের পর সন্ধি। সে দুটো ভুজও বড়ো আর ছোট। মেজরিটি আর মাইনরিটি। মীমাংসা যেটা হবে সেটা সমানে সমানে নয়, অসমানে অসমানে। মুসলিম লীগ কলকাতা পাবে না, দিল্লী পাবে না, লাহোর পাবে কি-না সেটা নির্ভর করবে শিখ মাইনরিটির উপরে, হিন্দু মেজরিটির উপরে নয়।" মানস সেটা অনিশ্চিত রেখে দেয়।

"কিছু মনে করবেন না, মল্লিক সাহেব, সেই যে একটা কথা আছে না, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। তেমনি এক কাঁকুড় হচ্ছে সারা বাংলাদেশ আর তেমনি এক বীচি হচ্ছে কলকাতা মহানগরী। বাঙালী হিন্দুর মাথায় ঢুকেছে যে বারো হাত কাঁকুড়ের চেয়ে তেরো হাত বীচির গুরুত্ব বেশী। তাই সে কলকাতার জন্যে লড়বে, সারা বাংলার জন্যে লড়বে না। কী করে এদের বোঝাব যে সারা বাংলার রক্ত চুষে কলকাতা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সারা বাংলার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার রক্ত শুকিয়ে যাবে, সেটা হবে একটা মরা শহর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রকৃত সমাধান হচ্ছে সারা বাংলার জন্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এক রাষ্ট্র। যার রাষ্ট্রপতি একজন হিন্দু ও প্রধানমন্ত্রী একজন মুসলমান। কিংবা রাষ্ট্রপতি একজন মুসলমান ও প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্দু। শাসনতন্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত হবে যাতে এই ব্যবস্থাই হয় পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট। তখন দেখবেন মুসলমানরা পাকিস্তান চাইবে না, পূর্ব পাকিস্তান তো কিছুতেই না। যে সমস্যা শরৎ বোস আর সুহরাবর্দী মিলে মিটিয়ে দিতে পারেন তার জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা কেন? ওঁরা কি বাংলার নাড়ী জানেন? বাঙালীর মন বোঝেন? লর্ড কার্জন সেটা জানতেন না। তাই একটা ঐতিহাসিক অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রদ করার জন্যে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন, বর্ধমানের আবুল কাসেম, কুমিল্লার আবদুল রসুল একজোট হয়েছিলেন। উপায়ান্তর নেই দেখে ঢাকার নবাব মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনের শেষে সমবেত অবাঙালী মুসলমানদের নিয়ে রাতারাতি একটা পলিটিকাল সংস্থা পত্তন করেন। নাম রাখা হয় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ। হ্যাঁ, মুসলিম লীগ হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে। যেখানে ওঠার কথা নয় সেইখানে, ঢাকায়। তেমনি পাকিস্তানও হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে উঠছে। যেখানে ওঠার কথা নয় সেইখানে, বাংলাদেশে। পাকিস্তান শব্দটি তো বিভিন্ন প্রদেশের নামের আদ্য অক্ষর জুড়ে জুড়ে বানানো। কই, তার মধ্যে বেঙ্গলের বি কই? ওর একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালী মুসলমানকে ভোলানো হয়েছে। এরাও পাইকারিভাবে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সত্যি কি ওটা বাঙালী মুসলমানের স্বার্থে? বাঙালী হিন্দুর স্বার্থে তো নয়ই। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা। যার রাষ্ট্রপতি হিন্দু হলে প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান। কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিন্দু হলে রাষ্ট্রপতি হবেন মুসলমান। ক্ষমতার বন্টন হবে এমন ভাবে যে কোনো সম্প্রদায়ই প্রভু সম্প্রদায় হবে না। যেটা পাকিস্তান হলে অনিবার্য, অখণ্ড ভারত হলে তো অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজরা যাচ্ছে যাক, কিন্তু সেটা শাপে বর না হয়ে চিরস্থায়ী অভিশাপ হবে, যদি বাঙালী হিন্দু মুসলমান ক্ষমতা ভাগাভাগি না করে বাসভূমি ভাগাভাগি করে। কিন্তু মনে করবেন না, সার। আমি তো আপনার তুলনায় শিশু। এই সেদিন বিলেত থেকে ফিরেছি। দেশের রাজনীতির খেই হারিয়ে ফেলেছি। কে জানে আমিই হয়তো ভ্রান্ত।" আখতার সাহেব এক নিঃশ্বাসে বলে যান।

"না, না, আপনি ভ্রান্ত নন, মিস্টার জামান। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো। পার্টিতে পার্টিতে কোয়ালিশন যদি না হয় হিন্দু রাষ্ট্রপতি আর মুসলিম প্রধানমন্ত্রী আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ রোধ করতে অক্ষম হবেন। পার্টিশন আপনাআপনি ঘটে যাবে।" মানস আশঙ্কা করে।

"কিন্তু পার্টিশন হলে তো প্রদেশকে ভিত্তি করেই হবে।" আখতারের ধারণা।

"তেমন কী কথা আছে? অঞ্চলকে ভিত্তি করে কেন নয়? হিন্দুদের ব্রুট মেজরিটির ভয়ে যদি ভারত ভাগ হয় তবে মুসলমানদের ব্রুট মেজরিটির ভয়ে বাংলা ভাগ হবে না কেন? আমি কিন্তু কোনোটারই পক্ষপাতী নই। ব্রুট মেজরিটি আমার উক্তি বা আমার যুক্তি নয়। জিন্না সাহেবই এর জনক। মেজরিটি হলেই সে ব্রুট হবে, এটা ধরে নেওয়া ভুল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের মেজরিটি, কিন্তু হিন্দুরা তার জন্যে ভীত নয়, তাদের মুখে শোনা যায় না যে মেজরিটি হচ্ছে ব্রুট মেজরিটি। বাংলাদেশেও আমরা মুসলিম মেজরিটিকে ভয় করিনে, ব্রুট মেজরিটি বলিনে। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন যদি না হয়, তার পরিবর্তে যদি হয় পার্টিশন, তা হলে প্রদেশের ভিত্তিতে নয়, অঞ্চলের ভিত্তিতে পার্টিশনের দাবী উঠবেই। সেটা তেরো হাত বীচির লোভে নয়, দুই নেশন থিওরির আনুষঙ্গিক মিথ্যা ও মিথ্যার আনুষঙ্গিক হিংসার প্রতিবাদে। সারা বাংলাদেশটাই হিন্দুর হোমল্যাণ্ড। তাকে মুসলিম হোমল্যাণ্ড বলে পাকিস্তানের সামিল করতে গেলে এই হবে তার উত্তর। এটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা প্রশ্নটা তুলে নিন। ভারত অবিভক্ত থাকলে বাংলাদেশও অবিভক্ত থাকবে। মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ শাসন করলে হিন্দুরাও তা মেনে নেবে। এতদিন তো মেনে নিয়েছে। আমার কথা যদি বলেন আমি মন্ত্রীদের জাত ধর্ম বিচার করিনে, পলিসি বিচার করি। অফিসারদের জাত ধর্ম বিচার করিনে, যোগ্যতা বিচার করি। রাইট ম্যান, রাইট পলিসি এইসবই বিচার্য। মুসলিম লীগের যেসব পলিসি ন্যায়সঙ্গত সেসব পলিসি আমি সমর্থন করি। মুসলিম অফিসারদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু মুসলমান সকলের উপকার করেন আমি তাঁদের প্রশংসা করি। কেন তাঁরা পর হয়ে যাবেন, কেন আমাদের পর মনে করবেন, এর কোনো সঙ্গত কারণ আমি জানিনে। ইংরেজরা চলে যাবে বলে মুসলমানরাও চলে যাবে এটা কি ইতিহাসের নির্দেশ? না দুই নেশন থিওরির পরিণাম? সব চেয়ে দুঃখের বিষয় সাধারণ নির্বাচনে এই থিওরি অধিকাংশ মুসলমানের ভোট পেয়ে জিন্না সাহেবের উপর আস্থা প্রমাণ করেছে। তিনি এখন সেই ভোটের জোরে পাকিস্তান দাবী করবেন, না পেলে গায়ের জোরে তুলকালাম কাণ্ড করবেন। করা সহজ, কারণ দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। ক্যাবিনেট মিশন যদি তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়ে নতুন এক এ্যাওয়ার্ড দেয় তা হলে কংগ্রেস তা এবার সরাসরি বর্জন করবে। নয়তো তিনিই প্রকারান্তরে তাঁটো দেবেন। আমি এই নাটকের নীরব দর্শক। এ নাটক বিয়োগান্ত না হলেই রক্ষা।" মানস চিন্তাকুল।

"আমার নিজের মতে দুই নেশন থিওরি হচ্ছে ঝুটা আর পাকিস্তান হচ্ছে ফাঁকিস্তান। বাঙালী মুসলমান একদিন এটা হৃদয়ঙ্গম করবেই। কিন্তু ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে এখন আর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারা যাবে না। তার জন্যে চাই আরো একটা সাধারণ নির্বাচন। আমাদের এখন দেখতে হবে যাতে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন অন্তত আমাদের এই প্রদেশে হয়। বাংলাদেশ আজ যা করে অবশিষ্ট ভারত

কাল তা করে। গোখলের সেই উক্তি কি মিথ্যা হবে? আমি তলে তলে চেষ্টা করে যাব। ইনশা আল্লা, যদি সফল হই তবে বাকী ভারত ভাগ হয়ে গেলেও বাংলাদেশ ভাগ হবে না, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবে। শরৎ বোস প্রেসিডেন্ট, সুহরাবর্দী প্রাইম মিনিস্টার। খোদা হাফেজ।" আখতার বিদায় নেন।

বাড়ী ফিরতে দেরি হয়েছিল। খাদি কর্মী বঙ্কিম কর তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। সৌম্যদার বন্ধু। একসঙ্গে জেল খেটেছেন।

"সৌম্যদার চিঠি পেয়েছি। ওরা ভালোই আছে। কিন্তু ওদের কুঁড়েঘর এখনো বাসযোগ্য হয়নি। বৌদি চান কলকাতার মতো বাথরুম ও টয়লেট। শহরের ক'জন বড়লোকের বাড়ীতে তা আছে? কুঁড়েঘরে তো একেবারেই বেমানান। তার সঙ্গে দু'খানা পাকা ঘর জুড়তে হবে। টাকা অবশ্য বৌদিই জোগাবেন, তাঁর অর্থের অভাব নেই। কিন্তু লোকে বলবে কী?"

মানস যূথিকার দিকে তাকায়। "এক আজব সমস্যা।"

"সমস্যা না ছাই। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে বলে কি তাদেরি মতো মাঠে জঙ্গলে ছুটতে হবে? শৌচের ব্যবস্থা যার যে রকম রুচি। এ ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তি করা অহিংসা নয়। সে অধিকার জনগণেরও নেই। সৌম্যদা যদি জনগণের কাছে নত হয় তা হলে জানব স্বাধীন ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না।" যূথিকা জুলির পক্ষ নেয়।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। ইংরেজরাও তো বলে, হোয়েন ইউ আর ইন রোম ডু অ্যাজ দ্য রোমানস ডু।" বঙ্কিমবাবু সাফাই দেন।

"কী, জজসাহেব? তোমার রায় কী?" যূথিকা কৌতুক করে।

"শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে এর উত্তর দিয়ে গেছেন। তুমি যদি লোকের উপকার করতে যাও তো তাদের একজন হতে হবে। তার জন্যে তাদের লেভেলে নামতে হবে। গান্ধীপন্থী কর্মীরা যদি বিদেশী মিশনারীদের মতো বাস করে তবে উপকারও তেমনি ভাসা ভাসা হবে। তারা যখন চলে যাবে তখন কেউ তাদের শিক্ষা মনে রাখবে না। সৌম্যদাও কি ওখানে বরাবর থাকবে। তা তো মনে হয় না। স্বরাজের পর কাজ ফুরিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সহধর্মিণীরও।" মানস যতদূর বোঝে।

"গান্ধীপন্থী কর্মীদের কাজ স্বরাজের পরেও ফুরোবার নয়, জজ সাহেব। স্বরাজ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য সর্বোদয়। আমরা শেষ মানুষটি পর্যন্ত যাব। তাকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করব, কর্মহীনতা থেকে উদ্ধার করব, অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করব, দুর্বলতা থেকে উদ্ধার করব। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়তে পারবে। তার মতো লোকদের মত না নিয়ে কেউ রাজা হতে পারবে না, তাদের উপর খাজনা ধার্য করতে পারবে না, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারবে না। এই হচ্ছে স্বরাজের তাৎপর্য কে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করল না করল সেটা গৌণ। দেখছেন তো তাদের সর্বপ্রধান সেবক গান্ধীজীর সঙ্গে নেগোশিয়েশন না চালিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন তাঁর অনুচর ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে চালাচ্ছেন। গান্ধীজীকে বাদ দেওয়া মানে পীপলকে বাদ দেওয়া। হস্তান্তর যেটা হবে সেটা উপরে উপরে হবে। সব নিচের মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছবে না। কাজেই সৌম্যদাকে থাকতে হবে সেই মানুষটির কাছে। তাকে ছেড়ে গেলে চলবে না। আর বৌদি যদি সমস্ত জেনেশুনে বিয়ে করে থাকেন তবে তাঁকেও অনুব্রতা হতে হবে।" বঙ্কিমবাবুর মতে।

"দাদা, আপনি কি বিয়ে করেছেন?" যূথিকা সন্দিগ্ধ স্বরে সুধায়।

"যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল ভিখারী স্বামীকে তিনি ত্যাগ করেছেন। আমিও মুক্ত, তিনিও মুক্ত।" বঙ্কিমবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

।। পনেরো ।।

জাহাজে ওঠার আগে মিলি চিঠি লেখে জুলিকে। বলে, "আমি আবার অকূলে ভাসলুম রে! জীবন আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমার স্থান। ঝাঁসীর রাণী হতে চাইলেই কি হওয়া যায়, ভাই? তোকেও বুঝতে হবে যে জোন অভ্ আর্ক হতে চাইলেই হওয়া যায় না। নৌসেনা বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ কোনোটাই এদেশে জমবে না। তার আগেই এদেশ স্বাধীন হবে। আয়ারল্যাণ্ডের মতো স্বাধীন। তার পরেও যদি কেউ আইরিশ রেপাবলিকান আর্মির মতো অখণ্ড ভারতীয় সেনা গঠন করতে চায় করতে পারে। কিন্তু আমি তার মধ্যে নেই। যারা আমাদের নয় তারা আমাদের নয়। জোর করে তাদের আপন করা যায় না। ওরা যদি আলাদা হতে চায় আলাদাই হোক। শুধু দেখতে হবে যেন আমাদের ভাগ থেকে কলকাতা বাদ না পড়ে। ইংরেজদের ঘটে ওটুকু বুদ্ধি আছে। ওরা যদিও পিটারকে বঞ্চিত করে পলকে দিতে ওস্তাদ তবু ভারত ত্যাগের সময় পিটারকে চিরশত্রু করতে সাহস পাবে না। বাণিজ্য তো পিটারের সঙ্গেই। আর ওরা বণিক জাতি।"

এর পর মিলি আসে আসল কথায়। "জুলি, আমার বিশেষ অনুরোধ যতদিন না তোর নিজের কুটির হয় ততদিন আমাদের বাড়ীই তোর বাড়ী, আমার মা বাবাই তোর মাসিমা মেসোমশায়। তুই ওঁদের কাছেই থাকিস। তাতে ওঁরা আমাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ ভুলবেন। তুই ওঁদের আরেকটি মেয়ে। শুধু মনে রাখিস যে ওঁরা রাজনীতির লোক নন, রাজনীতি এড়িয়ে চলেন। ওঁদের পক্ষে ওটাই নিরাপদ পলিসি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। ওঁদের কাছে এটা স্পষ্ট যে ওঁদের বাসস্থানটা কুম্ভীরীস্থান হতে যাচ্ছে। যদি না কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন হয়।"

মিলির নৌসেনাবিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার বিশদ বিবরণ সে নিজে লেখেনি। লিখেছেন তার দাদা। জুলিকে নয়, ওর বাবাকে। ক্যাপটেন মুস্তাফী সেটা শোনান ওর মাকে। ওর মা শোনান জুলিকে। আর জুলি সৌম্যকে।

সৌম্য তা শুনে বলে, "ওর ভিতরে যে আগুন ছিল তা দেখছি এতকাল পরেও নিবে যায়নি। ধন্যি মেয়ে।"

জুলির তা শুনে কী অভিমান! "তোমার সঙ্গে ঠিক মানাত। আমি তো কবে নিবে গেছি, যদি আদৌ জ্বলে থাকি।"

"না, না, তোমার ভিতরেও আগুন আছে, জুলি। সে আগুন তুমি লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ধীরে ধীরে ও অলক্ষে সঞ্চারিত করবে। বাক্য দিয়ে নয়, ব্যক্তিত্ব দিয়ে। জন জাগরণ না হলে আমরা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কী করব! আমরা যাকে গঠনের কাজ বলি তা জনজাগরণের সূত্র। দেখতে নাটকীয় নয় বলে বামপন্থীরা বিমুখ। দক্ষিণপন্থীদেরও চাড় নেই, কারণ তাঁরা আইনসভায় গিয়ে মন্ত্রী হতে চান। এবার বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য হয়েই তাঁদের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি। যার জন্যে আজীবন দুশ্চর তপস্যা। এর পরে একদিন শুনবে তাঁরা পদত্যাগ করে ফিরে এসেছেন। আমাদের পথ তেমন পথ নয়। আমরা জনগণের কাছে যাই ভোটের জন্যে নয়। ওদের ভিতরে আগুন সঞ্চার করতে। যে আগুন হিংসার আগুন নয়, তেজস্বিতার আগুন।" সৌম্য জুলিকে বোঝায়।

ইন্টারিম গভর্নমেন্টের প্রসঙ্গ ওঠে। সৌম্য বলে, "জবাহরলাল ও আজাদ অত্যধিক ব্যগ্র। তাঁদের মতে ওটা নাকি প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট। বিপ্লবের পর যেমন হয়। বিপ্লব কবে হলো যে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট হবে? কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। ওটা বড়লাটের নিয়ন্ত্রণাধীনই থাকবে, নেহক নামক

প্রধানমন্ত্রীর নয়। প্রধানমন্ত্রী পদটাও কবিকল্পনা। বড়লাট বা মুসলিম লীগ কেউ সেটা মেনে নেবে না। ঊর্ধ্বতন দায়িত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই থাকবে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নয়। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে আইনসভা কাউকে পদচ্যুত করতে পারবে না। বড়লাট অসন্তুষ্ট হলে কিন্তু তা করতে পারবেন। আর মুসলিম লীগকেও মাশুল জোগাতে হবে। রকমারি মাশুল। নয়তো ওরা সহযোগিতা করবে না। ওরা সহযোগিতা না করলে বড়লাট কংগ্রেসকেই বলবেন ওদের মান ভঞ্জন করতে। বাপু কী করবেন? জবাহর ও আজাদকে টেনে রাখবেন না যেতে দেবেন? ভিতরে ভিতরে এটা গান্ধী বনাম জিন্না। বাইরে থেকে মনে হয় ব্রিটেন বনাম ভারত।"

মিলির অনুরোধে নয়, মুস্তাফীদের অনুরোধেই ওরা তাঁদের ওখানে থাকে। আশ্রমে ওদের জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হলে সেখানে উঠে যাবে।

মুস্তাফীরা প্রত্যেক শুক্রবার রিসিভ করতেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বৈঠকখানায় আসতেন শহরের গণ্যমান্য উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক ও সরকারী কর্মচারী। সবরকম বিষয়েই আলাপ আলোচনা হতো।

রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার বলেন, "কেবল ইংরেজদের সঙ্গে নয় মুসলমানদের সঙ্গেও একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক চাই। যেটা শাসক শাসিতের নয়, শোষক শোষিতের নয়, উচ্চ নীচের নয়। স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যে সমানভাব প্রত্যাশা করি অথচ পাইনে আমাদের কাছ থেকে মুসলমানরাও সেই সমানভাব প্রত্যাশা করে অথচ পায় না। তাই মুসলিম লীগের প্রথম শর্ত হলো তাকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমান মর্যাদা ও সমান ওজন দিতে হবে। যাকে বলে প্যারিটি। কিন্তু তার মানে দাঁড়াচ্ছে একই সিংহাসনে দুই রাজা। যার নাম দ্বৈরাজ্য। ব্রিটিশ রাজের দুই উত্তরাধিকারী সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে একই সিংহাসনে বসবে এটা কী করে সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে না? দারা শিকো বনাম আওরংজেব। আধুনিক আওরংজেবের সামর্থ্য থাকলে তিনি আধুনিক দারা শিকোকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে সমগ্র সাম্রাজ্য অধিকার করতেন। তেমন সামর্থ্য নেই জেনে ছয়টা প্রদেশের বিপরীতে ছয়টা প্রদেশ দাবী করছেন। এটাও একপ্রকার প্যারিটি। গান্ধীজীর কথা শুনে মনে হয় তিনি বিনা দ্বন্দ্বে ছয়টা প্রদেশ ছেড়ে দেবেন, কিন্তু একটি শর্তে। সোভরেনটি থাকবে ঊর্ধ্বতম স্তরে ফেডারল গভর্নমেন্টের হাতে। সে তিনটিমাত্র বিষয় পরিচালনা করবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ। জিন্না সাহেবের এতে প্রবল আপত্তি। সোভরেনটি তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। তা হলে গিভ অ্যাণ্ড টেক হয় কী করে? গিভ অ্যাণ্ড টেক বিনা কি কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্ভবপর? কংগ্রেস লীগ চুক্তি না হলে কংগ্রেস লীগ সংঘর্ষ রোধ করবে কে? ইংরেজ? ইংরেজ কি চিরস্থায়ী? ওরা তো এখন যাই যাই করছে।"

এর উত্তরে সৌম্য মুখ খোলে। "গান্ধীজী তো একথাও বলছেন যে, হয় কংগ্রেসকে নয় লীগকে কেন্দ্রের ভার দিয়ে ওরা এক্ষুণি বিদায় হোক।"

প্রখ্যাত উকীল মোহিনীমোহন ধর রাজনীতিতেও ধুরন্ধর। তিনি চোখ বুজে শুনছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার মতো তুখোড় পলিটিসিয়ান এদেশে আর জন্মাননি। গান্ধী চলেন ডালে ডালে তো জিন্না চলেন পাতায় পাতায়। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের আশ্বাস না পেলে হ্রস্বমেয়াদী সমাধানে তাঁর আগ্রহ নেই। পাকিস্তান হবে কি হবে না সেইটেই প্রথম কথা। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তার পরের কথা। আর পাকিস্তান বলতে তিনি কেবল সেপারেট নয়, সোভরেন স্টেটও বোঝেন। বাংলাদেশ হবে তার একটা প্রদেশ। আসামও আরেকটা। সেটাও নাকি মুসলিম নেশনের অংশ। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি ধাঁধায় ফেলেছেন। ইংরেজরা শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পক্ষপাতী। অশান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কংগ্রেসও চায় না। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি বলে, আমরা পাকিস্তানের জন্যে লড়তে তৈরি, মরুক না লাখে লাখে হিন্দু মুসলিম শিখ তা হলে অশান্তির চূড়ান্ত হবে। এই নির্বাচনেই তো দেখা গেল মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। 'জ্বরের যম জারমলীন

হিন্দুর যম নুরুদ্দীন ; নুরুদ্দীনকে ভোট দিন। পাকিস্তান জিতে নিন।" বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগের জয়। কৃষক প্রজার জামানত বাজেয়াপ্ত। জিন্না সাহেব এখন থেকেই পাকিস্তানের বাদশা বনে বসে আছেন। অশান্তিকে তিনি ডরান না। জেহাদ বলে একটা অস্ত্র আছে তাঁর তূণে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের চেয়ে ঢের বেশী জোরালো। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক ধর্মের জন্যে তারা প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে প্রস্তুত। গান্ধীজীর পরামর্শে সারা ভারত যদি মুসলিম লীগের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজরা বিদায় হয় তা হলে তার পরের দিনই পানিপথের যুদ্ধ। হিন্দু মহাসভা অখণ্ড ভারতের জন্যে লড়বে। দিন দিন তারও প্রভাব বাড়ছে। সমান ভায়োলেন্স। আওরংজেব বনাম শিবাজী।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেও আঁচতে পারছে হিন্দু মুসলমানের জঙ্গী মনোবৃত্তি। হিন্দুদের সংখ্যার জোর কম, তাই দাপট কম, নইলে তারা যে অহিংসার পূজারী তা নয়। সে সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী। গৃহযুদ্ধের বিরোধী তো বটেই। কিন্তু আর-একটা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করার মতো দম তার সহকর্মীদের নেই।

গৃহকর্তা ক্যাপটেন মুস্তাফী বিতর্কে যোগ দেন। "এর কোনো সামরিক সমাধান নেই, মোহিনী। তোমরা নেতারা একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করো। ক্যাবিনেট মিশনও তারই অন্বেষণ করছে। আমার জামাতা সুকুমারের মুখে শুনেছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী স্বয়ং ভারত সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার নিয়েছেন। ভারত সম্পর্কিত ফাইল এখন তাঁর নিজের দেরাজে। কাউকে জানতেই দিচ্ছেন না ব্রিটেন কী করবে না করবে। তবে গান্ধীকে তিনি পছন্দ করেন না, গত মহাযুদ্ধের সময় গান্ধী ইংরেজদের পিঠে ছোরা মেরেছিলেন। জিন্নাকেও তিনি আসকারা দিতে চান না। জিন্নার অস্ত্র জেহাদ নয়, ভীটো। সে অস্ত্র অ্যাটলী সাহেব জিন্নার হাতে থাকতে দেবেন না। জিন্নাও কিছুদিন পরে টের পাবেন যে ইংরেজ তাঁর খেলা খেলবে না, তাঁকেই ইংরেজের খেলা খেলতে হবে। মান অভিমান বৃথা।"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "দ্যাখ, কালীকৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে নেতা বলে লজ্জা দেয় না। আমার কৃষক প্রজা দল তো গোহারান হেরেছে। লোকের মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে। যেখানে অবজেকটিভ চেষ্টা সম্ভব নয়, সেখানে সাবজেকটিভ চেষ্টা দিয়ে পরিস্থিতিকে শান্ত করতে হয়। অবজেকটিভ চেষ্টা বলতে বুঝি ভূমিহীনকে ভূমিদান, কর্মহীনকে কর্মদান, মুদ্রাস্ফীতিরোধ, ধনিকদের উপর বর্ধিত কর। ইংরেজ কর্তাদের দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় বস্তুগত পরিবর্তন হবে না, ওঁরা সেটা উপলব্ধি করেছেন। আর সাবজেকটিভ চেষ্টা বলতে বোঝায় ক্ষমতার হস্তান্তর। ইংরেজরা এখন এর জন্যে তৈরি। তারা জানে এখন যদি যায় মানে মানে যাবে। দেরি করলে মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। জট খুলতে পারবে না। শত কয়েক ইংরেজ প্রাণে মরতেও পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো শ্রীরাধা যেমন বলেছিলেন, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? ভারত হেন সাম্রাজ্য কাকে দিয়ে যাব? কংগ্রেসকে? না, কংগ্রেসকে ষোল আনা কিছুতেই নয়। মুসলিম লীগকে? না, মুসলিম লীগকে হিন্দুপ্রধান বা শিখপ্রধান অঞ্চল কখনো নয়। তা হলে কি পার্টিশন? পার্টিশন হলে কেবল ভারতের কেন? বাংলার নয় কেন? পাঞ্জাবের নয় কেন? সে রকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে দুই বা তিন পক্ষের সম্মতি নিতে হবে। উপর থেকে চাপিয়ে দিতে গেলে বিপত্তির অবধি থাকবে না। পক্ষপাতের অভিযোগ উঠবে। হিন্দু মুসলিম শিখ আলাদা আলাদা করে ইংরেজদেরই পদাঘাত করে তাড়াবে। নেগোশিয়েশন ফেল করলে ইংরেজদের সর্বনাশ, অথচ কংগ্রেস লীগের সৌখমাস নয়। এই দুই দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া দরকার। তার জন্যে যদি সালিশী করতে হয় এই অধমকে ডাকলে এই অধম দোরে দোরে গিয়ে পায়ে ধরে সাধতে রাজী। শিখদের আমি চিনিনে। কিন্তু অন্য দুই পক্ষকে চিনি। একদা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলুম। জিন্নার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির মেম্বর। সেদিনকার সেই প্রীতির সম্পর্ক আর নেই। তিনি সেই দল ভেঙে দিয়ে আইনসভায় মুসলিম লীগ দল গড়লে আমিও ছিটকে পড়ি। কেন্দ্রে নয়, বাংলায়

আইনসভায় আমার দল হয় কৃষক প্রজা দল। তবু পরিচয় দিলে জিন্না নিশ্চয়ই চিনবেন। কংগ্রেসেও এককালে ছিলুম। তার পর সি. আর. দাশের স্বরাজ পার্টিতে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমি না ঘরকা না ঘাটকা। সকলের সঙ্গে কথা বললে তবেই তো বুঝতে পারব কোন্ সমাধানটা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। একপক্ষ নিল, অপরপক্ষ নিল না, এমন যদি হয় তবে আমিও তো ব্যর্থ।"

বাসুদেব হালদার হাসেন। "সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ইংরেজরা যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে তবে আরো অর্ধ শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন অপেক্ষা করা ওদেরও মত নয়, আমাদেরও মত নয়। চেঞ্জ একটা চাইই চাই। তার জন্যে চাই একটা রাজনৈতিক সমাধান। সেটা যে আদর্শ সমাধান হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো। ষোল আনা কোনো পক্ষই পাবে না। লড়াই করলেও না। বুদ্ধিমানের কাজ গিভ অ্যাণ্ড টেক। সেটা যে ভাবেই হোক। ক্ষমতা ভাগও হতে পারে। দেশ ভাগও হতে পারে। প্রদেশ ভাগও হতে পারে।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে। "না, না, দেশভাগ নয়। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অবিভাজ্য। না, না, প্রদেশভাগ নয়। বাংলার ভাষা, বাংলার সঙ্গীত অবিভাজ্য। ক্ষমতা ভাগে আমার আপত্তি নেই। ক্ষমতা ভাগ কেন, ক্ষমতার সবটাই নিক না মুসলিম লীগ। ক্ষমতা মানেই দায়িত্ব। দায়িত্বকে ভাগ করতে পারা যায় না। মুসলিম লীগ এককভাবেই নিক বাংলাদেশে সরকার গঠনের দায়িত্ব। অবিচার, অত্যাচার দেখলে আমরা সত্যাগ্রহ করব। এমন ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করব যে মুসলমানদের একভাগও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সরকারের ভুল নীতি বানচাল করে দেবে। আমার কাছে বিরোধিতা করার অধিকারটাই গৌরবের। বিরোধিতা অবশ্য কথায় কথায় নয়। মূলনীতির প্রশ্নে। যেখানে সরকার গঠনের দায়িত্ব কংগ্রেস নিয়েছে সেখানে মূলনীতির প্রশ্নে সত্যাগ্রহ করার অধিকার মুসলিম লীগেরও রয়েছে। আমিই তখন লীগের পক্ষ নিয়ে সত্যাগ্রহে নামব। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষেরও মর্যাদা অনেক। মুসলিম লীগ সেই মর্যাদা লাভ করবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও বহুসংখ্যক প্রাদেশিক আইনসভায়। তবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়েক বছর অন্তর অন্তর পালাবদল হয়। বিরোধীপক্ষ হয় সরকারপক্ষ। সরকারপক্ষ হয় বিরোধীপক্ষ। তাই দুই পক্ষেরই স্বার্থ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে বলবৎ রাখা। আমাদের দেশে সেটা কিন্তু ব্যাহত হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা। তার বদলে যদি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি থাকত স্বতন্ত্র নির্বাচননির্ভর মুসলিম লীগ গড়ে না উঠে যৌথ নির্বাচননির্ভর ইউনিয়নিস্ট পার্টি গড়ে উঠত ও সে পার্টি একদিন কংগ্রেসের মতো হিন্দু মুসলমানের মিশ্র ভোটে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করত। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর প্রথম কাজ হবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন। তখন জিন্না সাহেব আবার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির মতো একটা মিশ্র দল গঠন করবেন ও হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টানের ভোটে জিতে সরকার গঠন করবেন। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? এর উৎপত্তি হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অপোজিশন হিসাবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মহাপ্রস্থানে গেলে কংগ্রেসও মহাপ্রস্থানে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নয়, পাঁচ দশ কি বিশ বছর বাদে। কংগ্রেস সরকারের বিরোধী পক্ষই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিয়ে সরকার গঠন করবে। এমনও হতে পারে যে কংগ্রেসও দু'ভাগ হয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী। গত কয়েক বছর হলো তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে দুর্বল, কিন্তু বৃদ্ধদের মৃত্যু বা অবসরগ্রহণের পর বামপন্থীরাই প্রবল হবে। আমার তো বিশ্বাস এই অধ্যায়ের শুরু হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে। সেই স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই ধাপে ধাপে এসেছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। তবে ইংরেজরা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি যে তাদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতির পরিণাম হবে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। তারা কুইট করতে চায় করুক, নয়তো আরো কিছুকাল থেকে আবার এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হোক। কিন্তু ডিভাইড করতে হয় তো ওদের বিদায়ের পর আমরাই ভাইয়ে ভাইয়ে করব, ওরা নিরপেক্ষ সেজে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে কেন? আমি বিশ্বাসই করিনে যে ওরা ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার

নিজেদের হাতে রাখবে না। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটা দোনোমনো ভাব আছে। গান্ধীজী কিন্তু অটল ও অনড়। পাকিস্তান দিতে হয় আমরাই দেব, ইংরেজরা নয়।"

মোহিনীবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। তা নয়। তিনি চাঙ্গা হয়ে বলেন, "জিন্না মানুষটি যে কত বড়ো ভুখোড় পলিটিসিয়ান তার ধারণাই নেই গান্ধী মহারাজের। হবে কী করে? তিনি কি সত্যাগ্রহ আর গঠনকর্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন? তিনি যেমন সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম বিশেষজ্ঞ, জিন্না তেমনি পার্লামেন্টারি ও কনস্টিটিউশনাল স্পেশিয়ালিস্ট। তিনি এই নিয়ে লেগে আছেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। গান্ধী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আজাদ, নেহরু এঁরা তাঁর তুলনায় এমেচার। ধরো, মুসলিম লীগ যদি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট করে তবে কংগ্রেস কি মেজরিটির ভোটে সেপারেট ইলেকটোরেট তুলে দিয়ে জয়েন্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তন করতে সাহস পাবে? দেশময় দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যাবে না? কে থামাবে যদি ইংরেজরা না থামায় বা থামাবার শক্তি রাখে? মুসলমানরা যেদিন একবাক্যে বলবে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন চাইনে, যৌথ নির্বাচন চাই, সেদিন এ আপদ যাবে। কিন্তু সেটা হবে পাকিস্তান অর্জনের পর তার কুফল দেখে। তার আগে নয়। আপাতত মুসলিম লীগ যদি শাসনতন্ত্র রচনায় সহযোগিতা না করে তবে শুধুমাত্র মেজরিটির ভোটে বিরাট কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। কারণ কংগ্রেসের মেজরিটি হচ্ছে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে হিন্দু মেজরিটি। একটা সম্প্রদায় কখনো আরেকটা সম্প্রদায়ের নিয়তি নির্ধারণ করতে পারে না। করতে গেলে গৃহযুদ্ধ অবধারিত। তবে একবার পাকিস্তান স্বীকার করে নিলে দুই সম্প্রদায়ে মিলে একটা আপসে পৌঁছতে পারে। জিন্না বার বার সেই কথাই বলে আসছেন। আপস মানে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। কংগ্রেসের মন মেজাজ যতদূর আমি বুঝি সে কারো সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজী হবে না, যদি না কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের পরামর্শ অনুসারে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীরা কাজ করেন। মুসলিম লীগেরও একটা হাই কমাণ্ড হয়েছে। সে তাতে নারাজ। দুই হাই কমাণ্ডের গুঁতোগুঁতি কোয়ালিশন সরকার ছত্রভঙ্গ হবে। আর কোথায় না হোক বাংলাদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠন করতে পারা যেত। কিন্তু পারা যাবে না। কারণ কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বা লীগ হাই কমাণ্ড কোনো পক্ষই তাঁদের কন্ট্রোল ছাড়বেন না। এই অধমের উপর যদি ভার দেওয়া হতো এই অধম সালিশী করতে এগিয়ে যেত। কিন্তু এই অধম এখন সর্বদল পরিত্যক্ত। তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখব কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে দাঁড়ালে কেউ আমাকে ভোট দিয়ে সেখানে পাঠায় কি না। জিন্নার সঙ্গে আমার যেমন যোগাযোগ বাংলাদেশে আর কারো তেমন নয়। আর জিন্নাই যে নাটের গুরু এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, সৌম্য। নাটের গুরু ভালোর জন্যেও বটে, মন্দের জন্যেও বটে। সেবার লখনউতে কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট হয়েছিল টিলক আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। এবারও সেইরকম একটা প্যাক্ট হতে পারে রাজাজী আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। রাজাজীর সঙ্গেও এই অধমের প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু এখন তাঁর দুর্দিন যাচ্ছে। তিনি কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে যোগ দেননি বলে মাদ্রাজের প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠন করার সময় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি। অথচ তিনিই তো সর্বপ্রথম পদত্যাগ করেছিলেন। কোথায় কৃতজ্ঞতা? রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো পদার্থই নেই। মহাত্মারও একদিন সেই দশা হবে।"

সৌম্য বৈরাগ্যের সঙ্গে বলে, "তিনি রাজক্ষমতা চাননি ও চান না।"

এতক্ষণ বাদে মৌনভঙ্গ করেন অধ্যাপক মাহমুদ শরীফ। "কায়দে আজম জিন্নাহ্ সাহেবও কি ক্ষমতা চেয়েছেন না চান? তিনি চান সমতা। হিন্দু মুসলমানের সমতা, কংগ্রেস লীগের সমতা, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের সমতা, গান্ধী জিন্নাহ্‌র সমতা। কংগ্রেস নেতাদের কাছে লিবার্টিই সবচেয়ে কাম্য। লীগ নেতাদের কাছে ইকুয়ালিটিই সবচেয়ে কাম্য। এই যে পাকিস্তানের দাবী এটা প্রকৃতপক্ষে সমতার দাবী। স্বরাজের দাবী যেমন স্বাধীনতার পাকিস্তানের দাবী তেমনি সমতার। ইংরেজরা বিদায় নিলে স্বাধীনতা

আসবে, কিন্তু সমতা আসবে না, যদি না পাকিস্তানের রূপ ধরে আসে। তার মানে এক নেশন নয় দুই নেশন। সমতার প্রয়োজন আছে এটা যদি মেনে নেন তা হলে পাকিস্তানেরও প্রয়োজন আছে এটাও মেনে নিতে হবে। সমতার খাতিরেই বাংলাদেশকেও পাকিস্তানের সামিল করা হচ্ছে, বাংলাদেশ হবে পূর্ব পাকিস্তান, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাঙ্গালীস্থান নয়। সমতার প্রয়োগ না থাকলে এর মতো ধোঁকাবাজি আমরা সহ্য করতুম না। এখনো সময় আছে, এখনো দেশভাগ নিবারণ করা যায়, কিন্তু কংগ্রেসের নাছোড়বান্দা মনোভাব ও মুসলিম লীগের যুদ্ধং দেহি মনোবৃত্তির ফলে দেশ যদি সত্যি সত্যি ভাগ হয়ে যায় তবে স্বাধীনতাও আসবে, সমতাও আসবে, কিন্তু আসবে না মৈত্রী। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার একটি বাদ পড়বে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বৈরী হয়েই কে জানে কতকাল কাটাবে। দেশ একবার ভাগ হয়ে গেলে আবার একদিন জোড়া লাগবে এটা একটা দিবাস্বপ্ন। একাকার করার জন্যে একটা রাষ্ট্র হাতিয়ার শানালে অপরটাও হাতিয়ার শানাবে। বলপরীক্ষায় হিন্দুস্থান জিতবে, পাকিস্তান হারবে, এমন সম্ভাবনা দেখলে ব্রিটেন ছুটে আসবে হস্তক্ষেপ করতে। পাকিস্তান একবার হলে বরাবরের জন্যেই হলো মনে রাখবেন। তৃতীয় পক্ষ যতদিন থাকবে দেশভাগও ততদিন থাকবে। ভারত ছেড়ে যাওয়া মানে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া নয়। ইংরেজকে দুনিয়া ছাড়াতে পারে এত শক্তি কংগ্রেসের বা হিন্দুর বা হিন্দুস্থানের নেই। গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, কিন্তু একাকার করতে পারে না। অন্তত এখনো তা পারেনি। একাকার যে এখনো রয়েছে এটা তৃতীয় পক্ষের কল্যাণে। তবে একাকার করাই যদি শ্রেয় হয় তবে কায়দে আজমের সঙ্গে সমানে সমানে এগ্রিমেন্ট করতে হবে। একপক্ষ মেজরিটি অপরপক্ষ মাইনরিটি এটা এগ্রিমেন্টের মূলসূত্র নয়। আমরা আজকাল নিজেদের আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে ভাবিনে। আমরা পাকিস্তানী ন্যাশনাল মেজরিটি। এটা একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন। আপনারা এখনো ভাবছেন যে আপনারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মেজরিটি। আপনাদের চিন্তার বিবর্তন হয়নি। প্যারিটিই হচ্ছে পাকিস্তানের বিকল্প। আমরা যদি সারা ভারতে প্যারিটি পাই তা হলে পাকিস্তানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হব না। পাকিস্তানে সারা ভারতের সব মুসলমানের লাভ হবে না। যারা হিন্দুস্থানে থাকতে চাইবে বা থাকতে বাধ্য হবে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আর আমরা বাঙালী মুসলমানরাও যে অবাঙালী মুসলমানদের সর্বঘটে দেখে সুখী হব তা নয়। আপিস আদালত, দোকান বাজার, কল কারখানা, চাষের জমি ভরে যাবে তাদের মাইগ্রেশনে। পাকিস্তানের পক্ষে তারা ভোট দিয়েছে, তাদের মাইগ্রেশনের অধিকার আছে। সব চেয়ে বড়ো বৈষম্য হবে যদি পূর্ব পাকিস্তান বলতে বোঝায় কেবল পূর্ব বঙ্গ ও সীলেট। দেশভাগ চাইলেও প্রদেশ ভাগ আমরা চাইনে। আশাকরি কংগ্রেসও চাইবে না। চাইলে কিন্তু বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়েরই ঘর ভেঙে যাবে। বাঙালী জাতীয়তার বনিয়াদ ধসে যাবে।"

সিভিল সার্জন বীরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী উত্তেজিত হয়ে বলেন, "আপনারা দেখছি গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়োবেন। মুসলমান হিসাবে পাকিস্তান আর বাঙালী হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশ। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে কত লোক ফাঁসী গেল, আন্দামানে গেল, জেলে গেল, বেত খেল, জরিমানা দিল। তার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। এখন সারা বাংলার তখ্‌তে আপনারাই রাজা হয়ে বসেছেন, তাতেও সন্তুষ্ট নন, গোটা বাংলাদেশকে স্টেপিং স্টোন করে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করতে চান। বঙ্গভঙ্গ রদ করে আমরা বিহারে ঠকে গেছি, ওড়িশায় ঠকে গেছি, আসামে ঠকে গেছি, বাংলাদেশেও ঠকে গেছি। কোনোখানেই একজন বাঙালী হিন্দু প্রধানমন্ত্রী নেই। বাঙালী হিন্দু অফিসার ক্লাস এখন অনাথ।"

মুস্তাফী তাঁকে শান্ত করে বলেন, "দেখুন, ডাক্তার সাহেব, বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে বাঙালী হিন্দু অন্য দিক দিয়ে ঠকে যেত। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলে একটা মতবাদ গড়ে উঠত না। সাহিত্য, চিত্রকলা,

কারুশিল্প, ইণ্ডাস্ট্রি, শিক্ষাদীক্ষা— কত দিক দিয়ে কত প্রগতি হয়েছে ভেবে দেখবেন। এই যে আজ বাঙালী মুসলমানের মুখে বাঙালী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব শুনছেন এটাও সেই আন্দোলনের সুফল। তবে এঁদের দোটানা এখনো যায়নি, এঁরা ইসলামের প্রতি আনুগত্য আর মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য দুই আনুগত্যের মধ্যে দোল খাচ্ছেন। এটা একটা সাইকোলজিকাল কেস। এটাকে সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতা দিয়ে বোঝানো যায় না। কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করলে পরে এঁদের দোটানা কেটে যাবে। তখন দেখবে এঁরাও সমান বাঙালী জাতীয়তাবাদী। দুঃখের বিষয় তার জন্যে হয়তো আবার বঙ্গভঙ্গের দরকার হবে। আমার মেয়ে মিলি এখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।"

"মধুমালতীর পক্ষে ওটা একটা ভিক্টি।" মোহিনীবাবু বলেন। "বাঙালী হিন্দুদের পক্ষেও, ওদের দাবী যদি হয় কার্জনের প্রেতকে জীয়ানো। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক একটা পুরনো বোতল। এর মধ্যে একটা নতুন মদ এসে ঢুকেছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টরা যখন আট আটটা প্রদেশ সাধারণ নির্বাচনে জিতে মন্ত্রিত্ব নেয় তখনি আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যেখানে নবাব বাদশারা রাজত্ব করেছেন সেখানে গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম জনমত সহ্য করবে? এর পরের ধাপ তো দিল্লীর লাল কেল্লায় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। মুসলিম জনমত ফেটে পড়বে না? সেটা বন্ধ না করতে পেরে তারা করবে স্বাধীনভাবে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ নিশান উত্তোলন। তার জন্যে করতে হবে পাকিস্তান হাসিল। হয় কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে, নয় ইংরেজের সঙ্গে যুক্তি করে, নয় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করে। ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড টমসনকে জিন্না সাহেব একথা বলেছেন। কথাটাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। জিন্না একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান।"

মুস্তাফী হাত জোড় করে বলেন, "আপনারা কেউ না খেয়ে যাবেন না। মিলির বন্ধু জুলির আজ রান্নার পরীক্ষা। ওর মাসিমা ওকে শেখান।"

।। ষোল ।।

যাঁরা যাবার কথা ভাবছিলেন তাঁরা খাবার কথা ভেবে জাঁকিয়ে বসেন।

ডাক্তার নিয়োগী অধ্যাপক শরীফের দিকে চেয়ে বলেন, "হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব কে না চায়? কিন্তু তার জন্যে হিন্দুকেই দাম দিতে হবে, মুসলিমকে নয়, এ কেমন কথা? প্যারিটি চ্যারিটি নয়। দরাদরির ব্যাপার। দরাদরির জন্যে সরাসরি কথাবার্তা চালাতে হয়। তৃতীয় পক্ষকে মাঝখানে রেখে সরাসরি কথাবার্তা হয় না। আর প্যারিটি বা চ্যারিটি সেই তৃতীয় পক্ষ অনিচ্ছুকের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। হিন্দুদের উপর জোর জুলুম করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আজ ইংরেজদের নেই। তারা এখন চাচার মতো আপনা বাঁচাতেই ব্যস্ত। আর গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করার হুমকি যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা যদি তুখোড় পলিটিসিয়ান হয়ে থাকেন তবে তাঁদের জানা উচিত যে শ্মশান ও গোরস্থানের মধ্যে প্যারিটি হলে ন'কোটি হিন্দু ও ন'কোটি মুসলমান যৌত হবে। তার পরেও বাইশ কোটি হিন্দু বেঁচে থাকবে, কিন্তু একটিও মুসলমান বেঁচে থাকবে না। যদি না ইংরেজ তাদের পক্ষ নেয়। কিন্তু পক্ষ নিলে ইংরেজও তো কয়েক হাজার মরবে। সে স্পৃহা কি তাদের কারো আছে? হিন্দুরা ও শিখেরা তাদের জন্যে জার্মানদের সঙ্গে, ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে। জাপানীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বন্দী হয়েছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে আবার হয়তো ইংরেজদের পক্ষে লড়বে। তাদের শত্রু করে ইংরেজদের কী লাভ? জিন্না সাহেব যদি হুমকি দেবার সময় মনে মনে ধরে নিয়ে থাকেন যে ইংরেজরা তাঁর হয়ে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে লড়বে তা হলে তিনি তাঁর ব্রিজ খেলার পার্টনারের হাতে কী কী তাস

আছে তা না জেনে নিজের হাত দেখেই ওভারকল করছেন। যারা তুখোড় খেলোয়াড় তারা ওভারকল করে না। তিনি হয়তো এটাও ধরে নিয়েছেন যে অহিংসাবাদী গান্ধী অনশন টনশন করে হিংসাবাদী হিন্দুদের নিবৃত্ত করবেন। অমনি করে মুখরক্ষা ও শেষরক্ষা হবে। কিন্তু জেহাদ যারা শুরু করবে তারা অত সহজে সেটা থামাতে পারবে না। হিটলার পারেনি, তোজো পারেনি। থামবে যখন তখন দেখা যাবে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান শিখ নিহত হয়েছে। আরো বেশী প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে একটা সীজ-ফায়ার হয়েছে। সীজ-ফায়ারের সময় যা হয়, এ পক্ষও কিছু রেখেছে, ও পক্ষও কিছু রেখেছে। সেই পর্যন্ত পাকিস্তানের সীমানা, হিন্দুস্থানের সীমানা। কোনো পক্ষই তাতে বিশেষ লাভবান হবে না। পরে আবার একহাত লড়বার জন্যে মনে মনে তৈরি হবে। সেটা আর যাই হোক অহিংস নয়। গান্ধীর দিন গেছে। জিন্নাকে মোকাবিলা করতে হবে জবাহরলালের সঙ্গে।"

অধ্যাপক শরীফের মুখ শুকিয়ে যায়। মুস্তাফী বলেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ক্যাবিনেট মিশন এসেছেন তিন পক্ষের গ্রহণযোগ্য সমাধান বার করতে। সকলের সঙ্গেই তাঁরা কথা বলছেন। সকলেই চায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইংরেজদের দিক থেকে আমি তো ইচ্ছার কোনো অভাব দেখছিনে। কংগ্রেস নেতারাও ইচ্ছুক। লীগ নেতারাও তাই। দেশের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আরো কিছুদিন পরে আরো ঠাণ্ডা হবে। তবে পুরোপুরি নর্মাল হবে বলে মনে হয় না। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ আজ উদ্‌ভ্রান্ত। কী হিন্দু, কী মুসলমান।"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে কী ভাবছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাঁকে আমি ভালো করেই চিনি। পাকিস্তানের উদ্‌ভাবক চৌধুরী রহমৎ আলী লণ্ডনের এক রেস্টোরান্টে এক ভোজ দেন, তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন হলেন ইকবাল, আরেকজন জিন্না। পাকিস্তানের প্রস্তাব জিন্না সরাসরি খারিজ করে দেন। ওটা অবাস্তব। তা হলে এমন কী ঘটল যে সেই জিন্নাই বছর পাঁচেক বাদে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন? এর উত্তর নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে গিয়ে দেখা গেল কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে একক মেজরিটি পেয়েছে, আরো দুটি প্রদেশেও সে লীগকে সঙ্গে না নিয়েও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করতে পারে। কোন্ দুঃখে সে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে চাইবে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হলে সে বরং পদত্যাগ করে বনবাসে যাবে তবু মুসলিম লীগের শর্তে রাজী হবে না। শাসনতন্ত্রের অনুশাসন অনুসারে প্রতি ক্ষেত্রে মাইনরিটিদের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। জিন্না আশা করেছিলেন যে মাইনরিটির প্রতিনিধি একমাত্র মুসলিম লীগ থেকেই নেওয়া হবে আর গভর্নররাও সেই নির্দেশ দেবেন। দেখা গেল কংগ্রেস তার নিজের দল থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়েছে। আর গভর্নররাও কংগ্রেসকে চটাতে সাহস পাননি, পাছে সে মন্ত্রিত্বই গ্রহণ না করে। মাস ছয়েক ধরে গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের যে পত্রব্যবহার চলে তার নীট ফল হয় কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বলবৃদ্ধি ও লাটসাহেবদের বলক্ষয়। এসব দেখে শুনে জিন্না সাহেব ফেডারেশনের উপরে বিশ্বাস হারান। রাজন্যরা যদি প্রতিনিধি মনোনয়ন না করেন, যদি তার পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠান তা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলও কংগ্রেস একক ভাবে গঠন করতে সমর্থ হবে, লীগের মুখাপেক্ষী হবে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সে নিজের দল থেকেই আহরণ করবে, লীগ যদি মুসলমানদের একমাত্র দল বলে স্বীকৃত না হয়। যেমন করে হোক কংগ্রেস একাধিপত্য বানচাল করতেই হবে। জিন্না সাহেব তাই ফেডারেশন অগ্রাহ্য করে তার বদলে দাবী করেন দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। একটা হিন্দুদের, অন্যটা মুসলমানদের। এরাও মেজরিটি, ওরাও মেজরিটি। এরাও নেশন, ওরাও নেশন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তাধারা সহসা খাত বদলায়। তার মধ্যে একটা বুজরুং দেখি ভাবও আসে। টমসনের

সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেই ভাবটাই ব্যক্ত হয়। ইংরেজ চলে গেলে কংগ্রেস তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে অসহ্য, অসহ্য এই নিয়তি। অপর উত্তরাধিকারী হবে মুসলিম লীগ, প্রয়োজন হলে ওয়ার অভ্ সাকসেসন লড়বে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগেছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস বা গান্ধী তাঁর দিকে মিটমাটের হাত বাড়িয়ে দেননি। যুদ্ধের ইস্যুতে বনবাসে গিয়ে তাঁকে উপবাসী রাখেন। ভেবেছিলেন তাতে তাঁর বল কমে যাবে। বল কমে যাওয়া দূরে থাক, সব ক'টা প্রদেশেই বেড়েছে। কংগ্রেস-মুসলিমরা এখন মুষ্টিমেয়। তাঁর বল এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে তিনি ইংরেজদের ডিকটেট করতে পারেন। কংগ্রেসকে তো গ্রাহ্যই করেন না। প্রয়োজন থাকলেও কোয়ালিশনের জন্যে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না। পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হবে।"

সৌম্যদা আর স্থির থাকতে পারে না। বলে, "কংগ্রেস-মুসলিমরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ধর্মে মুসলমান আর জন্মসূত্রে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদেরও ভূমিকা আছে, সে ভূমিকা এখনো শেষ হয়নি, যে কোনো দিন আবার তাঁদের ডাক পড়তে পারে। আমরা কি তাঁদের প্রতি বেইমানী করতে পারি? লীগ বললেও না। বড়লাট বললেও না। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে এঁদের একজন না থাকলে কংগ্রেসও থাকবে না। মুসলিম লীগই গভর্নমেন্ট চালাক। কংগ্রেস আপস করবে না, লড়াই করা তো দূরের কথা। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় যদি হাতাহাতি মারামারি খুনোখুনি বাধে কংগ্রেস তার মধ্যে থাকবে না, সেটা থামাবার দায় দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, তবে মানবতার খাতিরে গান্ধীপন্থীরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত হতে বলতে পারেন। শুধু গান্ধীপন্থীদের কেন, মানুষমাত্রের কর্তব্য মানুষকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করা। পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে উদ্ধার করা। এ ক্ষেত্রে কে হিন্দু কে মুসলমান বাছবিচার করা অনুচিত। এমন মুসলমান নিশ্চয়ই আছেন যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে হিন্দুর প্রাণ বাঁচাবেন। জিন্না সাহেবের থীসিসটা তো এই যে ইংরেজ রাজ চলে গেলে কংগ্রেস রাজ কায়েম হবে, সুতরাং মারো শত্রু পারো যে প্রকারে। থীসিসটাই ভুল। দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না। কংগ্রেস যদি থাকে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করেই থাকবে। মিটমাটের জন্যে কংগ্রেসের দুয়ার সব সময়ই খোলা। তা না হলে গান্ধীজী জিন্না সাহেবের দুয়ারে সতেরো দিন ধরে ধরনা দিতেন কেন? কায়দে আজম যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করে ইংরেজের সঙ্গেই মিটমাট চান তাতেও কংগ্রেস রাজী হবে, যদি তার মূলনীতিতে ঘা না পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিজেকে সরিয়ে জেলখানায় ফিরে যাবে। কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে কংগ্রেসের মূলনীতির সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে হবে। কংগ্রেসের মেজরিটি হিন্দু মেজরিটি নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টানের মিলিত মেজরিটি। সাম্প্রদায়িক মেজরিটি নয়, রাজনৈতিক মেজরিটি। তেমন মেজরিটি জাতীয়তাবিরুদ্ধ তো নয়ই, গণতন্ত্র বিরুদ্ধও নয়। আর কংগ্রেসের সংগ্রামকেও মাইনরিটিবিরুদ্ধ বলা যায় না। কংগ্রেসপন্থীরা কখনো মুসলমানের গায়ে হাত দেয়নি, কখনো দেবেও না। কংগ্রেস মন্ত্রীদের গদীচ্যুত করার জন্যে লীগপন্থীরা অনেক কিছু বানিয়েছেন। ভবিষ্যতেও বানাতে পারেন। উদ্দেশ্যটা কী? কংগ্রেস মন্ত্রীদের আবার গদীচ্যুত করা? তার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত। তা না হয়ে উদ্দেশ্য যদি হয় ভদ্রভাবে মিটমাট তা হলে কোয়ালিশনের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, পার্টিশনের জন্যে ঝগড়াঝাটি নয়।"

শরীফ সাহেব তারিফ করেন। "কোয়ালিশন লীগপন্থীরাও চায়। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে, লীগবহির্ভূত মুসলমানের সঙ্গে নয়। ওরা স্টুজ, ওরা কুইসলিং। মওলানা আজাদই বলুন, খান আবদুল গফ্ফার খানই বলুন, এঁরা কেউ সাচ্চা মুসলমান নন। হিন্দুর সঙ্গে মিটমাট একদিন না একদিন হবে, পাকিস্তানেও হিন্দু থাকবে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে কোনোদিন নয়। যদি না এঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে লীগে যোগ দেন। মুসলিম ইউনিটির খাতিরে সব মুসলমানকেই লীগের নিশানতলে সমবেত হতে হবে। তার পরে

হবে কোয়ালিশন অথবা পার্টিশন।"

সৌম্য আর কথা বাড়াতে চায় না। এই ফ্যানাটিকদের সঙ্গে তর্ক বৃথা। তখন রায় বাহাদুর খেই হাতে নেন। "শরীফ সাহেব, এটা কি আপনারা ভেবে দেখেননি যে ভারত ভেঙে দু'খানা হলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ও ভেঙে দু'খানা হবে? তা যদি হয় তবে মুসলিম ইউনিটি যাকে বলছেন তাই হবে মুসলিম ডিস্ইউনিটির নিদান। ভারতের সর্বনাশ তো হবেই। আপনাদের তাতে কী এসে যাবে? আপনারা তো ভারতীয় নন, আপনারা মুসলমান। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরও সর্বনাশ হবে। সেটা নজরে পড়ছে না, হিন্দু আধিপত্যকে খর্ব করাই একমাত্র লক্ষ্য। জিন্না যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাকিস্তান তিনি আদায় করবেনই। তার জন্যে নিজের এজমালী ঘরে আগুন দিতেও তাঁর হাত কাঁপবে না। কিন্তু সারা ভারতের সব মুসলমান যদি পাকিস্তানে জড়ো না হয় তো যারা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে তাদের দশা কী হবে? পাকিস্তানে তারা হবে বিদেশী। হিন্দুস্থানে তারা হবে বিধর্মী। সর্বত্র কৃপার পাত্র। জিন্না সাহেব পাকিস্তানে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাই কি সেখানে গিয়ে এখানকার ক্ষতিপূরণ পাবে? ব্যবসায়ীরা পাবে ব্যবসায়, ব্যারিস্টারেরা পাবেন প্র্যাকটিস, শ্রমিকরা পাবে কলকারখানার কাজ, কৃষকরা পাবে কর্ষণের জমি? বিশ্বাস হয় না, অধ্যাপক সাহেব। তার পর ভেবে দেখুন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনো কারণে যুদ্ধ বেধে যায় মুসলমানের বোমা পড়বে মুসলমানের মাথায়। ধর্মভাই বলে সে রেহাই পাবে না। বোমা যে ফেলবে সে হিন্দু মুসলমানে বাছবিচার করবে না। হিন্দু মুসলমান একই মহল্লায় না হোক একই শহরে বাস করে। বোমা এত উপর থেকে ফেলা হয় যে তার লক্ষ্য শুধুমাত্র হিন্দু হতে পারে না। এমন একটিও শহর নেই যেটি মুসলিমবিহীন। আজকের মুসলিম ইউনিটি কালকের মুসলিম নিধনের পথ করে দেবে, যদি সেটা পার্টিশনের জন্যে আকাশ পৃথিবী তোলপাড় করে। আজাদ ও আবদুল গফ্ফার খান মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু। কায়দে আজম জিন্না মুসলমানের নন, মুসলিম লীগ নামক দলের শ্রেষ্ঠ নেতা।"

"মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু কে সে বিচার মুসলমানের উপরেই ছেড়ে দিলে ভালো হয়, রায় বাহাদুর।" শরীফ উত্তপ্ত হয়ে বলেন। "আজাদ যা পেয়েছেন তা হিন্দুর কাছ থেকে পেয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি পদ. জিন্নাহ্ যা পেয়েছেন তা মুসলমানের কাছ থেকে পেয়েছেন। লীগসভাপতি পদ। বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফরের পতন ও কায়দে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহ্র উত্থান এর মধ্যবর্তী যুগটা আমাদের গৌরবের যুগ নয়, আপনাদেরই গৌরবের যুগ। এখন আমরা যে মওকা পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করলে ভারতের অর্ধেক অথবা পাকিস্তানের গোটা সিংহাসন আমাদের হবে। মুসলমানের হাতে মুসলমান হয়তো একদিন মরবে, কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে গেলে চলবে না। লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম রাজত্বের রেস্টোরেশন। আমাদের নিন্দাবাদ না করে বরং এই বলে ধন্যবাদ দিন যে আমরা নিখিল ভারত দাবী করছিনে। রেস্টোরেশন চাইলেও পুরো মোগল সাম্রাজ্যের নয়। আপনাদের সঙ্গে সদ্ভাবের খাতিরেই দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, আলীগড় ত্যাগ স্বীকার করছি। কায়দে আজমের এই ত্যাগস্বীকার মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগস্বীকারের চেয়ে কম নয়। জেলে যাওয়াটাই কি ত্যাগস্বীকারের একমাত্র নিরিখ?"

"এতই যখন ত্যাগ করছেন", ডাক্তার নিয়োগী রাগ চেপে বলেন, "তখন কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গও ত্যাগ করুন।"

শরীফ সাহেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, মোহিনীবাবু কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "এটা একটা আত্মঘাতী প্রস্তাব। বাংলাদেশ দু'ভাগ হলে পশ্চিম ভাগটা হবে হিন্দুস্থানের ল্যাজ আর পূর্ব ভাগটা পাকিস্তানের ল্যাজ। যে প্রদেশ সারা দেশের মাথা ছিল সে কোনো অংশেরই মাথা হবে না। বাঙালী জাতির গোড়া কেটে আগায় জল দিলে সে কি দিন দিন শুকিয়ে যাবে না? একেই বলে, রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। কার্জনের আমলেও এ দাওয়াই এত খারাপ ছিল না, কারণ কেন্দ্র ছিল একটাই, তার কাছে গিয়ে

নালিশ করতে পারা যেত। এবার দেশ দু'ভাগ হয়ে দুই কেন্দ্র হবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে অত্যাচার হলে সে হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারবে না, কারণ সে সেখানে এলিয়েন। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেটাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করবেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে না। ছুটবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর কাছে সাহায্যের জন্যে। তখন আমরা কবির ভাষায় গাইব, এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে। না, ডাক্তার সাহেব, এ দাওয়াই আপনার উপযুক্ত হয়নি, এটা একটা হাতুড়ে দাওয়াই। এর থেকে মালুম হচ্ছে বাঙালীর মস্তিষ্ক এখন দেউলে। বাঙালী বলতে আমি বাঙালী মুসলমানকেও বোঝাতে চাই। পাকিস্তানের জন্যে অবাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে, গাঁটছড়া বেঁধে তাঁরাও দেউলেপনার পরিচয় দিচ্ছেন। শরীফ সাহেব, আপনারা ভাবছেন আপনারা ওঁদের ব্যবহার করছেন। তা নয়। ওঁরাই আপনাদের ব্যবহার করছেন। আমি আবার বলি, জিন্না সাহেব একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান। তিনি আপনাদের এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন। এর মধ্যেই তিনি বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন ও ভুলিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রস্তাবটার উপর কলম চালিয়ে দেশকে প্রদেশে পরিণত করেছেন। পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশে। পাকিস্তান হলে সেখানকার কেন্দ্র থেকে শাসক নিয়োগ হবে। সে শাসক বাঙালী না হতেও পারেন। হিন্দুস্থানের মুসলিম অফিসারগণ দলে দলে চলে আসবেন পাকিস্তানে চাকরি করতে। আপনাদের সন্তানরা তো হিন্দুস্থানে চাকরি করতে যেতে পারবেন না। একেই বলে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচা।"

"আপনি তা হলে আমাদের কী চাইতে পরামর্শ দেন? দুই প্রান্তে দুই স্বতন্ত্র পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান? হিন্দুস্থান কি দুই পাকিস্তানকে দুই বগলে পুরবে না? দুই পাকিস্তানের তো এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" শরীফ সাহেব বলেন।

"সেলফ ডিটারমিনেশনের অধিকার আপনাদের আছে। আপনারা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু আমাদেরও কি সে অধিকার নেই? আমরাও কি সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারব না? আপনারা ভারতে মাইনরিটি হতে রাজী না হলে আমরাও পাকিস্তানে মাইনরিটি হতে নারাজ হব, প্রোফেসর শরীফ। আমরা চাইব কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ।" ডাক্তার সাহেব বলেন।

"তা হলে 'বন্দে মাতরম্' মিথ্যা? 'বঙ্গ আমার জননী আমার' মিথ্যা? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' মিথ্যা? বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা লিখেছেন? তা নয়। আপনারাই ভুল করছেন। পাকিস্তানকে আপনারা অকারণে ভয় করছেন। পাকিস্তান হিন্দুর শত্রু নয়। আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন ছিল সিরাজউদ্দৌলার আমলে।"

তাপের মাত্রা বাড়ছে দেখে মৃত্যুঞ্জয়ী তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। সৌম্যের দিকে ফিরে জানতে চান গান্ধীজী আজকাল নীরব কেন।

"তিনি আজকাল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এমন নিঃসঙ্গতা জীবনে অনুভব করেননি। এমন এক দিন ছিল যেদিন সমগ্র দেশে কংগ্রেসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সেদিন তিনি ভারতীয় প্রাণশক্তির একমাত্র প্রতিভূ হিসাবে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি আরউইনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। তেমন দিন আর ফিরল না। কংগ্রেসের ভিতরেই দেখা গেল তাঁর কথার দাম কমে গেছে। ভোট নিলে হয়তো তিনিই জিততেন। কিন্তু তেমন জয় তিনি চাননি। তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও থাকেন না। প্রতিনিধিত্বের দাবী সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসকে তিনি ছাড়লেও কংগ্রেস কিন্তু তাঁকে ছাড়ে না। কমলি নেহি ছোড়তি। কংগ্রেস নেতারা যখনি তাঁর পরামর্শ নিতে যান তখনি তিনি তাঁর পরামর্শ দেন। কিন্তু নিতে বাধ্য করেন না। লোকে ভাবে তিনি একজন ডিকটেটর। কিন্তু ডিকটেটর যদি তিনি হয়ে থাকেন তবে সেটা নৈতিক বলে বলীয়ান মহাপুরুষের ডিকটেটরশিপ। সেটার পরিচয় মেলে সংগ্রামের সময়। তখন

কংগ্রেস তাঁকে দেয় সেনাপতির ভূমিকা। শান্তির সময় কিন্তু তিনি আর সেনাপতি নন। তিনি পরামর্শদাতা। কংগ্রেসের হয়ে কথা বলার দায় তাঁর নয়, কংগ্রেস সভাপতির। গত ছ'বছর ধরে মওলানা আজাদের। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চান তবে আজাদকেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এখন দেশে কংগ্রেসের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরেও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী। সবচেয়ে বড়ো কথা গান্ধীজীর সঙ্গেও কংগ্রেস নেতাদের পায়ে পা মিলছে না। ভারতের শাসনব্যবস্থায় কংগ্রেস নেতারা চান কেন্দ্রীকরণ। মুসলিম লীগ নেতারা চান বিকেন্দ্রীকরণ। আর গান্ধীজী চান বিকেন্দ্রীকরণ। যেখানে এতখানি মতভেদ আর সব ক'টা মতই নীতিগত সেখানে অন্যান্য নেতাদেরকে কথা বলতে দিয়ে নিজের সরে থাকাই শ্রেয়। সকলেই জানে তিনি কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় রেখে দিয়ে আর সব বিষয় প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। ফলে প্রদেশের বল বাড়বে, কেন্দ্রের বল কমবে। কংগ্রেস নেতাদের কিন্তু উল্টো মত। তাঁরা প্রদেশকে দুর্বল না করে কেন্দ্রকে বলবান করতে চান। যেমন ব্রিটিশ আমলে। যেমন মোগল আমলে। শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে ভারতের বলকানীকরণ হতে পারে। অথচ জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবী তুলে ভারতকে বলকানের অভিমুখে রওনা করে দিতে উদ্যত। ভারত যদি ধর্মের নিরিখে দু'ভাগ হয় ভাষার নিরিখে বহু ভাগ হবে না কেন? একবার যদি ভাঙন শুরু হয় সেটা কি সেখানেই থামবে? শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে? মুসলমানদের নিশ্চয়ই একটা বখরা দিতে হবে। কিন্তু দাবীদার তো একমাত্র মুসলমানরাই নন। এ এক জটিল সমস্যা। এর একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হলে ঘোর অশান্তি। যে আগুন জ্বলবে তাতে সবাই দগ্ধ হবেন— গান্ধী, জিন্না, আজাদ, তারা সিং, আম্বেদকর, সাভারকর, লর্ড ওয়েভেল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সময় থাকতে তার প্রতিবিধান করতে চান বলেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্রয়কে ভারতে পাঠিয়েছেন। পেথিক-লরেন্স দীর্ঘকালের ভারতবন্ধু। ক্রিপ্‌সও তাই। শুনছি তৃতীয়জনের নাম আলেকজাণ্ডার।"

"শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আমরাও চাই, চৌধুরীজী। ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ না হলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই হবে। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে নেতারা সবাই থাকবেন, আজাদ সাহেব বাদে। দরাদরি সেখানে বসেই চালাবেন। তার পর কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে তাঁদের মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করবেন। সেখানে তা পাশ হয়েও যাবে। কেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ যেটাই হোক না কেন সর্বসম্মতিক্রমেই হবে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যেমন অধিকাংশের ভোটে বিল পাশ হয়, কখনো কখনো একটামাত্র ভোটের ব্যবধানে, ভারতের মতো বহুধর্মী, বহুভাষী দেশে সেটা অনুসরণ করা চলবে না। এই কথাটাই কায়দে আজম বলে আসছেন পঁচিশ বছর ধরে। মেজরিটি ভোট মামুলি বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু যেসব প্রশ্নে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থাকে সেসব প্রশ্নে একজনের মেজরিটি ভোটই যথেষ্ট নয়। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ করতে হয়। এমন প্রশ্ন থাকতে পারে যার নিষ্পত্তির জন্যে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ভোটের আবশ্যক হয়। ভারতে হিন্দুর সংখ্যানুপাত শতকরা সত্তরের মতো। এখানে দুই-তৃতীয়াংশ না হয়ে তিন-চতুর্থাংশ ভোটই মাইনরিটিদের পক্ষে নিরাপদ। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কংগ্রেস যদি বলে, ভারতের সরকারী ভাষা হবে হিন্দী আর মুসলিম লীগ যদি বলে, উর্দু, তা হলে সেটা শতকরা একান্নটা ভোটে পাশ হলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। শতকরা সাতষট্টি হলেও মুসলিম লীগের বিষম আপত্তি থাকবে। লীগ পক্ষে বহু হিন্দু শিখও ভোট দেবেন। তবু নিরাপত্তার খাতিরে শতকরা পঁচাত্তরই বিধেয়। নয়তো হিন্দী উর্দু উভয়কেই সরকারী ভাষা করতে হয়। ব্রিটেনের মতো একমাত্র ইংরেজীকেই সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। হিন্দু মুসলিম বিরোধের তলে তলে কাজ করছে হিন্দী উর্দু বিরোধ। এটা যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে সক্রিয়। উর্দুকে আদালত থেকে হটানো মানে মুসলিম রাজকর্মচারীদের হটানো। হিন্দীকে তার জায়গায় বসানো মানে হিন্দু রাজকর্মচারীদের

বৈঠানো। সার সৈয়দ আহমদ আতঙ্কিত হন হিন্দীভক্তদের উৎসাহ দেখে। তাঁর কংগ্রেসবিরাগের মূলে হিন্দুবিরাগ নয় হিন্দীবিরাগ।" অধ্যাপক শরীফ বিশ্লেষণ করেন।

রায় বাহাদুর কটাক্ষ করেন, "সেই সঙ্গে বাঙালী উকীল ব্যারিস্টার শ্রেণীর প্রতি বিরাগ। এই শ্রেণীটাই নাকি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টের অপোজিশন হিসাবে কংগ্রেস পরিচালনা করতে করতে একদিন সেই গভর্নমেন্টের উত্তরাধিকারী হবে। যে পদ্ধতিতে হবে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। সার সৈয়দের মতে সেটা ভারতের মতো দেশের অনুপযুক্ত। একই কথা শোনা যায়, শাসক শ্রেণীর মুখেও। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে। পদ্ধতিটা ভারতের অনুপযুক্ত তো বটেই, ভারতও পদ্ধতিটার অনুপযুক্ত। কিপলিং তো একটা কবিতাই লিখে ফেলেন, 'হারি চাণ্ডার মুকার্জি ব্যারিস্টার অ্যাট লা'। হা হা হা। পড়েছেন?"

কেউ পড়েননি শুনে রায় বাহাদুর বলেন, "বাঙালী বাবুদের উপর সে কী গায়ের ঝাল ঝাড়া! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ ট্রাইবাল আক্রমণকারীরা এসে বাঙালী বাবুদের পার্লামেন্টারি লীলাখেলা সাঙ্গ করে দেবে। তাঁদের প্রাণে বাঁচাই দায় হবে। জীবিত থাকলে কিপলিং সাহেবের চোখ কপালে উঠত যখন শুনতেন যে বাঙালী বাবু সুভায চাণ্ডার বোস সেই সব ট্রাইবালদের এলাকা দিয়ে কাবুলে গিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের তোড়জোড় করছেন। পার্লামেন্টারি লীলাখেলায় তাঁরও অনীহা।"

"পার্লামেন্টারি লীলাখেলায় আমাদেরও অনীহা।" সৌম্য গান্ধীপন্থীদের দিক থেকে জানায়। "সাধারণ নির্বাচনের পরে জনগণের সঙ্গে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর সংশ্রব থাকে না। তবু পরের বারের নির্বাচনে একটা জবাবদিহির দায় থাকে। যে দায় চার্চিলের মতো মহা প্রতাপশালী জননায়কেরও ছিল। সাধারণ নির্বাচকরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। গান্ধীজীর মতো পার্লামেন্টারি লীলাখেলার উপর আস্থাহীন সংগ্রামীর উপরেও এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে। পার্লামেন্টারি পন্থাকে তিনি এখন সত্যাগ্রহের মতোই গুরুত্ব দেন। ইংরেজরা যদি এখন হারি চাণ্ডার মুকার্জির সঙ্গে পার্লামেন্টারি হারজিতের খেলায় যোগ দিতে সম্মত থাকেন তবে কেবল আটটি প্রদেশে কেন, কেন্দ্রীয় আইনসভাতেও কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। হারি চাণ্ডারের দল একদিন মেজরিটি পাবেন সেই আশঙ্কায় তাঁরা মুসলিম লীগের উৎপত্তি ঘটিয়েছেন, তাকে সেপারেট ইলেকটোরেটের মই ধরিয়ে দিয়েছেন, সে মই বেয়ে উপরে উঠেছে কংগ্রেসের মেজরিটিকে ভীটো দিয়ে চালমাৎ করতে। যেটা করতে বড়লাটেরও বাধে। আর কোনো উপায় পাওয়া যাচ্ছে না বলে কেন্দ্রটাকেই দু'ভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে। সেটা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে, ইংরেজদের স্বার্থে নয়, একথা বিশ্বাস করা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে শক্ত। আমাদের সন্দেহ হয় এটা আমাদের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার ফন্দী। আমরা ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে মুসলমানদের সঙ্গে লড়ব। জনতার রোষ পড়বে জনতার উপরে, হিন্দুর রোষ মুসলমানের উপরে, মুসলমানেরও রোষ হিন্দুর উপরে। ইংরেজরাই হবে দু'পক্ষের রক্ষক ও সালিশ। তাদের সালিশীতে একপক্ষ পাবে পাকিস্তান, অপর পক্ষ হিন্দুস্থান। যেন এইজন্যে এতকালের স্বপ্ন। উমেশ চাণ্ডার বনার্জি থেকে যার শুরু। সুভাস চাণ্ডার বোসেও যা শেষ নয়। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র ভাবনা স্বাধীনতার জন্যে অধীর হয়ে আমরা যেন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ি। তা হলে স্বাধীনতা তো হবেই না, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক চিরকালের মতো বিষিয়ে যাবে। এটা আমাদের আত্মপরীক্ষার আর আত্মশুদ্ধির সময়। এখনকার পলিসির নাম মার্ক টাইম।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে শোনে। এর পর অধ্যাপক শরীফ বলেন, "চৌধুরীজী, ইংলণ্ডের মতো দেশেও এককালে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল। পিউরিটান বনাম অন্যান্য। এ রকম বিরোধ কোথায়ই বা না বেধেছে। ইংরেজরা আপনাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেলেও এ রকম বিরোধ বাধবে। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ নয়, হিন্দু মুসলমান উভয়ের দেশ। তাকে যদি আপনারা মেজরিটির ভোটে আপনাদের মনোপলি করতে যান তো আমরাও ভোটের রাজনীতির উপর আস্থা হারিয়ে নেতাজী সুভাষ বোসের

পন্থা অনুসরণ করব। উদ্দেশ্য হোমল্যাণ্ড অর্জন। গান্ধীজীর মতো জিন্নাহ্ সাহেবের বুকের ভিতরেও একই আগুন জ্বলছে। কিন্তু সেটা কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির নয়, হিন্দু আধিপত্য থেকেও মুক্তির। ইংরেজদের কথায় তিনি নাচছেন না। আটটা প্রদেশ কংগ্রেস দখল করেছে বলেই নাচছেন। উপরন্তু নিয়েছে পাঞ্জাব মন্ত্রিমণ্ডলেরও একাংশ। কংগ্রেস এখন তার দখল পাকা করতে চায়। তার পলিসি কনসলিডেশন। তাই মার্ক টাইম। লীগ পলিসি তার বিপরীত। কায়দে আজম বেশী দিন সবুর করবেন না। প্রলয় নাচন নাচবেন।"

॥ সতেরো ॥

ভূরিভোজনের পর বিদায় নেবার পালা। মোহিনীবাবু বলেন, "ত্রেতাযুগে দ্রৌপদী এর চেয়ে এমন কী ভালো রাঁধতেন হে, বাসুদেব?"

"কথাটা ঠিক। তবে ত্রেতাযুগে নয়, দ্বাপর যুগে।" রায় বাহাদুর হাসেন।

"কিন্তু কোফতা আর কালিয়া কি দ্বাপরযুগেও ছিল?" শরীফ সাহেব তর্ক করেন। "আমি ভাবছি চৌধুরানীজী কার কাছে এ বিদ্যা শিখলেন।"

"কেন? আমাদের বাড়ীর বাবুর্চির কাছে। মানে বাপের বাড়ীর। পিণ্ডিতে যখন ছিলুম তখন থেকেই আবু তালিব আমাদের সঙ্গে আছে। বছর তেইশ চব্বিশ।" জুলির যতদূর মনে পড়ে।

"সে কী, আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন?" শরীফের তাক লাগে।

"এখনো তো দেশভাগ হয়নি। হবে না আশা করি। কিন্তু যদি হয় তবে আবুকে বিদেশী বলে তার বুড়ো বয়সে জবাব দিতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে।" জুলি বলে।

"কেন? বিদেশী বলে কেন?" শরীফ চমকে ওঠেন। "পূর্ব পাকিস্তানও হবে তার স্বদেশ। আপনারও তাই "

"কিন্তু আমরা যে কলকাতার মানুষ। কলকাতা কি পূর্ব পাকিস্তানের সামিল হবে? যদি দেশভাগ হয়। হবে না আশা করি।" জুলির ধারণা।

"কলকাতা বাদ দিয়ে কি পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবা যায়? আপনারা ঠাওরেছেন পূর্ব পাকিস্তান মানে পূর্ববঙ্গ। ভুল। ভুল। বিলকুল ভুল। গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে দিল্লী ছেড়ে দিচ্ছি আগ্রা ছেড়ে দিচ্ছি। তার উপর কলকাতাও ছাড়ব। এ তো ভারী মজার কথা।" শরীফ সাহেব বিদ্রূপ করেন।

ডাক্তার নিয়োগী আর সইতে পারেন না। বলেন, "সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অভিযান মনে পড়ে? কলকাতার গোরাদের তিনি মানুষ বলে গণ্য করেননি। পরিণাম পলাশীতে পরাজয় ও পতন। এবার কলকাতার হিন্দুদের মানুষ বলে গণ্য করা হবে না, যেন তাদের সম্মতি অসম্মতির কোনো দাম নেই। মুসলিম লীগ চাইবে, ব্রিটিশ সরকার দেবেন। ব্যস্। অমনি কলকাতার হিন্দুরা ক্রীতদাসের মতো হস্তান্তরিত হবে।"

ক্যাপটেন মুস্তাফী উভয় পক্ষকে থামিয়ে দেন। "আর কটা দিন সবুর করুন। শোনা যাক ক্যাবিনেট মিশন কী নিষ্পত্তি করেন। তারা এক এক করে গান্ধী, জিন্না, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি বড়ো বড়ো নেতাদের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করছেন। নিজেদের মন খোলা রেখেছেন। গান্ধীজী নাকি দেশভাগে রাজী হবেন জিন্না সাহেব যদি দুই রাষ্ট্রের এক ডিফেন্স, এক ফরেন অ্যাফেয়ার্স, এক রেল পোস্ট অফিসে রাজী হন। কলকাতা তা হলে পূর্ব পাকিস্তানেই যাবে। কিন্তু কলকাতার লোক ইণ্ডিয়ান পাশপোর্টেই সর্বত্র যেতে আসতে পারবে। আমরা যারা এখানে বাস করব তাদেরও সেই একই পাশপোর্ট ।"

শরীফ সন্তুষ্ট হন না। "গান্ধীজী এক হাতে যা দেবেন আর এক হাতে তা ফিরিয়ে নেবেন। খানু

পলিটিসিয়ান। কিন্তু জিন্না সাহেব কি ভুলবেন? ভবী ভোলে না। বিকেন্দ্রীকরণ নয়, দ্বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর লক্ষ্য। কেউ তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবেন না। ক্যাবিনেট মিশনও না। তাঁর পেছনে ন'কোটি মুসলমান। সবাই লড়াকু। তবে গৃহযুদ্ধ এড়ানোই সুবুদ্ধি। তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করতে হবে উভয়কেই।"

মিলির মা বাবাকে, জুলি ও সৌম্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিরা একে একে বিদায় নেন। তখন চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে মিসেস মুস্তাফী বলেন, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।"

"কেন ওকথা মনে হলো, মাসিমা?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"ওঁদের ওইসব কথাবার্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে কলকাতা নিয়ে হিন্দু মুসলমানে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। মিলি থাকলে ওই আগুনে ঝাঁপ দিত। ভাগ্যিস্ সে এখন নিরাপদ দূরত্বে। তার সঙ্গে রণও। ওদের আচমকা দেশ ছেড়ে যাওয়ায় শক পেয়েছিলুম। জুলি এসে পড়ায় সামলে নিই। এখন দেখছি ওদের চলে যাওয়াই শাপে বর হয়েছে। বেঁচে থাকলে আবার কতবার দেখা হবে। মিলির যা স্বভাব। আগুন দেখলেই ও ঝাঁপ দেবেই।"

"সেটা তো আমারও স্বভাব, মাসিমা। কলকাতা জ্বলছে শুনলে আমি কি এখানে বসে বেহালা বাজাব নাকি? আমার মা রয়েছেন ওখানে। তা ছাড়া আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে জনতা। হিন্দুদের মুসলমানদের হাত থেকে, মুসলমানদের হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চার বছর আগে ওরা সবাই আমাকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নইলে আমার তো কোর্ট মার্শাল হতো, মাসিমা।" জুলি মনে করিয়ে দেয়।

"তোমাকে আমরা কলকাতা যেতে দেব না, জুলি। সৌম্যকেও না। সেটা শুধু তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে নয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্যেও। কলকাতার আগুনের ফুলকি এখানেও তো উড়ে আসতে পারে। নুরুদ্দীনের দলবল কি আমাদের রেহাই দেবে? জুরের যম জারমন্দীন, হিন্দুর যম নুরুদ্দীন। গায়ে কাঁটা দেয়। কেন যে তোমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে চাও বুঝতে পারিনে। ওরা তো ঘরের ঢেঁকী কুমীর নয়, যেমন এরা।" মিলির মা অকপটে বলে যান।

"আমরা তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে এদিকে পাকিস্তান হলে ওদিকে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেব।" মুস্তাফী প্রকাশ করেন। "কিন্তু কলকাতা নিয়ে যদি লড়াই বাধে তবে যেখানে আছি সেখানে থাকাই ভালো। এখানে আমাদের অসংখ্য পেসেন্ট। অধিকাংশই মুসলমান। ওরা যদি বাঁচতে চায় তো ওদের ডাক্তার পরিবারকেও বাঁচাবে। আর তোমরাও তো আশ্রমের মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু লোককে জীবিকা জোগাচ্ছ। ওরা বাঁচবে কী করে তোমরাই যদি না বাঁচো? যাকে বাঁচাও সে বাঁচায়।" মুস্তাফী বিশ্বাস করেন।

সৌম্য সেকথা সমর্থন করে। "আমি কাসাবিয়াঙ্কার মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকব। সেটাই আমার পিতার আদেশ। মরতে হয় মরব। আমাদের উদ্দেশ্য অপর পক্ষের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো। ইংরেজদের বেলা সেটা অনেকদূর সফল হয়েছে। কিন্তু লীগপন্থী মুসলমানদের বেলা আদৌ সফল হয়নি। কেমন করে হবে, কতদিনে হবে, এই এখন আমাদের ভাবনা। মূল নীতি বিসর্জন না দিয়ে এটা যদি সম্ভব হয় তো গান্ধীজী বাঁচবেন। নয়তো তাঁর জীবন সংশয়। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের ভাবনা। জুলির জন্যে আমি চিন্তা করিনে। সে দ্রৌপদীর মতো রক্তনের পরীক্ষায় পাশ করেছে। দ্রৌপদীর মতো বীরত্বের পরীক্ষায়ও পাস করবে।"

"তোমাকে একলা রেখে আমি কোথাও যেতে পারব না। তুমি যেখানে আমি সেখানে।" জুলি বলে দৃঢ় স্বরে।

মুস্তাফীরা তা শুনে আশ্বস্ত হন। মিলির মা বলেন, "আমার মেয়ে নও বলে কি তুমি আমার মেয়ের চেয়ে কম আপন? তোমাকে কি আমি বিপদের মুখে কলকাতায় ঠেলে দিতে পারি?"

মিলির বাবা বলেন, "আমার মনে হয় না ব্যাপার ততদূর গড়াবে। গড়ালে ইংরেজরাই এদেশে অনির্দিষ্টকাল আটকা পড়বে। বার্টন সাহেব আমাকে বলে গেছেন সামনের জানুয়ারি মাসেই তিনি ইণ্ডিয়া কুইট করবেন। তবে যদি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পান তা হলে আরো একবছর দেরি করতে পারেন। একই মনোভাব আরো অনেক সাহেবেরই। এদেশ থেকে ওঁদের মন উঠে গেছে। দেশে ফিরে গেলে অন্য কোনো চাকরির আশা আছে। কিন্তু বেশী দেরি করলে চাকরি বাকরি খালি থাকবে না। ক্যাবিনেট মিশন এটা বোঝেন। তাই একটা মিটমাটের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। দ্যাখ, সৌম্য, তোমরা স্বীকার করো আর না করো মুসলিম লীগেরও একটা কেস আছে। বিলেতের গভর্নমেন্টে এক পার্টি যায়, আরেক পার্টি আসে। কনসারভেটিভের পর লিবারল, লিবারলের পর কনসারভেটিভ। ইদানীং লিবারলের জায়গায় লেবার। এর নাম রোটেশন। আমাদের দেশে কি রোটেশনের জো আছে? কংগ্রেসের পর মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের পর কংগ্রেস এ রকম পালাবদল কি সম্ভব? দিল্লীতে মুসলিম লীগ কোনো কালেই মেজরিটি পাবে না। তা হলে কি সে কোনোদিনই ক্ষমতার মুখ দেখবে না? তার জন্যে কি তাকে কংগ্রেসের অনুগ্রহে কংগ্রেসের জুনিয়র পার্টনার হতে হবে? জিন্না সাহেব কারো অনুগ্রহ চান না। না কংগ্রেসের, না ইংরেজের। সেইজন্যে তিনি একটা তৃতীয় বিকল্প বার করেছেন। মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান। পাকিস্তান হলে সেখানে কংগ্রেসই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী হবে। তাঁর জুনিয়র পার্টনার হতে পারবেন কংগ্রেস মন্ত্রীরা। যেমন এই বাংলাদেশে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া একদিন না একদিন হবেই। কোথাও কংগ্রেস সিনিয়র ও লীগ জুনিয়র পার্টনার। কোথাও লীগ সিনিয়র ও কংগ্রেস জুনিয়র পার্টনার। বলা বাহুল্য এর জন্যে চাই দুই পার্টির মধ্যে চুক্তি। আর সেই চুক্তি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর রিনিউ করা চাই। কিন্তু তার গ্যারান্টি দেবে কে? নতুন শাসনতন্ত্র কি গ্যারান্টি দিতে পারে? নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করার অপূর্ব সুযোগ এসেছে আমাদের জীবনে। আমরা যেন এর সদ্ব্যবহার করতে পারি।"

সৌম্যকে স্বীকার করতে হয় যে ইংলণ্ডের মতো রোটেশন ভারতে চলবে না। কোয়ালিশনই শ্রেয়। কিন্তু সমমনস্ক পার্টি না হলে কোয়ালিশন মানে নিত্য দ্বৈরথ। তা হলে কি তৃতীয় বিকল্প বলতে পার্টিশন? দুই আর্মি, দুই ফরেন অ্যাফেয়ার্স, দুই রেলওয়ে সীস্টেম? এক রাষ্ট্রের নাগরিক অপর রাষ্ট্রে এলিয়েন? পাকিস্তানে গান্ধী, হিন্দুস্থানে জিন্না? ইণ্ডিয়ান নেশন দু'ভাগ? ভারতীয় মুসলিম সমাজ দু'ভাগ? কোনো স্তরেই ঐক্য থাকবে না? পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু'চির? মোগল সম্রাট বা ব্রিটিশ বড়লাট কেউ এমন বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারেননি। জিন্নাকে বড়লাট করলে যদি তাঁর অন্তঃপরিবর্তন ঘটত!

"আমাদের গণসংযোগ প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানই পাঁউরুটি আর মাছ ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এর প্রতিকার ইংরেজের গদীত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসেরও গদীত্যাগ। অন্যান্য দল মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে মিশে রাজত্ব করুক। কিন্তু পার্টিশন কদাচ নয়।" সৌম্য এই বলে শুভরাত্রি জানায়।

সৌম্যর 'সর্বোদয় আশ্রম' ধর্মীয় আশ্রম নয়। তার বাইরের ফটকে উৎকীর্ণ : "শুনহ, মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ফটকের একপাশে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল : "এখানে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ হরিজন, উচ্চ নীচ, নরনারী ভেদ নাই। সকলেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব।" আর একপাশে : "শ্রমই এই আশ্রমের প্রাণ। শ্রমই জপ তপ উপাসনা ও আরাধনা।"

আশ্রমের কাজকর্ম সকাল ছ'টায় শুরু, সন্ধ্যা ছ'টায় শেষ। সে সময় সকলেই যে যার বাড়ী ফিরে যায়, থাকে কেবল চৌকিদার, মালী আর জনা কয়েক আবাসিক কর্মী, যাদের আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাদের আহারাদির ব্যবস্থা তারাই করে। কিন্তু দুপুর বেলা সকলেই আশ্রমের লঙ্গরখানার অতিথি। সেখানে নিখরচায় ডাল, ভাত ও একটা কি দুটো সবজি খেতে দেওয়া হয়। পরিবেশন করে

ব্রাহ্মণ হরিজন, হিন্দু মুসলমান, নর নারী, যখন যাদের নাম লটারিতে ওঠে। আর রান্না করে যারা রন্ধননিপুণ। তাদের জাত বা ধর্ম দেখে নয়, গুণ ও কর্ম দেখে বাছাই করে আশ্রম কমিটি। তারাও পালা করে রাঁধে। অন্য সময় করে যার যার নিজের কাজ। কামারের কাজ, কুমোরের কাজ, ছুতোরের কাজ, দর্জির কাজ, তাঁতীর কাজ, কাটুনীর কাজ। এমনি হরেক রকমের কাজ। ময়লা সাফাইয়ের কাজ নিয়মিত করতে হয় কর্মীদের সবাইকেই। বাসন মাজা, কাপড় কাচা যার যার নিজের।

সকলে একসঙ্গে বসে খায়। কিন্তু মেয়েদের আলাদা পঙ্ক্তি। রাত্রে মেয়েদের থাকতে দেওয়া হয় না। তবে যারা স্ত্রী নিয়ে থাকতে চায় তাদের জন্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র কুটির আছে। তার জন্যে ভাড়া দিতে হয়। সেটা আসে উপার্জন থেকে। উৎপাদন অনুসারে উপার্জনের হিসাব হয়। উপার্জনে তারতম্য থাকে। আশ্রম কাউকে মজুরি দেয় না। নিজের খরচে খেলে আমিষ খেতে নিষেধ নেই, কিন্তু আশ্রমের খরচে খেলে নিরামিষই বিধি। নইলে খরচ বাড়ে। আশ্রমের সাধ্যের বাইরে। এই আশ্রম একটা ট্রাস্ট। সৌম্যও ট্রাস্টীদের একজন। তার পৈত্রিক সম্পত্তির কতক অংশ ট্রাস্টের তহবিলে খয়রাত করেছে। বাকী দু'জন ট্রাস্টী গুজরাটী। তাঁরা সৌম্যর উপরে আস্থাবান। তাকে পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়।

রোজ আশ্রমে গিয়ে তার প্রথম কাজ ঝাড়ু আর বালতি হাতে সাফাইয়ের অভিযানে যোগ দেওয়া। এটাই আশ্রমিকদের সমবেত প্রার্থনা। শরীরকে শুচি রাখা যেমন প্রাথমিক কর্তব্য পরিবেশকে পরিষ্কার রাখাও তেমনি প্রাথমিক কর্তব্য। অপরিষ্কার পরিবেশ থেকে কতরকম ব্যাধির উৎপত্তি। সভ্য জাতি বলে যাদের পরিচয় তারা পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। আমরা কি সভ্য জাতি? তা যদি হয়ে থাকি তবে আমাদের পরিবেশকেও নিজের মতো সাফ সুতরো রাখা চাই। দুঃখের বিষয় যত জন নিখরচায় আশ্রমের ভাত খায় তত জন নিখরচায় আশ্রম সাফ রাখতে এগিয়ে আসে না। সৌম্য ধৈর্য ধরে সহ্য করে যায়। এর পেছনে বহু শতাব্দীর উচ্চ নীচ মনোভাব আছে। আমরা উচ্চ বর্ণ, আমরা নীচ বর্ণের মতো ধাঙড়ের কাজ করব? তা হলে করবেটা কে? যারা চিরকাল করেছে তারাই চিরকাল করবে। পূর্বজন্মের কর্মফল। কত বড়ো বড়ো মহাপুরুষ এলেন আর গেলেন, কেউ কি এ প্রথা বদলে দিতে পারলেন? মহাত্মা গান্ধী পারবেন? পাগলামি! সৌম্য একটু একটু করে সাড়া পায়। জুলি ঝাড়ুদারনীর মতো গাছকোমর বেঁধে সাথী হয়।

এখানকার কর্মীরা সবাই সবাইকে সাথী বলে। যেমন কমিউনিস্টরা পরস্পরকে বলে কমরেড। এটা ছোটোখাটো একটা সমাজ। অথচ ধর্মীয় সমাজ নয়। তা বলে ধর্মহীনও নয়। যে যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে প্রেরণা এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা পুরাতন তাঁত চরকা ঘানি ইত্যাদি অবলম্বন করলেও নতুন এক আদর্শের প্রেরণা। সারা দিন তারা অক্লান্তভাবে কাজ করে।

"আমরা যদি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারি তা হলে বিশ্ব জয় করতে চাইনে। বিশ্ব জয় করে কী লাভ হবে, যদি নিজের আত্মাকেই হারাই? ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের দিকে চেয়ে দ্যাখ। মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তাদের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করেছে। যার পরিণতি জার্মানদের গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের গণহত্যা আর মার্কিনদের পারমাণবিক বোমায় জাপানীদের গণবিনাশ। এ ছাড়া আর কোনো পরিণতি হতে পারত না ও পারবে না। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে দ্যাখ। সেখানেও মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। তফাৎটা এই যে প্রাইভেট ক্যাপিটালিজমের স্থান নিয়েছে স্টেট ক্যাপিটালিজম। শ্রমিকদের ও কৃষকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটিয়ে নিয়ে ও নাগরিকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈনিক বানিয়ে ওরা ভাবছে ওরা একটা নতুন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করছে। একদিন উপলব্ধি করবে ওটা একটা নতুন শৃঙ্খল। যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর কোনো পক্ষে কেউ জীবিত থাকে। আমরা মনুষ্যত্বের বিনাশের উপর নয়, বিকাশের উপরেই জোর দিই। চরকা চিরকাল চরকা থাকবে না, তারও

বিবর্তন হবে। কিন্তু সে থাকবে কাটুনীর আয়ত্তে। কাটুনী তার আয়ত্তে নয়। মানুষের জন্যেই যন্ত্র, যন্ত্রের জন্যে মানুষ নয়। যন্ত্রকে দিয়ে মানুষের পরিশ্রম কমাতে গিয়ে যন্ত্র মানুষকেই ছাঁটাই করছে, আর সেই ছাঁটাই মানুষগুলিকে যুদ্ধের ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়ে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভারতেও তাই হবে কংগ্রেস নেতারা যদি গান্ধীজীর পন্থা থেকে বিচ্যুত হন। যদি মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে সত্য ও অহিংসা ততই দূরতর হচ্ছে।" সৌম্য তার প্রিয় সাথীকে শোনায়।

জুলি বিনা বাক্যে মেনে নেয়। কখনো ঝাড়ুদারনী হয়ে ঝাড়ু দেয়, কখনো ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয়, কখনো তাঁতঘরে গিয়ে ব্লাউসের কাপড় বুনতে বসে, কখনো কাটুনীদের সঙ্গে বসে তার জন্যে সুতো কাটে। বাগানে গিয়ে মাটি কোপায় কখনো। সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে যখন তখন তার শরীরময় ক্লান্তি আর ব্যথা। আহারের পর সকাল সকাল বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ঘুমের ঘোরে সৌম্যকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে। পাছে সে উঠে পালিয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে সে কখন থেকে জেগে আছে। জুলিকে জাগিয়ে না দিয়ে অপেক্ষা করছে।

মনে মনে সে তাব বান্ধবী বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেয়। তোদের বিপ্লবের আগে আমাদের বিপ্লব হবে, আমরাই জনগণের হৃদয় জয় করব। একবার ওদের হৃদয় জয় করতে পারলে ওদের যা করতে বলব তাই করবে। না, আর ভাঙ্ চুর নয়। খুন খারাপি তো নয়ই। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করবে ও বাইরে থেকে আক্রমণ এলে আত্মরক্ষা করবে। ভাত কাপড়ের জন্যে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। মোটা চাল মোটা কাপড় নিজেরাই উৎপন্ন করবে। নুনটাই যা দুর্লভ। সেটাও লোনা জমিতে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েৎই হবে সত্যিকার সোভিয়েট।

জুলি যে সর্বতোভাবে সৌম্যর সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করছে এটা লক্ষ করে সে আনন্দিত হয়। কিন্তু একই কালে বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেবার কথাও ভাবছে। এর জন্যে সে দুঃখিত। জুলিকে বলে, "বাবলীদের দলেও ত্যাগী পুরুষ ও নারী আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু উপায় মহৎ নয়। আমরা যদি আমাদের উপায়ে দৃঢ় থাকি তা হলে একদিন জনগণ তুলনা করে দেখবে কোন্‌টা শ্রেয় আর কোন্‌টা প্রেয়। আপাতত আমাদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট দোনোমনো। সত্যিকার গান্ধীপন্থীর সংখ্যা এখন আঙুলে গোনা যায়। পঁচিশ বছর আগে আরো অনেক বেশী ছিল। এইভাবে যদি চলতে থাকে পঁচিশ বছর বাদে একটি কি দুটিতে ঠেকবে। বাপু বলেন একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। হ্যাঁ, একজন সত্যাগ্রহীই প্রতিরোধের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু দেশের পুনর্গঠন বা সমাজের পুনর্বিন্যাসের জন্যে যথেষ্ট নয়। বাবলীদের সে সমস্যা নেই। তারা সবাই একমত যে জমিদার, মহাজন আর পুঁজিপতিদের খতম করে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে আর রাষ্ট্রকে পার্টির হাতের মুঠোর মধ্যে আনলে আর পার্টিকে একজন প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরের আজ্ঞাবহ করলেই প্রগতির পরাকাষ্ঠা হবে। ইতিহাস রুশদেশে ওদের একটা সুযোগ দিয়েছে। তার থেকে ওদের ধারণা হয়েছে সব দেশে দেবে। আমাদের এদেশে দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃথা। শুধু নিজের লক্ষ্যে আর নিজস্ব উপায়ে স্থির থাকতে হবে। তোমার আমার যদি সেই পরিমাণে বিশ্বাসের জোর না থাকে তবে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব না। ইতিহাস আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তবে বাপুকে পেছনে ফেলার সাধ্য কারো নেই। তিনি দু'শো বছর এগিয়ে রয়েছেন। নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া মানব সভ্যতা বাঁচতেই পারে না, আর সে নেতৃত্ব তিনি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেলেও নৈতিক নেতৃত্ব বজায় থাকবে। ধ্রুবতারার মতো তিনি পথ দেখাতে থাকবেন। ইংরেজরা বলে, শ্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস। তুমি যদি বাবলীর সঙ্গে দৌড়ে জিততে চাও তবে তোমাকে ধীর স্থির আর তন্নিষ্ঠ হতে হবে।"

"তোমার কি মনে হয় বাপুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে? কংগ্রেস কি তাঁর নেতৃত্ব মানবে না?" জুলি জানতে চায়।

"কংগ্রেস নেতারা যদি একবাক্যে বলতেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে একমাত্র গান্ধীজীই কথাবার্তা চালাবেন ও তাঁর যা সিদ্ধান্ত কংগ্রেসেরও সেই সিদ্ধান্ত তা হলে তিনি সরে দাঁড়াতেন না। কিন্তু নেতাদের মধ্যেই এখন একটা অধীর ভাব দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে যে কোনো দাম দিতে প্রস্তুত। ওদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও দিল্লীকা লাড্ডু খাবার জন্যে সাদরে ডাকছেন। যে খাবে সেও পশতাবে, যে খাবে না সেও পশতাবে। কংগ্রেসের ভিতরে একটা খাই খাই ভাব আর ইংরেজের ভিতরে একটা যাই যাই ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ওরা আর থাকতে চায় না। কিন্তু ওদের শর্ত কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে। ভাগ করে খেতে গেলে ঝগড়া বাধবেই। সে ঝগড়া কতদূর গড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য গম্ভীর মুখে বলে।

"না, না। তা কিছুতেই হবে না।" জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। "কাজ নেই অমন লাড্ডুতে। বিনা শর্তে দিলে খাব, নয়তো খাব না। এই হবে কংগ্রেসের জবাব।"

"বিনা শর্তে দিলেও খাওয়া মুশকিল হবে। মুসলিম লীগ এমন গণ্ডগোল বাধাবে যে গিলতে পারা যাবে না, উগরে ফেলতে হবে। পদত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে ওরা মুসলিম লীগকেই দিল্লীকা লাড্ডু দিক। ওরাই গ্রাস করুক। শিখদের সঙ্গে যখন বেধে যাবে তখন টের পাবে কেমন মজা। তখন হয়তো কংগ্রেসের দিকে মিটমাটের জন্যে হাত বাড়াবে। মিটমাট হলে পার্টিশনের ভিত্তিতে নয়, বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে।" সৌম্যর মতে।

"যদি বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে না হয় তা হলে?" জুলি প্রশ্ন করে।

"তা হলে মিটমাট হবেই না। শহীদ হবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। বাপুকেও। তিনি তৈরি।" সৌম্য ঠিক জানে।

জুলি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে, "তা হলে আমরা কেন ঘর বাঁধতে যাচ্ছি? কুটির নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিই?"

"না, বন্ধ করে দেব না। সবচেয়ে খারাপটা ধরে নেব কেন? সেটা না ঘটতেও পারে। ইংরেজদের মতো লীগপন্থী মুসলমানদেরও অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। বিকেন্দ্রীকরণে ওদেরও তো কিছু লাভ হবে। নিতান্ত ফ্যানাটিক না হলে তাতেই তারা রাজী হবে।" সৌম্যর মনে হয়।

"নিতান্ত ফ্যানাটিক যদি হয়?" জুলি জেরা করে।

"তা হলে দুরাশা।" সৌম্য হাল ছেড়ে দেয়।

"তা বলে তোমাকে আমি অনর্থক শহীদ হতে দেব না। বাপুকেও বারণ করব। আমরা বাঁচব ও বাঁচাব।" জুলি ভেবে চিন্তে বলে।

জুলিদের গৃহপ্রবেশের আগের দিন মুস্তাফীরা একটা পার্টি দেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মানসের বন্ধু ও সেইসূত্রে সৌম্যর আলাপী সত্যভূষণ সমাদ্দার। মর্টিমারের জায়গায় নতুন জেলা জজ। মিসেস সমাদ্দারও ছিলেন।

মুস্তাফী বলেন, "এরা দুটিতে ঘরকন্না পাতছে বটে, কিন্তু কে জানে ক'দিনের জন্যে! হঠাৎ একদিন সত্যাগ্রহের ডাক আসবে, অমনি এরা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।"

সমাদ্দার তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বলেন, "সত্যাগ্রহ হবে কার বিরুদ্ধে? ইংরেজরা তো ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে চলে যাবার তালে আছে। যারা আপনি চলে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কেনই বা দরকার হবে? এক যদি কংগ্রেসের দাবী হয় ক্ষমতার হস্তান্তর কালে তাকেই একমাত্র

উত্তরাধিকারী করা। তেমন দাবী ইংরেজ মানবে কেন? মানলে যে মুসলিম লীগকে শত্রু করা হবে। তাতে ইংরেজের কী লাভ? কংগ্রেস কি তার বিপদের দিন পাশে দাঁড়াবে? পুরাতন শত্রুকে উত্তরাধিকারী করে পুরাতন মিত্রকে শত্রু করা কি সঙ্গত? ওটা ইংরেজ চরিত্র নয়। ইংরেজরা তেমন কাজ করতে গেলে মুসলিম লীগ জেহাদ ঘোষণা করবে। আর সেই জেহাদের লক্ষ্য কেবল ইংরেজ নয়, কংগ্রেসও হবে। মুসলিম লীগ ধর্মের নামে মাঠে নামলে যা হবে তা আর একটা কুরুক্ষেত্র। গান্ধীজী কি এটা বোঝেন না?"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "কংগ্রেস বলবে মুসলিম লীগকে একমাত্র উত্তরাধিকারী করতে। তার জন্যে সত্যাগ্রহ করতে হবে কেন? পদত্যাগ করলেই চলবে। পদত্যাগের পর গঠনের কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেই হলো।"

"বামপন্থীরা সে নির্দেশ মানলে তো?" সমাদ্দার সন্দেহ করেন।

সৌম্য মৌন থাকে। মুস্তাফী বলেন, "বামপন্থীরা দূরে থাক, দক্ষিণপন্থীরাও কি মানবে? সাড়ে ছ'বছর ধরে যারা অভুক্ত রয়েছে তারা এখন খেতে বসেছে, লাটসাহেবেরাও তাঁদের জামাই আদরে খাওয়াচ্ছেন। এবার তো যুদ্ধের অজুহাতে উপবাস করা যায় না, যুদ্ধ আবার কবে বাধবে তারও ঠিক ঠিকানা নেই। এখন যদি অকারণে বা তুচ্ছ কারণে উপবাস করেন তবে ভবিষ্যতে যখন সত্যি সত্যি বিশ্বযুদ্ধ বাধবে তখন করবেন কী? বামপন্থীরা যদি অবুঝ হয় তবে তারাই দেশ শাসনের দায়িত্ব নিক। মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া কেন? ক্ষমতা বলতে দেশ ভাগ করার ক্ষমতাও তো বোঝায়। ক্ষমতার আসনে বসে যদি ওরা ওদের ইচ্ছামতো দেশভাগ করে তো সারা বাংলাদেশ ওদেরি হবে। সায় আসামও। এবার ইংরেজরা সত্যি সত্যি কুইট করছে, এবার প্রত্যাশা করতে পারা যাবে না যে তারাই কংগ্রেসের শূন্য গদী আগলাবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয়বার হবে না। এবারকার ইস্যু ইংরেজদের শূন্য স্থান পূরণ করবে একমাত্র কংগ্রেস, না যুগ্মভাবে কংগ্রেস ও লীগ, না বিভক্ত ভাবে কংগ্রেস ও লীগ। ইংরেজও থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না, মুসলিম লীগ যা খুশি তা করবে, আর কোথাও না করুক বাংলাদেশে তো করবেই। তাকে সংযত করবে কে? কী উপায়ে? সত্যাগ্রহ কি সেই উপায়?"

সৌম্য নিরুত্তর থাকে। জুলি বলে ওঠে, "সত্যাগ্রহ বিফল হলে গৃহযুদ্ধ।"

"ছেলেমানুষি। মিন্টিও সেই কথা বলে। গৃহযুদ্ধ যদি সৈনিকে সৈনিকে হয় তা হলে হয়তো আমরা বেঁচে বর্তে থাকব, কিন্তু যদি জনতায় জনতায় হয় তবে সপরিবারে পরলোক যাত্রা করতে হবে। যাদের পরলোকে যেতে আপত্তি তারা পর প্রদেশে যাত্রা করবে। যঃ পলায়তি স জীবতি।" মুস্তাফী বলেন।

সমাদ্দার আবার খেই হাতে নেন। "উপরের শ্রেণীর মুসলমানরা প্রায় দু'শো বছর ধরে অভুক্ত। একবার রক্তের স্বাদ পেলে তারা পঞ্চাশ বছরের আগে গদী থেকে নামবেন না। ছলে বলে কৌশলে গদী আঁকড়ে থাকবেন। তাঁদের কাছে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। সত্যাগ্রহ বা গৃহযুদ্ধ কোনোটাই তাঁদের নড়াতে পারবে না। নিচের শ্রেণীর মুসলমানরা যতদিন না সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক চেতনায় উপনীত হয় ততদিন তাঁদের টলাবে কে? বৃথা অপেক্ষা। আপাতত আমাদের কর্তব্য ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া হলে ইংরেজরাই মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে দেবে। কতকটা নিজেদের স্বার্থে, কতকটা ভারতের স্বার্থে। ভারতকে দুর্বল রেখে গেলে সোভিয়েট রাশিয়া এসে ঘাড় মটকাবে। ভারতরক্ষার দায়িত্ব ওরা বিভক্ত করতে চাইবে না। সেটা হবে যৌথ দায়িত্ব। তা হলে বিদেশ নীতিকেও যৌথ রাখতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও। শুনতে পাচ্ছি ক্যাবিনেট মিশনও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

সৌম্য এইবার মুখ খোলে। "গান্ধীজীও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

প্রতিমা সমাদ্দার জুলিকে একান্তে বলেন, "আপনাদের কুটির দেখতে যাব একদিন আমরা।

আপনারাও আমাদের কুটির দেখতে আসবেন একদিন।"

জুলি খুশি হয়ে বলে, "নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের কুটিরটা বাস্তবিকই কুটির। আপনাদের কুটিরটা কাল্পনিক।"

প্রতিমা সমাদ্দার হেসে বলেন, " তা হোক। আসবেন কিন্তু।"

।। আঠারো ।।

স্বপনদার বাড়ীর কাছাকাছি বাস করেন যশোবিকাশ রায়। ব্রাহ্মণ তথা জমিদার তথা ব্যারিস্টার। এর জন্যে তাঁর গর্বের কারণ ছিল। কিন্তু বিধাতা তাঁর মুখরক্ষা করেননি। পিতামহের অমতে বিলেত যাত্রার সময় অর্থাভাবে পিরালী বংশে বিবাহ করেন। ফলে পিরালী হন। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যে পিরালী হয় তার ভাই বোন ছেলেমেয়েরাও পিরালী হয়। তাদের বিয়ের সময় মুশকিলে পড়তে হয়। তাঁর একমাত্র কন্যা যশোধরাকে তিনি লোরেটোতে পড়িয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনাও শিখিয়েছিলেন। দেখতেও সুন্দরী। তন্বী। দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু পিরালীদের মধ্যে সুপাত্র পাওয়া দুষ্কর। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাত্ররা গুরুজনের ভয়ে পেছিয়ে যায়। যদি বা কেউ রাজী হয় সে মোটা পণ চায়, সেটা খরচ হবে তার বোনের বিয়েতে।

অসবর্ণ বিবাহ যদিও তাঁর অহংকারে বাধে তবু তিনি মেয়ের মুখ চেয়ে তাতেও রাজী হন হাতের কাছে পান স্বপনদাকে। তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। রায় সাহেবেরই কাছে শিক্ষানবীশ। যাকে বলে ডেভিল। নিজের ডেভিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তো প্রায়ই হয়। প্রস্তাবটা করেন মেয়ের মা। কিন্তু বিলিতী কেতা অনুসারে করতে হতো স্বপনদাকেই। বলতে হতো, 'টুকটুক, তুমি কি আমার হবে?" স্বপনদা প্রেমের শিক্ষানবীশী করতে আসেননি, সে বিদ্যা তিনি ছাত্রজীবনেই আয়ত্ত করেছেন। প্রয়োগও করেছেন। ব্যর্থও হয়েছেন। বলেন, "আমাকে মাফ করবেন। আমার ভাঙা হৃদয় জোড়া দেবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে যে ভেঙে দিয়েছে। তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি ও আরো কয়েক বছর করব।"

স্বপনদা জানতেন না যে টুকটুক দারুণ আঘাত পাবে। বিভিন্ন পাত্রের দ্বারা একটা না একটা অজুহাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে এক কাণ্ড করে বসে। বিলেত পালিয়ে গিয়ে এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করে। বাপ মা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? যতদিন পারেন চাপা দেন। কিন্তু পরে জানাজানি হয়ে যায়। বন্ধুরা রসিকতা করে বলেন, মুসলমানদের উপর পিরালীদের একটা পতঙ্গের মতো আকর্ষণ আছে। কন্যার পিতা কৈফিয়ৎ দেন, "পাত্রটি তো ভালো। সদ্বংশীয়। ওদের বংশের কে যেন নবাব ছিলেন। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্শ্ববর্তী সোয়াটের আখন্দ।" রেজা আলী আখন্দের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন স্বপনদা ইংরেজীতে ছড়া কাটেন—

"Who. or why. or which. or what.
Is the Akond of Swat?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে যান। তাঁকে জিজ্ঞাসু দেখে স্বপনদা বলেন, "ছড়াটা আমার নয়, এডওয়ার্ড লীয়ারের। ইংরেজরা জানত না আকন্দ বলতে কী বোঝায়, কাকে বোঝায়, কেন বোঝায়। আমরাও কি বুঝি? আমরা তো ভাবি আকন্দ ফুল। একজন আকন্দকে চাক্ষুষ করে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম। নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

বরটি উদার হলে কী হবে? তাঁর গুরুজন ঘোর রক্ষণশীল। তাঁর বেগম পর্দা মানেন না, পিয়ানো বাজান, ক্যারল গান করেন, ছদ্মনামে সিনেমায় অভিনয় করেন। আকন্দ পরিবারের মাথা হেঁট। ব্যারিস্টারি

পসারেও টান পড়ে। স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিন্য। তখন টুকটুক আবার এক কাণ্ড বাধায়। যুদ্ধের সময় যেসব মার্কিন মিলিটারি অফিসার এসেছিলেন তাঁদের একজনের সঙ্গে ইলোপ করে। স্বামী তালাক দেন।

কিছুদিন পরে খবর আসে টুকটুক আবার বিয়ে করেছে। বরের নাম জন শারম্যান উডরো। পূর্বপুরুষ সিভিল ওয়ারে নাম করেছিলেন। টুকটুকের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল হলিউডে গিয়ে চিত্রতারকা হওয়া। শ্বশুরবাড়ীর সেটা পছন্দ নয়। এ বাড়ীর মেয়েরা কেউ অভিনেত্রী হয় না। হলিউডের প্রযোজকরাও তাকে আমল দেন না। আজে বাজে ভূমিকা নিতে বলেন। সে রাজী হয় না। তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ততদিনে জনেরও ক্লান্তি এসেছে। টুকটুক ডিভোর্স চায় ও পায়।

স্বপনদা একদিন আইনের পরামর্শ নিতে গিয়ে দেখেন ব্যারিস্টার সাহেবের মুখখানা কালো। কেন জানতে চাওয়ার আগে তিনি কাতর স্বরে বলেন, "স্বপন, টুকটুক আমার একগালে কালি মাখিয়েছিল, এখন আরেক গালে চুণ মাখিয়েছে। আমি মুখ দেখাব কার কাছে? মেয়ে দ্বিতীয়বার ডিভোর্স পেয়েছে।"

স্বপনদা সান্ত্বনার স্বরে বলে, "অসুখী হওয়ার চেয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেয়।"

মেয়ের মা জ্বলে ওঠেন, "এর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে ও সুখী হতো। এসব কেলেঙ্কারি করত না।"

"আমি কেমন করে জানব? আমি কি সর্বজ্ঞ?" স্বপনদা জবাবদিহি করেন।

"তোমার জানা উচিত ছিল যে তোমার নভেল পড়ে তরুণী মেয়েরা তোমাকেই তাদের রোমান্টিক নায়ক করতে চাইবে। আরো ক'জনের মাথা খেয়েছ কে জানে? ওরাও হয়তো এমনি অসুখী।"

"গ্যেটের 'তরুণ ভেরটারের দুঃখ' পড়ে সেকালের তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। তার জন্যে কি গ্যেটে দায়ী? এ কী সর্বনেশে কথা! ক'জন প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করতে পারতুম?" স্বপনদা কপট ভয়ে ভীত।

যশোবিকাশ বলেন, "আর্ট যেমন জীবনের অনুসরণ করে জীবনও তেমনি আর্টের অনুসরণ করে। কার উক্তি? ওস্কার ওয়াইল্ডের না?"

"আর কার? যা চটকদার উক্তি!" স্বপনদা বলেন।

"আমি ভাবছি ও মেয়ে ইবসেনের সৃষ্টি না চেখভের? তোমার নয়, তা এতদিনে বোঝা গেছে। তুমি জানো কেমন করে সব দিক সামলাতে হয়। কিন্তু বলতে পারো ওর ভবিষ্যৎ কী? ও চায় স্বাধীন জীবিকা। সিনেমা লাইনই ওর পছন্দ। এদেশে তার কী রকম প্রস্‌পেক্ট?" জানতে চান যশোবিকাশ।

"উচ্চমান বিসর্জন দিলে অসীম পরিসর। কিন্তু টুকটুক আর টুকটুক থাকবে না। দেবিকারানী আর দেবিকারানী থাকতেন না। তিনি সময়মতো সরে যান। অবশ্য মনের মতো স্বামী পেয়ে। অতি উচ্চমনা পুরুষ। টুকটুকের ভাগ্যে কী আছে কে বলতে পারে! আর একজন শ্বেতোল্লাভ রেরিখ্‌ই বা কোথায়?" স্বপনদা সহানুভবী।

"তেমন একটি বর খোঁজা বাপ মায়ের সাধ্য নয়। আমরাই বা আর কদ্দিন? আমাদের পরে মেয়েটার ভার নেবে কে? টাকার অভাব হবে না। কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? পারমানেন্ট সেটলমেন্ট রদ হয়ে যেতে পারে। ওটা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। ওরা চলে গেলে ব্যারিস্টারিও তো উঠে যেতে পারে। ব্যারিস্টাররাও ইংরেজদেরই সৃষ্টি। আমাদের রুজি রোজগারের সূত্র থাকবে না। তোমাকে ধরতে হবে বৈদ্যবৃত্তি। আমাকে যজমান বৃত্তি।" যশোবিকাশ হাহুতাশ করেন।

স্বপনদা হেসে বলেন, "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, চতুরানন।"

"হাসির কথা নয়, স্বপন। ইংরেজী এসেছিল ফার্সীর জায়গায়। এর পর হিন্দী আসবে ইংরেজীর জায়গায়। পারবে তুমি হিন্দীতে আদালতের কাজ চালাতে? আমি তো অক্ষম। এ বয়সে হামাগুড়ি দিতে

নারাজ।" যশোবিকাশ হাসেন না।

"হিন্দী কেন বলছেন? উর্দুই তো হবে পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। আর বাংলাদেশ তো পড়বে পাকিস্তানে।" স্বপনদা মনে করিয়ে দেন।

"ভাবনার কথা। ইংরেজরা আমাদের উপর শোধ তুলে যাবে। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্যে প্রতিশোধ। তুমি তো জানো আমরা মডারেটরা সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করিনি। আমরা ছিলুম দূরদর্শী। আর এক্সট্রিমিস্টরা অদূরদর্শী। এখন ডে অভ্‌ রেকনিং আসন্ন। ইংরেজরা যদি গোটা বাংলাদেশটাই মুসলিম লীগকে দিয়ে যায় কংগ্রেস বা মহাসভা সেটা থামাবে কী করে? এবারকার নির্বাচনে মুসলিম লীগেরই একাধিপত্য। সুহরাবর্দী একজন বর্ণহিন্দুকেও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেননি। আর তাঁরই বা কতটুকু স্বাধীনতা? দাবার ঘুঁটি চালাচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেসকে জব্দ করাই তাঁর পলিসি। কংগ্রেস হয়তো ইংরেজের সঙ্গে আপস করবে, কিন্তু লীগ কখনো কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে না। ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসে বাধা দেবে। কৈকেয়ীর মতো দশরথকে বলবে, তুমি আমাকে বর দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। আমি চাই পাকিস্তান। যার সামিল হবে সারা বাংলা, সারা আসাম, সারা পাঞ্জাব। আমাকে আমার প্রার্থিত বর না দিয়ে তুমি কেমন করে বনবাসে যাও, দেখব। তোমার বিপদের দিন কৌশল্যা কি তোমার সেবা করেছিল? তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল? বুঝলে, স্বপন? ইংরেজরা মুসলিম লীগকে তার পাওনা না দিয়ে ছাড়া পাবে না। না দিয়ে গেলে লীগপন্থীরা বিদ্রোহ করবে। গুলি করে হাজার হাজার মুসলমান মারতে হবে। সম্ভব নয়।" যশোবিকাশ মাথা নাড়েন।

"ক্যাবিনেট মিশনের স্টেটমেন্ট পড়েছেন? ওঁরা সাফ বলে দিয়েছেন যে ওঁরা পাকিস্তান সমর্থন করেন না। মুসলিম লীগ যদি নাছোড়বান্দা হয় তবে অর্ধেক বঙ্গ, অর্ধেক পাঞ্জাব ও আসামের সিলেট জেলা পাবে। তাছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশ। যদি গোটা বাংলা, গোটা পাঞ্জাব ও গোটা আসামের জন্যে জেদ ধরে তবে সোভরেনটি পাবে না। সৈন্যসামন্ত, পররাষ্ট্রবিভাগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। মুসলিম লীগকে খুশি করবার জন্যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ক্ষমতা তিনটি গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটা গ্রুপ, পশ্চিম প্রান্তের মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে আর একটা গ্রুপ, বাংলাদেশ ও আসামকে নিয়ে আরো একটা গ্রুপ। শেষের গ্রুপটাতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা বাহান্নর নিচে। অমুসলমানদের সংখ্যা শতকরা আটচল্লিশের উপরে। প্রায় সমান সমান। গ্রুপদের নিজস্ব আইনসভা ও সরকার থাকবে। কোয়ালিশনের সম্ভাবনাই বেশী। এই হলো ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা। সেটা কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সেটা একটা এ্যাওয়ার্ড নয়।" স্বপনদা সংক্ষেপে প্রস্তাবের মর্ম শোনান।

"কেন্দ্র ও প্রদেশের মাঝখানে আরো একটা স্তর? গ্রুপ? দুনিয়ার আর কোনো শাসনতন্ত্রে কেউ দেখেছে? ওটাকে চালু করে দেবার জন্যে ইংরেজদের আরো কিছুকাল থেকে যেতে হবে। নয়তো দু'দিনেই ভেঙে পড়বে। কেন্দ্রকে অমন করে কমজোরী করা বিজ্ঞতা নয়। মোগলরাও তা করেনি, ইংরেজরা নিজেরাও তা করেনি। কংগ্রেস তাতে রাজী হবে? লীগ যদি রাজী হয় তবে তা সেই মই বেয়ে গাছে ওঠার জন্যে। গ্রুপ থেকেই পৌঁছবে স্বাধীন পাকিস্তানে। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র পাঞ্জাব ও সমগ্র আসাম সমেত। আগুন ধরাবে কেন্দ্রীয় সৈন্যদলে। কংগ্রেস লীগ আপস ছাড়া এ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। সে আপস ইংরেজদের হাতে নেই। আছে দুই দলের দলপতিদের হাতে। আমি তোমার মতো আশাবাদী নই, স্বপন।" যশোবিকাশ বলেন।

"আমিও কি আশাবাদী? লক্ষণ যা দেখছি তা আপসের নয়, গৃহযুদ্ধের। দু'পক্ষই তৈরি হচ্ছে। বিনা যুদ্ধে কেউ কাউকে সূচাগ্র মেদিনী দেবে না। আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাইনে। আমি দূরে সরে

থাকতে চাই। কিন্তু যাবই বা কোথায়? ইউরোপে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দীপিকা কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তার কুকুরই তার সর্বস্ব।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

টুকটুকের মা মেখলা দেবী হেসে ওঠেন। "কুকুরই তার সর্বস্ব? স্বামী নয়? এই হচ্ছে তোমার শাস্তি। টুকটুককে বিয়ে করলে দেখতে তুমিই হতে তার ঠাকুর। সে হতো ঠাকুরসর্বস্ব।"

দীপিকা যদি শোনে তবে রক্ষে থাকবে না। স্বপনদা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, "তা নয়। দীপিকা কলকাতায় থাকতে চায় সম্পত্তি পাহারা দিতে। ইংরেজরা যদি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভারত থেকে অপসরণ করে তবে তার পরে যেটা হবে সেটা জোর যার মুলুক তার। মালিক পালিয়ে গেলে সম্পত্তি লোপাট হয়। এটাই তো নিয়ম। আদালত কোথায় যে নালিশ করে ফেরৎ পাবে। ওসব অচল হবে। লর্ড ওয়েভেল ইন্টারিম গভর্নমেন্টের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি সফল হন তবে কংগ্রেস আর লীগ একসঙ্গে কাজ করতে করতে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিখবে। একটা সোডাস ভিতেভিত্তি গড়ে উঠবে। হিন্দু মুসলমান যদি এক না হয় ভারত এক হবে কোন্ মন্ত্রবলে? ইংরেজরা ক্ষমতা হাতে দিয়ে গেছে বলে? আমি চাই হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি। তুমি আমাকে কিছু দাও, আমি তোমাকে কিছু দিই। গিভ অ্যাণ্ড টেক। কিন্তু ওরা তো কেউ কারো সঙ্গে কথাই বলছে না। প্রত্যেকেরই সম্পর্ক ইংরেজের সঙ্গে। অপর পক্ষের সঙ্গে নয়। কৌশল্যাতে কৈকেয়ীতে মুখ দেখাদেখি নেই।"

"দ্যাখ, স্বপন, কংগ্রেস আর লীগ যদি মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে পরস্পরকে অপোজ করে, যদি প্রাদেশিক আইনসভায় পরস্পরের বিরোধী পক্ষ হয়, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরস্পরের বিরুদ্ধতা করে, তবে বড়লাটের শাসন পরিষদে তারা মিলে মিশে শাসনকার্য চালাবে কী করে? গিভ অ্যাণ্ড টেক সর্ব ক্ষেত্রেই করতে হবে। কেবলমাত্র শাসন পরিষদে নয়। গান্ধীজী শুনেছি ওয়েভেল সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস বা লীগ এদের এক পক্ষের উপর গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিতে। লীগ যদি গভর্নমেণ্ট চালায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দুই দলের যেমন সম্পর্ক তাতে ওদের মেলাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে।" যশোবিকাশ বলেন।

ব্র্যাণ্ডি এল। স্বপনদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যশোবিকাশ বলেন, "আমার বয়স হলো সত্তর। কোর্টে যাওয়া আসা করা আর চলবে না, গাউটের মতো হয়েছে। যতদিন পারি চেম্বার প্র্যাকটিস চালিয়ে যাব, যদি ইংরেজী থাকে। এখন আমার প্রধান ভাবনা টুকটুকের কী হবে। তোমার কি মনে হয় ও আবার বিয়ে করবে?"

"কেমন করে জানব? স্ত্রিয়াং চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

যশোবিকাশ হাসেন, কিন্তু মেখলা দেবী চটে যান। "নারীজাতিকে অত বড়ো অপমান আর কেউ করেনি। পচা রসিকতা।"

যশোবিকাশ তাঁর স্ত্রীকে প্রবোধ দেন। "যাঁরা সীতা, সাবিত্রী, উমা হৈমবতীর চরিত্র এঁকেছেন তাঁরা নারীকে কত বড়ো আসন দিয়েছেন। সম্মানও তো আর কেউ তেমন করেনি।"

"টুকটুক আসছে কবে।" স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন।

"যে কোনো দিন। আমাদের কাছেই থাকবে। বরাবর থাকলে তা আরো ভালো হয়। এ বয়সে আর কে আমাদের দেখাশুনা করবে? ভাস্কর? ভাস্কর তো বৌ নিয়ে মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্টে। শুনছি ব্রিগেডিয়ার হবে। ইংরেজরা এক এক করে উচ্চ পদ ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের এখনকার পলিসি হলো আর্মিটাকে ওদের সাগরেদ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া। গোরা ইংরেজের জায়গায় কালা ইংরেজ। যাতে ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা হয়। ভারতের স্বাধীনতায় ওদের আপত্তি নেই। যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে মেনে নেওয়াই তো বিজ্ঞতা। এবারকার যুদ্ধে এন্তার ছেলেকে কমিশন দেওয়া হয়েছে। তারা বেকার হলে তো শত্রুতা করবে। আর তাদের বহাল রাখতে গেলে নিজেদেরই হটতে হয়। সেটার জন্যে ওরা

মনে মনে প্রস্তুত। তবে ওদের পেনশন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সিভিলিয়ানদেরও ওই একই বক্তব্য। কিন্তু দেবেটা কে? হোম গভর্নমেন্ট না ভারত গভর্নমেন্ট? হোম গভর্নমেন্ট দীর্ঘকাল ধরে পেনসন ও ক্ষতিপূরণের দায় বইতে রাজী হবে না। বইতে হবে ভারত সরকারকেই। কোন্ ভারত সরকারকে? যারা বিদায় নিচ্ছে তাদের ভারত সরকার নয়। যারা ক্ষমতা বুঝে নিতে চায় তাদেরই সরকার। ক্ষমতার হস্তান্তর মানেই দায়িত্বের হস্তান্তর। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন করার জন্যে বড়লাট যে ব্যাকুল হয়েছেন তার কারণ এদেরই নিতে হবে পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত। রাজী হলে মিটমাট, নারাজ হলে বিচ্ছেদ। কংগ্রেস বা লীগ কেউ ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় না। শত্রুতার অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। মিত্রতার অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। আমরা মডারেটরা এইটেই কল্পনা করেছিলুম। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, লর্ড সিনহা কেউ তাঁবেদার ছিলেন না। তখনকার দিনে মহম্মদ আলী জিন্নাও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। তিনিও সমান স্বাধীনচেতা। পরিবর্তন তো মানুষ মাত্রেরই হয়। তাঁরও হয়েছে। গোখলের শিষ্য গান্ধীরও। দুঃখ এইখানে যে এঁদের মাঝখানে এখন দুস্তর ব্যবধান। গান্ধীজী যেমন বড়লাটের প্রতিপক্ষ জিন্না সাহেব তেমনি গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ। বিরোধীপক্ষই তো অলটারনেটিভ গভর্নমেন্ট গঠন করে। গান্ধীজী একদিন তা করবেন, কিন্তু জিন্না সাহেবের কী আশা। যদি না দেশ দু'ভাগ হয়। বাধা দিলে সিভিল ওয়ার। ফলাফল অনিশ্চিত। ইংরেজ তার আগেই কুইট করবে।" যশোবিকাশ অনুমান করেন।

স্বপনদা জানতে চায়, "জিন্নাকে কি আপনি চিনতেন?"

"চিনব না? তখনকার দিনে কংগ্রেস ছিল আমাদেরি হাতে গড়া। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, এ্যাটর্নি ও উকীলরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করতেন কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হবে, সভাপতি হবেন কে, পলিসি কী হবে। 'আমরা বিলেতফের্তা ক'টাই দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই।' স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল থাকতেন আমাদের এই পাড়ায়। কংগ্রেসের কাজ দেখাশুনা করতেন। গান্ধীজীর আত্মচরিতে যে ঘোষালবাবুর নাম আছে তিনি আর কেউ নন, জানকীনাথ। হ্যাঁ, তিনিও ব্যারিস্টার। সরলা দেবী তাঁরই কন্যা। কংগ্রেসের অধিবেশনে গান বাজনার ভার ছিল তাঁর উপরে। রবীন্দ্রনাথও গান গেয়ে শুনিয়েছেন। কংগ্রেস মুসলমানদেরও সভাপতি করত। মেম্বর তো করতই। জিন্না ছিলেন আমাদের তুরুপের তাস। ইংরেজদের বলতুম, এই দ্যাখ জিন্না আছেন আমাদের সঙ্গে। ইংরেজ মহলে তিনি অপ্রিয় ছিলেন। প্রিয় মুসলমানরা ঢাকায় শিক্ষা সম্মেলন করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে একটা চমক দেন। মুসলিম লীগ বলে একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন। খবরটা আসে রয়টারের মারফৎ লণ্ডন থেকে। ঢাকা থেকে সরাসরি নয়। তা হলে বোঝ কার কারসাজি। ওটা যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সেকেণ্ড ফ্রন্ট এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ওঁদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন যে মুসলমানদের দিতে হবে সেপারেট ইলেক্টোরেট। আমরা যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবী করেছিলুম তার পরিণতি হয় নির্বাচনের সময় হিন্দু মুসলমানের পৃথক ভোট। নির্বাচন জিতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যেতে হলে হিন্দু প্রার্থী মুসলিম ভোটারের দ্বারস্থ হবেন না, মুসলিম প্রার্থী হিন্দু প্রার্থীর দ্বারস্থ হবেন না। যে যার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে নির্বাচিত হবেন। জিন্নাকে বাধ্য হয়ে মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রে প্রার্থী হতে হয়। মুসলিম লীগের মেম্বর হতে হয়। তা হলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন না। তিনি দুই নৌকায় পা রেখেছেন কেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থে আমি কংগ্রেসে আছি। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মুসলিম লীগেও আছি? তখনকার দিনে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। ফলে জিন্না ছিলেন বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝখানে লখনউতে যে কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় সেটা ছিল টিলক ও জিন্নার যৌথ উদ্যোগে। লখনউতে আমিও উপস্থিত ছিলুম। লীগ সদস্যরা কংগ্রেসের অধিবেশনে আসেন, আমরাও যাই লীগ অধিবেশনে। টিলক

বলেন, 'হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজের ত্রিকোণীয় সংগ্রাম চলতে দেওয়া উচিত নয়। সংগ্রাম হবে এখন থেকে দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষে হিন্দু মুসলমান। অপর পক্ষে ইংরেজ।' সেটা কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মনের কথা। সে সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। পরে যখন সেটা হয় কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ তখন জিন্না বলেন, 'তার আগে আরো একটা কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট চাই।' টিলক জীবিত থাকলে সেটাই বোধ হয় পলিসি হতো। কিন্তু ইতিমধ্যে গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একবছরের মধ্যে স্বরাজ। উপরন্তু খেলাফৎ সমস্যার সুমীমাংসা। তা ছাড়া পাঞ্জাবের অন্যায়ের সুবিচার। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছিল অহিংস অসহযোগ। গণ সত্যাগ্রহ। তার জন্যে নির্বাচন বয়কট। আদালত বয়কট। আমি সেই সময় সরে পড়ি। জিন্না সাহেবও। কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট তো পার্লামেন্টারি রাজনীতির অঙ্গ। গান্ধীজী পার্লামেন্টারি রাজনীতি বর্জন করেন। পরে সি আর দাশ ও মোতিলাল নেহরুর খাতিরে স্বরাজ দলের সঙ্গে আপস করেন, কিন্তু জিন্নার সঙ্গে নয়। সেই ইস্তক গান্ধী জিন্নার মতভেদ ও পথভেদ বেড়েই চলেছে। জিন্না দাবী করছেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস মুসলিমরা লীগ মুসলিমদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারেন না, তাঁদের বিসর্জন না দিলে কোনো চুক্তিই সম্ভব নয়, কোনো চুক্তি সম্ভব না হলে ক্ষমতার হস্তান্তর একই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাতে পারে না, তার জন্যে চাই দুটো কেন্দ্রীয় সরকার, একটা হিন্দু নেশনের হোমল্যাণ্ডের ও আরেকটা মুসলিম নেশনের হোমল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। একটিমাত্র কেন্দ্রে কোয়ালিশন যদি একান্তই হয় তবে দুই পক্ষের প্যারিটি তার জন্যে অত্যাবশ্যক। কংগ্রেসকে সেটা মেনে নিতে হবে। নইলে লীগের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। সে সংঘর্ষের পথ ধরবে। সেই জিন্না আর এই জিন্না! চিনতেই পারা যায় না। মুখের চেহারা একই রকম আছে, কিন্তু মনের চেহারা বেবাক বদলে গেছে। টিলক মহারাজ যেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেইটেই আবার আমাদের সামনে— তিনকোণা সংগ্রাম। কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় অপসরণ করে তা হলে আর তিনকোণা নয়, দ্বিপাক্ষিক।" যশোবিকাশ তন্ময় হয়ে বলেন ও স্বপনদা একাগ্র চিত্তে শোনেন।

এর পরে আর জমে না। যশোবিকাশের হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। মেখলা দেবীরও। টুকটুকের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাই প্রথম কথা। ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা দ্বিতীয়।

স্বপনদা আর আইনের পরামর্শ চেয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চান না। তিনিও কন্যার জন্যে চিন্তিত। সেদিন এই শেষ।

ওদিকে দীপিকাদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁর কাছে বড়ো কথা কলকাতার ভবিষ্যৎ। মুসলিম লীগ যদি স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান চায় তবে তাকে কেবল হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির নয়, পাঞ্জাব, বঙ্গ ও আসামের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিরও মায়া কাটাতে হবে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তার ভাগে পড়বে না। তবে সে যদি নিতান্তই সেসব অঞ্চল হাতছাড়া করতে না চায় তা হলে তাকে সার্বভৌমতার মায়া কাটাতে হবে। সার্বভৌমতার প্রতীক ডিফেন্স, ফরেন এ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেগুলি তুলে দিতে হবে এক যৌথ গভর্নমেন্ট বা অথরিটির হাতে। সেটাও একপ্রকার কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুই উপরাষ্ট্রই তার অধীনস্থ। যেমন হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর। অবিভক্ত ভারতই অন্য ভাবে বহাল থাকবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব আর আসামও থাকবে অবিভক্ত।

"লেবার যে আমাদের কত বড়ো শুভানুধ্যায়ী এই পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। মুসলিম লীগ কিছুতেই অত ছোট পাকিস্তান ও অত বড়ো হিন্দুস্থানে রাজী হবে না। তা হলে ভারত ভাগের দাবী ত্যাগ করতে হয়। আর কলকাতার মায়া কাটানোও কি মুখের কথা? সুহ্‌রাবর্দী কি পারবেন বাংলা ভাগে রাজী হতে? আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে পাকিস্তান কলকাতা পাবে না। লড়াই করা বৃথা। কলকাতা

আমাদেরই থাকবে। আমরাও কলকাতায় থাকব।" দীপিকাদি বলেন।

"হ্যাঁ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমাকে আর বঙ্গভঙ্গ দর্শন করতে হবে না। এক জীবনে একবারই যথেষ্ট। ইংরেজদের উপর তোমার অবিশ্বাস জন্মেছিল। সেটা সেই কমিউনাল এ্যাওয়ার্ডের পর থেকে। এখন তুমি বুঝতে পারছ ওরা হিন্দুর উপর জাতক্রোধ নয়। কী ভোগানটাই ওদের ভোগানো হয়েছে ১৯৪২ সালের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে। এক দিকে জাপান, আরেক দিকে কংগ্রেস। কিন্তু তার জন্যে ওরা প্রতিশোধ নিতে চায় না। পেথিক-লরেন্স আর ক্রিপ্‌স গান্ধী ও নেহরুর পুরাতন বন্ধু।" স্বপনদা বলেন।

"পেথিক-লরেন্সের মতো ফেমিনিস্ট কি আর আছে? স্ত্রীর পদবী বহন করে চলেছেন। ওর নিজের পদবী তো পেথিক। লরেন্স পদবীটা ওঁর স্ত্রীর। হ্যাঁ, একেই বলে প্রেমের জন্যে ত্যাগস্বীকার। স্ত্রীরাই তো স্বামীর পদবী বহন করে বেড়ায়, স্বামীরা স্ত্রীর পদবী বহন করা দূরে থাক বিয়ের পরে রাখতেও দেয় না। যেমন তুমি।" দীপিকাদি খোঁটা দেন।

স্বপনদা জানতেন যে দীপিকাদি কট্টর ফেমিনিস্ট। বাবলী যেমন কট্টর কমিউনিস্ট। এ নিয়ে আগেও তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। ইংরেজ মেয়েরা আজকাল স্বামীর পদবী ধারণ না করে পিতার পদবীই রক্ষা করে। দীপিকাদি ইচ্ছা করলে দীপিকা ঘোষ লিখতে পারেন। কিন্তু স্বপনদাকে যদি বলেন গুপ্ত-ঘোষ লিখতে তা হলে সেটা হবে সুকুমার রায়ের হাঁসজারু বা হাতিমির মতো বিদ্ঘুটে। স্বামীর মতো স্ত্রীও হাস্যাস্পদ হবেন। আসলে ফেমিনিজম তত্ত্বটাই স্বপনদার পছন্দ নয়। এই যে মেয়েরা চাকরির জন্যে আজকাল ক্ষেপেছে এটা বিবাহের সঙ্গে বেখাপ। টুকটুক তার নবতম নিদর্শন। স্বামী আর সন্তান নিয়েই মেয়েদের জীবন।

আজ এ নিয়ে আর তর্ক না করে স্বপনদা বলেন, "পেথিক-লরেন্স ব্যারিস্টার, ক্রিপ্‌স ব্যারিস্টার, গান্ধী ব্যারিস্টার, নেহরু ব্যারিস্টার, পাটেল ব্যারিস্টার, জিন্না ব্যারিস্টার, লিয়াকৎ আলী ব্যারিস্টার। ওদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীও ব্যারিস্টার। এই ক'জন ব্যারিস্টারই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ইতিহাসের নির্বন্ধ। অখণ্ড ভারত বা দ্বিখণ্ড ভারত যেটাই হোক না কেন সিদ্ধান্তটা ব্যারিস্টারদের হাতে। নেহরু ও পাটেলকে বাদ দিয়ে হিন্দুস্থান সরকার হয় না। জিন্না আর লিয়াকৎকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান সরকার হয় না। তোমাকে মানতেই হবে যে ব্যারিস্টোক্রাসীর যুগ যায়নি ও যাবে না। ডেমোক্রাসী, বুরোক্রাসী আর ব্যারিস্টোক্রাসী এই তিনটি যেন এক বৃন্তে তিনটি ফুল। যেমন বিলেতে।"

দীপিকাদি রসিকতা করে বলেন, "এ যে দেখছি অষ্টবজ্র সম্মিলন। এর ফল হবে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী বসবে কি-না সন্দেহ। ইণ্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন করতে পারা যাবে কি-না সন্দেহ। ক্যাবিনেট মিশন সফল হবে কি-না সন্দেহ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ঘোরতর নৈরাজ্যের মধ্যে আইন আদালত টিকে থাকবে কি-না সন্দেহ। ঘোলা জলে কমিউনিস্টরা মাছ ধরবে কি-না সন্দেহ। সারা জীবনের তপস্যা ব্যর্থ হলে গান্ধীজী বেঁচে থাকবেন কি-না সন্দেহ। স্টালিন তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন কি-না সন্দেহ। স্টালিন এলে ট্রুমানও আসবেন নিঃসন্দেহে। ক্যাবিনেট মিশন প্রত্যাবর্তন করছেন। কিন্তু শিখদের তুষ্ট করবার জন্যে কী উপায় করছেন? ওরা কি সহ্য করবে?"

॥ উনিশ ॥

দীপিকাদির মনে শান্তি, স্বপনদার অশান্তি। ক্যাবিনেট মিশন তৃতীয় কোনো বিকল্প রাখেননি। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে পারবে না। হিন্দুরা চাইবে তাকে হিন্দুস্থানের সামিল করতে, মুসলমানরা চাইবে পাকিস্তানের সামিল করতে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান যদি একই কেন্দ্র মেনে নেয় তবে

বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকবে, কিন্তু জিন্না যদি পাকিস্তানের জন্যেও প্যারিটি দাবী করেন তবে কংগ্রেস কিছুতেই রাজী হবে না। প্যারিটি মানে ব্যালান্স অভ্‌ পাওয়ার। ব্যালান্স অভ্‌ পাওয়ার কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না বলেই জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত। বার্লিন দ্বিধাবিভক্ত। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশও দ্বিধা হবে। সীতার মতো স্বপনদাও পাতালপ্রবেশ করবেন। আর একটি লাইনও লিখবেন না। কার জন্যে লিখবেন? বাঙালীর জন্যেই লেখা, বাঙালীর ভাষাতেই লেখা। বাঙালী কোথায়? তার ভাষা কোথায়? এ কি সেই বাঙালী? এ কি সেই ভাষা? কলকাতা বার্লিনের মতো ভাগ হবে না। এই যা সান্ত্বনা। পূর্ব বঙ্গ? সে কি থেকে যাবে প্রহরীবেষ্টিত সীমান্তের ওপারে?

পূর্ব বঙ্গের জন্যে দীপিকাদির মাথাব্যথা ছিল না। ওখানে যত মুসলমান আছে আরব উপদ্বীপে, তুরস্কে বা ইরানেও তত নেই। ওরা যদি মনে করে ওরাও সেই রকম একটি নেশন তবে ওরাও একটি নেশন। নেশন শব্দটার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নাই। তা যদি থাকত ইহুদীরা বলত না যে ওরাও একটি নেশন। কখনো দেশ থেকে নেশন হয়, কখনো নেশন থেকে দেশ হয়। ইহুদীরা চলেছে দেশের সন্ধানে প্যালেস্টাইনে। ওদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বিরলবসতি কোনো দ্বীপে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে। ওরা কর্ণপাত করেনি। প্যালেস্টাইন ওদের পূর্বপুরুষের দেশ। সেইখানেই ওরা হোমল্যাণ্ড পুনরুদ্ধার করবে। ভারতের মুসলমানরাও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। তারা পূর্বপুরুষের দেশে ফিরে যেতে পারছে না, কারণ সে সব দেশ তো একটি নয়, বহুসংখ্যক। কতক আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা ভারতের ভিতরেই তাদের হোমল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করবে। হিন্দুদের বেলা দেশ থেকে নেশন। মুসলমানদের বেলা নেশন থেকে দেশ। ইতিহাসে এর নজির আছে। তুর্করা তো তুরস্কের আদি অধিবাসী ছিল না। তুরস্কও ছিল না তার নাম। মধ্য এশিয়ার তুর্করা সদলবলে গিয়ে বলপূর্বক সে দেশ অধিকার করে দেশের নাম তুরস্ক রেখেছে। হাঙ্গেরীর নামকরণ হান বা হুন থেকে। তারাও গেছে এশিয়া থেকে।

"ওরা যদি কলকাতা ছেড়ে দেয় আমিও ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী যশোর ছেড়ে দিতে রাজী আছি। গৃহযুদ্ধ আমি এড়াতেই চাই। কিন্তু কলকাতা দাবী করলে যুদ্ধং দেহি। তোমাকে নোটিশ দিয়ে রাখলুম। না, বার্লিনের মতো কলকাতা ভাগ করতে দেব না। কিন্তু বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব।" দীপিকাদি বলেন।

"সেটাও তো বাঙালী জাতির পক্ষে অগৌরবের বিষয়। যেমন জার্মান জাতির পক্ষে। তোমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না? অগৌরবের বিষয় নিয়ে কি কোনো কালে কালজয়ী নাটক উপন্যাস লিখতে পারা যাবে? উত্তর-পুরুষকে আমরা জগৎ কবিসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেব কী করে? কী সাহিত্যকীর্তি নিয়ে তারা ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দেবে? ব্যাড বার্গেন। ভেরি ব্যাড বার্গেন। এর চেয়ে ঢের ভালো স্বাধীন সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলাদেশ।"

"তার মানে প্রকাশ্য পাকিস্তান নয়, প্রচ্ছন্ন পাকিস্তান। মুসলিম মেজরিটিই স্থির করবে ফরেন পলিসি, ওয়ার অ্যাণ্ড পীস। হিন্দু মাইনরিটি ভুলের মাশুল দেবে। স্বাধীন বাংলাদেশ যদি ব্রিটেনকে মিলিটারি বেস দেয় তা হলে ফোর্ট উইলিয়ামে আবার গোরা ফৌজ মোতায়েন হবে। ব্রিটেন যদি আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশও আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সেটা মুসলমানদের পক্ষেও খারাপ হবে। কিন্তু ওরাও পারবে না পলিসি বদল করতে। ওরা যদি স্বতন্ত্র স্বাধীনতা চায় তো পূর্ববঙ্গ নিয়ে সন্তুষ্ট হোক। আমরা ওদের দিকে তাকাব না। চোখ ফিরিয়ে নেব। ওরা যাকে খুশি তাকে খাল কেটে ঘরে ডেকে আনতে পারবে। পরে পস্তাবে।" দীপিকাদি বলেন।

স্বপনদাকে স্বীকার করতে হয় যে পাকিস্তানী মানসিকতা যেখানে এত ব্যাপক সেখানে বাঙালী মানসিকতা পাত্তা পাবে না। কিন্তু এর একটা ভালো দিকও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনেও

ধর্মকে অবলম্বন করে নেশনবোধ জাগে। সেই নেশনবোধকে অবলম্বন করে সাহিত্যে ও জীবনে নব জাগরণ হয়। নেশনবোধ থাকলে মুসলমানদের মধ্যেও সাহিত্যে ও জীবনে নব জাগরণ আসত। হিন্দুরা এখন আর ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পায় না। পৌরাণিক নাটক দেখে না। পৌরাণিক কাব্য লেখে না। উপন্যাসেও ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ। মুসলমানদেরও ধর্মের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে। নইলে তাঁদের কাব্য, উপন্যাস, নাটক তাদের দেশের মানুষ পছন্দ করবে না।"

"তোমার সঙ্গে এখানে আমি একমত। তোমার মতো আমি ঐতিহাসিক নিয়তি মানিনে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্তন মানি। বিবর্তন বাঙালী হিন্দুকে যে যুগে উপনীত করেছে বাঙালী মুসলমানকে সে যুগে উপনীত করেনি। অন্তত অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। ইংরেজদের ভেদনীতির উপরেই আমরা এতদিন সবটা দোষ চাপিয়েছি। সেটা পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধসত্য। যে কোনো কারণেই হোক ওরা অর্ধ শতাব্দী ব্যবধানে রয়েছে। ধর্মের ব্যবধানই একমাত্র ব্যবধান নয়। যুগের ব্যবধানও একটা ব্যবধান ও আমার মতে আরো দুস্তর ব্যবধান। কামাল পাশা তুর্কদের আধুনিক যুগে পৌঁছে দিয়েছেন। তেরশো বছরের পুরনো খেলাফৎ থেকে মুক্ত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকেও খেলাফৎ রহিত হয়েছে। কামাল তেমনি স্বদেশকে শরিয়তী আইন থেকেও মুক্ত করেছেন। সেটাও এক অর্থে যুগপরিবর্তন। প্রবর্তন করেছেন সুইস আইন। ফলে সমাজকেও তিনি মোল্লাদের শাসন থেকে মুক্ত করেছেন। পাকিস্তানেও তাঁর মতো মুক্তিদাতার আবির্ভাব হবে। জিন্না সাহেব তাঁর জন্যে পথ তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তি বলতে তিনি বোঝেন তাঁর এক নম্বর শত্রু গান্ধীর কবল থেকে মুক্তি। গান্ধী যেমন বোঝেন তাঁর এক নম্বর শত্রু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কবল থেকে মুক্তি। দু'জনেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। যদি না গৃহযুদ্ধ বেধে যায় ও ইংরেজ আটকা পড়ে।" দীপিকাদি বলেন।

"আমি কিন্তু অতখানি আশাবাদী নই। ক্যাবিনেট মিশনের স্কীম যদি খারিজ হয় তা হলে হয় পার্টিশন, নয় গৃহযুদ্ধ। অথবা একই সঙ্গে দুই। ইংরেজরা কি অনন্তকাল অপেক্ষা করবে? কংগ্রেসকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যোগ দিতেই হবে। ইন্টারিম গভর্নমেন্টেও অংশ নেওয়া চাই। গৃহযুদ্ধ বাধাবার সঙ্কেত কংগ্রেস যেন না দেয়। দিলে দেবে লীগ। কিন্তু সে-ই বা কেন দেবে?" স্বপনদা অবিশ্বাস করেন।

দু'জনেরই ভাবনা বাংলাদেশকে ঘিরে বা কলকাতাকে ঘিরে। আসামের দিক থেকে কেউ ভেবে দেখেননি। ওরা ওদিকে তারস্বরে চিৎকার করছে যে আসাম গেল! আসামকে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে গ্রুপ গঠন করা হয় তবে সেই গ্রুপে দুই প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা দাঁড়াবে একুনে শতকরা পঞ্চাশের উপর। তারাই তাদের ভোটাধিক্যে আসামের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে তাদের ভোটাধিক্যে আসামকে বানাবে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপনিবেশ। অসমীয়ারা যেমন ভয় করে বাঙালী মুসলমানদের তেমনি ভয় করে বাঙালী হিন্দুদেরও। গ্রুপের হাতে ভাগ্য সমর্পণ যেন ডাইনীর হাতে সন্তান সমর্পণ। ওদের আপত্তি অহেতুক নয়।

কংগ্রেসকে ওদের আপত্তি বিবেচনা করতে হয়। ক্যাবিনেট মিশন আশা দেন আসাম ইচ্ছা করলে পাঁচ বছর বাদে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি গ্রুপ কনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে থাকে ও প্রাদেশিক কনস্টিটিউশন পালটে দেওয়া হয়ে থাকে তবে নবগঠিত আসাম গভর্নমেন্ট বেরিয়ে যেতে চাইবে না, চাইলেও গ্রুপ গভর্নমেন্ট বেরিয়ে যাবার দুয়ার খোলা রাখবে না। কিন্তু এইটুকু কারণে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের গোটা স্কীমটা বর্জন করতে চায় না। ব্যাপারটার চুলচেরা বিচারের জন্যে ফেডারল কোর্টে পাঠানো স্থির করে। কেননা মিশনের স্টেটমেন্টের ভাষায় কিছু ত্রুটি ছিল। মিশন যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে তার থেকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য ব্যাখ্যা অনুসারে আসাম আদৌ

না ঢুকতেও পারে। না ঢুকলে তাকে বাধ্য করতে পারা যাবে না।

গান্ধীজী তো আসাম কংগ্রেস নেতাদের সরাসরি পরামর্শ দেন কংগ্রেস ত্যাগ করতে। তা হলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ মানতে হবে না। আসাম গভর্নমেন্ট কংগ্রেস দলের গভর্নমেন্ট। কংগ্রেস ত্যাগ করলে কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত মন্ত্রীরা গভর্নমেন্ট ত্যাগ করতে সম্মানবদ্ধ। তা হলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তাঁদের জায়গায় যাঁরা মন্ত্রী হবেন তাঁরা গ্রুপে ঢুকতে রাজী হতে পারেন। কয়েকটা ভোট ভাঙিয়ে নিতে পারলে লীগ নেতা সাদুল্লা সাহেব গভর্নমেন্ট গঠন করতে পারবেন। গান্ধীজী সেদিক থেকে ভাবেননি। ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বজায় রাখতে চান। মন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন না। জনমতও তার পক্ষপাতী নয়।

ক্যাবিনেট মিশন কেন্দ্রকে ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে চান। গান্ধীজীরও এতে সায় ছিল। তিনিই তো এর প্রথম প্রবক্তা। কংগ্রেসে নেতারা মনে করেন কেন্দ্রের হাতে আরো কয়েকটা বিষয় না থাকলে কেন্দ্র শক্ত সমর্থ হবে না। নিচের তলা থেকে সহযোগিতা না পেলে কেন্দ্র অচল হবে। শেষে ভেঙে পড়বে। জিন্না ঠিক সেই ভাঙনটার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করবেন। আরো আগেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এটা একটা তুচ্ছ কারণ নয়, গুরুতর কারণ। এই কারণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের স্কীম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের হাত চেপে ধরেন। ক্যাবিনেট মিশন বলেননি যে তাঁদের স্কীম গ্রহণ করতেই হবে। অগ্রাহ্য করার স্বাধীনতা কংগ্রেসের আছে। কিন্তু ক্রিপ্‌সকে দ্বিতীয়বার খালি হাতে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর মুখরক্ষা করতে হবে। কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন-সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এটা বড়লাটকে হতভম্ব করে দেয়।

লর্ড ওয়েভেল সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের জন্যে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি কেন্দ্রে রদবদল ঘটাতে উদ্‌গ্রীব। যেটা চার বছর আগে সম্ভব ছিল না সেটা এবার সম্ভব হবে। জঙ্গীলাটকে বাদ দিয়ে ভারতীয়দের একজনকে ডিফেন্সের ভার দেওয়া হবে। তিনিই হবেন ভারতীয় ফৌজের সর্বোচ্চ পরিচালক। ইংরেজ সেনাপতিদেরও উপরওয়ালা। এতেই সূচনা করছে যে ব্রিটিশ সৈন্য অচিরে ভারত ত্যাগ করবে। বাকী রইল বড়লাটের ভীটো দানের ক্ষমতা। সেটা তিনি আপাতত হস্তান্তর করবেন না। কিন্তু ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। তাঁর গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেই এখন যেমন দায়ী পরেও তেমনি দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে নয়।

কংগ্রেস এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করে না। কিন্তু বড়লাট যখন লীগের মুখ চেয়ে প্যারিটির প্রস্তাব করেন তখন কংগ্রেস বেঁকে বসে। সমগ্র দেশে মুসলমান যতজন হিন্দু তার প্রায় তিন গুণ। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ সদস্য যতজন কংগ্রেস সদস্য তার দু'গুণ। প্যারিটি কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? কংগ্রেস নারাজ হয়। তখন বড়লাট পাঁচজন মুসলমান, পাঁচজন বর্ণ হিন্দু ও একজন তফসীলী হিন্দু নিয়ে সমস্যার মীমাংসা করতে চান। জিন্না সাহেব কী করবেন? মেনে নেন। নইলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা এগোয় না। এগোয় কংগ্রেসের সঙ্গে।

· ক্যাবিনেট মিশন পাকিস্তানের আর্জি খারিজ করেছেন, বড়লাট প্যারিটির আর্জি। বাকী থাকে মুসলিম লীগের অসপত্ন মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবী। কংগ্রেস যখন একজন মুসলমানকে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে তার জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলির একটি দিতে চায় জিন্না তখন বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে বলেন, কিছুতেই না। কংগ্রেস হিন্দুদের দল, হিন্দুর জায়গায় মুসলমান পাঠাতে পারে না। কংগ্রেস বলে, মুসলমান তো কংগ্রেসের আদিকাল থেকেই কংগ্রেসে আছেন। কেউ কেউ প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। যেমন

বদরুদ্দীন তৈয়বজী, রহিমতুল্লা সায়ানী, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলী। মহম্মদ আলী জিন্নাও হতে পারতেন, যদি কংগ্রেস না ছাড়তেন। এখনো একটা প্রদেশ শাসন করছেন কংগ্রেস মুসলিম মন্ত্রীরা। কেন্দ্রে অনধিকারী হলে প্রদেশেও তো তাঁরা অনধিকারী হবেন। তবে কি তাঁদেরও গদী ছাড়তে হবে? কংগ্রেসের ভাগ থেকে একটি আসন যদি কংগ্রেস একজন মুসলমানকে দেয় লীগের ভাগ তো কমে না। বরং হিন্দু মুসলমান সমানসংখ্যক হয়। ইসলামের উপর আঘাত এলে সব মুসলমান একজোট হয়ে প্রতিরোধ করবেন।

বড়লাট কংগ্রেসকে অনুরোধ উপরোধ করেন এই নিয়ে সে যেন পীড়াপীড়ি না করে। জিন্না এক্ষেত্রে অটল অনড়। নিজের দলের একজন মুসলমানকে মনোনয়ন করার অধিকার কংগ্রেসের আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগ না করাই বিজ্ঞতা। অমন করলে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট দ্বিদলীয় হবে না, একদলীয় হবে। সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে। গণ্ডগোল বাধবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটকে জানায় কংগ্রেসের পক্ষে নিজের মৌল নীতি বিসর্জন দেওয়া সঙ্গত নয়। অমন করলে প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাবে। কংগ্রেস ভেঙে গেলে ক্ষমতা নিয়ে কী হবে? কংগ্রেস ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যোগ দেবে না।

তা হলে দাঁড়াল এই যে, ক্যাবিনেট মিশনের মুখ রক্ষার জন্যে কংগ্রেস কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে বসতে রাজী, কিন্তু বড়লাটের মুখ রক্ষার জন্যে তাঁর শাসন পরিষদে বসতে রাজী নয়। কংগ্রেস নেতারা না থাকলে পেনসন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি একতরফা গ্রহণ করা যাবে না। ব্রিটিশ অপসরণের পর সিভিল ও মিলিটারি অফিসারদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস নেতারা বলতে পারেন, মুসলিম লীগ দিতে চায় দিক, কংগ্রেস দেবে না। বড়লাট পড়ে যান বেকায়দায়। এখন যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হয় তবে পরে কখন হবে? তখন কি কংগ্রেস নেতারা ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যোগদানের জন্যে চড়া দর হাঁকবেন না? পাল্লা দিয়ে লীগ হাঁকবে আরো চড়া দর। কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারা যাবে না। হয় নির্দলীয় সরকার চালাতে হবে, নয় একদলীয় সরকার চালাতে হবে, আর নয়তো এক একটি প্রদেশ এক একটি দলকে দিয়ে কেন্দ্রের সুবন্দোবস্ত না করেই ভঙ্গ দিতে হবে।

জিন্না সাহেব অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে বড়লাটের আমন্ত্রণ আসবে, তিনি কংগ্রেস নেতাদের অবর্তমানে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট জুড়ে বসবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাঁর দলের ভাগেই পড়বে। কংগ্রেস যদি পরে আসে আর সব পাবে, কিন্তু সেগুলি নয়। তিনি যা ডিকটেট করবেন ওয়েভেল তাই শুনবেন। তাঁর নির্দেশে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের কংগ্রেস মুসলিম গভর্নমেন্টের পতন হবে, তার পরে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট মুসলিম কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের, পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ গভর্নমেন্ট ভিন্ন আর কোনো গভর্নমেন্ট থাকবে না। আরো পরে আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট খতম হবে, তার জায়গায় নেবে লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। অমনি করে পূর্বপাকিস্তানেও মুসলিম লীগ নিষ্কন্টক হবে। অবশেষে দুই পাকিস্তান মিলিয়ে এক পাকিস্তান। পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে তিনি হিন্দুস্থানের কর্তাদের সঙ্গে বার্গেন করবেন। সর্বত্র কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট হবে। কংগ্রেস মুসলিম বাদে।

বড়লাট জিন্না সাহেবকে জানিয়ে দেন, আপাতত ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন করা সমীচীন হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে তলিয়ে দেখতে হবে। সময় লাগবে। ইন্টারিম গভর্নমেন্টের বদলে গঠিত হবে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট। আকারে ছোট। সদস্যরা সবাই সরকারী কর্মচারী। পরে তাঁরা পদত্যাগ করবেন। এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা।

জিন্না সাহেব তো ক্ষেপে লাল। বড়লাট তাঁকে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না। কথা ছিল কংগ্রেস আসুক আর না আসুক লীগ আসবেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে তাঁর কথার কোনো দাম নেই। তিনি

কংগ্রেসের সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে লীগের সহযোগিতাও উপেক্ষা করবেন। অপেক্ষার অর্থ উপেক্ষা। তাঁর জীবনে রাজকুলের উপেক্ষা এই প্রথম। বড়লাটের সকাশে তিনি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানান। যে পার্টি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যেতে রাজী হবে সেই পার্টি ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যাবার হকদার হবে, এই তো ছিল শর্ত। তিনি এ শর্ত পূরণ করেছেন, এর জন্যে পাকিস্তানের দাবী ত্যাগ করেছেন, প্যারিটির দাবী ত্যাগ করেছেন, আর কত ত্যাগ করবেন? অসপত্ন মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই কারণে যদি কংগ্রেস বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগদান না করে সেটা কার দোষ? কংগ্রেস তো এমনিতেই যোগদানের হকদার নয়, যেহেতু সে বঙ্গ ও আসামকে এক গ্রুপভুক্ত করতে দ্বিধান্বিত। কংগ্রেসের দোষে কি লীগের সাজা হবে?

স্বপনদার বন্ধু মীর আবদুল লতিফ স্বপনদাকে বলেন, "নেহরুও আসছেন না, জিন্নাও আসছেন না। বেসরকারী সদস্যদেরও বড়লাট বিদায় দিয়েছেন। কেয়ারটেকার হবেন জনা কয়েক বাছা বাছা সিভিলিয়ান। তাই এর নাম কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট। এদিকে হিন্দু মুসলিম টেনসন বেড়েই চলেছে। তবে ইঙ্গ-ভারতীয় টেনসন কমেছে। গান্ধীজী জয়প্রকাশ নারায়ণকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন। বামপন্থীরা শান্ত। কংগ্রেসের দিক থেকে কোনো গোলমাল বাধবে না। গান্ধীজী বাধতে দেবেন না। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের বলেছেন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী হচ্ছে গণ সত্যাগ্রহের পরিবর্ত। আপাতত বছর দুই নতুন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে মনোনিবেশ করা যাক। ইংরেজরা দু'বছর সময় নিক। এর তাৎপর্য বুঝতে পারছেন?"

"না, মীর সাহেব। রাজনীতি আমি বুঝিনে। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে শুনতে চাওয়া।" স্বীকার করেন স্বপনদা।

"গান্ধীজীর পরামর্শ হয় কংগ্রেসকে ইন্টারিম গভর্নমেন্টে নেওয়া হোক, নয় লীগকে। দুই সতীনকে একই বাড়ীতে রাখলে তারা বিস্ফোরণ ঘটাবে। কংগ্রেস ক্ষমতার জন্যে লালায়িত নয়, লীগ যদি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তবে লীগকেই আমন্ত্রণ করা হোক। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসেরই নিরঙ্কুশ মেজরিটি। অবশ্য মনোনীত সদস্যরা যদি নিরপেক্ষ থাকেন। বাজেট অধিবেশনে লীগ হেরে যাবে। বড়লাট বোধ হয় সেই আশঙ্কায় জিন্না সাহেবকে আমন্ত্রণ করছেন না। আবার, কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করতে তিনি পেছপাও। কংগ্রেস যদি যায় একজন কংগ্রেস মুসলিমকেও সঙ্গে নেবে। জেলযাত্রার দিন যারা সহযাত্রী রাজসভাযাত্রার দিন তারা বিবর্জিত, এ কী রকম বিচার? এ কি সেই পথি নারী বিবর্জিতা?" মীর সাহেব উচ্চহাস্য করেন।

স্বপনদা বিস্মিত হয়ে বলেন, "তা হলে কি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টই দু'বছর পায়চারি করবে? যতদিন না নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হয়।"

"না, না, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কোথাও বেশী দিন কাজ করে না। এমন সব গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা নেওয়া কেয়ারটেকারদের কর্ম নয়। ওই ইন্টারিম গভর্নমেন্টই গঠন করতে হবে। সেটারই মেয়াদ হবে দু'বছর কি তিন বছর। কংগ্রেসকে বাদ দিলে মেজরিটিকে বাদ দেওয়া হবে। আবার, মাইনরিটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। মুসলিম, শিখ, খ্রীস্টান এই তিন মাইনরিটিই থাকবেন। উপরন্তু পার্শী। তাঁদের তো আর কোনো দেশ নেই। আর তাঁরা গোড়া থেকেই কংগ্রেসে আছেন। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা এঁরাই তো একদা কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ ছিলেন। 'স্বরাজ' আমাদের লক্ষ্য, কার কণ্ঠে এটা প্রথম উচ্চারিত হয়? দাদাভাই নওরোজীর সভাপতির অভিভাষণে। চল্লিশ বছর পূর্বে। সেই রকম সময়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। এতদিনে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। স্বরাজের পালটা লক্ষ্য হয়েছে পাকিস্তান। দাদাভাইয়ের রাজনৈতিক শিষ্য জিন্নার এই রূপান্তর। দাদাভাই যাকে স্বরাজ বলেন জিন্না তাকে বলেন হোম রুল। হোম রুল লীগ বলে একটা প্রতিষ্ঠানের হন সভাপতি। গান্ধীজী

তখন ছিলেন তার উপসভাপতি বা সেইরকম কিছু। তাই আজকের গান্ধীপ্রাধান্য তাঁর চক্ষুঃশূল।" মীর সাহেব বলেন।

"হোম রুল কথাটা এল কোন্‌খান থেকে? আয়ারল্যাণ্ড থেকে। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের অনুসরণে ইণ্ডিয়ান হোম রুল আন্দোলন। মিসেস বেসান্ট ছিলেন অন্যতম নেত্রী। তাঁরও ছিল আর একটি হোম রুল লীগ। আইরিশরা হোম রুল পেতে যাচ্ছে, ব্রিটেন দিতে তৈরি, এমন সময় আলস্টারের প্রটেস্টান্টরা পাল্টা আন্দোলন শুরু করে দেন। তাঁরা ক্যাথলিক মেজরিটির আধিপত্য মানবেন না, তাঁদের জন্যে চাই স্বতন্ত্র একটি খণ্ড। সেটা হবে ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত। কার্সন তার প্রবক্তা। বিখ্যাত ব্যারিস্টার। আমার মনে হয় জিন্না সাহেব আইরিশ হোম রুল চেয়েছিলেন, এখন হিন্দু আধিপত্যের ভয়ে কার্সনের অনুকরণে আলস্টার অর্থাৎ পাকিস্তান চাইছেন। আইরিশ হোম রুলের নেতারা শেষ মুহূর্তে আপস করেন। আইরিশ ফ্রী স্টেটের দোসর হয় নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড। স্বাধীন নয়, স্বতন্ত্র। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান যদি বিচ্ছিন্ন হয় তবে ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত হবে। আরো এক ডোমিনিয়ন।" স্বপনদার আন্দাজ।

মীর সাহেব এ লাইনে চিন্তা করেননি। মনের মধ্যে তলিয়ে যান। তার পরে বলেন, "সম্ভবত তাই হবে। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমে ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানের আউটলাইন রয়েছে। জিন্না যদি তাতেই তুষ্ট হন তবে তারই সম্ভাবনা আছে। বৃহত্তর পাকিস্তানের নয়। কলকাতা তাঁর নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমান কি সত্যি তাই চায়? আমার সন্দেহ আছে। তার প্রগতি আবার এক পুরুষ পেছিয়ে যাবে।"

স্বপনদা তা শুনে বলেন, "তাই যদি হয় তবে সেই ওদের ঐতিহাসিক নিয়তি। আমার স্ত্রী কিন্তু আমার সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক বিবর্তন।"

"মানুষ যেটা স্বেচ্ছায় বেছে নেয় সেটা তার নিয়তি নয়। ওরা যদি স্বেচ্ছায় দেশের একভাগ ও প্রদেশের একভাগ বেছে নেয় তবে সেটা নিয়তি নয়, অপশন। এটা রেফারেণ্ডাম করে অপশন দিতে হবে। জিন্নার উপরে যেন সেটা ছেড়ে দেওয়া না হয়। লীগের উপরেও না।" মীর সাহেবের অভিমত।

"কেন? এবারকার নির্বাচন কী পাকিস্তান অর্জনের ম্যাণ্ডেট নয়? লীগ তো প্রায় সব ক'টা মুসলিম আসন জিতেছে। কৃষক প্রজা দলের আসন সংখ্যা নগণ্য।" স্বপনদা বলেন।

"সেকথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তান কত বড়ো বা কত ছোট সেটা তো ভোটারদের জানানো হয়নি। তারা ধরে নিয়েছে গোটা বাংলাদেশটাই হবে পাকিস্তানের সামিল। হিন্দুদের ভাগ দিতে হবে না। চোখ বুজে যারা ভোট দিয়েছে চোখ খোলা রেখে তারা ভোট দিক, তা হলেই বোঝা যাবে তারা ছোট পাকিস্তান চায় না বড়ো পাকিস্তান। যার ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যৌথ।" মীর সাহেব বিশদ করেন।

"তা হলে আবার সেই হিন্দু প্রাধান্য মেনে নিতে হলো। প্যারিটি তো হিন্দুপ্রধান গ্রুপের সঙ্গে মুসলিমপ্রধান দুই গ্রুপের হতে পারে না। মুসলিম লীগ কী তাতে রাজী হবে? আমার মনে হয় বাঙালীর নিয়তি আগে থেকেই স্থির হয়ে রয়েছে। ওরা জার্মানদের মতো ভাগ হয়ে যাবেই। কলকাতা যদি বার্লিনের মতো ভাগ না হয়ে যায় তবেই আমি বাঁচি।" স্বপনদা বলেন।

"দেখুন, গুপ্তসাহেব, আপনি ধরে নিয়েছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আর একটি ইউরোপ, বাংলাদেশ হচ্ছে তার জার্মানী আর কলকাতা হচ্ছে তার বার্লিন। এই ধারণাটাই ভুল। তাই আপনি মনে মনে প্রমাদ গণছেন। মুসলমানরা হিন্দুদের মতোই ভারতময় ছড়ানো। তারা কেউ মন থেকে পাকিস্তান বলে একটা পৃথক রাষ্ট্র চায় না, কারণ তা হলে তারা দিল্লী আগ্রা লখনৌ, পাটনায় পরদেশী বনে যাবে। তারা বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী থেকেও আস্তানা গুটোবে। অথচ বোম্বাইতে জিন্না সাহেবের বিরাট ভবন। সারা

জীবনের সঞ্চয় দিয়ে তিনি ওই প্রাসাদ তৈরি করেছেন। না, ওটা প্রাণ ধরে ত্যাগ করবেন না। মেয়েকেও দেবেন না। তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। শুনেছেন বোধহয় তাঁর মেয়ে যাকে বিয়ে করেছে সে পার্সী খ্রীস্টান। জবাহরলাল তাঁর জামাতাকে গ্রহণ করেছেন, জিন্না কিন্তু তাঁর জামাতাকে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করলে নেতৃত্ব হারাতেন।"

"জবাহরলাল তাঁর নেতৃত্ব হারাতেন না?" স্বপনদা সুধান।

"হারাতেন, যদি গান্ধীজী ইন্দিরার বিবাহের বিপক্ষে দাঁড়াতেন। তিনি সায় দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে হিন্দু মুসলমান পার্সী খ্রীস্টানকে জুড়ে জুড়ে এক নেশন গঠন করা যাবে না। পাতানো সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। রক্ত সম্পর্কও অত্যাবশ্যক। জার্মানরা এটা মানতে চায়নি। ইহুদীরাও কি মানতে চেয়েছে? এই নিয়ে কত বড়ো অনর্থ ঘটে গেল হিটলারের আমলে। আকবরের নীতি সফল হলে হিন্দু মুসলমানের জাতিবৈর এতদিনে মিতালীতে পরিণত হত। হিন্দু হিন্দুই থাকত, মুসলমান মুসলমানই থাকত, কিন্তু অসংখ্য পরিবার আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতো। অতীতের জন্যে আফসোস করে ফল নেই। ভবিষ্যতের দিকেই দৃষ্টি রাখা যাক। যা বলছিলুম, মুসলমানরা মন থেকে হিন্দুদের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ কামনা করে না। জিন্না সাহেবের কাছে পাকিস্তান হচ্ছে বার্গেনিং কাউন্টার। তিনি যদি সমান শর্তে পার্টনারশিপ পান তবে পার্টিশন মুলতুবি রাখবেন। গান্ধীজী যদি সমান শর্তে পার্টনারশিপে রাজী হন তা হলে ক্ষমতার হস্তান্তর কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত হস্তে হবে। স্বাধীনতার আনন্দ হিন্দু মুসলমান সমানে উপভোগ করবে। আর নয়তো হিন্দুর কাছে যা স্বাধীনতা মুসলমানের কাছে তা নতুন এক পরাধীনতা। ওরা বিদ্রোহের নিশান তুলবে। সেটা নেবে গৃহযুদ্ধের আকার। জিন্না সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান দাবী করবেন। মুলতুবি রাখবেন না।" মীর সাহেব দুঃখিত।

"আপনারা ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরাও তাঁর শিবিরে যাবেন? ইউনিয়নিস্ট মুসলিমরাও?" স্বপনদা জেরা করেন।

"আমরা পড়ে যাব বিষম দোটানায়। সেটা পরিহার করাই কর্তব্য। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আর কোথাও না হোক বাংলাদেশে একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গড়ে ওঠে। কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। শহীদও তাই চায়, কিরণশঙ্করও তাই। কিন্তু দুই হাই কমাণ্ড অনড় অটল। কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হবে যে মুসলিম লীগই মুসলিম নেশনের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস শুধু হিন্দু নেশনের। মুসলিম নেশন আর হিন্দু নেশনের মধ্যে সমতা রক্ষা করাও চাই, কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। তাদের সম্পর্ক মেজরিটি মাইনরিটির নয়, দুই মেজরিটির। যে যার ক্ষেত্রে মেজরিটি। এসব তত্ত্ব যদি কোয়ালিশনের পূর্বশর্ত হয় তবে তো কোয়ালিশনের কোনো আশাই থাকে না। আমরা দুর্ভাবনায় পড়েছি।" মীর সাহেব বিমর্ষ।

।। বিশ ।।

দীপিকাদি এতক্ষণ মৌন ছিলেন। এবার মুখ খোলেন। "আমি কি কিছু বলতে পারি?"

মীর সাহেব বলেন, "সে কী কথা! আপনি হলেন গৃহের কর্ত্রী। আপনি বলবেন না তো কে বলবে?"

"আমি একজন সাধারণ নাগরিক। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই বাংলাভাষায় বাঙালীকে বাঙালী এমন কদর্যভাবে গালমন্দ করছে যে মেছুনীরাও লজ্জা পায়। এঞ্জেলরাও কাঁদে। কলম হাতে থাকতেই এই! তলোয়ার হাতে পেলে তো এরা একে অপরের মাথা কাটবে। দুনিয়ার লোক দেখবে বাঙালী হিন্দু খুন করছে বাঙালী মুসলমানকে, বাঙালী মুসলমান খুন করছে বাঙালী হিন্দুকে। কিন্তু

কেন? ঝগড়াটা তো হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়। কংগ্রেস মুসলিমের সঙ্গে লীগ মুসলিমের। মওলানা আজাদের সঙ্গে কায়দে আজম জিন্নার। বড়লাটের শাসনপরিষদে আজাদ যদি যান জিন্না যাবেন না। জিন্না না গেলে শাসনপরিষদ সর্বজনগ্রাহ্য হবে না, বড়লাট তাই কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন কংগ্রেস মুসলিম বাদ দিতে। কংগ্রেস তার উত্তরে বলে, কংগ্রেস মুসলিম বাদ গেলে কংগ্রেসও বাদ যাবে। বড়লাট ভাবতেই পারেননি যে কংগ্রেস এই ইস্যুতে ব্যাক আউট করবে। জিন্নাকে তিনি বলেন সবুর করতে। যথাকালে তিনি ডাকবেন, এখন নয়। জিন্না তো রেগে টং। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের স্বীকৃতি দিলে তথাকথিত মুসলিম নেশনের সংহতি নষ্ট হয়। ইউনিয়নিস্ট মুসলিমদের বেলাও সেই যুক্তি। সিমলা বৈঠকের সময় তিনি বড়লাটের মনোনীত একজন ইউনিয়নিস্ট মুসলিমকেও কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে আসতে দেবেন না, বড়লাটও ইউনিয়নিস্টদের যুদ্ধকালীন সহযোগিতার কথা স্মরণ করে তাঁদের একজনকে আনতে ভুলবেন না। শাসনপরিষদের রদবদলের প্রস্তাব ভেস্তে যায়। একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবারেও। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট চান তো একজন কংগ্রেস মুসলিম বা ন্যাশনালিস্ট মুসলিমকেও তাঁর শাসনপরিষদে না নিয়ে পারেন না। তা করতে গেলে কিন্তু জিন্না সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় ছেদ পড়বে। আর কায়দে আজমই তো আজকের ভারতে অধিকাংশ মুসলমানের মুকুটহীন বাদশাহ। বড়লাট কি তাদের বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দেবেন? তা হয় না। এখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী কী নির্দেশ দেন তারই অপেক্ষায় থাকবেন। এদিকে দেশ হয়েছে অগ্নিগর্ভ। একটা দেশলাইয়ের কাঠির শিখা থেকে যে কোনো দিন যে কোনো উপলক্ষে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে।'' দীপিকাদি আশঙ্কা করেন।

মীর সাহেব একথা শুনে বলেন, ''আমরা সকলেই তার জন্যে উদ্বিগ্ন। কিন্তু কায়দে আজম কেন বুঝতে চাইছেন না যে মওলানা সাহেবকে আসতে দিলে তিনি যেতেন মুসলমান হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে। বসতেন কংগ্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট অন্যতম আসনে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের একজন সদস্য হিসাবে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা চালাতেন ভারতের বৃহত্তম দলের তরফ থেকে। তাঁকে সামনে রেখে যারা কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন করেছে, তিন বছর যিনি বন্দিশালায় কাটিয়েছেন, কংগ্রেস পলিসি যিনি প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত জানেন তাঁর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেবেন কী করে? ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তো শাসনযন্ত্র চালাবার জন্যে নয়। সে কাজ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টও করতে পারে। যেটা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের আসল কাজ সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে দর কষাকষি। দু'শো বছরের একটা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার অ্যাসেটস কী, লায়াবিলিটিজ কী না জেনে চোখ বুজে তো গভর্নমেন্টের দায়দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেওয়া যায় না। ক্ষমতার হস্তান্তর হচ্ছে দায়িত্বের হস্তান্তর। মওলানা সাহেব যাবেন কংগ্রেস প্রতিনিধি হয়ে, তাঁর যাবার ফলে লীগ প্রতিনিধির সংখ্যা একটিও কমবে না, বরং মুসলমানের সংখ্যা একটি বাড়বে। তথাকথিত মুসলিম নেশন যদি এটা না বোঝে তবে সেই অবুঝকে বড়লাট বোঝাবেন। নয়তো তার বিদ্রোহের ভয়ে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন মুলতুবি থাকবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এর নাম প্রগতি নয়, গতিরোধ। এটাও একপ্রকার ভীটো। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী তো পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন যে ভীটো দিয়ে প্রগতি বন্ধ রাখা চলবে না। তাঁর সেই ঘোষণা কি মাঠে মারা যাবে? জিন্না সাহেব সদলবলে আসুন, পণ্ডিতজীকেও সদলবলে আসতে দিন। খ্রীস্টান, শিখ, পার্সী প্রতিনিধিও আসুন। পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলুন। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই, ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গেও না। ওঁরাও চান স্বাধীনতা দিতে। মিত্রতা করতে। ভারত যদি স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের মেম্বর হতে চায় তবে ব্রিটেন স্বাগত জানাবে।''

দীপিকাদি প্রীত হয়ে বলেন, ''আপনার সঙ্গে আমি একমত। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই সঙ্কটকালে

আপনি ও আপনার মতো চিন্তাশীল মুসলমানরা নীরব কেন? আপনারা কি খবরের কাগজে লিখে অবুঝদের বোঝাতে পারতেন না? এটা হিন্দুদের সাধ্য নয়, হিন্দুরা লিখতে গেলে শুনবে ওরা মুসলমানের সংহতি পছন্দ করে না। মুসলমানের সংহতির কমতি কোথায়? ধর্মীয় ব্যাপারে তো ওরা সবাই এককাট্টা। কিন্তু এটা হলো রাজনীতির ব্যাপার। এক্ষেত্রে মুসলমানরা কবে এককাট্টা ছিল? মোগলরা এসে তুর্কি বা পাঠানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়নি? নাদির শাহ এসে মোগল বাদশাহের ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর হরণ করেননি? কমিউনিস্ট পার্টিতেও মুসলমান আছে, কেবল কংগ্রেস পার্টিতে নয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা, কমিউনিস্টদের লক্ষ্য বিপ্লব। কখনো যদি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ক্ষমতা পড়ে তবে তাঁদের একজন মুসলিম কমরেডকেও তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসাবেন। কংগ্রেস যে বড়লাটের অনুগ্রহে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব করছে তা নয়। কেন্দ্রই বা কেন বড়লাটের অনুগ্রহনির্ভর হবে? তার চেয়ে বাইরে থাকাই তার পক্ষে সম্মানজনক। তাই বলে সে এই কারণে বিদ্রোহ করবে না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে গিয়ে শাসনতন্ত্র তৈরি করবে। মুসলিম লীগও সেখানে গিয়ে সেই কাজে হাত লাগাতে পারে। মিলে মিশে কাজ করলে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। না হলে তখন না হয় বিদ্রোহ করতে পারে।"

মীর সাহেব বলেন, "ও কথা আমারও কথা, দিদি। আমি যে নীরব রয়েছি তা কিন্তু মানব না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ডিঙিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলাদেশকে জুড়ে দেওয়া একটা মিসজয়েণ্ডার। বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান মিশ খাবে। বাংলাদেশকে আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র করলেই বরং উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে হিন্দু মেজরিটির হাত থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষা। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম, কিন্তু প্রভাব বেশী। আমার সন্দেহ আসল উদ্দেশ্য তা নয়, ব্রিটিশ এ্যাওয়ার্ড।"

"এ্যাওয়ার্ড"! স্বপনদা যেন বাক্‌শক্তি ফিরে পান। "এ্যাওয়ার্ড যদি লীগ নেতাদের অভিষ্ট হয় তবে সেটা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ভিতরেই নিহিত রয়েছে। একটা নয়, দুটোর একটা। ওঁরা যদি ছ'টা প্রদেশ চান তো ছ'টা প্রদেশই পাবেন, সায় আসাম, যেখানে মুসলমানরা মেজরিটি নয়। কিন্তু যৌথ সোভরেনটিতে রাজী হতে হবে। আর যদি তাঁরা একক সোভরেনটি চান তবে তাঁরা পাবেন আসামের একাংশ, বাংলার আধখানা, পাঞ্জাবের আধখানা, সমগ্র সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। ইংরেজের হাত থেকে যদি পেতে হয় তো এইপর্যন্ত ওঁদের দৌড়। এর চেয়ে বেশীদূর নয়। কিন্তু কায়দে আজমের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এমন উচ্চাভিলাষীও আছেন যাঁরা দিল্লী আগ্রা না পেলে সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা চান গোটা মোগল সাম্রাজ্য। কারণ তাঁরা মোগল বংশধর। ইংরেজ যা দিতে পারে দিক। বাকীটা তাঁরা তলোয়ারের জোরে পুনরধিকার করবেন। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে চূড়ান্ত মিটমাটে সম্মত হবেন না। আপাতত আপস করবেন যদি কংগ্রেস এ্যাওয়ার্ড মেনে নেয়। আরো উচ্চাভিলাষী যাঁরা তাঁদের মতবাদ প্যান-ইসলামিজম। খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তার মরক্কো থেকে ইণ্ডোনেশিয়া। সেটা অবশ্য সময়সাপেক্ষ। মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর তারা বেরিয়ে পড়বেন তুর্কী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে। তার পরের ধাপ স্পেন পুনর্বিজয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সামিল হয়েছে যেসব মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড সেসব ভূখণ্ডের উপরেও তাঁদের দাবী আছে। কিন্তু তার আগে তাঁদের আরো বলসঞ্চয় করতে হবে। ইরান, ইরাক, সীরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতিকে দলবদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, রোমানিয়া, বুলগারিয়া, গ্রীস প্রভৃতিও তাদের চাই। মুসলিম অধ্যুষিত বলে নয়, পূর্বপুরুষের বিজিত বলে। আমি তো ভেবে দেখছি জিন্নাই সব চেয়ে কম উচ্চাভিলাষী। সবচেয়ে বেশী মডারেট। আফটার অল, তিনিও আমাদের মতো একজন ব্যারিস্টার।"

মীর সাহেব হো হো করে হাসেন। "সেইজন্যে যতরকম কুযুক্তি পেশ করে বড়লাটের কান ভারী

করেছেন। একজন কংগ্রেস মুসলিমকেও বড়লাটের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে দেবেন না। পারতপক্ষে গভর্নরের সঙ্গেও না। ওঁদের স্থান জেলে। ওঁরা জেলেই ফিরে যান।"

"ওঁরা তো ইংরেজদের বোঝাচ্ছেন কংগ্রেস মুসলিমরা হিন্দুদের স্টুজ। মুসলমান সেজে মুসলিম লেশনের শিবিরে ঢুকেছেন।" দীপিকাদি দুঃখিত।

"আর ওঁরা কার স্টুজ? ইংরেজদের? জিন্না সাহেব নন, তিনি যথার্থই স্বাধীনচেতা। নাইটও নন, নবাবও নন। জমিদারও নন, চাকরিও করেননি। নেতা হবার যোগ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁদের নেতা তাঁরা ত্যাগের জোরে নয়, কষ্ট স্বীকারের জোরে নয়, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভোটের জোরে। ভোট তারা না বুঝেই দিয়েছে। যেদিন ওদের চোখ ফুটবে সেদিন এঁরা থাকবেন কোথায়?" মীর সাহেব রহস্য করেন।

"এঁদের চেয়ে আরো কট্টর মুসলিম রাজনীতিতে নামবে। আমি এঁদের সঙ্গেই আপসের পক্ষপাতী। তার জন্যে যদি আজাদকে বিসর্জন দিতে হয় তাও না হয় দেওয়া যাবে। তাতে করে যদি গৃহযুদ্ধ এড়ানো যায়।" স্বপনদার আশা।

"তাতে করেও গৃহযুদ্ধ এড়ানো যাবে না, গুপ্ত সাহেব। ওঁদের দাবীর ফিরিস্তি কি ওই একটিতে সীমাবদ্ধ?" মীর সাহেব এক কথায় হেসে উড়িয়ে দেন। "যেখানে ওঁরা মেজরিটি সেখানে ওঁরা চান মেজরিটির সুখসুবিধা। যেখানে ওঁরা মাইনরিটি সেখানে ওঁরা চান মাইনরিটির সেফগার্ড। হেড্‌স্, আই উইন। টেল্‌স্, ইউ লুজ। কারণ? কারণ তাঁরা মুসলমান।"

দীপিকাদি সুধান, "কিন্তু আপনিও তো মুসলমান।"

"আমি নিজের পায়েই দাঁড়িয়েছি, মুসলমান হিসাবে কিছু চাইনি বা পাইনি। কংগ্রেসের কাছেও না, ইংরেজের কাছেও না।" মীর সাহেব উত্তর দেন। "মুসলমান হিসাবে কিছু চাওয়া উচিত নয়, পাওয়া গৌরবের নয়। কিন্তু মুসলমান বলেই যদি একজন গুণী ব্যক্তিকে তার উচিত পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে আমি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব, তাতে ফল না হলে প্রতিরোধ করব। কারো উপর যেন তার ধর্মের দরুন অবিচার বা অত্যাচার করা না হয়। এক্ষেত্রে হিন্দুদেরও দোষ আছে। না থাকলে বাঙালীতে বাঙালীতে এমন মসীযুদ্ধ বেধে যেত না। কর্পোরেশনে, ইউনিভার্সিটিতে স্বরাজ বলতে বোঝায় হিন্দুরাজ। তাকে বর্ণহিন্দুরাজ বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। ওয়ার্কিং মডেল অভ্ স্বরাজ দেখে যদি মুসলমানদের মনে সংশয় জাগে যে সারা ভারতেও স্বরাজ বলতে বোঝাবে বর্ণ হিন্দুরাজ তা হলে তাদের সংশয় দূর করা সহজ নয়। তারা ভাবে ভাগ বাঁটোয়ারার পথই এর সমাধানের পথ। সেই পথ ধরে চললে সমাধানের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ। কিন্তু পাকিস্তানেও কি হিন্দু থাকবে না, হিন্দুস্থানেও কি মুসলমান থাকবে না? যে যার পাওনা দাবী করবে না? না পেলে সেও তো প্রতিবাদ করবে, তাতে ফল না হলে প্রতিরোধ করবে। হিন্দুরাজের পাল্টা মুসলিম রাজ নয়। লোকে বলবে এর চেয়ে ব্রিটিশ রাজ ছিল ভালো। ওরাই মোটের উপর ন্যায়বিচার করত। এমন এক রাষ্ট্রের পত্তন করতে হবে যার হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি বা ভেদনীতি নেই, যে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। নামে নয়, কামে। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইংরেজ আমলই তার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ। ওরা খ্রীস্টান বলে এদেশ শাসন করেনি, তা হলে তো আমরা বলতুম খ্রীস্টান আমল। করেছে ইংরেজ বলে। ওদের দলে বিস্তর ইহুদী। খোদ বড়লাট লর্ড রেডিং। ওদের যেটা দোষ সেটা ধর্মগত নয়, চর্মগত। তুমি যদি নৈকষ্য শ্বেতাঙ্গ না হও তা হলে উচ্চতম পদ কোনোকালেই পাবে না, যতই যোগ্য হও না কেন। ওদের চোখে হিন্দু মুসলমান সমান কালো। ভারতীয় খ্রীস্টানও কম কালো নয়। ওদের সঙ্গে বিরোধটার মূলে বর্ণবৈষম্য। এই কলকাতা শহরেই এমন কয়েকটা ক্লাব আছে যেখানে মেম্বর হতে হলে একজন দেশীয় খ্রীস্টানেরও ধর্ম যথেষ্ট নয়, কর্ম যথেষ্ট নয়, চর্ম শ্বেতবর্ণ হওয়া চাই। তবে তিনি বাবুর্চি খানসামা বেয়ারা হতে পারেন। ভাগ্যবান

হলে অতিথিও হতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী এই বৈষম্যের তীব্রতা সর্ব স্তরে অনুভব করেন। তার প্রতিকার খুঁজতে গিয়েই তিনি হন সত্যাগ্রহী। সেইসূত্রেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নেতা হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের মন্দ ছাড়া ভালো দেখছেন না। এটাও একটা পরিবর্তিত দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে একদল শ্বেতাঙ্গের মুঠোয়। বিশেষ করে আর্মিতে। তাঁর মতে সেটা আর্মি অভ্ অকুপেশন। তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে হিন্দু মুসলিম শিখ সৈন্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়।"

কংগ্রেস যেটি করবে লীগ তার উল্টোটি করবে। এটাই তো রেওয়াজ। কংগ্রেস কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে যাচ্ছে, সুতরাং লীগ যাচ্ছে না। যেহেতু কংগ্রেসের নতুন প্রেসিডেণ্ট নেহরু জানান কংগ্রেস আগে থেকে কোনো স্কীম মেনে নেয়নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানিয়েছেন যে নেহরুর উক্তি তাঁদের দ্বারা অসমর্থিত। জিন্না কিন্তু কংগ্রেসকেই দায়ী করেন।

কংগ্রেস যখন ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিচ্ছে না তখন উল্টোটি করার জন্যে লীগের তো যোগ দেওয়াই উচিত। লীগ যাবার জন্যে তৈরি, এমন সময় বড়লাট ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন স্থগিত রেখে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। এটার অর্থ কংগ্রেস যদি না থাকে লীগও থাকবে না। কী অপমান! জিন্না বলেন বড়লাট লীগকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি। বড়লাট বলেন তিনি অমন কোনো কথা দেননি। জিন্না তাঁর কথার ভুল অর্থ করেছেন। জিন্না তা স্বীকার করেন না। তখন বড়লাটের সঙ্গে আড়ি।

কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে কংগ্রেস যায়, যাক, খোলা মাঠে গোল করুক। কিন্তু লীগ যাবে না। আর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যাবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। সেখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। লীগ তা হলে কী করবে? ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না ট্রেন আসে, কংগ্রেস ওঠে, তার সঙ্গে একজন কংগ্রেস মুসলিমও ওঠেন। হিন্দুর স্টুজ। না, লীগ উঠবে না। ওয়েটিং রুমে বসে থাকা বৃথা। বড়লাটকে বিশ্বাস নেই, সেবার গভর্নমেণ্টকে বিশ্বাস নেই। অসহযোগ। টাইটেল বর্জন। আরো অনেক কিছু।

মীর সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হয়। এবার তাঁর ওখানেই।

"যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই হলো। লাহোর প্রস্তাবের পর বোম্বাই প্রস্তাব মুসলিম লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। লাহোরে স্থির হয়ে যায় তার উদ্দেশ্য পাকিস্তান অর্জন। বোম্বাইয়ে স্থির হলো উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন। উদ্দেশ্য আর উপায় দুটোই স্থির।" তিনি বলেন।

"কাগজে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।" স্বপনদা জানতে চান, "কবে থেকে শুরু? দিন ধার্য হয়েছে?"

"শুনছি ১৬ই আগস্ট।" মীর সাহেব যতদূর জানেন।

"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় সুহরাবর্দী সাহেব এসব বেআইনী কার্যকলাপ চলতে দেবেন? আফটার অল, তিনি একজন ব্যারিস্টার।" স্বপনদা বলেন।

"হো হো! আপনি আবার সেই কথা বলছেন। ব্যারিস্টার তো জিন্না সাহেবও। শহীদ পড়ে গেছে দোটানায়। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? লীগ রাখি না উজিরী রাখি? লীগ ছাড়লে উজিরীও ছাড়তে হয়। নয়তো পার্টিই ওকে তাড়াবে। আর উজিরী ছাড়লে রাজনীতিও ছাড়তে হবে। সেটা ওর পক্ষে আত্মহত্যা।" মীর সাহেব গম্ভীরভাবে বলেন। "আর তাতে লাভটা কী হবে? শহীদের জায়গায় বড় উজীর হবেন সার নাজিমউদ্দীন। এখন মিস্টার নাজিমউদ্দীন। তিনিও তো ব্যারিস্টার। হা হা!"

স্বপনদা শুনে ব্যথিত হন যে প্রধানমন্ত্রীই বেআইনী কার্যকলাপ চলতে দেবেন সরকারী ছত্রচ্ছায়ায়। যদিও তিনি একজন ব্যারিস্টার। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত। সেখানে বেশ নাম করেছিলেন। প্রসিদ্ধ অভিজাত

পরিবারে জন্ম।

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি ওঁর সেটানার কারণ। এই সেদিন প্রথম বার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। ভোগ যথেষ্ট হয়নি।" স্বপনদা নরম হন।

বড়লাট এতদিন চিন্তা করছিলেন কী করে বন্ধ তালা খোলা যায়। তিনি নতুন এক প্রস্তাব পাঠান। কংগ্রেস যাকে চায় তাকে বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য মনোনয়ন করতে পারে, কংগ্রেসের সেই অধিকারে লীগ হস্তক্ষেপ করবে না। তেমনি, লীগ যাকে চায় তাকে সদস্য মনোনয়ন করতে পারে, কংগ্রেসও লীগের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর সব আগের মতো থাকবে।

কংগ্রেস সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ও ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগদানের সম্মতি জানায়। কিন্তু লীগ তার বিপরীতটি করে। জিন্না বড়লাটকে জানিয়ে দেন যে কংগ্রেস যদি একজন মুসলিম মনোনয়ন করে তবে লীগ তাঁর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে না। বড়লাট আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখেন না। নেহরুকে আমন্ত্রণ করে গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার দেন। নেহরু যাবেন প্রথমে জিন্নার কাছে যোগদানের অনুরোধ করতে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া হয় তো সেই অনুসারে গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে। নয়তো লীগের জন্যে কয়েকটা আসন শূন্য রেখে নেহরু তাঁর ইচ্ছামতো গভর্নমেণ্ট গঠন করবেন।

নেহরু জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অটল অনড়। কংগ্রেস মুসলিমকে নিলে লীগ মুসলিম আসবে না। লীগের সম্মতি পেতে হলে কংগ্রেস মুসলিমকে বর্জন করতে হবে। নেহরু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন ও বড়লাটকে জানান। তখন কাকে কাকে নেওয়া হবে স্থির করার জন্যে সময় নেন। ইতিমধ্যে ১৬ই আগস্ট এসে পড়ে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে।

মুসলিম লীগ এই দিবসটির জন্যে তোড়জোড় করছিল। নাজিমউদ্দীনের 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া' দৈনিকপত্রে কলকাতার কর্মসূচী প্রকাশ করা কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হয়। মীর সাহেব একদিন একখানা কপি নিয়ে স্বপনদাকে দেখাতে যান। বলেন, "গুপ্ত সাহেব, চার বছর বাদে হতে যাচ্ছে একটা অশুভ অধ্যায়ের সূচনা। এরা কেউ ইংরেজের গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না, গুলীর ভয় আছে। কিংবা তার সম্পত্তির গায়ে হাত দিতে। জেলের ভয় আছে। হিন্দুর উপরেই, শিখের উপরেও। এঁরা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যাচ্ছেন। হিন্দু ও শিখ ঠাওরাবে সব মুসলমানই এর জন্যে দায়ী। কে যে লীগপন্থী, কে যে নয় তা গণনা করবে না। বহু নিরীহ মুসলমান মার খাবে, মরবে। শহীদকেও হিন্দুরা বিশ্বাস করবে না। অর্ধেক বাঙালীকে অর্ধেক বাঙালীর গায়ে লেলিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর বদনাম হবে। তাঁর মানে মানে পদত্যাগ করা উচিত। নয়তো গভর্নর তাঁকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হবেন। গভর্নর শাসনভার স্বহস্তে নেবেন। সে এক কেলেঙ্কারি। নাজিমউদ্দীনের কী। তাঁর তো কিছু হারাবার নেই। গভর্নর যে তাঁকে ডেকে নিয়ে গদীতে বসাবেন সেটা নির্বোধের প্রত্যাশা। যদি না তিনি এ আন্দোলন থামিয়ে দিতে পারেন। সেটুকু সৎসাহস কি তাঁর আছে? তিনি যে জিন্না সাহেবের পরম অনুগত সেবক। আমি যে অশান্তি বোধ করছি তা কী করে প্রকাশ করব? হিন্দুরা হয়তো আমাকেও দোষ দেবেন, আমি কেন ডাইরেক্ট অ্যাকশনবিরোধী স্টেটমেণ্ট দিয়ে মুসলমানদের নিবৃত্ত করিনি। আমি কেন নীরব। ধরে নেবে মৌনং সম্মতিলক্ষণ। কিন্তু তা হলে যে আমাকে ঘোর বিপদে পড়তে হবে। আমার পরিবারকেও। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের দু'দিক থেকেই বিপদ। হয় রামে মারবে, নয় রাবণে মারবে। আমরা মারীচ কুরঙ্গ।"

স্বপনদা তাঁকে অভয় দেন। "না, না, ইংরেজ থাকতে অমন কোনো মারামারি হতে দেবে না। গভর্নর আছেন কী করতে? বড়লাট আছেন কী করতে? পুলিশের আনুগত্য তাঁদেরই কাছে। বেশী বাড়াবাড়ি হলে আর্মি আসবে। আর্মির আনুগত্যও তাঁদেরই কাছে। জিন্না, লিয়াকৎ, শহীদ, এঁরা সবাই ব্যারিস্টার। এঁরা কখনো আইন হাতে নেবেন না।"

"কেন? গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলও কি ব্যারিস্টার নন? ওঁরাই তো পথ দেখিয়েছেন। জিন্না দেখছেন কংগ্রেসকে অনুসরণ করলেই তিনি তাঁর সাধের পাকিস্তান পাবেন। তবে তিনি অহিংসার ধার ধারেন না। মুসলিম লীগের গর্ব সে হিংসায় বিশ্বাস করে। জিন্না বিপক্ষের সবাইকেই শাসিয়েছেন যে তার হাতেও পিস্তল আছে। কথা হচ্ছে পিস্তল বলতে যদি ভায়োলেন্স বোঝায় আর বিপক্ষ বলতে যদি ব্রিটিশ সরকার বোঝায় তবে তিতুমীরের এই অভিযান ব্যর্থ হবে। তবে কি হিন্দু বোঝায়? সেইটেই আমার আশঙ্কা। এটা নামে আইন অমান্য, আসলে মারদাঙ্গা। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এই ওদের স্লোগান।"

দীপিকাদি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "ওরা ভেবেছে কী? লড়াই কখনো একতরফা হয়? আরো একটা তরফ থাকে। সেই আরেক তরফ যদি ইংরেজ হয়ে থাকে আমাদের কিছু বলবার নেই। ইংরেজকে যেই হোক একজন তাড়ালেই হলো। আমি বরং মনে মনে তিতুমীরের সাফল্য কামনা করব। কিন্তু তিনি যদি হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে হিন্দুরাও দেখিয়ে দেবে যে তাদের হাতে পিস্তল নয় স্টেন গান আছে। ইংরেজ যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে জিৎ হবে হিন্দুদেরই।"

মীর সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, "সেটা তো যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো প্রমাণিত হয়নি। এবার হতেও পারে, না হতেও পারে। মুসলমানদের ধারণা এক একজন মুসলমান সৈনিক তিন তিনজন হিন্দু সৈনিকের সমান।"

দীপিকাদি গর্জে ওঠেন, "আরবরাও তো ভেবেছিল স্পেনে তাদের রাজত্ব আবহমানকাল বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আটশো বছর রাজত্বের পরে তারা স্পেন থেকে নির্মূল হয়। পড়ে থাকে কয়েকটি অতি সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন। তাজমহলের মতোই অপূর্ব। আর মোতি মসজিদের মতোই অমূল্য। আমরা সেগুলি সযত্নে রক্ষা করব। কিন্তু লড়াইতে জিতলে লীগপন্থী আরবদের আমাদের স্পেন থেকে সমূলে উচ্ছেদ করব।"

মীর সাহেব ব্যথা পান। বলেন, "আর লড়াইতে হারলে?"

"হারতেই পারিনে। হিন্দু আর শিখ সৈন্যসংখ্যা মুসলিম সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশী। আমাদের দিকে গুর্খারাও থাকবে। তারা একাই একশো। জানেন ভিক্টোরিয়া ক্রস কারা সব চেয়ে বেশী পেয়েছে? যারা জার্মানীতে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছে, আফ্রিকায় গিয়ে ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে, মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে তুর্কদের সঙ্গে লড়েছিল তারা পারবে না পাঞ্জাবী মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে? তা ছাড়া পাঠানরা আমাদের বিপক্ষে নয়।"

মীর সাহেব ওঠেন। "এ লড়াই কিন্তু সৈনিকে সৈনিকে নয়। ইংরেজ সরকারের অফিসারদের হুকুম না পেলে ওরা লড়বে না। এ লড়াই গুণ্ডায় গুণ্ডায়। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষও তাদের হাতে মরবে। তবে ইংরেজ চলে গেলে সৈনিকে সৈনিকে বাধতে পারে। ফলাফল অনিশ্চিত। কংগ্রেস কি সে ঝুঁকি নেবে?"

দীপিকাদি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় সেদিন শুতে যান। স্বপনদার সেদিকে নজর ছিল না। তিনি কতকটা আপন মনে বলে যান, "মুসলমানরা ফ্রেশ অভ্ মাই ফ্রেশ, ব্লাড অভ্ মাই ব্লাড। ওদের সঙ্গে কি আমি লড়তে পারি? আর ইংরেজদের সঙ্গে আমার অ্যাফিনিটি যে একজন প্রিয়জনের মতো। তাদের সঙ্গেও কি আমি ঝগড়া করতে পারি? বিশেষত ওরা যখন আপনা থেকেই যাচ্ছে।"

দীপিকাদি ফেটে পড়েন। "তুমিও একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান ও প্রচ্ছন্ন ইংরেজ। তোমার মতো ম্লেচ্ছ ও যবনের সঙ্গে শুলে আমার পাপ হবে। আমি ভারতীয় আর্য নারী। তোমাকে বিয়ে করা একটা হিমালয়ান ব্লাণ্ডার। বিলকুল ভুল। চললুম আমি ও ঘরে শুতে।"

স্বপনদা তো হতভম্ব। বলেন, "যা বলবার তা বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় বল। ইংরেজী আর ফার্সীর ফোড়ন দিচ্ছ কেন? ওসব তো ম্লেচ্ছ ও যবনদের বুলি।"

"তা হলে কী বলব? হিমালয়সদৃশ প্রমাদ। সম্পূর্ণ ভ্রম।" দীপিকাদি একটু অপ্রস্তুত হয়ে আবার শুয়ে পড়েন।

"রানু, তুমি কি জানো আমি কখনো স্বীকার করিনি যে, East is East and West is West and never the twain shall meet. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনই আমার ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব পত্তনের উদ্দেশ্য। সেই ক্লাবেই তোমার সঙ্গে আমার চার চোখের মিলন। সেই সুবাদে তোমার সঙ্গে আমার জীবনের মিলন। তেমনি, আমি কখনো মেনে নিইনি যে, হিন্দু হচ্ছে হিন্দু আর মুসলমান হচ্ছে মুসলমান, কখনো এদের মিলন হবে না। তা হলে তো ভারতীয় জাতির অস্তিত্বই থাকে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটা মায়া। আমরা মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটেছি। জিন্নাই ঠিক আর গান্ধী, নেহরু ও সুভাষ বেঠিক। আমার কথা যদি বল আমি প্রচ্ছন্ন মুসলমান, প্রচ্ছন্ন খ্রীস্টান তথা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। একই কালে আমি প্রচ্ছন্ন ইংরেজ, প্রচ্ছন্ন ফরাসী তথা প্রচ্ছন্ন জার্মান। আমার বোনদের কথা সত্য হলে আমি এদেশের টুর্গেনিভ, তাই প্রচ্ছন্ন রাশিয়ান।" স্বপনদা বলেন আবেগভরে।

"বুঝেছি, তুমি একটি বহুরূপী। তুমি হিন্দুও নও, ভারতীয়ও নও। তোমার সঙ্গে শোওয়া আর নয়। তোমার তাতে কষ্ট হবে না। তুমি স্বপ্নে বরনারী সঙ্গ পাবে। বরনারী কেন, পরনারী।" এই বলে দীপিকাদি দুম করে বিছানা থেকে নেমে দড়াম করে দরজা বন্ধ করেন। কুকুরটা আটকা পড়ে কুঁই কুঁই করে। তখন দরজা খুলে সেটাকেও নিয়ে যান। উর্বশীর মেষ।

স্বপনদা চেঁচিয়ে বলেন, "উর্বশী, উর্বশী, ফিরে এস।"

দীপিকাদি বলেন, "গুড নাইট। শুভরাত্রি। কাল দেখা হবে।"

পরের দিন আবার সদ্ভাব। কিন্তু রাতের বিছানা যার যার ঘরে। দীপিকাদি শুভরাত্রি জানিয়ে বলেন, "স্বপনমোহন, তুমি তোমার স্বপন দেখ। তেল আর জল মিশ খেয়েছে। কালা আর ধলা ভেদ ভুলেছে। মায়ামৃগ ধরা পড়েছে। ওদিকে একটা শো-ডাউনের তোড়জোড় চলেছে। আচ্ছা, শো-ডাউন কথাটার বাংলা কী?"

স্বপনদা রসিকতা করেন, "শো মানে শোও। ডাউন মানে নিচে। স্ত্রীরা স্বামীদের নিচে শোয়। প্রকৃতির বিধান।" দীপিকাদি রাঙা মুখে পালান।

।। একুশ ।।

সুকুমার সপরিবারে বিলেত ফিরে যাবার সময় যে চিঠি লিখেছিল তার জবাবে মানস বলেছিল, 'ভালোই করেছ। দেশটা এখন একটা আগ্নেয়গিরি। যে কোনো দিন লাভাবর্ষণ শুরু হতে পারে। তার আগেই ইংরেজরা সরে পড়বে মনে হচ্ছে। এই তো সেদিন এই স্টেশনের শেষ ইংরেজটিও বদলী হয়ে গেলেন। পুলিশ সাহেব। তাঁর জায়গায় এলেন একজন মুসলমান। পূর্বপরিচিত। অসাম্প্রদায়িক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তেমনি অসাম্প্রদায়িক মুসলমান। কিন্তু আমাদের সকলেরই অগ্নিপরীক্ষার দিন আসবে, যেদিন পলিটিসিয়ানদের বিরোধ সম্পূর্ণ অমীমাংসো হবে। এক উত্তরাধীকারী না দুই উত্তরাধিকারী এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হবে। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তাদের ডাক দিলে কেউ হাঁক দেবে, 'আল্লা হো আকবর', কেউ হাঁক দেবে, 'সৎ শ্রী অকাল', আবার কেউ হাঁক দেবে, 'দুর্গামাতা কী জয়।' একজনও হাঁক দেবে না, 'বন্দে মাতরম্' বা 'ভারতমাতা কী জয়।' জানো তো, গতবার যুদ্ধে যাবার সময় এরা কেউ দেশের নামে প্রাণ দিতে যায়নি। রাজার নামেও নয়। রাজার প্রতি আনুগত্যের স্থান নিয়েছে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। বিপ্লববাদিনী মধুমালতী আর সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে এখন সিপাহীদের উপর শেষ ভরসা রেখেছেন। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার আগে যদি উত্তরাধিকারী কারা

হবে এই প্রশ্নের সর্বসম্মত মীমাংসা না করে যায় তবে ধর্ম অনুসারে বিভক্ত সিপাহীরা পরস্পরের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করে এর একটা ধর্মসম্মত মীমাংসা করবে। ভারত স্বাধীনও হবে, বিভক্তও হবে। মধুমালতী কি এরকম একটা সমাধান চান? কেন তবে সিপাহীবিদ্রোহের স্বপ্ন দেখছেন? শুধু তিনি নন, বামপন্থীদের অনেকেই। জনগণকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেননি, সেই অভাব পূরণ করতে চাইছেন জওয়ানগণকে সঙ্গে নিয়ে। নৌসেনাবিদ্রোহ তারই প্রথম ধাপ। মধুমালতী ঘটনাচক্রে সেই ধাপে পা দেন। পা ভুল জায়গায় ফেলেছিলেন। ফিরে গিয়ে ভালোই করেছেন।"

এর উত্তরে সুকুমার এক লম্বা চিঠি লেখে। তার সঙ্গে গোঁজা ছিল একটা ছোট্ট চিঠি। মিলি লিখেছে যূথিকাকে। "ছ'বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে দেখি আমি আর একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল। বিদেশই আমার কাছে দেশ, দেশ আমার কাছে বিদেশ। ভুল ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তবে একটা বিষয়ে আমি ভুল করিনি। লক্ষ করেছি ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। আর কংগ্রেসওয়ালারা গদী ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। কংগ্রেস নেতারা একজন মুসলিমকে সঙ্গে না নিয়ে ইন্টারিম গভর্নমেন্টে আসবেন না। বরং ওয়েভেলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ওয়েভেলের এর পরে কর্তব্য কী? জিন্নাকে কথা দিয়ে কথা না রাখা? জিন্না সেই অভিযোগই করেছেন। কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট গঠন করা? ওয়েভেল সেই পন্থাই ধরেছেন। এটা তৃতীয় পন্থা। কিন্তু এ পথে কারো সঙ্গেই মিটমাট হতে পারে না। তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই থাকবে। সকলেই বলাবলি করছে এবার কংগ্রেস করবে কী? গণ সত্যাগ্রহ? লীগ করবে কী? গণ হত্যাগ্রহ? রাজদ্রোহ নয়। সেটা তার ইংরেজ মিতারা বরদাস্ত করবেন না। বেড়াল তা হলে কোনদিকে ঝাঁপ দেবে? জানো তো ভিতরের খবর দিয়ো। জুলি তো তার বরকে নিয়ে মেতে আছে। তা ওরা সুখী হোক। রণকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। সে কেবল দাদু দিদুর কথাই বলছে। তাঁদের খুঁজছে।"

মিলির চিঠি যূথিকাকে দিয়ে মানস সুকুমারের চিঠি পড়তে বসে।

সুকুমার লিখেছে, "জাহাজে এবার বিষম ভিড়। সাহেব মেমসাহেব বোঝাই। আমরা ক'জন কালা আদমী একেবারে কোণঠাসা। আলাদা একটা ডাইনিং টেবিলে দ্বীপান্তরিত। আমাদের মুখোমুখি যাঁদের আসন তাঁরা এক গুজরাটী মুসলিম দম্পতি। সুলেমান সোমজী ও আয়েশা সোমজী। আমরা তখন ধর্মসচেতন নই, চর্মসচেতন। ইংরেজীতেই কথাবার্তা চালাতে হয়, তাই বেপরোয়াভাবে সাহেবলোকের বর্ণবিদ্বেষের নিন্দাবাদ করতে পারিনে। বরং একটা অনুকম্পা বোধ করি। আহা, বেচারিরা ছ'সাত বছর পরে দেশে ফিরছে। ডেকে যখন বেড়াই একসঙ্গে বেড়াই। সেইসূত্রে মনের কথা খুলে বলি। ওঁরা মধ্যবয়সী। যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্যে লণ্ডনে। মাস ছয়েক থাকবেন। ভদ্রলোক একটা গুজরাটী পত্রিকার সম্পাদক। সেটার কয়েক পাতা ইংরেজী।

বললেন, "গান্ধীও গুজরাটী, জিন্নাও গুজরাটী, বল্লভভাইও গুজরাটী, মুন্‌শীও গুজরাটী, আমিও গুজরাটী। আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। তা হলে দুই নেশন বলে দাবী করতে যাই কেন? মেজরিটি মাইনরিটি কোন্ দেশে নেই? তা বলে কি তারা দুই নেশন? এটা যুক্তিসহ নয়। তবু অর্থবহ। আসলে যা হয়েছে তা এই যে বৃদ্ধ বাদশাহ শাহ্ জাহান এখন মুমূর্ষু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে বেধে গেছে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। মোগলদের মধ্যে এমন কোনো নিয়ম ছিল না যে জ্যেষ্ঠপুত্রই হবে পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী, অন্যেরা হবে তাঁর অধীনস্থ অনধিকারী। এই নিয়ে প্রত্যেকবারই গোলমাল বাধে। এর নিষ্পত্তি হয় গায়ের জোরে। জোর যার মুলুক তার। শাহ্ জাহানের নিজের বেলাও তাই হয়েছিল। এখন আমাদের সামনেও আছে একই প্রশ্ন। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে ইংরেজরা চলে যাবার সময় ক্ষমতার হস্তান্তর করে যাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার মেজরিটির হাতে। মেজরিটি রুল একটা বিদেশী কনভেনশন। এদেশে সেটা প্রথাসিদ্ধ বা বিধিবদ্ধ হয়নি। কংগ্রেসকে আমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে

পারিনে। এ যুগের আওরংজেব এ যুগের দারাকে আপসে দিল্লী ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু দারাকেও আপসে কলকাতা আর লাহোর ছেড়ে দিতে হবে।

তা শুনে আমি চমকে উঠি। বলি, জানেন না, কলকাতা হচ্ছে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ডেন। বাঘের বাচ্চারা কেউ বা টেররিস্ট, কেউ বা কমিউনিস্ট। দারার কথায় আওরংজেবকে ওরা ওদের আস্তানা ছেড়ে দেবে কেন? উনি বলেন, ইংরেজরা যদি যাবার আগে এ্যাওয়ার্ড দিয়ে যায়? আমি বলি, তা হলে প্রথম কামড় বসবে ইংরেজদেরই ঘাড়ে। ওদের রাজত্ব তো যাবেই, বাণিজ্যও যাবে। দ্বিতীয় চোট পড়বে লীগপন্থী মুসলমানদের গায়ে। ওঁরা কেমন করে রাজত্ব করে দেখে নেবে বামপন্থীরা। তিনি বলেন, এ তো বড়ো অন্যায়। আমরা গুজরাটী মুসলমানরা রাজ্য চাইনে, বাণিজ্য চাই। বোম্বাই হাতছাড়া হলে কলকাতাই হতো আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র। কলকাতা না থাকলে পাকিস্তান কানা হয়ে যাবে। আমি বলি, তা হলে পার্টিশনের দাবী তুলে নিন। কোয়ালিশনের জন্যে চেষ্টা করুন।

ওদিকে আয়েশা বেগমের সঙ্গে মিলির খুব ভাব। বেগম বলছিলেন, লণ্ডনে আমরা মহামান্য আগা খানের অতিথি হব। তিনি আমাদের ধর্মগুরু। তাঁর অসংখ্য হিন্দু শিষ্য। তাদের কাছে তিনি বিষ্ণুর দশম অবতার। আমরা হিন্দুবিদ্বেষী নই।

লণ্ডনে ফিরে আমার প্রথম কাজ হলো ক্যাবিনেট মিশনের ভারত রওনা হবার মুখে ক্রিপ্‌সের অন্তরঙ্গ মহলে খোঁজ খবর নেওয়া। ওঁরা কি কোনোরকম এ্যাওয়ার্ড হাতে করে নিয়ে যাচ্ছেন? তাই যদি হয় কলকাতা কার ভাগে পড়বে? জানেন তো ওটা টেররিস্ট আর কমিউনিস্টদের আস্তানা। তারা সবাই বাঙালী হিন্দু। ওঁরা আমাকে আশ্বাস দিলেন মিশন এখনো মনঃস্থির করেননি, বিভিন্ন পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব দিক বিবেচনা করে তাঁদের এ্যাওয়ার্ড নয়, সুপারিশ ঘোষণা করবেন। এখন থেকে ও এখান থেকে বলতে পারা যায় না কী কী সুপারিশ। তবে ব্রিটিশ পলিসির সার কথা কী সেটা বলতে বাধা নেই। এককালে ব্রিটিশ পলিসি ছিল, র‍্যালি দ্য মডারেডটস। তার পরে হয়, র‍্যালি দ্য মুসলিমস। যুদ্ধের পর থেকে হয়েছে, র‍্যালি দ্য রাইটিস্টস। এখন সবচেয়ে বড়ো আপদ হয়েছে বামপন্থীরা। চন্দ্র বোস নেই, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ আছেন। তাঁর পেছনে আছেন পণ্ডিত নেহরু। নেহরুর পিঠে চেপে রয়েছেন সিন্ধবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধ। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আর কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে চান না, অথচ ব্রিটেনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে একমাত্র তারই হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করতেও অনিচ্ছুক। শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁরা ক্ষমতার হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করবেন। তার পরে ভারত যদি এক থাকে তবে ভারত সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি দ্বিধা হয় তবে দুই সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি তিন হয় তবে তিন সরকারের সঙ্গে সন্ধি। আমি বলি, তিন কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলেন, শিখদেরও আলাদা একটা রাষ্ট্র থাকতে পারে। পাটিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা প্রভৃতি শিখ রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত জেলা জুড়ে জুড়ে শিখিস্থানও কি গড়ে উঠতে পারে না? শিখেরা পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে চাইবে কেন? আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে বাঙালী, অসমীয়া ও পাঞ্জাবী হিন্দুকেও পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে বাধ্য করা হবে না। এসব সমস্যার মীমাংসার জন্যে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন ডাকা হবে। অ্যাসেম্বলীর তৈরি শাসনতন্ত্রই ব্রিটেন গ্রহণ করবে। যদি সর্বসম্মত হয়। মেজরিটির ভোটে মাইনরিটির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না। তা সে শিখ মাইনরিটিই হোক, আর মুসলিম মাইনরিটিই হোক, আর হিন্দু মাইনরিটিই হোক।

সুকুমার আরো লিখেছে, ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ কংগ্রেস তার আপত্তিসত্ত্বেও মেনে নিয়েছে দেখে প্রীত হয়েছি। এ না হলে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীই বসত না। কিন্তু বড়লাটের আপ্রাণ প্রয়াসসত্ত্বেও কংগ্রেস তাঁর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে না শুনে মর্মাহত হয়েছি। আমার বাজীর ঘোড়া তো নেহরু। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী না হন তো আমিই বা কার ভরসায় চাকরির খোঁজে স্বদেশে ফিরব? একা

মুসলিম লীগ যোগ দিয়ে আখের গুছিয়ে নেবে। কিন্তু শুনে অবাক হয়েছি যে বড়লাট ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন স্থগিত রেখে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করছেন, তাতে শুধু অফিসিয়ালরাই থাকছেন। খোঁজ নিয়ে শুনতে পাই তিনি জিন্নাকে ডিফেন্স আর লিয়াকৎ আলী খান্‌কে হোম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে শিখদের ও কংগ্রেস সদস্যদের যোগদানের পথ রুদ্ধ করবেন না। তাঁদের জন্যে দুয়ার খোলা রাখাই তাঁর পলিসি। জিন্না বলছেন, বড়লাট তাঁকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছেন। বলবেনই তো। পারফিডিয়াস আলবিয়ন বলে একটা প্রবাদ আছে না? এখন তিনি কী করবেন? বিদায় করেছ যারে নয়নজলে আবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে?

ইতিমধ্যে যমুনা নদীর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। জিন্না সাহেব এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী ও ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট। শুধু তাই নয়, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন। আগস্ট মাসের দু'দিন আগে হলেও এই তাঁর আগস্ট প্রস্তাব। গান্ধীজীর আগস্ট প্রস্তাবের মতো এটাও বোম্বাইতে গৃহীত। কিন্তু কী আশ্চর্য। কেউ তাঁকে বা তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করে নজরবন্দী করেনি। উল্টে বড়লাট তাঁকে আবার আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু তাঁকে কংগ্রেস মুসলিমদের একজনকে বড়লাটের ক্যাবিনেটে নেওয়ার উপর ভীটো জারি করতে দেননি। এটা যে কেবল কংগ্রেসের উপরেই নিষেধাজ্ঞা তাই নয়, বড়লাটের উপরেও নিষেধাজ্ঞা। মুসলিম লীগ তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও কংগ্রেস তা করেনি। কংগ্রেস মুসলিম লীগের উপর কোনোরকম ভীটো জারি করেনি। বড়লাট কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জবাহরলাল নেহরুকে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার দেন, কিন্তু নিজে সাক্ষীগোপাল হতে নারাজ হন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছেই দায়ী থাকবেন, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে নয়। সে দায় কংগ্রেসের। লীগ থাকলে লীগেরও। মতবিরোধ বাধলে নেহরু দলবলে পদত্যাগ করতে পারেন। বড়লাট তাঁকে ঢালা অনুমতি দিলেও জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন। জিন্না যদি তাতে রাজী হন তা হলে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে। সেটাই বড়লাটের অভিপ্রায়। আপাতত না হলেও পরে হয়তো সেটা সম্ভব। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করলেও মুসলিম লীগের সাত খুন মাফ।"

চিঠি দুটো পড়ে যূথিকা বলে, "আমি তো দেখছি ইংরেজদের আর ভারতশাসনে রুচি নেই। ওরা মানে মানে ক্ষমতার হস্তান্তর করে দেশে ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। তবে, হ্যাঁ, ভারতের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক পাতাতেও চায়। যাতে তাদের বাণিজ্যে হাত না পড়ে, যাতে তাদের শত্রুরা ভারতে এসে তাদের স্থান না নেয়। তারা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে কানু বিনে গীত নেই, কংগ্রেস বিনে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট নেই। এককভাবে মুসলিম লীগের সে কর্ম নয়। তাই কংগ্রেসের অবর্তমানে মুসলিম লীগকে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব দেয়নি। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসকেই তারই শর্তে দিতে হয়েছে। তার ভাগ থেকে একটি আসন সে একজন মুসলমানকে দিতে পারবে, বিশেষত যখন একটা প্রদেশ কংগ্রেস মুসলিমরাই শাসন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁদের কি কোনো প্রতিনিধি থাকতে মানা? মানা করছেন যিনি তাঁরই তো অনধিকার।"

মানস স্বীকার করে। "কিন্তু জিন্নার ধারণা মুসলিম ঐক্যের খাতিরে মুসলিম লীগকেই একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে। কংগ্রেস মুসলিমরা কুইসলিং। নরওয়ের নাৎসী সমর্থক কুইসলিংএর অনুরূপ। এই মহান সত্যটা চার্চিল হলে মেনে নিতেন, অ্যাটলী মানতে রাজী নন। নেহরুকে বন্ধুরূপে পেতে হলে নেহরুর বন্ধুকেও বন্ধুরূপে পেতে হবে। মওলানা আজাদও নেহরুর মতো যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন, যদি গান্ধী বিমুখ না হতেন। আর ইউনিয়নিস্টরা তো অকৃপণ সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের কেমন করে কুইসলিং বলে গণ্য করা যায়? বড়লাট তাঁদের একজনকে একটা আসন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, জিন্নার আপত্তি থাকায় তিনি পেছিয়ে যান। নইলে একবছর আগেই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হতো। ইংরেজদের দিক থেকে অনিচ্ছা ছিল না, কংগ্রেসের দিক

থেকে অনিচ্ছা ছিল না, ইউনিয়নিস্ট মুসলিমদের দিক থেকে অনিচ্ছা ছিল না। একমাত্র মুসলিম লীগের দিক থেকেই ছিল অলিখিত এক ভীটো। লেবার গভর্নমেন্ট অস্বীকার করেছেন। এইটেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কারণ। জিন্নার বোধ হয় ধারণা ছিল যে এবারেও তিনি বড়লাটকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। কিন্তু ঘটনার গতি বড়লাটকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের রদবদল জরুরি। ইউরোপীয় অফিসাররা ছ'সাত বছর হলো দেশে ফেরার অনুমতি পাননি। পাবেন পয়লা জানুয়ারি থেকে। স্ত্রীদের পাঠাতে আরম্ভ করেছেন, তাই জাহাজে এত ভিড়। ক্ষমতা হস্তান্তরের তাড়াহুড়ো ইউরোপীয়দের মধ্যেই বেশী। জিন্না সাহেব ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হুমকি দিয়েছেন, কিন্তু গান্ধীজী হুমকি না দিলেও সকলে জানে যে তিনি আবার গণসত্যাগ্রহের ডাক দিতে পারেন। সেটা আরো মোক্ষম।"

যূথিকা তা শুনে তর্ক করে। "কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়ে তবে আবার গণসত্যাগ্রহের কী প্রয়োজন? সঙ্গে সঙ্গে যদি গৃহযুদ্ধ বেধে যায় গণ সত্যাগ্রহ কোন্ কাজে লাগবে? দেখতে দেখতে সেটা গণ হত্যাগ্রহে পরিণত হবে। তখন তাকে থামানোই দায়। তাতে মুসলিম লীগেরই সুবিধে। হিন্দুদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা যদি মরে মুসলিম জওয়ানরাও যুদ্ধে নামবে। শহরকে শহর লুট করবে, পুড়িয়ে দেবে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রাণ নিয়ে পালাবে। তখন সেই সব ছেড়ে আসা জায়গা নিয়ে পাকিস্তান হবে। অহিংসা দিয়ে তা রোধ করতে পারা যাবে না। সারা দেশে একশো জন সত্যিকার অহিংসাবাদী আছেন কি-না সন্দেহ। সৌম্যদা পর্যন্ত ডাইনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়েছেন। মানুষ মরেনি, এই তাঁর সাফাই। যারা রেল স্টেশন পুড়িয়েছে তারাও তো সেই সাফাই দেবে। না, এক মুঠো সত্যিকার সত্যাগ্রহীকে নিয়ে গণ সত্যাগ্রহ হয় না। ইন্ডিয়ান আর্মিকে ইংরেজদের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিতে হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে এই বোঝায়। মুসলিম রেজিমেন্টগুলো কংগ্রেসের হাতে পড়তে রাজী হবে না, তারা লীগকেই পছন্দ করবে। শিখ রেজিমেন্টগুলোর বোধহয় শিখিস্থানের উপর ঝোঁক। সময় এসেছে রিয়ালিস্ট হবার। ইংরেজের সঙ্গে আপস করতেই হবে। কিন্তু মানে মানে আপস। অ্যাটলী কংগ্রেসের মুখ রেখেছেন, লীগের মুখ রাখেননি। তাই লীগ ক্ষেপেছে। কিন্তু ইঙ্গ-কঙ্গ এক হলে রণে ভঙ্গ দেবে। কী ভাগ্য লেবার ক্ষমতায় এসেছে! সূর্যের আলো থাকতে ঘর ছেয়ে নাও। চার্চিল ফিরে এলে পশতাবে! পাঁচ বছর পরে লেবার থাকবে কি-না কে বলতে পারে। আরো আগেই যাবে, যদি আবার যুদ্ধ বেধে যায়। বার্লিন নিয়ে বাধতে পারে।"

একেই বলে কান্তাসম্মিত। মানস হাসে, "এই প্রথম শুনছি যে তুমি আপসের পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আপস তো মুসলিম লীগের সঙ্গেও আপস। লীগ মুখে যাই বলুক তার পিস্তল একজন ইংরেজেরও গায়ে লাগবে না। লাগলে লাগবে শত শত হিন্দুর গায়ে। হ্যাঁ, জিন্না বলছেন তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। তিনি আর কনস্টিটিউশনাল উপায়ে আন্দোলন করবেন না। গৃহযুদ্ধ বাধাবেন। গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্যে তাঁকে আপসে কতক জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। আর নয়তো লিঙ্কনের মতো এসপার কি ওসপার না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে। সে দায়িত্ব কংগ্রেস নেবে না। সে সত্যাগ্রহই শিখেছে, হত্যাগ্রহ শেখেনি। চরিত্রও হারাবে, যুদ্ধেও হারতে পারে। ওদেশ ছিল স্বাধীন দেশ, এদেশ তা নয়?"

দিনকয়েক পর খাদি কর্মী বঙ্কিম কর দেখা করতে আসেন। বলেন, "সৌম্যদার বার্তাবহ হয়ে এসেছি। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ওদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। ও দফায় দফায় নিমন্ত্রণ করছে ওর পুরনো সহকর্মীদের। উদ্দেশ্য বৌদির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উনি তো গান্ধীমার্গে নবীন আগন্তুক। আমরা কারা, কী আমাদের সাধনা, কেন সত্যাগ্রহ, গঠনকর্মের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বৌদিকে খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তাঁকে বোঝাতে হচ্ছে বীরত্বের আরো একরকম অর্থ আছে। অন্যায়ের যে প্রতিরোধ করে, অথচ করতে গিয়ে নিজে অন্যায় করে না, সেও একজন বীর পুরুষ বা বীরাঙ্গনা। গত পঁচিশ বছরে আমি বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি। এক এক করে বিবরণ দিই। বৌদি

আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। তার পর সৌম্যদার সঙ্গেও তাত্ত্বিক আলোচনা চলে। আমরাও একজাতের ডায়ালেকটিকসে বিশ্বাস করি। ডায়ালেকটিকাল ননভায়োলেন্স। এইসব নিয়ে দিন সাতেক কেটে যায়। বাঃ! চিঠিখানাই দিতে ভুলে গেছি। এই নিন।"

মানস চিঠিখানা খুলে পড়ে। সৌম্যদা লিখেছে, "আমাদের খবর বঙ্কিমের মুখে শুনবে। আমরা নতুন বাসায় এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। কিন্তু সামনে আসছে এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। এত বড়ো চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে আর আসেনি। জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কথা বলছি। উনি নাকি নিজেই বলেছেন যে ওটা কেবল ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধে। এ তো বড়ো মজার কথা। কংগ্রেস কি জিন্না সাহেবকে আশা দিয়ে আশাভঙ্গ করেছে? কংগ্রেস তো চায়নি যে বড়লাটের শাসনপরিষদে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা কমুক। তাদের সংখ্যা কমেওনি। নিজের সদস্যদের একজন হিন্দু না হয়ে মুসলিম হোন এটাই তার অনুরোধ। বড়লাট তার অনুরোধ রক্ষা করেননি বলে কংগ্রেস ওঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কংগ্রেস কী করে জানবে যে বড়লাট মুসলিম লীগকে গভর্নমেন্ট গঠনের ভার না দিয়ে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট গঠন করবেন? এটাই বা কী করে সে জানবে যে তার একজন মুসলিম কর্মীকে নিজের ভাগের একটি আসন দেবার অধিকার তার আছে এটা বড়লাট তাঁর পরবর্তী প্রস্তাবে মেনে নেবেন? এর ফলে বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমান সংখ্যাই তো একটি বেড়ে গেল। হিন্দু সংখ্যা তো একটি কমে গেল। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা সমান সমান হলো। অন্যায়টা হলো কোথায় ও কার প্রতি? মুসলমানরা সম্প্রদায়ই হোক আর নেশনই হোক তাদের প্রতি বড়লাট বা কংগ্রেস কেউ কোনো অন্যায় করেননি। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি দ্বিমুখী ডাইরেক্ট অ্যাকশন চালায় তবে ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েরই বিপদ। যদি না অহিংসা পালিত হয়। এঁরা যদি একই মুদ্রায় শোধ দেন তবে দুই পক্ষেই অন্যায় হবে। আমরা পড়ব মুশকিলে। সত্যাগ্রহ বলতে এতদিন আমরা বুঝেছি একপক্ষে অন্যায় অপরপক্ষে ন্যায়। আমরা ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছি। এবার সম্ভবত হবে দুই পক্ষেই অন্যায়। দুই পক্ষেই বহু নিরীহ মানুষ হতাহত হবে। আমরা তবে কোন্ পক্ষে দাঁড়াব? কোনো পক্ষেই না। আমাদের কর্তব্য হবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়কে থামানো ও থামাতে গিয়ে উভয়ের হাতে মার খাওয়া। হয়তো মার খেয়ে মরা। বলা বাহুল্য আমরা আর ক'জন? এইটুকুতে কি গৃহযুদ্ধ থামবে? যেখানে ইংরেজরাও স্বীকার করছে যে কংগ্রেসের অধিকার আছে সেখানে ন্যায় তো কংগ্রেসেরই পক্ষে। কিন্তু হিংসার দুষ্ট বৃত্তে জড়িয়ে পড়লে অন্যায় দুই পক্ষেই হবে। হিংসার উত্তর অহিংসভাবেই দিতে হবে। সহিংসভাবে নয়। এ এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। আমরা এ পরীক্ষায় সফল না হলে গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যর্থ হবে। তিনি কি আর বাঁচতে চাইবেন?"

চিঠিখানা যূথিকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মানস বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করে। জিজ্ঞাসা করে জুলিকে তিনি কেমন দেখলেন।

"ঝি চাকর রাখেননি। নিজেই যাবতীয় গৃহকর্ম করেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, মেঝে নিকোনো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তরকারি কোটা, রান্না বান্না করা সমস্তই তাঁর একার কাজ। আশ্রমের কর্মশালায় গিয়ে সুতো কাটেন, কাপড় বোনেন, লঙ্গরখানায় গিয়ে পরিবেশন করেন, কারো অসুখ করলে সেবা করেন। আশ্রমে একটা লঙ্গরখানা আছে। নিখরচায় কর্মীরা সবাই দুপুরবেলা খেতে পায়। ডাল, ভাত, একটা ছক্কা, তার সঙ্গে চাটনি ও স্যালাড। পুরুষেরা সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। কী ব্রাহ্মণ, কী হরিজন। তেমনি মেয়েদের সবাই এক সারিতে। একটু তফাতে। পরিবেশনটা মেয়েরাই করে। রান্নাটা পুরুষেরা। সবাই স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা। কামার আছে, কুমোর আছে, তাঁতী আছে, কাটুনী আছে, তেলী আছে। আর আছে ছুতোর মিস্ত্রি। তবে সৌম্যদার সহকর্মীরা অনেকে সরে পড়েছেন। তাঁদের কেউ বা এখন কমিউনিস্ট, কেউ বা নেতাজী ভক্ত, কেউ বা সাভারকর শিষ্য। কয়েকজন

এখনো টিকে আছেন শত প্রলোভন ও নির্যাতন সত্ত্বেও। আশ্রমের কাজকর্ম সঙ্কুচিত হয়েছে। কয়েকটা বিভাগ উঠে গেছে।" বঙ্কিমবাবু দুঃখ করেন।

যূথিকা জানতে চায়, "জুলি কি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, ছেড়ে দেননি। কিন্তু ওঁর স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। হিংসা আর অহিংসা এদের মধ্যে মাত্র একটি অক্ষরের ব্যবধান। তবু তা গভীর ও দুস্তর। উনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন স্বামীর রাজনীতিকে নিজের রাজনীতি করতে। তবে ওঁর নিজেরও তো একটা সাধনা আছে। উনি চান একই পুরুষের বৌ হতে, বোন হতে, মা হতে, বান্ধবী হতে, প্রেমিকা হতে, সঙ্গিনী হতে। অথচ বিপ্লবের ভূত ওঁর ঘাড় থেকে নামছে না। উনি চান ওঁর বন্ধু বাবলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে, চাষানীর সঙ্গে চাষানী, মজুরনীর সঙ্গে মজুরনী। অমনি করে শ্রেণীচ্যুত হয়ে বিপ্লব ঘটাতে। ওঁর মাথায় কি একটু ছিট আছে?" বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বলেন।

"শুধু ওর মাথায় কেন? ওর পতিদেবতার মাথায়ও।" যূথিকা খিল খিল করে হাসে। "উনি ভেবেছেন শহীদিয়ানা দিয়ে উনি হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করবেন। এদেশে চল্লিশ কোটি ভারতীয়, আর ইংরেজ মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার। চল্লিশ কোটি ইচ্ছা করলে চুয়াল্লিশ হাজারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যা তো একটা সমস্যাই নয়। অপর পক্ষে হিন্দু মুসলিম সমস্যা একটা অমীমাংস্য সমস্যা। আমরা ওদের তাড়িয়ে দিতেও পারিনে, আপনার করতেও পারিনে, রাজা করতেও পারিনে, প্রজা করতেও পারিনে। ওরাও আমাদের তাড়াতেও পারে না, কনভার্ট করতেও পারে না, রাজা করতেও পারে না, প্রজা করতেও পারে না। সেই যে আরব আর তার উট তারই মতো ব্যাপার। আরব ছিল তার তাঁবুতে। কাঁপতে কাঁপতে উট এসে আশ্রয় চায়। প্রথমে ঢোকায় মুখ, তার পরে গলা, তার পরে সামনের দুটো পা, তার পরে ধড়, তার পরে পেছনের দুটো পা। আরব হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবু ছেড়ে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তেমনি, এদেরও কি দাবীর অন্ত আছে? এক এক করে কত কী না পেয়েছে, এবার চায় পাকিস্তান। সেইখানেই কি ইতি? না, পরে একদিন বলবে, হিন্দুস্থান হামারা। ভাগো হিঁয়াসে। ইংরেজদের মতো আমরাও তাড়া খেয়ে পালাব। কিন্তু কোথায়? দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়তেই হবে একদিন না একদিন। সেদিন ক'জন অহিংস থাকতে পারবে, শহীদ হতে পারবে?"

বঙ্কিমবাবু নিরুত্তর। চা শেষ করে বিদায় নেন।

জিন্নার সঙ্গে জবাহরলালের সাক্ষাৎ নিষ্ফল হয়। এখন ষোলই আগস্টের প্রতীক্ষা। তার দু'দিন আগে দেবাদিদেব গুহ এসে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসেন। মুখ ফুটে একটি কথাও বলেন না। শুধু একখানা খবরের কাগজ পড়তে দেন। তেরোই তারিখের 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া'। খাজা নাজিমউদ্দীনের দৈনিকপত্র। তাতে ছিল 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' কেমন ভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ। শেষের দিকে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ সেক্রেটারির আবেদন :

"I appeal to the Musalmans of Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas to rise to the occasion and make the rally a unique success. We are in midst of the rainy season and the month of Ramazan fasting. But this is a month of real Jehad of God's grace and blessings, spiritual armament, and the moral and physical purge of the nation. It is a supreme occasion of our trial. Let Muslims brave the rains and all difficulties and make the Direct Action Day meeting a historic mass mobilisation of the Millat.

Muslims must remember that it was in Ramazan that the Quran was revealed. It was in the Ramazan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and

Heathenism was fought and won by 313 Muslims and again it was in Ramazan that 10 000 under the Holy Prophet conquered Mecca and established the kingdom of Heaven and the commonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting the action in this holy month."

মানসও গম্ভীর মুখে কাগজখানা যূথিকার হাতে বাড়িয়ে দেয়। একটি কথাও বলে না। যূথিকার মুখও গম্ভীর। চারদিক নিঃশব্দ।

"তবে আসি।" গুহ ওঠেন। কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ভরেন। অনেক সাধাসাধির পর এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান।

মানস বলে যূথিকাকে, "এর শুরু কোথায় ও কবে তা তো জানা গেল। সারা কোথায় ও কবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। জিন্নাহ্ও জানেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে, কিন্তু মীমাংসা এর ফলে হবে না। মীমাংসার পথ এ নয়।"

"মীমাংসা কি ওরা সত্যি সত্যি চায় যে মীমাংসা হবে? ওরা চায় বলপরীক্ষা। বেশ তাই হোক। হিন্দুরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে।" যূথিকা বলে দৃপ্ত কণ্ঠে।

।। বাইশ ।।

মাস মোবিলাইজেশন? বদরের লড়াই? মক্কার যুদ্ধ? এ কি সেই ধরনের যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব? কার সঙ্গে কার যুদ্ধ? হীদেনের সঙ্গে মুসলিমের। হীদেন কারা? ইংরেজরা নয় নিশ্চয়। এমনিতেই তারা মুষ্টিমেয়। তাদের বিরুদ্ধে মাস মোবিলাইজেশন যেন মশা মারতে কামান দাগা। তা ছাড়া তাদের হাতে যেসব মারাত্মক অস্ত্র আছে তা দিয়ে একশোটা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায়। মিএা সাহেবরা পুনরাবৃত্তি চাইবেন না। তা হলে এটা হিন্দুদেরই উপর আক্রমণের তোড়জোড়।

তাই যদি হয়ে থাকে বাংলার গভর্নর কী মনে করে ষোলই আগস্ট পাবলিক হলিডে ঘোষণা করলেন? এটা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানদের কারো পরব নয়। রাজার জন্মদিন বা ব্যাঙ্কের হিসাবের দিনও নয়। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের এমন কী গুরুত্ব? ওরা হরতাল করতে চায় তো করুক। আর-কেউ হরতাল করবে কেন? কিন্তু পাবলিক হলিডে হলে সরকারী অফিস আদালতও বন্ধ থাকবে, সেটাও প্রকারান্তরে সর্বজনীন হরতাল। মানসের মতো অফিসারদেরও। সেদিনকার জন্যে যেসব মামলার শুনানি নির্দিষ্ট রয়েছে সেসব মুলতুবি রাখতে হবে। আরো একটা দিন খুঁজে বার করতে হবে। দায়রার মামলা দিনের পর দিন লাগাতার ভাবে চলে। শুক্রবারের বকেয়া মামলা শনিবার শুনতে হবে, শনিবারের বকেয়া মামলা সোমবার শুনতে হবে। সোমবার থেকে তো অন্য এক মামলা। একটা শেষ না হলে তো আরেকটা শুরু হতে পারে না। একটা দিন হঠাৎ বন্ধ হলে কত লোকের সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট। সাক্ষী, আসামী, জুরি। আসামী যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তবে কেনই বা বেচারা জেলে আরেকদিন আটক থাকবে? জুররদের কি নিজেদের কাজকর্ম নেই? আর সাক্ষীরা কোথায় রাত কাটাবে? এ ছাড়া উকীলদেরও অসুবিধা আছে।

গভর্নরকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি মন্ত্রীদের প্রত্যেকটি পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি পাবলিক ইন্টারেস্ট দেখবেন। পাবলিক বলতে শুধু মুসলিম পাবলিক বোঝায় না। এটা লীগ মন্ত্রীমণ্ডল। এঁদের ম্যাণ্ডেট পাকিস্তান হাসিল করা। আর পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভিন্ন আর কারো স্বার্থে নয়। অন্তত আর কেউ সেই দাবী নিয়ে নির্বাচনে নামেনি। গভর্নর হয়তো ইউরোপীয়দের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁদেরই পরামর্শে পাবলিক হলিডে ঘোষণা করেছেন। এতে তাঁদের মুখরক্ষা হয়। নয়তো

আপিসে গেলে তাঁরাও মার খেতেন, দোকান খোলা রাখলে তাঁদেরও দোকান লুট হতো। হিন্দু নেতারা মির্জাপুর পার্কে সভা করে জানিয়ে রেখেছেন যে হিন্দুরা নিজেদের ক্ষতি করে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য নয়। হরতাল যারা করতে চায় তারা করুক, কিন্তু যারা নারাজ তাদের উপর যেন জোর জুলুম না হয়। হলে নেতারা বাধা দেবেন। আইন তাঁদেরই পক্ষে। পাবলিক হলিডেতে প্রাইভেট দোকানপাট খোলা থাকে তো বেআইনী নয়। অন্যান্য পাবলিক হলিডেতে খোলা রাখাই রেওয়াজ। সরকারী অফিসারদের উপরে সরকার নির্দেশ জারি করতে পারেন, বেসরকারী সাধারণের উপরে নয়। তারা কি তাজা মাছ কিনে খেতে পারবে না?

মানসের ঘুম আসে না। সে অনেক রাত অবধি তার কুঠির দোতালার লম্বা বারান্দায় নিঃশব্দে পায়চারি করে। মুসলিম লীগ তা হলে এমনি করে ওয়ার অভ্ সাকসেসন শুরু করে দিচ্ছে। পার্লামেণ্টারি ইলেকশন যথেষ্ট হলো না। কনস্টিটিউশনাল মীন যথেষ্ট হলো না। জিন্না সাহেব বলেছেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে। এবার তিনি পিস্তল হাতে নিচ্ছেন। ষোলই আগস্ট তাঁর সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের দিন। বলা যেতে পারে সেটা তাদের D-Day. যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইঙ্গ মার্কিন ফরাসী বাহিনীর নর্মাণ্ডির উপকূলে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট দিবস।

দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। একটি দেশলাইয়ের কাঠিও একটা দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। জিন্না এ করছেন কী! গোটা দেশটাই যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর সাধের পাকিস্তান কি আস্ত থাকবে? তিনি কি জানেন না যে শিখ বলেও একটি সম্প্রদায় আছে, তারও ধারণা সেও একটি নেশন, তারও একটা হোমল্যাণ্ড চাই। প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড চায় তো দেশ দু'ভাগ কেন বহু ভাগ হবে। আর নেশন কি কেবল ধর্ম অনুসারে হয়, ভাষা অনুসারে হয় না? মতবাদ অনুসারে হয় না? ইউরোপের ইতিহাস কী বলে? ভারত যদি একবার ভাঙতে আরম্ভ করে তো পাকিস্তানও পরে একদিন ভাঙতে পারে। তার আগে বাংলাদেশ যে অবিভক্ত থাকবে তা নয়। পাঞ্জাবও না। এসব যদি হবার থাকে তো কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে বসেই হোক। কেন ইংরেজদের সহায়তায় হতে চাওয়া? তাদের রোয়েদাদ যদি সবাই মেনে না নেয়? তবে কি গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়েই যেতে হবে? বেশ, তাই সই। কিন্তু ষোলই আগস্ট থেকেই তা শুরু হবে কেন? তবে কি এটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ঠেকিয়ে রাখার জন্যে হচ্ছে? অমন করে কি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নিবৃত্ত করা যায়? কিংবা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে? ওয়েভেল বার বার ওয়েভার করছেন, কিন্তু তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দিয়ে আর চলছে না। বড়ো রকম রদবদল চাই। মেজরিটিকেই তার উদ্‌যোগ নিতে হবে। মেজরিটি মাইনরিটিকে ডেকে আনবে। যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে।

কংগ্রেস ও লীগের বিবাদটাই হিন্দু মুসলিম বিবাদে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাদটা আসলে কংগ্রেস-মুসলিমের সঙ্গে লীগ-মুসলিমের বিবাদ। হতে পারে কংগ্রেস-মুসলিমরা সংখ্যায় কম, লীগ-মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশী। তা বলে কি তাদের পক্ষে একবিন্দুও সত্য নেই? এমন কথা কি বলতে পারা যায় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা, ১৯৪১ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা? ওরা গত নির্বাচনেও ভোটে জিতে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেছে। তার মানে ওরা ভারতেই থাকতে চায়, পাকিস্তানে থাকতে চায় না। কংগ্রেস তার মনোনীত একজন মুসলমানকে নিজের ভাগের একটি আসন দিতে বদ্ধপরিকর। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট আকাঙ্ক্ষা করেন তো তাঁকে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে। এ ছাড়া তিনি আর কী করতে পারতেন? কংগ্রেস লীগের বিবাদের মূলে রয়েছে আরো এক কারণ। সেটা আরো ফাণ্ডামেন্টাল। লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সমান আসন, সমানসংখ্যক পোর্টফোলিও, সমান গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও, সমান মর্যাদা দাবী করে। যেন সে আইন সভায় মাইনরিটি নয়, সারা ভারতেও মাইনরিটি নয়। বড়লাট ওয়েভার করতে করতে শেষকালে এ দাবীটাও মেনে নিতে

নারাজ হয়েছেন। নয়তো কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের আশা ছাড়তে হতো। লীগের শেষ তুরুপের তাস পাকিস্তান, বিকল্পে গ্রুপিং। বাংলাদেশের সঙ্গে আসামও গোষ্ঠীভুক্ত হবে। পাঞ্জাবের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও গোষ্ঠীভুক্ত হবে। কে না জানে যে অসমীয়াতে বাঙালীতে আদায় কাঁচকলায়? তেমনি, পাঠানে ও পাঞ্জাবীতে ভাষা নিয়ে, রেস নিয়ে রেষারেষি। প্রাদেশিক সরকার বন্ধনীভুক্ত হতে অনিচ্ছুক, তবু অনিচ্ছুকের উপর গ্রুপিং চাপিয়ে দিতে হবে। এই প্রশ্নে বড়লাট পুরোপুরি কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারছেন না, বিবাদটা ফেডারল কোর্টের ব্যাখ্যার জন্যে ঝুলে থাকছে। জিন্না সাহেবের আশঙ্কা— বড়লাটেরও আশঙ্কা— ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের ভাষায় গলদ আছে। কংগ্রেস তার সুযোগ পাবে। কিন্তু কোর্টের বিচারের উপর কথা বলা চলে না। বড়লাট অপেক্ষা করবেন না, গভর্নমেণ্ট ঢেলে সাজাবেন। জিন্না অপেক্ষা করবেন না, কংগ্রেস গদীতে বসার আগেই তিনি যুদ্ধে নামবেন। যুদ্ধটা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধেও বটে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধেও বটে। শ্বেতাঙ্গদের গায়ে হাত দিতে সাহসে কুলোবে না, হিন্দুদের মাথায়ই বাড়ি পড়বে, হিন্দুদের পিঠেই ছোরা বসবে।

মনটা খারাপ হয়ে যায়, উদ্বেগে ভরে যায়। এই কি ভারতের স্বাধীনতার মাশুল? এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ? জাতীয়তাবাদের কতটুকু এই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত থাকবে? এটা কি কোনো মতেই এড়ানো যায় না? থাকুক না ইংরেজরা আরো কয়েক বছর। কিন্তু তাতে কি সমাধান সুগম হবে? না সাম্প্রদায়িকতা আরো জোরদার হবে? সময় কার পক্ষে? কংগ্রেস-মুসলিমদের পক্ষে না লীগ-মুসলিমদের পক্ষে? গত দশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস-মুসলিমদের জোর কমছে, লীগ-মুসলিমদের জোর বাড়ছে। কংগ্রেসে মুসলিম সদস্যসংখ্যা বাড়ছে না, কমছে। দশ বছর পরে কংগ্রেস সত্যি সত্যি মুসলিমবর্জিত দল হবে। দু'জন কি তিনজনই ততদিন কংগ্রেসে থাকবেন। যদি ততদিন বাঁচেন। এটা এক নিদারুণ সত্য যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের কাছে ততখানি আকর্ষণীয় নয়, যতখানি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই ওরা জাতীয়তাবাদ বলে ভ্রম করছে। এ ভ্রমটাতে মেজরিটি বনবার প্রত্যাশা। আজকাল সব রাষ্ট্রেই মেজরিটিই তো ক্ষমতাসীন। ডিকটেটরশাসিত রাষ্ট্র পর্যন্ত মেজরিটির মুখ চেয়ে কাজ করে আমাদের মুশকিল এইখানে যে লোকে রাজনীতিক্ষেত্রেও ধর্মকে টেনে আনতে অভ্যস্ত। মুসলমান বলে বা শিখ বলে পরিচয় না দিলে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয় না, নির্বাচনক্ষেত্রেই ভেদবুদ্ধি। চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। সেকুলার স্টেট আমাদের কল্পনাতীত। সে রকম একটা রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশন রচনা করতে দিচ্ছে কে? ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা একধার থেকে বাধা দেবে। জিন্না এখন থেকেই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট করছেন। কেবল ইন্টারিম গভর্নমেণ্ট নয়। দশ বছর সময় দিলে কি তাঁর সেকুলার স্টেটে রুচি হবে? হবে না, কারণ ধর্মের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব। তাঁর দলের পক্ষে সেটা একটা জীবন মরণ প্রশ্ন, গান্ধী নেহরু আজাদের দলের পক্ষে নয়। মুসলিম লীগ যে কামড় দেবে এটাই ধ্রুব। কালহরণ এক্ষেত্রে নিষ্ফল।

জিন্না সাহেবের নির্দেশে মুসলিম লীগ যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছে সে আগুন নেবানোর সামর্থ্য বা ইচ্ছা ইংরেজদের নেই। তাঁরা দমন নীতি অবলম্বন না করে তোষণ নীতিই অবলম্বন করবেন। তা হলে দমন নীতি অবলম্বন করবে কে? আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট গভর্নমেণ্ট। মুসলিম জনতা যদি বেপরোয়া হয়ে খুন জখম ঘর জ্বালানো ইত্যাদি অপরাধ করে তবে তাকে শায়েস্তা করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। অপোজিশনে থাকলে মুসলিম লীগ এতে উস্কানি দেবেই। তার হারাবার কী আছে? সে যদি জানত যে সেও একদিন গভর্নমেণ্ট গঠন করবে বা কোয়ালিশনের পার্টনার হবে তা হলে সে সংযত হতো ও সংযম শেখাত। কংগ্রেস থাকতে তার কি সে রকম কোনো আশা ভরসা আছে? কংগ্রেসও এটা বোঝে। সেও এটা এড়াবার জন্যে পদত্যাগ করে অপোজিশনে যেতে তৈরি। কিন্তু ইংরেজ থাকলে তো? কংগ্রেসের উৎপত্তি ইংরেজের অপোজিশন হিসাবে। সে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে মুসলিম

লীগের অপোজিশন হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লক্ষ্য তার ভারতবর্ষের স্বরাজ। আর মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন, নয় যেখানে সম্ভব সেখানে স্বতন্ত্র গভর্নমেন্ট গঠন। এক এক করে পাঁচটি কি ছ'টি প্রদেশে। পরে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রুপে। অবশেষে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এক কথায়, মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় পার্টনারশিপ, নয় পার্টিশন। পার্টনারশিপ ইংরেজ থাকতে হয়নি, ইংরেজ গেলেও যে হবে তেমন অঙ্গীকার নেই, যেমন দেখা যাচ্ছে সে চিরকাল অপোজিশনেই থাকবে, কেন্দ্রে তো বটেই, অধিকাংশ প্রদেশে। তা হলে পার্টিশনই একমাত্র গতি। আর সেটা ইংরেজ থাকতেই সমাধা হোক।

এর প্রতিকার কি পাল্টা পার্টিশন? বাংলা ভাগ? পাঞ্জাব ভাগ? আসাম ভাগ? মানস তা মনে করে না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে যারা প্রাণ দিয়েছে, ধন দিয়েছে, জীবিকা দিয়েছে, জেলে গেছে, আন্দামানে গেছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে, ওদের উত্তরপুরুষ যদি আবার সেই বঙ্গভঙ্গকেই সাদরে বরণ করে। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব আঁচ করে সে গভীর বেদনা বোধ করছে। এরা কি পাকিস্তানী হতে চায়, না বাঙালী থাকতে চায়? এরা কি বুঝতে পারছে না যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ সমার্থক নয়? বাংলাদেশ বাঙালীমাত্রের দেশ। একে কেবল মুসলমানের দেশ করতে গেলে বিহার থেকে, যুক্তপ্রদেশ থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, ওড়িশা থেকে মুসলমান এসে বাঙালী হিন্দুকে ভিটেছাড়া করবে। মানস ভাবতেই পারেনি যে পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশে এত বেশী ভোট পড়বে ও তার ফলে মুসলিম একটি গভর্নমেন্ট গঠন করবে। সঙ্গে একজন তফশীলি হিন্দু। পেছনে কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক। বাঙালী হিন্দুরা এমনিতেই তাদের প্রাপ্য ক্ষমতার ভাগ থেকে বঞ্চিত, তার উপর তাদের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত তাদের দখলে না থাকার আশঙ্কা। এতদিন ইংরেজই ছিল তাদের একমাত্র বৈরী, এখন দেখছে ব্রিটিশ রাজ গেলে মুসলিম রাজ হবে। ইসলামী স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। বাংলাদেশ তার কাছে আর একটা আরব কি ইরান কি আফগানিস্থান।

দুই নেশন তত্ত্ব অসত্য হলেও দুই রাষ্ট্র তত্ত্ব অসত্য নয়। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগ চিরকাল অপোজিশনে থাকতে পারে না, তার পক্ষে যদি অধিকাংশ মুসলমান ভোট দিয়ে থাকে তবে অধিকাংশ মুসলমানও চিরকাল রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। এরূপ স্থলে কোয়ালিশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তা যদি অকেজো হয় তবে পার্টিশনের ব্যবস্থাও থাকা যুক্তিযুক্ত। মানস এইপর্যন্ত লীগপন্থীদের সঙ্গে একমত হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে উপায় তারা অবলম্বন করতে যাচ্ছে তা কখনো সহ্য করা যায় না। সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুর সম্পর্ক অহিনকুল সম্পর্ক নয়। ঝগড়া মাঝে মাঝে বেধেছে, ঝগড়া মিটেও গেছে, তারপর ওরা একসঙ্গে বাস করেছে। একসঙ্গে চাষ করেছে। একসঙ্গে মাছ ধরেছে। একসঙ্গে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করেছে। এখন এমন কী হয়েছে যে ওরা বরাবরের মতো পরস্পরকে ছেড়ে ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যাবে। মুসলিম ও হীদেন এই ভেদবুদ্ধি কেন? হীদেনকে মুসলিম করাই ছিল সেকালের নীতি। সেটা কি একালেও অনুসৃত হবে?

আর ওই যে মাস মোবিলাইজেশন ওর পরিণাম তো মধ্যযুগের ফ্রান্সের সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে মানসকে আতঙ্কিত করে। বাংলাদেশের হিন্দুরাও কি ফ্রান্সের প্রটেস্টাণ্টদের মতো ঝাড়ে মূলে সাবাড় হবে? মাইনরিটি বলে যদি কারো অস্তিত্বই না থাকে তবে মাইনরিটি সমস্যা বলেও কোনো সমস্যাই থাকে না। আরবে ইরানে তুরস্কেও নেই। তুরস্ক থেকে আর্মেনিয়ানদের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। গ্রীকদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার হবে পাকিস্তান থেকে, যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশন সফল হয়।

পরের দিন পনেরোই আগস্ট। মানস কোর্টে গিয়ে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকে। ফাঁকতালে একদিন ছুটি পাচ্ছে বলে অনেকেই উৎফুল্ল। যারা রোজা রাখছে তাদের তো কথাই নেই। কেউ বিশ্বাস করে না যে ষোলই আগস্ট অঘটন কিছু ঘটবে। ঘটলে কলকাতায় ঘটবে, এ শহরে নয়। শহরে হিন্দুর

সংখ্যাই বেশী। মুসলমানরাও শান্তিপ্রিয়। গ্রামে অবশ্য মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, কিন্তু খুনোখুনি হরদম হলেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নয়। তবে ইদানীং একটি গঞ্জে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট যারা লুট করে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মুসলমান। কারণটা বোধহয় অর্থনৈতিক। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় তবে তার প্রধান হেতু অর্থনৈতিক। জমিদার, মহাজন, নায়েব, পেয়াদা কে না তাদের শোষণ করেছে? কিন্তু শুধু কি তাদের? হিন্দুদেরও কি নয়?

কোর্ট থেকে উঠে সে যখন চেম্বারে যায় তখন নাজির সাহেব এসে তাকে সেলাম করেন। বলেন, "সার, অনুমতি পাই তো একটা কথা নিবেদন করি। কালকের বাজারটা আজকেই করে রাখলে ভালো হয়। শুনছি হিন্দুরাও কাল হরতাল করবে। পাছে দোকানপাট লুট হয় কি পুড়ে যায়। সাবধানের মার নেই।"

মানস মনে মনে চটে যায়। বলে, "কেন, ওরা কি মগের মুলুকে বাস করছে? সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? সরকার ওদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য নয়? ডি. এম. কী করছেন? এস. পি. কী করছেন?"

নাজির নিরুত্তর। তখন মানস টেলিফোন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজের সার্ভিসের বাঙালী সিনিয়র অফিসার মির্জা আফজল সিরাজীকে। "শুনছি কাল শহরসুদ্ধ সব দোকানপাট বন্ধ থাকবে। জেলা জজও শাক সবজি কিনতে পারবেন না। তাঁকেও কি সপরিবারে রোজা রাখতে হবে?"

সিরাজী লজ্জিত হয়ে বলেন, "পাবলিক হলিডেতে আপিস আদালত বন্ধ হয়। হাটবাজার কখনো বন্ধ হয় না। আমিও শুনছি সে রকম কিছু হবে। এটা কিন্তু সরকারের হুকুমে নয়, মস্লিক। হুকুম যদি কেউ জারি করে থাকে তবে সে এখানকার মুসলিম লীগ জেলা কমিটির সেক্রেটারি শফিকুদ্দীন। সে এবার জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আমার সঙ্গে ভারিক্কি চালে কথা বলে তা কাল সকালেই শাক সবজির বোঝা নিয়ে একজন ফেরিওয়ালী হাজির হবে। আপনারা যেটা খুশি কিনবেন। নো প্রব্লেম। সপরিবারে রোজা রাখতে হবে কেন? ইউ আর নট আ মুসলিম। আমিও কি রাখছি নাকি? রোজা রাখি তো অত খাটব কী করে?"

এর পরে মানস পুলিশম্যানকে ফোন করে। ইনি ওর পূর্ববর্তী কর্মস্থলে ওর প্রতিবেশী ছিলেন। টুর করে বেড়াচ্ছেন, বাড়ীতে স্ত্রীর প্রসবব্যথা। অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই যে সাহায্য করে। জজ গৃহিণী খবর পেয়ে ছুটে যান। রাত জেগে সেবা যত্ন করেন। ডাক্তার ডাকতে হয় না। সুপ্রসব হয়। সেই থেকে ওঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রমোটেড অফিসার। পাঞ্জাবী মুসলমান। চিয়াং কাইশেক যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর স্পেশাল ট্রেনের ডাইনিং কারের ওয়েটার সেজেছিলেন ফিদা হোসেন খান্। রাজপুত বংশীয় বলে গৌরব বোধ করেন। বংশের একটি শাখা এখনো হিন্দু। দুই শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে। কন্যা ধর্মান্তরিত হয় না। এটা নাকি ওই বংশেরই প্রথা। পাকিস্তান পছন্দ করেন না। তাঁর মতে জিন্না নিজে সাচ্চা মুসলমান নন।

"হরতাল হবে, শুনছি। মীটিং, প্রোসেসন এসব কিছু হচ্ছে না তো? আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে কমিউনাল মোড় নিতে পারে, খান্। জানি, আপনি সব সময় সতর্ক। আপনাকে সতর্ক হতে বলা অনাবশ্যক। প্লীজ ডোন্ট মাইণ্ড।" মানস তাঁকে টেলিফোন করে।

পুলিশ সাহেব তাকে আশ্বাস দেন যে শান্তিভঙ্গের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। "আজ সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে প্রোসেসনের অনুমতি দেওয়া হবে কি-না। দশ হাজার লোকের মিছিল যদি বেরোয় আমার অত লোকবল নেই যে সামলাতে পারব। ওরা যদি হাতিয়ার হাতে নিয়ে বেরোয় তবে ওদের নিরস্ত্র করাও তো দুষ্কর। তবে মিটিং-এর ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন নাকি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে মামলা হলে জেলে যাওয়ার মুরোদ একজনেরও নেই। আর হিন্দুবিরোধী আস্ফালনে মুসলমানের কতটুকু লাভ? নেহরু যাচ্ছেন ইন্টারিম

গভর্নমেন্টের প্রধান মেম্বর হয়ে। তিনি কি বেঙ্গলের হিন্দুদের প্রোটেকশন দেবেন না? বড়লাটও দেবেন। গভর্নরও দেবেন। দেখবেন কলকাতায় কাল নর্মাল থাকবে। গোলমাল বাধতেই দেওয়া হবে না। বাধলে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। তবে একটা খবর আপনাকে জানিয়ে রাখছি। বাইরে থেকে এখানে হিন্দু এজেন্ট প্রোভোকেটর এসেছে। স্থানীয় হিন্দু জনতাকে উস্কানি দিতে।"

পরের দিন ষোলই আগস্ট। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি দিক্‌নির্ণয়ক দিবস। মুসলিম লীগের লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় ছ'বছর আগে লাহোরে। আজ কলকাতায় স্থির হবে লক্ষ্যভেদের উপায়। গোলমাল হয়তো হবে না। না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। স্বয়ং গভর্নর রয়েছেন, ফোর্ট উইলিয়ামে আর্মি রয়েছে, লালবাজারে পুলিশ রয়েছে। সুহরাবর্দী একজন সুদক্ষ প্রশাসক। পরিস্থিতিকে তিনি আয়ত্তে রাখতে পারবেন। তিনিও জানেন যে দিনকয়েক বাদে নেহরু সদলবলে ক্ষমতায় আসছেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রথম ভুল ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা। তাঁর হাতের তাসের ট্রাম্প করার শক্তির অনুপাতে তিনি অত্যধিক 'কল্' দিয়েছেন। ব্রিজ খেলার পরিভাষায় একে বলে 'ওভারকল্'।

কিন্তু মাস মোবিলাইজেশন যদি হয় তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। কার সাধ্য কে সেই ধর্মোন্মাদ জনতাকে আয়ত্তে রাখবে? তারা মারবে, মরবে, সামনে যাকে পাবে তাকেই। কী ইংরেজ, কী হিন্দু। গভর্নরের প্রশ্রয়ে সুহরাবর্দী মন্ত্রীমণ্ডল যা করছেন তা আগুন নিয়ে খেলা। আজকের এই দিনটা শান্তিতে কাটলেই রক্ষা। মানস ও যূথিকার মনে একটা কী হয় কী হয় ভাব। মানস কিছু লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় পেলেও মুড পায় না। সাত পাঁচ ভাবে।

টেনিসের সময় হলে সে ছটফট করে। খেলতে গিয়ে খেলবে কার সঙ্গে? কেউ কি আজ আসবে? খেলাতেই বা মন লাগবে কেন? এমন দিনে কি খেলা যায়? রেডিও খুলে বসে থাকে যদি কলকাতার কোনো খবর দেয়। তেমন কিছু পায় না। নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। নেই খবর তো ভালো খবর।

সন্ধ্যাবেলা পাবলিক প্রোসিকিউটার রায় শরদিন্দু নিয়োগী বাহাদুর আসেন দেখা করতে। বলেন, "শুনলুম আপনি খুবই চিন্তিত। তাই জানাতে এলুম আজকের দিনটি শান্তিতে কেটেছে। হিন্দুরাও উৎসাহের সঙ্গে হরতাল পালন করেছে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা সাজে না। এখানে একজনও ইংরেজ অফিসার নেই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব দু'জনেই মুসলমান। দু'জনেই প্রো-হিন্দু। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির সভায় আমাকেও ডাকা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয় মিছিল বেরোতে দেওয়া সমীচীন কি না। আমি বলি, আলবৎ। তবে তাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে। আমি থাকব মিছিলের সঙ্গে। হিন্দুরা যে যোগ দিচ্ছে এটা জানলে তাদের মনোভাব বদলাবে। হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধী নয়। মোগল রাজত্বেরও বিরোধী ছিল না। তবে রাজপুতদের মতো তাদেরও বিশ্বাস করতে হবে, বড়ো বড়ো পদ দিতে হবে, তাদের উপর জিজিয়া বসানো চলবে না। আমি আল্লাহো আকবরও বলেছি, পাকিস্তান জিন্দাবাদও বলেছি। মিছিল শহর ঘুরে আসে। কারো উপরে হামলা করে না। মীটিংও হয়েছিল। সেখানেও আমি একজন বক্তা। শফিকুদ্দীন ইংরেজদের বাঁচিয়ে বক্তৃতা দেয়, জানে যে ইংরেজ চটলে গভর্নরস রুল হবে, তখন আমিই ওঁকে প্রোসিকিউট করব। হিন্দুদের উপরেই গায়ের ঝাল ঝাড়ে। বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর উপরে। কিন্তু শ্রোতারা তারিফ করে না। আমার উকীল বন্ধু আবু মোল্লা তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, গান্ধীজী কুইট ইণ্ডিয়া না বললে কি কায়দে আজম ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট বলতেন? ইংরেজরা কুইট না করলে কি মুসলমানরা পাকিস্তান পাবে? সভার লোক শুনে শান্ত হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"কলকাতার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, রায় বাহাদুর। তবু ভালো যে এখানকার সব খবর ভালো।" মানস এতে খুশি।

"কলকাতা আমার এলাকা নয়, তার জন্যে আমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই। সেটা যাঁদের এলাকা তাঁরাই ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবেন। আমরা কেন ধরে নেব যে কলকাতায় এমন কিছু ঘটবে যেটা ইতিহাসের স্রোত ঘুরিয়ে দেবে। বাংলাদেশ বাংলাদেশই থাকবে, যদিও এর নতুন নাম হয়তো হবে পূর্ব পাকিস্তান। হোক না, তাতে কী এসে যাবে। গোলাপকে যে নামেই ডাকুন সে গোলাপই থাকবে। হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের নাম কি হিন্দু ছিল? সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কি এর উল্লেখ আছে? আমাদের বাসভূমির নাম কি হিন্দুস্থান ছিল? প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও পড়েছেন এ নাম। তা হলে পাকিস্তান আর পাকিস্তানীতে এত আপত্তি কেন? পাকিস্তানের পাঁচটি কি ছ'টি প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল বা বাংলাদেশও থাকবে। অধিবাসীরা বাঙালীই থাকবে। আমরা হিন্দু মুসলমান মিলে তামাম পাকিস্তানে মেজরিটি হব। পশ্চিমারা যদি ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল না করে তবে আমরাই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করব, প্রধানমন্ত্রী হব, প্রেসিডেন্ট হব। মিলিটারি পাওয়ার হয়তো ওদের হাতে থাকবে, সিভিল পাওয়ার আমাদেরই হাতে। ঝগড়া যদি করতে হয় পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে করব, বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে কদাচ নয়। আমাদের হাতে যে তাস আছে সে তাস বুদ্ধিমানের মতো খেললে পাকিস্তানের রাজধানী হবে কলকাতা। কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমান আছে তাঁরা বাঙালী বলে পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। পাছে কেউ মনে করে নেটিভ মুসলমান। ওঁদের মতে ওঁরা আরব ইরান আফগানিস্থান থেকে এসেছেন বিজয়ীর বেশে। চেহারাটা কিন্তু আমাদেরই মতো।" রায় বাহাদুর হাসেন।

যূথিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় মানস। তিনি বলেন, "আপনার ছেলে আর আমার নাতি একই স্কুলে ও একই ক্লাসে পড়ে। ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। একদিন আমাদের কুটিরে পায়ের ধূলো দিলে কৃতার্থ হব।"

আপ্যায়নের পর তিনি বিদায় নেন।

এখানে কোনো অনর্থ ঘটেনি জেনে মানস ও যূথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্র বা ভূমিকম্পের এপিসেন্টার তো কলকাতা। কলকাতায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটলে এখানেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। তাই ভাবনা থেকে যায়।

রাত ন'টায় রেডিওতে শোনায় কলকাতায় হাঙ্গামায় পাঁচ হাজার জন হতাহত। লুটপাট। অগ্নিসংযোগ। কারফিউ জারি হবে।

"St. Bartholomew's Day Massacre!" মানস বলে ওঠে।

যূথিকার মুখ চুণ। তার মা বাবা যদিও তাকে ত্যাজ্য কন্যা করেছেন তবু সে তো তাঁদের ত্যাগ করেনি। তাঁরা অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। কে জানে তাঁদের কী অবস্থা। সে কান্না চাপতে পারে না।

"ও কী! তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে। কখনো কাঁদ না। ছি! কাঁদতে নেই। যাও, শুতে যাও।" মানস নিজে কিন্তু শুতে যায় না।

অর্ধেক রাত অবধি পায়চারি করতে করতে ভাবে হিন্দু মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব কি একদিনেই থামবে? গড়াবে অনেক দিন, যতদিন না একটা রাজনৈতিক সমাধান পাওয়া যায়। দুই পক্ষই দোষী, কোনো এক পক্ষকে নির্দোষ বলা যায় না। কিন্তু সে কি মহাযুদ্ধের মতো গৃহযুদ্ধের বেলাও নীরব সাক্ষী হবে?

।। তেইশ ।।

রাত দুটোর সময় শুতে গিয়ে সে দেখে যূথিকা তখনো জেগে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বিছানা ভিজে গেছে।

"ও কী। তুমি কাঁদছ এখনো? এক গঙ্গা অশ্রুধারায়ও হিন্দু মুসলমানের রক্তের দাগ মুছবে না। এ রক্ত বাঙালীর বুকের রক্ত। বাংলাদেশের কলিজার লহু।" মানস সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে।

যূথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "তোমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। তার উপর কাব্যি করা শুরু হলো।"

মানস বুঝতে না পেরে বোবা হয়ে থাকে। তখন যূথিকাই মুখোমুখি হয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কান্না পাচ্ছে, তাই কাঁদছি। পাঁচ হাজার হতাহত। আরো কত হবে কে জানে! মা বাবার কথা ভেবে কান্না পাবে না? বাড়ী কিনেছেন পার্ক সার্কাসে। চার দিকে মুসলমান গিজগিজ করছে। ওরা ক্ষেপে না গেলে চমৎকার লোক। কিন্তু ক্ষেপে গেলে চণ্ডী।"

"না, না, কেউ ওঁদের গায়ে হাত দেবেন না। স্বয়ং কায়দে আজমের সঙ্গে সিমলায় ওঁদের দহরম মহরম ছিল। সেখানকার ভাইসরিগাল লজে। জিন্না সাহেবের নিশ্চয়ই সেসব দিনের কথা মনে পড়বে।" মানস স্তোক দেয়।

"তাঁকে জানাবার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। তোমার যদি দয়ামায়া থাকে তুমি একবার ট্রাঙ্ক কল্ করে খবরটা নাও তাঁরা বেঁচে আছেন কি-না। বেঁচে থাকলে নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন কি-না।" যূথিকা ব্যাকুলভাবে বলে।

সে এর আগে কখনো এমন কোনো অনুরোধ করেনি, পাছে মানস ভুল বোঝে। তার বাবা তার স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, জামাতা বলে স্বীকার করতেই রাজী হননি। তার মা তো গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন। সম্পর্ক যখন কেটে গেছেই তখন আবার জোড়া দিতে যাওয়া কেন?

মানস বলে, "আচ্ছা, কাল সকালেই আমি ট্রাঙ্ক কল্ করে খবর নেব। কিন্তু আমার নয়, তোমার নামে।"

"না, না, আমার নামে নয়, আর কারো নামে। বিল অবশ্য আমরাই মেটাব।" যূথিকা ভেবে পায় না কার নামে।

মানস পরের দিন ট্রাঙ্ক কল্ বুক করতে গিয়ে শোনে কলকাতার লাইন খারাপ। শত খানেক কল্ জমে আছে। নতুন কল্ বুক করা বন্ধ। তখন একটা প্রি-পেড টেলিগ্রাম ডাকঘরে পাঠায়। চাপরাশি ফিরে এসে জানায় টেলিগ্রামও কলকাতায় যাচ্ছে না। লাইন খারাপ। অনুমতি নিয়ে নাম ঠিকানা দিয়েছিল ক্লাবের অনরারি সেক্রেটারি পরমেশ মিত্রের। তিনি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কেরও এজেন্ট। সর্বজনপ্রিয় পরোপকারী ভদ্রলোক।

এখন কী উপায়? মনে পড়ে যায় যে পুলিশ-সাহেবের হেফাজতে পুলিশ ওয়্যারলেস আছে। সেখান থেকে কলকাতা ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠানো সম্ভব। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কেবল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পক্ষে। মানস তখন ফিদা হোসেনকে অনুরোধ করে লালবাজারে ওয়্যারলেস করে ওয়্যারলেসে উত্তর আনিয়ে নিতে। তিনি নিজের নামেই মেসেজ পাঠান, কিন্তু লালবাজার সাড়া দেয় না। বার বার তিনবার নিরুত্তর।

খবরের কাগজ আসেনি, আসবেও না। কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়েনি। একই কারণে চিঠিপত্রও আসেনি, আসবেও না। যাত্রীরাও আসেনি, আসবেও না। মুখে মুখে কতরকম গুজব রটে যায়। কোর্টে গেলে একজন উকীল বলেন, "কলকাতায় কাল পঞ্চাশ হাজার জন মারা গেছে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার হিন্দু।" আরেকজন উকীল এসে জানান, "ষাট হাজার লোক মারা গেছে, তাদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার মুসলমান।" ঘন্টায় ঘন্টায় গুজব পল্লবিত হয়। কেউ বলে, "পাঁচটা মন্দিরে গোরুর মাথা পাওয়া গেছে।" কেউ বলে, "দশটা মসজিদে শূয়োর ঢুকেছে।" গির্জার কথা কিন্তু একজনও বলছে না। যদিও ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।

"হদিস পেলে?" যূথিকা জিজ্ঞাসা করে। মানসকে ফিরতে দেখে।

"পুলিশম্যান নিজের নামে মেসেজ পাঠিয়েছেন তাঁর বন্ধু শামসুল হুদার নামে। তিনি ডেপুটি কমিশনার। থাকেন পার্ক সার্কাসেই। তাঁর পক্ষে অনুসন্ধান সোজা। কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তো তাঁর চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি। তাঁকে তাগাদা দিয়েও সাড়া মেলেনি। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

যূথিকা মুখ ভার করে থাকে। "মিসেস সরকার কী করে খবর পেলেন? বলে গেলেন সরকার পরিবারের সবাই নিরাপদে আছে।"

"ওদের তো টাকার অভাব নেই। বোধ হয় রেডিও ট্রান্সমিটার আছে। তা ছাড়া আর কোন্ সূত্রে মিসেস সরকার খবর পেলেন?" মানস চিন্তা করে।

দিনের বেলা রেডিওতে যা শোনা যায় তা কতকটা স্থিতাবস্থার। রাত ন'টায় জানায় বাইরে থেকে সৈন্য এসে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করছে। কিন্তু ক'জন হতাহত তার উল্লেখ নেই।

"তার মানে অবস্থা আরো খারাপ।" যূথিকার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

মানস তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে? সেও তো শঙ্কিত স্বপনদার জন্যে, বৌদির জন্যে। তাঁদের বাড়ীর পেছনে মুসলমানদের বসতি। তাঁদের বাবুর্চি ও ড্রাইভার মুসলমান। বেয়ারা ও মেড হিন্দু। ঝিকে ওঁরা মেড বলেন। তার আরো কয়েকজন প্রিয় বন্ধুও তো কলকাতায় নিযুক্ত। প্রকাশকরাও কলকাতানিবাসী।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানস রাত জেগে পায়চারি করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় যে তার নিজের কর্মস্থলে তেমন কোনো বিপদ নেই। তবু বলা যায় না। গুজব যে ভাবে পল্লবিত হচ্ছে সেখানেও কলকাতার প্রতিক্রিয়ায় মারামারি বেধে যেতে পারে। এক পক্ষ মার দিলে কি অপর পক্ষ মার শোধ দেবে না?

তবে ভরসার কথা সিরাজী আর খান্। দু'জনেই অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির অফিসার। তাঁদের কারো বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা যায় না। তবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের উপরে শফিকুদ্দীনের মতো মোড়লদের চাপ একেবারেই কি পড়বে না?

কিন্তু এই দুই অভিজ্ঞ অফিসারের নিশ্চয় খেয়াল আছে যে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট আজ বাদে কাল গঠিত হবে ও তাতে মুসলিম লীগ থাকবে না, কংগ্রেস থাকবে। কাজেই দিল্লী থেকে যে চাপ পড়বে সেটাই কলকাতার মন্ত্রীমণ্ডলকে ও তাঁদের স্থানীয় মোড়লদের অফিসারদের উপর চাপ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করবে। অফিসাররা আইন মোতাবেক কর্তব্য করে গেলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, ট্রেন আসে না। রবিবার চিঠি আসার প্রশ্নই ওঠে না। টেলিগ্রাফ বন্ধ, ট্রাঙ্ক টেলিফোন বন্ধ। পুলিশ ওয়্যারলেস নিরুত্তর। মানস কোর্টে যায় না, কিন্তু গুজব তার কাছে পায়ে হেঁটে আসে। কলকাতায় নাকি দস্তুরমতো যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। একহাতে তলোয়ার, আরেক হাতে কোরান। ডাক ছাড়ছে, "আল্লাহো আকবর।" হিন্দুরা নাকি বোমা ফাটাচ্ছে। কারো কারো হাতে স্টেন গান। হাঁক ছাড়ছে, "জয় মা কালী

কলকত্তাওয়ালী।" ওদিকে শিখেরাও কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভবানীপুরকে ওরা মুসলিমমুক্ত করবে। গোরা সৈনিকরা চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু গুলী গোলা এখনো চালায়নি। গোরা পুলিশও নিরপেক্ষ।

এসব গালগল্পের উৎস কী? বারোজনের আড্ডা? না কোনো চোরাই রেডিও ট্রান্সমিটার? না লণ্ডনের বি. বি. সি.? মানস এসব গুজবে কান দেয় না। যূথিকাকেও বলে কর্ণপাত না করতে। কিন্তু অশ্রুপাত তা সত্ত্বেও থামে না।

শেষকালে পুলিশ থেকে একজন কনস্টেবল মেসেজ নিয়ে এসে দেখায়। কলকাতা থেকে পুলিশ ওয়্যারলেসে এসেছে। "রায়চৌধুরী পরিবার পুলিশের গাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। নিরাপদে আছেন। ছন্দা।" পুলিশ সাহেব তার উপরে লিখেছেন "শো জজ।"

মানস যূথিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। যূথিকা হেসে বলে, "ছাড়ো। ছাড়ো। দেখছে।" পুলিশের লোক পালায়। মুচকি হাসে।

দীপক আর মণি ছুটে আসে। কী হয়েছে? কী হয়েছে? তখন তাদের খুলে বলতে হয় যে তাদের দাদামশায় ও দিদিমা বেঁচে আছেন। তারা অবাক হয়। তাঁদের কথা তো মা কোনোদিন বলে না। প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যায়। দীপকের বোঝবার বয়স হয়েছে যে বলবার মতো নয়। সে আর ও প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু মণি মাঝে মাঝে বায়না ধরে। যূথিকা নিরুত্তর।

রেডিওতে দিনের বেলা যা বলে তা আশাপ্রদ নয়। দাঙ্গা থামেনি। সরকার আরো কড়া ব্যবস্থা করেছেন। রাত ন'টায় শোনায় দাঙ্গা এবার ভাঁটার মুখে। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা দেয় না। আর শুনেই বা কী হবে? হিন্দু মুসলমানের শ্রান্তি না এলে ইংরেজদের কিসের গরজ? সে তো আরো দশ বিশ বছর সুস্থ শরীরে ও বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে পারবে। সাম্রাজ্যের উপর সূর্য অস্ত যাক এটা কি সত্যি ওরা চায়? ওরা যদি চলে না যায় স্বাধীনতাও হবে না, পার্টিশনও হবে না। না হবে হিন্দুস্থান, না পাকিস্তান। আর কিছু না হোক, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মাইনরিটি নিরাপদ।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, চিঠিপত্র আসে না। ট্রাঙ্ক কল বুক করে না, টেলিগ্রাম পাঠায় না। তেমনি অচল অবস্থা। তবে বিকেলের দিকে দু'চার জন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে পৌঁছয়। যত সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাহিনী ছড়ায়। তাদেরই হাত থেকে কয়েকখানা দু'পাতার পত্রিকা ধার করে এনে নাজির দেখান মানসকে। হিন্দুদের কাগজে লিখেছে মুসলমানরা হিন্দুদের ধরে নিয়ে গিয়ে নাখোদা মসজিদের প্রাঙ্গণে কোরবানী করেছে। আর হিন্দুরা মুসলমানদের ধরে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটের কালীমন্দিরে বলি দিয়েছে। খুঁটিনাটি সমেত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মানস তো হাঁ। এ কি কখনো সম্ভব। বাঙালী হিন্দু মুসলমান কি এত নিচে নামতে পারে। বিশ্বাস হয় না। অথচ হয়ও। যুদ্ধে কী না সম্ভব? ত্রিশ বছরের যুদ্ধে জার্মানীর ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টরা নাকি মানুষের মাংস খায়। সে ঐতিহ্য এখনো লুপ্ত হয়নি। গত মহাযুদ্ধে নাৎসীরা লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মেরেছে, তবে খায়নি। হিন্দু মুসলমান যদি এ গৃহযুদ্ধ এক্ষুণি না থামায় তা হলে কার কপালে কী আছে কেউ তা জানে না। হার জিৎ তো সব যুদ্ধেই থাকে, কিন্তু এই যে ব্রুটালাইজেশন এর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। মানস যূথিকাকে এসব কথা জানায় না। ছেলেমেয়েকেও না।

পরের দিন 'স্টেটসম্যান' পায়, হেডলাইন হলো 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। ভিতরে লিখেছে কলকাতায় যা ঘটে গেল তা ইউরোপের মধ্যযুগের মতো একটা 'ফিউরি' (Fury)। সীমাহীন উন্মত্ত ক্রোধ। আগুন এখনো নেবেনি। থামেনি। তলে তলে ধোঁয়াচ্ছে। 'অমৃতবাজার' গভীর পরিতাপ প্রকাশ করে হিন্দু মুসলমান উভয়কে দোষ দিয়েছে। এ তোমার এ আমার পাপ। এ রকম যদি চলে তবে স্বাধীনতা দূর অস্ত্। সভ্যতাও থাকে কি না সন্দেহ।

রাস্তায় ঘাটে রাশি রাশি শব। বিস্তর শব গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে তাই সঠিক বলতে পারা যাচ্ছে না কত লোক মরেছে। হিন্দু কত, মুসলমান কত। লুটপাট অজস্র হয়েছে। গৃহদাহের সংখ্যাও কম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দৃশ্য। শকুন উড়ে এসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সরকার ও মিউনিসিপালিটি নাজেহাল। আর্মি এসে শব তুলে নিয়ে সৎকার করছে। নইলে মড়ক।

মানস যূথিকাকে দেখাবে কি দেখাবে না? সে ওৎ পেতে থাকে, ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তি কে কে নিহত তাঁদের নাম তন্ন তন্ন করে দেখে। না, তার বাবা মার নাম নেই। বিশিষ্টরা গা বাঁচিয়েছেন, গরিবেরা মরেছে। যারা দিন আনে দিন খায়, পথে না বেরিয়ে পারে না। আর যারা বস্তিতে থাকে।

ওরা দু'জনেই স্থির করে যে একদিন অনশনে থেকে নিহতদের জন্যে শোক করবে। ছুটির দিন দেখে। সেদিন তাদের মোর্নিং ড্রেস।

এর পরে কাগজ খুললে যথারীতি গালাগালি বর্ষণ। যত দোষ সুহরাবর্দী, যত দোষ বারোজ, যত দোষ জিন্না, যত দোষ ওয়েভেল। গান্ধী নেহরুও বাদ যান না। রোম পুড়ছে, নীরো বেহালা বাজাচ্ছেন। গান্ধী বাঙালীকে কোনোদিন ভালোবাসেননি, জবাহরলাল তো বাঙালীকে ঘৃণাই করেন।

"সত্যি, বাপু কেন একবার কলকাতায় এলেন না?" যূথিকার ধারণা তিনি এলেই সবাই শান্ত হতো।

"ওদিকে ওয়েভেল আবার ওয়েভার করছেন। শান্তির জন্যে লীগকে কিছু কনসেসন দিতে হবে। অর্থাৎ কংগেস-মুসলিমদের ডুবিয়ে দিতে হবে। নেহরুকে বল জোগাবার জন্যে বাপুকে থাকতে হচ্ছে দিল্লীতে। সেটাই তো প্রথম কর্তব্য। দেশের স্বাধীনতাই তো সকলের আগে।" মানস যতদূর বোঝে।

মাসের শেষে হঠাৎ বাবলী আর তার বান্ধবী আসে দেখা করতে। তারা তেভাগা আন্দোলন উপলক্ষে এ জেলায় পর্যটন করছে। কলকাতার অবস্থা কী রকম জানতে চাইলে বলে, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়াইয়ের ফলে কলকাতা এখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের এলাকায় পা দিতে ভয় পায়। আমরা তৃতীয় পক্ষ বলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। আমাদের পার্টি কার্ডই আমাদের পাশপোর্ট।"

মানস ও যূথিকা সুধায়, "স্বপনদার খবর কী? বৌদির কী খবর?"

বাবলী উত্তর দেয়, "সেই কথাই তো বলতে এসেছি। ওঁরাই জানাতে বলেছেন। ওঁদের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে দিয়েছে। এখন ওঁরা হিন্দুস্থান পার্কে সুবিনয় তালুকদারের অতিথি। ইচ্ছে ছিল সাত আট দিনের মধ্যে অবস্থা শান্ত হলে বালীগঞ্জ পার্কে ফিরবেন। কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্ট থাকতে হয় কোয়ালিশন, নয় গভর্নরস রুল দুটোর একটা হলেই ওঁরা ফিরবেন, নয়তো অন্য কোথাও একটা খালি ফ্ল্যাট ভাড়া করবেন। পরের বাড়িতে চাকর ও কুকুর নিয়ে থাকা যায় না, রান্নার উপরেও এক্তিয়ার নেই। কিছুদিন রাঁচীতে কি দেওঘরে গিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু বৌদির ভয় বেওয়ারিস পেয়ে বাড়ীটা বস্তির মুসলমানরাই বেদখল করে নেবে। ওদের জ্বালাতেই আধ ঘণ্টার নোটিসে বাড়ী থেকে পালাতে হলো।"

"সে কী কথা! আধ ঘণ্টার নোটিসে!" মানস ও যূথিকা হতবাক।

"সংক্ষেপে বলি। উর্দুকে বাংলায় তর্জমা করে বলছি। ষোল তারিখ রাত্রে ওঁরা যথানিয়মে শুতে গেছেন। ঘুমিয়েও পড়েছেন। হঠাৎ এলফ্রেন্ডের অবিরাম চিৎকার শুনে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। বেয়ারা ছুটে এসে বলে, ডাকাত পড়েছে। জানালায় মুখ গলিয়ে দেখেন মশাল আর নিশান হাতে বারো তেরো জন লুঙ্গী পরা লোক চেঁচিয়ে বলছে, দরজা খোল। নইলে দরজা ভাঙব। স্বপনদা দু'তিনজনকে চিনতে পারেন। বস্তিতেই থাকে। মাঝে মাঝে চাঁদা নিতে আসে। আপদে বিপদে আইনের পরামর্শও চায়

ব্যাপার কী, চাঁদ মিঞা? এত রাতে কী মনে করে? স্বপনদা সুধান। সালাম আলায়কুম, সাহেব। উত্তর কলকাতার হিন্দুরা মুসলমানদের মেরে খেদিয়ে দিয়েছে, কেটেও ফেলেছে কয়েক হাজারকে। দক্ষিণ কলকাতায় তাদের জায়গা দিতে হলে হিন্দুদেরও মেরে খেদিয়ে দিতে হয়, দরকার হলে কেটেও ফেলতে হয়। আপনি আমাদের মুরুব্বি, আপনাকে মারতেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, খেদিয়ে দিতেও কি পারি? না, সে রকম বেইমান আমরা নই। কিন্তু মেহেরবানি করে বাড়ীটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আজকেই সমস্তটা নয়, শুধু নিচের তলাটা। আপনারা তো দোতালাতেই থাকেন, আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকুন। কাল যেখানে পারেন চলে যাবেন। মালপত্তর, চাকরবাকর, কুকুর বেড়াল সব কিছু নিয়ে। আমরাই বয়ে নিয়ে ট্রাকে তুলে দেব। দাদা দেখেন তর্ক করা বৃথা। ধাঁ করে টেলিফোনের ঘরে গিয়ে রিং করেন। কিন্তু লাইন এনগেজড। পুলিশের আশা ছেড়ে দিয়ে বৌদির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকান। বৌদি চেঁচিয়ে বলেন, রামদীন, বন্দুক নিকালো। জানালার মুখ গলিয়ে বলেন, গোলী চলেগি। দো আদমীকো জান জায়েগা। ওরা বিশ্রী ভাষায় বৌদিকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয়। শাসিয়ে যায় যে কাল আবার আসবে, সঙ্গে সব রকম অস্ত্রশস্ত্র ও আরো অনেক জন। লাট সাহেব ওদের পক্ষে, বড়ো উজীর ওদের পক্ষে। গোলী চলেগি তো দোনো তরফসে চলেগি। দাদা ততক্ষণে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। বৌদি দাপটের সঙ্গে বলেন, বড়লাট আমাদের পক্ষে, মিলিটারি আমাদের পক্ষে। ট্যাঙ্ক চালিয়ে বস্তি বিলকুল সাফ করে দেবে। পরের দিন সকালে মীর সাহেব পুলিশের গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। বলেন, যশোবিকাশ রায়কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে বেরিয়েছি। তাঁর মেয়ে টুকটুক আমাকে খবর দিয়েছে যে আপনারাও বিপন্ন। আপনাদের বেয়ারা তার সঙ্গে দেখা করে কালকের ঘটনার বর্ণনা শুনিয়েছে। কী লজ্জার বিষয়! শহীদকে রিং করতেই তিনি পুলিশের গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটি পরিবারের জন্যে জায়গা আছে। আধ ঘন্টা সময় দিচ্ছি। জান বাঁচাতে চান তো অবিলম্বে তৈরি হোন ইতিমধ্যে রায় পরিবারকে নিয়ে আসি। ওঁদেরও আধ ঘন্টা সময় দিয়েছি। কোন্ ঠিকানায় যাবেন মনঃস্থির করুন। আগে থেকে টেলিফোনে খবর দিন। মনে করুন এটা মিলিটারি ইভাকুয়েশন। সাত আট দিন পর বাড়ী ফিরবেন। যাবার সময় বন্দোবস্ত করে যান কে চার্জে থাকবে। গাড়ীতে চড়ে তিনি উধাও হন।" বাবলী বলে যায়।

"এ যে রীতিমতো নাটক!" মানস কৌতূহলী হয়।

"উঃ। কী দুঃখের! নিজ বাসভূমে পরবাসী!" মৃণ্ময়িকা ব্যথিত হয়।

"টুকটুকের এটা নোবল রিভেঞ্জ, স্বপনদা বলেন। বৌদি শিউরে ওঠেন ডবল ডাইভোর্সীর সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে হবে? আমার তো ভয় করছে ওর মতলব ভালো নয়। কিন্তু কী করা যায়! বিপাকে পড়লে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়। বৌদি কী কী সঙ্গে নেবেন চট করে স্থির করে ফেলেন। স্বপনদা কোন্টা রেখে কোন্টা নেবেন ভেবে পান না। তাড়াতাড়ি যা হাতের কাছে পান তাই নিয়ে গাড়ীতে ওঠান। সব দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করা হয়। বেয়ারা থাকে চার্জে। বাবুর্চিকে ছুটি দেওয়া হয়। ড্রাইভারটিও মুসলমান। তাকে নিলে অকারণে ঝুঁকি নেওয়া হয়। হিন্দুরা হয়তো মেরেই ফেলবে। বৌদি নিজেও গাড়ী চালাতে জানেন। কিন্তু তালুকদারের ওখানে গারাজ পাবেন কোথায়? গাড়ী ও বাড়ী পাহারার বন্দোবস্ত করতে মীর সাহেবের সাহায্য চান। তিনি পুলিশের উপরে বরাত দেন। তালুকদারকে ফোন করা হয়। তিনি আশ্রয় দিতে খুশি হয়ে রাজী হন। এদ্দফকেও স্বাগত জানান। গুপ্তদের হিন্দুস্থান পার্কে নামিয়ে দিয়ে রায়েরা চলে যান রিজেন্টস পার্কে। সেখানে সে পরিবারের অতিথি হবেন। সেখানেও গারাজ পাবেন না বলে নিজের গাড়ী বাড়ীতে রেখে গেছেন। পুলিশের গাড়ীতে উঠে স্বপনদা বলেন যশোবিকাশ রায়কে, আফটার অল, শহীদ ইজ আ ব্যারিস্টার অ্যাণ্ড অ্যান অকসোনিয়ান. যশোবিকাশ বলেন, ইয়েস। হী ইজ ওয়ান অভ্ আস অ্যাট হার্ট। বৌদি আর টুকটুক দু'জনেই ক্ষেপে যান। বৌদি

বলেন, গোরু মেরে জুতো দান! টুকটুক বলেন, অক্সফোর্ড ও। হাসাহাসি পড়ে যায়। সেই থেকে ওঁরা দু'জনে দুই বান্ধবী। টুকটুক আর প্রেমে পড়তে চান না, বিয়ে করতে চান না। নাচ গান নিয়ে বাকী জীবনটা কাটাতে চান। রুক্মিণী দেবী অ্যারাণ্ডেলের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভাবছেন। আমি তো জানতুম না যে স্বপনদারা বাড়ী বদল করেছেন। ওঁর ওখানে গিয়ে রামদীন বেয়ারার মুখে বৃত্তান্ত শুনি। সে একপাল ভোজপুরীকে ডেকে এনে জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের সকলের হাতে ইয়া ইয়া লাঠি। তারপর তালুকদারদের ওখানে গিয়ে দেখা করি। উনি যখন শোনেন আমি তেভাগার তদারক করতে মফঃস্বলে বেরোচ্ছি তখন আমাকে বলেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা শোনাতে। স্বপনদার এখন লিখতে হাত কাঁপে, হাঁটতে পা কাঁপে। ডাক্তাররা বলছেন ট্রাউমা (trauma)। বৌদি বিষম ভাবনায় পড়েছেন। আচ্ছা, ওটা কি সারে না?" বাবলী সুধায়।

মানস ভয় পায়, কিন্তু অভয় দিয়ে বলে, "সারে বই কি।"

বাবলী আরো বলে, "ওদিকে পুলিশের লোক গিয়ে রামদীনের কাছ থেকে সে রাত্রের ঘটনার বিবরণ শুনে লিখে নিয়ে গেছে। বস্তিতে হয়েছে ধরপাকড়। চাঁদ মিঞা এখন সদলবলে জেল হাজতে। মুসলিম লীগের উকীলরা ওদের জন্যে আদালতে জামিন প্রার্থনা করে বিফল হয়েছেন। গভর্নরের এখন টনক নড়েছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের উপর কড়া হুকুম জারি করেছেন। মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্টে রয়েছে বলে গভর্নরের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে এটা তিনি সহ্য করবেন না। যে কোনোদিন বরখাস্ত করবেন। নয়তো তাঁর নিজের আসন টলমল। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বললে ভুল হবে না, আবার হচ্ছে বললেও ভুল হবে। হিন্দুরা এখন ঘরপোড়া গোরু। তারা সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিস্তর সজ্জন আছেন, তাঁরা বহু হিন্দুকে রক্ষাও করেছেন, আশ্রয়ও দিয়েছেন তবু মুসলমানদের কাউকেই হিন্দুরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না। নখী দন্তী শৃঙ্গীদের মতো মুসলমানদের থেকেও ওরা শত সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চায়। যারা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে তারা আর পাড়ায় ফিরতে রাজী নয়। এ সমস্যার সমাধান গভর্নরের হাতে নয়। তিনি তাই কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের পক্ষপাতী। কিন্তু তার জন্যে জিন্নার অনুমতি দরকার। জিন্না সেটা কেন দেবেন যদি বড়লাট ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাঁর মুখ রক্ষা না করেন? বড়লাট কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করতে অনিচ্ছুক। ঝগড়া করতে হলে করতেন ব্রিটিশ স্বার্থে। কিন্তু মুসলিম লীগের স্বার্থে একটিও ইউরোপীয় জীবনকে তিনি বিপন্ন করবেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে কংগ্রেস আরেক দফা আন্দোলন শুরু করলে বামপন্থীরা গান্ধী, নেহরু কারো তোয়াক্কা রাখবে না। ইউরোপীয়দের পিটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানদের গায়ে হাত দেবে না। দেশ এখন আগুন হয়ে রয়েছে। বড়লাট মুসলিম লীগের স্বার্থে বড়ো জোর এইপর্যন্ত করতে পারেন যে নতুন গভর্নমেণ্টে মুসলিম লীগের জন্যে পাঁচটি আসন সংরক্ষিত থাকবে, কিন্তু কংগ্রেসের জন্যে সংরক্ষিত আসন সে হিন্দুকে দেবে না মুসলমানকে দেবে সেটা কংগ্রেসের মর্জি। লীগের মর্জি নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই সামান্য পয়েণ্টটুকু মেনে নিতে তাঁর দু' দু' মাস লাগল। শুনেছি কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশনের খাতিরে একজন কংগ্রেস-মুসলিমকে বাদ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, মওলানা আজাদ পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বাধা দেন। কংগ্রেস-মুসলিমদের স্বার্থত্যাগ কারো চেয়ে কম নয়। ত্যাগের দিন যাঁরা ত্যাগের সাথী ভোগের দিন তাঁরা ভোগের সাথী হবেন এটাই তো ন্যায়নীতি। তিনি বোধহয় অনুমান করতে পারেননি তার পলিসির পরিণাম কী হবে। হয়েছে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। যার ভুক্তভোগী অসংখ্য নিরীহ হিন্দু মুসলমান। শতকরা পঁচানব্বই জন গরিব মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়। আমরা এ পলিসি কী করে সমর্থন করি? এটা ন্যায়নীতি হতে পারে, রাজনীতি নয়। যাই হোক, এতে আমাদেরই লাভ হয়েছে। আমরাই এখন দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে একমাত্র সেতুবন্ধ। নির্ভয়ে বিচরণ করি। উভয় পক্ষকেই অভয় দিই। আমাদের

উপর লোকের আস্থা বেড়েছে। আজ যে আমরা এই মুসলিম-প্রধান জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি সম্ভব হতো যদি আমাদের পরিচয় হতো আমরা কংগ্রেসের লোক বা হিন্দু গান্ধীর শিষ্য? জুলি কি সে রকম পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের মন পেতে পারছে? সৌম্যদাও কি আজকের এই পরিস্থিতিতে সেতুবন্ধন করতে পারছেন? সেতুভঙ্গ তো চার বছর আগে ঢের করলেন।"

যূথিকা স্বপনদার জন্যে উদ্বিগ্ন। "ওঁর ব্রেন ঠিক আছে তো?"

"ষোল আনা ঠিক আছে। শকটা তো ব্রেনে নয়। প্রাণে। ওই যারা রাতের মাঝখানে এসেছিল তাদের হাতে ভাগ্যিস্ অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। থাকলে বৌদির দোনলা বন্দুক কতটুকু কাজে লাগত? হিংসা পরাস্ত হতো প্রবলতর হিংসার কাছে। বৌদির অপমানের সীমা থাকত না। আর দাদার তো প্রাণটাই যেত। কথাটা নির্জলা সত্য। আমিও চিন্তা করে দেখছি মুসলমানরা যে হিংসার মার্গ ধরেছে এই মার্গ যদি হিন্দুরাও ধরত তা হলে হিন্দুর সর্বনাশ যা হতো তার চেয়ে চার গুণ বেশী হতো মুসলমানের সর্বনাশ। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। ওরা লড়ছে ইংরেজদের জোরে। সে খুঁটিও আর আগের মতো জোরদার নয়। তার পরীক্ষা হয়ে গেল এবার কলকাতায়। কলকাতার তিনদিনের দাঙ্গাহাঙ্গামাকে যদি ব্যাটল অভ্ ক্যালকাটা বলেন তা হলে হিন্দুরাই জিতেছে, মুসলমানরা হেরেছে। প্রত্যেকবারই এ রকম হবে। এটা একটা ডিসাইসিভ ইভেন্ট। যেমন ব্যাটল অভ্ প্লাসী। আমার খুব খারাপ লাগছে একথা ভাবতে যে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়েও হিংস্র হয়েছে। ওরা ছিল মাইল্ড হিন্দু। হয়েছে ওয়াইল্ড হিন্দু। বর্বরতার প্রতিযোগিতায় ওরাই পয়লা নম্বর। ওদের হাতে সমগ্র ভারত সঁপে দিয়ে যাবে কেন ইংরেজ? মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে ওদেরও একভাগ দিয়ে যাবে। এটা একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল। তবে এটাও নিশ্চিত যে কলকাতা পাকিস্তানের ভাগে পড়বে না।" বাবলীর সিদ্ধান্ত।

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। তার তাৎপর্য কী বোঝো, বোন বাবলী? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তিন পুরুষের তপস্যা ব্যর্থ হবে। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা গান্ধীপন্থী তাঁদের এক পুরুষের সাধনা মুছে যাবে। সৌম্যদা তার শাহাদাত দিয়ে কী করে এ তরঙ্গ রোধ করবে? আর তার বাপুর যা হবে তা কি বিয়োগান্ত নাটকের শেষে যা হয়?"

যূথিকা বেদনা বোধ করলেও হাসির ভান দিয়ে ঢেকে দেয়। "তোমরা থাকতে আমাদের ভাবনা কী? একটা বিপ্লব টিপ্লব কিছু ঘটাও। মানুষের মনটা এই মধ্যযুগের মিথ্যা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হোক। এরাও বুর্জোয়া, ওরাও বুর্জোয়া। যাঁহা কংগ্রেস তাঁহা মুসলিম লীগ। বুর্জোয়াতে বুর্জোয়াতে এক মুহূর্তেই কোলাকুলি হবে, যেই দেখবে লাল কেল্লার মাথায় লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। প্রতিবিপ্লবের জন্যে ওরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একজোট্টা হবে। আজকের নেতাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কী বল, ভাই? তোমার নামটি কী?"

"মাধুরী হোম। আমি এই শহরেরই মেয়ে। গাইড হয়ে এসেছি। কমরেড নই। রাজনীতি বুঝিনে। মেয়েদের স্কুলে পড়াই।" বান্ধবী বলে।

"ওঃ। আমার ধারণা ছিল তুমিও ঘরসংসার ফেলে বিপ্লব করে বেড়াচ্ছ। এসো একটু খাবার টেবিলে বসা যাক। আচ্ছা, বাবলী, বৌদিকে কেমন দেখলে বললে না তো। আর তাঁর এলফকে।"

"বৌদি হোমসিক। আর এল্ফ পরের বাড়ীতে এসে প্রতিক্ষণে অনুভব করছে সে আর স্বাধীন নয়। তার মুখে রা নেই। দেখে মায়া হয়। স্বপনদা তো বলছেন আর ওমুখো হবেন না। ওইসব লোকের মুখ দর্শন করবেন না। শেষে কি স্বামীস্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? কলকাতার দাঙ্গায় ওঁদের সোনার সংসার ছারখার হবে? এটাও কি কম ট্র্যাজিক?" বাবলী জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসার ভিতরেই উত্তর।

।। চব্বিশ ।।

ভোজনের মাঝখানে মানস বলে, "বোন বাবলী, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি সোজা পথে কলকাতা ফিরে না গিয়ে বাঁকা পথে ঘুরে যেতে পারবে?"

"কেন পারব না? তবে পার্টির কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। জানো তো, পার্টি ফার্স্ট। কিন্তু ব্যাপার কী, বলো তো?" বাবলী বিস্মিত।

"তুমি স্বপনদাদের খবরটা জুলিদের একবার শুনিয়ে গেলে ভালো করতে। সেইসঙ্গে জুলির মায়ের খবরটাও।" মানস উত্তর দেয়।

"নিশ্চয়। আমি কালকেই রওনা হয়ে যাব। তার আগে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। জুলিটাকে এত দেখতে ইচ্ছে করে। দেখা হলে খুব ঝগড়া করব ওর সঙ্গে। লড়াই টড়াই ছেড়ে কেমন বর নিয়ে ঘরসংসার করছে।" বাবলী হাসে।

সবাই হাসাহাসি করে। যূথিকা বলে, "তা তোমাকেই বা মানা করছে কে? পার্টিতেও তো সুপাত্রের অভাব নেই। বিয়ের নজীরও তো রয়েছে।"

"আচ্ছা, যূথীদি, তুমি কি এদেশের মেয়ে নও? তুমি কি জানো না যে শ্বশুর শাশুড়ীর মত না থাকলে বিয়ে সুখের হয় না? জুলির শ্বশুর শাশুড়ী থাকলে বিয়েই হতো না। তার বদলে বিপ্লব হতো।" বাবলী রসিকতা করে।

"থাক, বোন বাবলী। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ও প্রসঙ্গ থাক। এখন শোন। তোমার হাতে আমি একখানা চিঠি দিতে চাই। সেটা সৌম্যদার জন্যে। ওর মাথায় একটা ভূত চেপে রয়েছে, শাহাদাৎ। ও শহীদ হবে। তুমি কি ওকে বুঝিয়ে বলতে পারবে যে বিয়ের পরে শহীদ হওয়ার স্বাধীনতা ওর নেই? শহীদই যদি হবে তো বিয়ে করতে গেল কেন? অমন বৌ বহু ভাগ্যে মেলে। ও বেচারি শবরীর মতো কতকাল প্রতীক্ষা করেছে। ওর কি আর কারো সঙ্গে বিয়ে হতো না? পাত্র তো বিলেত থেকে বার বার ধাওয়া করে এসেছিল। ওই, যার সঙ্গে মিলির বিয়ে হলো।" মানস বলে।

"ওমা, তাই নাকি! মিলির বর জুলিকে বিয়ে করতে এসেছিল? কার সঙ্গে কার বিয়ে হয় প্রজাপতিই জানেন" বাবলী যেমন শুনেছে।

"সত্যি! আমিই কি জানতুম যে এই বরটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? ইনিও সৌম্যদার দোসর। ইনি নীরব দর্শক হবেন না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। কলকাতার দাঙ্গার খবর শুনে ছটফট করছিলেন, দাঙ্গাটাও তো একরকম যুদ্ধ। ইনি বলেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। পদত্যাগের কথা তো হামেশাই বলেন। তা তুমি সৌম্যদাকে বুঝিয়ে বলবে যে দেশ তাঁর কাছে শহীদিয়ানা চায় না। ইংরেজরা এখন যাবার মুখে, তারাই ডেকে নিয়ে কংগ্রেসকে তাদের সিংহাসনে বসিয়ে দিচ্ছে। পরশু জবাহরলালের অভিষেক। কৈকেয়ী বাগড়া দিতে চেষ্টা করেছিলেন, ব্যর্থ হয়েছেন। কলকাতা ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কোনো কাণ্ডকারখানা হয়নি। আর কলকাতায় যা হয়েছে তা তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, ইংরেজদের সঙ্গে যারা এতকাল লড়াই করে এসেছে সেই হিন্দুদের উপরেই অযাচিত আক্রমণ। গজনীর মাহ্‌মুদের মতো। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু অত সহজ নয়। ওদের গজনীতেই ফিরে যেতে হবে। ইংরেজরা যাচ্ছে, ওরাও যাক।" যূথিকা উত্তেজিত হয়ে বলে।

মানস মৃদু হেসে বলে, "গজনীতে ফিরে যেতে চাইলেও পাশপোর্ট লাগবে। ভিসা লাগবে। যতজন এসেছিল তাদের সংখ্যা নগণ্য। বাড়তে বাড়তে যতজন হয়েছে তাদের সংখ্যা আফগানিস্থানের

মোট জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। তা হলে আফগানরা যাবে কোথায়? একই কথা মোগল বংশধরদের বেলাও। তা ছাড়া ন' কোটি মুসলমানের সবই তো আরব, ইরানী, তুর্ক, আফগান, মোগল বংশের নয়। তারা স্বীকার না করলেও তাদের চেহারা, তাদের ভাষা ধরিয়ে দেয় যে তারা ভারতীয় বংশধর। ধর্মান্তর বংশান্তর নয়। এখন এদের পা কী স্থানে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা কেউ দিতে পারো?''

''পাকিস্তানে।'' যূথিকা, বাবলী, মাধুরী একসঙ্গে বলে ওঠে।

তখন মানস বলে, ''কেউ ওদের যেতে বাধ্য করছে না। ওরাই পা তুলে বসে আছে। ইংরেজ যাচ্ছে, সুতরাং ওরাও যাবে। ইংরেজ যাবে তার হোমে, অতএব ওরাও যাবে ওদের হোমল্যাণ্ডে। যাওয়াটা দু'দশবছর পরে হলে চলবে না। একই সঙ্গে, একই সময়ে। বরং একদিন আগে। হিন্দু নেটিভদের আওতায় বা অধীনে একটা দিনও নয়। সেই দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে ওরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাধিয়ে দেবে। সে সংগ্রাম অস্ত্রশস্ত্র ও মশাল নিয়ে। হিন্দুরা যদি সমান সহিংস হয় তবে যা হবে তা সাধারণ দাঙ্গা নয়, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলা হতো 'ফিউরি'। অন্ধ আক্রোশে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য পশুর চেয়েও নৃশংস হওয়া। জিন্না সাহেব বছর পাঁচ ছয় আগে এডওয়ার্ড টমসনকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের জন্যে লড়াই বাধবে গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে শহরে শহরে মহল্লায় মহল্লায়। টমসন চমকে ওঠেন। এটা কি কখনো সম্ভব? জিন্না সাহেব দেখিয়ে দিলেন যে সম্ভব। আপাতত কলকাতায়। মুসলমানরা যদি জেতে তবে তো পাকিস্তান আদায় হবেই, যদি হারে তা হলেও পাকিস্তানের কেস মজবুত হবে। সম্রাটের দরবারে হিন্দুদের অত্যাচারের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান প্রার্থনা করা হবে। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবেও। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক যেন নর্মান ও অ্যাংলো-স্যাকসনের সম্পর্ক। তেমনি পুরাতন। তেমনি অবিচ্ছেদ্য। কে যে নর্মান, কে যে অ্যাংলো-স্যাকসন তা কি এখন জোর করে বলবার উপায় আছে? একই রকম পোশাক পরলে, দাড়ি গোঁফ কামালে কেউ কি বুঝতে পারে কে মুসলমান, কে হিন্দু? হিন্দুরাও চোস্ত উর্দু বলে, মুসলমানরাও খাঁটি ভোজপুরী। মেয়েদের বেলা তো কথাই নেই। গ্রামে গ্রামে যখন লড়াই বাধবে তখন দেখবে রাতারাতি সবাই ভোল পালটেছে বা সদলবলে পালিয়েছে। এখন আমার ভাবনা কলকাতার মহামারী যেন পূব বাংলায় সংক্রামিত না হয়। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব মুসলমান হলেও কমিউনাল নন। তাঁরা শান্তিরক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমিও তাই। কিন্তু আমরা আর ক'জন! তবে আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিপ্রিয়। তারা সহযোগিতা করবে।''

এরপর ওদের গল্প করতে বলে মানস চলে যায় ওর লেখার টেবিলে। চিঠি লেখে সৌম্যদাকে ও স্বপনদাকে। চিঠি দুটো বাবলীর হাতেই পাঠাবে। বাবলীকে অনুরোধ করবে সৌম্য ও জুলির সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরতে।

সৌম্যকে লেখে, ''স্টেটসম্যান যাকে বলছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আমি তাকে বলব সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। প্যারিসে যা ঘটেছিল প্রায় চার শতাব্দী পূর্বে। রাজমাতার প্ররোচনায় ক্যাথলিকরা প্রটেস্টাণ্টদের সদলবলে নিপাত কিংবা বিতাড়ন করে। বিতাড়িত প্রটেস্টাণ্টরা ইংলণ্ডে গিয়ে রানী এলিজাবেথকে জানায়। এলিজাবেথের প্রতিবাদে ক্যাথারিন ডি মেডিসি উত্তর দেন, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমিও তোমার প্রটেস্টাণ্টদের নিপাত কিংবা বিতাড়ন করতে পারো। তাই হয়। এখন আমার আশঙ্কা এদেশেও সেইরকম কিছু না ঘটে। অহিংসোবাদীদের অন্য রকম উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। যাতে হিন্দুও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। মুসলমানও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। বাপু বোধ হয় এটাকে সাধারণ 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে'র প্রশ্ন মনে করে ব্রিটিশ শাসকদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এটা তার চেয়েও সীরিয়াস? এটা একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। কলকাতার ঘটনার বিবরণ যা শুনছি ও পড়ছি তাতে মনে হয় হিন্দু মুসলমানের ক্রোধ এত প্রচণ্ড যে তারা বন্দুক বেয়োনেট হাতে পেলে তাও ব্যবহার করত। ডাইনামাইট হাতে পেলে তাও। দ্বন্দ্বের এক দিকে হিন্দুদের

ব্রুট মেজরিটি। অন্যদিকে মুসলমানদের ব্রুট ফোর্স। এর কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই ভেবে বার করতে হবে। বাপু থাকতে আর কে সে কাজ করতে পারেন? আমরা যারা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' বজায় রাখতে নিযুক্ত তাদের দৌড় ততদূর নয়। আর আমরাও তো হিন্দু মুসলমানে বিভক্ত। হিন্দু যদি ঝাঁকে ঝাঁকে মরে আমিও কি উত্তেজিত না হয়ে পারি? তেমনি, মুসলমান যদি খাতারে খাতারে মরে কোন্ মুসলিম অফিসার মাথা ঠাণ্ডা রেখে মন দিয়ে হিন্দু রক্ষা করতে পারবেন? বলা বাহুল্য ইউরোপীয় অফিসার এখানে একজনও নেই, থাকলেও তিনি হয়তো কলকাতার গোরা পুলিশের মতো নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকতেন। যতদূর শুনেছি। বাস্তবিক, তাঁরা তো যাবার মুখে। তাঁদের কী স্বার্থ, কেন তাঁরা হিন্দুর দিকে বা মুসলমানের দিকে ঝুঁকতে চাইবেন? ঝুঁকলে সমতা রাখবেন। সেটাই তাঁদের পলিসি। বেশী হিন্দু বা বেশী মুসলমান ধরলে বা মারলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠবে। ওঁরা দু'পক্ষেরই গুডউইল চান। কোনো একপক্ষের নয়।"

স্বপনদাকে যা লেখে তা কতকটা একই প্রকার। তার সঙ্গে যোগ করে দেয়, "তুমি ফরাসী মানুষ। তুমি কী না দেখেছ? চারশো বছর আগে সেন্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। জনগণ দারুণ কমিউনাল ও মধ্যযুগীয়। তার দু'শো বছর বাদে তাদের উত্তরপুরুষরা আশ্চর্যরকম সেকুলার ও আধুনিক। রাজমাতার উত্তরনারী রাজরানী মারী আঁতোয়ানেতকেই তারা গিলোটিনে নিপাত করে। রাজত্বকেও উচ্ছেদ করে। ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে। চার্চের উপর থেকে পোপের আধিপত্য রহিত করে। চার্চের হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নেয়। আইনকানুন বদলে দেয়। সব মিলিয়ে যা হয় তাকেই বলে ফরাসীবিপ্লব। অপেক্ষা করো আর দ্যাখো। এইটুকুতেই তোমার হাত পা কাঁপছে! আরো কত কী দেখতে হবে, তখন তো হৃৎকম্প হবে। যদি না নিজেকে সামলাতে সমর্থ হও। বৌদিই তোমাকে সামলাবেন। তিনি শক্তিমতী।

তোমার কর্তব্য দেশের লোককে বৃহত্তর ও মহত্তর ভূমিকার জন্যে প্রস্তুত করা। ভলতেয়ারের মতো, রুশোর মতো, দিদেরোর মতো। এনসাইক্লোপীডিস্টদের মতো। হাত গুটিয়ে বসে না থাকলেই হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। পায়ের কাঁপুনিও থামবে সভায় সমিতিতে গেলে। উঠে দাঁড়াস্, উঠে দাঁড়াস্, ভেঙে পড়িস্ না রে।"

চিঠিখানা বাবলীর হাতে দেবার আগে মানস সবাইকে পড়ে শোনায়। বাবলী বলে, "যদি কিছু না মনে কর, মানসদা, তোমার থীসিসের বিসমিল্লাতেই গলদ। কংগ্রেস নেতারা তো বড়লাটের আহ্বানে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে পা বাড়িয়েছিলেনই আজাদকে বাদ দিয়ে। কিন্তু গান্ধীজীর ধনুর্ভঙ্গ পণ আজাদকে বা অন্য একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো যাওয়া চলবে না। ওদিকে জিন্না সাহেবেরও অনমনীয় জেদ লীগপন্থী ভিন্ন অন্য কোনো মুসলমান গেলে লীগ নেতারা যোগ দেবেন না। বড়লাট একপক্ষকে তুষ্ট করতে গিয়ে আরেক পক্ষকে রুষ্ট করতে চান না। তাই কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। সেটা নিতান্তই ঠিকা বন্দোবস্ত। শেষে মনঃস্থির করেন যে কংগ্রেসের শর্তে রাজী হবেন, একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে কংগ্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের একটা দেবেন। তার মানে গান্ধীর পণই বহাল রইল, জিন্নার জেদ খারিজ হলো। জিন্নার রাগটা পড়ল ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়ের উপরেই। রাগের মাথায় তিনি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন ও ঘোষণার দিন ধার্য করলেন। ব্যস্, অমনি বেধে গেল ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা। অন্যান্য স্থানে সে আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে ফেলা হয় কিংবা জ্বলতেই দেওয়া হয় না। ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়েরই পলিসি এক। ব্যতিক্রম একমাত্র কলকাতা। আর সে কী বিস্ফোরক ব্যতিক্রম! এটা বিলেতের লেবার গভর্নমেণ্ট পছন্দ করেননি, ভারতের বড়লাটও না। বাংলার গভর্নরও যে করেছেন তাও না। সুহরাবর্দীকে বিশ্বাস করতে গিয়েই এ ব্যাপার ঘটেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বাংলাদেশের আর কোনোখানেই

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন একটা ফাঁকা আওয়াজ। কংগ্রেস একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে নিয়ে ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যাচ্ছে। তবে ওটাও প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট নয়। ওটাও ফাঁকি। ওয়েভেলের নায়েব হয়ে নেহরু ইংরেজের জমিদারি চালাবেন। স্বাধীনতা না হাতী! বিপ্লব! বিপ্লব ছাড়া সাচ্চা আজাদী হতে পারে না। বিনা বিপ্লবে আজাদী ঝুটা আজাদী। এই হলো যথার্থ থীসিস। আর তোমার ওই ফরাসী বিপ্লবও সেকেলে বিপ্লব। একেলে বিপ্লব হচ্ছে রুশ বিপ্লব। তার জন্যে দেশকে তৈরি করতে হলে রুশো, ভলতেয়ার কোনো কর্মের নয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন পড়তে হবে, গণনাট্য অভিনয় করতে হবে। অমনি করে হবে গণজাগরণ ও রণ আয়োজন। অহিংসা! হা হা। হো হো। হি হি। সৌম্যদার যা হাস্যকর উপায়। এটা একটা মীথ। মানে মিথ্যা।''

মানস চুপ করে থাকে। যূথিকা মুখ খোলে। ''তোমরা কবে একেলে বিপ্লব ঘটাবে ততদিন ঘটনার স্রোত অপেক্ষা করবে না। ইনিশিয়েটিভ এতকাল গান্ধীজীর হাতেই ছিল, এখন জিন্না সাহেবের হাতে চলে গেছে। এই নির্মম সত্যকে বাপু কী ভাবে গ্রহণ করেন, কী ভাবে এর সঙ্গে মোকাবিলা করেন তার উপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ।''

বাবলী বিদায় নিয়ে পরের দিন সৌম্যর কর্মস্থলের অভিমুখে রওনা হয় ও সেইদিনই পৌঁছয়। সৌম্য তখন তার আশ্রমে উপস্থিত ছিল না। জুলি তার কুটিরের মেজের উপর আলপনা আঁকছিল। দিল্লীতে আজ প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!

জুলির সরল বেশ, সরল ভূষা, গৃহকর্ম নিপুণতা দেখে বাবলী রসিকতা করে, ''তুই যে পুরোদস্তুর কস্তুরবা বনে গেলি রে। তোকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে তুই জুলি। পতিব্রতা বলে এতখানি পতিব্রতা! তুই যে সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতির একজন হয়ে গেলি রে! চিরন্তনী ভারত নারী। পরে যখন মা হবি তখন উমা হৈমবতী। অবাক করলি, জুলি।''

কলকাতার প্রসঙ্গ ওঠে। বাবলী স্বপনদাদের দুর্ভোগের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে শোনায়। এল্‌ফের কথাও ভোলে না।

''আমার মা কেমন আছেন? অনেকদিন খবর পাইনি।'' জুলি সুধায়।

''দেখা হয়নি। খোঁজও নিতে পারিনি। তবে ও পাড়াটা এখনো পাকিস্তান হয়নি। সবাই নিরাপদ।'' বাবলী অভয় দেয়।

এর পরে অনেক সুখদুঃখের কথা। জুলিকে মিলি দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর মা বাবার ভালোবাসার টানে সে ওঁদের ওখানে এতদিন ছিল, এখন ওর নিজের কুটিরে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু এদিকেও নিন্দুকের টিটকারী শুনতে হচ্ছে। দিশী কুঁড়ে ঘরে বাস করে, বিলিতী টয়লেটে মাৎ করে।

''ওদের চুকলিতে কান দিতে নেই, ভাই। গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আমারও কি কম অসুবিধে হচ্ছে? তা বলে তো কমোড আশা করতে পারিনে। তুই বোধহয় গ্রাম অঞ্চলে যাস্‌নি। শহরে বসেই গ্রাম উন্নয়ন করছিস্। আজ হোক, কাল হোক তোকেও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। যদি সত্যি কস্তুরবা হয়ে থাকিস। ওইটেই অ্যাসিড টেস্ট।'' বাবলী খিল খিল করে হাসে।

''গ্রামে যাইনি তা নয়।'' জুলি সঙ্কোচের সঙ্গে বলে। ''দিনের বেলা চেপে রেখেছি। রাতের অন্ধকারে মাঠে জঙ্গলে গেছি। এখন বুঝতে পারি কেন এত নারীহরণ হয়। স্বরাজ তো হলো। এবার এর একটা স্থায়ী প্রতিকার চাই।''

''স্বরাজ তো হলো!'' ব্যঙ্গ করে বাবলী। ''রক্তবর্ণ শৃগাল ওই জবাহরলাল নেহরু। বিপ্লবও করেননি, জারকেও তাড়াননি, জারের অনুগ্রহে তাঁর শাসনপরিষদের পারিষদ হয়ে বলছেন ওটাই নাকি প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট! দু'দিন বাদে লাথি মেরে বিদায় করে দেবে, অ-পদস্থ হয়ে জেলে ফিরে যাবেন,

মুসলমানরা এমনি আনন্দের সঙ্গে 'মুক্তি দিবস' পালন করবে। আর জিন্না শাসাবেন, কংগ্রেস গদীতে ফিরে এলে আবার তুলকালাম কাণ্ড করব। লেনিনের ভাষায় কথা বললে কী হবে? লেনিন তো নন। গান্ধীও নন। আসলে উনি একজন ফেবিয়ান। লেবার গভর্নমেন্টের বেশীর ভাগ সদস্যই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ওঁরাও যে শক্ত হয়ে গদীতে বসতে পারবেন তাও নয়। রাজতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া এক দিবাস্বপ্ন।"

এমন সময় সৌম্যর প্রবেশ। হাতে সাজিভরা লাল পদ্ম। বাবলী উঠে দাঁড়ায়। কী মনে করে আভূমি প্রণত হয়।

সৌম্য চমকে ওঠে। "ও কী! কমিউনিস্টরাও প্রণাম করে নাকি!"

"তোমার কাছে আমি কমিউনিস্ট নই, আমি ছোট বোন। তাছাড়া তুমি একজন সাধু সন্ত। মাথা আপনি নত হয়ে আসে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয় সৌম্য। বলে, "এই যে কুটিরটা দেখছ এটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্রাইঘাটের কুটিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। সাজানো হয়েছে। সিলিং থেকে শিকেয় করে ঝুলছে হাঁড়ি পাতিল। তাতে চিঁড়ে, মুড়ি, খই, পাটালি, বাতাসা, দুধ, দই, ছানা, চা, চিনি। দড়ি ধরে টান দিলে সুড় সুড় করে নেমে আসে। কোন্‌টা খাবে, বলো।"

বাবলী ইতস্তত করে। সৌম্য তখন ওর সঙ্গিনীর দিকে তাকায়। সেও প্রণাম করেছিল। "তোমার পরিচয় তো দিলে না।"

"মুরলারানী সরখেল। আমি এইখানকারই মেয়ে। বেহুলাদির গাইড হয়ে এসেছি। কিন্তু কমিউনিস্ট নই।" মেয়েটি বলে।

"বেহুলাদি! বেহুলাদিটি কে?" সৌম্য বাবলীর দিকে তাকায়।

"ওঃ! তোমরা জানো না যে আমাদের একটা ছদ্মনামও থাকে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হলে ও ছাড়া আর উপায় কী! লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কি, গোর্কি এসব ছদ্মনাম ছাড়া আর কিছু নয়। আমারও তেমনি ছদ্মনাম বেহুলা। হিন্দুদের কাছে বেহুলা দেবী। মুসলমানদের কাছে বেহুলা বিবি। কিন্তু যতই যাই করি না কেন পুলিশ সব খবর রাখে।" বাবলী হাসে।

সৌম্য শিউরে ওঠে। "তুমি কি বোঝাতে চাও আমাদের আশ্রমেও?"

"হ্যাঁ, তোমাদের আশ্রমেও। তেমনি, পুলিশেও আমাদের লোক আছে। কোথায় নেই? প্রত্যেকটি আপিসেই প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজেই। এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমরা সর্বত্র ঢুকেছি।" বাবলী হাসিমুখে বলে।

জুলি কৌতূহলী হয়ে সুধায় লখিন্দর বলে কেউ আছে কি-না। বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "কোন্‌ সাহসে লখিন্দর হবে? সাপের কামড়ে মরবে না? তখন ওকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে ভেলায় করে ভাসতে হবে নাকি?"

দড়ি টেনে একে একে নামানো হয় হাঁড়ি পাতিল। যে যার পছন্দ মতো খায় যেটা খুশি।

"তোরা আজ এইখানেই ভাত খেয়ে যাবি। সবাই মিলে একটু গল্প গুজব করা যাবে। রাজনীতি নয়।" জুলি নিমন্ত্রণ জানায়।

বাবলী রাজী হয়। তখন জুলি রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার উদ্যোগ করে। মুরলা তার সাথী হয়। কুটিরে আর একটি মেয়েও ছিল। আশ্রমিকা। কালী।

বাবলী সৌম্যকে স্বপনদার কাহিনী শোনায়। সেটা শোনানোর জন্যেই এখানে আসা। মানসের অনুরোধে। স্বপনদা নিজে তো লিখবেন না, হাত কাঁপে।

"স্বপনদা তো বৌদির মতে প্রচ্ছন্ন মুসলমান। ওঁর মাতুল বংশ মোগল আমলের রইস তাঁদের

লাইব্রেরীতে এনতার ফার্সী কেতাব। আদব কায়দাও অনেকটা অভিজাত মুসলমানদের মতো। তাঁদেরি মতো সেই দোষ দুটোও ছিল। সুরা ও সাকী। ওঁরা লখনউ থেকে, বেনারস থেকে বাঈজীদের আনিয়ে গান শুনতেন, নাচ দেখতেন। স্বপনদার শৈশবটা তো মুর্শিদাবাদের নবাবী আবহাওয়াতেই কেটেছে। সেই মানুষকে যে মুসলমানরাই ঘরছাড়া করবে এটা কি কখনো ভাবা যায়? এর অভাবনীয়তাই তাঁকে বিহ্বল করেছে। বৌদিকে নয়।" বাবলী বিবরণ দিয়ে বলে।

সৌম্য দুঃখ প্রকাশ করে। "শুধু প্রচ্ছন্ন মুসলমানরা কেন, প্রকাশ্য মুসলমানরাও আজ দারুণ এক বিভীষিকার রাজত্বে বাস করছেন। ইংরেজ থাকতেই এই। ইংরেজ চলে গেলে মুসলিম লীগ যে কী না করবে তাই ভেবে মুসলমানরাও আতঙ্কিত। মৌলানা ইসমাইল হোসেন জালালাবাদীর নাম শুনেছ? খেলাফৎ আন্দোলনে তিনি ও আমি জেলবন্দী ছিলুম। সেদিনকার অনেকেই মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে ঘোরতর কমিউনাল হয়েছেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব এখনো খাদি পরেন, চরকা কাটেন, গঠনের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যদিও গান্ধীজীর মতো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। এমন মানুষের উপরেও লীগপন্থীদের রোষ। কেন তিনি পাকিস্তান সমর্থন করেন না? কেন তিনি ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেননি? তাঁর নাম এখন হয়েছে কালো ভেড়া। মুসলমানরা আর সবাই সাদা ভেড়া। ওরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নামকা ওয়াস্তে একটা প্রস্তাব পাশ করছে বলে ওরা নাকি লয়ালিস্ট নয়। ওরাই খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। মুসলিম ন্যাশনালিস্ট। আর মৌলানা সাহেব নাকি লয়ালিস্ট। তাঁকে ওরা একঘরে করেছে। পারলে ঘরছাড়া করবে। দিল্লীতে আজ যে রদবদল হচ্ছে তাতে থাকছে আজাদের বদলে আসফ আলী। তিনি কি মুসলমান নন? আর থাকছেন আলী জহীর ও শাফাৎ আহমদ খান্। এঁরাও কি মুসলমান নন? শাফাৎ আহমদকে বার বার ছোরা মেরেছে এক লীগপন্থী মুসলমান যুবক। ভদ্রলোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বপনদার তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি নয়। প্রকাশ্য মুসলমান হলে সেই আশঙ্কা ছিল।"

বাবলী স্বীকার করে যে লীগপন্থীদের পয়লা নম্বর শত্রু এখন পাকিস্তানবিমুখ অন্য দলের মুসলমানরাই। তবে কমিউনিস্ট মুসলমানদের কথা আলাদা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে মন খোলা রেখেছেন। হয় ভালো, না হয় ভালো। হলে তাঁরা পাকিস্তানেও থাকবেন, হিন্দুস্থানেও থাকবেন। কংগ্রেসীদের মতো পাকিস্তান ছাড়বেন না। এটা সুবিধাবাদ নয়, এটাই বাস্তববাদ।

জুলি আঁতকে ওঠে। "তুই কি বলতে চাস্ পাকিস্তান হলে আমাকেও এই আশ্রম, এই কুটির ছাড়তে হবে?"

"যদি কংগ্রেসে থাকিস তা হলে ছাড়তে হবে। নিছক গঠনের কাজ নিয়ে থাকলে কেউ তোকে আশ্রম ছাড়তে, কুটির ছাড়তে বলবে না। কিন্তু তুই কি রাজনীতি ভুলতে পারবি?" বাবলী সন্দেহ করে।

সৌম্য নীরব থেকে কী যেন চিন্তা করে। তারপর বলে, "না, বাবলী, আমি ভুলতে পারব না যে আমি একজন সত্যাগ্রহী। পাকিস্তান যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প হচ্ছে সত্যাগ্রহ। সঙ্গে আর কেউ না থাকলেও আমি সত্যাগ্রহ করব। সত্যাগ্রহী যে হবে তাকে শহীদ হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। জুলি একথা জানে, বিয়ের আগেই ওকে জানিয়েছি। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে প্রাণটা আমি সস্তায় বিকিয়ে দেব না। এর জন্যে প্রভূত মূল্য নেব। দেশের স্বাধীনতা বা বিশ্বের শান্তি বা হিন্দু মুসলমানের নিঃশর্ত মৈত্রী বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে নির্বৈর।"

জুলি এতক্ষণ মানসের চিঠিখানা দেয়নি। মনে পড়তেই জিব কেটে বলে, "ভুলে গেছলুম।"

সৌম্য মন দিয়ে পড়ে। তার পর ভাঁজ করে রেখে দেয়। বলে, "হুঁ। এখানেও কলকাতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। সতর্ক থাকতে বলেছে। হিন্দুরা সকলেই সতর্ক রয়েছেন। সেইজন্যে আজ তাঁদের একজনও আনন্দ প্রকাশ করছেন না। মুসলমানদের মতো তাঁরাও শোকদিবস পালন করছেন। আমাদের এই

ঘরোয়া আয়োজনেও আমরা আশ্রমের লোককে ডাকিনি। নিজেরাই যৎসামান্য আনন্দ করছি। জানি এটা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। এমন কী আধখানা স্বাধীনতাও নয়। এর মহত্ত্ব এইখানে যে ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরীভাব দূর হয়েছে। ওদের করমর্দন আন্তরিক। আমাদের করমর্দনও আন্তরিক।"

"কিন্তু ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরীভাব দূর হলেই কি ইংরেজে মুসলিম লীগে মিত্রভাব দূর হবে? ওরা দু'পক্ষের মিত্র হয়ে দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দেবে। নিজেদের জন্যেও কিছু রাখবে। এ ছাড়া আর কী হতে পারে, সৌম্যদা? তুমি নৈতিক বিকল্পের কথা ভেবে রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করো। কলকাতার গণহত্যার পর অনেকেই বলাবলি করছেন যে এর চেয়ে দেশভাগ ভালো, সেই সঙ্গে প্রদেশভাগও। সেটা ইংরেজরাই করে দিয়ে যাক। ওরা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। কংগ্রেসেরও সাধ্য নয়, লীগেরও অসাধ্য। জানিনে এ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব কি-না। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মুসলিম লীগ খারিজ করেছে। কংগ্রেসও যে সেটা মন খুলে গ্রহণ করেছে তা নয়। দেশের অবস্থা দিন দিন অগ্নিগর্ভ হচ্ছে। যে কোনো প্রদেশে, যে কোনো অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।" বাবলী হুঁশিয়ারি দেয়।

"তা বলে আমি বেঠিককে সমর্থন করব না। দেশভাগ বেঠিক। তার উত্তরে প্রদেশভাগও তেমনি বেঠিক, দুটো বেঠিক মিলে একটা ঠিক হয় না। ইংরেজদের কী? ওরা দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে, দুটোকেই সোভরেন ও স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দেবে, দুই রাষ্ট্রেই বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে। কতক লোকের লাভ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু জনগণের দুঃখের বোঝা বাড়বে। তখন আমি স্বাধীনভাবে সত্যাগ্রহও করতে পারব না। হিন্দুস্থানের নাগরিক হয়ে পাকিস্তানে বা পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে হিন্দুস্থানে সত্যাগ্রহ করা চলবে না।"

বাবলী আবেগের সঙ্গে বলে, "এই যে কতক লোকের মনে আনন্দ আর কতক লোকের মনে নিরানন্দ আজ আমরা দেখছি এর শেষ কোথায়? তুমি কি বুঝতে পারছ না, সৌম্যদা, যে যখন তখন যত্র তত্র দাঙ্গা বাধবে আর তা বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ হিমশিম খাবে? পুলিশ একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, আর্মিকে ডাকুন। আর্মিও কি দাঙ্গা বন্ধ করতে পারবে? ক'টা জায়গায় পারবে? আর্মিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, সত্যাগ্রহীদের ডাকুন। তখন পারবে তোমরা দলে দলে শহীদ হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করতে? তোমার যদি বাস্তববোধ থাকে তুমি সময় থাকতে মানবে যে দেশের অবস্থা সত্যাগ্রহীরাও শান্ত করতে পারবেন না। তার জন্যে চাই রাজনৈতিক সমাধান। সে সমাধান মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি। সেটা কার্যকর না হলে দেশ ভাগাভাগি। প্রদেশ ভাগাভাগি। ঠিক নয়, বেঠিক। তবু শান্তির জন্যে একান্ত আবশ্যক।"

সৌম্য তর্ক করে না। স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছে ঘরে ঘরে নিরানন্দ। যেন স্বদেশী শাসন নয়, নতুন এক বিদেশী শাসন। জুলিকে বলে, "সন্ধ্যায় আজ দীপাবলী হবে না। শুধু প্রার্থনা সভা হবে।"

যাবার সময় বাবলী সৌম্যকে চুপি চুপি বলে যায়, "লক্ষণ যা দেখছি জুলি বোধহয় মা হবার পথে। শহীদ হতে গিয়ে ওকে তুমি পথে বসিয়ো না। তোমার ভাবী সন্তানের খাতিরেও তোমাকে বাঁচতে হবে. শহীদ যদি কেউ হয় তো সে আমার মতো ভাগ্যবিড়ম্বিতা। সেটা কিন্তু বিপ্লবের দিন, বিপ্লবের প্রয়োজনে। সেদিন দেখবে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে গেছে। কেউ কারো গলা কাটছে না। বরং গলায় মালা দিচ্ছে। হাসছ যে? আসিবে সেদিন, আসিবে। তোমরাও সেদিন দেখবে সকলের মনে আনন্দ, নিরানন্দ কারো মনে নয়। যাদের মনে নিরানন্দ তারা পা দিয়ে ভোট দেবে।"

।। পঁচিশ ।।

সুকুমার লণ্ডনে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। বি. বি. সিতে জবাহরলালের অভিষেকের বার্তা শুনে লাফ দিয়ে ওঠে। মিলিকে বলে, "একটা দিনও দেরি করা উচিত নয়। আমি কালকেই প্লেন ধরে রওনা হচ্ছি। তোমরা জাহাজে করে ধীরে সুস্থে এসো। এখন চলি মেননের সঙ্গে দেখা করতে। নেহরু তাঁর সুপারিশ উপেক্ষা করতে পারবেন না।"

জবাহরলাল ইতিমধ্যেই কর্মপ্রার্থীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সুপারিশ যাঁরা করেছিলেন তাঁরাও এক একজন দিক্‌পাল বা দিক্‌পালিকা। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের তালিকাটিও ছোট নয়। তিনি নিজেও জানেন না তাঁর স্থায়িত্ব কতদিন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মতিগতি তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েও জানেন না। আর গান্ধীজীর মতিগতি বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ হাই কমাণ্ডের triumvir হয়েও কতটুকু জানেন! পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে ওই বৃদ্ধটি সিদ্ধহস্ত।

নেহরু কাউকেই কথা দেন না, সবাইকেই সবুর করতে বলেন। যাঁরা গোড়া থেকেই এদেশে রয়েছেন তাঁদের দাবীই অগ্রগণ্য। যাঁরা বিদেশ থেকে মদত দিয়েছেন তাঁদের দাবী তার পরে। সুকুমার তবু নাছোড়বান্দা। সে দিল্লীতেই ধর্না দিয়ে পড়ে থাকে। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভাতেও নিয়মিত যায়। একবার যদি গান্ধীজীর দূত হয়ে একখানা চিঠি নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে তবে কাগজে নাম উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সেও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবে।

ওদিকে মিলিও অস্থির বোধ করছিল। বিলেত তার আর একটুও ভালো লাগছিল না। যুদ্ধকালীন সে প্রেরণা আর নেই। যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে যে একতা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল সে একতাও আর নেই। রণের শিক্ষা সমস্যা মেটেনি, তাই সেও আর অপেক্ষা করতে পারে না। আবার আকাশপথেই ফেরে। সঙ্গে রণ। কিন্তু বিলেতের ঘরকন্না গুটিয়ে নেয় না। দেশে কাজকর্ম না জুটলে ফিরতে হতে পারে। সুকুমারও চাকরি ছাড়েনি। ছুটি নিয়েছে।

মুস্তাফীরা একদিন সৌম্যকে ও জুলিকে নিমন্ত্রণ করে এই সুসমাচার শুনিয়ে দেন। তাঁদের মুখে আহ্লাদ ধরে না। জুলি কিন্তু পুলকিত হয় না। কাঠ হাসি হাসে। সৌম্য কূটনীতিবিদের মতো দুটি একটি কথা বলে। "তা আপনাদের তো সঙ্গ দরকার। নাতিকে নিয়ে খেলা করবার বয়স তো হলো। মিলিকে নিয়েই ভাবনা। সে বোধ হয় দিল্লী চলে যাবে।"

"সুকুমার যদি কাজ পায়।" মুস্তাফী বলেন, "নেহরু কি আর সেই নেহরু? বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এখন মথুরার কৃষ্ণ। রাখাল বন্ধুদের যিনি চিনতে পারেন না।"

মিলির মা বলেন, "বেশ তো! মিলি এই সেবা প্রতিষ্ঠানেরই ভার নেবে। তোমারও উচিত জামাইকে বসিয়ে দিয়ে অবসর নেওয়া। কেন ওরা দিল্লী দিল্লী করবে? লণ্ডনে থাকারও কোনো মানে হয় না।"

জুলি প্রমাদ গণে। মিলি আর সুকুমার যদি এখানেই গুছিয়ে বসে তা হলে আবার না ত্রিকোণ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। সে মুখ ফুটে কিছু বলে না। সৌম্যের মুখের দিকে তাকায়।

"ওরা কি পাকিস্তানে থাকতে রাজী হবে, যদি পাকিস্তান হয়?" সৌম্য বলে।

বোমা পড়ার আওয়াজ হয়। মুস্তাফী বলেন, "তুমি তো গান্ধীজীর কাছের লোক বলেই শুনি। তোমার কি মনে হয় তিনি কংগ্রেসকে পার্টিশন মেনে নিতে দেবেন? পার্টিশন কি ভিভিসেকশন নয়?"

"যা বলেছেন, মেসোমশায়। তিনি বেঁচে থাকতে মেনে নিতে দেবেন না। কিন্তু যেমন দেখছি

মুসলিম লীগ কিছুতেই কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করবে না। এমন অনর্থ বাধাবে যে ইংরেজকেই অনন্তকাল থেকে যেতে হবে। এত বড়ো একটা মহাদেশের মতো দেশকে তো অরাজকতার কবলে ফেলে রেখে যাওয়া চলে না। তাদেরও তো বাণিজ্যিক স্বার্থ ব্যাহত হবে। যে কারণে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল সেই কারণেই হাতে রাখতে চাইবে। কংগ্রেস জেলে ফিরে গিয়ে ক'বছর অপেক্ষা করবে? আরো ছ'বছর? জেল থেকে বেরিয়ে কি দেখবে মুসলিম লীগের চিন্তাধারা তার দাগ মুছে ফেলেছে? পলিসি বদলেছে? নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের জিগীর তুলে কংগ্রেসী মুসলিমদের ভোটে হারাচ্ছে না? তাঁদের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে নিছক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জোরে মুসলিম ভোট পাচ্ছে? অত দূর যেতে হবে কেন, সামনেই তো নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন। ওরা যদি যোগ না দেয় অন্যের তৈরি শাসনতন্ত্র কি ওরা গ্রহণ করবে? ওরা চায় আলাদা একটা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী। আলাদা এক শাসনতন্ত্র। তার তাৎপর্য আলাদা এক রাষ্ট্র। অধিকাংশ মুসলমানেরও যদি সেই দাবী হয় তবে তো ভিভিসেকশন অনিবার্য। কে ওদের উপর গায়ের জোর খাটাবে? গান্ধীবাদীরা তো গায়ের জোরে বিশ্বাসই করেন না। জাতীয়তাবাদীরা করেন, কিন্তু কোথায় তাঁদের গায়ের জোর? কামান বন্দুক তো উভয় পক্ষেরই আছে। সৈনিক আছে উভয় পক্ষের . আসুক মিলি। দেখুক এসে সিপাহী বিদ্রোহের মর্ম কী। সিপাহীর বিরুদ্ধে সিপাহীর বিদ্রোহও কি সম্ভবপর নয়?'' সৌম্য উচ্চ স্বরে চিন্তা করে।

''বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও, সৌম্য। নেহরুর সরকারের সৈন্যদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ।'' মুস্তাফী বোঝেন।

''জিন্না সাহেবকে সরকার গঠনের ভার দিলেও একই কথা। জিন্না সরকারের সৈন্যদের মধ্যেও অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। নেহরুর বেলা হিন্দু-শিখের বিরুদ্ধে মুসলিম। জিন্নার বেলা মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দু-শিখ। এক্ষেত্রে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টই ভিভিসেকশন এড়াবার একমাত্র উপায়। বড়লাট সেই চেষ্টাই এতদিন করেছেন, কিন্তু জিন্নার নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্যে সফল হননি। উল্টে কংগ্রেসকেই দোষ দিচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেস কেন গ্রুপিং সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছে না? কেন তার ব্যাখ্যার জন্যে ফেডারল কোর্টে আবেদন করছে? পলিটিক্যাল ব্যালান্সের কি কোর্টে মীমাংসা হতে পারে? তাঁর মতে আসামকে নিক্তির পাল্লায় না চাপালে ব্যালান্স সমান হবে না। সত্যের খাতিরে আমাকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট চাই তো এক পক্ষের পাল্লা ভারী হলে মিটমাট হবে না। উভয় পক্ষের পাল্লাই সমান ভারী হওয়া দরকার। এটা জরুরিও বটে আসামের মায়া না কাটালে পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী। তা নয় তো সিভিল ওয়ার। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে কাজ হবে না। শহীদ হয়ে আমি কীই বা করতে পারব? বাপুই বা কী করতে পারবেন?''

''শহীদ হবে কে? তুমি? পাগল! তোমার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে। সন্তানের সূচনাও লক্ষ করছি।'' মুস্তাফী কানে তুলতে চান না। তাঁর স্ত্রীও না।

এতক্ষণে জুলির মুখ ফোটে। ''এই, বাথলীকে তুমি সেদিন যা বলেছিলে তার সঙ্গে তোমার আজকের বক্তব্যের মিল কোথায়?''

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, ''আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। নানা জনের সঙ্গে মিশছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার কারবার। তাই আমি আগে যা ভেবেছিলুম তার সঙ্গে এখন যা ভাবছি তার মিল থাকছে না। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করছি যে দেশের স্বাধীনতা একপক্ষের ইচ্ছাতেই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের একত্ব অপরপক্ষের ইচ্ছাসাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে যেসব মুসলমান ছিলেন তাঁরাও কলকাতার দাঙ্গার পর আমাদের ছেড়ে গেছেন বা যাচ্ছেন। অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের অখণ্ডতা কিসের জোরে টিকবে? ইংরেজদের বেয়োনেটের জোরে? হিন্দু-শিখ তলোয়ারের

জোরে? তাহলে অহিংসার মর্যাদা রইল কোথায়? অহিংসার ভবিষ্যৎ কী? বাপু বলবেন, মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তোমরা রামচন্দ্রের মতো বনবাসে যাও। বনবাসে যেতে আমরা রাজী আছি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বসিয়ে দিলে জাতীয়তাবাদের মর্যাদা থাকে না। অহিংসাবাদ হয়তো রক্ষা পেল, কিন্তু জাতীয়তাবাদ হেরে গেল। যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে হার মানেনি তারা মুসলিম লীগ পন্থীদের সঙ্গে লড়াই না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসরণ করবে। ওরা ভাববে আমরা দুর্বল, আমরা ভীরু, তাই রণছোড়। বলবে, দেখলে তো, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হাতে হাতে ফল। মুসলিম লীগ সিংহাসন জুড়ে বসে দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থে শাসন পরিচালনা করবে না, করবে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থে। তার মিত্র হবে রক্ষণশীল ইংরেজ আর প্রগতিবিমুখ আরব, ইরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি রাজ্য। গণতন্ত্র মেনে চললে অধিকাংশ প্রজার ভোটে আইন পাশ করাতে হবে, ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। সেসব কি সে করবে? আইনসভা ডাকবেই না, কনস্টিটিউশন তৈরি করবেই না। গণতন্ত্রের মর্যাদা রাখবেই না। ভারতের ঐক্য নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদেরও তো মূল্য আছে, গণতন্ত্রেরও তো মূল্য কম নয়। অহিংসা নীতি নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু স্বাধীনতার এই পরিণাম দেখে ক'জন অহিংসাবাদী অহিংসার ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখবে? আর আমি কি শুধু অহিংসাবাদী? সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদীও নই? গণতন্ত্রেও আস্থাবান নই? দেশ খণ্ড খণ্ড হবে, সেই আশঙ্কায় কি আমি নিজের অন্তরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড হতে দেব? বহু ত্যাগস্বীকারের ফলে আমরা দিল্লীতে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট লাভ করেছি, বড়লাটের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালাবার এমন সুযোগ এর আগে পাইনি, কথাবার্তা নিষ্ফল না হলেও আমরা ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকব। তার পরের দিন থেকে উত্তরাধিকারী হব। নিষ্ফল হলে অবশ্য গদী ছেড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়ব। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নয়। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগকেও ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে। তাতে ওদের মন না ভরলে রাজ্যের ভাগ দিতে হবে! হয়তো প্রদেশেরও ভাগ। যেসব অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি সেসব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হবে। নিরুপায়।"

"সে কী?" জুলি আঁতকে ওঠে। "সীমান্ত গান্ধীকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেবে? মহাত্মা গান্ধী রাজী হবেন?"

"আটকাচ্ছে তো সেইখানেই। পাঞ্জাবকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে সে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নেহরু ও প্যাটেল এতে রাজী হলে বাপু নিজের মত চাপিয়ে দেবেন না। সাধারণ অবস্থায় তিনি শুধু পরামর্শদাতা। অসাধারণ অবস্থায় সেনাপতি।" সৌম্য যত্ন করে বোঝায়।

মৃন্ময়ী মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস তো আর মুসলিম লীগ নয় যার এক হাতে পুলিশের ব্যাটন, আরেক হাতে গুণ্ডার ছোরা। কে কাকে ঠেকাবে? আমাদের কপালে কী আছে ভেবে ভয়ে ভয়ে রয়েছি। কংগ্রেস দিল্লীর মসনদে বসেছে বলেই এখনো এখানে বাস করছি, কংগ্রেস যদি মসনদ ছাড়ে আমরাও পূর্ববঙ্গ ছাড়ব। আশাকরি কলকাতা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সেখানে আমাদের একটা আস্তানা আছে, জানো। কলকাতা যদি গুণ্ডাদের রাজধানী হয় তবে আমরা লণ্ডনে গিয়ে সুকুমারের আস্তানায় মাথা গুঁজব।"

দিন কয়েক পরে সুকুমার এসে সশরীরে উপস্থিত। সঙ্গে মিলি আর রণ। ওদের কলকাতায় রিসিভ করেছে সুকুমার।

ওরা একদিন কুটির দেখতে আসে। মিলি জুলিকে দুই হাতে জড়িয়ে চুমুর পর চুমু খায়। "ওই চমৎকার ইভেন্টটি কবে নাগাদ ঘটবে রে, মেয়ে? আহা, ব্রহ্মচর্যের কিবা মহিমা! ভার্জিন বার্থ নয়তো?"

জুলি ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দেয়। "নিজের কথা ভেবে দ্যাখ। কোথায় তোর চিরকুমারী ব্রত?"

দু'জনেই হাসাহাসি করে লুটোপুটি খায়। তার পর জুলি রণকে আদর করতে বসে। মিলি ঘুরে ফিরে দেখে। টয়লেট দেখে বলে, "বিলেতের কটেজেও এমনটি দেখা যায় না।"

ওর বাড়া সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? জুলি ধন্য হয়ে যায়।

ওদিকে সুকুমার বলছিল সৌম্যকে, "না, ভাই, চাকরি জোটাতে পারিনি। মোগল যুগের দরবার। সব ধরাধরির ব্যাপার। কাকে ধরলে কী মেলে তা জানতে হলে আরো কয়েক মাস দিল্লীতে থাকতে হয়। ততদিন কংগ্রেস পরিচালিত গভর্নমেন্টটাই থাকবে কি-না সন্দেহ। নেহরু এখন পরম অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। বড়লাট রোজ মনে করিয়ে দিচ্ছেন মুসলিম লীগকে বখরা না দিলে ওরা জেহাদ ঘোষণা করবে। মুসলিম রেজিমেন্টগুলো কণ্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। দিল্লীর ভিতরের খবর মুসলিম লীগ ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে আসছে। ওরা এলে ওরাও চাকরির বখরা চাইবে। আমার কতটুকু আশা?"

সৌম্য আশ্বাস দেয়, "চাকরির দরকার কী? তোমার শ্বশুরের প্রতিষ্ঠান তোমরাই চালাবে। তুমি হবে সেক্রেটারি, মিলি হবে ডাইরেক্টর, কিংবা মিলি হবে সেক্রেটারি, তুমি হবে ডাইরেক্টর। পারিশ্রমিক যা পাবে তাতেই তোমাদের চলে যাবে। একটিই তো সন্তান।"

"হুঁ। প্রস্তাবটা নতুন নয়। কিন্তু এই অধমেরও আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকতে পারে। সে ঘরজামাই হতে যাবে কোন্ দুঃখে। লণ্ডনে তার নিজস্ব আস্তানা রয়েছে। উপার্জন আছে। ক্রিপ্‌স থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাকে এক ডাকে চেনেন। ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের সে মেম্বর। ফেবিয়ান সোসাইটিতেও তার যাতায়াত আছে। ইণ্ডিয়া অফিস আর ইণ্ডিয়া হাউস দুই জায়গাতেই তার কনট্যাক্ট রয়েছে। সে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম যদি উভয় পক্ষ মেনে না নেয় তবে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানেরই ভাগে পড়বে। তাই এখানকার সম্পত্তির উপরে তার একরত্তিও লোভ নেই। মিলি যদি রাখতে চায় রাখবে। বেচতে চায় বেচবে। আর মেসোমশায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা একটা পাবলিক ট্রাস্ট। ট্রাস্টীরা মেসোমশায়ের অবর্তমানে মিলিকে বা আমাকে সেক্রেটারি বা ডাইরেক্টর পদে বহাল রাখবেন কি না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ পাকিস্তানী আমলে। আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো ওটাকেও ওরা ইসলামাইজ করবে। পাকিস্তান মানেই তো মুসলিমদের জন্যে মুসলিমদের দ্বারা শাসিত মুসলিমদের রাষ্ট্র। স্থানীয় হিন্দু প্রধানরা এখন থেকেই কলকাতায় বাসা খুঁজছেন। তাঁদের আশঙ্কা এবার ঢাকায় বা চট্টগ্রামে হাঙ্গামা বাধবে।" সুকুমার এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"যাতে না বাধে তার জন্যেও স্থানীয় অফিসাররা সজাগ রয়েছেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এখানে শান্তিপূর্ণ ছিল। দোসরা সেপ্টেম্বরের শোকদিবসও শান্তিতে কেটেছে। তাঁরা সবাই চান কংগ্রেসের সঙ্গে আপস। কট্টর লীগপন্থীদের আপসবিরোধী পলিসি তাঁরা সমর্থন করেন না। হিন্দু মুসলমান বরাবর একসঙ্গে বাস করেছে, বরাবর একসঙ্গে বাস করবে। এটা যেমন আমাদের কথা, তেমনি ওদেরও কথা। কট্টর মুসলিমদের নিয়ে ওদের যেমন মুশকিল কট্টর হিন্দুদের নিয়ে আমদেরও তেমনি মুশকিল। এক হাতে তালি বাজে না। আরেক পক্ষ পাল্টা না দিলে দাঙ্গা জমে না। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বাধলে হিন্দুর পক্ষে শোচনীয় হবে, তাই হিন্দুকেই হতে হবে যথাসম্ভব অহিংস। রামকে রহিম মারলে রাম রহিমকে আত্মরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু মারতে পারে, কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্যে করিমকে বা আবদুলকে মারবে না। নির্দোষ মুসলমানকে মারার মধ্যে বিন্দুমাত্র পৌরুষ নেই। তেমনি নির্দোষ হিন্দুকেও।" সৌম্য হিংসার সীমা বেঁধে দেয়।

কৃষ্ণ মেননকে জবাহরলাল তাঁর পর্যটক প্রতিনিধি করে নিউ ইয়র্ক ও মস্কো পাঠাতে চান। তার পরে চান লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার করতে। বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবরটা পেয়ে সুকুমার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে উড়ে যায়। মিলিকে ও রণকে মুস্তাফীদের হেফাজতে রেখে। মুরুব্বি না থাকলে বা লবিতে না ভিড়লে দিল্লীতে কিছুই হবার জো নেই। হবার থাকলে হাই কমিশনারের ব্যক্তিগত অনুরোধ হবে।

নয়তো ইণ্ডিয়া হাউসেই মেনন ওকে কোনো এক চেয়ারে বসিয়ে দেবেন। ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে লিয়াজঁ রক্ষা করতে।

মিলি এর পর থেকে জুলির সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে। দু'জনায় গলাগলি ভাব। একদা ওদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারত, সুখী ভারত। যার জন্যে ওরা জীবন পণ করেছিল। সে স্বপ্নের কতটুকু বাস্তব হয়েছে? স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ততই বেড়ে যাচ্ছে। দেশ বোধহয় অখণ্ড থাকবে না, প্রদেশও খণ্ডিত হবে বোধ হয়। আর সুখ? একজনও কি আছে যাকে সুখী বলতে পারা যায়? সর্বক্ষণ ভয়। মিলির মা বাবা ভয়ে ভয়ে আছেন, প্রতিষ্ঠান ভয়ে ভয়ে চলছে। মিলি যদি এখানেই থেকে যায় ভয় নিয়েই ঘর করবে। জুলিই বা নির্ভয়ে থাকবে কী করে? নোয়াখালীতে কী হয়েছে শোনোনি?

নোয়াখালীর বিবরণ খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হবার আগেই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সৌম্যর কানে আসে। সে সঙ্গে সঙ্গে রিনিক নিয়ে নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। সেখানকার গান্ধীবাদী কর্মীদের সঙ্গে তার আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। বিবরণটা তারাই পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতার কাগজে লিখেছে পাঁচ হাজার হিন্দু খুন হয়েছে, তাদের সোনাদানা গোরু জরু লুট হয়েছে, বাড়ীঘর পোড়ানো হয়েছে। যারা প্রাণ হারায়নি তারা ধর্ম হারিয়েছে। ধর্মস্থান হারিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে ও ধর্ম বাঁচিয়েছে বিশ হাজার কি ত্রিশ হাজার। সম্পত্তির ক্ষতি অপরিমেয়। জমি বেদখল হয়েছে। হিন্দুদের সমূলে উৎপাটন করাই পলিসি। এটা বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই সাধিত হয়েছে। সহসা ঘটে গেছে তা নয়। পেছনে মাথা আছে। অথচ মুসলিম লীগ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এসব ওঁদের কাজ নয়, ওঁদের কোনো শত্রুর কাজ। তার জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

সৌম্য এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেছে। কাউকে দোষ দেয়নি। মুসলিম লীগকেও না, তার তথাকথিত শত্রুকেও না। সে সরেজমিনে তদন্ত করবে ও তার তদন্তের ফল সরাসরি দিল্লীতে বাপুকে জানাবে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরে আনতে পারেন। ব্রিটিশ শাসন তো এখনো হস্তান্তর হয়নি।

বাপু যে এতদিন দিল্লীতে আটক রয়েছেন এটার কারণ মুসলিম লীগকে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ভিতরে আনার জন্যে বড়লাটও সচেষ্ট, কংগ্রেসও সচেষ্ট, গান্ধীজীও সচেষ্ট। লীগের দিক থেকেও সাড়া পাওয়া গেছে, কিন্তু শর্তে বনছে না। সেইজন্যে দেরি হচ্ছে। লীগ যেদিন গভর্নমেন্টে যোগ দেবে বাপু তার পরের দিনই নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হবেন। ইতিমধ্যে লীগ একটা চমক দিয়েছে। তার জন্যে বরাদ্দ একটা আসন সে একজন হরিজনকে দিতে চেয়েছে। কংগ্রেস যদি একজন মুসলমানকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারে লীগও কেন একজন হরিজনকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারবে না? জিন্না সাহেব স্বয়ং যোগ দিতে চান না। বড়লাট দুঃখিত।

মোহিনীবাবুর মুখে মোনা লিসার হাসি। সৌম্য সুধায়, "এর অর্থ কী, কাকা? হর্ষ না বিষাদ?"

তিনি চোখ বুজে বলেন, "একই সঙ্গে দুই। গত দু'শ বছরের মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম পুরোপুরি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হচ্ছে। বড়লাটকে বাদ দিলে সব ক'জন ক্যাবিনেট মেম্বরই ভারতীয়। জঙ্গীলাটেরও আসন নেই। তাঁর উপরওয়ালা সর্দার বলদেও সিং। এই পরিবর্তনটি সাত বছর আগে ঘটলে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত মধুর হতো। এটা বিস্ময়কর অগ্রগতি, যদিও বিলম্বিত। এখন গভর্নমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়া বলতে বোঝায় গভর্নমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়ানস। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে যে আমল ছিল সে আমলের পাঁচশো বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুদেরই স্থান ছিল না। আকবরের রাজত্বই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে জাহাঙ্গীরের দরবারেও হিন্দুদের প্রতিপত্তি ছিল। এখন হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী সবাইকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে। সবাই যদি

ট্যাক্স দেয় তো সবাই পাবে ট্যাক্স ধার্য করার অধিকার। এরই নাম জাতীয় স্বাধীনতা। কত বড়ো পরিবর্তন! তার পর এটাও মনে রেখো। মুসলমানী আমলের আগে যতবার কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে ততবার শুধু উত্তর ভারতীয়দের নিয়েই। দক্ষিণের লোকের তাতে কোনো অংশ ছিল না। তা হলে দেখছ আড়াই হাজার বছরে এই প্রথম উত্তর-দক্ষিণবাসীরা পাশাপাশি বসে ভারত শাসন করছে। তার পর আরো আশ্চর্যের কথা, আর্যশাসিত ভারতে ক্ষত্রিয় রাজন্যরা অনার্য বা অস্পৃশ্যদের পায়ের তলাতেই রাখতেন। এখন দু'জন অস্পৃশ্য গদীতে চড়ে বসেছেন। তিন হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটল।"

সৌম্য স্বীকার করে। "তা হলে বিষাদ কেন?"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "দ্যাখো, সৌম্য, সরকার গঠন করা যত না কঠিন তার চেয়েও কঠিন তাকে টিকিয়ে রাখা। সমবেত দায়িত্ব ছাড়া সরকার টেকে না। ঘোড়ার গাড়ীতে চারটে ঘোড়া জুততে পারা যায় কিন্তু চার ঘোড়া যদি চার দিকে দৌড়য় তবে গাড়ী ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার চালাবার জন্যে যোগ দেয়নি, বানচাল করবার জন্যেই ঢুকেছে। চালাবার উদ্দেশ্য থাকলে জিন্নাকে পাঠাত, ন্যাজিমউদ্দীনকে পাঠাত। তাঁদের বদলে পাঠিয়েছে বদ্দি মালকে। তা দেখে বড়লাট পর্যন্ত স্তম্ভিত। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুদক্ষ রাজনীতিক বা প্রশাসক নেই। এক লিয়াকৎ আলী খান্ বাদে।"

নোয়াখালি ঘুরে এসে সৌম্য বলে জুলিকে, "যত রটেছে তত ঘটেনি। অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়ে বিহারী হিন্দুরা অতিমাত্রায় প্রতিশোধ নিয়েছে। কী করি, বলো তো? আমার বাড়ী বিহারের দেহাতে। আমার মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? কী তাদের অপরাধ? উদোর পিণ্ডি কেন বুধোর ঘাড়ে পড়বে? ভাবছি বিহারে গিয়ে দেখি কী করতে পারি। তোমার আপত্তি নেই তো, লক্ষ্মীটি?"

"সে কী কথা! তুমি বিহারের অন্নজলে মানুষ হয়েছ। তোমার প্রাথমিক কর্তব্য বিহারে গিয়ে হিন্দুদের শান্ত করা, মুসলমানদের অভয় দেওয়া। নোয়াখালীর প্রতিশোধ বিহারী হিন্দুরা নিয়েছে, যেমন কলকাতার প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালীর মুসলমানরা। এর পর কি পাঞ্জাবের মুসলমানরা নেবে বিহারের প্রতিশোধ? এই হিংসা প্রতিহিংসার কি সীমা আছে না শেষ আছে? বাপু এ বয়সে ক'টা জায়গায় যাবেন? ক'টা দিক সামলাবেন? তিনি বুড়ো হয়েছেন। তোমরা তাঁর জোয়ান ছেলেরাই তো ছোটাছুটি করবে। পারলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতুম। কিন্তু কেন পারছিনে তা তুমি জানো। যেটি আসছে ছোটাছুটি করে সেটিকে অকালে হারাতে চাইনে। আপত্তি নয়, অনুরোধ, আমাকে তুমি এখানে একলা ফেলে যেয়ো না, কলকাতায় মার কাছে রেখে যেয়ো।" জুলি বলে।

সৌম্য রাজী হয়। খবরটা শুনে মিলি ছুটে আসে ঝগড়া করতে। "এই মেয়ে, তুই তো আমার মায়ের কাছেই অনায়াসে থাকতে পারতিস্। সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তোর মতো মেয়েদের সেবা করতে। আমি রয়েছি তোকে সঙ্গ দিতে। না, আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছিনে। দেশের স্বাধীনতা আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। দাঙ্গাহাঙ্গামাই তো শেষ কথা নয়। স্বাধীনতাই শেষ কথা। এর পরে যখন বিলেত যাব তখন স্বাধীন দেশের নাগরিক রূপেই যাব। ব্রিটিশ প্রজা রূপে নয়।"

"আমি, ভাই, ওসব এখন ভাবতেই পারছিনে। আমার বরের সঙ্গে এই প্রথম আমার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পারলে ওর সঙ্গে আমিও বিহারে যেতুম। দেশের মানুষকে আগে প্রাণে বাঁচাতে দে। বেঁচে থাকলে তো স্বাধীনতার মুখ দেখবে। প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মানও বাঁচাতে হবে। আচ্ছা, ভাই, মেয়েগুলোর কী অপরাধ? ওদের কেন ধরে নিয়ে যায়? যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারছিনে। কেন তা তুই জানিস। এ অবস্থায় জ্বলে ওঠা কি ভালো?" জুলি

ব্যাকুলভাবে সুধায়।

"না, ভালো নয়। সাবধানে থাকিস্ ও রাখিস্। শোন, আমি যা দেখেছি তা তুই দেখিস্‌নি। মহাযুদ্ধ। এ যা দেখছিস্ তা মহাযুদ্ধ নয়, ছিঁচকে যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ তো। যুদ্ধে কী না হয়? অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ্ অ্যাণ্ড ওয়ার। খুন জখম, লুটতরাজ, ঘর জ্বালানো, নারীহরণ। সেকালে সীতাকেই উল্টে সাজা দেওয়া হয়েছে। একালে আমরা বিপ্লবী কন্যারা সে অবিচার উল্টে দিতে চাই। বিপ্লব বলতে বোঝায় ওলট পালট। অযোধ্যার লোকের ন্যায় অন্যায় বোধের ওলট পালট ঘটাতে হবে। উদ্ধারের পর সীতাদের কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে। কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। অগ্নিপরীক্ষা তো দূরের কথা। বনবাস তো কিছুতেই না। সসম্মানে পরিবারে ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাস্‌নে, জুলি। তুই গেলে আমি কার কাছে বল পাব?" মিলি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ক্রান্তদর্শী

চতুর্থ পর্ব

ভূমিকা

'ক্রান্তদর্শী' শেষ হলো। এ বই কিন্তু আমার পরিকল্পিত 'রিনিউয়াল' বা পুনর্নবায়ন নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী থীসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমারোহ। তারা বলে, "আমরা কি তোমার হাতের পুতুল যে তোমার খুশিমতো নড়ব চড়ব নাচব? আমাদের খুশিমতো আমরা বাঁচব।" এমন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। উপন্যাস একবার আরম্ভ করলে তার পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চরিত্ররা মঞ্চে নেমে শেখানো কথা বলে না, এক বলতে গিয়ে আর বলে। এক করতে গিয়ে আর করে। আমার লেখনীও কি আমার বাধ্য? শিকলটা আমার হাতে তবু বিদ্দি কুকুর আমাকেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেত, আমিই তার খেয়ালমতো চলতুম বা চালিত হতুম। এটাও সেইরকম একটা ব্যাপার।

তার পর, অন্তরে একজন আছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলতেন 'কৌতুকময়ী' আর গ্যেটে বলতেন ডাইমন বা ডেমন, তিনিও আমার কলম ধরে আমাকে লেখান। আগেও এ রকম হয়েছে। উপন্যাস একজনের সৃষ্টি একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও ঠিক যে উপন্যাস একজনের সৃষ্টি নয়। আর এই খানেই তার বিশেষত্ব। 'নতুন করে বাঁচা' নামে আমি প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যে প্রবন্ধ লিখেছিলুম আমার পরিকল্পিত উপন্যাস সেই রচনার রূপান্তর হতো। এটাই ছিল আমার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কিন্তু কার্যত তা হয়নি, কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভাবনাচিন্তা নয়, অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। জীবন বলতে অন্তর্জীবনও বোঝায়। আমার এ উপন্যাসে অন্তর্জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। একে নভেল অভ্ আইডিয়াজ্ বললে আমি আপত্তি করব না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস। তাঁর এতে অনীহা ছিল, অথচ তাঁর 'গোরা' সেই বর্গের নয় কি?

এই উপন্যাস আমার অন্য একটি বাসনার পরিপূরণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার আনুষঙ্গিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে একটা এপিক উপন্যাস লেখা যায়। 'ঘরে বাইরে'তেও এর অবতারণা লক্ষণীয়। কিন্তু নতুন যুগের মহাভারত লেখা আমার সাধ্য নয় বলেই সেটি আমি অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দিই। অথচ একজনকেও সে কাজে হাত দিতে দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে সেনসরের বা পুলিশের ভয়ে সে উপন্যাস লেখা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও দেখা গেল যাঁরা লিখতে পারতেন তাঁদের আগ্রহ বা উদ্যম নেই। অবশেষে আমাকেই ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্ক তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শেষ পরিণাম নিয়ে এপিক না হোক বৃহৎ উপন্যাসে হাত দিতে হলো। এর একটি গোপন কারণ ছিল। 'সত্যাসত্য' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হলে কেউ কেউ আমাকে আরো একখণ্ড লিখতে

অনুরোধ করেন। একজন বলেন বাদলকে বাঁচিয়ে দিতে। আরেকজন বলেন উজ্জয়িনীকে আমি অপাত্রে সম্প্রদান না করে যেন সুপাত্রে সম্প্রদান করি, দে সরকারের হাতে না দিয়ে সুধীর হাতে দিই। কিন্তু বারো বছর ধরে ওই উপন্যাস লিখে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। সপ্তম খণ্ড লিখতে সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আমার ছিল না। তা ছাড়া বাদলের মৃত্যুতেই ও কাহিনীর যথার্থ সমাপ্তি। সেটা একটা প্রতীকী ঘটনা। ঝড়ঝাপটার যুগে বুদ্ধিজীবীর অপসরণ।

আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমার কাছে জীবন্ত মানুষ। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সময় সুধী কি নিষ্ক্রিয় ছিল? না, সে বাদলের মতো বুদ্ধিজীবী নয়। তার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তার কী ভূমিকা? আরো পরে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের সময় তার কী অনুভূতি? সুধীর ভূমিকাকে ঘিরেই নতুন উপন্যাস দানা বাঁধে। বাদলকে আমি বাঁচিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারিনে। কোনান ডয়েল যেমন শার্লক হোমসকে বাঁচিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সুধীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপরতার বাইরে নয়। কিন্তু 'সত্যাসত্যে'র সুধী যেমনটি 'ক্রান্তদর্শী'র সুধী তেমনটি হতে পারে না। হলে পদে পদে জবাবদিহির দায় থাকে। না, সুধীকে আমি স্মরণ করলেও নিজের মতো করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছি। সেইজন্যে নাম পালটে দিয়ে 'সৌম্য' করেছি। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। ঘটনার আবর্তে পড়ে সে তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। সে বিনোবার মতো স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সৌম্য সৌম্যই। সে সুধী নয়।

সৌম্যকে ফিরিয়ে আনলে উজ্জয়িনীকেও ফিরিয়ে আনতে হয়। সে এসেছে অদৃশ্য এক টানে। তাকে আমি দে সরকারের হাতে ছেড়ে দিলেও তাদের বিয়ে দিইনি। সে বিধবা হয়েছে, এই পর্যন্ত নিশ্চিত। এর পরবর্তীটা অনিশ্চিত। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে থাকতেও পারে, না করে থাকতেও পারে। ওকে নিয়ে আসি মঞ্জুলিকা নামে। ডাক নাম জুলি। সৌম্য যদি অবিবাহিত থাকে তবে ওকেও তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। তা বলে ওদের রাজনৈতিক মতবাদ একই রকম হবে কেন? যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেটাই তো হবে। ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদের এক দুর্বার আকর্ষণ ছিল। জুলির পক্ষে সৌম্যর মতো একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যতদিন না সে সৌম্যর পত্নী হয়।

উজ্জয়িনীকে নিয়ে এলে দে সরকারকেও নিয়ে আসতে হয়। সে আসে সুকুমার দত্তবিশ্বাস নামে। বার বার প্রত্যাখ্যাত হবার পর সে জুলির বান্ধবীকে বিয়ে করে ক্ষান্ত হয়। তবে সেইখানে তার ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না। এই কাহিনীর শেষদিনটি পর্যন্ত সে আছে। আর আছে জুলির বান্ধবী মিলি, যার ভালো নাম মধুমালতী। তিনটি পুরনো চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই নতুন। মানস বাদল নয়, যদিও সৌম্যর পুরাতন বন্ধু। 'সত্যাসত্যে' তার উল্লেখ ছিল না। বর্তমান উপন্যাসে তারও একটি মুখ্য ভূমিকা। তারই মতো তার অপর বন্ধু স্বপনদারও। সৌম্য, মানস, স্বপন কোন্ জন যে এই কাহিনীর নায়ক তা আমিও জানিনে। অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বপনদাকে তথা মানসকে। একটা কথা বলে রাখি, মানসের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি মানস নই বা মানস আমি নয়। তার যূথিকাও আমার স্ত্রী লীলা নয়।

অনেকগুলি চরিত্রই জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আক্ষরিকভাবে নয়। তারা যে যার নিজের মতো করে বেঁচেছে ও বেড়েছে। আমার শাসন মানেনি। নায়িকা যে কোন্ জন তাও আমি জানিনে। জুলি ও যূথিকার মতো দীপিকাদিও তিনজনের একজন। তিনটি পরিবারকেই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব নয়। কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ। শেষে দিল্লী।

স্থান কাল পাত্র। এই তিন নিয়েই উপন্যাস। পাত্রের কথা বলেছি, স্থানের কথাও বললুম। এবার কালের কথা। এই কাহিনীর কালসীমা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি।

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণে যার শুরু মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণে তার শেষ। 'সত্যাসত্যে'র কালসীমা ছিল মাত্র দুটি বছর, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। তার জন্যে লিখতে হলো ছয় খণ্ড। লাগল বারো বছর সেই আন্দাজে এ গ্রন্থ লিখতে কত সময় লাগা সম্ভবপর, কয় খণ্ডে লেখা সমীচীন? অনেক বেশী। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার যৌবন বিগত হয়েছে, বার্ধক্য দিন দিন বেড়েছে। সময়মতো শেষ না করলে অসমাপ্ত গ্রন্থ পড়বেই বা কে? লিখব কি লিখব না করতে করতে পঁচাত্তর বছর বয়স পার হয়। আশির মধ্যে কি সব কথা বলে উঠতে পারব? আশি পর্যন্ত কি আমাকে বাঁচতে দেওয়া হবে? এক জ্যোতিষীর মতে চুয়াত্তর বছর বয়সেই আমার পরকাল।

কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই আরম্ভ করে দিই। শুনেছি তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুরু করেন অতি বৃদ্ধ বয়সে। শেষ করতে নাকি সাত বছর লেগেছিল। মোটামুটি চার বছরের পাথেয় নিয়েই আমার যাত্রারম্ভ। লিখতে ও সংশোধন করতে লেগে গেল সাত বছর। সম্প্রতি বিরাশি পূর্ণ হয়েছে। অবাক হচ্ছি দেখে যে এখনো বেঁচে আছি। আমার মা বেঁচেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর, আমার বাবা একষট্টি বছর। আমার ধারণা ছিল আমিও তাঁদের অনুবর্তন করব। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। যে কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারত না সে কাজ আমাকে দিয়ে তিনি করাবেনই। অন্তরে আমি এই আশ্বাস পাই যে আমি যা জানি আর কেউ তা জানে না, সুতরাং আমাকেই জানিয়ে যেতে হবে ও তার জন্যে বাঁচতে হবে। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

তৃপ্ত হতুম যদি পাঁচ পর্বে লিখতে পারতুম। তেতাল্লিশের শেষ অংশ, চুয়াল্লিশের সবটা, পঁয়তাল্লিশের প্রথম অংশ ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। প্রায় দু'বছর। ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম বেঁচে থাকতে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে তৃতীয় পর্ব লিখতে। কে জানে কেমন থাকি বলা তো যায় না। তাই মাঝখানে একটা ফাঁক রয়ে গেল। যাক, আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁরা সে ফাঁক পূরণ করবেন। আমার এটা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপাখ্যান। যেমন ডিকেন্সের 'আ টেল অভ্ টু সিটিজ্'। যার পটভূমিকাটা ফরাসী বিপ্লবের। কাহিনীটা কিন্তু দুই মহানগরীর ইতিহাসে অখ্যাত কাল্পনিক নায়ক নায়িকার।

ডিকেন্স যখন স্থির করেন যে ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় একখানি উপন্যাস লিখবেন তখন তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কার্লাইলকে চিঠি লিখে পরামর্শ চান কোন্ কোন্ বই পড়বেন। কার্লাইল তার উত্তরে এক গাড়ী বই পাঠিয়ে দেন। ফরাসী বিপ্লবের উপর লেখা বই ততদিনে এক গাড়ী ওজনের হয়েছে। এতদিনে তিন গাড়ী কি চার গাড়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ, ব্রিটিশ অপসরণ তথা ভারতবর্ষের বিভাজন একত্র করলে এটিও কি একটি বিপ্লবাত্মক বিষয় নয়? বিশ্বের ইতিহাসে সেই আট নয় বছরের মধ্যে যা ঘটে গেল তা ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে কি কম বিপ্লবাত্মক? এক গাড়ী না হোক, বেশ কিছু বই আমাকেও পড়তে হয়েছে। ডিকেন্স অবশ্য অত পড়েননি।

'ক্রান্তদর্শী' ইতিহাসভিত্তিক হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। রাজনীতিনির্ভর হলেও রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। বলতে পারা যায় বিশ্লেষণধর্মী মানবিক স্টেটমেণ্ট। বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের, ভারতের ইতিহাসের, বাংলার ইতিহাসের একটা যুগসন্ধিকে। সে রকম যুগসন্ধি আগেও আসেনি, পরেও আসবে না। ওই একবারই এল আর গেল। দেশ দেশান্তরে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেল। সমস্তটাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা কি একপ্রকার রিনিউয়াল নয়? আমার পরিকল্পনামতো নয় যদিও। আমার মানসে ছিল টলস্টয়, থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। সেই গান্ধীকেও ঘটনাচক্রে আপাতব্যর্থ হতে হলো। দেশ আর প্রদেশ গেল ভেঙে। শুধু এই দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে এটা একটা সেট-ব্যাক। তা সত্ত্বেও আমরা লাভ করলুম রাজন্যদের সম্মতিসহ নতুন এক রাষ্ট্র,

যার শাসনতন্ত্র সেকুলার। একজন নাগরিক যদি নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী হয় তবু সেও উচ্চপদারূঢ় হতে পারে। এই যে পরিবর্তন এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি মুসলিম লীগ অখণ্ড ভারতের কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে বসত। তার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়ে ধর্ম অনুসারে চাকরি, ধর্ম অনুসারে প্রমোশন, ধর্ম অনুসারে নির্বাচন ইত্যাদি মেনে নিতে হতো। নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদের কোথাও স্থান হতো না। না পার্লামেণ্টে, না গভর্নমেণ্টে। সেকুলারিজমের জন্যে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট না হলে, এক কোটি মানুষ ছিন্নমূল না হলে তার জন্যে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না। ইউরোপেও প্রস্তুত হয় বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্মঘটিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে।

এক হিসাবে সেট-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এককূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো যাঁরা লিখবেন তাঁরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁরা এক গাড়ী কি দু'গাড়ী বই পড়ে লিখবেন। তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদর্শ হবে টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্‌প্যাশনেট নয়। আমি এক জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক। আমার উপন্যাস সাবজেকটিভ। এর আড়ালে একটা দৃষ্টি আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে vision. তাই এর নাম 'ক্রান্তদর্শী'।

আরো একটি কথা। গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতাদের উক্তি এই গ্রন্থে কাল্পনিক। তবে তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ নয়। সেই ধরনের বক্তব্য তাঁদের মুখে যদি কেউ কেউ শুনে থাকেন তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রদের একেবারে অনুপস্থিত রাখা যায় না। টলস্টয়ও কি নেপোলিয়নকে তাঁর 'সমর ও শান্তি'র মধ্যে উপস্থাপিত করেননি? নেপোলিয়নের উক্তিগুলিও কি সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক? কোনো অংশই কল্পিত নয়? উপন্যাসের অনুরোধে আমাকেও কিছু কিছু বানাতে হয়েছে। তা না হলে সেই সেই বিষয়কে বোধগম্য করা যেত না। যেখানে যেখানে পেরেছি সেখানে সেখানে লিপিবদ্ধ উক্তি উদ্ধার করেছি। যাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়। আরো বেশী করলে উপন্যাস হতো না, ইতিহাস হতো। ইতিহাস না লিখলেও কোথাও আমি ইতিহাসের অমর্যাদা করিনি। যথাসম্ভব ইতিহাসের অনুসরণ করেছি। ইতিহাসের সমূহ তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' গ্রন্থের কতকগুলি পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যা কেউ পড়তে পারেনি তা আমি পড়ব কী করে?

আরো অনেক কথা বলার ছিল, আরো অনেক চরিত্রকে জানার ছিল। কিন্তু সে প্রলোভন সংবরণ করতে হলো। বহুদর্শী হলেও আমি আর্টের সীমা মানি। এখন বিদায় নিতে হচ্ছে। সৌম্য, জুলি, মানস, যূথিকা, স্বপনদা, দীপিকাদি, সুকুমার, মধুমালতী, মীর সাহেব, বাবলী প্রভৃতিকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার কাছে ওরা জীবন্ত মানুষ ও আপনজন। বিদায়ের দুঃখে আমি কাতর। সাত বছর ধরে আমি ওদের নিয়ে ছিলুম। এখন সব শূন্য মনে হচ্ছে।

ডি.এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার ছাপ্পান্ন বছরের সম্পর্ক। শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার ও শ্রীআশিসগোপাল মজুমদারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। স্বর্গীয় গোপালদাস মজুমদারের কাছেও। তাঁরই আগ্রহে এই উপন্যাসের সূচনা। ক্ষমা প্রেসের শ্রীতুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে আগাগোড়া সাহায্য করেছেন। তাঁকে বহু ধন্যবাদ।

২১ জুলাই ১৯৮৬ অন্নদাশঙ্কর রায়

।। এক ।।

স্বপনদা তাঁর শোবার ঘরের বেডল্যাম্পের আলোয় আঁদ্রে জীদের 'জুর্নাল' পাঠে তন্ময় ছিলেন। চমকে উঠে সুধান, "ও কে? তুমি?"

"না গো, আমি নই। বাঁশরি।" দীপিকাদি বিছানার একপাশে বসে হাসতে হাসতে উত্তর দেন।

"বাঁশরির ছেলেমেয়েরা বিভাসকে তাদের বাবা বলে।'The children of Alice call Bartrum their father.' চার্লস ল্যাম্বের 'ড্রিম চিলড্রেন'পড়েছ নিশ্চয়।" স্বপনদা মনে করিয়ে দেন।

দীপিকাদি তাঁর বালিশে মাথা রেখে বলেন, "পরকীয়ার ধ্যান করছ কেন? পাশেই তোমার পরকীয়া। স্ত্রীকে পরকীয়া ভেবে উল্লাস বোধ হয় না? মানছি আমার ঘাট হয়েছে। চার মাস অন্য ঘরে শুয়েছি তোমার উপর রাগ করে। মাই পুওর নেগলেক্টেড হাজব্যাণ্ড। আমি না করলে তোমাকে আদর করবে কে?"

"কিন্তু হঠাৎ এত অনুরাগ কেন, আর্যে? দাঙ্গাই বাধুক আর হাঙ্গামাই বাধুক আমি যা ছিলুম আমি তাই আছি। তোমার মতে প্রচ্ছন্ন ইংরেজ আর প্রচ্ছন্ন মুসলমান। আমার সঙ্গে শুলে তোমার পাপ হয়। তুমি ভারতের আর্য নারী। সীতা কি সাবিত্রী।" স্বপনদা বই মুড়ে রাখেন।

"এ অনুরাগ হঠাৎ নয়। রাতের পর রাত তোমার জন্যে জেগে রয়েছি। কখন তুমি আসবে আর আমার পাশে শোবে।" দীপিকাদি অভিমানভরে বলেন।

"এদিকে আমিও তো রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি। কখন ফিরবে আমার উর্বশী? কখন আসবে তার মেষ? মেষটি অবশ্য মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যায়। কুঁই কুঁই করে সমবেদনা জানায়। অবোলা প্রাণী সব বোঝে। কই, তোমার মেষটি কোথায়?" স্বপনদা খোঁজ করেন।

এল্‌ফ ইতিমধ্যে কখন এক সময় এসে খাটের তলায় আসন করে নিয়েছে। ঘেউ ঘেউ করে জানান দেয় সে সব শুনছে।

"মানছি আমি বলেছি আমি তোমার সঙ্গে শোব না। কিন্তু এমন কথা কি বলেছি যে তুমি আমার সঙ্গে শোবে না? অনায়াসেই আমার ঘরে গিয়ে আমার বিছানায় শুতে পারতে। তুমি এমন কাপুরুষ কেন?" দীপিকাদি সুধান।

"পোর্শিয়ার সওয়াল। তুমি আইন পড়লে না কেন? আজকাল মহিলারাও তো উকীল ব্যারিস্টার হচ্ছেন।" স্বপনদা খোঁচান।

"বেশ তো। তোমাকে নিয়ে আমি লণ্ডনে যেতে রাজী। তোমার চিকিৎসা, আমার পড়া দুই একসঙ্গে চলবে।" দীপিকাদি সীরিয়াস।

"আমার চিকিৎসা? আমার রোগটা কী তা তুমি জানো না? এই যে ইংরেজরা, এদের সঙ্গে আমাদের সাত পুরুষের সম্পর্ক। এরা কি শুধুই মন্দ, ভালো একটুকুও নয়। এরা চলে যাচ্ছে, আমার কি একটুও ব্যথা বোধ হচ্ছে না? তেমনি, এই যে মুসলমানরা, এদের সঙ্গেও আমাদের চব্বিশ পুরুষের সম্পর্ক। এরাও কি কেবলি খারাপ, ভালো একটুকুও নয়? এরাও চলে যাবে মনে হচ্ছে। আমার কি

একটুও বেদনা বোধ হবে না? বিয়োগান্ত নাটক দেখছি আমি। ঘটনার পর ঘটনা চলেছে লৌহশলাকার মতো অদৃশ্য এক চুম্বকের অভিমুখে। সেটা বোধহয় একটা মহা ট্র্যাজেডী। মহাভারতের মতো। না দেখলে আমি লিখব কেমন করে? আমি যে একজন লেখক।" স্বপনদা স্মরণ করিয়ে দেন।

"তুমি যে একজন লেখক তার প্রমাণ যা ছিল তামাদি হয়ে গেছে। নতুন লেখা কোথায়? কতরকম আকাশছোঁয়া পরিকল্পনা, কতরকম লম্বাচওড়া বুলি, কাজের বেলা কূর্মাবতার। চল, তোমাকে আমি বিলেত নিয়ে যাই। সেখানে হয়তো তোমার কর্মপ্রেরণা ফিরে পাবে। সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো তোমার ছোটগল্পের ইংরেজী তর্জমা। তুমি না করলে আমি করব। ইংরেজীতে একখানা বই বেরিয়ে গেলে হয়তো তোমার উৎসাহ বাড়বে। তার থেকে ফরাসীতেও হবে, জার্মানতেও হবে।" দীপিকাদি প্রেরণা দেন।

"রানু, তুমি এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও আমাকে চিনতে পারলে না। আমি একজন হিউম্যানিস্ট। হিউম্যানিজম আমার ফাণ্ডামেন্টাল ফেথ। আমার সেই গভীরতম প্রত্যয়ে ধাক্কা লেগেছে। আক্ষরিকভাবেও শিরদাঁড়া বেয়ে তুষারস্রোত বয়ে গেছে। পর পর দু' দু'টো মহাযুদ্ধ দেখে আমার মনে হচ্ছে মানুষ আর হিউম্যান নয়, ইনহিউম্যান। তা না হলে জার্মানদের মতো অমন সভ্য জাতি গ্যাস চেম্বারে পুরে ষাট লক্ষ ইহুদী বধ করত না। আর আমেরিকানদের মতো অমন প্রগতিশীল জাতি হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলে এক লক্ষ জাপানী হত্যা করত না। যারা বেঁচে গেল তারাও সারা জীবন অসুস্থ হয়ে জীবনের বোঝা বইবে। ভেবেছিলুম ভারত কখনো অমন ইনহিউম্যান হবে না। এখন দেখছি এ দেশ স্বাধীন না হতেই এই! স্বাধীন হলে কী না করবে! তিনদিনের দাঙ্গায় দেখা গেল ও শোনা গেল এদেশের হিন্দু মুসলমান কলকাতা মহানগরীর প্রকাশ্য রাস্তায় নিরীহ পথিকদের বিবস্ত্র করে পরীক্ষা করেছে কে হিন্দু কে মুসলমান। ভিন্নধর্মী হয়ে থাকলে বিনা অপরাধে পিটিয়ে বা কুপিয়ে মেরেছে ও তার পরে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। ডোম আসতে সাহস পায়নি, শকুনেরা আসমান থেকে নেমে এসে ছিঁড়ে খেয়েছে। তাই সব নয়। লাটসাহেব জওয়ানদের পাঠিয়েছেন মাথাপিছু পাঁচ টাকা বকসিসের বিনিময়ে রাস্তা থেকে শবদেহ সরাতে। তারা বাইরে নিয়ে গিয়ে গণ কবর দিয়েছে বা গণ চিতায় চড়িয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়েছে। যারা গেল তাদের আত্মীয়রা জানতেই পেল না তারা চিরকালের মতো গেছে। তাদের ধর্মীয় আচারও পালন করা হলো না, হবেও না, কারণ তাদের আত্মীয়দের চোখে তারা জীবিত। আমি ধর্মপ্রাণ হিন্দু নই। তবু আমারও সংস্কারে ঘা লাগে। কাকে দোষ দেব? হিন্দু মুসলমান কেউ কম দোষী নয়। হিন্দু মুসলিম সিভিল ওয়ার বলতে কী বোঝায় তার নমুনা তো দেখলে। এটা যখন দেশব্যাপী হবে তখন কোথায় থাকবে হিন্দু মুসলমানের ধর্মের বড়াই! সব ঝুটা হ্যায়। দুটিই বর্বর সম্প্রদায়। একদিন মধ্যযুগের জার্মানদের মতো ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময় শকুনের কাজ মানুষে করবে।" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

"ওঃ স্টপ ইট!" দীপিকাদি চেঁচিয়ে ওঠেন।

"মাফ করো, বৌ। তবু তো আসল কথাটা বলিনি।" স্বপনদা চুপ করেন।

"তা হলে বলেই ফেল যা বলতে চাও।" অনুমতি দেন দীপিকাদি।

"তুমি যেদিন বন্দুক ধরে ফায়ার করতে গেলে সেদিন আমার মেরুদণ্ড বেয়ে তুষারস্রোত বয়ে যায়। ভাবি, এ কী! আমরাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লুম নাকি! যে যুদ্ধের সূত্রপাত আজ হলো তার অবসান হবে কবে তা কি আমরা জানি? না জেনে যাত্রারম্ভ করব? কে বলতে পারে যুদ্ধের প্রয়োজনে কী অমানবিক কাণ্ড হবে। মহাভারতের যুদ্ধ যদি সত্য হয়ে থাকে তাতে কী অমানবিকতা না হয়েছে। পাণ্ডবে আর কৌরবে পার্থক্য কী। মানুষে আর রাক্ষসে কী প্রভেদ। আর আমার নিরীহ বৌ সেও নরহত্যা করবে। যাদের মারবে বা জখম করবে তারা আমার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। একই রক্ত, একই

মাংস।'' স্বপনদার গলা ধরে আসে।

''এটা তুমি বানিয়ে বলছ।'' দীপিকাদি বিশ্বাস করেন না।

''তুমি কি জান না যে আমার মাতুলবংশ মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রইস? উচ্চ পদাধিকারী। আর পাঁচজন অভিজাত পুরুষের মতো তাঁদেরও জলসাঘর ছিল। সেখানে লখনউয়ের বা বেনারসের বাঈজীরা নাচতেন ও গাইতেন। সঙ্গীত সুধাপানের পরে সঙ্গসুধাপানও চলত। ফলে যাদের আবির্ভাব হতো তারা বাবুজীদের মুসলিম প্রজাদের অন্দরে লালিত পালিত হতো। বড়ো হলে পিতার দেওয়া জায়গির ভোগ করত। এটা ছিল ওপেন সীক্রেট। মুসলিম সমাজের লাভ। সংখ্যাবৃদ্ধি, সম্পত্তিবৃদ্ধি। হিন্দু সমাজের শুচিতা বজায়। সুতরাং স্বস্তি। শুচিতা বজায় থাকাটাই তো ধর্ম। স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

দীপিকাদি থ হয়ে যান। ''তা হলে এই ব্যাপার! ভাগ্যিস্ আমি তোমার জ্ঞাতিভাইদের একজনকেও মারিনি। মারলে তো তুমি আমার মুখদর্শন করতে না। তা বলে কি আমি ওদের কলকাতা ছেড়ে দেব?''

''তা কখন বললুম? কলকাতা তোমার আমার ওদের সকলের। বাংলাদেশও তোমার আমার ওদের সকলের। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ্ আ লস্ট কজ, বাট বেঙ্গলী ইউনিটি ইজ নট। তবে ওরকম দাঙ্গা আরো কয়েকটা বাধলে সেটাও থাকবে না, বৌ। নিবারণ করো, নিবারণ করাই শ্রেয়। বাঙালীর আজ জীবন মরণ সমস্যা। সে যদি ভাগ হয়ে যায় তো মরবে। তিলে তিলে মরবে। স্লো ডেথ। টের পাবে না ?'' মরছে। হৃদয় হিংসায় বিদ্বেষে ভরপুর। সত্য কি নজরে পড়বে?'' স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

''কার্জনী আমলেও তো বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। কী এমন ক্ষতি হয়েছিল? আবার হলে কী এমন ক্ষতি হবে?'' দীপিকাদি সুধান।

''সেবারকার বিভাজন দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে হয়নি। তাই সেবার লোকজন ঘরবাড়ী মন্দির মসজিদ জায়গাজমি গোরুমোষ ছেড়ে পালায়নি। এবার সম্পূর্ণ লক্ষ্মীছাড়া হবে। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণান্ত। মানুষকে এত ভয়! যেন বাঘ সিংহ কি সাপ কুমীর। বাঙালীর নামে কত বড়ো কলঙ্ক! সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকারের সময় ফরাসীদের নামে যেমন হয়েছিল। হাজার হাজার প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকদের হাতে নিহত হয়। যারা বাঁচে তারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পালায়। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ ফ্রান্সের রাজমাতা ক্যাথারিন দ্য মেদিসিকে লেখেন, দিদি, তুমি তোমার প্রটেস্টাণ্টদের মারলে কেন, খেদালে কেন? ক্যাথারিন লেখেন, বোন, তোর মনে যদি এত লেগে থাকে তুইও তোর ক্যাথলিকদের মেরে খেদিয়ে দে না? তাই হয় ফ্রান্স হয় প্রটেস্ট্যাণ্টবর্জিত, ইংলণ্ড হয় ক্যাথলিকবর্জিত। তেমনি, পূর্ববঙ্গও হিন্দুবর্জিত আর পশ্চিমবঙ্গও মুসলিমবর্জিত হবে।'' স্বপনদার আশঙ্কা।

''দাঙ্গাহাঙ্গামা যারা শুরু করেছে তারা জেনেশুনেই করেছে যে এর ফল হবে ভারতভাগ। যেটা জানে না সেটা হচ্ছে প্রদেশভাগ। তারা তোমার জ্ঞাতি হলে সেকথা স্বীকার করত। তারা বলে হিন্দুরা স্বজাতি নয়, ভিন্ন জাতি। তাদের স্বজাতি আরব, ইরানী, আফগান, তুর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন নেশন। সেইরকম তারাও একটি নেশন। তাদের পাকিস্তানের সামিল হবে সারা বাংলা মায় কলকাতা। কলকাতার দাঙ্গা হচ্ছে ব্যাটল ফর ক্যালকাটা। সে ব্যাটল মুসলিম লীগ জেতেনি। কাজেই আরেক দফা লড়বে। সতর্ক থাকতে হবে। আমি তো একটা স্টেন গান কিনব ভাবছিলুম। কিন্তু তোমার শিরদাঁড়া দিয়ে আবার তুষারস্রোত বইবে সেটা কি আমি সইতে পারব? তার চেয়ে বিলেত চলে যাওয়াই শ্রেয়।'' দীপিকাদি আবার সেই কথা পাড়েন।

''স্টেন গান নিয়ে লড়বার জন্যে বিস্তর লোক রয়েছে। তোমাকে লড়তে হবে না। লড়াইতে তুমি যদি দশটা মারো ওরা একটাও তো মারবে। সেই একটা যদি তুমি হও তো আমি আর বাঁচব না, বৌ। তুমি আমার সাত রাজার ধন মানিক। তোমাকে হারালে আমি ফতুর হয়ে যাব। তুমি কি আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাবে না, মানিক?'' স্বপনদা বিহ্বল হয়ে বলেন।

দীপিকাদি তাঁর দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে তাঁর মুখে চোখে ঘন ঘন চুম্বন করেন। "আর তুমি আমার কী? আমার জীবনসর্বস্ব। তুমি যদি যাও আমি কি থাকব মনে করেছ? কিন্তু তোমাকে আমি যেতে দেব কেন? সাবিত্রীর মতো ফিরিয়ে আনব। তুমি যা চেয়েছ তা পাবে। কিন্তু আমার যা ভয় করে! যদি প্রসবযন্ত্রণায় মরে যাই?" দীপিকাদি থর থর করে কাঁপেন।

"আজকাল চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে। কোনো ভয় নেই। তুমিও বাঁচবে, যে আসবে সেও বাঁচবে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন।

"তোমার কী! তুমি পুরুষমানুষ। তুমি আবার বিয়ে করবে। আমাকে মনে রাখবে তো?" দীপিকাদি তাঁর বুকে মাথা গোঁজেন।

"তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তোমার মতো আর কেউ নয়। উর্বশী, আমার উর্বশী! তুমি যেয়ো না, তোমার পুরুরবাকে ছেড়ে স্বর্গে যেয়ো না। বলে যেয়ো না, স্বর্গে আবার দেখা হবে। উর্বশী পুরুরবা উপাখ্যান আমার কাছে এমন করুণ লাগে! বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।" স্বপনদার কান্না পায়।

দীপিকাদিও কাঁদেন। "তোমার জন্যে নয় তো কার জন্যে আমি বেদেনীর মতো ঘুরছি। এখানে সেখানে ওখানে তাঁবু গাড়ছি। বালীগঞ্জ পার্কের নিজের বাড়ী ছেড়ে হিন্দুস্থান পার্কে তালুকদারদের বাড়ী, সেখানে একমাস থেকে অশ্বিনী দত্ত রোডে বর্মণদের বাড়ী, সেখানে একমাস থেকে ল্যান্সডাউন রোডে ভাড়াটে ফ্ল্যাট। এখানেও প্রায় দু'মাস কাটল। কে জানে আরো ক'মাস কাটবে। আবার দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকতে আপাতত বালীগঞ্জে আর নয়। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।" দীপিকাদি চোখ মুছে বলেন।

"কোনো রকমে কেন? ভালো রকমে। উর্বশী আমার বক্ষে। মেঘও আমার কক্ষে। শুধু আলোটা নেবানো হয়নি। এই, যা!" তিনি বেড ল্যাম্পের সুইচে হাত দিতে যান।

দীপিকাদি তাঁর হাত চেপে ধরেন। "আলোটা থাক। আমি তোমার মুখ দেখব। তুমি আমার মুখ দেখবে।"

পরের দিন মীর সাহেবের আগমন। স্বপনদা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বলেন, "আইয়ে হজরত, তশরিফ লাইয়ে।"

"ও কী, গুপ্তসাহেব, আপনি কবে থেকে মুসলমান হলেন?" মীর সাহেব বিস্মিত।

"মুসলমান কেন বলছেন, পারসিয়ান। ইরানিয়ান। আমার মাতৃকুলের কালচার পারসিয়ান। আমার পিতৃকুলের ইউরোপীয়ান। দুটোই আমার হেরিটেজ। অবশ্য মূলত আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের গুপ্ত। আপনাদের আসার আগে অবধি আমরা বৌদ্ধ ছিলুম। আমাদের সংস্কৃতি ছিল ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি। যার নাম পরে হয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি। আমরা ইসলাম গ্রহণ করিনি কিন্তু পারসিয়ান কালচার বরণ করেছি। ফারসী শিখেছি, তার দৌলতে বড়ো বড়ো পদ পেয়েছি, জমিদার বা তালুকদার বনেছি। আনুষঙ্গিক উপসর্গও এসে জুটেছে। সোজা রাস্তায় না হলেও বাঁকা রাস্তায় আপনাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনও স্থাপিত হয়েছে। পরে আপনাদের আমল গেছে, ব্রিটিশ আমল এসেছে। আমরা ইংরেজী শিখেছি, তার কল্যাণে বড়ো বড়ো পদ পেয়েছি। উকীল ব্যারিস্টার হয়েছি। সেই সূত্রে ইউরোপীয় কালচার আয়ত্ত করেছি। ইংল্যণ্ডে আমেরিকায় গেছি। আধুনিক হয়েছি। আমাদেরই প্রবর্তনায় এদেশে রেনেসাঁস হয়েছে। রেফরমেশন হয়েছে। হতে পারত এর পরে একদিন ফরাসীবিপ্লব। মাটি করেছেন কায়দে আজম জিন্না। যারা বিপ্লব ঘটাতে পারত তারা ঘটাচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ। চারশো বছর আগেকার ফ্রান্সের ইতিহাসের সেই সেন্ট বারথোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। যা ষোলই আগস্ট দেখলুম সেই সময় থেকেই আমি অসুস্থ। হাত পা সমানে কাঁপছে। কাঁপতেই থাকবে যতদিন গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, মীর সাহেব।" স্বপনদা একনিঃশ্বাসে বলে যান।

"আঁতে ঘা তো আমারও লেগেছিল, গুপ্ত সাহেব। আমি কিন্তু দু'দিনের মধ্যে সামলে নিই।

আমি আপনার মতো হিউম্যানিস্ট নই। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম। সবকো সন্‌মতি দে, ভগবান। অন্যায়কে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণা করিনে, ভালোবাসি। সেটা তারা জানে ও বোঝে। যেদিন আপনি আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে এলেন সেদিন একদল লীগওয়ালা মুসলমান আমার বাড়ী চড়াও হয়। তেমনি মাঝ রাত্রে। উর্দুতে বলে, আপনার এখানে হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছেন কেন? ওরা সবাই দুশমন। ওদের সবাইকে পাড়াছাড়া করতে হবে। নইলে ইসলাম বিপন্ন। পাড়াটাকেই আমরা পাকিস্তান বানাতে চাই। আপনি ওদের আমাদের হাতে সঁপে দিন। আমরা ওদের শিয়ালদার কাছে রেখে আসব। আমি তো হাঁ। বন্দুক আমারও ছিল। আমিও দেখাতে পারতুম। কিন্তু তা হলে মস্ত বড়ো ভুল হতো। হিন্দুদের আমি বাঁচাতে পারতুম না। নিজেও সপরিবারে খুন হতুম। ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যে হাতিয়ার নিয়ে ফিরে আসত। অত কম সময়ের মধ্যে পুলিশকে টেলিফোনে খবর দিয়ে আনিয়ে নিতে পারা যেত না। পুলিশ তো টেলিফোনেও সাড়া দিত না।" মীর সাহেব বিবৃত করেন।

"তার পর?" দীপিকাদি কৌতূহল চাপতে পারেন না।

"বিপদের সময় সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। জানেন তো ইংরেজদের উপদেশ, কীপ ইয়োর হেড কুল অ্যাণ্ড ইয়োর হার্ট ওয়ার্ম। তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, তোমার হৃদয় উষ্ণ। আমি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলি, হাদিসে আমাদের প্রিয় রসুল কী বলেছেন? দুশমন যদি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করে তবে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে। এই হিন্দুরা তোমাদেরই পুরনো পড়শী। এরা দুশমনি করেছে বলে তোমরা আমাকে আগে কখনো জানাওনি। আজকের রাতটা তোমরা এদের এখানে মাথা গুঁজতে দাও। কাল ভোরে এরা আপনি চলে যাবে। না গেলে তোমরা ধরে নিয়ে যেয়ো। ওরা বলে, আমরা বরং সাপকে বিশ্বাস করব, তবু হিন্দুকে বিশ্বাস করব না। ওরা উত্তর কলকাতা থেকে মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে অপমান করবে। আমি বলি, ওঃ তাই তোমরা এদের দক্ষিণ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শোধবোধ করবে? কিন্তু দেশ ভাগাভাগির সময় যদি প্রদেশ ভাগাভাগি হয় আর কলকাতা পড়ে ওদের ভাগে তা হলে তোমাদেরও তামাম কলকত্তা থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হবে,মিএগ ভাইগণ। ওরা সুধায়, প্রদেশ ভাগ কেন হবে? এ প্রদেশে মুসলমানদের তো সংখ্যা বেশী। আমি বলি সেকথা ঠিক। কিন্তু ইংরেজরা এখন কংগ্রেসের মিতা, লীগের মিতা নয়। সেই জন্যেই তো জিন্না সাহেব বিদ্রোহ করেছেন। ইংরেজ আর কংগ্রেস দুই মিতা মিলে যা স্থির করবে তাই তো হবে। হিন্দু মুসলমান যদি দুই নেশন হয়ে থাকে তবে একই প্রদেশে থাকবে কী করে? একই শহরেই বা থাকবে কী করে? হিন্দুদের তোমরা সারে বঙ্গাল থেকে খেদাবে আর ওরা সারে বঙ্গাল তোমাদের ভাগে তুলে দেবে? ইংরেজরাই বা ওদের চটাবে কেন? দেখছ না আটটা প্রদেশে এখন কংগ্রেস সরকার? কেন্দ্রেও আর একটা কংগ্রেস-প্রধান সরকার হবে। তাদের হাতেই ফৌজ। তাদের পছন্দসই সদস্যদের হাতে। তোমরা যদি এদের রাখ এরাও তোমাদের রাখবে। এদের তাড়ালে এরাও তাড়াবে। এদের মারলে এরাও মারবে।" মীর সাহেব সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

"তার পর?" দীপিকাদি সুধান।

"তার পর আর কী? ওষুধ ধরে। ওরা ফিরে যায়। পরের দিন হিন্দুরা উত্তর মুখে রওনা হয়ে যায়। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমে যাবার পর একটা কমিটি গঠন করি। আমাদের কাজ হয় পলাতকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে স্বস্থানে পুনর্বাসন করা। হিন্দু ফিরবে হিন্দুর বাড়ী, মুসলমান ফিরবে মুসলমানের বাড়ী। একই পাড়ায় আগের মতো শান্তিতে বসবাস করবে। একটা পাড়া হিন্দুস্থান, আর একটা পাড়া পাকিস্তান এরকম ভেদবুদ্ধি থাকবে না। মাঝখানে ভেদরেখাও থাকবে না। কিন্তু ভাবা যত সহজ করা তত সহজ নয়। কেউ বিশ্বাস করে না যে এ সরকার আবার দাঙ্গা বাধতে দেবে না। এদের পলিসিই যখন ডাইরেক্ট অ্যাকশন। যার অন্য অর্থ হিন্দুবিরোধী সংগ্রাম। যার স্লোগান লড়কে

লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়কে নেওয়া মানে খুন জখম, লুটতরাজ,অগ্নিসংযোগ। ইংরেজ থাকতে এসব অপরাধ করা চলতে পারে কখনো? শহীদকে ডেকে বারোজ বলেছেন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে। তা যদি না করেন, যদি ফের দাঙ্গা বাধতে দেন, তা হলে গভর্নরস রুল। লীগ সরকারের পতন। শহীদ নিজেই বুঝতে পারেন যে বর্ণ হিন্দুরা যে সরকারে নেই সে সরকার বাংলাদেশে অচল। তারাই এ প্রদেশের সব চেয়ে প্রভাবশালী অংশ। তারাও ডাইরেক্ট অ্যাকশন চালাতে পারে। তবে তাদের দাবী সারা বাংলা নয়, তার জন্যে তারা লড়বে না। লড়লে লড়বে কলকাতার জন্যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে। তাদের খুঁচিয়ে কার কী লাভ? শহীদ যান জিন্না সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের অনুমতি চাইতে। জিন্না অনুমতি দেন না। দিলে অন্যান্য প্রদেশের লীগপন্থীরাও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের অনুমতি চাইবে। তাদেরও অনুমতি দিতে হবে। সবাইকে অনুমতি দিতে হবে। সবাই অনুমতি দিলে পাকিস্তানের জন্যে লড়বে কে? তিনি স্বয়ং ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যাননি, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতেও যাবেন না, আর কাউকেও যেতে দেবেন না। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যাদের যেতে দিয়েছেন তাঁদের উপর বরাত ভিতর থেকে লড়াই করা। শহীদ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তাঁর উপদলের কয়েকজন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের প্রস্তাব তোলেন। মহাত্মা বলেন তিনি কোয়ালিশন সরকারে বিশ্বাসই করেন না। সরকার যাঁরা চালাবেন তাঁরা একক দায়িত্বেই চালাবেন। তবে কংগ্রেসের পলিসি তা নয়। কংগ্রেস যেখানে ভালো মনে করে কোয়ালিশন সরকারে অংশ নেবে। তবে অংশীদারদের প্রোগ্রাম এক হওয়া চাই।" মীর সাহেব ব্যাখ্যা করেন।

"তা হলে পার্টনারশিপের কোনো আশা নেই? পার্টিশনের কথা ভাবতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকের বিরুদ্ধে?" স্বপনদার জিজ্ঞাসা।

"না, আরো একটা বিকল্প আছে, গুপ্ত সাহেব। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গ। শরৎ বোস ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। শহীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। জামান বলে এক ছোকরা ব্যারিস্টার দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ করছে। জামান তো বলছে আশা আছে। হয়তো যথাকালে দেখতে পাব বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান একমত হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গ চাইবে ও পাবে। তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। দাঙ্গাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ করতে হবে। যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে অস্ত্র সে ত্যাগ করবে। অন্যায়কে ঘৃণা করতে পারে, অন্যায়কারীকে ঘৃণা করবে না। আর বদলা নয়, আর শোধবোধ নয়। এখন থেকে মিলে মিশে কাজ করা। ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।" মীর সাহেব সকলের হয়ে মাফ চান।

দীপিকাদি ইতিমধ্যে খাবার তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সামনে রেখে বলেন, "আপনার দৌলতখানার এলাহি বন্দোবস্ত নয়। আমাদের গরিবখানার দীন আয়োজন।"

"কী যে বলেন,দিদি। গুপ্তর গুপ্তধন কত তা কি কারো জানতে বাকী আছে? টুকটুক আসবে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে। সে এখন আমার কমিটির একজন উৎসাহী সভ্য। সে যা করেছে তা আর কেউ করতে পারত না। অবশ্য উপস্থিত মহিলাটিকে বাদ দিয়ে।" মীর সাহেব আহারে মন দেন।

"কী করেছে ও মেয়ে? আবার বিয়ে? এবার কাকে? জাপানী বৌদ্ধকে? না পার্সীকে?" দীপিকা এর চেয়ে বেশী কল্পনা করতে পারেন না।

"পলায়নকালে তিনটি মুসলিম কন্যা ও সাতটি হিন্দু কন্যা নিখোঁজ হয়। গুরুজন সন্ধান পান না, পুলিশ সন্ধান পায় না। টুকটুক তাদের সন্ধান পায়। একদিন দেখি ও কোথা থেকে তিনটি মুসলিম কন্যাকে এনে হাজির করেছে। কেউ একটি কথাও ফাঁস করে না। টুকটুককে আড়ালে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করি। কোথায় ওরা ছিল? কেমন করে উদ্ধার করলে? ও বলে, আস্ক নো কোয়েশ্চেনস। অ্যাণ্ড ইউ উইল বি টোল্ড নো লাইজ। অদ্ভুত মেয়ে। তার পরে সাতটি হিন্দু কন্যাকেও উদ্ধার করে আনে। কেউ

কোনো কথা ফাঁস করে না। প্রশ্ন করলে সেই একই উত্তর। তার পর তাদের গুরুজনদের খবর দেওয়া হয়। তাঁরা আসেন। হিন্দু পিতারা ও হিন্দু স্বামীরা সাফ শুনিয়ে দেন, ওদের ডাক্তারি পরীক্ষা না করে ঘরে তুলব না। মেয়েরা ডাক্তারি পরীক্ষায় নারাজ। বলে, যেখান থেকে নিয়ে এলেন সেখানে ফিরিয়ে দিন। আমাদের মুখ চুপ। টুকটুক ওদের গুরুজনদের গলাধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।" মীর সাহেব হাসেন।

"তারপর মুসলিম কন্যাদের কী হলো?" দীপিকা জানতে চায়।

"ওদের গুরুজনেরা ডাক্তারির কথা বলেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সুধান, আপনি কি ঠিক জানেন যে এরা পোয়াতী নয়? আমি উত্তর দিই, সেটা এত কম সময়ের মধ্যে মালুম হবে না। তখন তাঁরা বলেন, আমরা মাস দুই বাদে আবার আসব। টুকটুক তাঁদের মুখের উপর শাসিয়ে দেয়, আপনাদের ফের আসতে দেওয়া হবে না। আপনারা মনঃস্থির করুন। বিবিদের যদি না নেন তবে তালাকনামা লিখে দিন। আমরা ওদের দোসরা জায়গায় নিকা দেব। ওঁরাও অনড়, টুকটুক ও অনড়। এ এক দুরূহ সমস্যা। কমিটি এই অবস্থায় ওই দশটি মেয়ের দায়িত্ব নিতে রাজী নন। তাঁরা হাত ধুয়ে ফেলেছেন। সব ক'টির দায়িত্ব এখন টুকটুক একাই নিয়েছে। ও একটা হোম খুলেছে। আমরা হলে বলতুম 'রেসকিউ হোম'। টুকটুক বলে, না, সেটা অপমানকর। আমি নাম রেখেছি 'হস্‌পিস'। যেমন খ্রীস্টানদের হয়। ওরা অতিথি। তফাতের মধ্যে এই খরচটা টুকটুক আর ওর বন্ধুরা বহন করেন। কিন্তু ডিসিপ্লিন পুরোপুরি টুকটুকের হাতে। কড়া ডিসিপ্লিন। মেয়েরাও ওকে খুব মানে। ও গোড়া থেকেই জানিয়ে রেখেছে যে ওর চোখে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়। কারো জন্যে হিন্দু পানি বা মুসলমান পানি জোগানো হবে না। খানাপিনা একই ছাঁদের হবে। একই সঙ্গে রান্না হবে। সবাই হাত লাগাবে। সবাই পরিবেশন করবে। কোনো বাছবিচার করবে না। যার ইচ্ছে সে নামাজ পড়তে পারে, পুজোআর্চা করতে পাবে। তার জন্যে সময়ও নির্দিষ্ট, স্থানও নির্দিষ্ট। সঙ্গীতের জন্যেও অন্য সময়। গোমাংস বা শূকরমাংস হস্‌পিসে ঢুকবে না। ও ছাড়া মাছমাংসের ব্যবস্থা হবে। যার রুচি সে খাবে। সাধারণত নিরামিষই হবে। হোম একদিন দেখে আসুন না। কিছু দিয়েও আসুন। নাম গোপন থাকবে। আমি সপ্তাহে একদিন যাই। ফী বার কিছু দিয়ে আসি। টুকটুক বলছে এই হোম ততদিন চালাব যতদিন একটিও মেয়ে সেখানে থাকবে। ওদের প্রত্যেককে ও তালিম দিয়ে ওয়ার্কিং উওম্যান তৈরি করবে। তখন এটাই হবে ওদের হস্‌টেল। তবে ওর বিশ্বাস ওদের কারো কারো বিয়ে হয়ে যাবে। ভাবনা কেবল বাচ্চাদের নিয়ে। যদি হয়। বলা যায় না। আপনারা কী বলেন?"

দীপিকাদি স্বপনদার দিকে তাকান। মীর সাহেব বলেন,"সবই টাকার খেলা। পণ দিন, যৌতুক দিন, বিয়ে হয়ে যাবে।"

।। দুই ।।

এবার স্বপনদা মুখ খোলেন। "হস্‌পিস? হুঁ। হস্‌পিসের ভিতর একটা হস্‌পিটালিটির ভাব আছে বটে। সেইজন্যে আমি হোটেলে না উঠে পারতপক্ষে হস্‌পিসেই উঠতুম। অবশ্য যেখানে যেখানে হস্‌পিস ছিল সেখানে সেখানে। তাতে খরচও বাঁচত। কিন্তু তার জন্যে চাই নিবেদিত কর্মী। সাধারণত ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী। টুকটুক তো ক্যাথলিকও নয়, সন্ন্যাসিনীও নয়। ওর-না ভারতনাট্যম্ শিখতে রুক্মিণী দেবী অ্যারাণ্ডেলের ওখানে যাবার কথা? ওর কি ক্ষণে ক্ষণে মত বদলায়? আজ যাকে বিয়ে করে কাল তাকে ছাড়ে। কাল যাকে বিয়ে করে পরশু তাকে ছাড়ে। ভাগিস্ আমি ওকে বিয়ে করিনি। দু'বছরের মধ্যে ওর মন উঠে যেত। তখন আমাকে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করত। দেখবেন, ওই হস্‌পিসও বছর খানেক পরে ছাড়বে।"

মীর সাহেব টুকটুকের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেন। "গুপ্ত সাহেব, ওর মা তো বললেন, স্বপনের জন্যেই আজ ওর এ হাল। যেন নোঙর ছেঁড়া নৌকো। কিন্তু সেকথা থাক। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে টুকটুক মাদ্রাজের টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে কলকাতা ছাড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় বেধে যায় ষোলই আগস্টের দাঙ্গা। নিজের বাপ মাকে আর আপনাদের দু'জনকে নিয়ে ও টালিগঞ্জে আর হিন্দুস্থান পার্কে রেখে আসে। কিন্তু সানি পার্কের বাড়ী ছাড়ে না। কী দারুণ সাহস ও মেয়ের! আমাকে বলে, আপনাদেরও যদি কোথাও পৌঁছে দিতে হয় তো আদেশ করুন। আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, আমাদের পাড়াটা তো মুসলমানদের পাড়া। আমাদের আবার কী বিপদ হতে পারে? তা ছাড়া আমাদের লীগপন্থী ভাইদেরই তো সরকার। সেই রাত্রেই গরিবখানার উপর হামলা। পরে আমি যখন কমিটি গঠন করি তখন ওকে বলি, তোমার মতো একজনকে কমিটির চাই যে হিন্দু হয়েও মুসলমানের আত্মীয় আর খ্রীস্টানদের মতো নিরপেক্ষ। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন। তোমার কি মাদ্রাজ না গেলেই নয়? ওদিকে ওর মা বাবাও বাড়ী ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চেম্বার তো সানি পার্কে, লাইব্রেরিও তো সেখানে। টালিগঞ্জে বসে কাকে কী আইনের পরামর্শ দেবেন? মক্কেলরাও কেউ অতদূর যেতে রাজী নয়। আমাকে বলেন, লতিফ, আই মাস্ট আর্ন মাই ডেলী ব্রেড বাই দ্য সোয়েট অভ্ মাই ব্রাউ। আমি ফিরে যাচ্ছি, শহীদকে বোলো আমার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করতে। বাড়ীতেই জায়গা দেব। খোরাকীও জোগাব। আমি বলি পাহারা ইতিমধ্যেই বসেছে। টুকটুক কি আমার মেয়ে নয়? আমি কি ওর জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করিনি? একলা মেয়েমানুষ বলে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে ওর সঙ্গিনী নিযুক্ত করেছি। কমিটি দিচ্ছে তার মাসোহারা। খানা আসছে আপনাদের বাবুর্চিখানা থেকে। আপনারা ফিরে গেলে ওকে রাখতেও পারেন, তাতে কমিটির কিছু সুরাহা হয়। এমনি করে ও মেয়ে জড়িয়ে পড়েছে সমাজসেবায়। আমরা ওর কাজ দেখে মুগ্ধ। ও কিন্তু আমাদের এক পয়সাও নেবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। বলে, এটাও ওর একটা অ্যাডভেঞ্চার। বলা বাহুল্য ওর মা বাবা বাড়ী ফিরে গেছেন। ওর সঙ্গিনীটিও থেকে গেছে। পাহারা আর লাগছে না।"

স্বপনদা শুনে সুখী হন না! বলেন, "অ্যাডভেঞ্চার! ওর কাছে সবকিছু অ্যাডভেঞ্চার। বাপ রে, কী ডানপিটে মেয়ে! আমার জীবনটাকে তছনছ করেছিল আর কী। ওকে নিয়ে নভেল লেখা যায়, নাটক লেখা যায়, কিন্তু ঘর করা যায় না, মীর সাহেব। ঘর করতে হলে করতে হয় এই দীপিকার সঙ্গে। বলতে গেলে এই বীরাঙ্গনাই সে রাত্রে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। বন্দুকটা তো এঁর ব্যবহারের জন্যে কেনা হয়নি, হয়েছিল রামদীন বেহারার ব্যবহারের জন্যে। রামদীন ব্যবহার করত ঠিক, কিন্তু ফায়ার করে আমার হার্ট ফেল করিয়ে ছাড়ত। তার পর বন্দুকটা কেনা হয়েছিল চোর ডাকাতকে ভয় দেখানোর জন্যে। প্রতিবেশী মুসলমানকে নয়। কী যে হলো এদেশের! প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বাড়ীতে এসে হামলা করে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে গুলী করবে বলে বন্দুক ধরে। গৃহযুদ্ধ একদিন না একদিন বাধবে, এটা আমার জানা ছিল, কিন্তু সেটা তো হতো সৈনিকে সৈনিকে। এ যা হলো তা মোটামুটি মিলে যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সের সেন্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকারের সঙ্গে। পুরোপুরি বলছিনে, কারণ ওটা ছিল একতরফা আর এটা হচ্ছে দোতরফা। ফলাফল একইরকম হবে। হিন্দুরা পালাবে মুসলিম এলাকা থেকে, মুসলমানরা পালাবে হিন্দু এলাকা থেকে। কেউ কারো প্রতিবেশী হবে না, হতে সাহস পাবে না। আস্থা ফিরে আসতে ফ্রান্সের মতো বা ইংলণ্ডের মতো দুই শতাব্দী লাগবে, তার জন্যেও দরকার হবে একটা ফরাসী বিপ্লবের, যা ধর্মের দিক থেকে মানুষের মনকে হিউমানিজমের দিকে ঘোরাবে। হিউমানিজম যে ধর্মকে খারিজ করে তা নয়, কিন্তু মানব জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপকে খারিজ করে। যাবতীয় তথ্যের বা বস্তুর ধর্মীয় ব্যাখ্যাকেও অস্বীকার করে। দর্শন এখন স্বরাট। বিজ্ঞান এখন স্বরাট। ইতিহাস এখন স্বরাট। রাজনীতি এখন স্বরাট। অর্থনীতি এখন স্বরাট। ভারতে কবে সে

সুদিন আসবে?"

কথাবার্তারও মোড় ঘুরে যায়। দুই ব্যারিস্টারে সওয়াল ও পাল্টা সওয়াল। দীপিকাদি উঠে যান। তিনি তখন টুকটুকের কথাই চিন্তা করছিলেন। একটু পরে একখানা চেক বই নিয়ে এসে জানতে চান স্বপনদার কাছে, "কত লিখব?"

"কেন লিখবে,কার নামে লিখবে?" স্বপনদা সুধান।

"টুকটুকের নামে। ও যে গুরুভার বহন করছে সেটা কি আমরা একটু হালকা করতে পারিনে? তুমি যদি অনুমতি দিতে আমিও ওর মতো অ্যাডভেঞ্চারে বেরোতুম।" দীপিকাদি ভেঙে বলেন।

"তুমি পতিপ্রাণা নারী, তোমার অ্যাডভেঞ্চার পতিগৃহে ও কলেজে। পুলিশ পর্যন্ত যাদের হদিস পায়নি তারা যে কেমন দুর্গম স্থানে ছিল সেটা কি তুমি অনুমান করতে পারছ না, রানু?" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

"ওই তোমার এক কথা। বিয়ে করেছি বলে আমার যেন কোনো স্বাধীনতা নেই। এইজন্যেই টুকটুক তালাক নিয়ে স্বাধীনা হয়েছে। কাজটা ভালো করেনি, কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে মানুষ কী না করতে পারে! মেয়েরাও মানুষ। তুমি হিউমানিস্ট, ওদেরকেও সমান অধিকার দাও।" দীপিকাদি নিবেদন করেন।

"তার মানে কি এই যে তুমিও টুকটুকের মতো বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে হিন্দু ও মুসলিম কন্যা উদ্ধার করবে? তুমি কি মনে করেছ এক মাঘে শীত যাবে, দাঙ্গা আর বাধবে না?" স্বপনদা তা মনে করেন না।

"না,না, সেরকম অভিপ্রায় আমার নেই। তবে আমি একদিন গিয়ে দেখব ওই মেয়েরা কেমন আছে, কোথায় আছে। আর কার কী দরকার। নিউ মার্কেটে গিয়ে কিনে এনে দেব। দিয়ে আসব বড়দিনের উপহার। আহা, বেচারি ধরে নিয়ে যাওয়া মেয়েরা। তারপর তো বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো। কী তাদের অপরাধ? মীর সাহেব, আপনি টুকটুককে বলবেন যে আমি তার কাজের অন্ধ সমর্থক। তারও ভক্ত সত্যি, সে আমাদের দেশের নারীশক্তির প্রতীক। আমার ধারণা ছিল ও একটি ফুরফুরে প্রজাপতি। আমার আশঙ্কা ছিল যে ও একদিন আমার বাগানের ফুলটিতেও এসে বসবে। যেমন চেয়েছিল বাগানটি আমার হওয়ার আগে। সেটা দেখছি ভুল। ওর মন এখন সমাজকল্যাণের কাজে। ওর জয় হোক। ওর জন্যে আজ আপনার হাতে ছোট্ট একখানা চেক দিচ্ছি। এর বেশী এখন পারছিনে, দুটো এস্টাব্লিশমেণ্ট চালাতে হয়। আর কর্তাও তো কোর্টে বেরোতে পারছেন না। ওঁর কাছে পরামর্শের জন্যেও কেউ আসে না ল কলেজ থেকেও ছুটি নিয়েছেন। চেকটা উনিই লিখতেন। ওঁর হাত কাঁপবে। তাই আমি লিখছি। জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট। আমারও সমান অধিকার। যদিও সমান কনট্রিবিউশন নয়।" দীপিকাদি চেক লিখে দেন।

মীর সাহেব চেকখানা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, "পাঁচশো টাকা! এ তো রাজকীয় অনুগ্রহ। টুকটুক উল্লাসে নাচবে। আমারই নাচতে সাধ যাচ্ছে। কী, গুপ্ত সাহেব, আপনার সাধ যাচ্ছে না?"

"হুঁ। কোথায় কে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, কে কাকে ফিরিয়ে আনবে, আর আমাকে ও আমার বৌকে তার খেসারৎ দিতে হবে। ভবিষ্যতেও যে অমন হবে না তা নয়। আমি কি তবে দেউলে হব? আমার আয়ের চেয়ে ব্যয় ঢের বেশী।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

"ধরে নাও যে ওটা আমার শেয়ারের থেকে দেওয়া। টুকটুক এত করছে, আমি কি তার একাংশও করব না? টাকা না দিয়ে আমি যদি গতর খাটিয়ে সাহায্য করতুম তুমি কিছু মনে করতে না?" দীপিকাদির চোখা প্রশ্ন।

"গতর খাটিয়ে তুমি কী করতে শুনি?" স্বপনদা থতমত খান।

"রোজ বাজার করে দিতুম।" দীপিকা না ভেবেচিন্তে বলেন।

"গাঁটের কড়ি খরচ করে তো? তা হলেই হয়েছে। তুমি কলেজও করবে, বাজারও করবে, আমার কাছে থাকবে কখন? তার চেয়ে কিছু টাকা ধরে দিয়ে খালাস হওয়াই ভালো।" স্বপনদা পরামর্শ দেন।

"তাই তো আমি করেছি। তবে খালাস আমি হতে পারব না। এ তোমার এ আমার পাপ! এর প্রায়শ্চিত্ত অত সহজ নয়। আহা, ওই মেয়েদের ভবিষ্যৎ কী হবে? যেমন হিন্দু সমাজ তেমনি মুসলিম সমাজ। কেউ তো ওদের নেবে না। টুকটুক ওদের স্বাবলম্বী করে দেবে, কিন্তু ঘর দিতে পারবে না, বর দিতে পারবে না। মীর সাহেব, আপনি যদি বিয়ে দিতে পারতেন!" দীপিকাদি বলেন।

"মুসলিম কন্যা তিনটির বিয়ে আমি অনায়াসেই দিতে পারি। যদি তাদের স্বামীরা তালাক দেয়। বাঙালী মুসলমানদের পাঞ্জাবী বিয়ে করতে আপত্তি নেই। অবশ্য বর যদি মুসলমান হয়ে থাকে। সতীনেও আপত্তি নেই। সতীনের সঙ্গে যদি ঘর করতে না হয়। তবে আমার আপত্তি আছে। আমি অবাঙালীর সঙ্গে বিয়ে দেব না, যার বিবি আছে তার সঙ্গেও বিয়ে দেব না। তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে নিক্ষেপ করা, সেটাও একটা পাপ। হিন্দু কন্যাদের বিয়ে দেওয়া আমার মাথাব্যথা নয়। হিন্দুরাই তা নিয়ে ভাবুন ও তৎপর হোন। কিছু টাকা ধরে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা মানবিকবাদ নয়। গুপ্ত সাহেব, আপনার বিবেক কী বলে? মানুষকে আপনি গুলী করবেন না। বেশ! কিন্তু আপনি অকূলে ভাসিয়ে দেবেন কী করে?" মীর সাহেব জেরা করেন।

"দেখুন, মীর সাহেব, হিন্দুরা একশোটা বিষয়ে এগিয়ে থাকলেও একটা বিষয়ে পেছিয়ে রয়েছে। নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাদের সংস্কার পাঁচ হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে ওরা স্বাধীন হবে, গণতন্ত্রী হবে, সমাজতন্ত্রী হবে, সর্বোদয় করবে, অতিমানসের অধিকারী হবে। কিন্তু নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের অযোধ্যার লোকের যে সংস্কার তাদেরও সেই সংস্কার আবহমানকাল অচল অটল থাকবে। আমি প্রচ্ছন্ন মুসলমানই হই আর প্রচ্ছন্ন ইংরেজই হই আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি। এটা আমার সহজাত সংস্কার। ওই মেয়েদের মধ্যেও সেই সংস্কার সমানে কাজ করছে। ওরাও বিয়ে করলে নিজেদের সতীত্বভ্রষ্ট মনে করে আজীবন কষ্ট পাবে। হস্‌পিস চালান সন্ন্যাসিনীরা। হস্‌পিসে যখন ওরা আছে তখন সন্ন্যাসিনী হোক। তা হলেই অযোধ্যার লোক সম্মান করবে। খুঁটিয়ে দেখবে না কার কী অতীত। মহামানব বুদ্ধও তাদের জন্যে সেই মার্গই নির্দেশ করেছিলেন। 'থেরীগাথা' পড়েছেন? সন্ন্যাস নিয়ে তাদের কী আনন্দ। আমার মনে হয় টুকটুক সন্ন্যাসিনী হবার পথে।" স্বপনদা অনুমান করেন।

মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "কী দিদি, আপনার কী মত? না আপনিও একমত?"

"আমি!" দীপিকাদি রাগ চেপে রাখতে পারেন না। বলেন, "আপনি যদি মালাবারে যান, কোচিনে যান, ত্রিবাঙ্কুড়ে যান তা হলে দেখবেন সেখানকার হিন্দুরাও কম ধার্মিক নয়। কিন্তু তাদের সমাজ মাতৃতন্ত্রী। তাই মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পায়। সম্পত্তি যার স্বাধীনতাও তার। সে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করে, বনিবনা না হলে একজনকে ত্যাজ্যপতি করে আরেকজনকে বিয়ে করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সতীত্বের অভাব নেই, কিন্তু তার সংজ্ঞা অন্যরূপ। পুরুষের সতীত্বেরই অনুরূপ। নারী যখন তার স্বাধিকার অর্জন করবে তখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার থেকেও মুক্ত হবে। নারীর মুক্তি না হলে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়, অতিমানস ইত্যাদি শুধু পুরুষদেরই জন্যে, নারীদের জন্যেও নয়। টুকটুক নিজে এদেশের নিউ উওম্যান। সে কখনো ওর অতিথি মেয়েদের সেকেলে সতীসাধ্বী হতে বলবে না। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ওদের অন্য শিক্ষা দেব।"

"ফলে ওই সপ্তকন্যা পুরাণের পঞ্চকন্যা হবে। অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী, মন্দোদরী তথা।" স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

দিনকয়েক পরে টুকটুক আসে ধন্যবাদ জানাতে ও রসিদ দিতে। বলে, "বেশ তো উৎফুল্ল

দেখছি তোমাদের দু'জনকেই। মেরি ক্রিসমাস অ্যাণ্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। দাদার অসুখ সেরে গেছে আশা করি।"

"তোমার দাদাকেই জিজ্ঞাসা করো।" দীপিকাদি বলেন।

"আমার অসুখ তো শারীরিক নয়, মানসিক। না, মানসিকও নয়, আরো গভীর স্তরের। কী করে সারবে যদি হিন্দু মুসলমান মানুষ না হয়ে শকুন হয়? তাও না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু মেয়েদের কি দোষ? কেন তাদের এই সর্বনাশ?" স্বপনদা সন্ত্রস্ত স্বরে বলেন।

টুকটুক একটু ভেবে নিয়ে বলে," সর্বনাশ কেন বলছ, স্বপনদা? মেয়েরা কি কাচের বাসন? তুমি যাকে অমূল্য মনে করো আমি তাকে অমূল্য মনে করিনে। মানুষের প্রাণ অমূল্য। মেয়েদের প্রাণনাশ করা হয়নি সতীত্ব যে নাশ করা হয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই। ওরা কারো নামে নালিশও করছে না। আর নারীর সতীত্ব পুরুষের সতীত্বের চেয়ে কোনো অংশে বেশী মূল্যবান নয়। পুরুষেরা তো যা করেছে তার জন্যে বড়াই করে। লজ্জিত হয় আর ক'জন? এতগুলো ব্রথেল চলছে কাদের বাহাদুরির জন্যে? ওই ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড আধুনিক নারী আর মানতে চায় না। পুরুষ বাহাদুর হলে নারীই বা হবে না কেন? পুরুষ একনিষ্ঠ হলে নারীও একনিষ্ঠ হবে। কতকগুলো বুনো জানোয়ার আমার দশটি মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। বুনো জানোয়ারের কবলে পড়লে শারীরিক জখম অসম্ভব নয়, কিন্তু চারিত্রিক বিকৃতি অসম্ভব। আমি আমার মেয়েদের বলেছি, তোমরা যেমন নিষ্পাপ ছিলে তেমনি নিষ্পাপ রয়েছ। পাপ তখনি হয় যখন নারীর সক্রিয় সম্মতি থাকে। ওদের পাপবোধ থেকে মুক্ত করাই আমার প্রকৃত কাজ। সেইজন্যে তাদের আমি সরকারের রেস্‌কিউ হোমে দিইনি। সেখানে ওরা আর সব পাবে, কিন্তু নৈতিক সমর্থন পাবে না। সেটা অত্যাবশ্যক।"

স্বপনদা হকচকিয়ে যান। হাত পায়ের কাঁপুনি মুখেও সংক্রামিত হয়। "তু-তুমি সর্বনাশ বলে মা-মানো না! তু-তুমি কি সমাজের কল্যাণ করছ না অ অকল্যাণ করছ?"

একথা শুনে টুকটুকও হকচকিয়ে যায়। দীপিকাদি ত্রস্ত হয়ে বলেন,"ওর হাত পা কাঁপছিল, এখন দেখছি ঠোঁটও কাঁপছে। লক্ষণ শুভ নয়। চল, আমরা ওঘরে যাই।"

পাশের ঘরে গিয়ে দীপিকাদি বলেন,"মেয়েরা নির্দোষ, কিন্তু যারা তাদের ধরে নিয়ে গেছে তারা তো দোষী। তুমিও স্বীকার করবে যে তারা পাপ করেছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুকেও করতে হবে, মুসলমানকেও করতে হবে। হিন্দু সাধারণকেও, মুসলমান সাধারণকেও। এ তোমার এ আমার পাপ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন। এটাও একপ্রকার যুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন আজ আবার সেই কথাই বলতেন। তোমার দাদাকে তাই আমি বলেছি, এ তোমার এ আমার পাপ। তোমার নামে যে চেক দেওয়া হলো সেটা বিবেককে শান্ত করার জন্যে দেওয়া। যাকে বলে conscience money."

টুকটুক অভিভূত হয়। "বৌদি, তুমি কি মানুষ না এন্‌জেল? এমন মন প্রাণ দিয়ে স্বামীর শুশ্রূষা করতে তো আমি কখনো পারতুম না। সেটা আমার মাতৃকুলের ধারা নয়। আমরা রুগীর ঘরে যাইনে, তার শুশ্রূষা করিনে। বাইরের নার্সের হাতে ছেড়ে দিই। তা না হলে আমাদের রূপযৌবন আমাদের চার্ম নষ্ট হয়ে যায়। তখন কর্তারা আমাদের ফেলে যত্র তত্র চরে বেড়ান।"

দীপিকাদি রঙ্গ করেন। "সেইজন্যেই বুঝি তুমি এই বয়সেও নবযুবতী। আর তোমার সমবয়সী হয়েও আমি যা হয়েছি তা আয়নায় দেখে আঁৎকে উঠি। তবে আমার কর্তাকে আমি ঘরে আটক করে রাখতে পেরেছি, বোন। নিজেও আটকা পড়েছি। তোমার কী। তুমি তো একেলা ওবেলা কাপড় ছাড়ার মতো স্বামী ছাড়ো। এবার বোধহয় সময় হয়েছে আর একটি পুরুষকে ধন্য করার। এমন রাঙা টুকটুকে বৌ কে না চায়!"

"কেউ যে প্রস্তাব করেনি তা নয়, কিন্তু আমি ওই অ্যাডভেঞ্চার আর করব না। আমি আমার দশটি মেয়েকে নিয়ে নতুন এক অ্যাডভেঞ্চারে মশগুল রয়েছি। এদের নিয়েই এখন আমার সুখ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমিও সুখী। জানতে পারি কি তোমার সীক্রেটটা কী?" টুকটুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়।

"তোমাকে বলব কেন, তুমিও যদি আমাকে তোমার সীক্রেটটা না বলো?" দীপিকাদিও কৌতূহলী।

"আমার সীক্রেট কাকে বলছ, বৌদি?" টুকটুক ভেবে পায় না।

"তোমার মেয়েদের তুমি পেলে কোথায়? কেমন করে? বস্তিতে বস্তিতে তল্লাস করে?" দীপিকাদি যতদূর অনুমান করেন।

"বলতে রাজী নই কাউকে। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি আমাকে মরাল সাপোর্ট দিয়েছ। কিন্তু খবরদার আর কাউকে বলতে যেয়ো না। তোমার উনবিংশ শতাব্দীর ফসিল স্বামীটিকেও না। তুমি আর আমি বিংশ শতাব্দীর জীবন্ত নারী। ভাগ্যিস্ ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। খুব বেঁচে গেছি। উনি কি আমাকে ছাড়তেন? আমাকে আঁকড়ে ধরতেন। অক্টোপাসের মতো। আর আমিও তেমনি দুর্বল, তাঁর বেলা। যাক, তুমি কী জানতে চাও? আমার মেয়েদের আমি কোথায় পেলুম ও কেমন করে? বলছি, কিন্তু বিনিময়ে তোমাকেও বলতে হবে তোমার সীক্রেট।" টুকটুক দর কষে।

"আচ্ছা, বলব।" দীপিকাদির মুখে দুষ্টু হাসি।

"তা হলে শোন।" মীর সাহেব আমাকে ডেকে একটা ভার দেন। দশটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, তারা সতেরোই আগস্ট থেকে নিখোঁজ। তারা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় পালাবার সময় গুণ্ডাদের আক্রমণে কোথায় ছিটকে পড়ে। যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। তাদের জন্যে অপেক্ষা করে না। তাদের তিনজন মুসলমান। তারা যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে। সাতটি হিন্দু। তারা যাচ্ছিল দুই দলে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব থেকে উত্তরে। তাদের গুরুজন পুলিশে খবর দেন, কিন্তু পুলিশের হাতে তখন এন্তার কেস। পুলিশ সময় নেয়, অবশেষে জানায় ওরা কলকাতায় নেই, থাকলে পাওয়া যেত। বোধহয় চালান গেছে পাঞ্জাবে। সেখানে মেয়ে বিক্রী হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কাগজে কাগজে। উত্তরও মেলে। কিন্তু গিয়ে দেখা যায় ভুল মানুষ। হতাশ হয়ে গুরুজন মীর সাহেবের কমিটির দ্বারস্থ হন। আমি ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি। চোস্ত উর্দু ও হিন্দী বলতে পারি। যে কোনো অন্দরে প্রবেশ অবাধ। কিন্তু কোথাও কোনো হদিস না পেয়ে এক ডিটেকটিভ এজেন্সীর শরণ নিই। তারা গোয়েন্দা লাগিয়ে গোপন অনুসন্ধানে জানতে পায় যে মুসলিম তিন কন্যাকে রাখা হয়েছে হিন্দু সাজিয়ে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে এক নিষিদ্ধ পল্লীতে মাসীর বাড়ী। আর হিন্দু সাত কন্যাকে মুসলিম সাজিয়ে শাঁখা সিঁদুর খুলে বা মুছে নাম ভাঁড়িয়ে তিনজন আমীর আদমীর হারেমে। সম্ভ্রান্ত এলাকায়।

খবর শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়। কার কাছেই বা এসব তথ্য ফাঁস করব? ফাঁস হয়ে গেলে মেয়েগুলো অন্যত্র চালান যাবে। দুটো কি তিনটে গ্যাং গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে এইসব কাণ্ড করেছে। তারা ভয়ানক জীব। যুদ্ধের সময় সরকার থেকে দু'হাজার গুণ্ডাকে বন্দী করা হয়েছিল। যুদ্ধের পরে তাদের খালাস দেওয়া হয়। তারা এখন বেপরোয়া। মীর সাহেবকে বলি, ক্লু মিলেছে। কিন্তু বিষম বিপদ। আপনি আমাকে একজন গোরা সার্জেন্ট দিন। তার হাতে সার্চ ওয়ারেণ্ট। ঠিকানা খালি থাকবে। আমি বসিয়ে দেব। তারপর আমার জন্যে আর আমার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সঙ্গিনী মিস ব্লেকস্টোনের জন্যে দু'খানা আইডেনটিটি কার্ড চাই। সব শেষে আমার কিছু টাকার দরকার। তা দিয়ে উপহার কিনতে হবে। কাদের জন্যে জানতে চান? যারা ওই মেয়েদের আটক করে রেখেছে তারা হয়তো কিছু খরচপত্র করেছে। তাদের সেটা পুষিয়ে দিতে হবে। তা হলে আর পুলিশ ডাকতে হবে না।

সবরকমে প্রস্তুত হয়েই আমরা তিনজনে রওনা হই। সার্জেন্টকে বাইরে খাড়া রেখে আমরা দু'জনে ভিতরে ঢুকি। প্রথমে মাসীর বাড়ী। মুসলিম কন্যাদের খোঁজে। মাসীকে যখন সেই তিনটি বালিকাকে ছেড়ে দিতে বলি তিনি বলেন, কোথায় শুনলেন তারা এখানে আছে? সব বাজে কথা। তারা এখানে নেই। এর পরে থলে থেকে বেড়াল বার করে বলি, তাদের যে আমাদের হাতে দেবে তার জন্যে এই পুরস্কার। এক হাজার টাকার অলঙ্কার। মাসী বোধহয় আরো কিছু পাবার আশায় প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আমি বলি, তা হলে ভুল ঠিকানায় এসেছি। এখন চলি। তিনি আমাকে থামান ও ভিতরে গিয়ে তিনটি মেয়েকে নিয়ে আসেন। বলেন, দেখুন দেখি এই মেয়েরা কি না। আমি ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখি ও তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। মাসী তখন মোক্ষম চাল চালেন। বলেন, আপনারা তো এদের নিয়ে আর কোথাও চালান দেবেন। আপনারা কারা? আমি আমাদের দু'জনের আইডেনটিটি কার্ড দেখাই। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। তখন তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখাই সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। তার হাতে সার্চ ওয়ারেন্ট। চেয়ে নিয়ে পূরণ করে দিই। তখন বরফ গলে। এর পরে দরাদরি। অত কম পুরস্কার দিলে কি চলে? আরো কিছু বাড়িয়ে দিন। আমার ব্যাগে নগদ পাঁচশো টাকা ছিল। সেটাও ধরিয়ে দিয়ে মেয়েদেব ছাড়িয়ে আনি। প্রথমেই যাই পুলিশ স্টেশনে। তারপর তাদের তিন বাড়ীতে।

সেইখানে বাধে ফ্যাসাদ। গুরুজন গ্রহণ করতে নারাজ। খুলে বলতে হবে কোথায় ওরা এতদিন ছিল। না বললে বাড়ীতে জায়গা হবে না। মেয়েরা মুখ খুলবে না। আমি বারণ করে দিয়েছিলুম। আমরাও মুখ খুলব না। ওঁরাও বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না। অগত্যা আমি ওদের নিয়ে যাই মীর সাহেবের ওখানে। তিনি তাদের সেদিনকার মতো থাকতে দেন। তারপরের দিন পাঠাতে চান রেসকিউ হোমে। আমি বলি, সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, নইলে সব মাটি হবে। তখন রাতারাতি একটা খালি বাড়ী ভাড়া করা হয়। আমি তার নাম রাখি হস্‌পিস। আমি চার্জ নিই। মেয়েদের বলি, আপাতত আমিই তোমাদের অভিভাবিকা। আমার প্রত্যেকটি আদেশ মানতে হবে। গ্যাং আমাদের গন্ধ পেলে রক্ষা থাকবে না, তাই পাহারার ব্যবস্থা করি। মিস ফোকস্টোন হন মাদার সুপিরিয়র। তার পর যাই হিন্দু কন্যাদের খোঁজে আলীপুরে আমীর আদমিদের মঞ্জিলে। তাঁরা একজন নন, তিনজন। এবার আমাকে আরো সাবধান হতে হলো। সঙ্গে নিলুম মীর সাহেবের কন্যা রাবেয়াকে। এমন সময়ে গেলুম যখন হুজুররা অনুপস্থিত। বেগমদের কথাবার্তা অনেকটা একই ধরনের। অলঙ্কার আরো মূল্যবান। মেয়েরা সেখানে বাঁদির মতো থাকত। আমাদের দেখে কান্না জুড়ে দেয়। বেগমদের বলি, বাইরে গোরা সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে, এরা হিন্দুর মেয়ে, সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। আপনারা ঝামেলায় পড়তে পারেন, যদি বন্দী করে রাখেন। তাঁরা এক কথায় রাজী। ওদের নিয়ে প্রথম কাজ হলো পুলিশ স্টেশনে যাওয়া, সেখান থেকে পরের কাজ হলো গুরুজনদের বাড়ী ওদের পৌঁছে দেওয়া। ওঁরাও জানতে চান কোথায় ওদের পাওয়া গেল। মেয়েদের শিখিয়ে ছিলুম কী বলতে হবে। ওরা বলে লোকের নাম জানে না, রাস্তার নাম জানে না। আমি বলি, ওসব বলা বারণ। বিপদের আশঙ্কা আছে। যা ভেবেছিলুম, ওঁরা ঘরে ফিরে নিলেন না। আমি ওদের সরাসরি হস্‌পিসেই তুলি। মীর সাহেবকে রাবেয়া জানায়। তিনি এসে দেখে যান।"

"আমার রাঙা টুকটুকে বোন। তোর পেটে এত বিদ্যে। আমি এত পড়াশুনা করেও তোর কাছে হার মানছি। কিন্তু তোর সামনে মস্ত ফাঁড়া। ওই মেয়েদের কেউ না কেউ পোয়াতী হবে। চার মাস হতে চলল। কোনো লক্ষণ দেখতে পাস্‌নি?" দীপিকাদি উদ্বিগ্ন হয়ে সুধান।

"আমি, ভাই, অত বুঝিনে। মেট্রন তো বলেছে তিনজনের লক্ষণ দেখছে। দুটি হিন্দু, একটি মুসলমান। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছি রোমান ক্যাথলিক মিশনারিদের সঙ্ঘ 'আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমা'কে ডাকব। সন্ন্যাসিনীরা জানতেও চাইবেন না বৈধ কি অবৈধ, বাপের নাম কী। বাচ্চাকে ওঁরা নিয়ে যাবেন ও রাখবেন। বাচ্চার মাকেও, যদি সে রাজী হয়। পরে তাকে বিদায় দেবেন, যদি না সে

খ্রীস্টান হতে চায়। বাচ্চাকে মানুষ করবেন, যদি কেউ দাবী না করে। আমি তো আর কোনো উপায় দেখছিনে, দিদি। তোর যদি জানা থাকে তো বল।" এমনি করে দু'জনের মধ্যে তুই তোকারি শুরু হয়ে যায়।

দীপিকাদি বোনের মাথাটা টেনে কপালে চুমু খেয়ে বলেন, "ধন্যি মেয়ে টুকটুক। আমার যদি মেয়ে হয় তার নামও আমি টুকটুক রাখব।"

"সে কী, দিদি। তোরও হবে না কি?" টুকটুক ফিসফিস করে সুধায়।

"হতে পারে। একদিন রাত্রে কবচ পরতে অবহেলা করেছি।" দীপিকাদি স্মিতমুখে উত্তর দেন।

।। তিন ।।

জুলিকে পেয়ে ও তার গোলগাল চেহারা নিরীক্ষণ করে তার মা আনন্দে অশ্রুমোচন করেন। তিনি তো আশা করেননি যে তাঁর বেবীর বেবী হবে। ভগবান আছেন।

জুলি একবার বাড়ীখানার উপর চোখ বুলিয়ে বলে, "মা, আবু তালিব কোথায়? ওকে দেখছিনে কেন?"

"আবু তালিবকে আমি ছুটিশুদ্ধ পেনসন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে পাড়ার ছেলেরা ওকে বেহেস্তে পাঠাত।" মা কৈফিয়ৎ দেন।

"আবু আমার ছেলেবেলা থেকে আমাদের বিশ্বস্ত বাবুর্চি। এমন কী ঘটল যে ওকে পাঞ্জাবে ফেরৎ পাঠাতে হলো?" জুলি জেরা করে।

"কাগজে পড়িস্‌নি কলকাতায় কী ভয়ানক দাঙ্গা বেধেছিল? কে কাকে রক্ষা করবে? আমি আবুকে না আবু আমাকে? দু'জনেরই সমান বিপদ। পাড়ার মুরুব্বিরা এসে বলেন, মিসেস্ সিনহা, আপনি বাঁচতেও পারবেন না, বাঁচাতেও পারবেন না, যদি আপনার বৃদ্ধ মুসলিম পাচকটিকে জবাব না দেন। ওর যে কোনো অপরাধ হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ পাড়ায় ওর থাকা না থাকাটার উপর শান্তি বা অশান্তি নির্ভর করছে। হী ইজ আ সিকুইরিটি রিস্ক। এর পরে আমি আর কী বলতে পারি? গভর্নমেন্ট হাউসে আগের মতো আমার গতিবিধি নেই। আমার মেজ জামাইও আর স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল নয়। বর্ণহিন্দুরা এ জমানায় অচ্ছুৎ। ক্যাবিনেটে তাঁরা নেই। কাজেই আমাকে সেই অন্যায় অনুরোধ মানতে হলো। অনুরোধ না আদেশ। তখন থেকে আমার মাথা হেঁট। তোর বাপ যদি বেঁচে থাকতেন কার সাধ্য ছিল আমার বাড়ী বয়ে এসে আমাকে হুকুম করে? আজকের সিচুয়েশনে কেউ কিছু করতে পারে না। লাটসাহেবও না, যদি না তিনি এই মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে স্বহস্তে শাসনভার নেন।" মা হাহুতাশ করেন।

জুলি আর কথা না বাড়িয়ে টেলিগ্রাম করে, 'আবু তালিব, কাম ব্যাক।' টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে একশো টাকা রাহা খরচ পাঠায়। একদিন 'দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা' এসে হাজির। এর পরে বলা উচিত ছিল 'যাও, ঠাকুর, চৈতন চুটকি নিয়া।' কিন্তু ভবিষ্যতে তারও প্রয়োজন হবে, বাড়ীতে একটি [illegible]ক বাড়বে ও জুলি তাকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

আবু ফিরে আসার পর পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। ছেলেরা এসে বলে, "আপনি আমাদের নমস্য। [illegible]ত বড়ো স্বাধীনতা কর্মী! কিন্তু এটা তো আপনাকে বলতে হবে না যে মুসলমানরা সারা বাংলাদেশ গ্রাস করতে চায়, সেখানে হিন্দুকে মারবে কিংবা তাড়াবে কিংবা কলমা পড়াবে। তার চেয়ে আরো খারাপ, ধরে বেঁধে বীফ খাওয়াবে। ওয়াক, ওয়াক, থুঃ। এ ঝুঁকি কে নিতে চায়, আপনিই ভেবে দেখুন। আমরা নিছক আত্মরক্ষার জন্যে লড়ছি। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আপনার এই লোকটি অবশ্য বহুদিনের চেনা মুসলমান। আমরাও তো একে ভালোবাসি। মাঝে মাঝে দেশ থেকে পাওয়া খেজুরটা, কিসমিসটা,

আপেলটা দেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এরা সবাই অন্ধ ইসলামবিশ্বাসী, হিন্দুবিদ্বেষী, সুতরাং এক একটি বিষধর সর্প।"

"তোমরা কি এতই অকৃতজ্ঞ যে এক বছরের মধ্যেই ভুলে গেলে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুসলিম সেনাদের? আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম কংগ্রেস মন্ত্রীদের? যাঁরা এখনো স্বাধীনতার জন্যে লড়ছেন। ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতার। কিন্তু আমি কেমন করে ভুলব যে বিয়াল্লিশ সালে আমি যাঁদের বাড়ীতে আত্মগোপন করে লড়েছিলুম তাঁদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। সেদিন তো কেউ সাপের মতো আমাকে কামড়ায়নি, আমাকে ধরিয়ে দেয়নি। সুনীল, রঘু, বসন্ত, তোমরাও তো পালিয়ে বেড়িয়েছিলে। তোমরাও কি সেদিন মুসলমানের কাছে আশ্রয় চাওনি ও পাওনি? যতরকম পাপ আছে তার মধ্যে হীনতম হচ্ছে পথের সাথী যে কুকুর তাকে স্বর্গের তোরণে পৌঁছিয়ে পরিত্যাগ করা। যুধিষ্ঠির বরং স্বর্গ ত্যাগ করবেন তবু পথের সাথীকে ত্যাগ করবেন না। আমাদের এ দেশের স্বাধীনতা আসন্ন। সেই আমাদের স্বর্গসুখ। আমরা আমাদের মুসলমান সাথীদের যদি সঙ্গে নিতে না পারি তবে বরং স্বাধীনতাকেই ছাড়ব। কিংবা স্বাধীনতাই হয়তো আমাদের অধর্ম দেখে আমাদের ছাড়বে।" জুলি রাগে দুঃখে ভেঙে পড়ে।

ওরা মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, "তা হলে কী করতে বলেন, মঞ্জুদি?"

"নেতাজী থাকলে যা বলতেন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই এখনো সারা হয়নি। আবার বাধলে সে সময় মুসলমানকে মনে পড়বে। সবাই কিছু লীগপন্থী নয়। বহু মুসলমান গান্ধীপন্থী, সুভাষপন্থী, কৃষকপ্রজা, ইউনিয়নিস্ট। ওদের বাঁচাও। যাকে বাঁচাও সেও বাঁচায়। এই আবু তালিবই আমাকে ও আমার মাকে বাঁচাবে।" জুলি বিশ্বাস করে।

ওরা চিন্তাকুলভাবে প্রণাম করে ফিরে যায়।

ওদের চলে যাবার পর মা বলেন, "আবার যদি দাঙ্গা বাধে ওরাই তো এ পাড়ার ভরসা। পুলিশ অপদার্থ। আর্মি সব জায়গায় টহল দিতে পারবে না। তোর মওলানা আজাদ বা খান্ আবদুল গফফার খান বা শাহ্ নওয়াজ খান কেউ আমাদের রক্ষা করতে ছুটে আসবেন না। তুই ভুল করলি।"

জুলি তার মাকে বোঝায় যে কংগ্রেস বড়লাটের গভর্নমেন্টে যোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা পাকাপোক্তভাবে নয়। বনিবনা না হলে পদত্যাগ করে আবার সংগ্রামে নামার দুয়ারটা খোলা রেখেছে। তখন মুসলমানরাও তার আহ্বানে সংগ্রামে নামবে। তিন চার মাসের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে ওয়েভেলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় হয় ওয়েভেল বিদায় নিয়েছেন, নয় কংগ্রেস নেতারা বিদায় নিয়েছেন। বাপুকেও সে সময় নোয়াখালী থেকে বিদায় নিতে হবে। দাঙ্গা বাধিয়ে জিন্না সাহেবের কী লাভ হবে? কংগ্রেসকে সরানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তো কংগ্রেস কোথায় যে কংগ্রেসকে সরাবেন? স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার শুরু হলে সেই গঙ্গার বানে সদলবলে তিনিই ভেসে যাবেন।"

তার মা রাজনীতি বোঝেন না। তিনি রাজভক্ত প্রজা। ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে এটা তিনি কামনাও করেন না, বিশ্বাসও করেন না। তাঁর স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর মতভেদ ছিল। মেয়ের সঙ্গেও মতভেদ হয়েছে।

"তোর ওই এক কথা। হয় ইংরেজ, নয় কংগ্রেস। এদিকে মুসলিম লীগ বলে একটা দাবীদার রয়েছে। সে কি তার পাওনার জন্যে লড়বে না? সারা বাংলা না পাক, পূববাংলা সে পাবেই। কার্জন লাইন আমাদের কপালে লেখা আছে। লর্ড কার্জন এদেশ থেকে গিয়ে ওদেশের গভর্নমেন্টে কী যেন হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁকে সালিশ মানলে তিনি পোলাণ্ডে যান আর সেখানেও এক লাইন টানেন। সেটাকে বলে কার্জন লাইন। পোলরা সে লাইন মুছে ফেলে। আমরাও যেমন মুছে ফেলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার সে লাইন আঁকা হয়েছে। লাইনের এক পাশে পোলাণ্ড, আরেক পাশে

সোভিয়েট ইউনিয়ন। কী করবে গোলরা? এটা যে তাদের কপালের লাইন। কার্জন ছিলেন লাইন আঁকতে ওস্তাদ। শুধু কার্জন কেন, ম্যাকমেহন, যাঁর নামে ম্যাকমেহন লাইন। ডুরাণ্ড, যাঁর নামে ডুরাণ্ড লাইন। তোদের জানা উচিত ইংরেজরা তোদের শত্রু নয়। তারা তোদের ভালোর জন্যেই সেবার লাইন টেনেছিল। এবারেও টানবে, যদি তোরা মুসলিম লীগের সঙ্গে আপস করতে রাজী থাকিস্।" মিসেস সিন্‌হা আপসের পক্ষপাতী।

"আপস কে না চায়? কিন্তু ভারতের ঐক্যের বিনিময়ে নয়। বাংলাদেশের ঐক্যের বিনিময়েও নয়। এ দুটো হলো স্বতঃসিদ্ধ।" জুলির মতে। "আমরা সমগ্রের জন্যে লড়েছি, ভগ্নাংশের জন্যে নয়। ভগ্নাংশ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনে। সমগ্রকে যতদিন না পাচ্ছি ততদিন লড়তেই থাকব। আরো দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর। বাপুও ততদিন বাঁচবেন।"

"সেটা বড়ো শক্ত কথা। বাপু কতদিন বাঁচবেন সেটা বাপুর হাতে নয়। মানুষের হাতে নয়। ভগবানের হাতে।" জুলির মা বলেন।

"ওঁর স্বাস্থ্য এখন চমৎকার। উনি যেদিন কলকাতা হয়ে নোয়াখালী যান সেইদিনই আমরা শিয়ালদায় নেমে ওঁকে দেখতে যাই। তিনি আরো দশ বছর বহাল তবিয়তে বাঁচবেন।" জুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে।

জুলি আবুকে ডেকে উর্দুতে বলে, "কায়দে আজমের তো দাড়ি নেই, সুহ্‌রাবর্দী সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, নাজিমউদ্দীন সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, খিজর হায়াৎ খান্ সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, তবে তোমার কেন দাড়ি থাকবে? ইসলামে দাড়ি ফরজ নয়। দাড়ি না রাখা হারাম নয়।"

আবু দাড়ি নেড়ে বলে, "এ দাড়ির বয়স তোমার চেয়েও বেশী। আমি বরং এ বাড়ী ছাড়ব তবু এ দাড়ি ছাড়ব না। ছাড়লে আমার বিবি আমাকে ছাড়বে। যার দাড়ি নেই সে মরদ নয়।"

জুলি তখন ঠাকুরকে ডেকে বলে, "তোমার ঐ টিকি আর পৈতে দেখলে মুসলমানদের মাথায় খুন চেপে যায়। টিকি আর পৈতে কি না রাখলেই নয়? টিকি পৈতে বড়ো না প্রাণ বড়ো? এইটেই আজকের দিনের জ্বলন্ত প্রশ্ন। এই দাঙ্গাকেই বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে হবে। জ্বলছে আগুন ধিকি ধিকি। এই বেলা দে পৈতে টিকি। বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছি। স্বদেশী টিকি পৈতেও পোড়াব।"

ঠাকুর তো স্তম্ভিত। "এ কী বলছ, দিদি! এই পৈতে হাতে ধরেই আমরা ব্রাহ্মণরা যে ব্রহ্মশাপ দিই তাকে ভয় করে না এমন হিন্দু নেই। এটাই আমাদেরও ব্রহ্মাস্ত্র। আমরা কি আমাদের অস্ত্র তোমাদের মুখের কথায় সমর্পণ করতে পারি? আর আমাদের এই টিকি? এই শিখা? এই শিখায় বাঁধি বেলপাতা বা তুলসীপাতা। হাতে করে তো ঘুরে বেড়ানো যায় না। অভিশাপ যেমন দিই আশীর্বাদও তেমনি করি। এই শিখা থেকেই বেলপাতা বা তুলসীপাতা দিয়ে। অভিশাপ দেবার ক্ষমতা যার আছে আশীর্বাদ করার ক্ষমতাও তার আছে। তোমরা আমাদের ক্ষমতার দুটো দিকই বন্ধ করবে। আমরা কি এতই দুর্বল?"

জুলির মা সহাস্যে মন্তব্য করেন, "চিতাবাঘকে বললে সেও তার দাগ বদলাবে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে বললে সে তার পৈতে ফেলে দেবে না। তেমনি, মুসলমানকে বললে সে তার দাড়ি কামাবে না। আরবদেশ থেকে ফতোয়া এলে স্বয়ং কায়দে আজমও দাড়ি গজাতে শুরু করবেন, নাজিমউদ্দীনের তো কথাই নেই। সুহ্‌রাবর্দী একটু গাঁইগুঁই করতে পারেন, কিন্তু সেটাও সাময়িক। ব্রাহ্মণরা অবশ্য বাইরের অনুশাসনের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁদের অনুশাসন আসে সুদূরতম অতীত থেকে। যার পৈতে নেই তাকে কেউ ব্রাহ্মণ বলে মানতে চায় না। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে শূদ্ররাও দলে দলে পৈতে নিয়ে দ্বিজ হচ্ছে। অনেকে জানে না যে উপবীতটা ব্রাহ্মণদের একচেটে নয়। ক্ষত্রিয়রাও, বৈশ্যরাও উপবীতের অধিকারী। পার্সী পুরোহিত ও পাচকদেরও উপবীত থাকে। প্রাচীনকালে নারীদেরও ছিল। দেবীদের মূর্তিতেও উপবীত লক্ষ করা যায়। তোমরা দেশকে স্বাধীন করতে পারো, কিন্তু দেশাচার, লোকাচার বা কুলাচার বদলে দিতে পারবে না। হিন্দুদের বেলা আস্তে আস্তে বদলে দিতে পারো, মুসলমানদের বেলা একেবারেই না।

ওদের প্রত্যেকের ভিতরে একটা প্রতিরোধের প্রাচীর। তাই ভারতের সমাজ শক, হূণ, কুষাণকে অঙ্গীভূত করতে পেরেছে, কিন্তু তুর্ক, মোগল, আরবকে অঙ্গীভূত করতে পারেনি। উল্টে ওরাই হিন্দুদের একাংশকে ইসলামে দীক্ষা দিয়ে মুসলিম সমাজের অঙ্গীভূত করেছে। অঙ্গীভূত করা না করা নিয়ে এই যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বই হিন্দু মুসলিম বিরোধের মূলে। এর থেকেই জন্মেছে পাকিস্তানের কল্পনা ও দাবী। তার থেকে বেধেছে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বাধবে গৃহযুদ্ধ। যদি ইংরেজরা সত্যিই চলে যায়। আমার বিশ্বাস হয় না। এমন সোনার সাম্রাজ্য কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়? স্বাধীনতা যাকে ভাবছ সেটা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন।''

জুলি তর্কে ভঙ্গ দেয়। তার পরবর্তী প্রোগ্রাম হয় বিয়াল্লিশ সালে যাঁরা তাকে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন সেইসব হিন্দু ও মুসলমানের বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া। তাঁরা কে কেমন আছেন, কেউ মার খেয়েছেন বা মরেছেন কি না, কেউ পালিয়েছেন ও ফিরেছেন কি না। তার মা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, ''তোর পক্ষে বেশী চলাফেরা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। যেটিকে ধারণ করেছিস সেটির পক্ষে নিরাপদ নয়। সব সময় পরিচারিকাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবি।''

শরীর যতই ভারী হয়ে আসে জুলির চলাফেরাও ততই কমে আসে। তবু সে তার হিতকারীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যায়। মোটের উপর ভালোই আছেন ওঁরা। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর মন বিষিয়ে যায়নি। তবে তাঁদের সকলের মনেই আশঙ্কা এই দাঙ্গাই শেষ দাঙ্গা নয়। সেটা আসন্ন না হলেও অবশ্যম্ভাবী। জিন্না তাঁর জেহাদ নামক শেষ অস্ত্র সংবরণ করবেন না। যদি না ইংরেজরা পাকিস্তান দিয়ে চলে যায়। জুলি কি বলতে পারে আবার গণ সত্যাগ্রহ ছাড়া তার মহান নেতার হাতে আর কী অস্ত্র আছে? থাকতেন যদি নেতাজী তা হলে তাঁর হাতে মারণাস্ত্র থাকত। নেতাজীর অভাবে জুলি ক্রমশ গান্ধীজীর দিকেই ঝুঁকেছে। সেটা তার স্বামীর সান্নিধ্যের জন্যেও বটে। সৌম্যর কাছে অহিংসা হচ্ছে মূলনীতি। জুলির কাছে পলিসি। এই পার্থক্যটুকু বাদ দিলে ওরা এখন এক লক্ষ্যে এক নেতৃত্বাধীন। তবে সে আর সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে না, যদি বাপু আবার সংগ্রামের ডাক দেন। তাকে তার মাতৃকর্তব্য পালন করতে হবে।

তার মেজদি একদিন স্বামীর সঙ্গে খোঁজখবর নিতে আসেন। জানতে চান ক'মাসের। কবে প্রত্যাশা করছে। কী কী বন্দোবস্ত হচ্ছে। তাঁর স্বামী ভূতপূর্ব স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, ''চার বছর আগে তুমি যে কলকাতা দেখেছিলে এ কলকাতা সে কলকাতা নয়। কিছু লক্ষ করেছ?''

''কই, না তো।'' জুলি তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেনি।

''চারবছর আগে ইংরেজ আর মার্কিন সৈন্যরা কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় দুরন্ত বেগে গাড়ী চালিয়ে সব কুকুর সাফ করে দেয়। কুকুরবংশ নির্মূল। তাদের মধ্যে উঁচু জাতের বিলিতী কুকুরও ছিল। বুড়ো হয়ে গেছে বলে বেচারিদের বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল তাদের দেশী মালিকরা। সাহেব মালিকরা তা না করে গুলী করে মেরেছিল। তোমার দিদি দয়া করে দু'তিনটিকে ঘরে এনে বাঁচায়। তুমি তো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। নইলে তুমিও আরো কয়েকটিকে বাঁচাতে। এক বছর বাদে দেখা গেল মানুষ মরছে কাতারে কাতারে। খিদের জ্বালায় পড়ে আছে প্রকাশ্য রাজপথে। সে দৃশ্য তোমাকে দেখতে হয়নি। তুমি তখন জেলে। বাইরে থাকলে কয়েকজনকে বাঁচাতে। আমরা আর কতটুকু করতে পারি। লঙ্গরখানা খুলে সেবাকার্য করেছিলুম। এবার কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অকর্মক। তুমি থাকলে কী করতে জানিনে।'' জামাইবাবু বলেন।

''কেন, কী হয়েছিল এবার?'' জুলি বুঝতে পারে না।

''এবার কলকাতার যেখানে যত ভিখিরি ছিল সব সাফ হয়ে গেছে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাবাজরা কানা, খোঁড়া, নুলো, কুষ্ঠরোগী কাউকেই রেহাই দেয়নি। পিটিয়েছে, খুঁচিয়েছে, কুপিয়েছে, পুড়িয়েছে গঙ্গায় ভাসিয়েছে বা ডুবিয়েছে। ইংরেজ মার্কিনের কৃপায় পথঘাট হয়েছিল নিষ্কুকুর। হিন্দু মুসলমানে

মেহেরবানীতে হলো নির্ভিক্ষুক। কোথাও কোথাও নিক্ষিরিওয়ালা। পরশুরাম যেমন পৃথিবীতে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন তেমনি আর কী? এর পরের দৃশ্য বোধহয় নির্ধনিক ও নির্জমিদার করা। কমিউনিস্টরা ওৎ পেতে বসে আছে। কবে আবার দাঙ্গা বাধবে। তেমন একটা কচার না পেলে ওরা আসরে নামবে না।" কৌসুলীর উক্তি।

"আপনি মনে করেন এটা কমিউনিজমের দিকে মোড় নেবে?" জুলি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। বাবলীরাই ঘোলা জলে মাছ ধরবে।

"আমার প্রিয় শালী, তুমি কোন্ স্বর্গে বাস করছ? তুমি কি ধরে নিয়েছ দেশের অবস্থা এখনো গান্ধীজীর নিয়ন্ত্রণে? না, এখন কারো নিয়ন্ত্রণে নয়। না গান্ধীর, না জিন্নার, না ওয়েভেলের, না বারোজের। তবে সর্বত্র কোয়ালিশন হলে, সবাই সবাইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলে এখনো সিচুয়েশন সামলানো যায়।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"কাউনসেল অভ্ ডেস্‌পেয়ার।" মিসেস সিন্‌হা কণ্ঠক্ষেপ করেন।

জুলির মাসিমা সেখানে ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেন, "আমরা ধনিকও নই, জমিদারও নই, আমরা বাঁচব তো?"

"মনে হয় বাঁচবেন। তবে তিনজন মানুষের জন্যে ছ'জন দাসদাসী রাখতে পারবেন না। বাড়ীটাও শেয়ার করতে হবে বাইরের লোকের সঙ্গে। পানভোজনও।" ব্যারিস্টার সাহেব অন্য অর্থে পানভোজন করেন।

মাস দেড়েক বাদে সৌম্য বিহার থেকে ফেরে। তার মুখ অন্ধকার। জুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে সুধায়, "কী দেখে এলে? কেমন দেখে এলে?"

"অবস্থা শান্ত। সেটা যেন ঝড়ের আগের ঠাণ্ডা। ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তার রক্তের ছাপ আর ধ্বংসের ছাপ দেখে এলুম। কয়েকটি বন্দিনীকে মুক্ত করতে পারলুম, মুক্ত হয়েছে যারা তাদের দেখে এলুম, কিন্তু কয়েকটি এখনো আটক হয়ে রয়েছে। তারা হস্‌টেজ বা জামিন।" সৌম্য কাতর স্বরে উত্তর দেয়।

জুলি স্তম্ভিত হয়। "এ কি সত্যি? বিহারে, কংগ্রেস শাসনে?"

"বিয়াল্লিশ সালে আমরা ওদের যা শিখিয়েছি তাই ওরা প্রয়োগ করেছে। যাদের বিরুদ্ধে তারা মুসলমান। বিশেষত ধনী মুসলমান। নোয়াখালীতেও একই প্যাটার্ন। হিন্দু, বিশেষত ধনী হিন্দু। সব চেয়ে যেটা খারাপ লাগে সেটা নারীকে এর মধ্যে টেনে আনা। যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে। তবে মাত্রার তারতম্য আছে।" সৌম্য বিমর্ষভাবে বলে।

"মাত্রাটা বড়ো কথা নয়। লঘুত্ব ও গুরুত্বই বড়ো কথা। শুধু কি অপহরণ না তার পরে ধর্ষণ?" জুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে জেরা করে।

"সেটা আমি বলতে পারব না। মহিলারা কেউ সে রকম অভিযোগ করছেন না। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও সম্মত নন। ভবিষ্যতের কথা তো চিন্তা করতে হবে। সন্দেহভাজন আসামীদের ধরপাকড় করা হয়েছে ঢের। কিন্তু আদালতের বিচারে ক'জনের সাজা হবে? আর কোন্ অপরাধে? হরণের না ধর্ষণের? তাই সরকারী মহলও চিন্তিত।"

জুলি বলে, "আমিও যেতুম, দেখতুম, উদ্ধার করতুম, দণ্ডদানের ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু কী করব? দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমি এখন অপারগ। আচ্ছা, আশ্রমে ফিরে যাবার আগে একটা সামাজিক কর্তব্য সেরে যাও দেখি। নিয়ে চল আমাকে স্বপনদার ওখানে। তাঁর নাকি হাত পা কাঁপছে। সেই দাঙ্গার সময় থেকে। আমার যাওয়া উচিত ছিল আরো আগে। যাইনি, নানান জায়গায় যেতে হয়েছিল। তা ছাড়া তোমার প্রতীক্ষায় ছিলুম।"

সেইদিনই দু'জনে স্বপনদার নতুন ঠিকানায় যায়। বৌদি দরজা খুলে দেন। চেঁচিয়ে বলেন, "কারা এসেছে জানো? জুলি আর তার বর।"

জুলির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে জুড়ে দেন, "আরো একটি মানুষ, যার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

স্বপনদা উঠে এসে জুলিকে আলিঙ্গন করেন। সৌম্যর দুই কাঁধ ধরে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁকানি দেন। ক্যারামেল অনেকদিন থেকেই মজুত রয়েছিল। জুলিকে দিয়ে বলেন, "আমার প্রিয় বোন ক্যারামেল। আমার প্রিয় বোনটি। একটু যেন মোটাসোটা মনে হচ্ছে। পূব বাংলায় খাঁটি দুধ ঘি ননী মাখন খেয়ে।"

দীপিকাদি উচ্চ হাস্য করে বলেন, "কলকাতার ভেজাল দুধ ঘি খেয়েও তেমনি মোটাসোটা হতো। এটা আরেকজনকে বহন করছে বলে।"

স্বপনদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, "ওঃ তাই নাকি! সুসংবাদ। শুভসংবাদ। সেলিব্রেট করা উচিত। বাড়ীতে কী আছে বার করো। দু'জনের জন্যে।"

বৌদি জুলিকে টেনে নিয়ে অন্য ঘরে যান। কথা হয় চুপি চুপি।

"তারপর, মহাত্মা চৌধুরী! সেকালে এক ঋষি অপর ঋষিকে জিজ্ঞাসা করতেন, অপি তপো বর্ধতে? আমি ঋষি নই, তুমি ঋষি। আমারও সেই জিজ্ঞাসা। বলি, তুমি কিসের তপস্যায় মগ্ন? ফল কী পাচ্ছ?"

"আমাদের এখন মহাসঙ্কট। আমরা জানতুম আমরা ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনো সফল হব না, তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম পালটে দিয়ে অহিংস উপায় অবলম্বন করি। তাতে বহুদূর সফলও হই। এখন ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে বল কষাকষি হচ্ছে না, বোধহয় আর তার দরকারও হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "মুসলিম লীগের সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা এখন আদৌ নামব কি না। নামলে ওদের চেয়েও নির্মম, ওদের চেয়েও বর্বর, ওদের চেয়েও ব্রুটাল হতে হবে। নয়তো সফল হব কী করে? কতক হিন্দু আমাদের নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই ইতিমধ্যে কলকাতায় ও বিহারে হিংসার মোকাবিলা করেছে প্রতিহিংসায় অথবা অতিহিংসায়। কলকাতায় সমান হিংস্র, বিহারে অধিকতর হিংস্র। রোগের চেয়ে রোগের প্রতিকার আরো ভয়ঙ্কর। জবাহরলাল তো আসুরিক চিকিৎসা করতে উদ্যত বিহারের দাঙ্গাবাজদের উপর বোমাবর্ষণ। আমরা যারা অহিংস উপায়ে বিশ্বাসী তাদের কাছে এর চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ আর আসেনি। আমাদের হাতে কোনো তৈরি দাওয়াই নেই। ওষুধ বানিয়ে নিতে হবে। বাপু সেই চেষ্টায় আছেন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে কি আমরা দাঙ্গাবাজদের সম্মুখীন হতে পারব? ফলাফল ভগবানের হাতে। সেই পরিমাণ মানবপ্রেম তথা ভগবদ্‌বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আমরাই বা আর ক'জন। অতিক্ষুদ্র গান্ধী পরিবার। দেশময় অনর্থ হলে দেশময় ছুটোছুটি করা অসম্ভব।" সৌম্য দম নেয়।

স্বপনদা বলেন, "বলো, আর কী বলতে চাও।"

"তারপর শেষ কথাটা কী? মুসলিম লীগের অন্তঃপরিবর্তন হবে, সে আর লড়তে চাইবে না। অস্ত্র সমর্পণ করবে। ভারত অখণ্ড থাকবে। স্বাধীনও হবে। তার পরেও তো প্রশ্ন উঠবে, অতঃ কিম্? সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র তো বলপ্রয়োগে হয় না, ভোটপ্রয়োগে হতে পারে। জিন্না বলেছেন ব্রুট মেজরিটির কাছে তিনি নত হবেন না। আমরা যেমন বলেছি ব্রুট ফোর্সের কাছে আমরা নত হব না। সব মুসলমান যদি একজোট্টা হয়ে পাকিস্তান চায়, সব হিন্দু যদি একজোট্টা হয়ে তাতে নারাজ হয় তা হলে সর্বসম্মত সমাধান তো হবেই না, ভোটের জোরে যেটা হবে সেটা অপর পক্ষ মেনে নেবে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সে বিদ্রোহ অহিংস আকারও নিতে পারে। তা হলেও অহিংসা এক্ষেত্রে নিয়ামক নয়। সত্যই নিয়ামক। মুসলমানদের অমতে তাদের উপর আইন কানুন চাপিয়ে দেবার কী অধিকার আছে হিন্দুদের?

সত্য কার দিকে? সত্যটা কী? ভারতীয়রা কী এক নেশন না দুই নেশন না বহু নেশন? ইংরেজরা ছত্রপতি না হলে ভারতবর্ষ তো ছত্রভঙ্গ অবস্থাতেই থাকত। যতবার তাকে একচ্ছত্র শাসনে আনা গেছে ততবার বাহুবলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমরাও সে পন্থা অবলম্বন করতে পারি। কিন্তু মহাপুরুষ যীশু বলে গেছেন, সমগ্র জগৎ যদি তুমি লাভ কর অথচ নিজের আত্মাকেই হারাও তবে তোমার কতটুকু লাভ হলো? আত্মার বিনিময়ে আমরা সমগ্র ভারত জয় করতে চাইনে। সর্বসম্মতিক্রমে যে অংশ আমাদের সেই অংশই আমাদের। সমগ্র ভারত কি কেবল হিন্দু মেজরিটির জন্যে? মুসলিম মাইনরিটির জন্যেও নয়? তাদের জন্যেও যদি হয়ে থাকে তবে তারা ভোট দিয়ে সেকথা বলুক। তারা আদৌ ধরাছোঁওয়াই দিচ্ছে না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট করেছে। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে এসেছে সেটাকে ভিতর থেকে বানচাল করতে। নোয়াখালীতে বাপু এমন বাধার মুখোমুখি হচ্ছেন যে রাতের মাঝখানে থেকে থেকে কেঁদে উঠছেন, "এখন আমি কী করি?" আমারও তো একই দশা। মুসলমানরা ইংরেজদের মতো বিদেশী নয়, তবু একদল এখন এই হাজার বছর পরেও বিদেশী হবে বলে জেদ ধরেছে। সেই বিদেশের নাম পাকিস্তান। তারা একদা বিজেতা ছিল বলে এখন আবার বিজেতা হতে চায়। তাই হাঁক ছাড়ছে, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' বিধর্মী তারা আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। মাঝখানে একটা সেতু গড়ে উঠেছিল। নানক, কবির, দাদু, রজ্জব, চৈতন্যের প্রেমের সেতু। সেটা ভেঙে চুরমার করেছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তথা প্যান-ইসলামিজম। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আবার গড়ে তুলতে পারিনি। মাঝখানে দুই সম্প্রদায়কে এক করেছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ভাষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় আছে, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের মনের মিল পল্লী অঞ্চলে এখনো কতকটা আছে, কিন্তু এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার ঢেউ সেখানেও পৌঁছেছে। গ্রামগুলোও যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয় তবেই আমরা গেছি। যুদ্ধে জিতেও যুধিষ্ঠির মহারাজ সিংহাসন ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথ ধরেন। আমাদের বাপুরও সেই পরিণাম না হয়।" সৌম্য কাতর কণ্ঠে বলে।

স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দেন। "মুসলিম লীগ মুখে যাই বলুক না কেন সে আমাদের পর নয়, আপন শরিক। এটা শরিকানা মামলা। চলছে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতম আদালতে। রায় দেবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলী। সেবার যেমন দিয়েছিলেন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। রায়টা যে পুরোপুরি মুসলিম লীগের পক্ষেই যাবে এমন কথা ধরে নেবার কারণ নেই। কংগ্রেস ইংরেজকে জ্বালিয়েছে এর জন্যে ওরা তাকে সাজা দেবে তেমন জাতই ওরা নয়। ওরা অতীত দেখে কাজ করে না, ভবিষ্যৎ দেখে করে। ভবিষ্যতে কে তাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করবে, কে তাদের শিবিরে যোগ দিয়ে লড়বে, এইসব চিন্তা করেই তারা কাজ করে। তুমি আমার কথা বাপুকে জানাবে। তিনি যেন ইংরেজদের উপর বিশ্বাস না হারান। তারা মহৎ বলেই মহত্তের মর্যাদা বোঝে। জিন্নাকে অবশ্য ডুবিয়ে দিয়ে যাবে না। মুসলমানদের কাছে তারা বহুভাবে ঋণী। ভবিষ্যতেও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার দরকার হবে। পারস্য উপসাগরের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। ইরাক, ইরান, আরব উপকূলের তৈল আহরণ করতে। ইউনিটি অভ্ ইণ্ডিয়া ইজ আ লস্ট কজ্। তার জন্যে আমি চোখের জল ফেলিনে। আমার চোখের জল বাঙালীর জন্যে, বাংলার জন্যে। যা দেখছি যা শুনছি তা আমার হাতে পায়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে। একটা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছি। ভালচারাইজেশন।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। বলে, "ভুলে যান, স্বপনদা, ওই দুঃস্বপ্ন।"

"ক্ষমা করতে পারি। ভুলতে পারিনে, সৌম্য।" স্বপনদা বলেন।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় বৌদি ঢুকেছিলেন জুলিকে নিয়ে। তিনি কথা কেড়ে নিয়ে বীরদর্পে বলে ওঠেন, "মেরি কলকত্তা নেহি দুঁগী।"

জুলি তো অবাক। "সে কী, বৌদি, তুমি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে দেবে?"

"গৃহযুদ্ধ এড়াতে। দেখছ না একটা দাঙ্গাতেই তোমার দাদার কী হাল হয়েছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে সর্বাঙ্গ কাঁপবে।" দীপিকাদি আশঙ্কা করেন।

।। চার ।।

ষোল বছর পরে যূথিকার মা তাকে চিঠি লিখেছেন। অবিশ্বাস্য ঘটনা। অঘটন আজও ঘটে। যূথিকা একনিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে ও মানসের দিকে বাড়িয়ে দেয়। একটি কথাও বলে না। মা লিখেছেন —
"সাবিত্রীসমানেষু,

প্রিয় শেলী,

খবরের কাগজে দেখিলাম তোমাদের ওদিকে নোয়াখালী নামে একটা জায়গায় কী সব ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। তোমরা নিরাপদে আছ তো? আমাদের নিরাপত্তার জন্য তোমরা যেমন চিন্তিত ছিলে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরাও তেমনি চিন্তিত জানিবে। সেবার তোমাদের সাহায্যেই আমরা রক্ষা পাইলাম। ষোলই, সতেরোই আগস্ট আমরা গৃহবন্দী। চারদিকে 'আল্লা হো আকবর' ও 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' চিৎকার। ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া আমরা দুইদিন লুকাইয়া থাকি। টেলিফোন করিয়া কাহাকেও পাই না। গাড়ী বাহির করিতেও সাহস হয় না। পথেই কাটা পড়িব। এমন অবস্থায় পুলিশ থেকে একজন গোরা সার্জেন্ট আসিয়া জানিতে চাহিল আমরা কি এখানেই থাকিতে ইচ্ছা করি না অন্য কোনো পাড়ায় চলিয়া যাইতে চাহি। অন্যত্র যাইতে চাহিলে পুলিশ সঙ্গে যাইবে। আমরা জানিতে চাহিলাম, আপনারা খবর পাইলেন কাহার কাছে? তিনি বলিলেন, পুলিশ ওয়্যারলেসে আপনার কন্যা ও জামাতার তরফ হইতে খোঁজ লইতে বলিয়াছেন তাঁহাদের জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব। আমরা তো হাতে স্বর্গ পাইলাম। সেইদিনই চলিয়া গেলাম হেস্টিংসে। এক ইউরোপীয় বন্ধুর বাড়ী। তাঁহার সহায়তায় সেই পাড়াতেই একটা খালি ফ্ল্যাট পাইলাম। কেয়ারটেকার ফ্ল্যাট। যাঁহাদের ফ্ল্যাট তাঁহারা ফিরিলেই আবার সরিতে হইল। এবার চেতলায় এক আত্মীয়ের বাড়ী। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে স্বস্থানে ফিরিয়াছি। তোমাকে চিঠি লিখিব লিখিব করিয়া লেখা হয় নাই। বিশ্রাম পাই নাই বলিলে মিথ্যা হইবে না, কিন্তু পুরোপুরি সত্যও হইবে না। আসল কারণ সঙ্কোচ। তোমার সঙ্গে ষোল বৎসর পত্র ব্যবহার নাই। তোমাকে লিখিলে তুমি কী মনে করিবে।

শেলী, আমরা এই ষোল বৎসরে অনেক জায়গায় বাস করিলাম। সিমলার চাকরির মেয়াদ ফুরাইলে লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে এক জাহাজে গেলাম ইংলণ্ডে। চেলটেনহ্যামে ইংরেজ পেনসনারদের সঙ্গে আমরাও বসতি করিলাম। কিন্তু মুখপোড়া হিটলার যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। আক্রমণের ভয়ে আমরা পলাইয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীটা কিনিলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই। জাপানী বোমার ভয়ে চলিলাম আবার সিমলায়। যুদ্ধের পরে কলিকাতা ফিরিলাম শান্তির আশায়। কিন্তু কোথায় শান্তি। দাঙ্গাহাঙ্গামায় শহর বিপর্যস্ত। তোমাকে আর যাহা বলিবার ছিল তাহা শুনিলে তুমি বলিবে, বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। হ্যাঁ, মা শেলী, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। তোমার দাদা কলিকাতায় থাকিয়াও খোঁজ লয় না আমরা জীবিত না মৃত। তোমার ছোটভাই তার শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, তবে তার ফ্ল্যাটের জন্যে ভাড়া দেয়। সে কালেভদ্রে দেখা করিতে আসে। শুনিয়া থাকিবে তোমার দাদা মেম বিবাহ করিয়া স্বেচ্ছায় সমাজচ্যুত হইয়াছেন। তোমার বাবা তাই তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহার পুত্র হইলে সে তো পিণ্ডাধিকারী হইতে পারিবে না, আমরা তবে পরলোকে কাহার হাতে পিণ্ড পাইব? তোমার বাবা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে তোমার ছোট ভাইই

তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি নিজেই সম্বন্ধ করিয়া স্বসমাজে তাহার বিবাহ দিলেন। বধূমাতা বড়লোকের কন্যা। কিন্তু সে আমাদের মতো মাঝারি অবস্থার লোকের ঘরে থাকিল না, চলিয়া গেল তাহার পিতৃগৃহে। দুঃখের বিষয় তাহার স্বামী ও পুত্রকেও লইয়া গেল।

এখন আমরা শুনিতেছি ইংরেজরা এ দেশ ছাড়িয়া চিরবিদায় লইতেছে। আমাদের মতো রাজভক্ত প্রজাদের ভাসাইয়া দিয়া যাইতেছে। মুসলিম লীগ শাসাইতেছে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবে। তাহা হইলে আমরা ইহলোকেই বা কী খাইব? পেনসনের টাকায় কি আজকাল সংসার চলে? তাহা হইতে বড় কথা জমিদারি যদি না থাকিল তবে কী থাকিল যে তোমার দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হইল ও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল? আর তোমার ছোট ভাইকেও এমন কী দেওয়া হইল যে সে আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আমাদের দিকে তাকাইবে? এ সংসারে সব সম্পর্কই সম্পত্তিভিত্তিক। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি এ সংসারে কেহ কাহারও নহে। মায়ার সংসার। তোমার বাবা এখন দেশের মায়া কাটাইয়া দিয়া আবার বিলাতে চলিয়া যাইবার জন্য তৈরি হইতেছেন। যুদ্ধ শেষ। বিলাত নিরাপদ। তাহা হইলে কেন এদেশে পড়িয়া থাকা? দেশ স্বাধীন হইলে কংগ্রেস কি আমাদের মান রাখিবে? শুনিতেছি বিলাতী উপাধিগুলো কাঁচিয়া যাইবে। ও. বি. ই. বলিয়া কেহ চিনিবে না, মানিবে না। যাক, এসব কথা লিখিয়া তোমাকে 'বোর' করিতে চাহি না। তুমি তোমার সংসার লইয়া আনন্দেই আছ। আনন্দেই থাক। তোমাদের সবাইকে আমাদের শুভকামনা। ইতি তোমার অভাগিনী মা।"

পড়তে পড়তে যূথিকার চোখ ছল ছল করে। আবেগে তার বাগ্‌রোধ হয়। মানসও নীরব থাকে।

"অভিজাত পরিবার!" যূথিকা চোখ মুছে বলে। "ভাঙবে, তবু মচকাবে না।"

"এবার তো বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। তুমি উত্তর দেবে তো?" মানস বলে।

"দেবার কী আছে? ত্যাজ্য কন্যা যাকে করেছেন তাকে আশীর্বাদ পর্যন্ত করেননি। ইঙ্গিতও করেছেন যে সম্পর্কটা সম্পত্তিভিত্তিক। যেন আমিও খোঁজ নিয়েছি সম্পত্তির আশায়। উনি স্বীকার না করলে কী হবে, সম্পত্তি ওঁর প্রচুর জমেছে। জমিদারি উঠে গেলেও অর্থাভাব হবে না। অভাগিনী যদি নিজেকে মনে করেন তবে তা অর্থাভাবে নয়, ভালোবাসার অভাবে। অমন মাকে কে ভালোবাসতে যাবে, বলো? বাবার জন্যেই আমি বেশী দুঃখিত। এখন সে রামও থাকছে না, সে অযোধ্যাও থাকছে না। কেউ তাঁকে চিনছেও না, সেলাম ঠুকছেও না। সেসব উর্দিপরা চাকর বাকরও নেই। মানী লোকের মাথা হেঁট। অন্দরেও খাণ্ডার গৃহিণী।"

যূথিকার মনের অবস্থা অনুমান করে মানস আর কথা বাড়ায় না। কোমল সুরে বলে, "প্রিয়ে শেলী! তোমার ডাকনাম যে শেলী একথা তো তুমি একবারও আমার কাছে প্রকাশ করনি। করলে তো আমি তোমাকে জুই বলে ডাকতুম না, শেলী বলেই ডাকতুম। কী মিষ্টি নাম শেলী! শেলী আমার প্রিয় কবি।"

"ও নাম বরাবরের মতো তেতো হয়ে গেছে। ও নামে ডাকলে আমার মনে পড়ে যায় তোমার অপমান আর আমার বহিষ্কার। পড়লে তো চিঠিখানা, কোথাও কি দেখলে এতটুকু দুঃখপ্রকাশ। ওই যে বলেছি, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। আমি ওঁদের ধনও চাইনে, সম্পত্তিও চাইনে, চাই শুধু একটু স্নেহ, একটু মমতা। যেটা মানুষের সহজাত। পশুর মধ্যেও যা দেখা যায়। যাক, তবু এতকাল পরে মনে পড়েছে যে আমি বেঁচে আছি। আর আমিও হয়তো নিরাপদ নই। এটা আমারই ওয়্যারলেসে মেসেজের পাল্টা মেসেজ। স্বতঃ উৎসারিত নয়।" যূথিকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে যায়।

"তাই শেলী, আমি কিন্তু আনন্দিত। তোমার জননী 'তোমাদের' ও 'তোমরা' লিখে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী ও সন্তানদেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভালোবাসা পাই না পাই, স্বীকৃতি তো পেয়েছি। এই বা কম কী!" মানস গদগদ ভাবে বলে।

"ওটা সাধারণ শিষ্টাচার। ওর মধ্যে স্বীকৃতির নামগন্ধ নেই। স্বীকৃতির জন্যে তুমি এমন কাঙাল কেন? আর কেউ না করুক আমি তো তোমাকে স্বীকার করে নিয়েছি। স্বীকৃতি একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। সার কথা হলো সেই প্রেম, ভালোবাসা। আমার ছেলেমেয়েরা তাদের দাদামশায় ও দিদিমার স্নেহ পাচ্ছে না, তাদের মামা মামীদেরও না। তাদের খেলার সাথী ও পড়ার সাথীদের সঙ্গে এইখানেই তফাৎ। এতদিন এটা তাদের খেয়াল হয়নি, এখন স্কুলে গিয়ে হৃদয়ঙ্গম করছে। যতদিন পেরেছি ভুলিয়ে রেখেছি। আর পারছিনে। ওঁদের দিক থেকে এটা নিষ্ঠুরতা। কবে এটা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করবেন? এই চিঠিতে ওঁদের অন্তঃপরিবর্তনের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তুমিও নিশ্চয়ই অনুভব করছ যে তোমার সহযোগীদের শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন, শালা আছে, শালী আছে। তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ও শালা থাকলেও না থাকার সামিল। শালী অবশ্য কোনোদিন ছিল না।" যূথিকা আক্ষেপ করে।

মানসের হাসি পায়। "শেলী যত মিষ্টি শালী তার চেয়ে কম মিষ্টি নয়। যদি বলি আরো বেশী তুমি ক্ষেপে যাবে।"

"তা হলে তুমি এক কাজ করো। আমাকেই শালী বলে ডাকো। কিন্তু ছেলেমেয়ের সামনে না।" যূথিকা অভিমান করে।

মানস জিব কেটে বলে, "ছি। বৌকে শালী বলে ডাকব! তা হলে তো শালীকেও বৌ বলে ডাকতে হয়। শালী নেই, ভালোই হয়েছে। শেষকালে কাকে কী বলতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়তুম।"

যূথিকা কিছুদিন পরে নিজেই চিঠির জবাব দেয়। মানসকে দেখায়। চিঠিতে ছিল —

"প্রিয় মা,

তোমার চিঠির জন্যে আমাদের ধন্যবাদ। আমরা এখন পর্যন্ত নিরাপদ। কিন্তু কখন কী ঘটে বলা যায় না। তোমরা বিপদ দেখলে পালিয়ে যেতে পারো, আমাদের কি পালানোর জো আছে? ওর ডিউটি, ও পালাতে পারে না। জজ না থাকলে জেলা অরাজক হবে। ওকে রেখে আমরাই বা পালাই কী করে? আমরা কি তেমন নিষ্ঠুর? তা ছাড়া আমাদের এই জেলার চারদিকে নদী নালা জঙ্গল পাহাড়, রেল লাইন যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যদি জাহাজ না চলে, ট্রেন বিপদের মুখে নিয়ে যায়, মোটরও কিছুদূর গিয়ে পথ পাবে না। তা হলে আমাদের কী দশা হবে তা আন্দাজ করতে পারো। আমরা আগুনের ভিতরে থেকেই নিরাপত্তার অন্বেষণ করব। রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে? আমরা ধর্মকর্ম কিছুই করিনে। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করি। আর তাঁর প্রতিরূপ মানুষেও।

আমাদের প্রণাম জেনো তোমরা। ইতি। তোমার —

ত্যাজ্যকন্যা শেলী"

এবার মানসের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলে, "ত্যাজ্যকন্যাটা কেটে দাও। কী দরকার খোঁচা দেওয়ার? এ যেন কাঁকড়াবিছের ল্যাজেই কামড়।"

যূথিকা ওটা কেটে দিয়ে ওর জায়গায় লেখে, "মৃতকন্যা"।

তা দেখে মানস শিউরে ওঠে, "সর্বনাশ! সতীর দেহত্যাগ শিবের জীবনেও অভিসম্পাত।"

"ওঁরাই তো বলেছিলেন আমি ওদের চোখে মৃত।" যূথিকা স্মরণ করে।

"সেটা রাগের মাথায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা। ওসব ধরতে নেই। ভুলে যাও আর ক্ষমা করো।" মানস তার শাশুড়ীর হয়ে বলে।

"ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়।" যূথিকা ঘাড় নাড়ে। যা হোক শেষ পর্যন্ত লেখে, "পতিব্রতা কন্যা শেলী।"

মানসের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "তোমার জন্যে আমি কিছুই ত্যাগ করিনি। আমার জন্যে তুমি কত কী ত্যাগ করলে!"

যূথিকা স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "প্রেমের জন্যে ত্যাগ তো চিরকাল নারীরাই করে। পুরুষেরা কবে করেছে? একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় চণ্ডিদাস। হয়তো ওদেশের সাহিত্যে ওরকম কয়েকটি ব্যক্তিও পাওয়া যাবে। আর পারস্যের সাহিত্যে। লায়লা আর মজনু।"

"অত দূর যেতে হবে কেন? এই তো সেদিন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্যে সিংহাসনত্যাগ করলেন। পুরুষরাও পারে, তবে নারীদের মতো অত বেশী নয়।" মানস আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করে।

এর পর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ আবার ওঠে। যূথিকা সুধায়, "তোমাদের বিপদে আপদে একটা র‍্যালিং পয়েন্ট স্কীম আছে না?"

"আছে বইকি। পুলিশবেষ্টিত হয়ে এক নিরাপদ কেন্দ্রে সবাইকে বাস করতে হবে। আমার প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবে না। স্বাধীনতা বলতেও না। পরে আমি পুলিশের বিরুদ্ধে একটি লাইনও লিখতে পারব না।" মানস বলে।

"সাধে কি ইংরেজরা পুলিশকে এত তোয়াজ করে?" যূথিকা টিপ্পনী কাটে।

"গরজ বড়ো বালাই। এই যে আমি পুলিশ ওয়্যারলেসের সাহায্যে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর খোঁজ নিলুম এটা কি আমারও শক্ত হাতকে কম শক্ত করবে না? ও রকম একটা পরিস্থিতিতে ও ছাড়া আর গতি ছিল না। তেমনি আরো একবার হয়তো সাহায্য নিতে হবে, যদি র‍্যালিং পয়েন্টে আশ্রয় নিয়েও স্বস্তি না থাকে। শুধু আমাদের নয়, অফিসার সকলেরই। ওয়্যারলেস করে চেয়ে পাঠাতে হবে হেলিকপ্টার।" মানস ফাঁস করে।

"হেলিকপ্টার? সে আবার কী?" যূথিকা অবাক।

"যুদ্ধের সময় তার উদ্ভাবন হয়েছে। এরোপ্লেন যেখানে নামতে পারে না অবতরণভূমির অভাবে, হেলিকপ্টার সেখানে নামতে পারে। ছেলেদের খেলার মাঠও তার নামার পক্ষে যথেষ্ট। খেলার মাঠ থেকে আমরা ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব, যদি হেলিকপ্টার আনিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সেটা এত গোপনে যে কাকপক্ষীও টের পাবে না। টের পেলে হেলিকপ্টারকে গুলী করে অচল করবে। অগত্যা পাল্টা গুলী চালাতে হবে।" মানস চোখ বোজে।

যূথিকা বিশ্বাস করতে পারে না যে পরিস্থিতি ততদূর ভয়াবহ হবে। বলে, "মানুষ মরে ভয়ে। আমরা ভয় করব না। বিপদের সম্মুখীন হব। তবে ছেলেমেয়েদের আগে থেকে আর কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। শুধু প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, ওসব ভীষণ কাণ্ডকারখানা যেন ওদের কোমল মনের উপর ছায়াপাত না করতে পারে। আশা করি তার দরকার হবে না। কেনই বা হবে, যদি ক্ষমতার হস্তান্তর সময় থাকতে হয় ও নির্বিবাদে হয়।"

"নির্বিবাদে হবে না, শেলী। সময় থাকতে হলেও হতে পারে। ইংরেজদের যদি ভারতের উপর পিছুটান না থাকে। ওয়েভেল কেবলি ওয়েভার করছেন। সেদিন পাকড়াশী এসেছিল টুরে। ক্লাবে দেখা হলো। বলেছিল সময় পেলে বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গেও দেখা করে যাবে। সময় পায়নি মনে হচ্ছে। যাই হোক, সে তো ভিতরের খবর রাখে। সে যা কানে কানে বলে গেল তা কল্পনাকেও পরাস্ত করে।" মানস যূথিকার আরো কাছে সরে আসে।

"আমারও কি শোনা উচিত?" যূথিকা বিব্রত বোধ করে।

"আমারও কি বলা উচিত? তবে তোমাকে না বলে পারিনে। জানি তুমি চাপা মেয়ে। চেপেই রাখবে।" মানস কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়।

"তা হলে বলো কী শুনেছ।" যূথিকা কান পাতে।

"ওয়েভেল প্রাণ ধরে কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রেখে যাবেন না। লীগকে একমাত্র

উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া তো প্রশ্নের বাইরে। একাধিক উত্তরাধিকারী রেখে যেতে হলে ভারত ভাগ করতে হয়। আর্মি ভাগ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগকেও ভাগ করতে হয়। তাঁর একক দায়িত্বে তিনি একাজ করতে পারেন না। কংগ্রেসের রাজিনামা চাই। কংগ্রেস রাজি হবে কেন? কাজটা তো লীগের স্বার্থে। পরোক্ষে ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থে। অথচ কংগ্রেস যদি অকস্মাৎ পদত্যাগ করে আবার সেই কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন বাধিয়ে দেয় তবে সেটাকে দমন করাও আগের বারের মতো সহজসাধ্য হবে না।" মানস থেমে যায়।

"তা হলে তিনি কী করবেন?" যূথিকার কৌতূহল আরো বাড়ে।

মানস কী বলবে, কতটুকু বলবে, কেমন করে বলবে ভাবতে সময় নেয়। তারপর বলেই ফেলে, "দ্যাখ, এসব জল্পনা কল্পনা এখনো পাকা হয়নি, তাই একে প্ল্যান বা স্কীম মনে করলে ভুল হবে। কংগ্রেস যদি অকস্মাৎ পদত্যাগ করে আবার আন্দোলন বাধায় তবে বড়লাট যা করবেন এটা তারই একটা ইঙ্গিত। তিনি 'এ' গ্রুপের কংগ্রেস প্রদেশগুলোর থেকে গভর্নরসমেত সব ব্রিটিশ অফিসারকে প্রত্যাহার করবেন। সেই প্রদেশগুলো তাঁর অধীনতা থেকে মুক্ত হবে। সম্রাটের অধীনতা থেকেও। তার মানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা স্বাধীন। কিছুদিন পরে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার স্বাধীন। কংগ্রেস এসব প্রদেশে গোলমাল বাধাবে না, ক্ষমতা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে। তারপর তিনি বাংলাদেশ ও আসাম থেকেও গভর্নর ইত্যাদিকে সরাবেন। কিন্তু তার আগে কোয়ালিশনের চেষ্টা করবেন। ব্যর্থ হলে হয়তো প্রদেশ ভাগ করে একাংশ লীগকে ও একাংশ কংগ্রেসকে দেবেন। লীগ অবশ্য প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধও করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস যদি তৃপ্ত হয় তো ইংরেজ নিরাপদ। ভয়টা তো কংগ্রেসকেই, লীগকে নয়। এর পরে কী করবেন তা ওয়েভেলের কেন, শিবের অসাধ্য কাজ। পাঞ্জাবের শিখরা অত সহজে তৃপ্ত হবার পাত্র নয়। তারা চায় শিখিস্থান বা খলিস্থান। তার মানে খলসাদের জায়গা। কংগ্রেস তৃপ্ত হতে পারে, লীগ তৃপ্ত না হলেও ইংরেজের গায়ে হাত দেবে না, কিন্তু শিখ! সে যে মারাত্মক ব্যাপার। ওদের বাদ দিয়ে প্রদেশ ভাগ হয় না, ওদের নিয়ে কোয়ালিশনই হতে পারে। না হলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর না মেলা পর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মিকে ভাগও করতে পারা যাবে না, অপসারণ করতেও পারা যাবে না। ওয়েভেল যা করতে চান সেটা কাঁচারকম ক্ষমতার হস্তান্তর। তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যি ক্ষমতা সম্প্রদান করবেন। এর মধ্যে কোনো প্যাঁচ নেই। একভাগ কংগ্রেসকে, একভাগ লীগকে, এটা স্থির কেবল শিখসম্বন্ধেই তিনি মনঃস্থির করতে অক্ষম। তা বলে কি ইংরেজরা অনন্তকাল আটকা পড়ে থাকবে? ইতিমধ্যেই ইংরেজ অফিসাররা ক্ষতিপূরণ পেলে অবসর নেবেন, বলা বাহুল্য পেনসনও পাবেন। কেউ কেউ এমন অধৈর্য হয়েছেন যে ক্ষতিপূরণ না পেলেও শুধুমাত্র পেনসন সম্বল করে বিদায় নেবেন। প্রশ্ন উঠেছে, পেনসনটা দেবে কারা? ব্রিটিশ সরকার, ভারত সরকার, না এক বা একাধিক ভারতীয় সরকার? যতদূর জানা গেছে ব্রিটিশ সরকার দেবেন না, অক্ষম বা অনিচ্ছুক। কংগ্রেস রাজী, লীগও রাজী, কিন্তু কেবল বিদেশীদেরই, স্বদেশীদের নয়। যেহেতু স্বদেশীরা সকলেই চাকরি পাবে। একই শর্তে।"

"এটা তো অন্যায়! বিদেশীদের উপর এত দয়া কেন? ওঁরাও তো ব্রিটেনে বা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে চাকরি পেতে পারেন। আর স্বদেশীরা সবাই কি চাকরিতে থাকতে পাবেন? যাঁরা কংগ্রেসীদের বেধড়ক পিটিয়েছেন বা বেপরোয়াভাবে জেলে পুরেছেন তাঁরা কি টিকতে পারবেন? কংগ্রেসীরা আগে থেকেই শাসিয়ে রেখেছে যে দেখে নেবে। লীগের অধীনে চাকরি করা আরো দুষ্কর। লীগের মুলুক মানে মগের মুলুক। যার নমুনা নোয়াখালী।" যূথিকা শঙ্কিত হয়।

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, "পাকিস্তান না হতেই এই! পাকিস্তান হলে কী যে হবে তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুরা না হয় কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গ তাদের ভাগে পাবে। ক্যাবিনেট মিশন সেটা

মানেন। বড়লাটও সেটা মানেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ তো তাদের নাগালের বাইরে থাকবে। সেখানে বলপূর্বক নারীহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ, জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করে করপ্রদানে অক্ষমদের ঘরবাড়ী জায়গাজমি অধিগ্রহণ তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। ঠেকাতে গেলে যুদ্ধ বাধবে ও তাতে বহুলোক হতাহত হবে। যুদ্ধনিবারণ যাঁদের ব্রত, যেমন মহাত্মা গান্ধীর, তাঁরা তো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ সমর্থন করতে পারেন না। তাঁদের এখন থেকেই সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে যুদ্ধ না বাধে। আমার তো ভয় হচ্ছে যে ইংরেজদের প্রস্থানের পূর্বেই জনতায় জনতায় যুদ্ধ, সৈনিকে সৈনিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সেটাই জিন্না সাহেবের সংকল্প আর তিনিও গান্ধীজীর মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু একজন যেমন কট্টর অহিংসাবাদী অপরজন তেমনি পাকিস্তান অর্জনের জন্যে পিস্তলধারণে বিশ্বাসী। তা বলে পিস্তল দেখিয়ে তিনি বা তাঁর অনুগামীরা নারীহরণ করতে পারেন না, ইসলামে দীক্ষিত করতে পারেন না। এই দুটি অ্যাকশন যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের অন্তর্গত হয় তবে সারা দেশ জ্বলে উঠবে। কেউ নেবাতে পারবে না। না ইংরেজ, না কংগ্রেস, না লীগ, না গান্ধী, না জিন্না। তবে দাবানলের পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায় না। শান্তি একদিন ফিরবে। নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতের সাধারণ মানুষ স্বভাবতই সহনশীল। মুসলমানরাও যে সবাই অসহিষ্ণু তা নয়। এই দ্যাখ না, আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আফজল সিরাজী। উনি স্বয়ং গিয়ে হেলথ অফিসার বশীর আহমদের বাড়ী থেকে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করেন, শাসিয়ে আসেন যে পরের বার গ্রেফতার করবেন। আর আমাদের পুলিশ সাহেব ফিদা হোসেন খান্ তো দিনরাত গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে চড়ে, কখনো নৌকায় করে। কখনো স্ববেশে, কখনো ছদ্মবেশে। তিনি খানসামা সেজে চিয়াং কাইশেক আর মাদাম চিয়াং কাইশেককে স্পেশাল ট্রেনে খানা পরিবেশন করেছিলেন। দারুণ তুখোড় অফিসার। এঁরা কেউ কম মুসলমান নন, কিন্তু এঁরা মাইনে পাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, পাকিস্তান অর্জন করতে নয়। ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি রুল অভ্ ল। সেই শাসন যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাঁরাও তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন, আমিও আমার কর্তব্য পালন করব। দুঃখ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে পাকিস্তান হলে এঁরাও তার শাসকদলের অধীনে চলে যাবেন। রোমে যারা যায় তারা রোমানদের মতো আচরণ করে। পাকিস্তানে যাঁরা যাবেন তাঁরা পাকিস্তানীদের মতো আচরণ করবেন। যুদ্ধ বাধলে এঁরা থাকবেন ভিন্ন শিবিরে। হায়, হায়।"

"ওঃ এইসব দুশ্চিন্তা নিয়ে তুমি রাতের পর রাত পায়চারি করছ? সাধারণ মুসলমানরা আমাদের মালীর মতো ভালোমানুষ, আমাদের বাবুর্চির মতো নিরীহ। কিন্তু ওদের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র অন্যরকম। ওঁরা এইসব সাধারণ মুসলমানকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন। হিন্দুর বাঁচবার পথ থাকবে, সে পালিয়ে বাঁচবে, কিন্তু পশ্চিমা হিন্দুরা আক্রমণ করলে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান বাঁচবে কী করে? কোথায় পালাবে? পশ্চিমে নয়, পূবেও নয়। সেদিকে বার্মা। তা হলে কি দক্ষিণে জাহাজ ধরে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আরব সাগরে ভেসে পশ্চিম পাকিস্তানে কূল পাবে? সারা বাংলাই যদি ওদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তো হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই লক্ষ্যভেদ সম্ভব, হাতাহাতি করে সম্ভবপর নয়। নারীহরণের সাজা একদিন পেতেই হবে। রাবণ রাজার লঙ্কার পতন হলো, আর জিন্না বাদশার পাকিস্তানের পতন হবে না? আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে যে এর পেছনে জিন্নার হাত আছে বা থাকতে পারে। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত আদর করেছেন। জিন্না একজন খাঁটি ভদ্রলোক। সার নাজিমও একজন খাঁটি ভদ্রলোক। তাঁর ভাই খাজা শাহাবউদ্দীনও তাই। বেগম শাহাবউদ্দীন তো আমার বন্ধু। আর সুহরাবর্দী সাহেবেরও তো আমি হিন্দুদের মুখেও প্রশংসা শুনেছি। এঁরা থাকতে এমন অপকর্ম ঘটায় কে? কার হাত আছে এর পেছনে?" যূথিকা জানতে চায়।

"শুনছি গোলাম সারওয়ার। নোয়াখালীতে ওর একটা উপদল আছে। গত নির্বাচনে ওকে লীগ

প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়নি, তাই ও নাকি সুহরাবর্দীর উপর রাগ করে তাঁকে অপদস্থ করার অভিপ্রায়ে খুনখারাবি, লুটতরাজ, আগুন লাগানো, নারীহরণ, ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদি ঘটিয়েছে। ঘটনার বিবরণ যা পেয়েছি তার থেকে মনে হয় না যে মাত্র একজনের মাথা এর পেছনে। দশাননের দশটা মাথা ছিল। একটা মাথা না হয় গোলাম সারওয়ারের। বাকী ন'টার নাম ঠিকানা কী? নোয়াখালী তিনটি মাল রপ্তানী করে বলে প্রসিদ্ধ। সুপারি আর লঙ্কা আর মোল্লা। যদি বলি মোল্লারাও এর পেছনে তা হলে কি ভুল হবে? হিন্দুদের যা স্বভাব। অপহৃতা নারীকে ওরা ঘরে নেবে না, অগত্যা ওরা মুসলমান হয়ে মুসলমানের জন্ম দেবে। যার ধর্মান্তর হলো তাকে একবার গোমাংস খাইয়ে দিলেই সে আর কখনো হিন্দু হতে পারবে না, মন্দিরে ঢুকতে পারবে না, সে ম্লেচ্ছ। মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির কত রকম সহজ উপায়। তার জন্যে হিন্দুদের পবিত্রতার ধারণাই দায়ী। সে ধারণা সীতাকেও অপবিত্র জ্ঞান করে অগ্নিপরীক্ষার বিধান দিয়েছিল। পূর্বপুরুষরা গোমাংস ঘ্রাণ করেছিলেন বলে ঠাকুরবংশকে বরাবরের মতো পিরালী ব্রাহ্মণ করে রাখা হয়। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের মনেও গভীর ক্ষত ছিল। নোয়াখালী একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা আমাদের সাত শতাব্দীর ইতিহাসের ও ঐতিহ্যের উপসংহার। আমরা সবাই চমকে উঠেছি। বাপু পর্যন্ত ছুটে এসেছেন দিল্লী থেকে। এর তাৎপর্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।" মানস এইসব নিয়ে চিন্তান্বিত। এর সমাধান খোঁজে রাত জেগে।

"তোমার মধ্যে আরো একটা পরিবর্তনও লক্ষ করছি। জিজ্ঞাসা করতে পারছিনে মুখ ফুটে।" যূথিকা মুখ টিপে হাসে।

"হ্যাঁ, জুঁই। আমি আবার সেই ব্রত নিয়েছি। যতদিন না নোয়াখালীর মেয়েদের উদ্ধার হয় ততদিন এই ব্রত আমি চালিয়ে যাব। তোমার সম্মতি আছে বলে ধরে নিয়েছি। অন্যায় করেছি?" মানস কবুল করে।

"দূর!" যূথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "তোমার দৌড় কতদূর তা আমি জানি। তাই চুপ করে আছি।"

॥ পাঁচ ॥

কথা ছিল নোয়াখালী থেকে ফিরে এসে বঙ্কিমবাবু মানসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি একদিন আসেন তার কুঠিতে।

"সৌম্যদার সঙ্গেও দেখা হলো। তিনি বিহার ঘুরে এলেন। আপনাদের ভালোবাসা জানিয়েছেন। বৌদি কলকাতায় থেকে গেছেন। শুনেছেন বোধহয় যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা।" বঙ্কিমবাবু বলেন।

"ওমা, তাই নাকি?" যূথিকা বিস্মিত ও আনন্দিত হয়।

মানস মন্তব্য করে, "তা হলে ওর কলকাতায় থেকে যাওয়াই শ্রেয়। যদিও মুস্তাফীদের ওখানে থাকলেও চলত।"

"সৌম্যদাও তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু বৌদি একটু বেশীরকম সাবধানী। একটু বেশী বয়সে এই প্রথম মা হতে যাচ্ছেন কিনা। জটিলতা হতে পারে। তাঁর নিজের ভয়ডর নেই, কিন্তু কে জানে যদি তাঁর সন্তানের অমঙ্গল হয়। একথা শোনার পর সৌম্যদাও অনুমতি দেন।" বঙ্কিমবাবুও অনুমোদন করেন।

এর পর নোয়াখালীর প্রসঙ্গ। বাপু ওখানে যাবার পর থেকে অবস্থা শান্ত। আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সেটা বাপুর প্রভাবে, না পুলিশের প্রতাপে, না মিলিটারির প্রসাদে তা বলা শক্ত। বুঝতে পারা যাবে বাপু যখন নোয়াখালী ছাড়বেন, মিলিটারি তাঁর অনুসরণ করবে ও পুলিশ একলা পড়ে যাবে। যেখানে হিংসা আর অহিংসা একই সঙ্গে কাজ করছে সেখানে কোন্‌টা সফল তা কী করে প্রমাণ হবে?" বঙ্কিমবাবুর সংশয়।

"বাঃ! আপনি গান্ধীপন্থী হয়ে একথা বলছেন?" মানস আশ্চর্য হয়।

"দেখুন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির নিরস্ত্র বিরোধ এক জিনিস আর প্রজাদের একভাগের নেতা হয়ে আরেকভাগের নেতার সঙ্গে মোকাবিলা অন্য জিনিস। কে না বুঝতে পারছে যে এটা জিন্না সাহেবের ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট আন্দোলনের অঙ্গ? বাপুর কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের পাল্টা চাল। কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন কি পুরোপুরি অহিংস ছিল? আমরাই কি বলিনি যে নিষ্ক্রিয় থাকার চেয়ে সক্রিয় হওয়া ভালো, পুরোপুরি অহিংস না হলেও চলে? মানুষ খুন হয়নি, কিন্তু থানা আক্রমণ, ট্রেজারি আক্রমণ ইত্যাদি তো হয়েছে। বেশীর ভাগ অবশ্য বাংলার বাইরে। মুসলিম লীগ এক কাটি সরেশ। মানুষ খুনও করেছে, আরও অনেক কিছু করেছে যা কম শোচনীয় নয়। যেমন নারীহরণ ও ধর্মান্তরীকরণ। ওদিকে বিহারী হিন্দুরাও তা একই মুদ্রায় শোধ করেছে। ধর্মান্তরীকরণটা বাদে আর কী বাকী রেখেছে?" বঙ্কিমবাবুর মাথা হেঁট।

"বলেন কী, কর মশায়। নারীহরণও বাদ যায়নি!" মানস চমকে ওঠে।

"না, মল্লিক মশায়। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।" বঙ্কিমবাবু স্বীকার করেন।

"কক্ষনো নয়। হিন্দুরা কক্ষনো অমন কাজ করতে পারে না। ওরা হাজার অপরাধ করলেও মুসলিম নারী হরণ করে না।" মানসের দৃঢ়বিশ্বাস।

"এমনিতেই করে না। করেছে নোয়াখালীর বদলা নিতে। কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কেউ প্ররোচিত করেনি, যা হয়েছে তা আপনা থেকে হয়েছে। জবাহরলাল শাসাচ্ছেন বোমাবর্ষণ করবেন। অপরপক্ষে বল্লভভাই শাসাচ্ছেন তরবারির সঙ্গে তরবারির ভেট হবে। তার মানে হিংসার প্রতিদানে হিংসা। তা হলে নারীহরণের প্রতিদানে নারীহরণ নয় কেন? এখন আমরা কার নেতৃত্ব মানব? বাপুর, না জবাহরলালের, না বল্লভভাইয়ের?" বঙ্কিমবাবুও বিভ্রান্ত।

"কেন, আইনের শাসন কি উঠে গেছে? দণ্ডবিধি আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন কি রদ হয়েছে? আইন অনুসারে কাজ করার জন্যে পুলিশ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন, জজ রয়েছেন। আসামীদের জন্যে জেল রয়েছে। বোমাবর্ষণের বিধান তো কোথাও লেখেনি। বোমা যদি পড়ে নিরপরাধদের উপরেও পড়বে। তলোয়ার ব্যবহার তো যুদ্ধকালে নিবদ্ধ। যুদ্ধঘোষণা না করেই কি তলোয়ার ব্যবহার করা যায়? তাও সৈনিকে সৈনিকে নয়, গুণ্ডায় গুণ্ডায়। বাপুর সম্বল অবশ্য নৈতিক উপায়। তাঁর কথা আলাদা।" মানস অভিমত দেয়।

"বাপু আশা করছেন যে আমরা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে গিয়ে শহীদ হব। কিন্তু আমাদের সে শক্তি কোথায়? ইচ্ছাই বা কোথায়? চরম আত্মদানের জন্যে আমরা প্রস্তুত নই। তবে যদি কারাবরণের আদেশ পাই আমরা সর্বদা প্রস্তুত। এই পরিস্থিতিতে তিনি কারাবরণের প্রয়োজন বোধ করছেন না।" বঙ্কিমবাবু যতদূর জানেন।

"না করে ঠিকই করছেন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। দেশ অরাজক হবে, যখন ইংরেজরা কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে একতরফা প্রস্থান করবে। কংগ্রেসের ভোটের জোর তখন মুসলিম লীগের উপর বলবৎ হবে না। মুসলিম লীগের ভোটের জোর তখন বাংলাদেশের কংগ্রেসের উপর বলবৎ হবে না। পাঞ্জাবের শিখদের উপর তো নয়ই। বল্লভভাই যে তরোয়ালের জোরের কথা বলছেন সে জোর কি যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য? ইতিহাসে কি বৃহত্তর সৈন্যদল ক্ষুদ্রতর সৈন্যদলের দ্বারা পরাজিত হয়নি একাধিকবার? এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার না করে চলে যায় তবে তার এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না যে সে আড়াল থেকে মুসলিম লীগকে অস্ত্র আর রণকৌশল জোগাবে না। তা যদি হয় কংগ্রেস কেবল পাঞ্জাব থেকে নয়, দিল্লী থেকেও বিতাড়িত হবে। তবে কলকাতা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু গোটা বাংলাদেশ নয়। চট্টগ্রামের বন্দরে পাঞ্জাবী মুসলমান

সৈন্য নামবে ও ঢাকা দখল করে নেবে। বাকী থাকে প্রেমের জোর, যার অপর নাম অহিংসার জোর কিন্তু তার বেলা কি জুলিয়াস সীজারের মতো বলা চলে, এলুম, দেখলুম, জয় করলুম? মানুষের হৃদয় জয় করতে আরো বেশী সময় লাগে। বাপু হয়তো তিন মাস কি চার মাস কি ছ'মাস থাকবেন। নোয়াখালীর পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা যদি কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় হিন্দু মুসলিম জনগণের কাছে আপীল করে কী ফল হবে? জিন্না সাহেবের এজেন্টরাও তো গ্রামে গ্রামে সক্রিয়। এখন ইংরেজদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতি আর কাজ করছে না। জিন্না সাহেবের ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট নীতিই তার স্থান নিয়েছে। দ্বন্দ্বটা ধর্ম নিয়ে নয়, রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে। এর ফয়সালা কি জনগণের স্তরে হতে পারে? হলে হবে উচ্চতম স্তরে।" মানস সংশয়ান্বিত।

"কিন্তু জনগণ যদি আপনাদের মধ্যে মিটমাট করে নেয় তো উচ্চতম স্তরেও কি সেটা প্রতিফলিত হতে পারে না? পাকিস্তানের দাবীটা তো নিচে থেকে ওঠেনি, উপর থেকেই নেমেছে।" মনে করিয়ে দেন বঙ্কিমবাবু।

"তা যদি বলেন, স্বরাজের দাবীটাও নিচে থেকে উপরে ওঠেনি, উপর থেকে নিচে নেমেছে। বটগাছের ঝুরির মতো সেটা এখন মাটিতে দৃঢ়মূল। পাকিস্তানের দাবীও কালক্রমে দৃঢ়মূল হবে। আমাদের ছেলেবেলায় যার নাম ছিল মুসলিম ইণ্ডিয়া পরে তারই নাম হয়েছে পাকিস্তান। যেটা ছিল হিন্দু ভারতের সঙ্গে সমান্তরাল সেটাই হবে হিন্দুস্থানের সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু মুশকিলটা এইখানে যে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু ভারতের হয়ে লড়ছে না, লড়ছে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলের হয়ে, সকলের স্বার্থে। সে স্বার্থ অবিভাজ্য। ভারতের ডিফেন্স অবিভাজ্য, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অবিভাজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিভাজ্য। সেইজন্যে এই তিনটি বিষয় ক্যাবিনেট মিশন অবিভক্তই রেখেছেন। বড়লাটও তাই চান। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে না যায়, সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র যদি রচিত না হয় তবে কংগ্রেসের একতরফা সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনুমোদন করবেন না। জিন্না সাহেবের খুঁটির জোর সেইখানে। রক্ষণশীল দলের শিবিরে। এত বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিক দলের একক সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ হতে পারে না। যেমন এখানকার কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে তেমনি ওখানকার পার্লামেন্টে কনসেনসাস আবশ্যক। জিন্না সাহেব এটা খুব ভালো করেই জানেন। তাই তাঁর এত জেদ।" মানস অনুমান করে।

"জিন্না নিজেও শাসনতন্ত্র রচনা করবেন না, কংগ্রেসকেও তা করতে দেবেন না, কংগ্রেস সেটা করলে অগ্রাহ্য করবেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁর ভীটোকেই বড়ো করে দেখবেন। এ তো ভারী অদ্ভুত কথা! তা হলে তো ব্রিটেনকে থেকে যেতেই হয়। বেশ, তাই হোক। থাকুক ওরা যতদিন খুশি। কিন্তু প্রগতির পথ রুদ্ধ দেখলে কংগ্রেস নেতারাও গদী আঁকড়ে পড়ে থাকবেন না। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ভেঙে যাবে।" বঙ্কিমবাবুর ধারণা।

"সেটাই সম্ভব। কিন্তু সরকারী মহলের ভিতরের খবর ইংরেজরা কংগ্রেসকে কয়েকটা প্রদেশ ছেড়ে দেবে, কয়েকটা লীগকে, একটা কি দুটোর ভাগ বাঁটোয়ারাও করতে পারে। মোদ্দা কথা ওরা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো একটা পার্টিকে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে গদীতে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে না। যার ভোটের জোর বেশী সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে এটা জিন্নাও মানবেন না, ব্রিটিশ পার্লামেন্টও মানবে না। আর কারই বা এত গায়ের জোর আছে যে একচ্ছত্র শাসক হবে? ইংরেজ যেখানে পারল না কংগ্রেস সেখানে পারবে? ঘুরে ফিরে আবার আসতে হয় প্রেমের জোরের কাছে। গান্ধী জিন্নাকে, কংগ্রেস লীগকে, হিন্দু মুসলমানকে যদি ভালোবেসে কোলে টেনে নিতে পারতেন তা হলে ভাবনা কী ছিল? এখন বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কী অন্তঃপরিবর্তন ঘটতে পারে রাজনীতিতে প্রতিফলিত হবে? তবু সেটা পরীক্ষাযোগ্য।" মানস বলে।

যূথিকা মৌন ভঙ্গ করে। "এসব কোনো কাজের কথা নয়। আমি বলি বাপু সময় থাকতে নোয়াখালী থেকে হিন্দুর মেয়েদের নিয়ে ইহুদীদের প্রোফেট মোজেসের মতো পদ্মা পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করুন। বাইবেলে যাকে বলা হয়েছে এক্‌সোডাস। পুরুষরা আরো কিছুদিন থেকে দেখতে পারে মুসলমানদের মতিগতি বদলেছে। তার লক্ষণ না দেখলে ওরাও পেয়ারেলালের নেতৃত্বে অগস্ত্যযাত্রা করবে।"

বঙ্কিমবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, "দিদির বোধহয় মালুম নেই যে নোয়াখালীর শতকরা দশজন হিন্দু শতকরা নব্বইভাগ জমির মালিক আর শতকরা নব্বইভাগ মুসলমান শতকরা দশভাগ জমির। হিন্দুরা অত জমি পেয়েছে খাজনা বাকীর মামলা করে বা সুদ বাকীর মামলা করে। আইন যদি অন্যরকম হতো কিছুতেই অত জমি পেত না। প্রজা ও খাতকের প্রতি সামাজিক সুবিচার করতে যতবারই আইন সংশোধনের প্রস্তাব এসেছে হিন্দুরা বাধা দিয়েছে। যেমন মহাসভাপন্থী তেমনি কংগ্রেসপন্থী। কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললে গান্ধীজীর উপরেও আস্থা হারিয়ে ফেলা হয়। মহাত্মাজী নোয়াখালী গিয়ে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাবেন আমাদের সকলের মনে এই ধারণা ছিল। কই, তেমন কিছু তো ঘটল না। কারণ তিনি সামাজিক সুবিচারের পথ দিয়ে হাঁটছেন না। জমিদারকে বলছেন না, খাজনা মকুব করো। মহাজনকে বলছেন না, সুদ মাফ করো। ওঁরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রজা ও খাতকের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করছেন না। মুসলিম লীগে মহাজন একজনও নেই, জমিদার থাকলেও তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। তাই তার পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, পূরণ করাও শক্ত নয়, যদি পাকিস্তান হয়। মুসলমানরা তাই পাকিস্তানের অনুকূলে ভোট দিয়েছে। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্যে ধার্য দিনে ওরা এসব জেলায় মেতে ওঠেনি। নোয়াখালীর ঘটনা ঘটেছে অনেক পরে। এর পেছনে লীগের হাত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে লীগ থেকে বহিষ্কৃত গোলাম সরওয়ার এর জন্যে দায়ী। তার পেছনে মোল্লাশক্তি থাকাই সম্ভবপর। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই হিন্দু মুসলমানের ধনবৈষম্য। এ বৈষম্য বজায় থাকলে কমিউনিস্টরা এর থেকে ফায়দা তুলবে। তাদের তুলনায় মুসলিম লীগ এমন কী ফায়দা তুলতে পারে? পাকিস্তান একটা বার্গেনিং কাউন্টার। পাকিস্তানের চেয়ে ভালো বার্গেন পেলে ওরা ওটা ছেড়ে দেবে। সেই ভালো বার্গেনটা কী? কী সেই রাজনৈতিক সমাধান? আমি তো ভেবে পাইনে। মল্লিক মশায় বলতে পারেন?"

মানস চট করে উত্তর দিতে পারে না। মাথা চুলকিয়ে বলে, "লীগের আসল দাবীটা তার মনের মতো শর্তে প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠন। ব্যতিক্রম কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সেখানে অবিমিশ্র লীগ গভর্নমেন্ট। কিন্তু লীগের শর্তের মধ্যে এটাও পড়ে যে, কোনোখানেই কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের কংগ্রেসের কোটায় স্থান দেওয়া হবে না। তাঁরা না ঘরকা না ঘাটকা। কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সংগ্রামী কমরেডদের পরিত্যাগ করবেন না। যেমন ব্রিটিশ কর্তারা তাঁদের মুসলিম সহযোগীদের পরিত্যাগ করবেন না। নতুন মিতার জন্যে পুরনো মিতাকে পরিত্যাগ করতে কি কেউ রাজী হন? ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেসের ডেডলক, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ডেডলক, এ দুটি ডেডলকের মূল কারণ হচ্ছে এই। আমি তো আরো ভালো বার্গেন খুঁজে পাচ্ছিনে।"

"তা হলে কি রাজনৈতিক সমাধানের কোনো আশা নেই? নোয়াখালীর মাটি চষাই সার?" বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসু হন।

"গান্ধীজী নিশ্চয়ই ভাবছেন। পণ্ডিতজীও। সর্দারজীও। আপনিও চিন্তা করুন। আমিও চিন্তা করি। সবাই যদি অন্ধকার দেখেন তবে মারামারির ভিতর দিয়েই সমাধান হবে। তলোয়ারের ধার দিয়েও।" মানস যতদূর দেখতে পায়।

যূথিকা অধৈর্য হয়ে বলে, "অত কথা এখন থেকে নাই বা চিন্তা করা গেল। নোয়াখালীর মেয়েদের কথাই আগে। সেইসঙ্গে বিহারের মেয়েদের কথাও। ওদের জন্যেও আমি মর্মাহত। ঘটনাটা যদি সত্য

হয়ে থাকে।"

"দিদি, সৌম্যদা কখনো মিথ্যা বলে না। সে কোনো কোনো অবস্থায় অহিংসা ছাড়তে পারে, কিন্তু সত্যকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়বে না। ফলাফল যাই হোক। বিহারে যা ঘটেছে তা ওকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সে নিজেও তো একহিসাবে বিহারী। বিহারীরা ওকে ভালোবাসে, সেও তাদের ভালোবাসে। ছি ছি! তাদের এই কর্ম! ওরা নোয়াখালীর বদলা নিয়েছে। এর পরে পাঞ্জাবীরা হয়তো বিহারের বদলা নেবে। তার পর পাঞ্জাবীদের বদলা নেবে হয়তো মারাঠারা। বাপু তাঁর এই সাতাত্তর বছর বয়সে ক'টা প্রদেশেই বা ছুটোছুটি করবেন! করতে হবে তাঁর শিষ্যদেরই। তারাই বা সংখ্যায় ক'জন। মন্ত্রীদের উপরেই বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্বাসটা করবে যারা তারা তো পল্লীগ্রামের সাধারণ হিন্দু, সাধারণ মুসলমান। তারা কি মন্ত্রীদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারবে? তারা কি দেখছে না যেই রক্ষক সেই ভক্ষক?" বঙ্কিমবাবু লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

"আমি এখন মুসলিম লীগ গভর্নমেন্টের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। তাঁদের যাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপরেও। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের উপরেই বা বিশ্বাস রাখি কী দেখে? বোমা বর্ষণ করে এ সমস্যার সমাধান হয় না। তাতে দোষী আর নির্দোষ একসঙ্গেই মরবে। মেয়েগুলোও বাঁচবে না। তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ারের মোকাবিলা তো যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সেটা কি গ্রামে গঞ্জেও হবে নাকি? বাপুকে আমি লিখব নারী ও শিশুদের নিয়ে অপসরণই একমাত্র সমাধান। জিন্না সাহেবও বিহারে গিয়ে তাই করুন।" যূথিকা যেন কত বড়ো একটা আবিষ্কার করেছে!

"দিদি, জিন্না সাহেব যদি বিহারী মুসলমানদের নিয়ে পূর্ব মুখে আসেন আর বাপু যদি বাঙালী হিন্দুদের নিয়ে পশ্চিম মুখে যান মাঝপথে মুখোমুখি ঘটবে না তো? লক্ষ করেননি দু'জনের মধ্যে কেমন রেষারেষি চলেছে?" ইনি যদি হাঁকেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া' উনি হাঁকেন 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। ইনি যদি চালান 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স' উনি চালান 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। দুটো আন্দোলনই যদি একসঙ্গে চলে তবে জনগণ বিভক্ত হবেই। আপনিও সেই পরামর্শ দিচ্ছেন। যেদেশে জনগণ দ্বিধাবিভক্ত সেদেশের বাসভূমিও তো স্বতঃই দ্বিধাবিভক্ত। সেটা কি একটা সমাধান হলো?" বঙ্কিমবাবু মাথা নাড়েন।

যূথিকা অপ্রস্তুত হয়। মানস তাকে আড়াল করতে এগিয়ে আসে। "আহা, ওটা তো কেউ গোপনে করতে বলবে না। করতে বলবে সেক্রেটারি অভ্ স্টেটকে জানিয়ে, বড়লাটকে জানিয়ে, গভর্নরকে জানিয়ে, জিন্না সাহেবকে জানিয়ে, সুহরাবর্দী সাহেবকে জানিয়ে, দুনিয়ার লোককে জানিয়ে। আর একটা দাণ্ডী অভিযান আর কী! সেবারকার মতো এবারও বাপু দেশবিদেশের বিবেককে জাগরিত করবেন। ইমাজিনেশনকে ক্যাপচার করবেন। মোজেস চলেছেন আগে আগে, ইহুদী কন্যারা চলেছে পিছে পিছে। হলিউড থেকে ফিল্ম নির্মাতারা ছুটে আসবে ছবি তুলতে। এখন পদ্মানদীকে কী করে লোহিত সাগরের মতো ফাঁক করা যায়, যে ফাঁক দিয়ে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে পার হবে?"

যূথিকা রেগে যায়। "এটা কি একটা তামাশার বিষয়! দেখছ না এটা একটা সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন। যার জন্যে ত্রেতাযুগে বেধেছিল লঙ্কার যুদ্ধ। আর দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। সীতার অসম্মান রামের সহ্য হয়নি। দ্রৌপদীর অসম্মান কৃষ্ণের সহ্য হয়নি। একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আবার এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। বাপু তা না হলে দিল্লী থেকে নোয়াখালীতে ছুটে আসতেন কেন? তিনিই তো এ যুগের কৃষ্ণ। নারীর সম্মান হেলাফেলার বিষয় নয়। এর জন্যে ট্রয় পুড়েছে। বাংলাদেশও পুড়বে, যদি প্রতিকার না হয়। আমরাই জ্বালিয়ে দেব আগুন, যদি অহিংসায় কাজ না দেয়। যদি বাপু বিফল হন। সে আগুনে খাক হয়ে যাবে ইংরেজ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ।"

মানস তাকে শান্ত করে। "আহা, আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। আমি প্র্যাকটিকাল ম্যান। আমাকে আগে স্টীমার জোগাড় করতে হবে, চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ যাবার মতো খান দশেক

স্টীমার। একটাতে দিশারী হবেন বাপু, আরেকটাতে পেয়ারেলাল, আরেকটাতে নির্মল বোস, আরেকটাতে সৌম্য চৌধুরী, আরেকটাতে বঙ্কিম কর ইত্যাদি। গ্রীকরা হাজারটা জাহাজে করে কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়েছিল। পদযাত্রা চাঁদপুর পর্যন্ত চলতে পারে, তার পরে সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রের স্থলে পদ্মা। গোয়ালন্দ থেকে আবার পদযাত্রা। কলকাতায় যখন ওই দলটি পৌঁছবে তখন আগুন জ্বলবে বইকি। রাইটার্স বিল্ডিং পুড়ে খাক হবে। গভর্নমেণ্ট হাউস পুড়ে ছাই হবে। বেলভিডিয়ার পুড়ে শ্মশান হবে। তবে ওটা ঠিক অহিংসা নয়। এই যা।"

যূথিকা রাগ করে উঠে যায়। "তোমার সঙ্গে আড়ি। তুমি একটুও সীরিয়াস নও। বাপুকে আমি লিখবই। নইলে আমার মন হালকা হবে না।"

বঙ্কিমবাবু চুপি চুপি বলেন, "আপনাকে সাবধান করে দিই, মল্লিক মশায়। আমি ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে যাবেন না। করতে গেলে আখেরে ছাড়াছাড়ি। সব সময় হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাবেন। ওঁরা সব সময় রাইট। আপনি আমি সব সময় রং। এই হলো বিবাহিত জীবনের মাধুর্য। মধুর রস উপভোগ একেই বলে।"

দু'জনে হাসাহাসি করেন। মানস বেয়ারাকে ডেকে বলে, "দু'জনের জন্যে কফি। কফিতে আপত্তি নেই তো?"

"না। কস্তুরবা খেতে ভালোবাসতেন। বাপু একদিন নিজের হাতে তৈরি করে খাওয়ান। আপনিও সেইরকম করবেন। আমি করিনি বলে এই দশা। মন বুঝে কাজ করতে হয় সব পুরুষকেই। মহাপুরুষকেও।" বঙ্কিমবাবু হাসেন।

"আমার কিন্তু এই সুবচন মনে থাকে না। ইচ্ছে আছে খনার বচনের মতো কিছু লিখব। দেশের লোক যা চিরকাল মনে রাখবে।" মানস হাসে।

যূথিকাও পরে এসে সে হাসিতে যোগ দেয়। "এই মানুষটিকে নিয়ে পারা যাবে না, বঙ্কিমদা। এঁর হাতে এক সাংঘাতিক হাতিয়ার আছে। তা দিয়ে ইনি রাজা উজীর মারেন। এঁর লেখাই এঁর লড়াই। আজ হয়তো আমার নামে লিখবেন। আমাকেও সাবধানে থাকতে হয়।"

মানস নিজের হাতে ওর জন্যে এক পেয়ালা কফি ঢেলে দেয়। ঢালতে গিয়ে টিপয়ের উপরেও ঢালে। যূথিকা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে, "তুমি নিতান্তই আনাড়ি। মহাত্মা নও, দুরাত্মা।"

মানস যূথিকার দিকে চেয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় বলে, "তুমি তো জানো আমি মহাত্মা হবার পথেই চলেছি। কিন্তু ওঁর মতো মহাত্মা হওয়া কি আর কারো সাধ্য? উনিই আমাদের বুদ্ধ, আমাদের খ্রীস্ট, আমাদের মোজেস, আমাদের ওয়াশিংটন, আমাদের লিঙ্কন। উনি যেমন দেশ উদ্ধার করবেন, তেমনি হরিজন উদ্ধার, তেমনি নারী উদ্ধার। ওঁর কি জুড়ি আছে?"

যূথিকা প্রথম বাক্যটি শুনে রঙিন হয়। বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারেন না কেন। দু'চার কথার পর বলেন, "একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। বাপুর নীতি হচ্ছে হিন্দুরা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে, মুসলমানরা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। তাদের নিরাপত্তার জন্যে দায়ী হবে তাদের ভিন্নধর্মী প্রতিবেশীরা। আর উভয়ের প্রতি সমান দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার। সরকার তার কর্তব্য পালনে তৎপর হলে এসব ঘটনা ঘটত না, ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে নারী উদ্ধার, সম্পত্তি উদ্ধার প্রভৃতির সূত্রপাত হতো। সরকারকে তিনি আরো সময় দিতে চান। সরকার থেকে আশ্বাসও পেয়েছেন যে অন্যায়ের প্রতিকার হবে। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও আশ্বাস পেতে হবে যে আর কখনো অমন ঘটনা ঘটাবে না। সে আশ্বাস পলাতক প্রতিবেশীদের বা অপহৃতা প্রতিবেশিনীদের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। এটা রাজনৈতিক মিশন নয়। নৈতিক।"

"কিন্তু অপরাধীদের সাজা পেতে হবে। আইন তার নিজের রাস্তায় চলবে। তাদের মুক্তির আশ্বাস

দেওয়া হবে না। মুক্তির কথা উঠবে দণ্ডভোগের পর।" মানসও পরিষ্কার করে বলে।

বঙ্কিমবাবু দোনোমনো করেন। "তা হলে তো শাস্তির স্পিরিটটাই নষ্ট হয়ে যায়। নারী উদ্ধার শক্ত হবে। বিহারেও।"

"শক্ত হলে পিউনিটিভ ট্যাক্স। গ্রামশুদ্ধ লোকের উপর। অনাদায়ে ঘটি বাটি ক্রোক।" মানস দাওয়াই বাতলায়।

যূথিকা খুশি হয়ে বলে, "আশা করি ততদূর যেতে হবে না।"

বঙ্কিমবাবু আহত হন। "আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে বাপু ওখানে গেছেন শুধুমাত্র নারী উদ্ধার করতে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য জগাই মাধাই উদ্ধার। জগাই মাধাই যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তবে ওরাই নারী উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। ওরাই প্রত্যেকটি হিন্দুকে রক্ষা করবে। বাপুর নোয়াখালী মিশন সার্থক হবে। জাতীয় জীবনে একটা মিরাক্ল ঘটে যাবে। মুসলমানরা হিন্দুদের সব অশ্রু মুছে দেবে। হিন্দুরা মুসলমানদের সব লাঞ্ছনা মোচন করবে। বাপুর মতো মানুষ হাজার বছরে একজন আসেন। তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে সে ব্যর্থতা হাজার বছরের ব্যর্থতা। বোমাবর্ষণে নয়, তলোয়ারের ঝঞ্ঝনায় নয়, দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো করায় নয়, লোক অপসারণে নয়, যত্র তত্র বদলা নেওয়ায় নয়, তৃতীয় পক্ষের রোয়েদাদে নয়, কোনো মতেই হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হবে না। এ সমস্যা স্বাধীনতার পরেও, বিপ্লবের পরেও উত্তরপুরুষকে জর্জর করবে।"

মানস ও যূথিকা দু'জনেই নির্বাক। কিছুক্ষণ পরে মানসের মুখ ফোটে। "নোয়াখালীর তাৎপর্য এত বেশী?"

"নোয়াখালীর তাৎপর্য বিহারেরও তাৎপর্য। যুক্তপ্রদেশেরও, পাঞ্জাবেরও তাৎপর্য। নয়তো গভর্নরস রুল ঘোষণা করে রাজপুরুষরাই প্রত্যেকটি বাড়ী তল্লাস করে নারী উদ্ধার করতেন। বিহারেও।" বঙ্কিমবাবু নিঃসন্দেহ।

"সৌম্যদা কি নোয়াখালীতে গিয়ে কাজ করবেন?" যূথিকা সুধায়।

"সৌম্যদাকে বলা হয়েছে তার নিজের জেলা সামলাতে। আমাকেও বলা হয়েছে আমার নিজের জেলা আগলাতে। সবাই গিয়ে নোয়াখালীতে জড়ো হলে অন্যান্য জেলার হিন্দুদের মনোবল কমে যাবে। নিজের নিজের জেলায় যদি থাকি মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের যেমন হৃদ্যতা ওরাও আমাদের কথায় কান দেবে। অবশ্য লীগপন্থী মুসলমান বাদে। কী করে যে ওঁদের মন পাব তা ভেবে পাচ্ছিনে। ওঁদের মধ্যেও আমার বন্ধুস্থানীয় আছেন। নোয়াখালীর জন্যে ওঁরাও লজ্জিত। একজন সেদিন কী বললেন শুনলে হেসে কুটি কুটি হবেন।" বঙ্কিমবাবু কৌতূহল জাগিয়ে দেন।

"শমসের আলী আফগান লোকটি ভালো। আমি ওঁকে শের আফগান বলে ডাকি। মাছ মাংস খান না। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তেল চুকচুকে চেহারা। আমার তো মনে হয় বিশুদ্ধ বাঙালী। পেশায় উকীল। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কেস নেন। সেই শমসের আলী আমার মনের ব্যথা আঁচতে পেরে বলেন —" বঙ্কিমবাবু হেসে ফেলেন।

"কী বলেন, শুনতে আমি অধীর।' যূথিকা কান পাতে।

"বলেন—হা হা! বলেন, আরে দাদা, আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে এনেছি। তা তোমরাও আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাও না কেন? হা হা! আমি তো হাঁ!" বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে ঢলে পড়েন।

"ছি!" যূথিকা হাসতে হাসতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"তা আপনি কী বললেন?" মানস হাসি চাপে।

"আমি বলি, এটা আফগানসুলভ কথা হলো। ওদের প্রথা হচ্ছে ভেন্‌ডেটা। তুমি আমার বাপকে

মেরেছ। আমি তোমার বাপকে মারব। তুমি আমার বৌকে কেড়ে নিয়েছ। আমি তোমার বৌকে কেড়ে নেব। হাতে হাতে ন্যায়বিচার। মামলার নিষ্পত্তি। কিন্তু আমাদের প্রথা তা নয়। আমি বলি, আফগান সাহেব, সাতশো বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষ যখন গজনীতে কি ঘোরে ছিলেন তখন যে প্রথা মানতেন সে প্রথা কি আজকের দিনে এই বাংলাদেশে চলে? আমরা হিন্দুরা কখনো মুসলিম নারীর গায়ে হাত দিইনে। হিন্দুরাও নারীহরণ করে, কিন্তু জাত বাঁচিয়ে। মুসলমানের মেয়েকে যদি ঘরে তুলতে না পারি, যদি বিয়ে করতে না পারি, তবে কেন বেচারিকে অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া? দুটো অন্যায় মিলে একটা ন্যায় হয় না। না, এই একটি ব্যাপারে আমরা নিঃস্পৃহ। তবে সম্পত্তি হরণ যদি বলেন তাতে আমাদের অনীহা নেই। বরং একটু বেশীরকম আগ্রহ।" বঙ্কিমবাবু হাসেন।

"যা বলেছেন। মুসলমানের সম্পত্তি গ্রাস করেই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ফেঁপে উঠেছে। যারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছে তারাই এখন দলে দলে পাকিস্তানী বনে যাচ্ছে। এর পরে হয়তো দলে দলে কমিউনিস্ট বনবে। সব অনর্থের মূল হচ্ছে সম্পত্তি। নারীও একদা তাই ছিল। নইলে লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, ট্রয়ের যুদ্ধ ঘটত না। আহা বেচারা শের আফগান! তিনিও কি একটা যুদ্ধটুদ্ধ বাধিয়ে দিতেন না সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে? অন্তত মোগল হারেম থেকে বেগম হরণ করে বদলা নিতেন না? সেই ভয়ে তাঁকে কোতল করা হলো।" মানস দুঃখ প্রকাশ করে।

যূথিকার চোখে জল আসে। সে বলে, "সত্যি!"

।। ছয় ।।

মানসের এক চোখ নোয়াখালীর উপরে, যেখানে গান্ধীজী খানাখন্দ পেরিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন। অন্য চোখ দিল্লীর উপরে। যেখানে লর্ড ওয়েভেল কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সফল হলে স্বাধীন ভারত, অখণ্ড ভারত, নয়তো স্বাধীন তথা স্বতন্ত্র দুই রাষ্ট্র। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে শিখদের নিয়ে জটিলতা।

কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করে লীগের সঙ্গে মিটমাট করা সম্ভব নয়। লীগের সঙ্গে মিটমাট না করলে লীগ বাধাবে সিভিল ওয়ার। আর লীগকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কংগ্রেসকে অসন্তুষ্ট করলে কংগ্রেস লাগাবে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। ওয়েভেলের একদিকে বাঘ, অন্যদিকে কুমীর। একদিকে সীলা (Scylla) অন্যদিকে ক্যারিবডিস (Charybdis)।

তিনি যদি কংগ্রেসের হাতে কয়েকটি প্রদেশ আর লীগের হাতে কয়েকটা প্রদেশ ধরিয়ে দিয়ে কোনো মতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করে চলে যেতে চান তা হলেও বিপদ কম নয়। অপসরণের পথ তো বোম্বাই বা করাচী বন্দর দিয়ে। কংগ্রেসের বামপন্থীরা জাহাজে উঠতে দেবে তো? আর লীগেরও চরমপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। খাকসার দল। তারাও ব্রিটিশবিরোধী। তা ছাড়া শিখরা তো আছেই। কারো সঙ্গে পাকা বন্দোবস্ত না করে একতরফা সৈন্য অপসরণ সম্ভব ছিল যখন অপসরণ করতে হতো ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিহারে, বিহার থেকে যুক্তপ্রদেশে। কিন্তু সমুদ্রের বক্ষে অবতরণ করে অপসরণ কেবল যে জাহাজের অপেক্ষা রাখে তা নয়, বন্দর ছেড়ে জাহাজে ওঠারও অপেক্ষা রাখে। কুলীরা ধর্মঘট করলে ট্রেন থেকেই মাল নামবে না। সৈনিকদের সঙ্গে ব্যাগ আর ব্যাগেজও তো যাবে।

প্রায় বিশ বছর আগে মানসের এক বন্ধুকে তর্কচ্ছলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বলেছিলেন, "আপনি কি বলতে চান যে ইণ্ডিয়া থেকে আমরা ব্যাগ আর ব্যাগেজ সমেত বিদায় হব?" তার উত্তরে বন্ধু বলেছিলেন, "আরে না, না। ব্যাগ আর ব্যাগেজ সমেত নয়, ওসব তো আমাদের সম্পত্তি।" ভদ্রলোক

শুনে হতভম্ব। ঘটনার গতি সেইদিকেই যাচ্ছে। হয় দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করতে হবে, নয় মানে মানে অপসরণ করতে হবে। এর হাতে ওর হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে অপসরণ নিষ্কণ্টক হতে পারে না।

এই যেমন ওয়েভেলের সঙ্কট তেমনি গান্ধীজীর সঙ্কট মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে নোয়াখালীর মুসলিম জনগণের হৃদয়জয়ের অভিযান। ব্যর্থ হলে তাঁকেও একদিন হিন্দুদের নিয়ে অপসরণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে ব্যাগ আর ব্যাগেজ থাকলে চাঁদপুর থেকে স্টীমারে তুলতে দেওয়া হবে কি? ওদের যদি আদৌ উঠতে দেওয়া হয় খালি হাতেই বিদায় নিতে হবে। অমন ভাবে অপসরণ মানে মানে প্রস্থান নয়। গান্ধীজী তার দায়িত্ব নেবেন না। আর মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়াও কি সহজ কথা? বছর সাত আট আগে এক সাক্ষাৎকারীকে লীগপন্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এঁদের চেয়ে শাসকদের সঙ্গে মিটমাট আরো সহজ।"

ত্রিশ বছর পূর্বে জিন্না সাহেব ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির নেতা। তখনকার দিনে এটা পরস্পরবিরোধী ছিল না, বরং পরিপূরক ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন, "ভারতের জাতীয় স্বার্থের জন্যে কংগ্রেস আর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্যে লীগ। দুটোরই প্রয়োজন আছে। তাই দুটোতেই আমি আছি।" দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করতেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখনউতে তিনি কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট সম্পাদনায় [illegible] হয়েছিলেন ১৯১৬ সালে। সেটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে হিন্দু মুসলমানের বখরা কী রকম হবে তাই নিয়ে. এর পরে যখন কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের বা স্বরাজের পালা আসবে তখন আবার সেই রকম একটা চুক্তির প্রয়োজন হবে। আবার সেই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তখন আবার তাঁকে টিলকের মতো একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুক্তির সম্পাদনায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

টিলকের মৃত্যুর পর গান্ধী হন কংগ্রেসের সর্বপ্রধান নেতা। গান্ধীর সঙ্গেও জিন্নার সদ্‌ভাব ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধী যেদিন বোম্বাইতে সম্বর্ধিত হন সেদিন জিন্না ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। পরে তাঁরা হোম রুল লীগেও একসঙ্গে মিলে কাজ করেন। জিন্না সভাপতি, গান্ধী সহ-সভাপতি ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাই সিনিয়র। বছর পাঁচেকের মধ্যে চাকা ঘুরে যায়। খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনকে জুড়ে দিয়ে গান্ধী হন সেই সংযুক্ত আন্দোলনের মহানায়ক। আন্দোলনটা ছিল গণভিত্তিক। জিন্নার তাতে অরুচি। অশাসনতান্ত্রিক। জিন্নার তাতে আপত্তি। তা ছাড়া গান্ধীর নবলব্ধ সহযোগী গোঁড়া মৌলানাদের সঙ্গে জিন্নার মতো গোঁড়ামিবর্জিত মুসলমানের বনিবনা হবে কেন? তিনি না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, সাহেবদের মতো খানা, সাহেবদের মতো পিনা, সাহেবদের মতো পোশাক। জিন্না ক্রমশ গান্ধী[illegible] থেকে দূরে সরে যান। কংগ্রেস থেকেও। কংগ্রেস লীগ চুক্তি স্বপ্নই থেকে যায়।

পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয় ১৯৩৭ সালে। এর পরের [illegible] ফেডারেশন। কংগ্রেস লীগ চুক্তি না হলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি হবে কী করে? কিন্তু ততদিনে গঙ্গা যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কংগ্রেসের মতে কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতীয় জনগণের ধর্মনির্বিশেষে একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগের মতে মুসলিম লীগই হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মসূত্রে একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগকে তেমন মর্যাদা দিতে রাজী নয়, দিলে মৌলানা আজাদ, খান্ আবদুল গফ্‌ফর খান্ প্রমুখ সংগ্রামী নেতাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। অপর পক্ষে, লীগ কংগ্রেসকে অমন মর্যাদা দিতে নারাজ। দিলে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের মতো সরাসরি কথা বলতে পারে না। কংগ্রেসের তুলনায় লীগ খাটো হয়। জিন্না কখনো কারো কাছে খাটো হবেন না। না গান্ধীর কাছে, না বড়লাটের কাছে। কংগ্রেস লীগ চুক্তি হবে সমানে সমানে। নয়তো আদৌ

হবে না। সেরূপ স্থলে মুসলিম লীগের দাবী হবে সেপারেট ইলেকটোরেটের লজিক্যাল পরিণতি সেপারেট স্টেট। পাকিস্তান। ফেডারেশন নৈব নৈব চ।

জিন্না সাহেব তাঁর বার্গেনিং পাওয়ার বাড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে বার্গেন করবেন? কংগ্রেসের সঙ্গে? কংগ্রেস তো লীগের শর্তে কথাবার্তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বড়লাটের সঙ্গে? বড়লাটের দরজা অবশ্য খোলা। কিন্তু জিন্না সাহেবের সঙ্গে তাঁর বার্গেন যদি কংগ্রেসের বা হিন্দুর খরচে হয় তবে বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেস কথাবার্তা বন্ধ করে দেবে। বড়লাট কি সেটা চাইবেন? কংগ্রেস নেতাদের তিনি হাতছাড়া করলে তাঁরা আবার গান্ধীজীর হাতে পড়বেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেটা পছন্দ করবেন না। তাঁরা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের ঝুঁকি নেবেন না। তবে কি তাঁরা সিভিল ওয়ারের ঝুঁকি নেবেন? না, তাও নয়। তাঁরা সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছেন। যাতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ নিষ্কণ্টক হয়।

ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট পুনর্গঠনের পর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর আর কোনো প্রয়োজন রইল না। মুসলিম লীগ তো তার খোয়াল খুশিমতো একজন তফশিলী জাতির হিন্দুকে নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদ্ আলো করে বসেছে। বাইরে পড়ে গেছেন জিন্না সাহেব। সেটা তাঁর নিজের ইচ্ছায়। জবাহরলাল উক্ত পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হবেন আর তিনি হবেন একজন সাধারণ মেম্বর এ কি কখনো সহ্য হয়? আর তাঁর ক্ষমতাই বা কী? জঙ্গীলাটের আসনটা তো একজন শিখকে দেওয়া স্থির হয়ে গেছে, নইলে শিখরা বেঁকে বসবে, এমনিতেই ওদের দাবী পাকিস্তানের পাল্টা শিখিস্তান বা খলিস্তান। মুসলিম লীগের মতো ওরাও দাবী আদায়ের দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে, আপাতত সেনাবিভাগের ভার দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।

তা হলে জিন্না সাহেবের হাতে আর কোন্ তাসখানা বাকী রইল? কী খেলা এর পর তিনি খেলবেন? কেন, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট। তিনি যদি সদলবলে তার বাইরে থাকেন তা হলে কংগ্রেস সেখানে গিয়ে এমন কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবে না যা হিন্দু মুসলমানের সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র। যে শাসনতন্ত্র অনুসারে আসমুদ্র হিমাচল শাসন নির্বিবাদে সম্ভবপর। তেমন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে দাঙ্গাহাঙ্গামা তো বাধানো যাবেই, সিপাহীবিদ্রোহও আপনি বাধবে। কংগ্রেস অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায় যে একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তা মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় কিছুতেই হতে দেবে না।

মুসলিম লীগ কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে না গেলে বড়লাট তার অধিবেশন ডাকবেন না, কারণ সে সভা একবার কাজ শুরু করলে পরে তাকে থামানোই যাবে না। তার তৈরি শাসনতন্ত্র মুসলমানদের উপর বলবৎ করতে হবে। সে ঝুঁকি তিনি নিতে নারাজ। বিস্তর টালবাহানার পর তিনি তার অধিবেশন ডাকেন। আরম্ভের সময় মুসলিম লীগ অনুপস্থিত। সে আরম্ভ ভারতের মতো একটি মহান রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তার অভিব্যক্তি। এর জন্যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেই গর্ব বোধ করতে পারে। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নিলে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগ সহযোগিতা করবে না। আর সেটা মেনে নেওয়ার তাৎপর্য আসামকে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে লীগের পাতে তুলে দেওয়া। তর্কের খাতিরে সেটা সম্ভব হলেও লীগ তার পাকিস্তানের দাবী প্রত্যাহার করবে না, দশ বছর অপেক্ষা করবে। ততদিনে আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের পেটে তলিয়ে গিয়ে থাকবে।

মানস অর্ধেক রাত জেগে দোতালার ঢালা বারান্দায় রোজ পায়চারি করে। যূথিকা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে শুইয়ে দেয়। তার খড়ের বিছানায়। আজকাল সে ক্যাম্প খাটে শোয় না।

"অমন করলে কি শরীর টিকবে? তোমার অত মাথাব্যথা কেন? দেশ কি শুধু তোমার একার? না তুমিই তার মাথা?" যূথিকা রাগ করে।

"কী করি, বল? জেগে থাকলেই বরং আমি ভালো থাকি, ঘুমিয়ে পড়লে খালি দুঃস্বপ্ন দেখি।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"দুঃস্বপ্ন! কী এমন দুঃস্বপ্ন শুনি?" যূথিকা জেরা করে।

"ওসব শুনলে তুমি ভয় পাবে।" মানস দ্বিধা করে।

"না, না, তুমি বলো। আমি কি ভয় পাবার মেয়ে?" যূথিকা পীড়াপীড়ি করে। "শুধু একটি জিনিসকে ভয়। আমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।"

মানস তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "দিনকাল বদলেছে। হিন্দুরা আর তেমন হৃদয়হীন নয়। অন্তত আমি তো নই।" কিন্তু তার কণ্ঠে ঠিক সুরটি ফোটে না। সেও সংস্কারমুক্ত নয়।

"যাক, ওসব অলক্ষুণে কথা যাক। এখন বলো কী এমন স্বপ্ন দেখ।" যূথিকা নাছোড়বান্দা।

মানস একটু ইতস্তত করে। তার পর ধীরে ধীরে বলে, "সব কি মনে আছে? পূর্বাপরও মনে নেই। যত সব খাপছাড়া স্বপ্ন।"

"যেটুকু মনে পড়ে বলো।" যূথিকা চাপ দেয়।

"তোমাকে বলেছি আমাদের এখানে একটা র‍্যালিং পয়েন্ট আছে। অফিসারদের আর তাদের পরিবারদের জন্যে। সাইরেন বাজলেই সেখানে গিয়ে জড়ো হতে হয়। চারদিকে কড়া পুলিশ পাহারা। মারমুখো জনতা সেখানে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু দিনের পর দিন ঘেরাও করে যদি রাখে, খোরাক সংগ্রহ করতে না দেয়, খাবার জল ফুরিয়ে যায়, তখন কী উপায়? সময়ে যদি রিলিফ না পৌঁছয় তা হলে তো মরণ অথবা আত্মসমর্পণ। স্বপ্ন দেখি র‍্যালিং পয়েন্টে পুরুষ বলতে একমাত্র আমি। আমার উপরই আর সকলের নারী ও শিশুর রক্ষার ভার। অর্জুনের মতো আমার হাতে গাণ্ডীব অর্থাৎ রাইফেল। কিন্তু যখন তুলে ধরতে যাই তখন দেখি এত ভারী যে বইতে পারছিনে। আমি দিশেহারা। গুণ্ডারা মহাভারতের দস্যুদের মতো যাদবকন্যাদের হরণ করে নিয়ে যায়, কেউ কেউ হাসিমুখে যায়, আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। আমার হাত পা অসাড়। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।" মানস মুখ নিচু করে বলে যায়

"ওদের মধ্যে কি আমিও ছিলুম?" যূথী জেরা করে।

"তা তা—ইয়ে ঠিক মনে পড়ছে না।" মানস পাশ কাটাতে চায়।

"তার মানে ছিলুম। তুমি বলতে লজ্জা বোধ করছ। এবার বলো আমার হাসিমুখ দেখেছিলে?" যূথী আবার জেরা করে।

"কই, না . তেমন তো মনে পড়ছে না।" মানস বলতে ভয় পায়।

"ঠিক মনে পড়ছে। তবে তোমাকে বলে রাখি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তেমনি, নারীও বীরভোগ্যা। যে তাকে ধরে নিয়ে যায় সে তারই হয়।" যূথী পরিহাস করে।

মানস তা শুনে দুঃখ পায়। মৌন থাকে। তখন যূথিকা গম্ভীর মুখে বলে, "তা হলে যা বলি শোনো। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে সেটা নিবারণ করাই সুবুদ্ধি। গৃহযুদ্ধে হিন্দুরাই হয়তো জিতবে, কিন্তু তাদের নারীরা মান বাঁচাবার জন্যে জহরব্রত করবে। আগুন জ্বালিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে। অন্তত একজন যে করবেই এখন থেকেই তার নোটিস দিয়ে রাখি। যদি পরিস্থিতি আলাউদ্দীন খিলজির আমলের মতো হয়। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সেদিনও যেমন ছিল আজকেও তেমনি রয়েছে। অন্তত কতক মুসলমান আছে যাদের হাতে নারী আর গোরু নিরাপদ নয়। আর হিন্দুদের কাছে এ দুটিই সব চেয়ে মূল্যবান। গোরুকে সরাতে বলব না, কিন্তু সময় থাকতে নারীকে সরাতে হবে। ইংরেজরা যা করছে। মেমসাহেবরা এখন থেকেই ভারত ছাড়ছেন। কেউ যাচ্ছেন বিলেত। কেউ অস্ট্রেলিয়া। এই যে নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এঁর মেমসাহেব নিউজীল্যাণ্ডের মেয়ে। তিনিও চলে গেছেন বাপের বাড়ী। আমিও যেতুম, কিন্তু আমার তো বাপের বাড়ী নেই।" যূথিকার গলা ধরে আসে।

মানস কেমন করে তাকে আশ্বাস দেবে? কোন্ ভাষায়? বলে, "তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই তোমাকে যেতে দেব। কিন্তু আমাকে এই জেলায় থাকতেই হবে। আমার উপর নির্ভর করছে বহু হিন্দুর মনোবল। তবে ডেনিস রিকম্যান থাকতে ভাবনার কিছু নেই। ছেলেটি খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ ও ভদ্র। তেমনি সাহসী ও অসাম্প্রদায়িক।"

যূথিকা আশ্বাস মানে না। "তুমি কি বুঝতে পারছ না এই হচ্ছে জিন্না সাহেবের লাস্ট চাল? পাকিস্তান হাসিল করতে না পারলে তাঁর কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে? তিনি কি হাল ছেড়ে দেবার আগে একবার মরণ কামড় দেবেন না? সে কামড়ে ইংরেজরাও কি জখম হতে পারে না? সর্বত্র না হোক, কতকগুলো জায়গায় না ইংরেজ রাজ, না কংগ্রেস রাজ, কোনোটাই থাকবে না। মুসলিম লীগের চাঁইরা গুণ্ডা রাজ কায়েম করবে। যাকে বলতে পারো গুণ্ডার্কি। তেমন জায়গায় গুণ্ডারাই জজ, গুণ্ডারাই ম্যাজিস্ট্রেট, গুণ্ডারাই পুলিশ, গুণ্ডারাই জেলর, গুণ্ডারাই ফাঁসুড়ে। তাদের একমাত্র ভয় মিলিটারিকে। কিন্তু মিলিটারির ভিতরেও মুসলিম লীগের সমর্থক রয়েছে। ওরা গুণ্ডাদের দিকেই ভিড়ে যাবে। তখন এক রেজিমেন্টের সঙ্গে আরেক রেজিমেন্টের যুদ্ধ। পুরোদস্তুর গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক না কেন মানুষের প্রাণ আর নারীর মান দুটোই জুয়াখেলার পণ। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবার আগে শতবার ভাবতে হয়। যোদ্ধারাও প্রাণ হারায়, তাদের নারীরাও মান হারায়। যদি না জহরব্রতে মরে। আমার মত হচ্ছে মুসলিম লীগকে এমন কিছু অফার করা যার উপর ইংরেজরা নীলাম ডাক ডাকতে না পারে। সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়া। আসামের মায়া কাটানো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভার তার উপর ছেড়ে দেওয়া। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তবে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগ করা। ক্যাবিনেট মিশন স্টেটমেন্টে তার আভাস আছে। বড়লাটই মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে রাজী করাতে পারেন। ওদেরও তো গরজ কম নয়। ওরা ভালোয় ভালোয় সৈন্যসামন্ত সরাতে চায়।"

মানস মাথা নাড়ে। "না শেলী। বাপু কক্ষনো রাজী হবেন না, ওটা হবে ভারতমাতার জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ। কংগ্রেস? সে তো তিনিই।"

যূথিকার মত সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। "বাপু যদি বলেন 'না' তবে আমিও বলব, 'না'। কে জানে তিনি হয়তো একটা মিরাক্ল ঘটাতে যাচ্ছেন। একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে মুসলমানরা যদি একবাক্যে বলে, 'ভারতমাতা আমাদেরও মাতা। আমাদের আর কোনো মাতা নেই। হিন্দুরা আমাদের ভাই। আমরা তাদের সঙ্গে লড়ব না। ঘরোয়া মিটমাট চাই। বিদেশীর মুখাপেক্ষী হব না। কায়দে আজম মহাত্মাজীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে ফয়সালা করুন। আহা! সত্যি কি এমন দিন আসবে!"

মানস শুধু বলে, "সে রকম একটা সম্ভাবনা আছে বইকি। কংগ্রেস যদি ক্ষমতা না চায়, গঠনের কাজ নিয়ে থাকে।"

"ওটা হয়তো দেশভাগ নিবারণ করবে, কিন্তু বাংলাদেশে মুসলিম লীগের গুণ্ডার্কি বন্ধ করতে পারবে না। যদি না মুসলমানদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বাপুর নোয়াখালীর মিশন সফল হয়।" যূথিকা ভাবে।

মানস একমত হয়। "হ্যাঁ, সেটার উপরেই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে। ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে। মুসলমানদের অধিকাংশের হয়নি। অপেক্ষা করলে সেটাও সম্ভব। কিন্তু ঘটনার গতি অপেক্ষা করবে কি? দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। এই অবস্থায় ইংরেজ চলে গেলে এর শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবে কে? মুসলিম লীগ? সঙ্গে সঙ্গে শিখদের সঙ্গে তার বেধে যাবে। সারা ভারতের ভার তার হাতে সঁপে দেবার আগে ইংরেজরা দশবার ভাববে। নয়তো শিখ সৈন্যরাই তাদের কোতল করবে। শিখদের বক্তব্য হলো ভারত যদি অখণ্ড থাকে তবে তারা শিখিস্থান চাইবে না, যদি দ্বিখণ্ড হয়

তবে শিখিস্থান দাবী করবে ও তার জন্যে লড়বে। লড়কে লেঙ্গে শিখিস্থান। ওরফে খলি স্থান।"

যূথিকা কৌতূহলী হয়ে সুধায়, "আচ্ছা, খলিস্থান বলতে কী বোঝায়? খালি জায়গা? খালি জায়গা কি কোথাও আছে?"

"খলি বলতে বোঝায় পবিত্র। যেমন খলসা। খলিস্থান হচ্ছে শিখদের পক্ষে পবিত্র স্থান, যেমন পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের পক্ষে পবিত্র। কিন্তু এমন একটাও জেলা নেই যেখানে শিখদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শিখ নেতারা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কি সব? সম্পত্তি কাদের বেশী? মুসলমানদের না শিখদের? কাদের হাত থেকে ইংরেজরা পাঞ্জাব নিয়েছিল? মুসলমানদের না শিখদের? গোটা পাঁচ ছয় শিখ রাজ্য এখনো রয়েছে। কাদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে? মুসলমানদের না শিখদের? এসব যুক্তি অকাট্য। তাই পাকিস্তানে চট করে রাজী হচ্ছে না ইংরেজ। শিখরা কিছুতেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সামিল হবে না। অথচ হিন্দুস্থান নামক রাষ্ট্রেরও কি সামিল হতে রাজী হবে? না, তাতেও তাদের আপত্তি। তাদের মতে তারা একটি স্বতন্ত্র নেশন। তাদের আপত্তি খণ্ডন করার জন্যে কংগ্রেস অভয় দিচ্ছে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান হবে একটি সেকুলার স্টেট, যেখানে কোনো ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্ম করা হবে না। যে রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র হবে না। সেখানে যে যার নিজের ধর্ম আচরণ করবে। কেউ ধর্মীয় কারণে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে না। কেউ সেই কারণে বিশেষ অসুবিধা পোহাবে না। এখন শিখরা এতে আশ্বস্ত হলে হয়। মুসলিম লীগ এমন একটা কুদৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে যে এর অনুসরণ করলে শিখরা হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা।" মানস উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে।

নোয়াখালীর ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে মানস ইতিমধ্যে তার সার্ভিসের চেনা অচেনা বহু অফিসারকে চিঠি লিখেছিল। তাঁদের কেউ ইংরেজ, কেউ হিন্দু, কেউ বা মুসলমান। চিঠির বয়ান ইংরেজদের বেলা একরকম, হিন্দুদের বেলা আরেক রকম, মুসলমানদের বেলা আরো এক রকম।

ইংরেজদের লিখেছিল, "শুনেছি আপনারা অচিরে এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন। তাকে কী অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন ভেবে দেখেছেন কি? বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে একজনও হিন্দু নারী নিরাপদ নয়। আপনারাও তাদের রক্ষা করছেন না, হিন্দুরাও যে রক্ষা করবে তারও উপায় নেই, কারণ তারা নিরস্ত্র। হিন্দুনারীর সম্মান একবার গেলে চিরকালের মতো যায়। হিন্দু পুরুষরা এর কোনো প্রতিকার জানে না। দুর্বৃত্তদের এর থেকে নিবৃত্ত করবার একমাত্র উপায় তাদের নিধন। তার জন্যে চাই তাদের অস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আপনারা যদি আর কিছু না করেন তবে এই অন্যায়ের নিন্দাবাদ করুন। তা নইলে লোকে ধরে নেবে যে আপনারা এর পেছনে আছেন। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।"

হিন্দুদের লেখে, "হিন্দু নারীর এ অসম্মান আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আঙুলটি নাড়তে পারছিনে। যেহেতু আমরা সরকারী চাকুরে ও সার্ভিস রুলসের অধীন। কী করা যায়, বলুন তো? দলবদ্ধ হয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো যায় না? গভর্নরের এখনো যথেষ্ট সংরক্ষিত ক্ষমতা রয়েছে। তিনি কি শুধু মুসলমানদের গভর্নর? হিন্দুদের কেউ নন? ইংরেজ শাসনের গোড়ায় সবাইকে অভয় দেওয়া হয়েছিল যে কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না। অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুদের ধরে ধরে মুসলমান করা হচ্ছে। কলমা পড়ানো হচ্ছে। গোমাংস খাওয়ানো হচ্ছে। যাতে তারা স্বধর্মে ফিরতে না পারে। এ বিষয়ে হিন্দুদের দুর্বলতা আছে। গোরু খেয়ে একবার যদি জাত গেল তো বরাবরের জন্যে গেল। তেমনি রাবণের হাতে একবার পড়লে সীতার আর নিস্তার নেই। তাকে শেষপর্যন্ত পাতালপ্রবেশ করে সব জ্বালা জুড়োতে হবে। প্রতিকার যেখানে নেই সেখানে নিবারণই তো শ্রেয়। কিন্তু কেমন করে?"

আর মুসলমানদের লেখে, "আপনাদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষপাতী। কিন্তু পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে হিন্দু বলে কি কোনো ধর্ম সম্প্রদায় থাকবে না? থাকলে তাদের নারীদের সম্মান বলে কি কোনো পদার্থ থাকবে না? যে কোনো মুসলমান সেটা হরণ করতে পারবে? এমনতরো পাকিস্তানে কি কোনো

হিন্দু সম্মতি দিতে পারে? তার বিনা সম্মতিতে কি তাকে পাকিস্তানের সামিল করতে পারা যাবে? নোয়াখালীতে যা ঘটেছে সেটা কি পাকিস্তানের নমুনা? কারো কণ্ঠে একটি প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না কেন? আমরা কতকাল একসঙ্গে আছি। হিন্দু মুসলমানকে ছেড়ে, মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে বাঁচবার কথা কখনো ভাবেনি। এখন থেকে ভাবতে হবে নাকি?"

এসব চিঠির উত্তর একে একে আসতে আরম্ভ করে। অবশ্য সকলেই জবাব দেন না। কারো জবাব সহানুভূতিশীল, কারো জবাব বেদরদী, কারো জবাব কটুকথায় ভরা, কারো জবাব উপদেশপূর্ণ। বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

এক আয়ারল্যাণ্ডবাসী জেলা জজ লেখেন, "প্রথমে মনে হয়েছিল আপনি একজন এজেন্ট প্রোভোকেটর। তা নয়, আপনি একজন উগ্র ন্যাশনালিস্ট। আপনার অন্তর বিদ্বেষ বিষে জর্জর। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ায় আমাদের কী? আমরা কেন বিচারের আগেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করব? আমরা প্রোফেসনাল মেন। সেই নিরিখেই আমাদের যা মূল্য। আমাদের আইনে বিনা বিচারে কাউকে দণ্ড দেওয়া চলে না। আপনি আমাদের অকারণে উস্কানি দিচ্ছেন।"

এক ইংরেজ হাইকোর্ট জজ লেখেন, "যেসব কথা পড়ছি সেসব সত্য হলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু রোগের চেয়ে রোগের যে দাওয়াই নির্দেশ করেছেন সে দাওয়াইটা যে আরো খারাপ। নারীর সম্মান একদিন না একদিন ফিরে আসতে পারে, আমাদের সমাজে আসে। কিন্তু মানুষের প্রাণের দীপ একবার নিবিয়ে দিলে আর জ্বালানো যায় না।"

এক স্কটল্যাণ্ডবাসী কমিশনার লেখেন, "গোলাম সারওয়ারকে তো আমি জেলে পুরে এসেছিলুম। ওকে খালাস করল কে? আমি বরাবরই বলে আসছি যে রাজনৈতিক আন্দোলন যত ইচ্ছা চালানো হোক। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা যেন সব সময় বজায় থাকে। আমরা রাজনীতিকদের আশা আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিইনে, কিন্তু আইন ভঙ্গ করলে সাজা দিই।"

ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ ঘুণাক্ষরে ফাঁস করেন না। তবে একটা বিহ্বল সুর বাজে সকলেই এখন প্রস্থানের দিন গুণছেন।

একজন প্রবীণ হিন্দু জজ লেখেন, "আগে বলসঞ্চয় করতে হবে। নইলে এর প্রতিকার সম্ভব হবে না।"

আরেকজন প্রবীণ হিন্দু জজ লেখেন, "নিষ্ফল আক্রোশে নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই বার করে খাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমিও আছি। কিন্তু দলবদ্ধ হওয়া সহজ নয়। আমরা যে সরকারী চাকুরে!"

আরেকজন প্রবীণতর হিন্দু জজ আশীর্বাদ করেন, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। গীতা রহস্য।"

একজন হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তবু মিলিটারিকে ডাকলে ফল আরো খারাপ হবে।" মানসের চিঠিতে সে রকম একটা প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছিল।

একজন তরুণ বাঙালী মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "আমাদের খবরের কাগজগুলো হলদে রঙের কাগজ। খবর বানাতে বা অতিরঞ্জন করতে ওস্তাদ। যা ঘটেছে তার চেয়ে বহুগুণ রটেছে। হিন্দুদের অযথা রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভয় পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি ঘটনাস্থলে গেলে দেখবেন আপনার উদ্বেগ মাত্রাতিরিক্ত।"

আরেকজন অভিজ্ঞ পাঞ্জাবী মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "পাকিস্তান যখন হবে তখন দেখবেন সেটা একটা আদর্শ রাষ্ট্র। সেখানে সবাই সুখে শান্তিতে বাস করছে। কী মুসলিম, কী হিন্দু। নোয়াখালী তার নমুনা নয়। সেখানে সামান্য যা হয়েছে তা হিন্দুরা পাকিস্তানবিরোধী প্রোপাগাণ্ডার কাজে লাগাচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

বিহারের ঘটনা শুনে মানস ক্লস পোজিশনে পড়ে। বিহারের মুসলিম বন্ধুদের কী বলে সান্ত্বনা দেবে? আরেক প্রস্থ চিঠি লেখে। বলে, "বাংলাদেশের সরকার যদি আইনের শাসন বলবৎ না করে বিহারের লোকজন মরীয়া হয়ে আইনকে নিজের হাতে নেবেই তো। এটাও খারাপ ওটাও খারাপ। আমি গভীরভাবে দুঃখিত। আসুন, এ আগুন সবাই মিলে নিবিয়ে দিই। জিন্না সাহেবেরও বোঝা উচিত তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন।"

।। সাত ।।

বিহারী মুসলিম বন্ধুদের চিঠি লেখার সময় মানস জানত না যে মুসলিম নারীদেরও হরণ করা হয়েছে। খবরের কাগজ এ বিষয়ে নীরব। পরে যখন খবরটা কর্ণগোচর হয় তখন মানস মরমে মরে যায়। হিন্দুরাও যে অমন কাজ করতে পারে এটা নতুন কথা নয়, কিন্তু সেটা কেবল হিন্দু নারীর বেলা। মুসলিম নারীকে হরণ করার মামলা তার কোর্টে বহুবার এসেছে, কিন্তু আসামীরাও মুসলমান।

মানসের চিত্ত নৈতিক সঙ্কটে দোলাচল। সুমতি বলে, মুসলিম বন্ধুদের আবার লেখ। ক্ষমা চাও বিহারী হিন্দুদের হয়ে। এ তোমার এ আমার পাপ। কুমতি বলে, বিহারী মুসলমানরাও তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে রব তুলেছে। লড়াইতে কী না হয়? অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। নোয়াখালীতে তো মুসলমানরাই তার নমুনা দেখিয়েছে। কেউ যে নিন্দাবাদ করেছেন তাও তো নজরে পড়েনি। বুঝুক ওরা গৃহযুদ্ধ বলতে কী বোঝায়। জেহাদ মানে কী।

কুমতিই প্রবল হয়। মানস আর লেখে না। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চিন্তা করে সে তার মুসলিম বোনদের জন্যে আর কোন্ ব্রত নিতে পারে। এই শীতে মেজের উপর শীতলপাটি পেতে শুতে সাহস হয় না। কিংবা লেপ কম্বল মুড়ি না দিয়ে খড়ের বিছানায়। একটা কিছু করা উচিত। নইলে পাপমোচন হবে কেন? ব্যক্তিগত পাপ নয়। সম্প্রদায়গত পাপ।

কিছুদিন পরে বিহার থেকে মুসলিম শরণার্থীর ঢল নামে। তাদের অন্যত্র না বসালে তারা কলকাতায় এসে জুটবে। তাদের জন্যে মেদিনীপুর জেলার পোড়ো জমিতে শিবির খোলা হচ্ছে। ওদিকে নোয়াখালীর হিন্দু শরণার্থীরাও কলকাতা আসতে ব্যগ্র। ওদের ঠেকানো হয়েছে চাঁদপুরে শিবির খুলে তদারক করার জন্যে পাঠানো হয়েছে সিরাজী সাহেবকে। যাঁর জায়গায় এসেছেন রিকম্যান শরণার্থী সমস্যা এখন থেকেই গুরুতর। যখন গৃহযুদ্ধ জমে উঠবে তখন শরণার্থীর ভিড়ে শিবির উপচে পড়বে। পথ ঘাট ছেয়ে যাবে শরণার্থীতে। শহরের জনসংখ্যা ফেঁপে উঠবে। রেশনে টান পড়বে। একদিক থেকে বিহারী মুসলমান, আরেকদিক থেকে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

ফরাসীদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল। তবু তারা জার্মানদের কাছে নামমাত্র যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করল কেন? কারণ জার্মান আক্রমণের তোড়ে ফ্রান্সের উত্তর দিক থেকে অসামরিক অধিবাসীরা ভেসে যায়। সবাই ছোটে রাজধানী অভিমুখে। পথঘাট শরণার্থীতে ভরে যায় তাদের গাড়ীগুলোর জট খুলে ফরাসী সৈনিকরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ট্যাঙ্ক ও ট্রাক নিয়ে এগোতে পারে না। শরণার্থীদের ঠেলতে ঠেলতে জার্মান সৈনিকরা কিন্তু এগিয়ে আসে। অগত্যা ফরাসীরা রণে ভঙ্গ দেয়।

সমরতন্ত্রের গ্রন্থকারদের কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে শরণার্থী জনতা, সৈন্যসামন্ত নয়, অস্ত্রশস্ত্র নয়। রণপতিদের সমস্ত গণনা ভেস্তে দিতে পারে শরণার্থীদের গড্ডলিকা প্রবাহ। যাঁরা বলছেন, হয় পার্টিশন নয় গৃহযুদ্ধ, আর যাঁরা বলছেন, বরং গৃহযুদ্ধ তবু পার্টিশন নয়, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না যুদ্ধ একবার জমে উঠলে উন্মত্ত জনতা কেমন অমানুষিক ব্যবহার করতে পারে। তখন সব চাল উল্টে যাবে। কেউ ধরে নিতে পারে না যে আখেরে জিৎ হবে।

যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ও গণ সত্যাগ্রহ। এতদিন সেটা সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাতে কিছু ফলও পাওয়া গেছে। এখন কি সেই সব নৈতিক অস্ত্র প্রজাদের একভাগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে? জাতীয়তাবাদকে ওরা মনে করত ইসলামের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে বেখাপ। ইকবাল আর জিন্না সাহেবরাই ওদের বুঝিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদও ভালো, যদি সেটার নাম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও তার আধার হয় পাকিস্তান বলে ভারতের এক খণ্ড। সোজা পথে না হয়ে বাঁকা পথে তারা জাতীয়তাবাদী হচ্ছে, দেশকে আপনার ভাবছে। এতদিন তো ধর্মই কেবল ছিল তাদের আপনার। দেশের এক অংশকে ভালোবাসাও দেশকে ভালোবাসা। ওদের সত্যিকার বিপক্ষ হিন্দুরা নয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই। কিন্তু সেকথা এখন ওদের বোঝায় কে? রোখটা পার্টিশনবিরোধীদের উপরেই। যেন এটা প্রকারান্তরে ইসলামবিরোধিতা।

মানস ক্রমে উপলব্ধি করে যে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে বধ করে হিন্দুদেরও মঙ্গল হতে পারে না। সে উপায় সম্পূর্ণ গর্হিত। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করাই প্রকৃত পন্থা। তারা না বুঝলে অহিংস অসহযোগ বা গণ সত্যাগ্রহও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করাই শ্রেয়। আগে যেমন হয়েছে পরেও তেমনি তার থেকে আসতে পারে দাঙ্গাহাঙ্গামা। শেষে ইংরেজরাই সেসব দমন করবে। হিন্দুরা দমন করতে পারবে না। অন্তত পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। উল্টে ওরাও যদি জেহাদ ঘোষণা করে তবে ইংরেজরাও কি পারবে দমন করতে? ইসলাম বিপন্ন শুনলে ওরা উন্মাদের মতো লড়বে।

আর নৈতিক অস্ত্র যাদের হাতে তারা কি বীর না কাপুরুষ? যদি বীর হয়ে থাকে তবে বীরের অহিংসার নিদর্শন কোথায়? গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো নির্ভীক ক'জন? মানবপ্রেমিকই বা ক'জন? অন্তরে যদি প্রেম না থাকে, সাহস না থাকে তবে অহিংসা তো দুর্বলের অহিংসা। তেমন অহিংসার চেয়ে হিংসাই ভালো, যদি সে হিংসা চোরাগোপ্তা হিংসা না হয়। পেছন থেকে ছোরা মেরে পালিয়ে যাওয়া ও ধরা পড়লে মিথ্যা বলা বা প্রাণ ভিক্ষা করা বীরের হিংসা নয়। সেটাও কাপুরুষের কাজ। সব চেয়ে ভালো 'লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ'। তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি। পরস্পরকে পরলোকে পাঠালে ইহলোক ভোগ করবে কে?

মানস ভেবে দেখে মুসলিম লীগকে স্টেট উইদিন স্টেট না দিয়ে স্টেট আউটসাইড স্টেট দেওয়াই দূরদর্শিতা। তবে তার সে স্টেট তারই মাপে তৈরি হবে। বর্গফল সারা ভারতের চার ভাগের এক ভাগ। কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ তো বাদ যাবেই, সিমলাসমেত পূর্ব পাঞ্জাবও বাদ। সীলেট যদি চায় আসাম ছেড়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হতে পারবে। আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও যদি চায় পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। সিন্ধুপ্রদেশ তথা বেলুচিস্তান সম্বন্ধেও সেই কথা। ক্যাবিনেট মিশনের স্টেটমেন্টেও পাকিস্তানের সীমানির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে, যদি পাকিস্তানই হয় মুসলিম লীগের সঙ্গে সেটলমেন্টের ভিত্তি। নয়তো স্বাধীন বঙ্গ। মানসের মতে।

সম্ভাব্য পাকিস্তানের পরিসংখ্যান জানতে মানস যায় দেবাদিদেব গুহর ওখানে। গুহ এসব বিষয়ে যেমন ওয়াকিবহাল আর কেউ তেমন নন। গুহ বিস্মিত হয়ে সুধান, "পরিসংখ্যান জেনে আপনি করতে চান কী? মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দান?"

"ভাবছি।" মানস উত্তর দেয়, "আমার অন্তরে সেই পরিমাণ প্রেম নেই যা থাকলে মুসলমানদের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি। আবার সেই পরিমাণ হিংসা নেই যা থাকলে আমি মুসলমানদের প্রাণ নিতে পারি। তা হলে আমার মতে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে না দিয়ে পাকিস্তানের দাবী নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয়। পোর্শিয়া যেমন শাইলককে বলেছিলেন, এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবে নাও, কিন্তু খবরদার এক ফোঁটা রক্ত যেন না পড়ে। আমিও তেমনি বলব পাকিস্তান কেটে নিতে চাও নাও, কিন্তু হিন্দুপ্রধান অঞ্চল যেন আত্মসাৎ না করো।"

এর পর গুহ বইপত্র নাড়াচাড়া করে বলেন—খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে না গিয়ে মোটামুটি একটা হিসাব দিচ্ছি। সারা বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যা তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ আর অমুসলিম সংখ্যা দু'কোটি সত্তর লক্ষ। সব মুসলমান যদি পূর্ববঙ্গে ভিড় করে আর সব অমুসলমান যদি পশ্চিমবঙ্গে সমবেত হয় তবে পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গের দু'কোটি সত্তর লক্ষ। ধরে নিচ্ছি যে সঙ্গে সঙ্গে লোক বিনিময় ঘটবে। সেটা যদি না ঘটে তবে মিশ্র জনসংখ্যা মোটের উপর সেই রকমই হবে। এ গেল বাংলাদেশের হিসাব। আসামের মুসলিম সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ। অমুসলিম সংখ্যা সাতষট্টি লক্ষ। সীলেট যদি বাদ যায় ও আসামের সব মুসলিম সেখানে গিয়ে জড়ো হয় তা হলে চৌত্রিশ লক্ষ মুসলমান বাকী আসাম ছেড়ে পূর্ববঙ্গে সামিল হবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে তিন কোটি সত্তর লক্ষের মতো। বলা যাক চার কোটি। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যাও একই রকম গণনায় হিন্দু শিখ বাদ দিয়ে ও মুসলিম যোগ করে দাঁড়াবে দু'কোটি ছাব্বিশ লক্ষ। বলা যাক তিন কোটি। তা হলে তামাম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা সাতকোটি। এর উপর আরো দু'কোটি মুসলমান চাপাতে পারো, যদি হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলি থেকে মুসলমানরা সবাই পাকিস্তানে মহাপ্রস্থান করে। কিন্তু কাটছাঁট দেওয়া পাকিস্তান কি ন'কোটি মুসলমানের ভার সইতে পারবে? লীগ নেতাদের সঙ্গে তর্ক করেছি। তাঁদের কথা হলো বিশ্বাসে মিলায় পাকিস্তান তর্কে বহুদূর। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কাটছাঁট না দেওয়া পাকিস্তানই তাঁরা পাবেন।"

"তার মানে ব্রিটেন পক্ষপাতিত্ব করবে। যেমন আগেও করেছে। সেটা এবার সম্ভবপর নয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের আটকা পড়তে হবে। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও সময়মতো স্বদেশে ফিরে গিয়ে অন্য চাকরি পাবেন না, তাঁদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট দেবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তো দেবেন না বলেই দিয়েছেন। তাঁদের অবস্থা হবে ত্রিশঙ্কুর মতো। দাপটের সঙ্গে শাসন করতেও পারবেন না খিদমদগারি করতে হবে। আমার বিশ্বাস কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হবেই, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লীগের সঙ্গেও। যেমন হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে।" মানস যতদূর জানে।

গুহ তা শুনে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। বলেন, "আমি তখন কেমব্রিজের ছাত্র। আয়ারল্যাণ্ডের বত্রিশটা কাউন্টির মধ্যে ছাব্বিশটা ছিল ক্যাথলিকপ্রধান আর বাকী ছ'টা প্রটেস্টান্টপ্রধান। ছ'টা কাউন্টিকে অপশন দেওয়া হয় তারা ইচ্ছে করলে আইরিশ ফ্রী স্টেটে যোগ দিতে পারবে, নতুবা বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জন্যে আলাদা গভর্নমেন্ট গঠন করবে ও সেটা গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইউনাইটেড কিংডমের সামিল হবে। প্রটেস্টান্টদের ইউনিয়নিস্ট পার্টি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গেই ইউনিয়ন চায়, আইরিশ ফ্রী স্টেটের সঙ্গে নয়। তাদের সিদ্ধান্তই ভোটারদের সমর্থন পায়। আইরিশ রেপাবলিকান পার্টি আয়ারল্যাণ্ডের পার্টিশন মেনে নেয় না, কিন্তু অধিকাংশ আইরিশ ক্যাথলিক ওটা মেনে নেয়। নইলে শুধু যে ক্যাথলিকে প্রটেস্টান্টে গৃহযুদ্ধ বাধত তাই নয়, ব্রিটেনের সঙ্গেও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেধে যেত। দুই ফ্রণ্টে লড়াই। তার ঝুঁকি নেবে কে? জনমত পার্টিশনকেই মন্দের ভালো মনে করে। সেই মর্মে মীমাংসা হয় দীর্ঘসূত্রী আইরিশ প্রশ্নের। সেই মর্মে দীর্ঘসূত্রী ভারতীয় প্রশ্নেরও মীমাংসা হতে পারে। যাকে জটিলতর করেছে হিন্দু মুসলিম বা কংগ্রেস লীগ প্রশ্ন। আমরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই হব ভুক্তভোগী।"

মানস তাঁকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করে। "ভারত বিভক্ত হলেও বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকতে পারে পার্টিশন নয়, সিসেসন। অবিভক্ত বাংলাদেশ ভারত তথা পাকিস্তানের বাইরে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্ন কি তৃতীয় এক জাতীয়তাবাদ হয় না? বাঙালী জাতীয়তাবাদ। বিহার ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি জুড়লে মোট জনসংখ্যা সাত কোটিরও বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রও সপ্ত কোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদ শুনেছেন। দ্বিসপ্ত কোটি ভুজে খর করবাল দেখেছেন। হিন্দু মুসলমানের এক জননীকেই বন্দনা করেছেন। দুই জননীকে

নয়। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটেছে যে বঙ্গজননী হবেন তাদের মা?”

গুহ বিষণ্ণ সুরে বলেন, “ বঙ্কিমচন্দ্রই তো লিখেছেন ‘বন্দে মাতরম্’ রব তুলে হিন্দু বাঙালীরা মুসলিম বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাঙালীরা বাংলাভাষাতেই দোহাই দেয়, ‘মুই হেঁদু! মুই হেঁদু।’ ওরা হিন্দু ধর্ম ছেড়েছে, বাংলা ভাষা ছাড়েনি। বাঙালী বলে যারা পরিচয় দেবে তারা ধর্মান্তরিত বাঙালীকে মেরে তাড়াবে কেন? কোথায়ই বা তারা পালিয়ে বাঁচবে? আফগানিস্থানে, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়? না ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে? কলকাতার দাঙ্গার সময়ও ‘বন্দে মাতরম্’ রব উঠেছিল। এখন কানে আসছে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পেলে তাঁরা পার্টিশনে সায় দেবেন। আহা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কী শ্রদ্ধা! আর আমাদের প্রতি কী অনুরাগ! তর্কের খাতিরে আপনাকে আজ লোকবিনিময়ের কথা বলছি। সেটা আমার মনের কথা নয়। আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। মুসলমানও হব না। জেলে যেতে হয় যাব। পরলোকে যেতেও আপত্তি নেই। জমিদারিটা হারাব। সেটা ইসলামের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দরুন নয়, ফরাসী বিপ্লবের বা রুশবিপ্লবের সাম্যের প্রেরণায়। নবাবদের জমিদারিও যাবে। চলবে কী করে জানিনে। বাড়ীখানা যদি রাখতে দেয় একতালাটা ভাড়া দিয়ে দোতালায় বাস করব।”

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, “আপনি তা হলে secession-এ বিশ্বাস করেন না!”

“দেখুন, মিস্টার মল্লিক, ওটা শুধু কথার মারপ্যাচ। আয়ারল্যাণ্ডেও secession শব্দটা ব্যবহার করা হয়। অথচ সেখানে দেখা গেল আলস্টারের তিনটি কাউন্টি ফ্রী স্টেটকে দেওয়া হলো, ছ’টি নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ডকে। আলস্টার তো আস্ত রইল না। আয়ারল্যাণ্ডও না। তা হলে পার্টিশন হলো কি না, বলুন। তবে আমাদের বেলা যেটার সম্ভাবনা আছে সেটা সিসেসন নয়, পার্টিশন। কারণ মুসলিম লীগ চায় একই দিনে একই ক্ষণে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অনুকূলে ক্ষমতার হস্তান্তর। আয়ারল্যাণ্ডে হয়েছে আগে পরে। আগে আইরিশ ফ্রী স্টেট হয়। তার পরে নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড বেরিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীও তেমনি একটা সূত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু জিন্না সাহেব তার বিপক্ষে। নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড ফ্রী স্টেটের সঙ্গে সমান স্টেটাস পায়নি। পাকিস্তানের জন্যে তিনি চান সমান স্টেটাস। সমান সোভরেনটি। গান্ধী জিন্না সমান। জবাহর লিয়াকৎ সমান। কংগ্রেস লীগ সমান। হিন্দু মুসলিম সমান। তাঁর মাথায় এই সব ঘুরছে। সেটা একদিক থেকে ভালো বলতে হবে। পাকিস্তান কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো ডোমিনিয়ন হবে, নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ডের মতো লেজুড় হবে না।”

এর পরে মানসের আর কিছু বলার থাকে না। শোনারও থাকে না। সে উঠতে চায়। গুহ তাকে উঠতে দেন না। বলেন, “শুনুন। বাংলাদেশ যদি দু’ভাগ হয় সেটা হিন্দু স্বার্থপরতার পরিণাম। কলেজ হলো, তার নাম হলো হিন্দু কলেজ। সেখানে মুসলমানের প্রবেশ মানা। মুসলমানদের একটা জেনারেশন ইংরেজী শিক্ষার একই প্রকার সুযোগ পেল না। কলকাতার মাদ্রাসার সঙ্গে ইংরেজী ক্লাস জুড়ে দেওয়া হলো, কিন্তু সেটার দৌড় বেশী দূর নয়। একসঙ্গে পড়াশুনা করলে যেমন পরস্পরকে চেনাশোনার ও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতার সুরাহা হয় তেমন হলো না। সরকার থেকে হিন্দু কলেজ বিস্তর অর্থ সাহায্য পায়, সুতরাং সরকার যখন প্রস্তাব করেন সেটা সকলের জন্যে উন্মুক্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ হোক তখন হিন্দু প্রতিনিধিরা আপত্তি করেন। একজন কি দু’জন বাদে। শেষে হিন্দু কলেজ ভেঙে এক ভাগ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ, তার দুয়ার সকলের জন্যে খোলা। আরেকভাগ হয় হিন্দু স্কুল। তার দুয়ার এখনো খোলা নয়। অথচ সরকারী টাকাতেই চলে। মুসলমানদের জন্যে অন্য বন্দোবস্ত করলে আর যাই হোক একসঙ্গে পড়াশুনা ও খেলাধুলা হয় না। পরিচয়সূত্রে ভাববিনিময় হয় না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ফী বেশী বলে বিদ্যাসাগর মশায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্ররা সস্তায় পড়ে। কিন্তু শুধু হিন্দু ছাত্ররাই প্রবেশ পায়। অথচ গরিব ছাত্র মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। তারা প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হলেও ফী জোগাতে পারে না। তাই কোনোখানেই ইংরেজী পড়াশুনার উৎসাহ পায় না। ফলে

চাকরিবাকরিও জোটে না। হিন্দুরা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। অগত্যা মুসলমানরা চাকরির কোটা দাবী করে ও পায়। পৌর প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে সম্পত্তিগত যোগ্যতা কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতা হয় ভোটদানের শর্ত। মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য। তাই হিন্দুদেরই প্রাধান্য। নিচের স্তরে এটা লক্ষ করে মুসলমানরা উপরের স্তরে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা দাবী করে ও পায়। সেই ভেদনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী। এর থেকে পরিত্রাণ কোনো রকম গোঁজামিলে নয়।" গুহ নিবেদন করেন।

মানস মাথা হেঁট করে শোনে। উচ্চবাচ্য করে না। তখন গুহ আবার বলেন, "ভালো নয়, মন্দের ভালো। এর চাইতেও খারাপ হতো, যদি মুসলমানরা হতো প্রত্যেকটি প্রদেশে বা অঞ্চলে মাইনরিটি। তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে চাকরিবাকরিতে উচ্চতর স্থান অর্জন করতে পারত না, রাজনীতিক্ষেত্রেও উচ্চ আসন লাভ করতে পারত না, সর্বক্ষেত্রে নিম্নতর পোজিশন পেয়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। তখন তাদের দমন করতে গিয়ে সব এনার্জি ক্ষয় হতো। অবশেষে বাধ্য হয়ে গোটা কয়েক প্রদেশ ওদের জন্যে খালি করে দিয়ে স্বস্তি পাওয়া যেত। সেইখানে ওরা রাজত্ব করত। তার চেয়ে এই ভালো যে কয়েকটা প্রদেশে বা অঞ্চলে ওদের মেজরিটি হয়ে রয়েছে। অপর পক্ষ মানে মানে স্বীকার করে নিতে পারে, হার জিতের প্রশ্ন ওঠে না। সীমান্তরেখা নিয়ে বিবাদ সালিশের দ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে।"

মানস সুধায়, "তাহলে কি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গের সম্ভাবনা নেই?"

"কই, তার লক্ষণ কোথায়? তার অত্যাবশ্যক শর্ত কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট । কংগ্রেস বা লীগ কোনো মহল কি তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন? যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক সেটাই সবচেয়ে উপেক্ষিত।" গুহ উত্তর দেন।

"কলকাতার দাঙ্গার আগে কোয়ালিশনের প্রসঙ্গ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু তার পর থেকে আর নয়। নোয়াখালীর পর যা শোনা যাচ্ছে তা কারো কারো মুখে বঙ্গভঙ্গের কথা, কারো কারো মুখে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গের কথা। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের কথা চাপা পড়ে গেছে। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে মুসলিম লীগ যোগ দিয়েছে, কিন্তু সেটাকে বানচাল করার জন্যে। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে লীগ সদস্যারা যোগ দেননি, দিলে সেটাকেও বানচাল করত। না দেওয়ার ফলে অন্যান্য সদস্যরা এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের অদল বদলে কংগ্রেস বা লীগ কোনো পক্ষ রাজী নন। শিখদের দিক থেকেও আপত্তি উঠেছে। যে অ্যাসেম্বলীর সদস্য সংখ্যা ব্রিটিশ ভারত থেকে দু'শো বিরানব্বই তার শিখ সদস্য মাত্র চারজন। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে একজন শিখকে জঙ্গীলাটের আসন দেওয়া হয়েছে বলে তার উপর থেকে আপত্তি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী সম্বন্ধে আপত্তি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়নি।" মানস যতদূর জানে।

"ওই দুটি রাস্তার কোনোটিতেই অগ্রগতি যেটুকু হয়েছে তার বেশী হবে না, মিস্টার মল্লিক। বৃথা আশা। নেতি নেতি করে দেশভাগেই পৌঁছতে হবে, হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে প্রদেশভাগেও। দেশভাগ বা প্রদেশভাগ এমন কিছু অভূতপূর্ব নয়। সেইসঙ্গে লোকভাগও যদি হয় তবে সেটা কিন্তু অভূতপূর্ব। আর সর্বনেশে। আমি তো ভাবতেই পারিনে হিন্দুরা মুসলমানদের ছেড়ে আর মুসলমানরা হিন্দুদের ছেড়ে কেমন করে বাঁচবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন বটে, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরূপ। আমার ঘোড়ার সহিস মুসলমান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান মুসলমান, বজরার মাঝি মুসলমান, হাতির মাহুত মুসলমান, পালকি বেহারা মুসলমান, দালানের মিস্ত্রী মুসলমান, পোশাকের দর্জি মুসলমান, টেবিলের খানসামা মুসলমান, কিচেনের বাবুর্চি মুসলমান। আমার খোরাক আসে মুসলমান চাষী রায়তের চষা জমি থেকে, আমার কাপড় আসে মুসলমান জোলার তাঁত থেকে।

আবার ধোপা হিন্দু, নাপিত হিন্দু, গয়লা হিন্দু, বেয়ারা হিন্দু, পুরুত হিন্দু, গুরু হিন্দু, পূজারী হিন্দু, মালী হিন্দু, মেথর হিন্দু, মারা গেলে মুদ্দফরাস হিন্দু। জমিদারি কর্মচারীদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। আমার বাবার আমলেও এই রেওয়াজ ছিল, আমার ঠাকুরদার আমলেও। তফাতের মধ্যে আমি টেবিলে আর কিচেনে মুসলমান নিয়োগ করেছি। তা না হলে সাহেবসুবোদের নিমন্ত্রণ করতে পারতুম না, করলে অন্যত্র বন্দোবস্ত করতুম। না, আমার কোনো গার্ডেন হাউস নেই। ওসব উপসর্গও নেই। কিন্তু যা বলতে চেয়েছি তার থেকে সরে এসেছি। হিন্দু আর মুসলমান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে হিন্দুকে রাখবে মুসলমান আর মুসলমানকে রাখবে হিন্দু। The Age of Golden Deeds is not over. বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও কাজ করছে। তার দৃষ্টান্তও আছে। কারা মেজরিটি, কারা মাইনরিটি এ গণনা তুচ্ছ। এরই উপর দাঁড়িয়ে ইমারত গড়তে গেলে সে ইমারত শক্ত বুনিয়াদের উপর খাড়া থাকবে না। পার্টিশন একদিন রহিত হবেই, যেমন আগেও একবার হয়েছে। যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবে তারা পরে আবার ফিরে আসবে। যারা মারের ভয়ে পালিয়ে আসবে তারাও পরে আবার ফিরে যাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছিন্নমূল করে পশ্চিমবঙ্গে বা পূর্ববঙ্গে স্থাপন করা সম্ভব, কিন্তু শিকড় লাগানো সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাবুরা নিজেদের চশমায় সবাইকে দেখছে। তবে নাটের গুরু তাঁরা নন, তিনি, যিনি এ যুগের মহম্মদ তুঘলক। মহম্মদ আলী জিন্না। তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে নাগরিকদের চলে যাবার হুকুম জারি করেছিলেন। দিল্লী খালি হলো, কিন্তু দৌলতাবাদ জমল না। পথে মারা গেল বা নিরুদ্দেশ হলো বা লুকিয়ে থাকল বেশীর ভাগ। আশা করি গান্ধী বা জবাহরলাল এমন পাগলামি করবেন না। যে যেখানে আছে সেখানেই তাকে রাখবেন। তুঘলক আমল বেশী দিন টেকেনি। টিকতে পারে না। পাকিস্তানীদেরও সুমতি হবে। তারা লোকবিনিময়ে ক্ষান্তি দেবে।" গুহ আশাবাদী।

"আপনি যা বললেন সব সত্যি। কিন্তু লক্ষণ সুবিধের নয়। একটা ঘোরতর বিপর্যয়ের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কত মানুষের প্রাণহানি হবে, কত নারীর সম্মানহানি, কত গৃহস্থের গৃহহানি, কত কৃষিজীবীর জমিহানি, কত ব্যবসায়ীর ব্যবসায়হানি, কত ছাত্রের ভবিষ্যৎহানি এসব ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এইসব কারণেই আমি পার্টিশনবিরোধী। যেমন ভারতের পার্টিশন তেমনি বাংলার পার্টিশন। দুটো ভুল মিলে একটা ঠিক হয় না। দুটো অন্যায় মিলে একটা ন্যায়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের গ্রহণযোগ্য কোনো সর্বসম্মত সমাধানও তো আমি বাতলাতে পারছিনে। সময় বয়ে যাচ্ছে। ইংরেজরা উড়ু উড়ু। উত্তরাধিকারী না হলেও চলে না। হলেও সেটা বিতর্কিত হবেই। তা সে কংগ্রেসই হোক আর লীগই হোক। সিভিল ওয়ার এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে তার প্রথম দিন। ফ্রান্সের ইতিহাসে সে রকম একটা দিন ছিল সেন্ট বার্থোলোমিউজ ডে। পনেরো শ' বাহাত্তর সালের চব্বিশে আগস্ট। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। তার জের অনেক দূর গড়ায়। ফ্রান্স প্রায় প্রটেস্টান্টশূন্য, ইংলণ্ড প্রায় ক্যাথলিকশূন্য হয়।" মানস জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে।

গুহ দার্শনিকের মতো নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, "আমরা ইংরেজ আমলের জমিদার। এদেশের ব্যারন। ওরা যেদিন কুইট নোটিস পায় আমরাও সেদিন কুইট নোটিস পাই। তার পর থেকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে সাজঘরে ঢুকে সাজপোশাক খুলে ফেলছি। 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া গুঁড়ামাত্র আছে অবশেষে।' হাতী গেছে, ঘোড়া গেছে, ঘোড়ার গাড়ী গেছে, বজরা গেছে, সাহেবী চাল গেছে, দিশী ঠাটও গেছে। দেনা যা ছিল সব শোধ করে দিয়েছি। জনা কতক পুরনো চাকরবাকর আছে, ছাড়িয়ে দিতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু আমার কষ্ট নয়, ওদেরও কষ্ট। পাবলিকের করুণার পাত্র হতে চাইনে। দান খয়রাত একেবারে বন্ধ করে দিইনি। যাকে একশো টাকা দিতুম তাকে দশ টাকা দিই। যাতে একেবারে নিঃস্ব না হয়ে পড়ি, সেদিকে নজর আছে। আমি পথের ভিখারীও হব না, কম মাইনের চাকরিও করব না। বেশী মাইনের চাকরি আমাকে কেই বা দিচ্ছে, বলুন? গণিতের নোট বুক থেকে আমার কিছু আয় হয়। দেশে

গণিতের আদর যদি থাকে আমার সে আয় অব্যাহত থাকবে। অনেকদিন থেকে আমি নিখরচায় বিদ্যার্থীদের পড়িয়ে আসছি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। আমার বিশ্বাস আমার মুসলিম ছাত্ররা আমার পাশে দাঁড়াবে। ইংরেজদের সঙ্গে আমাকে একনৌকায় ভাসতে হবে না। দুশো বছর ধরে এক সাজ পরে ইতিহাসে কোন্ শ্রেণীই বা অভিনয় করে? বাংলার জমিদার শ্রেণীকেও ইতিহাসের রায় মেনে নিয়ে মানে মানে সরে যেতে হবে। তাই আমার কোনো আফসোস নেই, জজ সাহেব।"

মানস ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নেয়। পুলিশ সাহেব ফিদা হোসেন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। যূথিকাকে বলছিলেন তাঁর বদলীর খবর। উচ্চতর পদে কলকাতায় বদলী। ভাগ্যবান পুরুষ। মানস অভিনন্দন জানায়।

"অভিনন্দনের কী আছে? এটা একটা ফালতু পদ। আমাকে নাকি পাঞ্জাবে পাঠানো হবে ক্যালকাটা পুলিশের জন্যে সিপাহী রিক্রুট করতে। গতবারের দাঙ্গায় ক্যালকাটা পুলিশের বহুৎ বদনাম হয়েছে। তাই নতুন রক্ত আমদানী করতে হবে।" ফিদা হোসেন চিন্তিত।

মানস সুধায়, "কেন? কর্তারা কি ফের দাঙ্গা বাধবে মনে করেন?"

"কী করে বলব? তবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। সেটা বিহারের মুসলিম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া। সব মুসলমান এখন একদিল যে পাকিস্তান হাসিল করতেই হবে। নইলে মুসলমান বাঁচবে না। আমি তো আগে পাকিস্তানের বিপক্ষেই ছিলুম। এখন অন্যান্য মুসলিম অফিসারদের মতো আমিও তার পক্ষে।" পুলিশ সাহেব সখেদে বলেন।

মানস দুঃখিত হয়। বলে, "বিহারের জন্যে আমি লজ্জিত। কংগ্রেস নেতারা বিব্রত। আর কখনো সে রকম হবে না। আর কোথাও হবে না।"

"না হলে তো বাঁচি। তবু পাকিস্তান হলে আরো নিশ্চিন্ত হব। আপনারাও শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবেন, আমরাও শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলব। আমি এমন কথা বলব না যে আপনারা সারা বাংলা বা সারা পাঞ্জাব ছেড়ে দিন। আমি কট্টর জিন্নাভক্ত নই।" ফিদা হোসেন আশ্বাস দেন।

।। আট ।।

সৌম্য যেদিন নোয়াখালী ফিরে যায় সেদিন বাবলী এসেছিল জুলিকে দেখতে। সেই প্রথমবার নয়, আগেও কয়েকবার দেখে গেছে। জুলির জন্যে জুলির যত না ভাবনা বাবলীর তার চেয়েও বেশী।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, তুমি কোন্ প্রাণে তোমার বৌকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে যাচ্ছ? যে কোনো দিন ওর প্রিম্যাচিয়োর ডেলিভারি হতে পারে। নারীর জীবনে এত বড়ো বিপদ কি আর আছে?" বাবলী রাগ করে।

"আমরা সত্যাগ্রহীরাও একজাতের যোদ্ধা। সত্যাগ্রহ হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প। ডাক পড়লে সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হতে হয়, যুদ্ধ তাদের জন্যে সবুর করবে না। তুমি কি চাও যে আমরা যুদ্ধে হারি? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমাদের হারজিতের উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে? তার মানে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য। বোন বাবলী, তুমি থাকতে আমি এমন কী বেশী করতে পারি যার ফলে জুলি নিশ্চয় বাঁচবে? নারীজাতির এই যুদ্ধক্ষেত্রে নারীই পরম সহায়। পুরুষ তো সাক্ষীগোপাল।" সৌম্য মনে করে।

বাবলী ঠাণ্ডা হয়। বলে, "তোমরা আবার এক সত্যাগ্রহের তোড়জোড় করছ নাকি? কাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ? মুসলমানদের বিরুদ্ধে?"

"না, বোন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ছাব্বিশ সাতাশ বছর ধরে অহিংস সংগ্রামে নিযুক্ত। আমাদের শিবিরে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা চার্চিলের বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রাম। চার্চিলের সঙ্গে তলে তলে জিন্নার আঁতাত। জিন্না এই সংগ্রামটাকে হিন্দু মুসলমানের সংগ্রামে পরিণত করেছেন। আমরা যদি সতর্ক না হই তবে আমাদেরও বলা হবে হিন্দুর মিত্র মুসলমানের শত্রু। ইতিমধ্যেই রব উঠেছে গান্ধী ছুটে গেছেন নোয়াখালীতে হিন্দুদের বাঁচাতে। কই, বিহারে তো যাননি মুসলমানদের রক্ষা করতে? কী করে এদের বোঝাব যে নোয়াখালীতে হিন্দু বাঁচলে বিহারেও মুসলমান রক্ষা পাবে? বিহার ঘুরে এলুম। সেখানে যারা মুসলমানদের মেরেছে তাদের যুক্তি হলো হিন্দুরা বিহারে বদলা না নিলে নোয়াখালীর দাঙ্গা ত্রিপুরায় ছড়াত, সেখান থেকে ঢাকায়, সেখান থেকে শ্রীহট্টে। বিহারেও গান্ধীজীর যাওয়া দরকার। এই কুযুক্তি খণ্ডন করা চাই। আমি চেষ্টা করেছি। হিন্দু বন্ধুরা আমার কথা শোনেনি। মুসলিম বন্ধুরা টিটকারি দিয়েছে। বলেছে, আমাদের হাতে বন্দুক দাও, ইয়ার। অন্তত বন্দুকের লাইসেন্স পাইয়ে দাও। আমরাই আমাদের ধন প্রাণ ও ইজ্জত সম্মান রক্ষা করব। এখন এই সিভিল ওয়ার থেকে হিন্দু মুসলমানকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাদের একজোট করে প্রস্তুত রাখতে হবে বিদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ওরা যাবার আগে এমন এক চাল চালবে যার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলে মুসলিম লীগ হয় ট্রয় যুদ্ধের ঘোড়া অথবা মুসলমানরা পায় স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র। নেপথ্যে ইংরেজরাই বহাল থাকবে। যেমন রয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলোতেও। আমরা যেটাই মেনে নেব সেটাই আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে। কোনোটা মেনে না নিলে কী হবে সেটাই চিন্তা করছি।" সৌম্যকে চিন্তাকুল দেখায়।

"কোনোটা মেনে না নিলে যেটা হবে সেটা গৃহযুদ্ধ। সেটা পেশাদার সৈনিকদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে না। নোয়াখালী আর বিহার তার নমুনা। গান্ধীজী ক'টা জায়গায় গিয়ে আগুন নেবাবেন আর তোমরাই বা ক'টা জায়গায়? তোমরাই বা ক'জন? পরিস্থিতি অবশেষে আমাদের হাতে এসে পড়বে। গৃহযুদ্ধকে আমরা শ্রেণীযুদ্ধের মোড় দেব। জমিদার বনাম প্রজা, জোতদার বনাম চাষী, কলওয়ালা বনাম মজদুর, মহাজন বনাম খাতক, ভদ্রলোক বনাম খাঙ্গড়। আমরা হিংসা অহিংসার ভেদ মানিনে। যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় তাই করণীয়। হয়তো রক্তের নদী সাঁতরে পার হতে হবে।" বাবলী বলে যায়।

"One more river, one more river, one more river to cross ইংলণ্ডে শুনেছিলুম এইরকম একটা গান। হ্যাঁ, স্বাধীনতার তীরে পৌঁছতে হলে আরো একটা নদী পার হতে হবে। আমরাও বুঝি সেকথা। কিন্তু সেটা রক্তের নদী কেন হবে, বোন? আর তোমরাই বা কেন সেটাকে শ্রেণীযুদ্ধের রূপ দেবে? আমাদের একটা সুযোগ দাও। আমরা অহিংসভাবেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর স্বার্থে নয়। অগণিত দীনহীনের জন্যেই। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব ভুলে যাই তোমরা আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ো। তার জন্যে কারো রক্তপাত করতে হবে না। নির্বাচনে হারিয়ে দিলেই আমরা হটে যাব। গঠনের কাজ নিয়েই থাকব।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

জুলি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "ভাই বাবলী, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কি একটিমাত্র পন্থা আছে? লেনিন যা দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির দিকে তাকাও। কত বড়ো একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে ওরা বুলেট ছেড়ে ব্যালটের মাধ্যমে। আমরা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমেও আরো একটা বিপ্লব ঘটাতে পারি। আগে তো স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হই।"

"কী করে সফল হবে, ভাই? মুসলিম লীগকে যদি তার পাওনা এক পাউণ্ড মাংস না দাও? মাংস কেটে নিলে রক্ত পড়বেই।" বাবলী তর্ক করে।

"আমরা সবটাই মুসলিম লীগকে ছেড়ে দেব।" সৌম্য উত্তর দেয়। "কিন্তু একটা শর্তে। ভারতকে ভাবী মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। স্বাধীন ভারত মার্কিন পক্ষেও লড়বে না, রুশ পক্ষেও লড়বে না।

তোমাদের বিপ্লবের পর তোমরা তো রুশ পক্ষে লড়বে ও ভারতকে জড়াবে। সেটা হবে অকারণে মার্কিনকে শত্রু করা। পরিণাম হবে জাপানের মতো ভয়াবহ। লীগ সরকার মার্কিনপক্ষ নিলে আমরা লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামব।"

বাবলী কী ভেবে বলে, "সত্যাগ্রহও হিংসা প্রতিহিংসার রূপ নিতে পারে। মুসলিম লীগ মুসলিম জনতাকে লেলিয়ে দেবে। যেমন ষোলই আগস্টের দিন। হিন্দু জনতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে না। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে নেবে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ এক জিনিস, লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অন্য জিনিস। ব্রিটিশ পক্ষে জনতা ছিল না। লীগ পক্ষে জনতা থাকবে। ইংরেজরা ধর্মের নামে লড়ত না। লীগপন্থীরা ধর্মের নামে লড়বে। তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছ, সৌম্যদা।"

"হিংসা প্রতিহিংসার এই ভিসাস সার্কল ভঙ্গ করতে হবে আমাকে। আজ এটাই আমার প্রাথমিক কর্তব্য।" সৌম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জুলি তা শুনে বলে, "তা হলে তুমি আগে মুসলমানদের বাঁচাও। বিহারে ফিরে যাও। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পাশে বাপুজি রয়েছেন।"

"বিহারের মুসলমানদের পেছনে সেখানকার সরকার রয়েছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পেছনে এখানকার সরকার নেই। সেইজন্যে বাপুকেই থাকতে হচ্ছে। আমাদের কর্তব্য তাঁকে নোয়াখালী থেকে খালাস দেওয়া। তা হলে তিনি বিহারে যেতে পারবেন।" সৌম্য খোলসা করে।

"ছোটবোনের একটা আবদার শোন, দাদা। যেখানেই যাও শহীদ হতে যেয়ো না। তোমার বা তোমাদের শাহাদতে মুসলিম লীগের হৃদয় গলবে না। সে হৃদয় অধিকাংশ মুসলমানেরও হৃদয়। যেমন হৃদয়হীন ভাবে ওরা গোরু কাটে তেমনি কসাইয়ের মতো ভারতকেও কাটবে। হিংসা থাকলে প্রতিহিংসাও থাকে। হিন্দুদেরও কতক অংশ বলতে শুরু করেছে ওরাই বা কালীঘাটের খাঁড়া দিয়ে পাঁঠাবলির মতো বাংলাদেশকে বলি দেবে না কেন? দু'দিকেই ধর্মীয় যুক্তি। মানুষ যেন হিন্দু বা মুসলমান ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতীয় নয়, বাঙালী নয়, মালিক নয়, শ্রমিক নয়, বুদ্ধিজীবী নয়, কৃষিজীবী নয়, ক্যাপিটালিস্ট নয়, কমিউনিস্ট নয়, শিল্পী নয়, সমজদার নয়। আমরা ধর্ম জিনিসটারই বিপক্ষে। তাই আমরা এর মধ্যে নেই। এই ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙির মধ্যে। তবে একথাও ভেবে রেখেছি যে পাকিস্তান হলে আমরা সবাই সেখান থেকে চলে আসব না, সেখানেও আন্দোলন চালাব। তাই পাকিস্তান স্বীকার করে নেব। আমরা বাস্তববাদী। যাতে কার্যোদ্ধার হয় সেটাই আমাদের নীতি।" বাবলী মন খুলে বলে যায়।

"তোরা একটার পর একটা বোকামি করেছিস। এটাও সেইরকম একটা বোকামি। ইসলামকে জিতিয়ে দিলে ইসলামই তোদের ঘাড় মটকাবে, বাবলী। যাক, তোর সঙ্গে আমি একমত যে শাহাদতে চিঁড়ে ভিজবে না। তোর দাদার জানা উচিত যে চার্চিল জিন্না অ্যাক্সিস অত সহজে ভাঙবে না বা মচকাবে না। লেবার পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। অ্যাটলীকে আর ক্রিপ্‌সকে হাতছাড়া করার মতো বোকামি আর নেই। জবাহর ঠিক পথেই চলছেন। বাপুর দিক থেকে বাপুও ঠিক। দেশ একটাই হোক আর দুটোই হোক হিন্দুকে মুসলমানের সঙ্গে আর মুসলমানকে হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতে হবে। যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে, তেমনি সিন্ধুপ্রদেশে, তেমনি দক্ষিণ ভারতে। দেশভাগ হলেও লোকভাগ যাতে না হয় তার জন্যেই বাপুর এই নোয়াখালী মিশন। আমারও মন চাইছে উড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে, কিন্তু দেহ নড়তে চাইছে না। তোর দাদাই যান। আমার জন্যে ওঁকে থাকতে হবে না। মা আর মাসী রয়েছেন।" জুলি তাই নিশ্চিন্ত।

বাবলী ক্ষেপে যায়। "আমাদের বোকামি না তোদের নেতাদের খোকামি? কোলের শিশুও বুঝতে পারে যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে লড়তে গেলে হিটলার হারবেই আর হিটলার হারলে ব্রিটেন জিতবেই। তেমনি, আমেরিকার সঙ্গে লড়তে গেলে জাপান হারবেই আর জাপান হারলে ব্রিটেন জিতবেই। তা

হলে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে শক্তি ক্ষয় করার দরকারটা কী ছিল? এখন গৃহযুদ্ধের বেলা শক্তি কম পড়ছে না? আপস না করে চারা আছে?"

সৌম্য দুঃখিত হয়। বলে, "আমাদের সেদিন 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ঝাঁপ না দিয়ে চারা ছিল না, বোন। আমরা ইংরেজদের দুর্যোগের সুযোগ নিতে চাইনি, ওদের দুর্দিনে ওদের পাশে দাঁড়াতেই চেয়েছি। কিন্তু ওদের প্রজা বা তাঁবেদার হিসাবে নয়, ওদেরই মতো স্বাধীন জাতি হিসাবে। কিছুতেই ওদের বোঝানো গেল না যে আমাদের দেশরক্ষা আমাদেরই দায়িত্ব ও দায়িত্বের সমপরিমাণ ক্ষমতাও থাকা চাই। আমাদের সহযোগিতা পাবে অথচ আমাদের সম্মান দেবে না, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে আর কী করলে ভালো হতো? পরে যখন জাপান এসে সীমান্তে হাজির হয় তখন দেখা গেল প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়। প্রতিরোধ করতে হবে। তার আগে জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টা আবার করা হলো। সিভিল পাওয়ার ওঁরা অনেকখানি ছাড়বেন, কিন্তু মিলিটারি পাওয়ার মুঠোর মধ্যে রাখবেন। যুদ্ধকালে সেইটেই তো আসল। মিলিটারি হাতে পেলে আমরা জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ করতুম। তা যখন সম্ভব নয় তখন অসামরিক প্রতিরোধই করতে হলো একই কালে দুই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর বিরুদ্ধে। যারা অকুপেশনে অবস্থিত আর যারা অকুপেশনে অগ্রসর। ওদের মতলব এক পক্ষ হটতে হটতে যাবে, আরেক পক্ষ হটাতে হটাতে এগোবে। যাবে যারা তারা আগন্তুকদের হাতেই বরং ক্ষমতা তুলে দিয়ে যাবে, তবু আমাদের হাতে তুলে দেবে না। কারণ পরে ওদের হাত থেকে ফিরে পাবে, আমাদের হাত থেকে ফিরে পাবে না। মাঝখান থেকে আমাদের দেশ হবে দুই বিদেশীর যুদ্ধক্ষেত্র। তারা পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়ে আমাদের খোরাক থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে, আমাদের কলকারখানার উপর বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করবে, আমাদের লোকদের ঘরবাড়ী পোড়াবে। এর নাম পোড়ামাটি নীতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে পালাবে, সৈনিকরাও যে পালাবে না তা নয়। তারা মার্সিনারি সৈনিক, রাজার জন্যে লড়ছে, দেশের জন্যে নয়। এমন যে পরিস্থিতি এতে আমাদের কর্তব্য হলো ইংরেজ ও জাপানী উভয়ের মাঝখানে জায়গা নিয়ে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করা। তার জন্যে আমরা রেল লাইন ভেঙেছি, পুল উড়িয়ে দিয়েছি, টেলিগ্রাফের তার কেটেছি। ফলে ইংরেজরাও এগোবার পথ পায়নি, জাপানীরাও এগোবার পথে বাধা পেয়েছে। এ অবস্থা অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে ক'মাস হয় সে ক'মাস আমরাই আমাদের প্রভু। সেই যে স্বাধীনতার স্বাদ সে স্বাদ যারাই পেয়েছে তাদেরই জীবন সার্থক হয়েছে। তার জন্যে মরেও সুখ আছে। কতক কর্মী স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে, মানুষ খুন করেছে, জরিমানা উশুল করেছে, জমা দেয়নি। তবে সাহেব খুন করেছে বলে শোনা যায়নি। বরং সাহেবদের গুলীতেই মরেছে। সব দলেই কয়েকটা কালো ভেড়া থাকে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। সাহেবরাও নয়। যাই হোক, এখন ওদের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে। সকলের না হোক অধিকাংশের। অ্যাটলীর দিকেই অধিকাংশ ভোট। চার্চিলের দিকে নয়। চার্চিল গোষ্ঠী ক্ষমতায় ফিরে আসার আগেই লেবার পার্টির সঙ্গে আমাদের মিটমাট করতে হবে। মিটমাটকে যদি আপস বলো তো আপস সব সময় মন্দ নয়। যা চেয়েছি তার সমস্তটা হয়তো পাব না, বাদ সাধবে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের পেছনে অধিকাংশ মুসলমান। তাদের সঙ্গে দর কষাকষি বৃথা, বল কষাকষিও বিজ্ঞতা নয়। অবশ্য কালক্রমে মুসলিম জনগণের জ্ঞানোদয় হবে। কিন্তু ইংরেজ বা কংগ্রেস কেউ ততদিন অপেক্ষা করবে না।"

"অপেক্ষা করবে না তো কী করবে?" যাবলী সুধায়।

"লীগ সদস্যরা যদি যৌথ দায়িত্ব না মানেন কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবেন। মিটমাট করতে না পেরে বড়লাট সদলবলে ভারতত্যাগ করবেন। সেটা কী করে এড়ানো যায় সেই নিয়েই আলাপ আলোচনা চলেছে দিল্লীর সঙ্গে লণ্ডনের। এই সম্প্রতি নেহরু আর জিন্না লণ্ডন ঘুরে এলেন। দু'জনের

সঙ্গে কথাবার্তা বলে অ্যাটলী একটা সূত্র বার করেছেন। জনসংখ্যার বৃহৎ কোনো অংশের সহযোগিতা বিনা যদি কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় তবে সে শাসনতন্ত্র ভারতের অনিচ্ছুক অংশগুলির উপর ব্রিটিশ সরকার চাপিয়ে দেবেন না। তার মানে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশ যদি অনিচ্ছুক হয় তবে তারা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সামিল হবে না। কিন্তু কিসের সামিল হবে সেটা স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানের উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ পাকিস্তানে না-ও যেতে পারে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকতে পারে। একই কথা খাটে পাঞ্জাবের বেলাও। সমগ্র পাঞ্জাব পাকিস্তানে যাবে শুনলে শিখরা তুলকালাম কাণ্ড করবে। হিন্দুরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তেমনি, সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানে যাবে শুনলে হিন্দুরাও মারমুখো হবে। তা হলে কি প্রদেশভঙ্গ হবে? অ্যাটলী সেটা কংগ্রেস ও লীগের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি কারো উপর কিছু চাপাবেন না। প্রদেশভঙ্গ করতে চাইলে নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালাতে হবে। নইলে মারামারি বেধে যাবে। গৃহযুদ্ধ হয় তো এই সংকীর্ণ ইস্যুতেই হবে। বাপুজী এরকম ইস্যুর দায়িত্ব নেবেন না কোথায় যুদ্ধ ও শান্তির মতো মহান প্রশ্ন আর কোথায় প্রদেশভঙ্গের মতো ক্ষুদ্র প্রশ্ন। এ নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে হয় তো বল্লভভাই ও জবাহরলাল ঘামাবেন। আমি যতদূর জানি বাপু প্রদেশভঙ্গের বিপক্ষে। কেন মুসলিম লীগকে এই নিয়ে খোঁচানো? ছেড়েই দাও ওদের তিনটে প্রদেশ, ওরাও ছেড়ে দিক তিনটে বিষয়। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ। অবশ্য কংগ্রেসকে নয়, দলনিরপেক্ষ কেন্দ্রকে। এখন নেতারা কী স্থির করেন তা দেখা যাক। আপাতত দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করাই শ্রেয়। সবাই মিলে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে বসা যাক। হয়তো একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান মিলে যাবে। আমরা কেন ধরে নেব যে ভারতীয়দের বিজ্ঞতা নিঃশেষ হয়ে গেছে ও দেশভাগ, প্রদেশভাগ বিনা গতি নেই? ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে কূলে এসে নৌকাডুবি হবে। স্বাধীন হতে না হতেই আমরা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সারা বাংলায় না হোক পূব বাংলায় আমরা হিন্দুরা হব এলিয়েন। আর সারা ভারতে না হোক পাকিস্তান বাদ দিয়ে বাকী স্থানে মুসলমানরা হবে এলিয়েন। তোমরা কমিউনিস্টরা যদি একটা ফয়সালা বাতলে দিতে তা হলে আমরা তোমাদেরই ডিকটেটর করে দিতুম, বোন।" সৌম্য সহাস্যে বলে।

"আমাদের উপর ভার দিলে আমরা ভারতকে চোদ্দ ভাগে বিভক্ত করতুম। এক একটা ভাগ হতো এক একটা রেপাবলিক। তার পরে তারা একজোট হয়ে গড়ত ইউনিয়ন অভ্ সোশিয়ালিস্ট পঞ্চায়তী রেপাবলিকস। সংক্ষেপে ইউ. এস. পি. আর। হিন্দু মুসলমানের দ্বৈরাজ্যের উপর ভিত্তি করে অখণ্ড ভারত গঠন করা যেন চোরাবালির উপর ইমারত নির্মাণ করা। ধর্মের ভিত্তিতে নয়, মতবাদের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র তৈরি হতো।" বাবলী স্বপ্ন দেখে।

সৌম্য হেসে বলে, "ইস্পাতের কাঠামোটা কিন্তু রেড আর্মি।"

সৌম্য জুলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে যায় নোয়াখালী। শ্রীরামপুরে দর্শন পায় বাপুর। বিহারের বিবরণ শোনায় তাঁকে। কিন্তু একটি কথা তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখে। সেটা বিহারী হিন্দুদের কয়েকজনের মুখে শোনা। "খুনকা বদলা খুন। লুটকা বদলা লুট। আগকা বদলা আগ।" আর সবচেয়ে বিশ্রী "ফেলসানিকা বদলা ফেলসানি।" অমনি করে বদলা নিতে পারলে নাকি পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের পক্ষে নিরাপদ হবে। মুসলমানরা নাকি আর কোনো ভাষা বোঝে না। তাদের একহাতে কোরান আরেক হাতে তরবারি।

গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত সেবাকর্মীরাও রয়েছেন। অনেকেই সৌম্যর চেনা। সে কিন্তু ভাবতেই পারেনি যে তাঁদের মধ্যে সোনাদিও থাকবেন। অবাক হয়।

"কেন, অবাক হবার কী আছে?" সোনাদি বলেন, "বাপুর বয়স কত হলো খেয়াল আছে? এখন তো 'বা' বেঁচে নেই। বাপুর হেফাজত করবে কে? ওই বুড়োকে চোখে চোখে রাখা চাই। কখন আবার অনশন শুরু করবেন। আমরা তটস্থ হয়ে পাহারা দিচ্ছি।" সোনাদি বলেন।

কস্তুরবাকে সংক্ষেপে বলা হতো 'বা'। সৌম্য আক্ষেপ করে, ''অবশ্য 'বা' থাকলে ভাবনা কী ছিল? ভয় তো বাপু ওই একজনকেই করতেন।''

কথাপ্রসঙ্গে সোনাদি বলেন, ''গ্রীক দার্শনিক ডাইয়োজেনিস ঘুরে বেড়াতেন দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে মানুষ খুঁজতে। সৎ মানুষ। তিনি একজনও সৎ মানুষ খুঁজে পান না। বাপুও খুঁজছেন প্রত্যেকটি গ্রামে একজন উত্তম হিন্দু ও একজন মুসলমান। আমরা বাইরে থেকে যারা এসেছি তারা তো এখানে থাকব না। থাকবে যারা তারাই শান্তি স্থাপন করবে। কিন্তু কোথায় সেইসব উত্তম হিন্দু ও উত্তম মুসলমান? উত্তম হিন্দু হচ্ছে সেই যে মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বা যবন বলে ঘৃণা করবে না, আপন জনের মতো ভালোবাসবে। আর উত্তম মুসলমান হচ্ছে সেই যে হিন্দুকে কাফের বা মালাউন বলে ঘৃণা করবে না, তার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হবে।''

সৌম্য আশ্বাস দেয় যে ''বাপু যেমনটি চান তেমনিটি উত্তম হিন্দু ও উত্তম মুসলমান খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু সমস্যাটা তো তাঁদের আয়ত্তে নয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্যে লড়বে স্থির করেছে। লড়াই শুরুও হয়ে গেছে কলকাতায়। সে লড়াই অহিংস নয়। অহিংসায় কারো বিশ্বাসও নেই। উত্তম মুসলমানও তো লীগপন্থী হতে পারে। তা না হলে লীগপন্থীরা তাকে একঘরে করবে। উত্তম হিন্দুও আত্মরক্ষার খাতিরে বন্দুক ধরতে পারে। ধরেওছে। মেরেওছে ও মরেওছে। বাপুও বলেছেন কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা ভালো। কিন্তু সে রকম দৃষ্টান্ত আর ক'টা! বেশীর ভাগই দুর্বৃত্তের ভয়ে স্থানত্যাগ করেছে। অন্তরে বহুগুণ ঘৃণা বহন করছে। বাপু যদি এদের স্বস্থানে সুস্থির করতে না পারেন এরা নাচার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাবে আর সেখান থেকে মুসলমানদের খেদাবে। এমনি করে একটা ভিসাস সার্কল সৃষ্টি হচ্ছে, সোনাদি। সময়মতো একে ভাঙতে না পারলে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবই একদিন ভারত ভাঙবে, তথা বাংলাদেশ ভাঙবে। বাপুর বিহারে যাওয়া জরুরি।''

সোনাদি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তার পর বলেন, ''নোয়াখালী থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে পারলে তো বিহারে যাবেন। এত বড়ো অগ্নিপরীক্ষা তাঁর জীবনে আসেনি। তিনি বলেন এই পরীক্ষায় যদি বাঁচেন তবে তাঁর নবজন্ম হবে। যা শুনছেন যা দেখছেন তা যে কোনো মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। বিহারী হিন্দুরা উন্মাদ হয়েছে। তবু তো তারা কোনো মুসলমানকে গোবর খাইয়ে হিন্দু বানায়নি। এরা গোমাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়েছে। এরাও উন্মাদ। পুলিশ দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে এদের উন্মত্ততা সারানো যাবে না। হিন্দুদেরই গোমাংসের ভয় কাটিয়ে উঠতে হবে। তেমনি মেয়েদেরও কাটিয়ে উঠতে হবে ধর্ষণের গ্লানি।''

''উদ্ধারকার্য কতদূর হয়েছে?'' জানতে চায় সৌম্য।

''যতদূর সম্ভব। মুসলমানদের মধ্যেও সহৃদয়ী আছেন। তাঁরাও সহযোগিতা করছেন. যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তারা কিন্তু সহযোগিতা করছে না। অপরাধীদের নাম বলছে না। অপরাধও চাপা দিচ্ছে। একটাও কেস ধোপে টিকবে কি না সন্দেহ। তাদের গুরুজনদেরও ইচ্ছা নয় থানা পুলিশ কোর্ট কাচারি করা। বাপুরও ইচ্ছা নয়। ওদের ভবিষ্যৎটা তো দেখতে হবে। ধর্মান্তরিতরাও স্বধর্মে ফিরে আসছে। হিন্দুসমাজ আগের মতো অনুদার নয়। অনুদার হলে হিন্দুর সংখ্যা আরো কমবে। সংখ্যার যে কী গুরুত্ব সেটা এতদিন পণ্ডিতদের মাথায় আসেনি। এই দুর্যোগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও ঘটে যাচ্ছে। অভিশাপও আশীর্বাদের কাজ করছে। হিন্দুসমাজের। মুসলিম সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটছে কি না বুঝতে পারছিনে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ওরা মনে প্রাণে হিন্দুপ্রভাব কাটিয়ে উঠছে। পাকিস্তান সেদিক থেকে দরকারী। হিন্দু মুসলমান মিলে এক নেশন হলে সেটা হতো না। মুসলমানরা যেখানে মেজরিটি সেখানে সমাজসংস্কার তত কঠিন নয়। নারীপ্রগতি তত মন্থর নয়। সময় এসেছে যখন আমাদের পার্টিশনবিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের ধারণা হিন্দুরা এইজন্যেই অখণ্ড ভারত

চায় যে সেখানে তারাই মেজরিটি। মাইনরিটি হলে তারাও পার্টিশন চাইত। সে ধারণা নেহাৎ ভুল নয়। বাংলাদেশে হিন্দুরা মাইনরিটি বলে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও কতক লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ দু'ভাগ হলেই হিন্দুর দিক থেকে মঙ্গল। আমি তো বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের বাইরে। এখানকার লোকে কী ভাবছে তা এতদিন আমার ঠিক জানা ছিল না। এখন জানতে পাচ্ছি। হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন আজ বাঙালীকে আচ্ছন্ন করেছে।" সোনাদি গালে হাত দিয়ে বলেন।

"বাঙালী হিন্দু এখন বাপুর দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে। তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে চরমপন্থী নেতাদের দিকে তাকাবে। তাদের কেউ বা দক্ষিণপন্থীর চরম, কেউ বা তার বিপরীত, বামপন্থীর চরম। নৈতিকতার কথা কেউ ভাবতে চান না। রাজনীতি ভিন্ন আর কোনো গণনা নেই। সে রাজনীতিও ত্যাগের রাজনীতি নয়। ক্ষমতার রাজনীতি। সত্যাগ্রহী খুঁজতে হলে দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে খুঁজতে হবে। গান্ধীজী আজ বাংলাদেশে এক অচল মুদ্রা। যদি না তিনি নোয়াখালীতে একটা ভোজবাজি দেখান।" সৌম্যর মন খারাপ।

"কী জানি ভাই, আমার তো বিশ্বাস হয় না যে নোয়াখালীর প্রান্তরেই হবে সেই যুদ্ধ যা একহিসাবে ভারতের জন্যে যুদ্ধ। যাতে অংশগ্রহণ করতে এখানে আমার আসা। এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণই আমি দেখতে পাচ্ছিনে তেমন কোনো যুদ্ধের।" সোনাদি বলেন সংশয়ের স্বরে।

"হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বাপু অমন কথা। তাঁর উক্তির তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেননি। তাঁর মনে যা ছিল তা গণসত্যাগ্রহ নয়। গণসত্যাগ্রহ হলে কার বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ? মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে? তার উত্তরে মুসলিম লীগ জেহাদ ঘোষণা করত না? বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে? তার নীট ফল কী হতো? ব্রিটেনের অপসরণ নয়, কংগ্রেসেরই অপসরণ। ওদিকে বল্লভভাই হুঙ্কার ছাড়ছেন, তরবারির সঙ্গে মোকাবিলা করবে তরবারি। অর্থাৎ হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসা। বাপু কি গণসত্যাগ্রহ করতে গিয়ে গণহত্যা ডেকে আনবেন? তা হতে পারে না, সোনাদি। তাঁর উক্তির প্রকৃত অর্থ তাঁর নোয়াখালী অভিযান হচ্ছে মুসলিম জনগণের হৃদয়জয়ের অভিযান। তাদের যদি অন্তঃপরিবর্তন হয় তবে তাদের নেতাদেরও অন্তঃপরিবর্তন হবে। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সমাধানে উপনীত হবেন। কেউ জয়ী হবে না, কেউ পরাজিত হবে না। জয় হবে সত্যের। সত্যটা এই যে হিন্দু মুসলমান একই মায়ের সন্তান। যে মায়ের নাম ভারতমাতা তথা বঙ্গমাতা।" সৌম্য ব্যাকুলভাবে বোঝায়।

"ওঃ এই কথা। তুমি কি মনে করো জিন্না সাহেব এতদূর এগিয়ে কী পাবেন তা না জেনে পিছু হটবেন? তিনি পাকিস্তানের জন্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। পাকিস্তান না পেলে তিনি লড়াই বন্ধ করবেন না। যেমন স্বাধীনতা না পেলে বাপুও লড়াই বন্ধ করবেন না। বাতাসে বারুদের গন্ধ। এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংস হবে না। জয়প্রকাশ, রামমনোহর, অরুণা ও তাদের দলবল ওৎ পেতে বসে আছে কখন আরেক দফা লড়াই বাধবে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই। সর্দারজী অবশ্য বলছেন ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াই এখন কাবার। কিন্তু বাপু কি সেকথা বলেছেন? তাঁর মনে কী আছে তা কে বলতে পারে? যতদূর বুঝতে পারি, তিনি অসময়ে কিছু করবেন না। এখন ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় নয়। সেটা আসবে কংগ্রেস নেতারা যখন গদী ত্যাগ করে আবার তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তার সম্ভাবনা কি নেই?" সোনাদির জিজ্ঞাসা।

সৌম্য স্বীকার করে, "আছে। সরকার চালাবার জন্যে কংগ্রেস নেতারা বড়লাটের শাসন পরিষদে যাননি। কথাবার্তা চালাবার জন্যেই গেছেন। কথাবার্তা যদি সফল না হয় তবে পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস নেতাদের তূণে ও ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। আর যা আছে তা বাপুর তূণে। বাপু তাঁদের তাড়া দিতে চান না। সময় দিতে চান। ব্রিটিশ সরকারকেও। তাড়া যিনি দিচ্ছেন তিনি জিন্না সাহেব।

বেশী দেরি হলে মুসলিম লীগ সদস্যরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যোগ দেবেন। আলাপ আলোচনা সেইখানে বসেই হবে। কংগ্রেস নেতারা সেটা চান। তিনি সেটা চান না। সময় তাঁর দিকে নয়। তবে ইংরেজের দিকেও নয়। বাপুর মুশকিল সেইখানে। তিনি অপেক্ষা করলেও কেউ অপেক্ষা করবে না। তিনি একঘরে।"

।। নয় ।।

সোনাদির মতো আহুত, অনাহুত, রবাহুত অভিযাত্রীদের সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। তাঁদের সকলের ধারণা নোয়াখালীতে দাণ্ডী অভিযানের মতো একটা কিছু হতে যাচ্ছে। গান্ধীজী চলবেন আগে আগে, অন্যেরা তাঁর পিছু পিছু। সরকার ধরে ধরে জেলে পুরবে, পুলিশ লাঠি চালাবে, গুলীও চালাতে পারে। দুনিয়ার লোক দেখবে, দেখতে ছুটে আসবে, বার্তা ছড়িয়ে পড়বে দেশে বিদেশে। যুদ্ধের বার্তা। না, ঠিক যুদ্ধের নয়, যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় সত্যাগ্রহের, যুদ্ধের নৈতিক বিকল্পের। যার নাম মরাল ইকুইভ্যালেন্ট অভ্ ওয়ার।

কিন্তু যুদ্ধে তো একটা প্রতিপক্ষ থাকে। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কে? মুসলিম লীগ সরকার? তাঁরা তো নিজেরাই বিব্রত। তাঁদের মতে নষ্টের গোড়া গোলাম সারওয়ার বলে এক ব্যক্তি, তাকে লীগের টিকিট দেওয়া হয়নি বলে সে আইন সভায় যেতে পারেনি, সেই আক্রোশ থেকে হিন্দুবিদ্বেষী কার্যকলাপে নেতৃত্ব করছে। যাতে শহীদ সুহরাবর্দীর বদনাম হয়। গান্ধীজী সুহরাবর্দীর ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করেন। আর সুহরাবর্দী ও পুলিশ দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখেন। নইলে কে জানে গোলাম সারওয়ারের গ্যাং হয়তো তাঁকেই খুন করে বসত।

না, শহীদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যায় না। অভিযানটা তবে কার বিরুদ্ধে হবে? কেনই বা হবে? গান্ধীজী চান হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি। সেটা যদি তিনি স্থাপন করতে পারেন তবেই তাঁর জয়। কাদের উপরে জয়? যারা অপ্রীতির সুযোগ নিয়ে দেশ ভাগ করতে চায় তাদের উপরে। তাঁর উদ্দেশ্য দেশভাগ নিবারণ। উপায় সম্প্রীতি পুনঃস্থাপন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে খটকা বাধে। এঁদের উদ্দেশ্য কি পাকিস্তান অর্জন না পার্টিশন বর্জন? নির্ভরযোগ্য উত্তর তিনি কারো কাছেই পান না, শহীদের কাছেও না। সবাই জিন্নাসাহেবের ভয়ে তটস্থ। জিন্না হলো গুজরাটী 'ঝীণা'র ইংরেজী রূপান্তর। তার অর্থ 'ছোট'। সেই জিন্নাই হয়েছে এখন 'জিন্নাহ্'। যেমন আল্লাহ্। আরবী নয়, আরবীতর। আল্লাহ্ ও রসূলের পরে জিন্নাহ্। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে ফজলুল হকের মতো পাকা ঘুঁটিও কেঁচে গেছেন। ঝগড়া নয়, মতান্তর থেকে শহীদ সুহরাবর্দীরও ত্রিশঙ্কু দশা। মাঝখান থেকে নাজিমউদ্দীনের প্রভাববৃদ্ধি।

গান্ধীজী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যে উপায়ের চিন্তা করেছিলেন সে উপায় ছেড়ে তাঁকে অন্য উপায় খুঁজতে হচ্ছে। এর নাম অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলা। রবাহুতেরা একে একে সরে পড়ছেন। অনাহুতেরা আরো কিছুদিন পায়চারি করছেন। সোনাদিও তাঁদের একজন। সৌম্যকে বলেন, "ভাই, আমাদের বাপুর মতো মহাপুরুষ হাজার বছরে একজন জন্মান। সামনের হাজার বছরে তাঁর মতো একজন জন্মাবেন মনে হয় না। নোয়াখালীর মতো একটা অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে কেন তিনি বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবন করে আয়ুক্ষয় ও বলক্ষয় করছেন? একজন মুসলমানেরও কি মন ভেজাতে পারছেন?"

"এর কারণ বিহারের হিন্দুরা তিনগুণ কি চারগুণ বদলা নিয়ে এখানকার মুসলমানদের মনটাকে পাথর করে দিয়েছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলে উপসর্গের চিকিৎসা না করে রোগের চিকিৎসা করাই শ্রেয়। নিতে হবে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ গ্রহণ বা জিন্নার শর্তে পার্টিশন।" সোনাদি বলেন।

"সেই কঠিন সিদ্ধান্তটা কাদের খরচে হবে, সোনাদি? আমি তো ভেবে দেখছি ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মেনে নিলে আসামের হিন্দু ও ট্রাইবালদের আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের খরচে। মুসলিম লীগের দাবী মেনে নিলে বাংলাদেশের হিন্দুদের, আসামের হিন্দু ও ট্রাইবালদের, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের, সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুদের আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের খরচে। মাঝামাঝি একটা সিদ্ধান্ত সম্ভব। সেটা কিন্তু কংগ্রেসের একক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। দেশভাগের শর্ত হবে প্রদেশভাগ। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ, প্রথমবার পাঞ্জাবভঙ্গ, আসামের পুনর্বিন্যাস। মুসলিম জনমত যে এর অনুকূল হবে তা নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ তো প্রতিকূল হবেই। কলকাতা নিয়েও টাগ্-অভ্-ওয়ার বাধবে। লাহোর নিয়ে তো রীতিমতো ওয়ার। প্রদেশভাগ এক বিপজ্জনক সমাধান। মাথাব্যথা সারাতে গিয়ে মাথা কাটা। রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। বাপু কিছুতেই সায় দেবেন না, হয়তো সরাসরি বিরোধিতা করবেন। না, সত্যাগ্রহ নয়। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ইস্যু। আদৌ নৈতিক ইস্যু নয়। মুসলিম মাইনরিটির সঙ্গে তিনি লড়তে আগ্রহী নন, যদি মুসলিম মাইনরিটি এই ইস্যুতে লড়তে চায়। মুসলিম মাইনরিটিকে কাছে টেনে নিতেই হবে। ভালোবাসা দিয়ে। দরদ দিয়ে। সেইজন্যেই তিনি নোয়াখালীতে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যাচ্ছেন। মুসলিম মাইনরিটি মানে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মাইনরিটি। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মেজরিটি। তাই স্থানীয় হিন্দু মাইনরিটিকেও অভয় দিতে হচ্ছে। তারা এখন এমন ডিমরালাইজড যে তাদের পাহারা দেবার জন্যে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। সেটা তাঁর অনুরোধে নয়, লাটসাহেবের আদেশে। জওয়ানরা এসে পড়েছে দেখছি। এটা তাঁর ইচ্ছায় নয়, বড়লাটের নির্দেশে। ইংরেজরা তো এখনো ক্ষমতার হস্তান্তর করেনি। চরম দায়িত্ব এখনো তাদেরই। মুসলমানদের এটা বোঝানো শক্ত। একই সঙ্গে হিংসা আর অহিংসা দেখে তারা বাপুকেই সন্দেহ করছে। তাই বিশ্বাস ফিরে আসছে না। বাপুর উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। ওদিকে লীগপন্থীরা রব তুলেছে, আগে বিহারে যান। সেখানকার মুসলমানদের বাঁচান। কিন্তু কী করে এখানকার কাজ আধখানা রেখে যাবেন? কার উপর দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। এর উত্তর আমি তো খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি জানো?" সৌম্য সুধায়।

"না, আমারও জানা নেই। আমি বহুকাল সেবাগ্রামবাসিনী। আমি স্বস্থানেই ফিরে যেতে চাই। সেখানকার কাজ পড়ে রয়েছে। আমার কর্তাও বার বার লিখছেন ফিরে যেতে। নোয়াখালীকে স্বাভাবিক করতে কে জানে কতকাল লাগবে। দু' একমাসের মামলা নয়। বাপু শ্রীরামপুর ছাড়লে আমিও বাংলাদেশ ছাড়ব। তুমিই আমার জায়গা নাও।" সোনাদি সাধেন।

"তা কী করে সম্ভব, সোনাদি? আমার আশ্রম কে দেখবে? বাপুও বলছেন আমাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে। পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা এখন অগ্নিগর্ভ। নোয়াখালী কি একটি? নোয়াখালী অনেকগুলি। আমরা যে যেখানে আছি সে সেখানে থেকে বাপুর কর্মপন্থা অনুসরণ করব। রাজনীতি আমাদের জন্যে নয়। তবে সত্যাগ্রহের ডাক এলে সাড়া দেব।" সৌম্য মনে মনে প্রস্তুত।

"বাপুর জীবনে এত বড়ো চ্যালেঞ্জ আর আসেনি। চ্যালেঞ্জটা জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। কেমন করে এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভায়োলেন্স ছিল স্টেট ভায়োলেন্স। তার সঙ্গে কেমন করে মোকাবিলা করতে হয় বাপু ভালো করেই জানেন। কিন্তু একেবারেই জানেন না কেমন করে মাস ভায়োলেন্সের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো ক'জন ব্যক্তি তিনি দেখেছেন যে তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবেন? বললে শুনছে কে? বীরের অহিংসা বা সাহসীর অহিংসা বলতে যদি স্টেট ভায়োলেন্সের সামনে দাঁড়ানো বোঝায় তবে তার পরীক্ষা কয়েকবার হয়েছে। পরেও হতে পারে। পুলিশ জানে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভায়োলেন্সের জন্যে জবাবদিহি

করতে হবে। তার উপরে গভর্নমেন্টের কন্ট্রোল আছে। কিন্তু উন্মত্ত জনতার উপর অঙ্কুশ চালাবে কে? তার সামনে দাঁড়ালে নির্ঘাত মৃত্যু। তাই বুনো ওলের উত্তর বাঘা তেঁতুল। মুসলিম মাস ভায়োলেন্সের উত্তর হিন্দু মাস ভায়োলেন্স। যেমন দেখা গেল কলকাতায়। যেখানে তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তাদের জোর যেখানে বেশী সেখানে তারা বদলা নিয়েছে। সেটা পাল্টা অন্যায়। বাপুকে এসব ভাবতে হচ্ছে।" সোনাদি বলেন।

"ভাবতে হচ্ছে আমাকেও। আমার মতো সবাইকে। যারা একচক্ষু হরিণের মতো কেবল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্টেট ভায়োলেন্সই দেখতে অভ্যস্ত। যাদের কারবার পুলিশের সঙ্গে, ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে, মিলিটারির সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাঝে মাঝে বেধেছে, কখনো গোহত্যা নিয়ে, কখনো মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। সেসব নিতান্ত অরাজনৈতিক। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশানো দাঙ্গাহাঙ্গামা একটা নিখিল ভারতীয় দলের দাবী আদায়ের হাতিয়ার হতে এই প্রথম দেখলুম। তাও যদি দুটো একটা শহরে সীমাবদ্ধ থাকত! এ যে ক্রমশই শহর থেকে গ্রামে, এক প্রদেশ থেকে অপর প্রদেশে, কয়েক জন থেকে বহু জনে সংক্রামিত হচ্ছে। কোথাও এক জায়গায় গণ্ডী না টানলে সর্বজনে প্রসারিত হবে। দেখতে দেখতে পূর্ববঙ্গ হয়ে যাবে হিন্দুবর্জিত বা পাণ্ডববর্জিত। তেমনি, বিহার মুসলিমবর্জিত বা কৌরববর্জিত। শেষ অঙ্কে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করে পাণ্ডবরা কি সুখী হয়েছিলেন? সুখী হলে মহাপ্রস্থান করতেন কেন? আর কী অপরিমিত লোকক্ষয়। গীতায় শ্রীভগবান লোকক্ষয়ের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। যোদ্ধারা নিমিত্তমাত্র। আমরা কিন্তু একালের লোকক্ষয়ের নিমিত্ত হতে নারাজ। তেমন কোনো অবতারকেও দায়িত্ব দিতে পারছিনে। বাপু তেমন কোনো অবতার নন। জিন্না সাহেব হয়তো একজন নবী। দায়িত্ব নিতে চান তিনিই নিন। কিন্তু তৃতীয়পক্ষের শাসনকালে নয়। আমরা তৃতীয়পক্ষকেই দায়ী করব আর তার বিরুদ্ধেই আরো একদফা লড়ব, যদি দ্বিতীয়পক্ষ নিরস্ত না হয়। সোজাসুজি মুসলিম লীগের সঙ্গে নয়। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। খুঁটিকেই হটাতে হবে। তারপর দেখা যাবে মেড়ার দৌড় কতদূর।" সৌম্য বলতে বলতে তেতে ওঠে।

"না, না। দেশ প্রস্তুত নয়। জনগণ প্রস্তুত নয়। কংগ্রেস প্রস্তুত নয়। বাপুও কি প্রস্তুত? তিনি দু'বছর সময় চান। কিন্তু ঘটনা ততদিন সবুর করলে তো?" সোনাদি বলেন।

সৌম্য চুপ করে শোনে। তিনি বলে যান, "তা ছাড়া ইংরেজরা তোমাদের চেয়ে কম ধূর্ত নয়। ওদের সঙ্গে আরো এক দফা লড়াইয়ে নেমে তোমরা দেখবে হিন্দুর কান মুসলমানের হাতে আর মুসলমানের কান হিন্দুর হাতে। ইংরেজরা কাছে পিঠে নেই। বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে কেন মিছিমিছি ওয়াটারলু ডেকে আনা? সময়ে দাঁড়ি টানাই বুদ্ধিমানের কাজ। মেনে নেওয়া উচিত যে এই পর্যন্ত সম্ভব, এর বেশী সম্ভব নয়। স্বাধীনতা পেলেই আমরা কৃতার্থ। হিন্দু মুসলিম একতা দূর অস্ত্। অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে হারানো ভুল। আমরা জানি আমাদের দৌড় পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি নয়। স্থানীয় সমর্থন নেই। নোয়াখালী থেকে পুলিশ সরিয়ে নিলে, মিলিটারি সরিয়ে নিলে বাপুকেও সরে যেতে হবে। আমরা ওঁকে পাহারা দিয়ে বাঁচাতে পারব না। শাহাদত এর উত্তর নয়। রাজনৈতিক সমাধানই খুঁজতে হবে। দিল্লীতে বসে নেতারা সেই চেষ্টাই করছেন। তুমি তোমার আশ্রমে ফিরে যাও, আমিও আমার আশ্রমে ফিরে যাই। বাপুরও ইচ্ছা নয় যে গ্রাম পরিক্রমার সময় বেশী অনুচর তাঁর সঙ্গে থাকে। তাঁর মটো, একলা চল রে। তাঁর শক্তি যা তা ভিতর থেকেই আসছে। দলবল থেকে নয়। দলবল যেন ক্রাচ। তিনি ক্রাচ বগলে করে হাঁটবেন না। দলবলকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে পাঠাচ্ছেন। তাতে জনসংযোগ সুগম হবে। তারাও শিখবে কেমন করে বাপুর সাহায্য না নিয়ে সাম্প্রদায়িক অনর্থের সম্মুখীন হতে হয়। দলের মেয়েদেরও তিনি সে শিক্ষা দিচ্ছেন।"

মাত্র চারজনকেই গান্ধীজী সহযাত্রী করে পদযাত্রা করেন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বহু ব্যক্তি

নোয়াখালীতে এসে তাঁর সহকর্মী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁদের সবাইকে লেখেন যে যার নিজের জায়গায় থেকে গঠনের কাজ করতে। নিতান্তই যদি কেউ আসতে চান তবে সারা জীবন নোয়াখালীতে থাকতে প্রস্তুত হয়ে আসবেন। তিনি নিজেও তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। ব্যর্থতা বরণের চেয়ে মৃত্যু বরণই তাঁর পক্ষে শ্রেয়। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

নির্মলকুমার বসু, মনু গান্ধী, পরশুরাম ও রামচন্দ্রন্ এই চারজনকে তিনি বেছে নেন, সঙ্গীদের আর সবাইকে হয় ফেরৎ পাঠান, নয় নোয়াখালীর অন্যান্য স্থানে মোতায়েন করেন। সোনাদিকে তিনি সেবাগ্রামে ফিরে যেতে বলেন। সোনাদি যাবার সময় সৌম্যকে বলেন, " তোমারও উচিত জুলির কাছে ফিরে যাওয়া। স্ত্রীরা এই সময়টা স্বামীদের সান্নিধ্য চায়।"

টেলিগ্রাম পেলেই যাব। আপাতত আশ্রমে ফিরে না গেলে নয়। ওরাও তো অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"ভালো কথা, তুমি কি যূথিকা মল্লিক নামে কোনো মেয়েকে চেনো? বাপুকে আকুলভাবে লিখেছে নোয়াখালী থেকে হিন্দুর বৌঝিদের সবাইকে নিয়ে মোজেসের মতো দেশত্যাগ করতে। বাপু আমার উপর ভার দিয়েছেন ওকে জানাতে যে হিন্দু পুরুষদেরই পৌরুষের পরীক্ষা দিতে হবে। তাদের বৌঝিদের যে কোনো উপায়ে রক্ষা করতে হবে, হয়তো বা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হবে। পলায়ন কাপুরুষের কাজ।" সোনাদি বলে যান।

"ওর স্বামী মানস আমার প্রিয় বন্ধু। বাপুর বক্তব্য আমি ওকে জানিয়ে দেব। দেখাও করতে পারি। কাছাকাছি জেলায় থাকে।" সৌম্য সোনাদির কাছ থেকে বিদায় নেয় ও তাঁকে বিদায় দেয়।

বঙ্কিমদার প্রযত্নে আশ্রম ঠিকই চলছিল। কিন্তু তিনিও স্বস্থানে চলে যান। তাই অগোছালো হয়ে পড়ে। সৌম্য আবার খেই হাতে নেয়। কিন্তু জুলির অভাবে সব শূন্য মনে হয়।

"দিদিমণি কোথায়? কেমন আছেন? কবে আসবেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন শুনতে হয় সকলের মুখে। কেউ কেউ আরো অন্তরঙ্গ ভাবে সুধায়, "কবে হবে?" সৌম্য বলে, "আমি কি ডাক্তার, না জ্যোতিষী? যতদূর বোঝা যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। তার পরে ওদের নিয়ে আসব।"

এখন থেকেই 'ওদের'।

মুস্তাফীরা সৌম্যকে দেখে দারুণ খুশি। জুলির যাওয়ার পরে মিলিরও মন লাগে না। সে চলে যায় তার ছেলের জন্যে মনের মতো স্কুল খুঁজতে। ওকে ভারতেই পড়াবে। বড়ো হলে পরে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে পাঠাবে।

মুস্তাফী বলেন, "জুলিকেও নিয়ে এলে পারতে। আমরা তো রয়েছি। আমাদের সেবাপ্রতিষ্ঠান কলকাতার যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে।"

"ওর মা ওকে ছাড়বেন না। আর ওরও ইচ্ছা মায়ের কাছে থাকা। আর আমিও তো কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। পূর্ববঙ্গের যখন যেখানে গোলমাল বাধবে তখন সেখানে ছুটতে হবে। আশা করি আর বাধবে না। তবু তৈরি থাকতে হবে।" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

"আমরা আপাতত নিশ্চিন্ত। এখানে আবার ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। মিস্টার ক্যামেরন জবরদস্ত হাকিম। দুই পকেটে দুটো রিভলভার নিয়ে বেরোন। তাঁর আশঙ্কা কংগ্রেস যা দাবী করেছে তা না পেলে ফের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে নামবে। একটা রিভলভার কংগ্রেসওয়ালাদের জন্যে। তেমনি, লীগ যা দাবী করেছে তা না পেলে জেহাদ ঘোষণা করবে। অন্য রিভলভারটা লীগওয়ালাদের জন্যে। ভয়ে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে না। তবে আমার সঙ্গে খুব ভাব।" মুস্তাফী বলেন।

"হাঁা, পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হচ্ছে। কিংবা

ইউরোপীয়ান এস. পি.। যাতে হিন্দুদের মনের জোর বাড়ে। হিন্দুদের এখন যে হাল তাতে তারা সাহেব তাড়ানো দূরে থাক সাহেবকেই আঁকড়ে ধরবে। মুসলিম অফিসারদের উপর হিন্দুদের আস্থা নেই। হিন্দু অফিসারদের উপর মুসলমানদের আস্থা নেই। ইউরোপীয় অফিসারদের উপরেই উভয়ের আস্থা। স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় এসেও হাত ফস্কে যাচ্ছে। গান্ধীজীর মন খারাপ। আমারও। আমরা কোন্ মুখে বলব আমরা এক নেশন? যখন হিন্দুরা বলছে পূর্ববঙ্গে একজনও হিন্দু নারী নিরাপদ নয়।" সৌম্য বলি বলি করে বলতে পারে না যে বিহারের মুসলমানদের মুখে শুনেছে সেখানে একজন মুসলিম নারীও নিরাপদ নয়।

"বিষম লজ্জার কথা। ঘেন্নার কথা। শেষে কিনা ইউরোপীয়ানরাই রক্ষক। ওরা কিন্তু ওদের মেমসাহেবদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।" মুস্তাফী বলেন।

"শুনতে পাচ্ছি আমাদের এখানকার হিন্দু ভদ্রলোকেরা নাকি তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।" সৌম্য জানতে চায় কথাটা কতদূর সত্য।

"ভুল শোননি। এক মাঘে শীত যায় না। আবার একটা কিছু বাধবে ভেবে সাহেবরা যা করছে হিন্দুরাও তাই করছে। ওদের ভারতত্যাগ, এদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ। কে কাকে অভয় দেবে?" মুস্তাফী সংশয় প্রকাশ করেন।

"আমি তো বুঝতেই পারছিনে মেমসাহেবরা কেন আগে ভাগে দেশে চলে যাচ্ছেন। আমরা কি কখনো তাঁদের কারো গায়ে হাত দিয়েছি?" সৌম্য বিচলিত।

"না, তোমরা অমন কাজ করনি। কিন্তু কেউ যদি অমন কাজ করে ওরা আগের মতো একজনের অপরাধে একশো জনকে দণ্ড দিতে পারবে না। সেটা জানার পর হিন্দু বা মুসলিম বা শিখ জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তখন কি হাজার জন মহিলার লাঞ্ছনার জন্যে এক লাখ জনকে দণ্ড দিতে পারবে? সে দণ্ডশক্তি আর নেই। ওরা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিচ্ছে।" মুস্তাফী ব্যাখ্যা করেন।

"তা নিক। আমরা বাধা দেব না। কিন্তু হিন্দু ভদ্রলোকদের কি বন্দুকের লাইসেন্স নেই? বন্দুক নেই? বেআইনী বন্দুক তো আজকাল অনেকের ঘরে। আত্মরক্ষার জন্যে বা নারীরক্ষার জন্যে বন্দুক ধরলে গান্ধীজী আপত্তি করবেন না। কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর বদলা নিলে নিন্দা করবেন। সেটা মহাপাপ।" সৌম্য তফাৎটা বোঝায়।

"আত্মরক্ষার জন্যে বা নারীরক্ষার জন্যে তুমি না হয় একবার গুলী চালালে। কিন্তু ওরা যদি দলবদ্ধ হয়ে দশটা গুলী চালায় বা শড়কি ছুঁড়ে মারে তা হলে তুমি কী করবে? শহরে তুমিও দলবল জোগাড় করতে পারো, কিন্তু গ্রামে তুমি নিঃসঙ্গ। ও ভাবে হিন্দুদের মানরক্ষা হবে না, সৌম্য। গান্ধীজী বাঙালী হিন্দুদের রাজপুত ঠাওরেছেন। তাই রাজপুতদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আমরা বহুকাল থেকে নিরস্ত্র। রাজপুতরা কোনো কালেই তা হয়নি। বন্দুক হাতে পেলেও চালাতে জানিনে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। আমাদের ভরসা পুলিশ আর মিলিটারি। তাদের উপর আস্থা না থাকলে শ্রীচরণ ভরসা। আমাকেও স্থানত্যাগ করতে হবে। অসংখ্য মুসলিম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আছেন। কিন্তু জেহাদের দিন তাঁরাও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আমার বা তোমার আর কোথাও যাবার জায়গা আছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান যে ডুববে।" মুস্তাফী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন।

"আমার আশ্রমেরও একই দশা হবে, আমি যদি অন্যত্র যাই। কিন্তু জাহাজ ডুবলেও আমি কাসাবিয়াঙ্কার মতো শেষপর্যন্ত খাড়া থাকব।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"আমিও কি খাড়া থাকতে চাইনে? এ বয়সে আর একটা সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব কোন্ মন্ত্রবলে? ডাক্তারি অবশ্য যে কোনো স্থানে করা যায়। কিন্তু আমি কি শুধুই ডাক্তার? তাতেই কি আমার জীবনের সার্থকতা? আর আমার নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটিকেই বা কার হাতে সঁপে দিয়ে যাব?

সরকার নিজের হাতে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন আশা করি। কিন্তু সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা অন্য জিনিস। হিন্দু নার্সরা কেউ থাকতে চাইবে না। মুসলিম নার্স কোথায়? খ্রীস্টান নার্সই ভরসা।" মুস্তাফী কতকটা সান্ত্বনা পান।

"আপনি কি মনে করেন গান্ধীজীর মিশন সফল হবে না? হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না?" সৌম্য সুধায়।

মুস্তাফী একটু চিন্তা করে উত্তর দেন, "গান্ধীজীকে এককালে বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রোফেটের মতো মান্য করত। কিন্তু এখন আর করে না। ওদের বিশ্বাস দেশের স্বাধীনতার নাম করে তিনি যার জন্যে লড়ছেন তা নিজের দলের ক্ষমতা। সেটা প্রধানত হিন্দুদের দল। বাংলাদেশে সেই হিন্দুরা জমিদার, মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মুসলমানদের জন্যে তারা বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকার করবে না। যখনি প্রজা ও খাতকের প্রতি ন্যায়ের খাতিরে আইন সংশোধনের প্রস্তাব উঠেছে তখনি কংগ্রেস সদস্যরা বাধা দিয়েছেন। প্রজা ও খাতকরা প্রধানত মুসলমান। সুতরাং কংগ্রেসের ভোট মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভোট। গান্ধীজী কি এসব জানেন না? আগে ইংরেজ যাবে, তার পরে মুসলমানরা যা পাবার তা পাবে, এটা ওদের স্তোক দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। গদীতে গ্যাঁট হয়ে বসলে কংগ্রেস জমিদার ও মহাজনদের পক্ষই নেবে। আর হিন্দু মধ্যবিত্তরাই চাকরি বাকরিতে সিংহের ভাগ পাবে। জমিদারি ও মহাজনি উঠে না যাওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা কংগ্রেসের উপর প্রসন্ন হবে না। সুতরাং গান্ধীজীর উপরও না। একটা বড়ো গোছের অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে কংগ্রেসের উপর মুসলমানদের আস্থা জন্মাবে না। গান্ধীজীর উপরেও না। ওদের অবশ্য পিটিয়ে সিধে করা যায়। হিন্দু তথা মুসলিম জমিদারগণ এতদিন সে কর্ম করেছেন। কিন্তু তাদের মন পাওয়া অন্য জিনিস। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির বদলে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেও মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। কারণ পাকিস্তান হলে হিন্দু শোষক ও শাসক শ্রেণীর হাত থেকে ওরা নিষ্কৃতি পাবে। গান্ধীজী তো সত্যের পূজারী। তিনি কি হিন্দুদের বলতে পারছেন না যে তোমরা প্রজা ও খাতকদের সঙ্গে সন্ধি করো? নয়তো সময় থাকতে সরে পড়ো? জমিদারি ও মহাজনি সরকারের হাতে যাক। ইংরেজরা যদি এত বড়ো সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারে তোমরাই বা কেন তার চেয়ে ঢের ছোট জমিদারি বা তেজারতি ত্যাগ করতে পারবে না? তাঁর ওই গঠনমূলক কর্মে নোয়াখালীর ভবী ভুলবে না, সৌম্য। আমার সেবামূলক কর্মেও এখানকার ভবী ভুলছে না।" মুস্তাফী বাস্তববাদী।

সৌম্য বিমর্ষ হয়। "তা বলে পলায়ন বাপু সমর্থন করেন না। গণপলায়ন তো নয়ই। হিন্দুদের দিকেও সত্য আছে। তাদের সবাই কিছু জমিদার বা মহাজন বা মধ্যবিত্ত নয়। বেশীর ভাগই চাষী বারুই জেলে তেলী মাঝি মাল্লা কামার কুমোর ধোপা নাপিত শাঁখারী কাঁসারী সোনার ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষ। তা ছাড়া দিন মজুর। শ্রেণী শত্রু বলে কী করে এদের চিহ্নিত করা যায়? এরা চলে গেলে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ধসে পড়ে। পাকিস্তান যদি এদের রাখতে না পারে তবে তার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। জিন্না সাহেব রাজনীতি করতে গিয়ে অর্থনীতিকে ডোবাতে যাচ্ছেন। গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি দিয়ে ডুবন্ত অর্থনীতিকে ভাসাতে চাইছেন। আজকের মুসলমান যদি এটা না বোঝে কালকের মুসলমান নিশ্চয়ই এটা বুঝবে। ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু নেই। পাকিস্তানও শেষ কথা নয়। গণ পলায়নের পর গণ প্রত্যাবর্তনও সম্ভবপর। আপনাকেও ফিরে আসতে হতে পারে। রুগীরাই সাধাসাধি করবে।" সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

"আমরা না গেলে মুসলিম ডাক্তাররা সুযোগ পাবেন না। ওঁদের খাতিরেই আমাকে সরে যেতে হবে।" মুস্তাফী বলেন।

মোহিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বলেন, "আমিও চোখে অন্ধকার দেখছি। পাকিস্তানের

দাবী এখন শিক্ষিত মুসলমান মহলে নিবদ্ধ নয়। গ্রামে গঞ্জে হাটে ঘাটে ওই একই দাবী। আমার আফসোস এই যে জিন্নার মতো অত বড়ো একজন প্রতিভাকে আমরা ঠিকমতো চিনতে পারলুম না। টিলক আর জিন্না এই দুই মহারথী না থাকলে ১৯১৬ সালে লখনউতে কংগ্রেস লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতো না, সেই চুক্তি অনুসারে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া স্থির হয়। তার বিনিময়ে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে হিন্দুদেরও দেওয়া হয় ওয়েটেজ। প্রাদেশিক স্তরে সেই মর্মে বোঝাপড়া না হলে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস সুগম হতো না। স্বীকার করতেই হবে জিন্না সাহেবের কুশলতা। প্রাদেশিক স্তরের পরবর্তী স্তর হলো কেন্দ্রীয় স্তর। সেখানে যখন রিফর্মসের সময় আসবে তখন আরো একদফা ওয়েটেজ বিনিময়ের প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু কী করে? কেন্দ্র তো মাত্র একটাই। সেই এক কেন্দ্রকে যদি দুই কেন্দ্রে পরিণত করা যেত তা হলে কেন্দ্রীয় স্তরেও ওয়েটেজ বিনিময় সম্ভবপর হতো। এই চিন্তা থেকেই পাকিস্তানের দাবী। গিভ অ্যাণ্ড টেক বলতে ওয়েটেজ বিনিময়ই বোঝায়। কিন্তু কেন্দ্র যদি বিভক্ত না হয়, অবিভক্তই থাকে, তবে জিন্না সাহেবের বিকল্প দাবী হবে প্যারিটি। হিন্দু মুসলিম প্যারিটি। নিদেনপক্ষে বর্ণ হিন্দু মুসলিম প্যারিটি। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তায় পাকিস্তানও নতুন। প্যারিটিও নতুন। এসব তত্ত্ব শুনে আমরা হকচকিয়ে যাই। কিন্তু খোলা মন নিয়ে বিবেচনা করলে বুঝবে নতুন বলে এগুলি অহেতুক নয়। তাই যদি হতো তবে বেঙ্গল পার্টিশনের পাল্টা দাবী ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের মুখে শোনা যেত না। এই উদ্ভট দাবী কংগ্রেসও সমর্থন করবে না, লীগও সমর্থন করবে না। জিন্না সাহেবের যুক্তিটা হলো দুই কেন্দ্র না হলে গিভ্ অ্যাণ্ড টেক হবে কী করে? বিকল্পে প্যারিটিও তো একপ্রকার গিভ্ অ্যাণ্ড টেক। তাতে দুই পাল্লা সমান থাকে। হিন্দু মুসলমান হবে সমান সমান। কংগ্রেস লীগ হবে সমান সমান। তা হলেই না দুই পার্টনারের স্থায়ী পার্টনারশিপ হবে। পার্টনারশিপ না হলে পার্টিশনই হোক। সেটাও স্থায়ী বন্দোবস্ত। মাঝামাঝি যেসব সমাধান বাতলানো হচ্ছে সেসব কারো মনঃপূত নয়। না কংগ্রেসের, না লীগের। না গান্ধীর, না জিন্নার। আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে তিন-চতুর্থাংশের সঙ্গে এক-চতুর্থাংশের প্যারিটি কেমন করে সম্ভব? তেমনি, এটাও আমার বুদ্ধির অগম্য দেশ বিভক্ত হলে প্রদেশ কেমন করে অবিভক্ত থাকবে? পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ, বাঙালী হিন্দু, এমন কী স্বর্গ হাতে পাবে যার জন্যে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পছন্দ করবে? এমনধারা বন্দোবস্ত ইংরেজের সঙ্গে মুসলিম লীগের হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের হতে পারে না। কংগ্রেস লীগ চুক্তি যদি অত্যাবশ্যক হয় তবে এই মর্মে বিধিবদ্ধ হতে পারে না। আর ইংরেজ লীগ চুক্তি যদি হিন্দু শিখের স্বার্থবিরোধী হয় হিন্দু শিখ ইঙ্গ-মুসলিম আঁতাতের সঙ্গে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়বে। সে লড়াই অহিংস হবে না। আমি অবশ্য হিন্দু-মুসলিম আঁতাতের পক্ষপাতী। কিন্তু আজকের বঙ্গদেশে আমার মতো ফসিল আর কে আছে? ইংরেজরা শুনছি যাবার মুখে। দেখা যাক ওরা শ্মশান না গোরোস্থান কী রেখে যায়। বোধহয় দুই। তাতে তাদের লাভই বা কী হবে?"

সৌম্য স্তব্ধ হয়ে শোনে। বলে, "পাকিস্তানও না, প্যারিটিও না, তৃতীয় পন্থা যদি কিছু থাকে সেইটেই এখন আমাদের ধ্যান।"

"তৃতীয় পন্থা?" মোহিনীবাবু উত্তর দেন, "তৃতীয়পক্ষের আরো দশ বিশ বছর অবস্থান। আমি জানি তোমাদের এটা ভালো লাগবে না। ইংরেজ যদি থেকে যায় তোমরা আবার এক গণ আন্দোলন করবে। তখন বাধবে গণ খুনোখুনি।"

।। দশ ।।

অশেষ ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় করে নিয়ে যূথিকাকে চিঠি লেখে সৌম্য। সেইসঙ্গে মানসকেও দু'চার কথা।

"স্নেহের বোন যূথী, বাপুকে যে চিঠি তুমি লিখেছিলে সে চিঠি তিনি সোনাদির হাতে দিয়ে বলেন উত্তর দিতে। সোনাদিরও সময় ছিল না, তাই তিনি দিয়ে যান আমার হাতে। তোমার হৃদয়টি কোমল, তুমি সেই হৃদয় দিয়েই সমস্যার সমাধান খুঁজেছ। কিন্তু এ বড়ো কঠিন সমস্যা, বোন। মস্তিষ্কেরও সাহায্য নিতে হবে। নোয়াখালীতে যা ঘটেছে অন্যান্য জেলাতেও তা ঘটতে পারত। এখনো পারে। আর তার বিপরীতে বিহারেও তা ঘটেছে। সেখানকার মাইনরিটির উপর মেজরিটির বদলা। সুদ সমেত। চক্রবৃদ্ধি হারে। আপাতত সেটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু আগুন নেবেনি, ধোঁয়াচ্ছে।

বাপুকে তুমি বলেছ মোজেসের মতো নোয়াখালীর নারীদের নিয়ে এক্‌সোডাস করতে। কিন্তু, বোন, নারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষরাই বা কেমন করে ঘরসংসার করবে? সারাদিন চাষবাস করে যখন ঘরে ফিরবে তখন রেঁধে রাখবে কে? সবাই কি আমার মতো আশ্রমিক হবে নাকি? নারী যেখানে যাবে পুরুষও সেখানেই যাবে। নোয়াখালী হিন্দুশূন্য হবে। তারপর সেই ছিন্নমূল নরনারীকে কোথায় রোপণ করব আমরা? কোথায় তারা মূল পাবে? ঘরবাড়ী জুটতে পারে, জমিও মিলতে পারে, কিন্তু সেই পরিবেশ, সেই ভাষা, সেই ঐতিহ্য, সেই উত্তরাধিকার? মানুষ মনোজীবী। সে কি কেবল মাছ ভাত খেয়ে বাঁচে? মাছের কথা যদি বলো মাছই বা কোথায় পাবে পূর্ববাংলার মতো? যাদের আমরা বাঁচাব তারা প্রতিদিন আমাদের শাপান্ত করবে কেন স্বস্থানভ্রষ্ট করেছি বলে।

তাদের স্বস্থানভ্রষ্ট না করে অভয় দিতে চেষ্টা করছেন বাপু। তার জন্যে নিজেই নোয়াখালীতে বছরের পর বছর থাকতে রাজী। তিনি দিল্লীতে রাজত্ব করতে চান না। সেবাগ্রামে ফিরে যেতেও ব্যগ্র নন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে সাহায্য করবার জন্যে বিস্তর লোক নোয়াখালী আসতে চান। বাপু তাঁদের জানিয়েছেন যে যাঁরা আসবেন তাঁরা সারা জীবন অতিবাহিত করবার জন্যে তৈরি হয়ে আসবেন। এ সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। পাকিস্তানী মুসলমানরা শুধু মেজরিটি হয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় শতকরা একশো হতে। সোজা উপায় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা। তা না হলে মারধোর লুটতরাজ নারীহরণ গৃহদাহ ইত্যাদি উপায়ে তাদের খেদানো। ব্রিটিশ বেয়োনেট সরে গেলে এটা চরমে উঠবে। তা বলে কি আমরা ব্রিটিশ বেয়োনেটকে ধরে রাখতে চাইব? কক্ষনো না। জিন্না সাহেব খোঁচা দিচ্ছেন যে আমরা নাকি ব্রিটিশ বেয়োনেটের আশ্রয়ে থেকে ভারত শাসন করার মতলব এঁটেছি। মানুষটি সন্দেহ দিয়ে গড়া।

তার পর বিহারের দিকে তাকাও। তুমি কি মনে করো বাদশা খানের কর্তব্য মোজেসের মতো বিহারী মুসলিমদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি দেওয়া? বিহারকে মুসলিমশূন্য করা? অমন করলে হিন্দুরা হয়তো নিষ্কণ্টক ও মুসলমানরা নিরাপদ হবে, কিন্তু হিন্দু মুসলিম মিলে আমরা এক নেশন থাকব না, দুই নেশনে বিভক্ত হব। মুসলিম লীগের থীসিসই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর সেটা বিনা আমাদের কৃতকর্মের দ্বারাই। স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কী করব, যদি তার জন্যে ভারতীয় নেশনকে দুই নেশনে ভাগ করতে হয়? দুই নেশন হলে দুই রাষ্ট্রও অবশ্যম্ভাবী। আমরা যারা স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছি তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

হিন্দু মুসলমান সাতশো বছর ধরে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কখনো যে নোয়াখালীর মতো

ঘটনা ঘটেনি তা নয়। কতক লোক ভয় পেয়ে পালিয়েছে, কতক অকুতোভয়ে প্রতিরোধ করেছে, কতককে বাঁচিয়েছে তাদের প্রতিবেশীরা, কতককে রক্ষা করেছেন সরকার আর অধিকাংশের রক্ষক ভগবান। এবারেও তাই হবে। ইহুদীদের মতো তাদের প্রব্রজ্যা করতে হবে না। বিহারের মুসলমানদেরও না। তাদেরকেও সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। তারা সরে আসবে বাংলাদেশে হিন্দুর শূন্যস্থান পূরণ করতে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ। ভাষা এক নয়, খাদ্য এক নয়, ঐতিহ্য এক নয়, সংস্কৃতি এক নয়। ওদের যারা ডেকে আনছে তারাই একদিন ওদের খেদাবে। বাপুর নীতি হলো যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। সেখানেই তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে। এ কাজ যেমন সরকারের তেমনি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও। নোয়াখালীতে লীগ সরকারের তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের। বিহারে কংগ্রেস সরকারের তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের। জিন্না সাহেবকে দিয়ে তিনি একথা স্বীকার করিয়েও নিয়েছেন।"

এর পর পারিবারিক প্রসঙ্গ। জুলির কথা। যূথিকার কথা।

মানসকে লেখা চিঠিতে সৌম্য লেখে, "আমার অবস্থাটা এখন হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকাশিত একখানি উপন্যাসের নায়কের মতো। হান্‌স ফালাডার 'লিটল ম্যান, হোয়াট নাউ।' পড়েছ নিশ্চয়। এত দিন যে জাতীয়তার সাধনা করলুম সে জাতীয়তা বিপন্ন। এক জাতি দুই জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। এতদিন যে অহিংসার সাধনা করলুম সে অহিংসাও এখন বিপন্ন। আমার প্রধান অবলম্বন ছিল হিন্দুর অহিংসা। বৌদ্ধের অহিংসা। জৈনের অহিংসা। সব মিলিয়ে ভারতের অহিংসা। গান্ধীর জীবনে যা মূর্ত। এখন দেখছি হিন্দুও আর মাইলড হিন্দু নয়। সে ওয়াইলড হিন্দু। তার মতে অহিংসা হচ্ছে কাপুরুষতার মুখোশ। আর হিংসাই হচ্ছে বীরত্ব। গান্ধীকে সে পিঁজরাপোলে পাঠাতে চায়। মুসলমানরা হিংসা ভিন্ন আর কোনো ভাষা বোঝে না। তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। বল্লভভাই বলেছেন তরবারির সঙ্গে তরবারির ভেট হবে। সোর্ড উইল বি মেট বাই সোর্ড। সেটাই নাকি সব হিন্দুর মনের কথা। বাপুর প্রিয় গান গুরুদেবের 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' আমারও প্রিয় গান।

আশ্রমে ফিরে এসে এবার মনে হচ্ছে এর অস্তিত্ব আর কদ্দিন! যেমন ক্যাপটেন মুস্তাফীর সেবাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। তিনি এটা ট্রাস্টীদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন। পাকিস্তানে তিনি মানসম্মান নিয়ে বাস করতে পারবেন না, যদি পাকিস্তান হয়। কিন্তু আমি যে কাসাবিয়াঙ্কা।

হোম মেম্বর পদ নিয়ে বল্লভভাই ভেবেছিলেন নোয়াখালীর উপরেও তাঁর এক্তিয়ার। কিন্তু নোয়াখালীর উপরে এক্তিয়ার বাংলাদেশের সরকারের। তার মানে সুহরাবর্দী সাহেবের। তিনি থাকতে গভর্নরও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। তবে তাঁর কিছু রিজার্ভ পাওয়ার আছে। সেটা খাটাতে গিয়ে সুহরাবর্দীর সঙ্গে ঝগড়া করতেও তিনি নারাজ। সুহরাবর্দী গেলে তাঁর সরকারের পতন হয়। শূন্য স্থান পূরণ করবে কে? কংগ্রেস নয়। তবে কি গভর্নর স্বয়ং? তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে হবে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ইংরেজ মরবে। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে বাপুর মতো একজনের উপস্থিতি প্রয়োজন। তাঁর যে কোনো ক্ষমতা আছে তা নয়। তাঁর আছে নৈতিক প্রভাব যা দিয়ে তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনছেন। কিন্তু সেটা তো রাজনৈতিক সমাধান নয়। যেমন লীগপন্থী তেমনি কংগ্রেসপন্থী সকলেই চায় রাজনৈতিক সমাধান। তার মানে কী? কোয়ালিশন না পার্টিশন? পার্টিশন কোনো পক্ষই চান না। কিন্তু কোয়ালিশনই বা কেমন করে সম্ভব? জিন্না নারাজ। আগে বিহার, যুক্ত প্রদেশ ইত্যাদিতে কোয়ালিশন হোক। তারপরে বাংলায় হবে। এতে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আপত্তি। কেন্দ্রীয় সরকারে লীগ মেম্বরদের চাল দেখে তাঁরা শঙ্কিত। লীগ খেলোয়াড়রা টীম ওয়ার্কে বিশ্বাস করেন না। ফুটবল খেলায় তাঁরা সেমসাইড গোল করবেন। উদ্দেশ্য ভিতর থেকে লড়াই করে পাকিস্তান আদায়।

তাঁদের তাড়ালেই তাঁরা চুপ করে থাকবেন না। জেহাদের ডাক দেবেন। তার মানে গৃহযুদ্ধ।

আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব? সেটা তো আরো বীভৎস। প্রতিবেশীই প্রতিবেশীকে মেরে তার ঘরবাড়ী জায়গা জমি দখল করবে। তার বৌঝিকেও হরণ করবে। গৃহযুদ্ধে যদি অনিচ্ছা থাকে তবে 'সোর্ড উইল বি মেট বাই সোর্ড' বলে কেন ওদের রাগিয়ে তোলা? সেটা আর যাই হোক রাজনৈতিক সমাধান নয়। তা ছাড়া ইংরেজরাই বা ওতে জড়িয়ে পড়তে চাইবে কেন? ওরা তো ওদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতেই কৃতসংকল্প। পাঁচ বছর আগে তেমন সুমতি ওদের ছিল না। কতকটা রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধে ভারতের সহযোগিতার আশায়, কতকটা সাম্রাজ্যবাসের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামের ভয়ে ওরা ওদের পলিসি ঠিক করে ফেলেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে ওরা মিটমাট চায়, সেইসঙ্গে লীগের সঙ্গেও মিটমাট। লীগকে ওরা কংগ্রেসের করুণানির্ভর করবে না। করতে গেলে লীগ তেড়ে আসবে।

কংগ্রেস অনায়াসেই অ্যাবডিকেট করতে পারে, কিন্তু তার পরে কী করবে? সহসা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শুরু করতে বাপুও অনিচ্ছুক। হিংসার প্রেস্টিজ এখন তুঙ্গে। অহিংস আন্দোলন রাতারাতি সহিংস হয়ে উঠবে। অথচ তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেও পারবেন না। সেটা তাঁর স্বভাবে নেই। কংগ্রেসকে তিনি ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা তো কোনো রাজনৈতিক সমাধান নয়। আর ইংরেজরা যদি দেখে তেমন কোনো সমাধানের আশা নেই তারা মিটমাট না করেই কুইট করবে। পাঁচ বছর আগে আমরা ওদের কুইট করানোর জন্যে অধীর হয়েছিলুম। কিন্তু এখন আমরা ওদের সঙ্গে মিটমাটের জন্যে অধীর। মিটমাট হয়ে যাবার পরে ওরা কুইট করবে। কিন্তু আগে জিন্নার সঙ্গে মিটমাট না হলে ওদের সঙ্গে মিটমাট হবার নয়। চাবীটা এখন জিন্নার হাতেই। বল্লভভাইয়ের হাতে নয়। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। এই হচ্ছে কংগ্রেসের হাল।"

উকীল সরকার রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার একদিন জেলা শাসক ক্যামেরন সাহেবকে নিয়ে আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। অমনি করে সৌম্যর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। দিনকয়েক বাদে রায় বাহাদুর তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। বলেন, "সাহেব সেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়েছেন। আরো কিছু প্রশ্ন করতে চান। সেটা গোপনীয়।"

একটু পরে ক্যামেরন এসে সৌম্যর সঙ্গে করমর্দন করেন। "শুনেছি আপনি মিস্টার গান্ধীর কাছের মানুষ। এই সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে এসেছেন। জানতে ইচ্ছে করে তিনি কী ভাবছেন। আবার ডাক দেবেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া'?"

সৌম্য হেসে বলে, "তিনি যে কী ভাবছেন তা তিনিই জানেন। আর কারো সাধ্য নেই যে জিজ্ঞাসা করে। না, তিনিও জানেন না। বরাবরই দেখা গেছে তাঁর ইনার ভয়েস তাঁকে হঠাৎ একদিন জানায় কী করতে হবে। আমরা যুক্তি খুঁজে পাইনে, তর্ক করি। তিনি বলেন, ইনটেলেক্ট দিয়ে পরে বুঝবে। এখন যা করতে বলছি তাই করো। পরে যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করেছি। ভুল করে থাকলে তিনি আপনি ভুল স্বীকার করেন।"

ক্যামেরনও হাসেন। "আপনি কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন, মিস্টার চৌধুরী। এদেশ কুইট করার জন্যে আমি ছটফট করছি। কথা ছিল এই জানুয়ারিতে জাহাজ ধরব। এখন শুনছি মার্চের আগে নয়। ইতিমধ্যে তিনি যদি আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেন তা হলে জাহাজও হাতছাড়া হবে, নতুন চাকরিতেও ওরা অন্য লোক নেবে। এই ঝুলে থাকা অবস্থায় নিজের জন্যে বা পরিবারের জন্যে কিছুই প্ল্যান করা যাচ্ছে না। উপরওয়ালাদের সুধালে তাঁরাও বলেন, আমাদেরও একই দশা। যারা কুইট করতে ষোল আনা প্রস্তুত তাদের এমন কী চমক আছে যা আপনারা দিতে পারেন?"

"না, নতুন কোনো চমক আমারও জানা নেই। তবে যতদূর বুঝতে পারছি নেহরুর জন্যেই গান্ধী পায়চারি করছেন। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী ছদ্মনামে ওই যে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সটি লণ্ডন থেকে

দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে গান্ধীজীকে তা ভোলাতে পারে না, নেহরুকে ভুলিয়েছে। তিনিই তো চেয়েছিলেন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী। ওটা তাঁরই শিশু। শিশুটি যদি দাঁড়াতে না পারে, হাঁটতে না পারে, দৌড়তে না পারে, তার বিকাশ বন্ধ করে দেন জিন্নার মুখ চেয়ে ওয়েভেল তবে নেহরুও ঠেকে শিখবেন যে 'আগে শাসনতন্ত্র পরে স্বাধীনতা' নয়, 'আগে স্বাধীনতা পরে শাসনতন্ত্র।' তখন তিনি গদী থেকে নেমে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে। এই পর্যন্ত আমি অনুমান করতে পারি। পরের ধাপটা বোধহয় মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে কংগ্রেসের পরিত্যক্ত আসনগুলি দেওয়া, কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় সরকারকে দুটি কেন্দ্রীয় সরকার করা নয়। লীগ রাজত্বে কংগ্রেসের আপত্তি হবে না, কিন্তু লীগের কথামতো ভারত ভাগে কংগ্রেস বাধা দেবে। আপনারা দেশে ফিরে যাবেন কেন, লীগ রাজত্বে পরম সুখে বাস করবেন। কিন্তু দেশে ফেরার তাড়া আছে বলে ধর্মের নামে দেশ ভাগ করে দিয়ে যাবেন আর আমরা চুপ করে বসে থাকব? গর্জে উঠব না? জাহাজ আটকাব না? প্লেন আটকাব না? ব্যাগেজ আটকাব না?" সৌম্য টিপে টিপে হাসে।

ক্যামেরন রাগতভাবে বলেন, "তা হলে গুলী চলবে কিন্তু।"

"তা কি আমরা জানিনে? গুলী চলতে চলতে ফুরিয়ে যাবে। তখন শাদা নিশান তুলে আত্মসমর্পণ। আপনারা সবাই বাঁচবেন, একজনেরও সাজা হবে না। কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। দুই দেশের মাঝখানে পড়ে থাকবে হাজার হাজার ভারতীয়দের লাশ। দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। সাত সমুদ্র যে ব্যবধান রচনা করেনি আর একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ তা করবে। আমাদের সম্মতি না নিয়ে যে পার্টিশন ওয়াল তৈরি হবে আমরা সেটাকে ধূলিসাৎ করব। সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বরাবরের জন্যে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করতে হবে। এই কারণে আপনাদেরও হাজির থাকতে হবে। আপনাদের সরকারই আপনাদের আটকাবে।" সৌম্য রসিয়ে রসিয়ে বলে।

ক্যামেরন ভিতরে ভিতরে চটে যান। "ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিলেই তো পার্টিশন এড়ানো যায়।"

সৌম্যও মনে মনে রাগ করে। "আসাম কি মুসলমানদের প্রদেশ? সেটা কোন্ হিসাবে মুসলমানদের ভাগে পড়ে? অসমীয়রা বিয়াল্লিশ সালে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। কেমন করে আমরা তাদের মুসলিম লীগের কবলে তুলে দিই? আপনাদের মাথায় ঘুরছে কংগ্রেস ও লীগের ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। হিন্দু মেজরিটির সঙ্গে মুসলিম মাইনরিটির ব্যালান্স। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের সঙ্গে মুসলিম সেপারেটিস্টদের ব্যালান্স। এ ধরনের ব্যালান্স উপর থেকে চাপানো। আপনাদের যতদিন চাপানোর ক্ষমতা ছিল ততদিন সম্ভব ছিল। এখন ক্ষমতার শেষ দশা। এখনো চাপানোর চেষ্টা। ভাগাভাগির ব্যাপারটা কংগ্রেস ও লীগের ঘরোয়া ব্যাপার। সেটা একভাবে না একভাবে হবেই। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে। সদ্ভাব রক্ষার জন্যে পাকিস্তানও দিতে পারি। কিন্তু সদ্ভাবের কোনো চিহ্নই নেই। গায়ের জোরের আস্ফালন। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। আর কী জঘন্য লড়াই? নিরীহ নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। নিরীহ স্ত্রীপুরুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়ানো ও গোমাংস খাওয়ানো। ইংরেজ রাজত্বে আগে এসব মাঝে মাঝে হয়েছিল বলেই হিন্দুরা ইংরেজ রাজত্বকে তুলনায় পছন্দ করে। এখন ইংরেজ থাকতেই আবার সেই দশা। ওদিকে বিহারের হিন্দুরা একই মুদ্রায় শোধ দিতে গিয়ে সমান ঘৃণ্য কাজ করছে। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট। এই ভিসাস সার্কল ভাঙ্গ করতেই হবে। এই নিয়েই আমরা চিন্তিত। আমরা যারা গান্ধীজীর কাছের মানুষ। আপনারাও খেয়াল রাখবেন যে দুই শতাব্দী ধরে যে গুড উইল গড়ে তুলেছেন তাকে হারিয়ে ফেললে কী নিয়ে বাড়ী ফিরবেন।"

ক্যামেরন দুঃখিত হন। বলেন, "এ জেলায় তেমন কিছু ঘটবে না। আমি বদ্ধপরিকর। সেইজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

হালদার তারিফ করেন। "হ্যাঁ, আপনার আসার পর থেকে আমরাও নিশ্চিন্ত। মনে রাখবেন, মিস্টার ক্যামেরন, এই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আপনারই মতো একজন স্কটসম্যানের হাতে গড়া। হিউম সাহেবও আপনারই মতো সিভিলিয়ান ছিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলান দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দীন তৈয়বজী, ডব্লিউ সি বনার্জী। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী। বনার্জীর সাহেবী চালচলন থেকে লোকে ধরে তিনি ছিলেন খ্রীস্টান। সেটা ঠিক নয়। তিনি হিন্দুই ছিলেন, তবে তাঁর স্ত্রী বিলেত বাস করার সময় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শেষ কন্যাটি খ্রীস্টান, অন্যান্য পুত্র কন্যা হিন্দু। এই হলো কংগ্রেসের ঐতিহ্য। কংগ্রেস কোনো দিনই হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমিও এককালে তার সদস্য ছিলুম। কলকাতায় অ্যানী বেসান্ট যেবার প্রেসিডেণ্ট হন সেবার জিন্নাকেও দেখেছি কংগ্রেসের মঞ্চে। ফজলুল হকও একসময় কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারি ছিলেন। মহম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্ব যাঁদের সহ্য হয়নি তাঁরা একে একে কংগ্রেস থেকে সরে যান। পরে আলী ভ্রাতারাও তাই করেন। আমি কংগ্রেস ত্যাগ করি আদালত বর্জনে নারাজ হয়ে। আদালত ছাড়লে খাব কী? কংগ্রেস তখন মুসলমানদেরও আস্থাভাজন ছিল। আর মুসলিম লীগের সভাতেও হিন্দুরা যাতায়াত করতেন। জিন্না একবার কংগ্রেস লীগের মিলন ঘটিয়ে দেন। তাঁর ঘটকালিতেই লখনউ চুক্তি সফল হয়। সেটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করার জন্যে। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ আদায় করতে হলেও সেইরকম আরো একটা চুক্তি চাই। তার বদলে অসহযোগ করে কী হবে? দ্বিতীয়বার ঘটকালি করতে না পেরেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন। সম্পূর্ণ হতাশ না হলে তিনি পার্টিশন দাবী করতেন না। তাঁর অমতে কংগ্রেস নেতৃত্বে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠিত হতে যাচ্ছে বলেই তাঁর ডাইরেক্ট অ্যাকশন। পার্টিশন বা ডাইরেক্ট অ্যাকশন কোনোটাই আমি সমর্থন করিনে। এসবের জন্যে আমি ব্রিটিশ সরকারকেও দায়ী করতে পারিনে। আমরা ঝগড়া করতে করতে যেখানে এসে পৌঁছেছি সেটা একটা পর্বতের চূড়া। পায়ের তলায় গভীর খাদ। আর একটু হলেই পদস্খলন ও পাতালে পতন। কী করে শেষ রক্ষা হয় সেই কথাই ভাবছি। সৌম্য, তোমাকেও ভাবতে হবে। লড়াই তো অনেক করলে। এখন সন্ধি করো। মুসলিম লীগের সঙ্গে করতে না চাইলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে করতে না চাইলে মুসলিম লীগের সঙ্গে। কারো সঙ্গে সন্ধি করবে না, এই ধনুর্ভঙ্গ পণ দেশকে ছারখার করবে। তুমি যদি মনে করো সেইটেই স্বাধীনতা তবে আমি নাচার।"

"রায় বাহাদুর, আপনার কথাই ঠিক। আর লড়াই নয়। এখন সন্ধি। আসুন হ্যাণ্ডশেক করা যাক।" ক্যামেরন হাত বাড়িয়ে দেন।

সৌম্য তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "তথাস্তু।"

ক্যামেরন জানতে চান সে কখনো বিলেত গেছে কি না। সৌম্য বলে, "বিশ বছর আগে। দু'বছর ছিলুম। খুব ভালো ব্যবহার পেয়েছি। এখনো সেদেশের বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাই। তাঁরা সবাই প্যাসিফিস্ট ও ভারতমিত্র। মুরিয়েল লেস্টারের কিংসলী হলে গান্ধীজী অতিথি হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হয়ে বড়ো কোনো হোটেলে থাকেননি। ইস্ট এণ্ডের গরিবরাই তাঁর প্রতিবেশী। আর চার্চের লোকরাই তাঁর আপনার লোক। যেমন মড রয়ডেন।"

রায় বাহাদুর বলেন, "মিসেস চৌধুরীও বহুদিন বিলেতে ছিলেন। ফিরে এসে টেররিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। এখন স্বামীর মতো গান্ধীপন্থী।"

"আলাপ হলে খুশি হব। কবে আসছেন এখানে?" ক্যামেরন সুধান।

সৌম্য সঙ্কোচ বোধ করে। রায় বাহাদুর বলেন, "ইন্টারেস্টিং কণ্ডিশন।" সে কথা মুখে আনা যায় না, ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়।

"ওঃ!" সাহেব সহানুভূতির স্বরে বলেন।

ক্যামেরনের অন্যত্র কাজ ছিল। তিনি বিদায় নেন। কিছুক্ষণ পরে মোহিনীমোহন ধর আসেন। বলেন, "ক্যামেরনকে কেমন দেখলে, সৌম্য?"

"লোকটাতো ভালোই। ইংরেজরা কেই বা ভালো নয়? কিন্তু ওদের পলিসি নিয়েই আমাদের কারবার। আর পলিসি তো সেই সনাতন ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। তার থেকে আসে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। ইচ্ছে থাক আর নাই থাক মিস্টার ক্যামেরনকেও সেই পলিসি অনুসরণ করতে হবে।"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে কী ভাবেন। বলেন, "দিল্লী ঘুরে এলুম। জানতে কৌতূহল ছিল, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী কী জিনিস। আর একটা লালকেল্লা না কুতব মিনার। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হলো। কিন্তু এত বড়ো যে যজ্ঞ তাতে শিব নেই। শিবহীন যজ্ঞ।"

রায় বাহাদুর সৌম্যর দিকে তাকান। সৌম্য মোহিনীবাবুর দিকে। তিনি পরিষ্কার করেন। "অর্থাৎ জিন্না নেই। সবচেয়ে পুরাতন পার্লামেন্টারিয়ান। সব চেয়ে অভিজ্ঞ। সব চেয়ে সুদক্ষ।"

"সেকথা ঠিক।" বাসুদেব বলেন। "সেকালের কংগ্রেসে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি।"

"আমার মনে বড়ো দুঃখ হলো। দেখা করতে গেলুম তাঁর বাড়ী। সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমি বললুম, 'শিবহীন যজ্ঞ। তাই শিবকে দেখতে এসেছি।' তিনি বাঁকা হাসি হেসে বলেন, 'ওরা ভেবেছে ওদের ওই যজ্ঞ ফলপ্রদ হবে।' এর পরে তিনি একটা কৈফিয়ৎ দেন। ' যেতে কি আমার কম ইচ্ছে? কিন্তু গিয়ে ফল কী হতো? ওদের যা দস্তুর। সিদ্ধান্তগুলো ওরা নেয় ঘরোয়া বৈঠকে বসে। তার পর আইন সভায় ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেয়। ব্রুট মেজরিটির জোরে। গান্ধীকে চেপে ধরলে তিনি জবাব দেন, 'কেন, বিলেতের পার্লামেন্টে কী হয়? সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় লণ্ডনের কার্লটন ক্লাবে। পার্লামেন্ট একটা রেজিস্টারিং বডি।' গান্ধীর দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষ যেন কেউ নয়। তাঁর নিজের পার্লামেন্টারি অভিজ্ঞতা নেই। তিনি তাতে বিশ্বাসই করেন না। নেহরু তো বিপ্লবী। আর বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁরা তো পার্টি ম্যানেজার। ভোট আর জোট এই নিয়ে এঁদের কেরামতি। শাসনতন্ত্রের এঁরা বোঝেন কী? আমার যা উদ্দেশ্য তা আমি ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিয়ে সিদ্ধ করব।' আমি দেখি তাঁর মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।" মোহিনীবাবু বলে যান।

"তার পর তুমি কী বললে?" রায় বাহাদুর প্রশ্ন করেন।

"আমি বললুম, কায়দে আজম, কাগজে দেখলুম আপনি লোকবিনিময় দাবী করেছেন। তার মানে কি বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দু থাকবে না, শূন্যতা পূরণ করবে আড়াই কোটি পশ্চিমা মুসলমান? যাদের ভাষা উর্দু। বাঙালী মুসলমানরা কি বাংলা ছাড়বে, না পশ্চিমা মুসলমানরা উর্দু? ভাষা নিয়ে ঝগড়া বাধবে না? আর বাঙালী হিন্দুরাও যে বিহারে বা যুক্তপ্রদেশে স্বাগত হবে তা নয়। এমনিতেই যথেষ্ট বাঙালীবিদ্বেষ। তারা পশ্চিমে না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দাবী করবে ও কলকাতার আরেক দফা লড়বে। তিনি ধাক্কা খেয়ে বলেন, 'তাই তো । লোকবিনিময়টা দেখছি ড্রপ করতে হবে। কিন্তু গোটা বাংলাদেশটাই আমি চাই।' তাঁর বিশ্বাস তিনি যাহা চাহিবেন তাহা পাইবেন। আমি মনে মনে হাসি।" মোহিনীবাবু বলেন।

"বাঁচালেন।" বাসুদেব তারিফ করেন। "তুমি আমাদের লোকবিনিময়ের অভিশাপ থেকে বাঁচালে। কিন্তু মনে মনে হাসলে কেন?"

"সে অনেক কথা। ধৈর্য থাকে তো শোন। ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানরা যেমন লড়েছে হিন্দুরা তেমন নয়। কিন্তু লাভ হলো হিন্দুদেরই, মুসলমানদের নয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান্ তাঁর স্বধর্মীদের বোঝান যে শত্রুভাবের সাধনায় হারানো বাদশাহী ফিরে পাওয়া যাবে না। মিত্রভাবের সাধনা করতে হবে। আর কিছু না হোক চাকরি তো মিলবে। মিত্রভাবের সাধনাই তখন থেকে শিক্ষিত মুসলমানদের নীতি। কংগ্রেসের চেয়ে লয়্যাল হতে হবে, এটাই হয় মুসলিম লীগের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মুশকিল

বাধে যখন প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক যোগ দেয় জার্মান শিবিরে। খলিফা বিপন্ন হলে ইসলামও বিপন্ন হয়। মুসলমানরা যুদ্ধে কোন্ পক্ষে লড়বে? খলিফার পক্ষে না সম্রাটের পক্ষে? মুসলিম লীগ তো ইংরেজের আঁচলবাঁধা। মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শৌকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এঁরাই নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধের পরে এঁরা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে খেলাফতের ইস্যুর সঙ্গে স্বরাজের ইস্যুর ঘোঁট পাকিয়ে রাজদ্রোহী আন্দোলনে নামেন। মুসলিম লীগ থেকে মুসলমানরা সরে গিয়ে কংগ্রেসে ঢোকে। সার সৈয়দ আহমদ খানের পলিসির সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের সরিয়ে রাখতে। কারণ কংগ্রেসের রাজভক্তি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। মুসলিম জনমত দ্বিধাবিভক্ত হয়। লীগপন্থী মুসলমানদের চেয়ে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের জনপ্রিয়তা বেশী।" মোহিনীবাবু দম নেন।

"তারপর?" বাসুদেব উৎকর্ণ। সৌম্যও।

"অপূর্ব কৌশলে কংগ্রেসের কোর্ট থেকে লীগের কোর্টে বল ফিরিয়ে আনেন জিন্না। তখন তিনি আর কংগ্রেস নেতা নন। তিনি ইতিমধ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি গঠন করে ব্রিটিশ তাঁবেদারি থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখিয়েছিলেন। অথচ কংগ্রেসের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে শত্রুভাবের সাধনা শেখাননি। এক দরজা খোলা রেখেছিলেন ইংরেজের দিকে, আরেক দরজা কংগ্রেসের দিকে। এই পলিসির অগ্নিপরীক্ষার দিন আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। মুসলিম লীগ রাজশক্তির সঙ্গে সেই দুর্দিনে সহযোগিতাও করে, অসহযোগও করে। এই দুমুখো পলিসির দরুন ব্রিটিশ সহানুভূতির অর্ধেক হারায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর বিবেচনায় গান্ধী যদি হন পূর্ণ শত্রু তো জিন্না হচ্ছেন অর্ধ শত্রু ও অর্ধ মিত্র। একজন যদি অখণ্ড ভারত না পান তো অন্যজন কেন অখণ্ড পাকিস্তান পাবেন? সার সৈয়দ আহমদ খান্ হলে যত বড়ো পাকিস্তান পেতেন মহম্মদ আলী জিন্না তত বড়ো পাকিস্তান পেতে পারেন না। যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মোহিনীবাবু থামেন।

বাসুদেব জেরা করেন, "তুমি কি বলতে চাও আবার বঙ্গভঙ্গ হবে?"

"সেইরকম একটা গুজবই শুনে এলুম অন্তরঙ্গ কংগ্রেস মহলে।" মোহিনীবাবুর জবাব। "হয় কোয়ালিশন নয় পার্টিশন। জিন্নার যে পলিসি প্যাটেলেরও সেই পলিসি।"

।। এগারো ।।

মিলি এসেছে জুলিকে দেখতে। কুশলসম্ভাষণের পর বলে, "তুই আমাকে চুম্বকের মতো টানছিস, মেয়ে। তুই ওখানে থাকলে আমিও ওখানে থাকতুম। তুই এখানে তাই আমি এখানে। তবে রণকে আমি কলকাতায় রাখতে সাহস পাচ্ছিনে। ওকে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে দিচ্ছি। ওরও ভালো লাগবে।"

"আমার বর যেখানে আমিও সেখানে। ওকে ওর বাপু আদেশ দিয়েছেন ওর আশ্রম না ছাড়তে। ও কাসাবিয়াঙ্কার মতো বাপের আদেশ পালন করতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করবে। আমি গেলে আমিও বিপন্ন হব, মিলি। যে বেচারা আসছে সেও। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা বাপুও বিপন্ন। কাসাবিয়াঙ্কার বাবাও বাঁচলেন না, তা জানিস্। সবাই মিলে আমরা এক ট্র্যাজেডীর অভিমুখে চলেছি। থামতেও পারিনে, পেছোতেও পারিনে। তবে তোর দিক থেকে তুই ঠিকই করেছিস্। তোকে আর ওখানে ফিরে যেতে হবে না। কী দরকার?" জুলি জোর দিয়ে বলে।

মিলি খিল খিল করে হাসে। "তোর বদ্ধমূল ধারণা তোর বরকে আমি ভুলিয়ে নিতে চাই। দূর, পাগলী! যে যার সে তার। সৌম্য তোর, আমার নয়। তা ছাড়া আমি আর ও মুলুকে ফিরে যাচ্ছিনে। সম্পত্তির লোভেও না। আমার বর বিলেতে আমার নামে বাড়ী কিনে রেখেছে। কোথায়

বিলেত আর কোথায় পূর্ববঙ্গ। লণ্ডন হচ্ছে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থান। আর পাকিস্তান? হা হা হা হা! তাই নিয়ে লড়াই করবে কোন্ নির্বোধ। আমি তো নইই। আমার বাবাও না। তিনিও মাঝে মাঝে চলে আসতে চান। মা তো কবে থেকে চলে আসার ধুয়ো ধরেছেন। বাবার অসংখ্য পেসেন্ট। পেসেন্টদের অনুমতি না নিয়ে চলে আসা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু তাঁর পেসেন্টরা তো তাঁকে প্রাণে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচালে বাঁচাবে দেশের গভর্নমেন্ট। যেহেতু আপসেট বাংলা দেশের গভর্নমেন্টই বাধিয়ে দিল দাঙ্গা। সেটা হলো প্রথম ঘণ্টাধ্বনি। দুটো মাস যেতে না যেতে আবার ঘণ্টাধ্বনি। এবার নোয়াখালী ও ত্রিপুরায়। এর পরের বার পূর্ববঙ্গের অন্য কোনো জেলায়। বাবা তার জন্যে অপেক্ষা করতে নারাজ। বেশ বোঝা যাচ্ছে মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদায় না করে ছাড়বে না। ইংরেজরা যে জিন্নাকে বা সুহরাবর্দীকে জেলে পুরবে তাও নয়। জেলখানাটা গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, জয়প্রকাশের জন্যে বরাদ্দ।"

"তোর জন্যেও। আমার জন্যেও।" জুলি মনে করিয়ে দেয়।

"আমি তো চুনোপুঁটি। আমাকে কে পোছে! কথা হচ্ছিল, পাকিস্তান যখন হবেই, আর বাংলাদেশের সবটা না হোক পূর্বভাগটা তার সামিল হবেই, তখন কেন মিছিমিছি মায়া বাড়ানো? ইংরেজরা যেমন ভারতের মায়া কাটাচ্ছে আমরাও তেমনি পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাব। বাবা লিখেছেন তিনি সৌম্যদাকে বলেছেন যে যোদ্ধারা বেছে নেয় কোন্‌টা হবে যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে তাদের শক্ত ঘাঁটি তারই উপর নির্ভর করে জয়। পাঁচ বছর আগে তোমরা বেছে নিয়েছিলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। ঠিকই করেছিলে। সে সময় ইংরেজরা ছিল অপসরণশীল। তোমরা অনায়াসেই ভাজচুর করে এক হাতে জাপানীকে আরেক হাতে ইংরেজকে ঠেকালে। তখন পরিস্থিতি ছিল তোমাদের অনুকূল, এখন কিন্তু তা নয়। পূর্ববঙ্গ ও সীলেট এখন মুসলিম লীগের অনুকূল, যদি গৃহযুদ্ধ বাধে। তোমাদের উচিত পশ্চিমবঙ্গে অপসরণ করা। সেখানেই ঘাঁটি গাড়া। কাসাবিয়াঙ্কার মতো অটল থেকে মৃত্যুবরণ করা নিরর্থক। মুসলিম লীগ অত সহজে ভুলবে না। সে চায় ইংরেজের হাত থেকে সার্বভৌম পাকিস্তান, কংগ্রেসের হাত থেকে অটোনমি নয়। ক্ষুদ্রই হোক, বৃহৎই হোক, সার্বভৌম পাকিস্তান সে আদায় করে নেবেই। তার পেছনে অধিকাংশ মুসলমান। তারাও চায় পাকিস্তান। লড়কে লেঙ্গে। মুসলমানের হৃদয় জয় করার চেষ্টা আমিও কি কম করেছি? আমার পেসেন্টদের অধিকাংশই তো দুঃস্থ মুসলমান। তাদের কাছ থেকে আমি নামমাত্র একটা ফী নিই, যাতে তাদের আত্মসম্মান বজায় থাকে। কিন্তু তাদের নির্বাচিত গভর্নমেন্টের কার্যকলাপ দেখে আমি হৃদয়ঙ্গম করছি যে হিন্দু মুসলমান কেউ কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কলকাতার হিন্দুরাও কম দাঙ্গাবাজ নয়। আমাকে বিলেতেই শেষপর্যন্ত যেতে হবে। আমি হিন্দুস্থানেও টিকতে পারব না। তোমরা যে যাই বল না কেন ইংরেজরা এদেশকে দু'শো বছর এগিয়ে দিয়েছে। ওরা চলে গেলে দেশ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যেতে পারে। আর আমাদের মুসলিম বন্ধুরা যাই বলুক না কেন আমরা বাংলাদেশের হিন্দুরা তাঁদের একশো বছর এগিয়ে দিয়েছি। আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে গেলে তাঁরা একশো বছর পেছিয়ে যাবেন। বাবার প্রথম উক্তিটা আমি মানিনে, কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিটা বিলকুল ঠিক। তোর কী মনে হয়, ছুঁড়ি?" মিলি পরিহাস করে।

"দূর, আমি ছুঁড়ি হতে গেলুম কেন? স্বচক্ষেই দেখছিস্ আমার বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। তোরও তাই। তা বলে তোকে আমি ছুঁড়ি বলে অপমান করব না। এ বয়সে একটু ভারিক্কি হতে হয়।" জুলি গম্ভীরভাবে বলে।

"এইজন্যেই আমি ইণ্ডিয়ান থাকতে চাইনে। এদেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। আর ওদেশের মেয়েরা দু'কুড়িতেও ছুঁড়ি। তুই এত সীরিয়াস কেন? ভিতরে রসবোধ নেই কেন? আমি হলে ওই মিন্‌সের দাড়ি ধরে নাচতুম। কী করে যে তুই ফুলঝাড়ু সহ্য করিস?" মিলি হাসির হুল্লোড় তোলে।

"ছি! পরস্ত্রী হয়ে পরপুরুষকে নিয়ে অমন ব্যঙ্গ করা ভালো দেখায় না। আমি কি কখনো বলেছি

যে তোর বর সুকুমার একটা মেনিমুখো বাঁদর? জানি, তোর মনে লাগবে। হাজার হোক স্বামী তো!" জুলি অবিবেচক নয়।

"ওই বাঁদরকে তুই ফন্দী করে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিস। তোকে তাই কোনোদিন ক্ষমা করতে পারিনি। তবে সমান ভালোবাসি। তোর মতো দুঃখ তো আমি পাইনি, তাই তোর সুখে আমি সুখী। তোর মতো মেয়েদের ওলড্ গার্ল বলাটা ভালোবাসারই নিদর্শন। ইয়াং লেডী বলাটা তো রীতিমতো শিষ্টাচার।" মিলি জুলির দুই গালে চুমু খায়।

জুলি ওর দুই গালে দুই চড় কসিয়ে দেয়। "তোর বয়স দেখছি দিন দিন কমছে। বিলেতে সাত বছর বাস করে তুই দেখছি বিজাতীয় বনে গেছিস্। যদিও বিষম ব্রিটিশবিদ্বেষী। আচ্ছা, এখন একটু রাজনীতি হোক। জানতে পারি কি আপাতত তোদের প্রোগ্রামটা কী?"

"আমরা মুসলিম লীগের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইনে। যুদ্ধ আমাদের ওই জোরদার খুঁটির সঙ্গে, মেড়ার সঙ্গে। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। খুঁটিটাকে হটাতে পারলে মেড়াটাকেও বাগে আনতে পারা যাবে। আমরা নজর রেখেছি ওয়েভেলের উপরে, অ্যাটলীর উপরে, চার্চিলের উপরে। জিন্নাকে ওঁদের কে কতখানি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সুকুমার আমাকে ভিতরের খবর পাঠাচ্ছে, ওর অনেক সোর্স আছে। ও লিখছে ভারতের পার্টিশন তো হবেই বাংলার পার্টিশনও হতে পারে, যদি না বাঙালী হিন্দু মুসলমান কোয়ালিশন ক্যাবিনেট গঠন করে, যদি না বাংলাদেশ উভয়ের ইচ্ছায় হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান ভিন্ন তৃতীয় এক রাষ্ট্র পত্তন করে। কলকাতায় এসে আমি এখন বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নাড়ী টিপছি। গৃহযুদ্ধে বিশেষ কারো উৎসাহ দেখছিনে, যদিও বৈরীভাব অধিকাংশের মনে।" মিলি যতদূর বোঝে।

জুলি তা শুনে বলে, "গৃহযুদ্ধে কারো বিশেষ উৎসাহ নেই, তবু হাতিয়ার জোগাড় করাতেও বিরাম নেই। অমন যে ভালোমানুষ দীপিকা বৌদি উনিও নাকি স্টেন গান কিনেছেন। পাইপ গান তো আজকাল পাড়ায় পাড়ায়। পাঁচ বছর আগে আমরা যারা ছিলুম অ্যান্টি-ওয়ার আজ তারা প্রো-সিভিল ওয়ার হতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস ভায়োলেন্স দিয়ে কিছুই পাকাপাকিভাবে পাওয়া যায় না। না স্বাধীনতা, না পাকিস্তান, না সমাজতন্ত্র।"

"হীয়ার, হীয়ার। কস্তুরবা চৌধুরানী বলেছেন। বিয়ের পর সব মেয়েরই পদবী বদলে যায়, জানতুম। কিন্তু মতবাদও কি বদলে যায়? এটা হার মাস্টারস্ ভয়েস নয় তো?" মিলি ঠাট্টা করে।

জুলি ঠাট্টা বোঝে না। "সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে তোরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটত। তুইও একই কথা বলতিস্। ওর মতো পোড় খেয়েছে ক'জন। ও অনেক দুঃখে শিক্ষা করেছে যে দেশের লোক যদি হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্ট বৃত্তে জড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতা হাওয়া হয়ে যাবে, পাকিস্তানও আসমানে ঝুলে থাকবে, আর সমাজতন্ত্র হবে আকাশকুসুম। ব্রিটিশ রুলের পরে আসবে মিলিটারি রুল। সেও একদিন যাবে, কিন্তু তার যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিদেশীরা এসে হাজির হবে। ইংরেজরাই যে সব চেয়ে খারাপ বিদেশী তা নয়, মিলি।"

"কথাটা সত্য। ওদের সঙ্গে সাত বছর থেকে আমারও বিশ্বাস হয়েছে যে ওঁরাই মন্দের ভালো। বাবা আমাকে বরাবরই এই কথা বলে এসেছেন, আমি গ্রাহ্য করিনি। তা বলে আমি তোর সঙ্গে একমত হতে পারব না যে অহিংসা দিয়েই স্বাধীনতা পাকাপাকিভাবে পাওয়া যাবে। ওই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট পর্যন্তই তোদের দৌড়। ওর থেকে বেরিয়ে এলেও বিপদ, না এলেও বিপদ। যাকে বলে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? তোর কথা আলাদা। তোর সামনে কনফাইনমেন্ট। আমার সে পাট চুকে গেছে।" মিলি কিসের ইঙ্গিত দেয়?

"কেন, তুই কি আর মা হতে রাজী নোস্? রণের একটি বোন হলে ভালো হতো না?" জুলি আশ্চর্য হয়।

"নো মোর। নো মোর। ওদেশের প্রগতিশীল মেয়েরা কেউ দ্বিতীয়বার মা হতে রাজী নয়। নয়তো নিজস্ব একটা কেরিয়ার বলে কিছু থাকে না। কেরিয়ারের খাতিরে একবার মা হতেও অনেকে নারাজ। স্বাধীনতা বলতে কি কেবল দেশের স্বাধীনতা বোঝায়? কত রকম স্বাধীনতা আছে। তার মধ্যে একটা হলো কেরিয়ারের স্বাধীনতা। পুরুষের বেলা এটা সর্বস্বীকৃত। যত আপত্তি শুধু নারীর বেলা। তোর নিজের ভবিষ্যৎটা কী হবে, মাইজী?" মিলি কৌতুক করে।

জুলি ঘাবড়ে যায়। "সৌম্যর যে ভবিষ্যৎ আমারও সেই ভবিষ্যৎ। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ওরই বা কী ভবিষ্যৎ? ওর আশ্রমে ও অনেক টাকা দান করে ট্রাস্টি হয়েছে। কিন্তু আশ্রমটাই তো অচল হয়ে যাবে, যদি দেশ ভাগ হয়ে যায় আর আমরা এলিয়েন বনে যাই। বাচ্চাটাকে মানুষ করব কী করে?"

"তা হলে আর বাচ্চা না হওয়াই ভালো। তোদের তো বাঁধা গৎ ব্রহ্মচর্য। হা হা হা হা।" মিলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

"আমার স্বপ্ন আরো একটি সন্তানের মা হওয়া। ছেলের পরে মেয়ে কিংবা মেয়ের পরে ছেলে। তার পরে না হয় তোর পন্থা অনুসরণ করব। দুটি না হলে জুটি হয় না। জুটি না হলে খেলাধুলা হয় না।" জুলি তার জন্যে প্রস্তুত।

"তুই কোন্ যুগে বাস করছিস্, বেবী? রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে? বিলেতে থাকতে কত ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে। কেউ একটির বেশী চায় না, যদি আদৌ চায়। মা হওয়া যেমন কষ্টের, ছেলেমেয়েকে মানুষ করা তার চেয়েও কষ্টের। যুদ্ধের কি শেষ আছে? আবার যুদ্ধ বাধবে, ছেলেগুলো কন্‌স্ক্রিপ্ট হয়ে যুদ্ধে মরতে যাবে, মেয়েগুলোও আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে মরবে। তা হলে ওদের বহন করা কেন? লালনপালন করা কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর একটা অর্থ ছিল। সেটা ছিল মোটের উপর শান্তির যুগ। আর এটা হলো মহা অশান্তির যুগ। ভারত স্বাধীন হয়েও কি এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে, ভেবেছিস? ইংরেজরা যে আর আমাদের বন্দীরূপে দাবিয়ে রাখতে চাইছে না তার কারণ তারা ভাবী মহাযুদ্ধে আমাদের মিত্ররূপে পাবার আশা রাখে। আমাদেরও তো কমিউনিজমের ভয় আছে। না, নেই?" মিলি জুলির সমর্থন প্রত্যাশা করে।

"না, নেই। আমরা কাউকেই ডরাইনে। কেউ আমাদের শত্রু নয়। ইউরোপ একটা মিথ্যে ভয়ে ভুগছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি পনেরোটা রেপাবলিকের জায়গায় পঞ্চাশটা রেপাবলিকের সমবায় হয় তবে নিজের চরিত্র হারাবে। তার কমিউনিজমে প্রচুর খাদ মেশাতে হবে। ইতিমধ্যে ন্যাশনালিজমের খাদ মেশানো হয়েছে। স্টালিন নেপোলিয়ন নন। নেপোলিয়নের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে পতন ডেকে আনবেন না। তোরা হয়তো ভাবী মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে লড়তে রাজী হবি, আমরা কিন্তু ওর মধ্যে নেই, মিলি। আমরা কারো শত্রুও নই, কারো মিত্রও নই। সামনে পড়ে রয়েছে দারিদ্র্যমোচনের কাজ, বিরাট গঠনকর্মের প্রোগ্রাম। গণশক্তির একটি কণাও আমরা বাজে কাজে অপচয় করব না। যুদ্ধ একটা বাজে কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যাগ্রহ আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহের আর কোনো প্রয়োজনও নেই। সত্যাগ্রহই তার মরাল ইকুইভ্যালেন্ট। শুধু যুদ্ধের নয়, বিপ্লবেরও। এদেশে যদি বিপ্লব হয় তবে সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই হবে। রক্তপাতের মাধ্যমে নয়।" জুলির কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

মিলির কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ। "হেলে ধরতে জানে না, কেউটে ধরতে যায়। জিন্নার সঙ্গেই এঁটে উঠতে পারছিস্‌নে, স্ট্যালিনের সঙ্গে পারবি। গান্ধীজী যে একজন সাধুসন্ত সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আমি তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানাই। কিন্তু তাঁর রাজনীতি আর অর্থনীতি আধুনিক যুগের উপযুক্ত নয়। দেশের লোক যতই আধুনিক হবে ততই তাঁর প্রতি বিমুখ হবে। তখন তাদের সামনে থাকবে দুটিমাত্র বিকল্প। পাশ্চাত্য ক্যাপিটালিজমযুক্ত ডেমোক্রাসী অথবা প্রাচ্য কমিউনিজমযুক্ত ডিকটেটরশিপ। মাঝখানে তৃতীয় কোনো মতবাদ নেই রে, পাগলী। স্বাধীনতা চেয়েছিলি, স্বাধীনতা

পাবি। তবে তার থেকে খানিকটা কাটা যাবে মুসলিম লীগকে বখরা দিতে। ব্যস্, এইপর্যন্ত তোদের দৌড়। এর পরে রঙ্গমঞ্চ থেকে তোদের প্রস্থান। তার বাইরে সাধু সন্ত হিসাবেই তোদের অবস্থান। আশ্রমটা তুলে দিস্‌নে। ওটাকে এপারে সরিয়ে নিয়ে আসিস্। সেবাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সেইরকম কিছু করতে হবে। বাবার শেষবয়সের অবলম্বন। ওটাই ওঁর প্রাণ। ওঁর জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন। এত বয়সে উনি আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে জমিয়ে বসতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গে ওঁর মতো ডাক্তার শত শত।" মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

"বিলেতে গিয়ে প্যানেল কিনে জাঁকিয়ে বসতে পারেন।" জুলি পরামর্শ দেয়।

"বিলেত দেশটা বুড়োবুড়িদের জন্যে নয়। যুবকযুবতীদের জন্যে। বাবা দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবেন। এইসব মানুষই পার্টিশনের ভিকটিম। জিন্না নিজেও তাই হবেন। গান্ধীজীও। ট্র্যাজেডী।" মিলি আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

"কেন? পার্টিশন কি বিধির বিধান যে আমাদের সেটা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে?" জুলি ফোঁস করে ওঠে।

"না, বিধির বিধান নয়। কিন্তু নেসেসারি ইভিল। নরনারীর দাম্পত্য জীবনে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন সেপারেশন ছাড়া উপায় থাকে না। নিত্য কলহ, নিত্য মারামারির চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। হিন্দু মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্কেরও এখন সেইরকম অবস্থা। তাই রাজনৈতিক সেপারেশনই মন্দের ভালো। সেটা দেবার গভর্নমেন্ট থাকতেই চুকে যাক। ওদের সঙ্গে দরাদরি না করলে ওরা সারা বাংলা মুসলিম লীগ গভর্নমেন্টের হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। দরাদরি করলে কংগ্রেসের হাতেও একটা ভাগ তুলে দেবে। এই কথাটাই জানিয়েছে সুকুমার।" মিলি প্রকাশ করে।

"তোদের মধ্যে সেপারেশন হচ্ছে না তো?" জুলি জেরা করে।

"না, আইনত নয়। তবে কার্যত তাই। আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে। এ জীবনে আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। ও যদি আর কাউকে বিয়ে করতে চায় তবে আমি পথ রোধ করব না। ডিভোর্স দেব।" মিলি উত্তর দেয়।

"জানিস্ তো ওর স্বভাব। তোর শূন্য স্থান অপূর্ণ থাকবে না।" জুলি শঙ্কিত।

"ডিভোর্সের মামলায় ওই তথ্যটা আমার অনুকূলে যাবে।" মিলি নিঃশঙ্ক।

"কিন্তু তোর ছেলে কত কষ্ট পাবে! সে তার বাপকেও চাইবে, তার মাকেও চাইবে। তুই বিলেত ফিরে যা। কিংবা সুকুমারদা দেশে ফিরে আসুক। চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটে যাবেই।" জুলি আশ্বাস দেয়।

"বাবার দিক থেকে স্ট্যান্ডিং অফার রয়েছে। তাঁর মেডিকাল সাপ্লাই কনসার্নের ডিরেক্টর পদের জন্যে একজন আপনার লোকের দরকার। কলকাতায় হেড অফিস। ও রাজী নয়। পাছে লোকে বলে ঘরজামাই। তা ছাড়া ওর যা স্বধর্ম। ও মিশবে পলিটিসিয়ান আর ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে। বেশীর ভাগই বামপন্থী। অথচ কমিউনিস্ট নয়। ভিতরের খবর ওর মতো আর ক'জন রাখে! কোনো এক পত্রিকা যদি ওকে স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট করে তা হলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যায়। দিল্লীকে কেন্দ্র করে ও সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করবে। আমি কিন্তু দিল্লীতে বাসা বাঁধতে নারাজ। রণ যদি শান্তিনিকেতনে পড়ে আমার বাস কলকাতায়। এখানে নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। তার একটা ফ্ল্যাট খালি। আমরা যে যখন আসি তখন উঠি। বাসা বাঁধতে হলে সেইখানেই বাঁধব। নিজের জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। রাজনীতিতে আর আমার রুচি নেই। তবে আগে থেকে একটা কমিটমেন্ট আছে। ইংরেজদের সঙ্গে যদি আরো এক দফা লড়তে হয় তবে আমাকেও নামতে হবে।" মিলি এর বেশী ভেঙে বলে না।

"আরো একবার লড়তে হলে কংগ্রেসই লড়বে। আর বাপুজীই সেনাপতি হবেন। আর রণপদ্ধতি

হবে অহিংসা অর্থাৎ ভায়োলেন্সবর্জিত। আমাদের অহিংস সংগ্রামের কন্তার নিয়ে যে তোদের খুশিমতো ভায়োলেন্ট কাণ্ডকারখানা করবি তার অবকাশ থাকবে না। তোদের উপর তবু বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু বাবলীদের উপর রাখতে পারিনে। যদিও বাবলী নিজে আমার প্রিয় বান্ধবী। সে প্রায়ই আসে আমাকে দেখতে। আমার জন্যে এটা ওটা এনে দেয়। মজার কথা ওরা এখন আর সোভিয়েট ইউনিয়নকে পিতৃভূমি বলে না। এই ভারতই ওদের মাতৃভূমি। অথচ ভুলেও একবার 'বন্দে মাতরম্' বলবে না। যাক, 'দেশ' 'দেশ' করতে করতে ওরা সত্যি একদিন দেশকে ভালোবাসবে। তবে ভায়োলেন্স কোনোদিন ভুলবে বলে মনে হয় না। শেষপর্যন্ত ওইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। বাবলীকে বলেছি, তোকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তোর ভায়োলেন্সকে ভালোবাসিনে। ওঃ কত লোককেই না ওরা কোতল করেছে রাশিয়ায়।" জুলি শিউরে ওঠে।

"ভারতেও করবে, যদি সুযোগ পায়।" মিলির বদ্ধমূল ধারণা।

"তবে একটা বিষয়ে আমি ওদের প্রশংসা না করে পারছিনে। বহু মুসলমানকে ও বহু হিন্দুকে ওরা প্রাণে বাঁচিয়েছে। এটা ঠিক বাপুজীর মনের মতো কাজ। যারা দেশবাসীকে ভালোবাসে তারা দেশকেই ভালোবাসে। আর যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে আমরা তাদের ভালো না বেসে পারি কই?" জুলির যুক্তি এই।

"হ্যাঁ, মানতেই হবে যে ওরা মহৎ কাজ করেছে। ওদের উপর আমার তেমন রাগ নেই যেমন মুসলিম লীগপন্থীদের উপর। সাতশো বছর ভারতে থেকে এইসব বুরবঁ (Bourbon) কিছুই ভোলেনি ও কিছুই শেখেনি। রোমে বাস করতে হলে রোমানদের মতো ব্যবহার করতে হয়। এরা করবে আরবদের মতো বা তুর্কদের মতো ব্যবহার। তার জন্যে রোমের একখণ্ড কেটে নিয়ে তাকে অঙ্গহীন করবে। নামটা পালটে দিলেই নাকি দেশটা বদলে যাবে, নদনদী পাহাড় পর্বত বদলে যাবে, জনগণের স্বভাবচরিত্র বদলে যাবে, আর্থিক অবস্থা বদলে যাবে। ইচ্ছে হয় এদের আচ্ছা করে পিটিয়ে সিধে করতে, কিন্তু ফল হবে চিরস্থায়ী শত্রুতা। সেটা হবে মস্ত বড়ো ভুল। পাপও বটে। তাই আমি দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদে রাজী হচ্ছি। হ্যাঁ, এটাও একটা ভুল। গান্ধীজী হয়তো বলবেন হিমালয়প্রমাণ ভুল। কিন্তু চিরস্থায়ী শত্রুতার চেয়ে ক্ষুদ্রতর ভুল। দু'তিন পুরুষ বাদে ওরাই উপলব্ধি করবে যে এটা সত্যিই হিমালয়প্রমাণ ভুল। তখন স্বেচ্ছায় এটা সংশোধন করবে। আপাতত আমাদের পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাতে হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে অপসরণ করে পশ্চিমবঙ্গেই ঘাঁটি গাড়তে হবে। মিলিটারি নেসেসিটি। পূর্ববঙ্গের মাটিতে লড়াই করে আমরা জিততে পারব না। পশ্চিমবাংলার মাটিতে লড়াই করে আমরা হারতে পারব না। কংগ্রেস আর লীগ নেতারা যদি এই সত্য মেনে নিয়ে সন্ধি করেন তো ইংরেজদের রোয়েদাদের দরকার হবে না। নয়তো ওটাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু ইংরেজরা যদি রোয়েদাদের নামে কারচুপি করে তা হলে ওদেরই একদিন কি আমাদেরই একদিন। কলকাতা যদি পাকিস্তানকে দেয় তবে আমাদের মাথায় খুন চড়বে।" মিলির মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। তাকে ভয়ঙ্কর দেখায়।

জুলি কী বলবে ভাষা খুঁজে পায় না। একটু ভেবে নিয়ে বলে, "না, মাথায় খুন চড়বে না। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় অ্যাবডিকেট করব। মুসলিম লীগ দেশ চালাবে। দেশের সবটাই। খাজনা আদায় করতে গিয়ে দেখবে হিন্দুর সহযোগিতা পাচ্ছে না। যথেষ্ট খাজনা জোগাবার সামর্থ্য মুসলমানের নেই। অত বড়ো একটা সৈন্যদলও বিনা বেতনে বা বিনা খোরাকে শান্ত থাকবে না। লুটপাট করে দিন গুজরান করবে। পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে তখন মুসলিম লীগও অ্যাবডিকেট করবে। ইংরেজকেই আবার শাসনভার নিতে হবে। যদি ধারে কাছে থাকে। কিন্তু ওরাও ভালো করে বুঝেছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি না করলে ওরাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি মানে দেশভাগ প্রদেশভাগ নয়।" জুলি সৌম্যর কাছে যা শুনেছে।

মিলি দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। "ভগবানের অশেষ করুণা ওই গান্ধীটুপীওয়ালার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। নইলে এইসব গাঁজাখুরি কথা শুনে আমি একদিন ক্ষেপে যেতুম। ক্ষেপে গিয়ে ওর দাড়ি ধরে নাচতুম। ওরে বেবী, আজকের এই হিন্দুরা কি পঁচিশ বছর আগেকার সেই হিন্দু? এরা সাতশো বছর বাদে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পেয়েছে। সহজে ছাড়বে না, ছাড়তে বাধ্য হলে সিপাইবিদ্রোহের সিগনাল দেবে। হিন্দু আর শিখ সৈন্যরা এখন নেহরুর মুঠোর মধ্যে। মুসলিম সৈন্যদের কতকও তাঁর ভক্ত। সিপাইবিদ্রোহে যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তবে গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের হাতের পাঁচ তো থাকবেই। তবে এবার সেটা ঘোরতর ভায়োলেন্ট হবে। দিল্লী আমরা রাখবই। কলকাতাও জিতে নেব। তবে কতক জায়গা মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিতে হবে। চিরস্থায়ী শত্রুতা কে চায়?"

কখন এক সময় বাবলী এসে মিলির পিছনে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরে বলে, "আমি কে? কে আমি?"

"তুই বাঁদরী। তুই পোড়ার মুখী। তুই বাবলী।" মিলি হেসে জবাব দেয়।

বাবলী এবার জুলির কাছে গিয়ে ওর পেটে হাত বুলিয়ে দেয়। "নড়ছে চড়ছে। লাথি মারছে। বেশ বড়ো সড়ো হয়েছে। শুধু বুঝতে দিচ্ছে না ছেলে কি মেয়ে।"

মিলিও ইতিমধ্যে পরখ করে দেখেছে। বলে, "ছেলেই হবে। রণের বেলাও এরই মতো আঁচ পাওয়া গেছল।"

জুলির মুখটি হাসিতে ভরে যায়। বলে, "তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

"আমি কিন্তু বাজি রাখছি। এ মেয়ে না হয়ে যায় না। আমি এর মাসী। আমি জানব না তো জানবে কে?" বাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী।

"আমার মা-ও তাই বলেছেন।" জুলি শুকনো মুখে বলে।

"ওঁর চেয়ে আর কে ভালো বোঝে? উনি তিন মেয়ের মা। জুলি, মেয়ের জন্যে এখন থেকেই জামাকাপড় তৈরি রাখছিস্ তো? কে জানে কখন এসে পড়ে। সৌম্যদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেব?" বাবলী সুধায়।

"টেলিগ্রামের চেয়ে ট্রাঙ্ক কল আগে পৌঁছবে। যুদ্ধের দৌলতে আজকাল ট্রাঙ্ক কল করতে পারা যায়। আমিই কল করব বাবাকে।" মিলি আগ বাড়িয়ে জবাব দেয়।

"ওর ওখানে বিস্তর কাজ। কেন ওকে এখানে এনে বসিয়ে রাখা? তোরা তো রয়েছিস। ভয়টা আমার কিসের? মরে যাব?" জুলির মুখ শুকিয়ে যায়।

"না, না, প্রশ্নই ওঠে না। তুই খুব শক্ত মেয়ে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাবধানের মার নেই।" বাবলী আর মিলি ভাগ করে বলে।

জুলি জানতে চায় নোয়াখালীর মেয়েদের মিলি কার জিম্মা রেখে এসেছে।

"ওরা যে যার ঘরে ফিরে গেছে। ওদের আত্মীয়রাই নিয়ে গেছে। পরে যদি দেখা যায় পোয়াতী টোয়াতী হয়েছে তবে অ্যাবরশন ট্যাবরশন দরকার হবে। তখন প্রসূতীর প্রাণ সংশয় বলে সার্টিফিকেট দিয়ে তার গুরুজনের অনুমতি নিয়ে অপারেশন টপারেশন করা যাবে। সিম্পল কেস।" মিলি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

জুলি চোখ কপালে তোলে। "ইমমরাল হবে না?"

"মরালিটি জিনিসটা রিলেটিভ। যে মেয়ে রেপ ভিকটিম তার বেলা অ্যাবরশন ইমমরাল নয়। এবারকার মহাযুদ্ধে নাৎসী রেপ ভিকটিম শত সহস্র। তাদের বেলা যা ইমমরাল নয় নোয়াখালীর মেয়েদের বেলা তা ইমমরাল হবে কেন? কেনই বা তারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হবে?" মিলি পাল্টা প্রশ্ন করে।

"হিন্দুসমাজকে আরো উদার হতে হবে। হিন্দুর মেয়ের গর্ভে যারই সন্তান জন্মাক সে সন্তান হিন্দু

বলেই গণ্য হবে। যেমন মুসলমানের মেয়ের গর্ভে গোরার সন্তান জন্মিয়ে মুসলমান বলে গণ্য হয়েছে।" জুলি যতদূর জানে।

"সমাজ সংস্কার এক লাফে অতদূর এগোবে না, জুলি। হিন্দুসমাজ যে ওই মেয়েদের সীতার মতো আগুনের উপর দিয়ে হাঁটায়নি এটা বড়ো কম বৈপ্লবিক নয়। সমান বৈপ্লবিক কলমা পড়া গোমাংস খাওয়া নারী ও পুরুষদের হিন্দুধর্মে ফেরৎ নেওয়া। তাদের কাউকে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়নি। বরাত ভালো। তাদের কারো অঙ্গে সুন্নতের চিহ্ন নেই। হিন্দুদের এমনতর সুবুদ্ধি যদি সাতশো বছর আগে থাকত তবে কি আজ মুসলিম সংখ্যা এত বেশী হতো যে তার জন্যে দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ প্রয়োজন হতো? বলতে ভুলে গেছি, কয়েকটি বিধবা এখনো ফিরে আসেনি, তাদের হদিস নেই। মনে হয় মুসলিম বিয়ে করে তারা সুখী হয়েছে।" মিলি অনুমান করে।

"অল্পবয়সী হিন্দু বিধবারা সারাজীবন বৈধব্য সইতে না পেরে স্বেচ্ছায় বহুক্ষেত্রে মুসলমান বিয়ে করেছে। এটা তো সাতশো বছর ধরে চলে আসছে। এটাও মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।" বাবলীর মন্তব্য।

"এর পরেও যদি হিন্দুসমাজের চোখ না ফোটে তবে আর কবে ফুটবে? যাক্, মুসলিম বিয়ে করে যদি ওরা সুখী হয় তবে আমার কোনো খেদ নেই।" ইতি জুলি।

"আমার আছে। ওরা আর ওদের সন্তানসন্ততি শুধু যে মুসলমান হবে তাই নয় আরবী নাম ধারণ করে অভারতীয় বনে যাবে। পাকিস্তান হলে ওদের পরিচয় হবে পাকিস্তানী। অন্য নেশন।" মিলির টিপ্পনী।

"অন্য নেশন বলে স্বীকার না করলেই হয়। আমার অসহায় দশার সুযোগ নিয়ে তোরা দেশভাগ প্রদেশভাগ প্রচার করছিস, যেন একটা আরেকটার ক্ষতিপূরণ। সমর্থ থাকলে আমি গর্জে উঠতুম। বাংলাদেশকে, বাঙালী জাতিকে একবার তো দু'ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ধোপে টিকল না কেন? কারণ হিন্দু মুসলমান সকলেই উপলব্ধি করেছিল সেটার কুফল বহুদূরপ্রসারী। বহুপুরুষব্যাপী। মুসলমান নেতারাই বলেন যে ধর্মে আমরা পৃথক হলেও হিন্দুদের সঙ্গে মিলে আমরা এক নেশন। সেটাই এখনকার মুসলিম লীগপন্থীদেরও মনোভাব। তাঁরা ভারতভাগ চান, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ চান না। অবশ্য ভারতভাগটাও ভুল। ওদের যত্ন করে বোঝাতে হবে। দীর্ঘ পথ। রাতারাতি পার্টিশনে রাজী হতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে উঠতে দে।" জুলি অনুনয় করে।

বাবলী তাকে মনে করিয়ে দেয় যে তার বর্তমান অবস্থায় উত্তেজনা ভালো নয়। মিলি বলে, "ফেব্রুয়ারিতে তুই খালাস হবি, যদি অকালে ডেলিভারি না হয়। উঠে দাঁড়াতে আরো তিনমাস লাগবে। সিদ্ধান্ত কি ততদিন সবুর করবে? বাঙালী হিন্দু তোর বাপুজীকে একটা স্বল্পমেয়াদী সুযোগ দিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী নয়। অলৌকিক ঘটনা যদি তিনি ঘটান তো এই জানুয়ারিতে বা ফেব্রুয়ারিতেই ঘটাতে হবে। নয়তো প্রদেশভাগের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কংগ্রেসওয়ালারা কোয়ালিশনের জন্যে হাঁ করে বসে আছেন সাত মাস ধরে। কোয়ালিশন না হলে পার্টিশন তাঁদের ক্ষমতার স্বাদ দেবে। ত্যাগ কি তাঁরা কম করেছেন বিহারীদের চেয়ে? তবে বিহারেই বা কেন চাঁদের হাট, বাংলায় কেন নিষ্প্রদীপ? কংগ্রেসী মহলে অসন্তোষ ঘনাচ্ছে। মহাসভাপন্থীরাও প্রদেশভাগ চান। কোয়ালিশনের আশা একান্ত ক্ষীণ। যে সমস্যা কোয়ালিশন হলেই মিটে যেত সেটা মেটাতে না পেরে বা না চেয়ে জিন্না সাহেব লোকবিনিময় দাবী করছেন। যেন নোয়াখালীর হিন্দু মাইনরিটি বিহারে ও বিহারের মুসলিম মাইনরিটি নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত হলেই উভয় পক্ষ কৃতার্থ হবে। ওদিকে গান্ধীজীর নীতি ঠিক বিপরীত। আমাদের নেতারা কি কোনোদিন কোনো বিষয়ে একমত হবেন? পাঁচ বছর সময় দিলেও না। ইংরেজ কি ততকাল পায়চারি করবে? আর আমরাই বা কেন তাদের পায়চারি করতে দেব? আমরা চাই ত্বরিত সিদ্ধান্ত।"

"আমাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় রেখে?" জুলি যুযুৎসু দেহি ভাব দেখায়।

বাবলী তাকে চেপে ধরে। "দেশের কী হবে চিন্তা না করে তোর কী হবে, তোর খোকার বা খুকুর কী হবে এইটেই চিন্তা কর। তবে আমি নিজে সৈনিক বলে গেছি। বুর্জোয়ারা দেশভাগ প্রদেশভাগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সিভিল ওয়ারকে তারা যমের মতো ডরায়। পাছে আমরাই সেটাকে শ্রেণীযুদ্ধে রূপান্তরিত করি। অবশ্য আমাদেরও ততখানি জোর নেই যে স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব ঘটাতে পারব। পাঁচ বছর সময় পেলে তো আমাদেরই সুবিধে। কিন্তু ইংরেজরা ততদিন সবুর না করে বুর্জোয়াদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। আমাদের সূত্র থেকে আমরাও খবর পাচ্ছি যে খুব একটা দেরি হবে না।"

।। বারো ।।

বাংলার লাট সার ফ্রেডারিক বারোজ নাকি মফঃস্বলে গিয়ে মানসকে ও যূথিকাকে ডিনার টেবিলে বসে বলেছেন, "হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব? আমরা চলে যাচ্ছি।" তিনি একথাও নাকি বলেছেন যে আয়ারল্যাণ্ড থেকে চলে যাওয়ার ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, এদেশেও তাই হবে।

তবে কলকাতা ওঁরা সহজে ছেড়ে যাবেন না, শোনা যাচ্ছে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলো থেকে অপসরণ করলেও মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলোতে আরো কিছুকাল 'বিশ্রাম' করবেন। তাই বিস্তর গোরা সৈন্য আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুলিশেও গোরাদের প্রাচুর্য। ওদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও ইউরোপীয়দের প্রাণরক্ষা তবু প্রাথমিক দায়িত্ব দাঙ্গা বাধতে না দেওয়া ও বাধলে তৎক্ষণাৎ দমন করা। অলিতে গলিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ অবশ্য অন্য কথা। লড়াই সেখানে আজও বন্ধ হয়নি, কালও বন্ধ হবে না। যতদিন হিন্দুপ্রধান এলাকায় একটিও মুসলমান থাকবে ও মুসলিমপ্রধান এলাকায় একটিও হিন্দু ততদিন এ লড়াই চলতে থাকবে। এই হোলো আমাদের 'ওয়ার্কিং মডেল অভ্ স্বরাজ'।

বড়দিনের পর দীপিকাদি হঠাৎ একদিন বলেন, "চল, ফিরে যাই। নিজের বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে থাকতে কতদিন ভালো লাগে!"

স্বপনদা বলেন, "সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে, রানু! তুমিই তো আমার তারিণী। বন্দুক ধরতে হলে তোমাকেই ধরতে হবে।"

"এবার বন্দুক নয়, স্টেন গান। দেবি কলকত্তা নেহি দুঁগি। ওরা আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যাক। সেইখানেই নবাবী করুক। আমরা যে ওদের একটা বখরা দিতে চাইনে তা নয়। একটা ন্যায্য রোয়েদাদ হলে আমরাও রাজী। আগেরটার মতো অন্যায্য হলে চলবে না কিন্তু।" দীপিকাদি তা না হলে লড়বেন।

"হ্যাঁ, জনমত ক্রমশ সেইদিকেই ঝুঁকছে। পেছিয়ে রয়েছে শুধু আমার মতো কয়েকজন অবুঝ। বাংলা ভাগ হলে বাঙালী জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। স্টেনগান দিয়ে তুমি ইংরেজ মারবে না, মুসলমান মারবে। আর ওরাও কি ইংরেজ মারবে? না, ওরা হিন্দু মারবে। দু'পক্ষে বাঙালীই মরবে। বাঙালীর সংখ্যাই কমবে। এর নাম যদি ট্র্যাজেডী না হয় তো কার নাম ট্র্যাজেডী? চুম্বকের মতো এ ট্র্যাজেডী প্রত্যেকটি ঘটনাকে টানছে।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

ফিরে যান ওঁরা এলককে নিয়ে ওঁদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে। এলকের কী আনন্দ! হাঁকডাক করে পাড়াশুদ্ধ কুকুরকে জানান দেয় যে সে তার রাজ্যে ফিরেছে। রামদীন বেয়ারা এতদিন দিনমান খৈনী খাচ্ছিল আর সারারাত 'রামা হো' 'রামা হো' বলে তার ভোজপুরী স্বজনদের নিয়ে গলা সাধছিল। পাড়ার হিন্দুদের কত বড়ো ভরসা! তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। তবে তার লাঠিখানা সে সমানে তেল লাগিয়ে যায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস দাঙ্গা ফের বাধবে। এটা একটা বিরতি।

স্বপনদার তর সয় না, তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে এ বইটার এক পৃষ্ঠা পড়েন তো ও বইটার দেড় পৃষ্ঠা। গোটা দশেক বই নাড়াচাড়া করার পর Michelet প্রণীত ফ্রান্সের ইতিহাস পেড়ে নিয়ে বুঁদ হয়ে যান। গত শতাব্দীতে লেখা ক্লাসিক। এখনো বাসী হয়নি। দীপিকাদি বিস্ময় প্রকাশ করলে বলেন, "আজকের বাংলাদেশকে বুঝতে হলে চারশো বছর আগেকার ফ্রান্সের ইতিহাস গুলে খেতে হবে। ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে যদি শিক্ষা লাভ করি তো আমাদের ভবিষ্যৎ আছে।"

আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বপনদার হাত পায়ের কাঁপুনি ক্রমশ কমে যায়। বিনা চিকিৎসায়। খুশি হয়ে দীপিকাদি একটা পার্টি দেন। স্বপনদার গ্রুপের বন্ধুরা তাঁদের জায়াদের নিয়ে উপস্থিত হন। দুশ্চিন্তা প্রত্যেকের মনে। কিন্তু মুখে হাসি ঠাট্টা। হাতে ড্রিঙ্কস্।

একমাত্র মীর সাহেবকে বিমর্ষ দেখা গেল। স্বপনদার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, "বিহারী হনুমানরা নোয়াখালীতে কলির রামচন্দ্রের মিশন মাটি করেছে। গান্ধী যে সফল হবেন তার বিন্দুমাত্র আশা নেই। মুসলিম জনমত একেবারে একবগ্গা। আমাকে সবাই বলছে কালো ভেড়া। আমার অপরাধ আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে বিশ্বাস করি। শুনেছেন বোধহয় বিহারী মুসলমানরা তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। বাঙালী মুসলমানরা তাদের আদর করে ঢোকাচ্ছে। খাল কেটে কুমীরকে ঢোকানোর পরিণাম কী হবে তা কি ওরা অনুমান করতে পারছে? আমি মুখ ফুটে বলতে গেলে মার খাব। তাই চুপ করে দেখে যাচ্ছি। লীগওয়ালাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গকেও অমনি করে মুসলিম-প্রধান বানাতে পারলে কেল্লা ফতে। তামাম বাঙ্গালা পাকিস্তানের সামিল হবে।"

"উর্দুভাষীতে বাংলাদেশ ভরে গেলে বাঙালী মুসলমানের স্বকীয়তা কতটুকু থাকবে? না ওরা মুসলমান হয়েই ধন্য হবে, বাঙালী হয়ে নয়?" স্বপনদা বলেন।

"এই প্রশ্নটাই বাঙালী মুসলমানের পক্ষে জীবনমরণ প্রশ্ন। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাতে খুব কম লোককেই দেখছি। পাকিস্তান হওয়া না হওয়াটাই প্রায় সকলের কাছে এখন জীবনমরণ প্রশ্ন। এক অর্থে মুসলমানের কাছে, আরেক অর্থে হিন্দুর কাছে। বাঙালীকে এর আগে আর কোনো প্রশ্নে এমনভাবে বিভক্ত হতে দেখা যায়নি। মুসলমান ভাবছে পাকিস্তান হলেই জীবন, না হলেই মরণ। হিন্দু ভাবছে পাকিস্তান হলেই মরণ, না হলেই জীবন। অথচ এই ইস্যুতে গৃহযুদ্ধে নামতে কারো উৎসাহ নেই। শহীদেরও না, নাজিমেরও না। হক সাহেবেরও না। যদিও তিনি আবার ভোল পালটেছেন। মুসলিম লীগে ভিড়েছেন।" মীর সাহেব দুঃখ করেন।

"নেতা বলতে ওই একজনই ছিলেন, যাঁকে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিশ্বাস করত। এখন উভয়েই অবিশ্বাস করে। চিত্তরঞ্জনের উপর উভয়ের আস্থা ছিল। তিনিও নেই। তাঁর শিষ্য সুভাষচন্দ্রেরও খোঁজখবর নেই। নেতৃহীন এই দেশ কার দিকে তাকাবে? রবীন্দ্রনাথ থাকলে তাঁর কথার ওজন থাকত। কাজী নজরুল অবশ্য তত বড় নন, তবু প্রকৃতিস্থ থাকলে তাঁর কথারও দাম থাকত। আইনের ভাষায় বলতে গেলে আমাদের কেসটা যাচ্ছে বাই ডিফল্ট। দেখবেন আপনি অবাঙালী হিন্দু মুসলমানরাই বাঙালীর নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবে। ইংরেজের রোয়েদাদে।" স্বপনদা এতদিনে উপলব্ধি করেছেন।

"আপনি কি মনে করেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার কোনো সম্ভাবনা নেই? শহীদ ও শরৎ কিন্তু তা মনে করেন না।" মীর সাহেব বলেন।

"এঁরা যদি একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গড়ে তুলতে পারতেন তা হলে এঁদের স্বপ্ন হয়তো সার্থক হতো। কিন্তু কোয়ালিশনের নামগন্ধ নেই। কেন্দ্রের ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যদি কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট না হয় তো বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্টগুলো কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট হবে না। আর কংগ্রেস গভর্নমেন্টগুলো কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট না হলে লীগ গভর্নমেন্টগুলোও কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট হবে না। কেন্দ্রের ইন্টারিম গভর্নমেন্টের অবস্থা এখন টলটলায়মান। যে কোনো দিন ভেঙে পড়তে পারে।

বড়লাটকেই সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে হবে। যতদিন পারেন চালাবেন। না পারলে কংগ্রেসের হাতে একাংশ, লীগের হাতে একাংশ, শিখদের হাতে একাংশ ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়বেন। তার পর হয় গৃহযুদ্ধ, নয় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি। হ্যাঁ, হিন্দুদের মেজাজ যা দেখছি তারা প্রদেশ ভাগাভাগি চাইবে ও তার জন্যেই দরকার হলে লড়বে।" স্বপনদা দীপিকাদির মেজাজ বুঝে বলেন।

মীর সাহেব ম্লান মুখে বলেন, "তা হলে কি আমাকেও পাকিস্তানে যেতে হবে? জিন্না সাহেব লোকবিনিময় দাবী করছেন।"

"জিন্না সাহেব অবশ্যই পাকিস্তানে যাবেন। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কেন যাবেন? ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা কেন যাবেন? ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা কেন যাবেন? লীগপন্থীরা ইউরোপের লোকবিনিময়ের ইতিহাস পড়েননি। আমি মিশ্লের ফরাসী দেশের ইতিহাস পড়ছি। লোকবিনিময় ভদ্রভাবে হয় না। ক্যাথলিকরা প্রটেস্টান্টদের পিটিয়ে তাড়ায়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। প্রটেস্টান্টরাও বদলা নেয়। শিলারের ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস পড়লে দেখবেন জার্মানরা অতটা নির্মম হয়নি। তাদের নিয়ম ছিল রাজা প্রটেস্টান্ট হলে প্রজারাও প্রটেস্টান্ট হবে। রাজা ক্যাথলিক হলে প্রজারাও ক্যাথলিক হবে। যাদের তাতে আপত্তি তারা স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করবে। পাকিস্তানের হিন্দুরা মার খেয়ে বা মারের ভয়ে পালিয়ে আসতে পারে। মুসলমান হয়ে মারধর এড়াতেও পারে। মুসলমান হতে বাধ্য না হলেও স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হতে পারে। তবে এপারে আমরা মধ্যযুগের ফরাসী বা জার্মানদের মতো আচরণ করব না। আমাদের রাষ্ট্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী সকলেই সমান নাগরিক অধিকার পাবে। যেমন পরবর্তী যুগের ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্মানীতে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম একটা নতুন যুগের প্রবর্তন। মুসলিম সেপারেটিজম একটা পুরাতন যুগের পুনরাবর্তন। তার আদর্শ মধ্যযুগীয় তথা মধ্যপ্রাচ্য। ভারতের মাটিতে আর একটা আফগানিস্থান কি তুর্কিস্থান প্রতিষ্ঠাই তার অভিষ্ট। আমরা এতে সায় দিতেও পারিনে, বাধা দিতেও পারিনে। আমরা এটা গ্রহণও করব না, বর্জনও করব না। ইংরেজরা নতুন এক রোয়েদাদ হিসেবে এই বস্তুটিই দুই পক্ষের সামনে রাখবে। নইলে যেটা করবে সেটা আরো খারাপ। বলকানীকরণ।" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

মীর সাহেব চিন্তাকুল ভাবে বলেন, "সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কংগ্রেস লীগ চুক্তি, যেমনটি হয়েছিল লখনউতে ১৯১৬ সালে। এই জিন্না সাহেবই ছিলেন তার একজন উদ্যোক্তা। অপরজন বাল গঙ্গাধর টিলক। টিলক মহারাজ নেই, গান্ধী মহারাজ রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন না।"

"তিনিও পারবেন না। একে তো হিংসার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে, তার উপর হিন্দু মুসলিম দ্বৈরাজ্যবাদের কাছে। অথবা হিন্দু মুসলিম দুই রাজ্যবাদের কাছে। মুসলিম লীগ আর মাইনরিটির প্রতিনিধি নয়। সেও অপর এক মেজরিটির প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিতে চায়। দেশ ভাগ করলে সত্যিই সে এক মেজরিটির প্রতিনিধি। কিন্তু সেক্ষেত্রে গান্ধীজীর কোনো ভূমিকা থাকে না। কারণ তিনি অবিভক্ত ভারতের হয়ে আটাশ বছর ধরে সংগ্রাম করে এসেছেন। আবার করতে পারেন। গান্ধী জিন্নাকে বন্ধনীভুক্ত করা যায় না, এটা আপনিও মানবেন, মীর সাহেব। সেইজন্যে তিনি দূরে সরে গেছেন। এখন মোকাবিলা জিন্নাতে জওহরলালে। মিস্টার অ্যাটলী এঁদের দু'জনের সঙ্গেই কথাবার্তা চালাচ্ছেন। বড়লাটও তাই করছেন। শেষপর্যন্ত যদি একটা চুক্তি হয় তবে সেটা হবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। তা না হলে সিভিল ওয়ার। তারই মাঝখানে ব্রিটিশ অপসরণ।" স্বপনদা কম্পিত কণ্ঠে বলেন।

"না, না, সিভিল ওয়ার নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে। তবু কোনো সমাধান হবে না। হিন্দুরা জিততে পারে, কিন্তু মুসলমানরা বশ্যতা স্বীকার করবে না। প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করবে। তৃতীয় পক্ষকে ডেকে আনবে। সোভিয়েত রাশিয়াই যে সেই তৃতীয় পক্ষ হবে না তা কে বলতে পারে? খোদা না

করুন।" মীর সাহেব মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করেন।

স্বপনদা বলেন, "এটা একটা ওয়ার অভ্ সাকসেসন। একদিন না একদিন দুই পক্ষের মধ্যে সীজ-ফায়ার হবে। সেই সীজ-ফায়ার লাইনটাই হবে ইন্টারন্যাশনাল বাউণ্ডারি। ইংরেজরা স্বীকৃতি দিলে আর সবাই স্বীকৃতি দেবে। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কলকাতা হিন্দুস্থানের দখলে থাকবেই। তবে মুর্শিদাবাদ হয়তো থাকবে না। আমার মামার বাড়ী পড়বে লাইনের ওপারে। মোগল আমলের সঙ্গে ওঁরাই আমার লিঙ্ক। লিঙ্ক কেটে যাবে। অনুমান করতেই পারছেন আমি কতখানি উদ্বিগ্ন।"

"মুর্শিদাবাদ আপনার মামার বাড়ী। পাবনা আমার যে পৈত্রিক ভদ্রাসন। আপনার মোগল আমলের সঙ্গে লিঙ্ক। আমার যে সুলতানী আমলের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। আমার বেদনা আপনি বুঝবেন না, গুপ্ত সাহেব। আমার এক পা আমাকে পূব বাংলায় টানছে। আরেক পা পশ্চিমবাংলা ছাড়তে নারাজ। আমি কলকাতায় পড়াশুনা করে, ব্যারিস্টারি করে ক্যালকেশিয়ান বনে গেছি। বাড়ীও করেছি। আরো বাড়ী কিনছি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বাড়ী। ওরা এদেশ থেকে আস্তানা গুটিয়ে নিচ্ছে। ওদের কাছ থেকে কিনে আমি পরে ভাড়া দেব। প্র্যাকটিসের আয়ে ঘাটতি পড়লে ভাড়া থেকে পুষিয়ে নেব।" মীর সাহেব কানে কানে বলেন।

স্বপনদা হেসে বলেন, "পাকা বুর্জোয়া।"

ওদিকে দীপিকাদি গল্প করছেন টুকটুকের সঙ্গে। একটু আড়ালে। হাতে ফ্রুট জুস।

"তোর হস্‌পিসের হালচাল কী, টুকুনী?" দীপিকাদি সুধান।

"আমি আর চালাতে পারছিনে, দিদি। অর্থাভাবে নয়। অর্থ একটা প্রশ্নই নয়। প্রত্যেকটি মেয়ে চায় বর আর ঘর। ওদের কাছে এটা একটা ওয়েটিং রুম। আমরা ওদের পড়িয়ে শুনিয়ে কাজকর্ম শিখিয়ে লায়েক করে দিতে চাইলে কী হবে, ওদের মন অন্য জায়গায়। বিয়ে। বিয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতে পারে না। তার জন্যে হিন্দুর মেয়ে মুসলমান হতে রাজী, মুসলমানের মেয়ে খ্রীস্টান হতে রাজী। ধর্ম একটা প্রশ্নই নয়। আজকের এই ধর্ম নিয়ে হানাহানি কাটাকাটির মরুপ্রান্তরে আমার হস্‌পিস যেন একটা ওয়েসিস। কিন্তু এদের বিয়ের পাত্র আমি পাই কোথায়? যারা আসে তাদের মতলব ভালো নয়।" টুকটুক ভেঙে বলে না।

"মীর সাহেবকে তোর সমস্যাটা জানিয়েছিস্?" দীপিকাদি জিজ্ঞাসা করেন।

"জানিয়েছি বইকি। তিনি যা বলেন তা শুনে আমি চিন্তিত। বলেন, এ মেয়েরা পুরুষের স্বাদ পেয়েছে। এরা সে স্বাদ বেশী দিন ভুলে থাকবে না। সেইজন্যে এরা বিয়ের কথা ভাবছে। এদের যেমন করে হোক বিয়ে দিতে হবে। অবশ্য অন্যপূর্বার সঙ্গে বিবাহে পাত্রের সম্মতি নিয়ে। তা না হলে হিন্দুর মেয়েরা ফিরে যাবে হারেমে আর মুসলমানের মেয়েরা মাসীর বাড়ী। সেটা হবে আমাদের পক্ষে পরাজয়। আমরা কেন পরাজয় মেনে নেব? 'আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমা'র সঙ্গে কথাবার্তা চালাও। ওঁরাই নিন এই মেয়েদের ভার। খ্রীস্টান সমাজেই বিয়ে দিন। যদি সৎপাত্র জোটে। সিস্টাররা আসাযাওয়াও করছেন। কিন্তু সেটাও হবে আমার পক্ষে পরাজয়। সবচেয়ে ভালো হতো যদি এই মেয়েদের গুরুজনরা এদের ঘরে ফিরিয়ে নিতেন। যাদের সন্তানসম্ভাবনা হয়নি ও হবে না তেমন মেয়েদের কারো কারো ফিরে যাওয়ার আশা আছে। তিনটি কিছুদিন পরে ছ'টি হবে। তাদের কী আশা? আমি কি তাদের নিয়েই দায়গ্রস্ত হব, না সিস্টারদের হাতে তাদের সঁপে দেব? আমার নাচ গান শিকেয় তোলা রয়েছে। আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি।" টুকটুক দুঃখ করে।

"আমি তো দেখছি তুই আরো নবীন হয়েছিস্। আরো আকর্ষণীয়। বিয়ের কনের মতো দেখতে। বর আসবে এখুনি। নিয়ে যাবে তখুনি। না, তোকে এ দায় চিরদিন বইতে হবে না। দেশের নানান জায়গায় নানান প্রতিষ্ঠান আছে। চাঁদার বিনিময়ে তারা এ দায় নেবে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিশ্র

প্রতিষ্ঠান আর একটাও নেই। আওয়ার লেডীকেও মিশ্র প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। আমরা যে নেশন গড়তে চাই তার আদর্শ হচ্ছে তোর হস্‌পিস। বাচ্চা হলে তাদের সব ক'টাকেই আমরা ভারতীয় হিসাবে মানুষ করব, হিন্দু হিসাবে বা মুসলমান হিসাবে নয়। কেনই বা ওরা খ্রীস্টান হিসাবে মানুষ হবে? অবশ্য সাবালক হয়ে স্বেচ্ছায় খ্রীস্টান হতে পারে। তিনটে সমাজই তুই ভিতর থেকে দেখেছিস্। হিন্দু আর মুসলিম আর খ্রীস্টান। তোর চেয়ে অভিজ্ঞ আর কে আছে যে এ দায় বহন করতে পারে? তবে এটাও আমি বলব না যে এর জন্যে তোর বিয়ের বিঘ্ন হোক বা তোর নাচগানের ক্ষতি হোক। তোর নিজের জীবনটাকেও নতুন করে গড়ে তোলার দায় আছে।" দীপিকাদি সহানুভূতিভরে বলেন।

"না, না, বিয়ে আর নয়। তেমন পুরুষ কেউ নেই যার সঙ্গে জোড় মিলবে। আমার মা বাবার ইচ্ছাও নয় যে আমি আবার চোখ বুজে ঝাঁপ দিই। নাচ গানের বেলা তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু কলকাতায় থেকে তাঁদের বুড়ো বয়সে দেখাশুনা করতে হবে। যাক, পরে তোর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। তোরা যে এ পাড়ায় ফিরেছিস্ এইটেই সৌভাগ্য। আসিস্ আমাদের ওখানে। হস্‌পিসে তো অবিলম্বে।" টুকটুক আমন্ত্রণ করে।

এমন সময় কফির পেয়ালা হাতে বাবলী এসে যোগ দেয়। "তোমরা দুই সখীতে মিলে কিসের চক্রান্ত করছ?"

"বিপ্লবের। সত্যি বলছি। এটাও একজাতের বিপ্লব। এইসব অপহৃতা নারীদের বিবাহ বা পুনর্বিবাহ। দোষ তো এদের নয়। কেন এরা সারা জীবনের জন্যে সাজা পাবে? আমরা এদের বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু বহু বাধা। তোমরা এ ভার নেবে?" দীপিকাদি প্রস্তাব করেন।

"এটা একটা সমস্যাই নয়, বৌদি। নিম্নতর বর্ণে বা নিম্নতর শ্রেণীতে বিয়ে করতে রাজী হলে পাত্রের অভাব হবে না। অবশ্য একটু আধটু মিথ্যা বলতে হবে। পাত্রপক্ষও বলে। সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বর্ণের অনুপান থাকলে কার্যসিদ্ধি সুগম হয়। আর যদি সমান বর্ণে বা সমান শ্রেণীতে বিয়ে দিতে হয় ভয় তবে পণযৌতুক ডবল করতে হবে। 'অপহৃতা' এই তথ্যটা বেমালুম চেপে যেতে হবে।" বাবলী পরামর্শ দেয়।

"এটা তো ঠিক কমিউনিস্টের মতো কথা হলো না, বাবলী। পাবলিকের টাকায় আমাদের হস্‌পিস চলছে। সে টাকা কি আমরা এইভাবে অপচয় করতে পারি? মিথ্যার আশ্রয় একেবারেই নেওয়া হবে না।" দীপিকাদি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

"তা হলে ওদের বিয়ে না দিয়ে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা ওদের সব সময়ের কর্মী করব। মাসোহারা দেব। বিপ্লবের পরে ওদের বিয়ে হবে। বুর্জোয়ারাই লুফে নেবে।" বাবলী বাঁকা হাসি হাসে।

"যৌবনের ধর্ম বলে একটা কথা আছে। কখন কী করে বসে তার দায়িত্ব কি তোমরা নেবে? না আমাদের উপরেই চাপাবে?" দীপিকাদি জেরা করেন।

"এর উত্তর আমি দেব না। তোমরা বুর্জোয়ারা কি জানো না কেমন করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হয়? নিত্য নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছ, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিত্য নূতন জন্মনিবারকও উদ্ভাবন করছ। আর নারীহরণের কথা যদি উঠল তবে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বিবাহপ্রথাটাই বা একপ্রকার নারীহরণ ছাড়া আর কী? বর এসে কনেকে ধরে নিয়ে যায় ওর সম্মতির বয়সের আগেই, কিংবা ওর নিজের সম্মতি না নিয়েই। সবই তো বেচাকেনার ব্যাপার। ম্যারেজ মার্কেট।" বাবলী টিটকারী দেয়।

টুকটুক এতক্ষণ নীরব ছিল। বলে, "আচ্ছা, বাবলীদি, আমি যদি হতাশ হয়ে হিন্দুর মেয়েদের আবার হারেমে পাঠিয়ে দিই ও মুসলিম মেয়েদের আবার মাসীর বাড়ী ফেরৎ দিই তা হলে কি সেটা ভালো হবে? আমার কাছে মাসীর বাড়ী থেকে কুটনী আসছে আর হারেম থেকে খোজা। ভয় দেখিয়ে

ভাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি হলে কী করতে? ওদের হাতেই মেয়েগুলোকে তুলে দিতে?"

বাবলী জবাব দিতে পারে না। দীপিকাদির দিকে তাকায়।

"তুমি, আমি, টুকটুক সব আগে নারী। তার পরে কমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া বা আর কিছু। নারীর এই বিপদে আমরা সবাই এককাট্টা। এই মেয়েরা যদি আত্মনির্ভর হতো তাহলে আমাদের ভাবনার কারণ থাকত না, কিন্তু সে শিক্ষা এদের নেই, সেদিকে মনোযোগও নেই। বাঙালীর মেয়ের একমাত্র লক্ষ্য বিয়ে। বিয়ের পর স্বামী ও সংসার। এরা সর্বক্ষণ বিয়ের চিন্তাই করছে। কারো কারো বিয়ে হয়েও গেছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার মুখ নেই। নতুন করে বিয়ে দিতে হবে। নইলে বিপথে যাবে। এরা কেউ তোমার সহকর্মী হবে না, বাবলী। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। যদি কাউকে তোমার পছন্দ হয় তুমি তার কাছে প্রস্তাব করতে পারো। সে যদি রাজী হয় তবে আমরা কমিটিকে বলে রাজী করাব।" দীপিকাদি বলেন।

" দেখি আমার কমরেডরা কী বলেন। আমার একার মত অনুসারে তো কাজ হবে না। দলভুক্ত হওয়ার এই এক অসুবিধে।" বাবলী কবুল করে।

টুকটুক হুঁশিয়ারি দেয়, "আমি থাকতে এরা হারেমে বা মাসীর বাড়ী যাবে না, কিন্তু ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের কনভেন্টে যেতে পারে। মীর সাহেবেরও সেই মত।"

"তাতে কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম সমাজে বিপ্লব আসবে না, টুকটুক। আমি চাই হিন্দু সমাজ মুসলিম সমাজ এই মেয়েদের সসম্মানে ঘরে ফিরিয়ে নিক। বা ঘর সংসার দিক। এ রকম কেস তো নোয়াখালীতে, বিহারে ও অন্যান্য স্থানেও হয়েছে। অবলারাই হয়েছে গুণ্ডাদের সহজ শিকার। আমাদের এই মেয়েরা টেস্ট কেস।" দীপিকাদি বলেন।

"বৌদি, ওসব হলো সমাজসংস্কারের ব্যাপার, সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপার নয়। সমাজসংস্কার অপেক্ষা করতে পারে, সামাজিক ন্যায় তা পারে না।" বাবলীর মতে।

"নারীর লজ্জা যাদের বুকে বাজে না তাদের মুখে সামাজিক ন্যায়ের খই ফোটে। কিন্তু সমাজের অর্ধেকই তো নারী। নারী যদি একবাক্যে বলে আর গর্ভধারণ করবে না তা হলে সেইদিনই সমাজের বাকী অর্ধেকেরও শেষ।" বৌদি মনে করিয়ে দেন।

"ভালো কথা," বাবলীর মনে পড়ে যায়। "স্বপনদা কি জানেন যে তাঁর ক্যারামেল এখন নার্সিং হোমে? সৌম্যদাকে ট্রাঙ্ক কল করা হয়েছে।"

"তাই নাকি?" বৌদি লাফিয়ে ওঠেন। "দ্যাট ইডিয়ট সৌম্য। এমন সময় কেউ পদ্মার ওপারে থেকে আশ্রম চালায়? আসতে চব্বিশ ঘন্টা লাগবে। চল, আমরা দেখে আসি।"

"ওর কেবিনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, বৌদি।" বাবলী জানায়।

"তা হলে তো অবস্থা সঙ্গীন। কী করা যায়, বল তো? বাড়ীর পার্টি ছেড়ে কোথাও যাওয়াটাও মানায় না। আমিই যখন হস্টেস।" বৌদি ছটফট করেন। খবরটা স্বপনদাকে শোনাবেন কিনা চিন্তা করেন।

টুকটুক বলে, "এইজন্যেই আমি মা হতে চাইনি। সেইজন্যেই বেঁচে আছি।"

বৌদি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে টেলিফোন করতে যান। কিছুক্ষণ পরে উল্লাসিত বদনে ফিরে আসেন। "গেস, বয় অর গার্ল।"

"গার্ল।" বাবলীর অনুমান। "বয়।" টুকটুকের অনুমান।

"বোথ।" বৌদি হেসে লুটিয়ে পড়েন।

নিজের বাড়ীতে নিজের স্টাডিতে বসে স্বপনদা দেশকাল ভুলে মিশ্লের ফরাসী ইতিহাসে ডুবে রয়েছেন, হঠাৎ একদিন সুকুমার এসে হাজির হয়। টেবিলের উপর একটা বোতল রেখে বলে, "বর্দো।

আপনার সমবয়সী।"

"অ্যা! বল কী হে, বর্মো! তুমি কেমন করে জানলে যে মঁতেন আমার প্রিয় লেখক আর তাঁর প্রবন্ধ আমার প্রিয় পাঠ্য? তাঁর যুগটাও এমনি এক বিশৃঙ্খলার যুগ ছিল। অনেক ধন্যবাদ। আমিও তোমাকে খালি হাতে ফিরতে দেব না, সুকুমার। তোমাকে তো করে খেতে হয়। মাশুলও দিয়েছ নিশ্চয়।" স্বপনদা মূল্য দিতে চান।

"মাফ করবেন, স্বপনদা। ওটা নিছক উপহার। তবে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পেলে আমি কৃতার্থ হব। এসব ঘরোয়া ব্যাপার আর কোনো ব্যারিস্টারের কাছে ভাঙতে যাব না। আপনি বলতে গেলে আমাদের আপনার লোক।" সুকুমার গদগদ স্বরে বলে।

বইখানা সরিয়ে রেখে স্বপনদা ঘুরে বসেন। "ব্যাপার কী, সুকুমার?"

"সীরিয়াস। দেশ ভেঙে যেতে বসেছে, সেটা তো সকলের ভাবনা। বিশেষ করে আমার নয়। কিন্তু আমার যে ঘর ভেঙে যেতে বসেছে। সেই ভাবনায় আমি পাগল। আমার ছেলের কী হবে, স্বপনদা?" সুকুমার কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে।

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে, ভাই। খুলে বল। ডাক্তারকে আর ব্যারিস্টারকে সব কিছু খুলে বলতে হয়। অ্যাডাল্টারি?" তিনি গলা খাটো করেন।

"না, না। মিলি সেরকম মেয়ে নয়। আর আমি যদিও শুকদেব নই তবু বিয়ের পর থেকে একনিষ্ঠ পতি।" সুকুমার উত্তর দেয়।

"তা হলে ডিভোর্স চাও না। আর কী চাও?" স্বপনদা সুধান।

"চাই আমার ছেলেকে। আমার একমাত্র সন্তানকে। মিলি স্থির করেছে এখন থেকে তার বুড়ো বাপ মার দেখাশুনা করবে। তাঁদের নিয়ে লণ্ডনে চলে আসুক। বাড়ী মজুত। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চালু হলে ওঁরা বিনা খরচে চিকিৎসা পাবেন, ওষুধপত্র পাবেন। একটা রেভোলিউশনারি স্টেপ। আমরাই নিচ্ছি, আমরা লেবার পার্টির লোক। শ্বশুরঠাকুর রাজী, কিন্তু শাশুড়ীঠাকুরানী নারাজ। ওদেশে গঙ্গা নেই। কাশী নেই। তাই মরেও শান্তি নেই। তাঁর মেয়ে এই সব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিচ্ছে। মা থাকবেন গঙ্গাতীরে, সুতরাং সেও থাকবে কলকাতায়। ছেলেটাকে দিচ্ছে শান্তিনিকেতনে। সেখানে পড়ে ওর ভবিষ্যৎ কী? ওদিকে লণ্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে ওর জন্যে সীট রাখতে আমি গলদ্‌ঘর্ম। নেহাৎ ব্রিটিশ বর্ণ বলেই সে এই দুর্লভ সুবিধা পাবে। আমার প্ল্যান ওকে যথাকালে অক্সফোর্ড কি কেমব্রিজে দেওয়া। নেহরু বলো, সুভাষ বলো, সুহরাবর্দী বলো, নাজিমউদ্দীন বলো, কে না অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে পড়েছেন? মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ, তিনিও কেমব্রিজের ছাত্র। মিলি নিজের জীবন নিয়ে যা খুশি করুক, কিন্তু রাণের জীবন নিয়ে এ ছেলেখেলা কেন? আমার জীবনটা যে ব্যর্থ সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কলকাতায় আমাকে কেউ চাকরি দেবে না। লীগ তো নয়ই, কংগ্রেসও না। দিল্লীতেও আমার তেমন 'পুল' নেই। একমাত্র কৃষ্ণ মেনন। শুনছি তাঁকে লণ্ডনেই রাখতে চান নেহরু। প্যাটেল যদিও বিমুখ। মেননের অপরাধ তিনি বামপন্থী। অথচ লেবারের সঙ্গে কংগ্রেসের তিনিই তো যোগসূত্র। যতদূর দেখছি আমাকে মেননের প্রসাদে লণ্ডনেই চাকরি করতে হবে। দিল্লী দূর অস্ত্।" সুকুমার হাত কচলাতে থাকে।

"তার মানে ডিভোর্স নয়, সেপারেশন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে নেয় ছেলে কার কাছে কত বয়স অবধি থাকবে। কোর্টে মাকে অগ্রাধিকার দেয়, কিন্তু বরাবরের জন্যে নয়। বলা বাহুল্য, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। এমনও তো হতে পারে যে ছেলে মায়ের কাছে থাকলে মূর্খ হবে, বাপের কাছে থাকলে পণ্ডিত হবে। ছেলের যাতে মঙ্গল হয় কোর্ট সেটাই বিবেচনা করবেন। তোমারও বিবেচনা করা উচিত তুমি ওকে ওর মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে ওর মায়ের অভাব পূরণ করবে কী করে। তা ছাড়া তুমি পুরুষমানুষ। নারী যে আর কখনো তোমার জীবনে আসবে না তা নয়।

ডিভোর্স হচ্ছে সেপারেশন থেকে এক পদক্ষেপ দূরে। তুমি চলে এস, সুকুমার। এই কলকাতা শহরেই তোমার একটা হিল্লে হতে পারে।" স্বপনদা আশা দেন।

"ভাবছি। বিলেতের কয়েকটা পত্রিকার স্পেশাল রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে দিল্লীতে থাকা যায় ও কলকাতায় ঘোরা যায়। বিশেষত এই যুগসন্ধির সময়। একরাশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই এক বছর কি দেড় বছরের মধ্যে। অ্যাটলীর ঘোষণা শুনেছ নিশ্চয়। ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই ভারত ত্যাগ করবে। ভারতীয়রা একমত হলে এক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। নয়তো একাধিকের হাতে। তার মানে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে পারে, বাঙালীরা যদি একমত হয়। নয়তো পার্টিশন ভারতেরও, বাংলাদেশেরও। সিভিল ওয়ার কোনো পক্ষ চায় না, কিন্তু আপনা আপনি বেধে যেতে পারে, ইতিহাসে তার বহু নজীর রয়েছে। তবে লেবার গভর্নমেন্টের ভিতরের খবর ইণ্ডিয়াতেও একপ্রকার আইরিশ সেটলমেন্ট সম্ভবপর। সেখানে যেমন আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের জন্যে আইরিশ ফ্রী স্টেট আর ইউনিয়নিস্টদের জন্যে নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড, এখানেও তেমনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের জন্যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আর মুসলিম সেপারেটিস্টদের জন্যে পাকিস্তান। মনে আছে বোধ হয় যে আলস্টার পুরোপুরি কোনো পক্ষ পায়নি। তেমনি, বাংলাদেশও পুরোপুরি কোনো পক্ষ পাবে না। কলকাতা হয়তো ফ্রী সিটি হবে। কিংবা জয়েন্ট সিটি। দেশ বিভক্ত হলেও, প্রদেশ বিভক্ত হলেও, কলকাতা অবিভক্ত থাকবে। কলকাতা নিয়ে সিভিল ওয়ার কেন বাধবে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে তার জন্যে তৈরি থাকাই সমীচীন।" সুকুমার এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"হঠাৎ স্রোতের মাঝখানে ঘোড়াবদল হলো কেন? ওয়েভেল কেন যাবেন, মাউন্টব্যাটেন কেন আসবেন? মাত্র কয়েক মাসের তো রাজত্ব।" স্বপনদা জানতে চান।

"ওয়েভেল থাকলে কংগ্রেস নাও থাকতে পারে। সম্পর্কটা অনেকটা মিলির সঙ্গে আমার মতো। কংগ্রেস যা বলে ওয়েভেল তা শোনেন না। ওয়েভেল যা বলেন কংগ্রেস তা শোনে না। লেবার গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে সেপারেশন পছন্দ করেন না। আমাদের মাঝখানে তৃতীয় কোনো নারী বা পুরুষ নেই। লেবার ও কংগ্রেসের মাঝখানে মুসলিম লীগ রয়েছে। লেবার লীগকেও হাতছাড়া করতে চায় না। করলে বার্গেনিং পাওয়ার কমে যাবে। দু'কূল বজায় রাখার জন্যে মাউন্টব্যাটেনকে পাঠানো হবে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মেয়ের ঘরের নাতির ছেলে বলে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। ব্যক্তিগত চার্মও প্রচুর। কংগ্রেসকে তিনি এক পকেটে ও লীগকে আরেক পকেটে পুরবেন। শিখদের নিয়েই সংশয়। তার চেয়েও বেশী গান্ধীজীকে নিয়ে। ওই বৃদ্ধকে পকেটস্থ করা কারো সাধ্য নয়। মাউন্টব্যাটেন যদি সফল হন তবে অসাধ্যসাধন করবেন।" সুকুমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দোলায়িত।

স্বপনদা সুকুমারকে অভয় দেন। "তোমাদের দু'জনের মাঝখানে যখন কেউ নেই তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, সুকুমার। রূপ আপাতত ওর মায়ের জিম্মাই থাকুক। পরে দেখা যাবে কোথায় থাকে। তুমিও চেষ্টা করো দিল্লীতে চলে আসতে। তোমার মতো লেবারের ঘরের মাসী আর কংগ্রেসের ঘরের পিসীর জন্যে ঠাঁই না থাকে তো কার জন্যে আছে? মাউন্টব্যাটেনের দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়তে পারলে আরো ভালো হয়। আমরা ভিতরের খবর আরো বেশী পাব। চীয়ারিও।" স্বপনদা বর্দোর গ্লাস তুলে মুখে ছোঁয়ান।

"চীয়ারিও।" সুকুমার তাই করে।

।। তেরো ।।

চাঙ্গা হয়ে স্বপনদা জমিয়ে বসেন। "এখন বলো প্যারিসে আর কী দেখলে? কেমন আছে প্যারিস? যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত?"

"একেবারেই না। বোঝাই যায় না যে ওর ওপর দিয়ে একটা মহাযুদ্ধের পাঁচ বছর গেছে। ও তেমনি সুন্দরী, তেমনি চিরযৌবনা। কিন্তু এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় প্যারিসের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতিকে। হিটলার তো আদেশ দিয়েছিলেন, প্যারিস ত্যাগের আগে তাকে পুড়িয়ে খাক করে দাও। Von Choltitz কিন্তু সে আদেশ অমান্য করেন। প্যারিস যে মানব সভ্যতার হৃৎপিণ্ড। তাকে কি প্রাণ ধরে ধ্বংস করা যায়। নইলে সে যা হতো তা আর একটা বার্লিন। অপূরণীয় ক্ষতি।" সুকুমার যতদূর জানে।

স্বপনদা প্রায় কেঁদে ফেলেন। ধরা গলায় বলেন, "মানুষ আছে। মানুষ আছে। মানবজাতির আশা আছে। আশা আছে। হিউমানিজম লোপ পায়নি।"

"তার পর, বার্লিনের কী হাল? ঘুরে এসেছ আশা করি।" স্বপনদা উৎসুক।

"বার্লিন এখন এক ধ্বংসস্তূপ। চ্যান্সেলারি একেবারে সমভূম। ওখানে হিটলার থাকত একটা বাঙ্কারে। মাটির তলায়। এ যেন সাপ মারতে গিয়ে বাস্তু ভেঙে ফেলা।" সুকুমার তুলনা করে।

"নিয়তি। নিয়তি।" স্বপনদার বাগ্‌রোধ হয়। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, শুনছি বার্লিন নাকি ভাগাভাগি হবে। লাইন টানা হবে কোথায়?"

"শুনছি ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট বরাবর।" সুকুমার উত্তর দেয়।

" তা হলে উন্টার ডেন লিণ্ডেন পড়বে কাদের ভাগে? পূব দিকে যখন তখন রুশ ভাগে নয় তো?" স্বপনদা ভয় করেন।

"যা বলেছেন। আমাকে তো ঢুকতেই দিত না। আমার যে ব্রিটিশ পাশপোর্ট। খুলে দেখাই আমার জন্ম ইণ্ডিয়ায়। চার দিক কড়া পাহারা। কিছুই উপভোগ করা যায় না। কে বলবে যে এ সেই বার্লিন।" সুকুমারের খেদ।

"তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করছি কেন, জানো?" স্বপনদা চমক দেন।

"না তো। কী করে জানব?" সুকুমার ঘাবড়ে যায়।

স্বপনদা কাঁপা গলায় বলেন, "কলকাতারও সেই দশা হতে পারে। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে জেলা ভাগ, শহর ভাগ। ভাগাভাগির কোথায় দাঁড়ি টানবে? দিল্লী আর কলকাতা এই দুটো শহরেরই বিপদ। সিভিল ওয়ারের উপর ছেড়ে দিলেও বিপদ, অ্যাওয়ার্ডের উপর ছেড়ে দিলেও বিপদ। কী করে আমি বিশ্বাস করব যে ইংরেজরা বাংলাদেশের একাংশ হিন্দুদের দিতে গিয়ে কলকাতার একাংশ মুসলমানদের দিয়ে যাবে না? আমার তো আশঙ্কা শিয়ালদা বরাবর লাইন টানা হবে। মূল শহরটা পড়বে হিন্দুদের ভাগে, পূব দিকের বস্তিগুলো মুসলমানদের ভাগে। বরাবর আমি প্রদেশভাগের বিপক্ষেই ছিলুম। তোমার বৌদির সঙ্গে মতভেদ ছিল। ষোলই আগস্টের দাঙ্গাহাঙ্গামার পর নির্বাসিত হয়ে আমার মন ভেঙে গেছে। যেটুকু মায়া ছিল নোয়াখালীর হাঙ্গামার পর সেটুকুও আর নেই। এখন ভাঙন আসছে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদি না হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাঙালীত্ব প্রবল হয়। যেমন ফরাসীদের মধ্যে, যেমন জার্মানদের মধ্যে দুই শতাব্দী পরে প্রবল হয়েছিল। আমাদের বেলা হয়তো দুই শতাব্দী নয়, এক শতাব্দী। হয়তো আরো কম। আধ শতাব্দী। কিন্তু আপাতত হয় সিভিল ওয়ার নয় পার্টিশন।" স্বপনদা আকুল কণ্ঠে বলেন।

"অ্যাটলীকে বিশ্বাস করুন। মাউন্টব্যাটেনকে চান্স দিন।" সুকুমার ভরসা দেয়।

"তুমি তো জানোই, আমি ইংরেজদের বিশ্বাস করি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। প্রথমে সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে। পরে সুভাষ আর তার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্যে। বাধ্য হয়ে ওরা মুসলিম লীগের দিকে ঝোঁকে। মুসলিম লীগও ওদের দিকে। এই যে আঁতাত এর থেকে ইংরেজরা বেরোতে পারবে না। হিন্দুদের আরো আসন দিতে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড চেয়েছিলেন, ইউরোপীয় সিভিলিয়ানরা গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরেন। স্টীয়ারিং হুইল চেপে ধরলে ড্রাইভারের হাত বেঁকে যায়। তেমনি ম্যাকডোনাল্ডের হাত এদিক ওদিক হয়ে যায়। নইলে তিনি বাঙালী হিন্দুদের উপর অমন অবিচার করতেন না। এবারেও কি ইউরোপীয়ান সিভিলিয়ানরা স্টীয়ারিং হুইলে হাত লাগাবেন না? তা ছাড়া বেসরকারী ইউরোপীয়ানরাও সেবারকার মতো এবারেও মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে জোর ওকালতী করবেন। সম্প্রদায় এখন নেশন বলে পরিচয় দিচ্ছে। হোমল্যাণ্ড সে আদায় করে নেবেই, সেটাও হবে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক। সেইজন্যেই তো আমার আশঙ্কা কলকাতার বেলা অ্যাটলী অথবা মাউন্টব্যাটেনের হাত বেঁকে যাবে। কে জানে হয়তো আমার এই বাড়ীখানাও পড়বে পাকিস্তানে। তোমার বৌদি ইংরেজদের আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাই স্টেনগানের জোগাড় দেখছেন। উনি কোনো মতেই অমন অন্যায় রোয়েদাদ মেনে নেবেন না। বলছেন, মেরি কলকত্তা নেহি দুঁগি। ঝাঁসীর রানীর মতো কথা।" স্বপনদা মুচকি হাসেন।

"ঝাঁসীর রানীর ভূমিকাটা তো মিলির, যেমন জোন অভ্ আর্কের ভূমিকাটা জুলির। বৌদি যদি এদের কারো ভূমিকায় নামেন এরা যাবে কোথায়? ওসব অবাস্তব জল্পনাকল্পনার দিন গেছে। এখন শুধু ইংরেজরা নয়, মুসলমানরাও লড়াইয়ে নেমেছে। দুই ফ্রন্টে লড়তে গেলে হিটলারের দশা হবে। জুলি অমন কাজ করবে না, তার দুই বাচ্চা নিয়ে সে নাজেহাল। রূপাকে ফেলে মিলিও যে আগুনে ঝাঁপ দেবে তা মনে হয় না। এখন বৌদিকে আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত ও নিরস্ত্র করুন, স্বপনদা।" সুকুমারের সবিনয় অনুরোধ।

"হা হা! নিরস্ত ও নিরস্ত্র করলে করবে আমি নয়, এলফ্। ওর মুখ চেয়েই উনি ওই জঙ্গী ভূমিকা ছাড়বেন। সোজা কথাটা এই যে ইংরেজদের দিতে হবে সর্বপ্রকার অভয়। প্রাণের, ধনের, ধর্মকর্মের, ব্যবসা বাণিজ্যের। তা হলে ওরাও রাজনৈতিক সুবিচার করবে।" স্বপনদা পরামর্শ দেন।

"চমৎকার। আরো ভালো হয় যদি আরো দুটি বাক্য জুড়ে দেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাসে রাজী হতে হবে আর কমনওয়েলথে যোগ দিতে হবে। দেখবেন আস্ত কলকাতা আপনাদের ভাগে পড়বে, সমেত গ্রেটার ক্যালকাটা। ওদিকে দিল্লী, সমেত গ্রেটার ডেলহি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে দিয়ে একবার পাশ করিয়ে নিতে পারলে সেই বাউণ্ডারিই হবে পারমানেন্ট বাউণ্ডারি।" সুকুমার গ্যারান্টি দেয়।

"তা হলে বাঙালী জাতি আর কোনো দিন এক হবে না। বাংলাদেশ আর কোনো দিন এক হবে না।" স্বপনদার চোখে জল এসে পড়ে।

"ইতিহাসে কিছুই ফাইনাল নয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সত্যিকার ঐক্যবোধ জন্মালে ভাঙা দেশ ও ভাঙা প্রদেশ আবার জোড়া লাগবে। মারামারি করে গায়ের জোরে একাকার করা একটা প্রমাদ। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করে হিন্দু মুসলিম প্যাক্টও তেমনি ঐক্যের নামে ছলনা। তৃতীয় পক্ষের নির্বন্ধে বিবাহ না করে তৃতীয় পক্ষের সাক্ষিশীতে বিবাহভঙ্গই এক্ষেত্রে বিজ্ঞতা।" সুকুমার নিজের সমস্যার কথা ভেবে বলে।

"ওয়েট অ্যাণ্ড সী।" স্বপনদা একসঙ্গে দুই সমস্যার উত্তর দেন।

সুকুমার থাকতেই সৌম্য এসে উপস্থিত। যদিও একুশ দিনে নয়, তার কয়েকদিন পরে, তবু উপলক্ষটা একই। নবজাতকদের মুখদর্শন। স্বপনদাকে ও বৌদিকে সাদর নিমন্ত্রণ। সুকুমার ও মিলিকে

আগেই করা হয়ে গেছে। জুলির কনফাইনমেন্টের তারিখ আন্দাজ করে সুকুমার লণ্ডন থেকে উড়ে এসেছে। জুলিকে একবার শেষবারের মতো দেখতে, যদি না বাঁচে। মিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারত সম্বন্ধে একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার হতে যাচ্ছে বলেই তার আসা। আর এমনি বিধাতার কৌতুক যে বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ওদেশে মিস্টার অ্যাটলীর সেই যুগান্তকারী ঘোষণা আর এদেশে জুলির যমজ সন্তান লাভ।

"ওহে সৌম্য, তোমাকে একটা কথা বলব বলে কয়েকদিন থেকে খুঁজছি। কিন্তু তার আগে বলো, এ কী অঘটন। তোমার এমন চেহারা কেন? তোমার সেই সুপুষ্ট দাড়ি কোথায়?" স্বপনদা সহাস্যে সুধান।

"আর বলেন কেন, স্বপনদা? আমার মানত ছিল ভারত যেদিন স্বাধীন হবে সেইদিন আমি আমার দাড়ি বিসর্জন দেব। আমার বাচ্চাদের কোলে নিতে গেলুম, নার্স বলে কি না দাড়িতে কত কী বীজাণু আছে, বাচ্চাদের পক্ষে ছোঁয়াচে হতে পারে। যান, আগে দাড়ি কামান, তার পর ওদের কোলে নেবেন। কত বড়ো একটা মরাল ক্রাইসিস! ভেবে দেখি স্বাধীনতা তো একরকম মুঠোর মধ্যে। মিস্টার অ্যাটলী কথা দিয়েছেন। অনিশ্চিত যেটা সেটা স্বাধীনতা নয়, অখণ্ডতা। তা হলে দাড়ি ফেলে দিয়ে বাচ্চাদের আদর না করি কেন?" সৌম্য হাসতে হাসতে বলে।

"বেশ করেছ। এখন তোমাকে রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে। দাড়ি রাখার বয়স তো চলে যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে আবার রেখো, যদি কবিকল্প হতে চাও। এখন শোন তোমাকে কী বলতে চেয়েছি। তোমাদের যমজ সন্তান লাভ একটি প্রতীকী সূচনা। ভারতবর্ষ ভেঙে যমজ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে। অ্যাটলীর ঘোষণা যেদিন তোমাদের যমজ সন্তান লাভ সেইদিন। এটা কি নিছক কাকতালীয়? না বোধ হয়।" স্বপনদার ধারণা।

"যাঃ! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। আমাদের বাচ্চা দুটি কী অপরাধ করেছে যে দেশের ভাঙন সূচনা করবে? ওটা ব্রিটিশ পলিসি। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল থেকে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। জিন্নার সঙ্গে চার্চিলের যোগসাজস। শেষে অ্যাটলীও এক কোপ দিলেন। এট টু ব্রুটে! তুমিও, ব্রুটাস।" সৌম্য ক্ষোভ জানায়।

সুকুমার অ্যাটলীর পক্ষ নেয়। "ভারতের অখণ্ডতা তো তিনি নাকচ করছেন না। সেটা ভারতীয়দের উপরেই ন্যস্ত করছেন। ভারতীয়রা যদি দ্বিমত হয় তবে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হবে। যদি বহুমত হয় তবে বহুধা বিভক্ত হবে। ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবে। তার বেয়োনেট সরিয়ে নেবে।"

সৌম্য এই নিয়ে তর্ক করতে আসেনি। সে এখন খোশ মেজাজে আছে। বলে, "স্বপনদা, এদের দুটোর কী নাম রাখা যায়, বলুন তো?"

"তোমার বৌদি বলেন, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা। মহাভারতের দুই প্রধান চরিত্র। তাঁরা অবশ্য যমজ ছিলেন না। আমি এখনো ভেবে দেখিনি।" স্বপনদা বলেন।

সুকুমার খোঁচা দেয়। "সৌম্য, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। জুলিকে তুমি দ্বিগুণ কষ্ট দিলে। ও যদি মারা যেত তোমাকে জেলে পোরা উচিত হতো।"

সৌম্য বলে, "আমি তো জেলে যাবার জন্যে সব সময় তৈরি।"

স্বপনদা হাসেন। "প্রকৃতির প্রতিশোধ। এতকাল ধরে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের এই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আরো দেরি করলে ট্রিপলেটস জন্মাত।"

"তা হলে ফাঁসী দেওয়া উচিত হতো।" সুকুমার রায় দেয়।

দীপিকাদি অন্য ঘরে ছিলেন। সৌম্য ও সুকুমারকে নিয়ে স্বপনদা তাঁর কাছে যান। সব শুনে তিনি বল্লেন, "সব ভালো যার শেষ ভালো।"

অতএব সবাইকে মিষ্টি মুখ করতে হবে। বৌদি তার আয়োজন করেন। স্বপনদা বলেন, "শোন, সৌম্য, তোমাকে আমার আরো কিছু বলার ছিল। তাই নিয়ে আমার মন ভারাক্রান্ত। পাঁচবছর আগে ইংরেজ রাজের উপরে তোমরা কুইট নোটিস জারী করেছিলে। সে নোটিস সে সময় কার্যকর হয়নি। হতে যাচ্ছে আজ থেকে পনেরো মাসের মধ্যে। রেড আর্মিকে রুখতে হলে পশ্চিম জার্মানীতে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা চাই। অগত্যা ভারত থেকে তাদের অপসরণ করতে হবে। তার পরে কী? পাওয়ার ভ্যাকুয়াম। শূন্যতার সুযোগ নিয়ে সর্বব্যাপী অরাজকতা। অথবা একরাশ কলকান রাজ্য। যেমনটি বার বার ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে। শূন্যতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমাদেরও আছে, কিন্তু পূর্ণতা দিয়ে সে শূন্যতা ভরার ক্ষমতা এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেইজন্যে আহ্বান করা হয়েছে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী। যার কাজ সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাতে না থাকছেন গান্ধী, না থাকছেন জিন্না। গান্ধীর দলের লোক থাকছেন, কিন্তু জিন্নার দলের লোক অদৃশ্য। রাজন্যরাও কেউ আসছেন না। আপনাদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত না করে প্রত্যেকের নজর এখন তৃতীয় পক্ষের উপর। তৃতীয় পক্ষ যাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে যাবেন তিনিই রাজরাজেশ্বর হবেন। কিন্তু মুকুটের দাবীদার কি একজন? তৃতীয় পক্ষ যদি কংগ্রেসকে দেন লীগ হবে চিরশত্রু। যদি লীগকে দেন কংগ্রেস হবে চিরশত্রু। কেনই বা তাঁরা চিরশত্রু পেছনে রেখে যাবেন? যখন বাণিজ্যের জন্যে আবার ফিরে আসতে হবেই। বাণিজ্য বিনা কি ওইটুকু দেশ বাঁচতে পারে? মুকুট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবেই। এই পরিস্থিতিতে গণ সত্যাগ্রহ হচ্ছে গণ হত্যাগ্রহ। জেনোসাইড। সেই জেনোসাইডের দিন তোমার মতো দু'চারজন পাগল শহীদ হলেই জেনোসাইড বন্ধ হবে না, সৌম্য। তোমাদের বাপুর আমরণ অনশনও ব্যর্থ হবে। শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই পারবেন জেনোসাইড রুখতে বা থামাতে। শূন্যতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর আছে, শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা তাঁর নেই। নেই তাঁর অনুগামীদেরও। এই যে নীরেট সত্য একে বিনম্র ভাবে মেনে নেওয়াই সত্যের প্রতি আগ্রহ। মুসলিম লীগ ইংরেজের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে অধিকাংশ মুসলমানদের প্রতিভূ। তারা তাকে ভোট দিয়েছে, তার ইঙ্গিতে জান নিয়েছে। জান দিয়েছে। এই পিশাচ নৃত্য হিন্দুকেও পিশাচ করে তুলছে। আমাদের সকলেরই মাথা উঁচু হয়েছিল গান্ধীর জন্যে, সুভাষের জন্যে। এখন সকলেরই মাথা হেঁট জিন্নার জন্যে। আমাদের পিশাচে পরিণত করার ক্ষমতা জিন্নার আছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ইংরেজরাও অত নিচে নামতে পারত, কিন্তু নামবে না বলেই মানে মানে চলে যাচ্ছে। মুসলিম লীগ মানে মানে চলে যাবে না। কংগ্রেসকেই মানে মানে ভারতের এক অংশ থেকে চলে আসতে হবে। এই যে সিদ্ধান্ত এর আর কোনো বিকল্প নেই, সৌম্য। ক্যারামেলকে আর তার বাচ্চাদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। তুমিও বাপুর অনুমতি নিয়ে সরে এসো। তাতে যদি তোমার পৌরুষে বাধে তবে অবশ্য অন্য কথা। আর ক্যারামেল যেমন পতিব্রতা সে কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটবে। তা বলে বাচ্চা দুটোকেও নিয়ে যাবার অধিকার কি ওর আছে? কী বলো, রানু?"

"কক্ষনো না। বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতে হবে। ওদের জন্যে আমি ফীডিং বটল কিনে রেখেছি। মা-টাকে ওরা দুটোতে মিলে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। সেও ওদের সব সময় বুকে করে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কোলছাড়া করবে না। অমন করলে ওর মাই শুকিয়ে যেতে কতক্ষণ! ফীডিং বটলই এ প্রশ্নের উত্তর।" বৌদি বলেন।

"শ্রমিকের ঘরে ওসব মানায় না, বৌদি। আমরা আশ্রমিকরাও শ্রমিক।" সৌম্য পাশ কাটায়।

নির্দিষ্ট দিনে স্বপনদা ও দীপিকাদি দু'জনে দুটি মোহর দিয়ে নবজাতকদের মুখ দর্শন করেন। দীপিকাদি শিশু দুটিকে এক এক করে কোলে তুলে নেন ও একটু আদর করে স্বপনদার দিকে বাড়িয়ে দেন। দাদা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একজনের বেলা বলেন, "না, না, হিজি করবে।" আরেক জনের বেলা

বলেন "এ রাম! পচ করবে!"

জুলি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো ক্ষয় হতে হতে আধখানা হয়ে গেছে। কিন্তু ওর বাচ্চা দুটি বয়সের তুলনায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মায়ের দুধই ওদের একমাত্র খাদ্য। ফীডিং বটলের প্রস্তাব জুলি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

বাবলী, মিলি, টুকটুক সবাই এসে যে যা পারে দিয়ে নবজাতকদের মুখ দর্শন করে যায়। কোলে তুলে নেয়। আদর করে। কিন্তু সুকুমার ও তল্লাট মাড়ায় না। জুলির মাকে একান্তে বলে, "আহা, বেচারি জুলি! অপাত্রে পড়লে যা হয়।"

মিসেস সিন্‌হা কান দেন না। মেয়ের ডেলিভারির দিন থেকে তাঁর মুখে কেবল একটি কথা, "গড ইজ গ্রেট। আল্লা হো আকবর! ভগবান পরম মহিমাময়!" সুকুমারের বক্তব্য না শুনে তাঁকেও সেই কথা বলেন। "গড ইজ গ্রেট! আল্লা হো আকবর! ভগবান পরম মহিমাময়!" সুকুমার তো তাজ্জব।

রণও এসেছিল জুলি মাসীকে ও তার বাচ্চা দুটিকে দেখতে। দীপিকাদি তাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করেন। "কী রণ? কৃষ্ণাকে তোমার পছন্দ হয়? পছন্দ হলে বলো। এখন থেকে বুক করে রাখি। তোমারই ফার্স্ট চয়েস।"

তা শুনে মিলি মুখ ভার করে। "বৌদি, এ কেমনতর রঙ্গ? এই বয়স থেকেই রণ বিয়ের কথা ভাববে?"

"উঁহু। শাস্ত্রমতে এটা ব্রহ্মচর্যের বয়স।" স্বপনদা টিপ্পনী কাটেন।

সৌম্য হাত জোড় করে সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। প্রকাশ্য আনন্দের সঙ্গে তার মনে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ। কবে এদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। আদৌ পারবে কি না। জুলি যদি রাজী না হয়। তার মা যদি মত না দেন। ডাক্তারদের যদি অমত থাকে। সৌম্যই বা ক'টা দিক সামলাবে! আশ্রমের গঠনমূলক কর্ম। জেলার সাম্প্রদায়িক শান্তি। গৃহস্থের পারিবারিক সমস্যা।

মিলি ওর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে। "সৌম্যদা, বাবার মন উঠে গেছে। উনি আর ওদেশে থাকতে চান না। হ্যাঁ, দেশই বটে। মুসলিম নেশনের বাসভূমি। মা তো অনেকদিন থেকেই বিমুখ। উনি শ্রীরামপুরের মেয়ে। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। গঙ্গাজল সব সময় ঘরে মজুত। হালদার বাড়ীতেও। আমরা যদি না থাকি তোমরা কাদের কাছে সমাজ পাবে? তোমাদের ওই আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে চলে এলে কেমন হয়? তবে সেবাপ্রতিষ্ঠান যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। শুধু ট্রাস্টি বদল হবে।"

"আশ্রমের বেলাও কি ট্রাস্টি বদল হতে পারে না? ভেবে দেখব। আমি কিন্তু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে চাইনে। আমরা থাকলে হিন্দুসম্প্রদায়ের আস্থা থাকবে। নয়তো ওরাও চলে আসতে চাইবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চলে আসা মানে মহানিষ্ক্রমণ। লোক বলবে ইংরেজরা মহানিষ্ক্রমণ করেছে বলে আমরাও তাই করেছি। যেন ব্রিটিশ বেয়োনেটই ছিল আমাদের রক্ষাকবচ। নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ব্যাপারের পর দু'লাখ শরণার্থী জড়ো হয়েছে পদ্মাপারের ত্রাণ শিবিরে। বাপু না গেলে তাদের সংখ্যা আরো বেশী হতো। এপারে এসে ওরা থাকবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? জীবিকা জুটবে ক'জনের? বিয়ে করেছি বলে, বাপ হয়েছি বলে কি আমি হুট করে চলে আসতে পারছি? সরকারী কর্মচারীদের মতো আমারও একটা চার্জ আছে। তুমি ভেবে দেখো, বোন। তোমারও কি নেই?" সৌম্য আবেদন করে।

মিলি অন্তরঙ্গ স্বরে সুধায়, "সৌম্যদা, তোমার কি ইচ্ছে আমি ওখানে থাকি?"

"আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে অবাস্তব। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ হিন্দুর মেয়েদের মনের জোর বজায় রাখতে হলে তোমার মতো সাহসী মেয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমার মতো বীরাঙ্গনার

পালিয়ে আসা যেন যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া। তুমি যদি যুদ্ধে ভঙ্গ দাও তা হলে হিন্দু শরণার্থীর স্রোত রোধ করতে পারা যাবে না। ওদিকে বিহারী হিন্দুরাও বদলা নেবে। বিহারী মুসলমান শরণার্থীতেও বাংলাদেশ ভরে যাবে। দুই দিক থেকে শরণার্থীর স্রোত, কলকাতা কি ভাসবে না ডুববে?" সৌম্যও পাল্টা সুধায়।

"কলকাতার কী হবে না হবে, জানিনে। কিন্তু বাবা বলছেন পূর্ববঙ্গ একটা ডুবন্ত জাহাজ আর তিনি সেই ডুবন্ত জাহাজের প্রথম ইঁদুর। জানো তো, জাহাজডুবির সময় ইঁদুরই সকলের আগে টের পায়, তাই সকলের আগে পালায়। বাবা যেখানে থাকবেন না আমি সেখানে কেমন করে থাকি? কোন্ সুবাদে থাকি? তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকাতে পারো তা হলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু তাহলে রণের কী হবে? সে কোথায় থাকবে? রণকে আমি পূর্ববঙ্গে রাখব না। রণের বাবা এসেছে, জানো। ওর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। রণের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।" মিলি সুকুমারকে গ্রাহ্য করে না।

সৌম্য সুকুমারকে ইশারায় ডাকে। সে এক ভদ্রমহিলাকে মাউণ্টব্যাটেনের কুলজি শোনাচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসে।

"সুকুমার, তুমি বিলেত সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল তেমন আর কেউ নয়। তাই এই অজ্ঞ দেশকে জ্ঞান দেবার জন্যে তোমার এখন এই দেশেই থেকে যাওয়া সমীচীন। তোমার ছেলে রণ যদি শান্তিনিকেতনে পড়ে তোমার থাকা উচিত তার কাছাকাছি কলকাতায়। কিন্তু মধুমালতীর কর্মক্ষেত্র এখন পূর্ববঙ্গ। সেখানে নিপীড়িতা নারীদের পাশে দাঁড়াবার জন্যে তাঁর মতো সাহসিকার প্রয়োজন আছে। মঞ্জুলিকারও কর্তব্য তাই, তবে ওঁর অবস্থা তো দেখছ। উনি আমার সঙ্গে থাকতে চাইলেও ওঁর মা ওঁকে অনুমতি দেবেন না। কারণ ডাক্তারদের মত নেই। ক্যাপটেন মুস্তাফী কার চেয়ে কম? আমি তাঁর ভরসায় জুলিকে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছিলুম, তিনি কিন্তু আর সেখানে থাকতে রাজী নন। সময় থাকতে মানে মানে সরে আসবেন, ইংরেজ যেমন সময় থাকতে মানে মানে সরে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গ যে পূর্ব পাকিস্তান হবে এটা তো মোটামুটি নিশ্চিত। যদি না বাঙালী হিন্দু মুসলমান ঝগড়া ভুলে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করে।" সৌম্য বলে যায়।

"ক্যাপটেন মুস্তাফী ওখানে না থাকলে তাঁর কন্যা থাকবেন কার তত্ত্বাবধানে? এটা কি ইংলণ্ড যে উনি স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবেন? এদেশে হয় স্বামী, নয় পিতা, নয় অন্য কোনো গুরুজন সঙ্গে থাকা চাই। নিপীড়িতা নারীর জন্যে সমবেদনা আমারও কম নয়, কিন্তু তার ত্রাণের দায়িত্ব সমগ্র সমাজের, সমগ্র রাষ্ট্রের, সমগ্র সভ্যতারও বলতে পারো। একক ভাবে আমরা কে কী করতে পারি? আমরা কি মহাত্মা গান্ধী, যিনি একাই একশো? ক্যাপটেন মুস্তাফীর মতো প্রভাবশালী ডাক্তার যেখান থেকে চলে আসছেন সেখানে তাঁর কন্যার তিষ্ঠনো সহজ হবে না। তবে, তাঁকে 'না' বলার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার সন্তানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার অধিকার আমার আছে।" সুকুমার স্বাধিকার সচেতন।

সৌম্য আঁচতে পারে ওদের দু'জনের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। ওদের সিদ্ধান্ত ওদের উপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। বলে, "রণের জন্যে ভাবনাই সকলের আগে। আরো দুটো রণ আছে। ইংরেজদের সঙ্গে রণ, লীগপন্থী মুসলিমদের সঙ্গে রণ। সেসব রণের কথা পরে। তার জন্যে অন্য অনেকে রয়েছে।"

বাড়ী ফেরার সময় সুকুমার বলে, "মিলি, তুমি সত্যিই অসাধারণ মেয়ে। তোমার এক ফোঁটাও পজেসিভনেস নেই। তুমি অনায়াসেই তোমার স্বামীকে ইংরেজ মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারলে। তারা ভুল বলে যারা বলে মেয়েদের স্বভাবই হলো জেলাসী। এমন স্ত্রীর স্বামী হওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমি আর কাউকে বিয়ে করব না, কারণ আর কেউ তোমার মতো মহান হবে না। তুমি কি নারী? তুমি একটি এনজেল!"

"কিন্তু তুমি তো জেলাস। তুমি তো পজেসিভ। তুমি তো আমাকে সৌম্যদার সঙ্গে মিশতে দেখলে বিশ্বাস কর না। জুলি যখন ওখানে থাকবে না তখন ওকে কেউ বা দেখবে শুনবে, আমি যদি মাঝে মাঝে গিয়ে না দেখি, না শুনি? এটা কি আমার বাল্যসখী জুলির প্রতি আমার কর্তব্য নয়? আর সৌম্যদাও তো একটি এন্‌জেল। ও কি তোমার মতো পুরুষ যে নারী বিনা বাঁচতে পারে না? ওর সঙ্গে মেয়েরা সবাই নিরাপদ। আমিও ব্যতিক্রম নই। ওর জন্যে জুলিকে ষোল সতেরো বছর তপস্যা করতে হয়েছে। বোকা মেয়ে যৌবন বইয়ে দিয়েছে। দেখলে তো কী বিশ্রী হয়েছে ওকে দেখতে। কেমন অস্থিচর্মসার! আমরাও তো মা হয়েছি, তা বলে এমন হাড়গিলের মতো চেহারা! সৌম্যদা বলেই ওকে ভালোবাসে, তা না হলে জুলি একটা রূপসী বিদ্যাধরী নয়।" মিলি মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে বলে যায়।

সুকুমার টিপে টিপে হাসে। "এর নাম জেলাসী।"

"জেলাসী? আমি জেলাস? কার বেলা জেলাস? জুলির বেলা? মরণ! বরং তুমিই জেলাস। সৌম্যদার বেলা। কবুল করো।" মিলি তর্জনী উঁচায়।

"আচ্ছা, কবুল করছি। আমি সৌম্যকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ওর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করি। ওর জন্যে জুলিকে হারিয়েছি। আর তুমিও যেমন আত্মহারা তাতে আমি মনে মনে শঙ্কিত। যদিও কায়িক অর্থে নয়।" সুকুমার কবুল করে।

"তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি। তুমি আমাকে সন্দেহ কর। তা হলে বিচ্ছেদই শ্রেয়। কী বলো?" মিলি রুক্ষ স্বরে বলে।

"ওটা তোমার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, মিলি। আমি তো প্রাণ থাকতে রণকে সৎমা দেব না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করব না। তুমি করতে পারো। সেইজন্যে বিচ্ছেদ দাবী করছ।" সুকুমার খোঁচা দেয়।

"কী সাংঘাতিক লোক রে, বাবা! কবে আমি বিচ্ছেদ দাবী করলুম? আমিও কি আবার বিয়ে করতে চাই নাকি? রণকে আমি সৎবাপ দেব? এ জন্মে নয়। তবে তোমার সঙ্গে বসবাস আর নয়।" মিলি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

"আমার দুর্ভাগ্য। এমন রত্ন আমি নিজ দোষে হারালুম। বিলেতেই ফিরে যাব, ভাবছি। তবে রণকে এদেশে ফেলে রেখে যাব না। বাপের অধিকার খাটাব। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। কেন আমার অধিকার খোয়াব? রণ আমার ছেলে, সে আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে।" সুকুমারও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

"তা বলে আমার ছেলে আমার জিম্মা থাকবে না? আইনে কী বলে? চল স্বপনদার কাছে যাই।" মিলি প্রস্তাব করে।

"স্বপনদার ওখানে আমি ঘুরে এসেছি। ওঁর পরামর্শ নিয়েছি। তুমি যদি চাও তো আবার তোমার সঙ্গে যেতে পারি। ছেলে বিলেতে পড়াশুনা করবে, কী বছর দেশে এসে মার সঙ্গে দেখা করে যাবে। রণ ব্রিটিশ বর্ন, কাজেই ওটাই ওর স্বদেশ। ওর জন্মের সময় সেকথা তুমি জানতে।" সুকুমার মনে করিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, জানতুম। তখন উপায় ছিল না।" মিলি স্বীকার করে।

"বেশ, এখন উপায় হয়েছে। শাঁখা, সিঁদুর, লোয়া, সবই এক এক করে খুলে ফেলেছ বা মুছে ফেলেছ? এখন তুমি কুমারী। আবার বিয়ে করতে পারো, যদি ডিভোর্স চাও আর পাও। তুমি আমার বিরুদ্ধে যা খুশি বানিয়ে দরখাস্ত করতে পারো, আমি কনটেস্ট করব না। আমি জানি আমার মতো শত শত পুরুষ আছে, আমি নিতান্তই একজন অ্যাভারেজ ম্যান। আর তুমি একটি অসামান্য নারী, যার সমকক্ষ লাখে না মিলয় এক। গোড়া থেকেই জানতুম যে তোমাকে আমি বেশীদিন ধরে রাখতে পারব না। এতদিন যে পেরেছি এটা রণের কল্যাণে। ওর উপর অধিকার আমার থাকলেও আমি সেটা আপাতত

খাটাতে চাইনে। এই বছরটা ভারতের ইতিহাসে একটা আশ্চর্য বছর। কত রকম আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমি আজ কলকাতা, কাল দিল্লী, পরশু লণ্ডন ঘুরে বেড়াব। রণের দায়িত্ব কি আমার নেওয়া সাজে? তুমিই ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করো। ফলাফলের জন্যে তুমিই দায়ী। ও যখন সাবালক হবে তখন ওকে আমি খুলে বলব সব কথা। তার পর ওর যদি ইচ্ছে হয় বিলেতের কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেব। ব্রিটিশ বর্ন বলে ও হয়তো কিছু সুবিধে পাবে। তুমি আর যাই করো ওর বার্থ সার্টিফিকেটটা ফেলে দিয়ো না। দেশ স্বাধীন হলেও সেটা ওর কাজে লাগবে। আমি যতদূর দেখতে পারছি ব্রিটেনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের একটা ট্রীটি হবে। যদি সে রেপাবলিক হয়। ট্রীটির দরকার হবে না, যদি সে ডোমিনিয়ন স্টেটাস বরণ করে।" সুকুমার সমস্ত আবেগ চেপে রাখে।

"বাজে কথা। ডোমিনিয়ন স্টেটাস সতেরো বছর আগেই খারিজ করা হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা যদি গ্রহণ করে বামপন্থীরা তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। সেদিন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে নেহরুর স্বাধীন সার্বভৌম রেপাবলিক প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। এর আর নড়চড় নেই।" মিলি বলে দৃপ্ত স্বরে।

"মুসলিম লীগ তা স্বীকার করে নেয়নি। তার সদস্যরা অনুপস্থিত। রাজন্যরা মেনে নেননি। রেপাবলিকে তাঁরা যোগ দিতেই পারেন না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর প্রস্তাব কংগ্রেস প্রদেশগুলোর উপর বলবৎ হতে পারে। অন্যান্য প্রদেশগুলোর উপর নয়। রাজ্যগুলোর উপর তো নয়ই। অ্যাটলীর ঘোষণার মর্ম, যারা রেপাবলিক পছন্দ করে তাদের অংশ রেপাবলিক হবে, যারা পছন্দ করে না তাদের অংশ ডোমিনিয়ন হবে।" সুকুমার ব্যাখ্যা করে শোনায়।

"তা হলে আরো একবার লড়তে হবে। আমি লড়ব।" মিলি জ্বলে ওঠে।

"লড়লে দুই ফ্রন্টে লড়তে হবে। ব্রিটিশ ফ্রন্টে আর মুসলিম লীগ ফ্রন্টে। তার আগে পূর্ববঙ্গ ইভ্যাকুয়েট করো, আরো দশটা নোয়াখালীর জন্যে তৈরি হও। আমি জানি তোমার ভিতরে যে আগুন ছিল সে আগুন এখনো নেবেনি। তুমি আমার অনুরোধ অনুনয় শুনবে না। এবার কিন্তু জেল বা দ্বীপান্তর নয়। মুসলমানের ছোরা, ইংরেজের গুলী। রণকে নিরাপদ দূরত্বে রেখো, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। কালকেই আমি শান্তিনিকেতন যাচ্ছি ওকে দেখতে। সেখান থেকে দিল্লী। দিল্লী থেকে লণ্ডন। তোমার সঙ্গে এবারকার মতো এই শেষ দেখা।" সুকুমার মিলিকে পৌঁছে দিয়ে বলে।

"তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে আর থাকবে না?" মিলি বিস্মিত হয়।

"কোন্ সুবাদে থাকব? সবই তো চুকে গেছে।" সুকুমার ডান হাত বাড়ায়।

মিলি তার হাতটা দুই হাতে চেপে ধরে মুখে ছোঁয়ায়। বলে, "সব চুকে যায়নি ও যাবে না। এই যে তোমার দেওয়া আংটি। তোমার অভিজ্ঞান।"

সুকুমারকে মিলি হিড় হিড় করে ভিতরে টেনে নিয়ে যায় ও দরজা বন্ধ করে দেয়। তার পর খুব একচোট কাঁদে। "তুমি জুলিকে দেখতে এসেছ। আমাকে নয়।"

।। চোদ্দ ।।

অর্ধেক রাত অবধি ওরা তর্কাতর্কি করে কাটায়। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। হাতাহাতি থেকে মাতামাতি। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে উঠে মিলি তার বরের গলা জড়িয়ে ধরে। "যেতে নাহি দিব।"

"তার মানে কী, মিলি?" সুকুমার চুমু খায়।

" তোমাকে আর বিলেত ফিরে যেতে দেব না। এই দেশেই আমরা তিনটিতে মিলে নীড় রচনা করব। তুমি, আমি আর রণ। লাগে টাকা দেবে কালী মুস্তাফী। বাবার বিজনেস কনসার্ন সরে আসছে

কলকাতায়। দেখবার লোক নেই। আমি কি ছাই বিজনেস বুঝি? বাবা তোমাকে চান, মা তোমাকে চান, দাদা তোমাকে চান, আমি তোমাকে চাই, রণ তোমাকে চায়। আমাদের ঝগড়া তো জুলিকে কেন্দ্র করে। জুলি এখন ওর দুই বাচ্চাকে নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। ও এখন কোনো অর্থেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বেচারি। সৌম্যদার জন্যে দুঃখ হয়। ঘর সামলাবেন না বাহির সামলাবেন? ওঁর রাজনৈতিক ভূমিকা খতম। ওই আশ্রমের বাবাজী ও মাতাজী হয়ে ওদের বাকী জীবনটা কাটবে।" মিলি হাসে।

"ওদের কী হবে না হবে তা নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা? আমার মাথাব্যথা আমার ছেলের জন্যে, ছেলের মায়ের জন্যে। আমার এই ছোট্ট বুলবুলিটির জন্যে। এই সুইট ইয়াং গার্লটির জন্যে। মিলি, মাই ল্যভ্। তুমি কি বুঝতে পারছ না তুমি কী ভুল করছ? ওদেশে তোমার নিজের বাড়ী রয়েছে। তুমি ওদের নাগরিক। আমরা যে ওয়েলফেয়ার স্টেট গড়ছি তাতে কেউ বেকার থাকবে না, তুমিও না। আর তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। স্কুল থেকে বেরোলেই চাকরি। আর নয়তো ইউনিভার্সিটি থেকে। ওর বাপকে এদেশে কেউ চেনে না, কিন্তু ওদেশে না চেনে কে? অ্যাটলী থেকে শুরু করে ক্রিপ্স, পেথিক-লরেন্স, মিস উইলকিনসন। বেভানকে তো আমি 'নায়' বলেই ডাকি। অবশ্য রণ যখন বড় হবে তখন ওঁরা বেঁচে থাকবেন কি না, ক্ষমতায় থাকবেন কি না বলতে পারব না। কথায় বলে বেড়ালের ন'টা জীবন। টোরিদেরও তাই। ওরা যদি ফিরে আসে তো ওয়েলফেয়ার স্টেট ডুববে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ডুবন্ত জাহাজ থেকে প্রথম ইঁদুর হয়ে পালিয়ে আসতেও পারি।" সুকুমার শিউরে ওঠে।

"ততদিনে একটা ওলট পালট হয়ে গিয়ে থাকবে। কাজকর্ম জুটবে কি না কে গ্যারান্টি দেবে? আমার নামও তো লোকে ভুলে যাচ্ছে। এ বাজারে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেরই নামডাক। নেতাজীর দিকে যারা তাকিয়ে রয়েছে তাদের মতো কতক আশাবাদী বাদে। আমি সাত বছর বাইরে থেকে তাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন। নাম করব না, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার মেলবন্ধন তারও স্বতন্ত্রভাবে লড়বার শক্তি নেই। কংগ্রেস লড়লেই সে গোষ্ঠী লড়বে। আর গান্ধী লড়লেই কংগ্রেস লড়বে। কিন্তু মহাত্মার মনে কী আছে তা প্যারেলালজী ও নির্মলদাও জানেন না। আমার তো মনে হয় বুড়ো নিজেও জানেন না। অ্যাটলীর শেষ প্রস্তাব শুনে জবাহর যেমন লাফিয়ে উঠেছেন তা লক্ষ করে আমি হতভম্ব। তবে কি মিটমাট আসন্ন? তবে কি ইংরেজ সত্যিই চলল? তা হলে লড়ব আমরা কার সঙ্গে? মুসলিম লীগের সঙ্গে? দূর ছাই! কোথায় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই! কোথায় ভাগবাঁটোয়ারার জন্যে! আমি এর মধ্যে নেই।" মিলি নিঃস্পৃহভাবে বলে।

"বাঁচলুম। তুমি আমার সঙ্গে লড়বে।" সুকুমার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে।

"তুমি থাকছ কোথায় যে তোমার সঙ্গে লড়ব? আজকেই তো চলে যাচ্ছ শান্তিনিকেতন, সেখান থেকে দিল্লী, সেখান থেকে লণ্ডন।" মিলি বলে।

"দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেনকে অভ্যর্থনা করতে হবে। আমি 'ট্রিবিউনে'র বিশেষ প্রতিনিধি। আমাকে সব দেখতে শুনতে রিপোর্ট করতে হবে। সেকালে একটা ছড়া শোনা যেত। তুমিও শুনেছ নিশ্চয়। 'ঘোড়েকা পর হাউদা, হাতীকা পর জীন। জলদি যাও, জলদি যাও, ওয়ারেন হেস্টিন।' প্রথম গভর্নর জেনারেলের মতো শেষ গভর্নর জেনারেলও সমান ব্যস্তবাগীশ। ওঁকে বরাত দেওয়া হয়েছে পনেরো মাসের মধ্যে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতে। উনি ততদিন সবুর করবার পাত্র নন। ওদিকে রয়াল নেভীতে ওঁর চাকরি খালি পড়ে থাকবে। সামনের ডিসেম্বরের মধ্যেই কেল্লা ফতে হবে। তার মানে লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে। তার আগে দিল্লী থেকে আমি লণ্ডন রওনা হচ্ছিনে, মিলি। ভাবছি আমি একটা ডায়েরি রাখব। ঐতিহাসিক ডায়েরি।" সুকুমার তার সংকল্প জানায়।

"হ্যাঁ, এই ক'টা মাস খুবই ক্রুশিয়াল। পারলে আমিও যেতুম তোমার সঙ্গে। রণের ছুটি হলে দিল্লী ঘুরে আসব। শুনেছি মাউন্টব্যাটেন হচ্ছেন প্রিন্স চার্মিং আর লেডী মাউন্টব্যাটেন সিণ্ডারেলা। একবার

চাক্ষুষ করতে হবে।" মিলি আগ্রহ প্রকাশ করে।

"শুধু চাক্ষুষ করবে কেন? পার্টিতে গিয়ে আলাপ করবে। ওঁরা খুব মিশুক শুনেছি। ঘন ঘন পার্টি দেন। রাজবংশের মতো দিলদরিয়া। ওঁদের মস্ত বড়ো গুণ ওঁরা বর্ণ বিচার করেন না। নেটিভ বলে কেউ খাটো নয়। নেহরুর সঙ্গে ওঁদের আগে থেকেই মেলামেশা। ওঁর ভাইসরয় মনোনয়নের এটাও নাকি প্রচ্ছন্ন কারণ। নেহরু যদি তাঁর জাদুবিদ্যার ফাঁদে পড়েন এক এক করে আর সকলেও পড়বেন। মহাত্মাও বাদ যাবেন না। সেদিকটা লেডী মাউন্টব্যাটেন দেখবেন। তিনি একজন সেবাব্রতী মহিলা। পরিষদের মা জননী।" সুকুমার যতদূর জানে।

"ওদিকে বিরাট বড়লোকের উত্তরাধিকারিণী। তা হলে তো দিল্লী যেতে হচ্ছে। আমিও সেবাব্রতী হতে চাই, সুকু। বাবা আমার জন্যে যা রেখে যাবেন তাও তো বড়ো কম নয়। বিয়ের আগে সেবাধর্মে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। সেইসূত্রে সৌম্যদার সঙ্গে আলাপ হয়। জীবন জড়ানোর স্বপ্নও দেখি। কোথা থেকে উড়ে এল জুলি। আর জুলির সঙ্গে তুমি। সব এদিক ওদিক হয়ে গেল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। এ তিনটি মানুষের হাতে নয়। ভগবানের হাতে। হ্যাঁ, আমি ভগবান মানি। ভগবানই তোমার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যদার সঙ্গে জুলিকে। নইলে তুমিই বা কে আর আমিই বা কে? কখনো কি দেখা হয়েছে না ভাব হয়েছে?" মিলি স্মরণ করে।

সুকুমার হেসে বলে, "তোমার হাবভাব দেখে ভয় হয়েছিল বিবাহভঙ্গের বেশী দেরি নেই। যেমন ভারতভঙ্গের বা বঙ্গভঙ্গের বেশী দেরি নেই। তুমি দিল্লী পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক আছো, লণ্ডন পর্যন্তও যেতে অনিচ্ছুক হবে না, যখন দেখবে মেনন হাই কমিশনার ও আমি তাঁর অধীনে একটা পদ পেয়েছি। পুরাতন বিপ্লবী রাজবন্দিনী বলে তোমারও কদর বেড়ে যাবে, তুমিও একটা পদ পেয়ে যেতে পারো। তোমার সুবাদে আমিও আরো উচ্চ পদ পেতে পারি। হোয়াই নট ফার্স্ট সেক্রেটারি, পাবলিক রিলেশনস, ইণ্ডিয়ান এমবাসী, ওয়ারস অর প্রাগ? তুমি যেতে রাজী হলে তো? ওসব পদে স্ত্রী না নিয়ে যেতে নেই। বিশেষ করে টোকিওতে।"

"ধোৎ! আমার বয়ে গেছে ডিপ্লোমাটের বাড়ীতে হস্টেস হতে। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি ব্রিটিশ নাগরিক। তোমাকে স্বাধীন ভারত সরকার ওসব পদ দেবেন না। তোমাকে পাশপোর্ট বদলাতে হবে। রণকেও। আমার কথা অবশ্য আলাদা। পুরাতন বিপ্লবী রাজবন্দিনী বলে আমার একটা হিল্লে হতে পারে। তাতে যদি তোমার কোনো সুবিধে হয় আমি রাজী। কিন্তু বিদেশে নয়, দিল্লীতে কিংবা কলকাতায়।" মিলি জানায়।

"চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই," বলে মিলিও সুকুমারের সঙ্গে শান্তিনিকেতন রওনা হয়। রণ তার বাবাকে অনেকদিন দেখেনি। খুশি তো হবেই। কিন্তু দেখা গেল মা বাবা কারো প্রতি তার তেমন টান নেই, যেমন তার সমবয়সী সাথীদের প্রতি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে ছুটে পালিয়ে যায়। সাথীদের নিয়ে সে লেফট রাইট করে হাঁটে। তাদের অগ্রণী হয়ে।

"দেখছ? দেখছ? তোমার ছেলেকে দেখছ? আ বর্ন লীডার! লক্ষ করো, ওদের পা কেমন তালে তালে পড়ছে। কোথাও তালভঙ্গ হচ্ছে না। রণ না হলে কে এমন শিক্ষা দিত?" মিলি সগর্বে তাকায়।

"তাই তো ভাবছি। রণকে নিয়ে আর নীড় বাঁধা যাবে না। তিনজনের নীড়। ও আর ছোট্ট পাখীর ছানাটি নয়। উড়তে শিখেছে।" সুকুমার বলে।

"তারপর লক্ষ করেছ কি না জানিনে। বাড়ীতে ওর দাদা বা দিদি ছিল না। এখানে বড়ো মাত্রেই দাদা বা দিদি। রথীদা, প্রভাতদা, সুরেনদা, তনয়দা থেকে শুরু করে এক ক্লাস উপরে যারা পড়ে তারাও দাদা। তেমনি, ইন্দিরাদি, প্রতিমাদি, হেমবালাদি থেকে শুরু করে এক ক্লাস উপরে যারা পড়ে তারাও দিদি। ও নিজেও তো একজন দাদা। ওর ছোট ভাই বা বোন না থাকায় দাদা বলবার কেউ ছিল না। ও

এখন ছোটদের উপর দাদাগিরি ফলায়। এমনটি তুমি আর কোথাও পাবে না। এটা একটা বৃহত্তর পরিবার। শিক্ষা বলতে এসবও বোঝায়। শুধু পড়াশুনা বা খেলাধূলা নয়।" মিলি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পক্ষপাতী।

দিন তিনেক গেস্ট হাউসে থেকে ওরা রুণের কার্যকলাপের উপর নজর রাখে। ও ছেলে ইতিমধ্যে বাংলা ভালো বলতে শিখেছে, গান গাইতে শিখছে, বৈতালিকে যোগ দেয়, মন্দিরে গিয়ে আচার্যের ভাষণ শোনে। এক এক করে ওর পাপড়িগুলি খুলে যাচ্ছে।

মিলি বলে, "ওদেশের মাটিতে ওর শিকড় লাগত না। সেইজন্যে ওকে আমি এদেশে নিয়ে এসেছি। নিজের দেশটাকে আগে ভালো করে চিনুক। নিজের ভাষাটাকে ভালো করে দোরস্ত করুক। নিজেদের সভ্যতার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হোক। তার পরে তুমি ওকে বিদেশে পড়াতে চাও তো আমি 'না' বলব না। দেখবে ও খুব তাড়াতাড়ি পিক্ আপ করবে।"

"ওর জন্যে ওর মাকেও এদেশে দশ বারো বছর আটকা পড়তে হবে। আর বাবাকে এদেশ ওদেশ করতে হবে। পারিবারিক জীবন বলতে কতটুকু থাকবে? এখন বুঝতে পারছি এদেশে কর্তব্যরত ইংরেজ অফিসারদের জীবন কেমন ছিল। স্ত্রী থাকতেন বিলেতে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খাতিরে। স্বামী থাকতেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায়। তিন বছর অন্তর একবার দেখা। যুদ্ধ বাধলে তো পাঁচ বছর বা সাত বছর অন্তর। আমার দশাও অনেকটা সেইরকম হবে, মিলি।" সুকুমার আশঙ্কা করে।

"তোমাকে কে বলছে ওদেশে ফিরে যেতে? বাবার বিজনেস কনসার্ন তো আমারও কনসার্ন। আমার যা তোমারও তাই।" মিলি আশ্বাস দেয়।

"আমার ট্র্যাজেডী তুমি কী বুঝবে, নারী!" সুকুমার নাটকীয়ভাবে বলে। "আমি একজন 'হইলে হইতে পারিতাম'। রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে একটি গল্প আছে।"

"কতই বা তোমার বয়স! বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ। সামনে পড়ে আছে যথেষ্ট আয়ু। বাবারই আয়ু বরং আর বেশী নেই। তাঁর কাছাকাছি থাকাটাই আরো জরুরি। মাকে অবশ্য দাদার কাছে পাঠানো যায়। বাবা সেখানে বেখাপ। তিনি কলকাতা চলে আসছেন। সেখানে আমি ছাড়া কে তাঁকে দেখবে?" মিলি উদ্বিগ্ন।

সুকুমার পোজ দিয়ে বলে, "সো আই অ্যাম আ মার্টার টু ল্যভ্।"

মিলি হেসে গড়িয়ে পড়ে। "এইজন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে। তুমি একজন জাত অভিনেতা। নাঃ। তোমাকে আমি ছাড়ব না। যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু ওই দিল্লী পর্যন্ত। আমার পরামর্শ শোন। দিল্লীতেই একটা কাজকর্ম জোগাড় করো। তা সে যতই ছোট হোক। তোমার উপার্জনের উপর আমরা তোমার বৌ আর ছেলে নির্ভর করিনে। ওটা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হলেই হলো। তুমি সমস্তক্ষণ ভাবছ বিদেশে উচ্চ পদের কথা। যেটা দিতে পারবেন শুধু জবাহরলাল নেহরু। তার জন্যে পুচ্ছ ধরতে হবে তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ মেননের। কিন্তু তুমি বিদেশে পদ পেলে কী হবে, আমি তো যাচ্ছিনে, রুণ তো নয়ই। তাই বলি, তুমি কৃষ্ণ মেননের পুচ্ছ ছাড়ো। তার বদলে ধরো সুধীর ঘোষের কচ্ছ।"

"কার? কার?" চমকে ওঠে সুকুমার।

"সুধীরদাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে তোমার বৌ বিপ্লবী রাজবন্দিনী মধুমালতী মুস্তাফী। তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন সর্দার বল্লভভাই পাটেলের দরবারে। তাঁর হাতেই ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং। যে কাজে তোমার দক্ষতা আছে। কিন্তু, খবরদার, স্যাভিল রোর বিলিতী পোশাক পরে যেয়ো না। বিশুদ্ধ খদ্দরের ধুতী কোর্তা থাকবে তোমার পরণে, সাধারণ চপ্পল তোমার চরণে। মাথায় গান্ধীটুপী। বাতচিৎ করবে হিন্দীতে, ভুলভ্রান্তি হলে ক্ষতি নেই। অবশ্য ইংরেজীর ফোড়নও দেবে, সবাই দেন। তাতে যদি তোমার পাকা সাহেবী টান প্রকট হয় তো চাকরি বাঁধা। রেডিওতে ওঁরা পাকা সাহেবী

টান পছন্দ করেন। সত্য আর অহিংসা সম্বন্ধে দুটি একটি সুভাষিতও শুনিয়ে দিতে পারো। মুখে গান্ধী, মনে ফন্দী, এইভাবে অভিনয় করবে।" মিলি নির্দেশ দেয়।

"এমন বুদ্ধিমতী বৌ যার তার চাকরি হবে না তো হবে কার? এখন কথা হচ্ছে তুমি কি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে দিল্লী যেতে চাও? নাটকের প্রম্পটার হতে? সুধীর ঘোষকে আমি খুঁজে বার করব কী করে?" সুকুমার সুধায়।

"গান্ধীজীর আশে পাশে। তিনিও তো দিল্লী যাচ্ছেন বিহারের কাজ বাকী রেখে। আচ্ছা, তোমার যদি সঙ্কোচ বোধ হয় আমিই সুধীরদাকে বলব। কিন্তু তোমাকেই গান্ধীভক্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তুমি তো সৌম্যদা নও, যার কাছে ওটা অভিনয় নয়। সৌম্যদা কখনো চাকরির উমেদার হবে না। সে চাকরি দেবে, যদি কখনো মন্ত্রী হয়। না, তাও সে হবে না। সে গঠনকর্মী।" মিলি উত্তর দেয়।

"এককথায় আমাকে চাকরির জন্যে সৌম্য চৌধুরী সাজতে হবে। সেই ভাষায় কথা বলতে হবে। আমার ছোট্ট চড়ুই পাখী! আমার কানে ফিসফিস করে এই পরামর্শই তুমি দিচ্ছ। দিল্লীতে আমাকে দেখছি দু'রকম জীবন যাপন করতে হবে। লণ্ডনের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার নয়। সাহেবী পোশাক ও বোলচাল। পানভোজন। ধূমপান, সুরাপান। আবার দেশ্যেতী ধুতী কোর্তা পরা গান্ধীটুপী মাথায় আশ্রমিক। ডক্টর জীকল, মিস্টার হাইড।" সুকুমার স্মরণ করে।

"অভিনয়ে তোমার যেমন ওস্তাদী, তুমি পারবে। প্রেমটাও কি তোমার অভিনয় নয়, মায়াবী?" মিলি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সোহাগ জানায়।

"প্রেমের তুমি কী বোঝ, বালিকা? বোঝা রিভলভার তো প্রেম নয়, অপ্রেম। তোমার জগতে দুটি মাত্র রং আছে। শাদা আর কালো। তোমার নীতিশাস্ত্রে দুটিমাত্র গুণ আছে। ভালো আর মন্দ। প্রেমকে বুঝতে হলে, প্রেমিককে চিনতে হলে, আরো রঙের, আরো গুণের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়।" সুকুমারও সোহাগের প্রতিদান দেয়। প্রতি অঙ্গে।

ওরা দিল্লীতে গিয়ে দেখে ইউরোপীয় বা ইউরোপীয়েতর সব ক'টা হোটেলের সব ক'টা ঘরই বুক হয়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে বেশ কিছু দূরে সুইস হোটেলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই মেলে। সুকুমার চায় ভালো অ্যাড্রেস। তার যেসব ইংরেজ সহযোগী বিলেত থেকে আসবেন— কেউ কেউ এসে গেছেন— তাঁরা যেন একটা দেশী হোটেলের ঠিকানা শুনে পেছিয়ে না যান। ওর হোটেলে আসেন, আড্ডা দেন। হাঁড়ির খবর শোনান।

মিলি যা ভয় করেছিল তাই হয়। তার বামপন্থী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নেত্রী অশোকা প্রিয়তম—উচ্চারণ প্রীতম—প্রথমেই সুধান সে কোথায় উঠেছে। সুইস হোটেলের নাম শুনে তিনি জ্বলে ওঠেন। "এদেশের টাকা ওরা ওদেশে চালান দিচ্ছে। দেশের লোক আরো গরিব হচ্ছে। এসব জেনেও তুমি মধুমালতী মুস্তাফী ওদের পকেট ভারী করছ। কেন, পাঞ্জাবী হোটেল কী দোষ করল? সেখানে কী আরাম কম? যত্ন কম?" তাঁর স্বামী শিখ।

"না, অশোকাদি, আরাম কম নয়, যত্ন বরং বেশী। কিন্তু আমি তো এখন মধুমালতী মুস্তাফী নই, দত্তবিশ্বাস। ইংরেজরা বলে, ডাট বিশোয়াস। সুকুমার যদি নেটিভ হোটেলে নেটিভদের চালে চলে তবে ওর ইংরেজ সহযোগীরা ওকে ওদের সঙ্গে মিশতে দেবে না। হাঁড়ির খবর শোনাবে না। আড্ডায় হাঁড়ি ভাঙবে না। ওর এদেশে আসার উদ্দেশ্যটাই মাটি হবে। ও এসেছে মাউণ্টব্যাটেনের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক রূপে। ওর সঙ্গে আমার দিল্লী আসার কথা ছিল না। এসেছি ওর জন্যে একটা কাজকর্ম জোটাতে। কিন্তু সেটার জন্যে চাই অন্যরকম সাজপোশাক চালচলন, বাসস্থান, বন্ধুবান্ধব। ও তো হিন্দীই বুঝতে বা বলতে পারে না। দেশে যদি কাজকর্ম না পায় ওকে বিদেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমি আর ফিরে যেতে চাইনে। ফল হবে অবাঞ্ছিত সেপারেশন।" মিলি মন খুলে বলে।

"ওমা, তাই নাকি? আচ্ছা, আমি চিন্তা করে দেখি কী করতে পারি। আমরা তো অপোজিশনের অপোজিশন। কংগ্রেসকে যদি অপোজিশন বলো। এই মুহূর্তে কংগ্রেস তা নয়। কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে? কংগ্রেস যদি কেবলমাত্র পদত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় থাকে আমাদের কর্তব্য হবে তাকে নাড়া দেওয়া। সে যদি তাতেও না নড়ে আমরা একাই এগিয়ে যাব। মিউটিনি আদি ঘটাব। তোমার উপরে আমরা নির্ভর করি, মধু। বেঙ্গলে আমাদের মহিলাকর্মী তেমন নেই। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তোমাকে আমরা খুব মিশ করেছি। পরের বার তুমি আমাদের বঞ্চিত করবে না তো?" অশোকাদি সস্নেহে সুধান।

"পরের বার বলে কিছু থাকলে তো? মাউন্টব্যাটেন যে ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করতেই এসেছেন। ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন। কালবিলম্ব করেননি। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন তাঁরাই জেনেছেন যে ইংরেজদের চলে যেতে আর একটা বছরও লাগবে না। বিশ্বাস করা কঠিন, বার বার বিশ্বাস করে ঠকে গেছি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমরা কুইট না করতে বললেও ওরাই কুইট করবে। মিউটিনি আমরা করব কার বিরুদ্ধে? দেশী সিপাইদের এক অংশের বিরুদ্ধে? হিন্দু বনাম মুসলিম? মুসলিম বনাম শিখ? জনগণকেই বা কার বিরুদ্ধে লড়তে বলব? হিন্দু বনাম মুসলিম? মুসলিম বনাম শিখ? গণ সত্যাগ্রহই বা কার বিরুদ্ধে কে করবে? লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস? দক্ষিণপন্থীর বিরুদ্ধে বামপন্থী? আমাদের থীসিসের প্রথম কথাই তো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে হটাতে হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যদি নিজেই হটে যায় তাকে হটানোর প্রশ্নই ওঠে না। তার হাত থেকে রাজদণ্ড হস্তান্তরের প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্নটার উত্তর চাইছেন মাউন্টব্যাটেন। এর উত্তর গান্ধী একভাবে দিচ্ছেন, জিন্না আরেকভাবে।" মিলি যতদূর জানে।

অশোকাদি বলেন, "শুনেছি। গান্ধীজী প্রস্তাব করেছেন জিন্না সাহেবই নতুন শাসনপরিষদ্ গড়বেন ও ভারতরাষ্ট্র চালাবেন। জিন্না সাহেব বলেছেন, ভারতরাষ্ট্র নয়, পাকিস্তান পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করা মানে তো মাস্টার তারা সিংকে অসন্তুষ্ট করা। কাজেই এসব কথাবার্তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক। ইংরেজরা কারো হাতে ভার দিয়ে চলে যেতে পারে না। না দিয়েও চলে যেতে পারে না। ওরা থাকছেই, সুতরাং আমাদের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা সে ভূমিকাও থাকছে। আমরা হস্তান্তর চাইনে। আমরা লাল কেল্লা দখল করব। সৈন্যদলের সাহায্যে। জনগণের সাহায্যে। পার্টির সাহায্যে।"

মিলি উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু ভিতর থেকে তেমন সায় পায় না। "অশোকাদি, আপনি বোধহয় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা জানেন না। লাল কেল্লা দখল করেও আপনারা তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। মুসলিম লীগও ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি দখল করবে। পূর্ববঙ্গ গেলে আসামও যাবে। লাল কেল্লা থেকে গৌহাটী বহু দূর। মুসলিম লীগের পেছনেও সৈন্যদল ও জনগণ। সিভিল ওয়ার বাধবেই। রাশিয়া তার সুযোগ নিতে পারে। আমরা রুশপন্থী নই, কমিউনিস্ট নই। আমাদের কী লাভ?"

"ঝুঁকি নিতে হবে, মধু। নো রিস্ক নো গেন। যা কিছু হারাব তা পাঁচ বছরের মধ্যেই জিতে নেব। সিভিল ওয়ারকে এত ভয় কেন? এমন কোন্ দেশ আছে যে দেশে সিভিল ওয়ার হয়নি? আমরাও সিভিল ওয়ারের ভিতর দিয়ে যাব। তার শেষে আরো সংহত হব। এই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটবে, সেই সঙ্গে শিখ মুসলমানের বিরোধও। রক্তপাত? তা রক্তপাত একটু হবে বইকি। চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে চল্লিশ লক্ষের মৃত্যু এমন কিছু বেশী ক্ষতি নয়। সেদিন দুর্ভিক্ষেও তো ত্রিশ লক্ষ মারা গেল। আমেরিকার জনসংখ্যা যখন তিন কোটি ছিল তখন দশ লক্ষ লোক সিভিল ওয়ারে প্রাণ দিয়েছিল। পঞ্চাশ লক্ষ জখম হয়েছিল। তার ফলে আমেরিকা এখন মহাশক্তিমান হয়েছে। পৃথিবীর মহত্তম শক্তি। ভারতও তেমনি এক মহাশক্তি হবে, যদি সিভিল ওয়ারের ভিতর দিয়ে যায় ও অবিভক্ত থাকে। ক্ষমতার হস্তান্তর কথাটার মধ্যে একটা আপস-আপস ভাব আছে। আপস না করলে হস্তান্তর হয় না। ব্রিটেন কি

বিনা শর্তে হস্তান্তর করবে? কোথাও করেছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। তুমি দেখবে মাউন্টব্যাটেন সুকৌশলে শর্তাধীন স্বাধীনতা দিয়ে যাবেন। ওই জাতটাকে চিনতেন একমাত্র নেতাজী সুভাষ। আর কেউ না। গান্ধীজীও না। নেহরু তো নয়ই। এঁরা ইংরেজদের বন্ধু। ইংরেজদের মধ্যেও এঁদের বন্ধু আছেন। সেইজন্যে এঁদের আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে নেতাজী আজ এদেশে নেই। আশঙ্কা হচ্ছে যে হস্তান্তর একভাবে না একভাবে হয়ে যাবে। পার্টিশনের ভিত্তিতে হতে পারে। কতক নেতা আবার পাঞ্জাব পার্টিশনের জন্যেও ক্ষেপেছেন।" অশোকাদি দুঃখ করেন।

"বেঙ্গল পার্টিশনের জন্যেও।" মিলি যোগ করে।

"শুনে অবাক হচ্ছি, ভাই। তা হলে শতাব্দীর গোড়ায় অত বোমাবাজি করার দরকারটা কী ছিল? ক্ষুদিরাম, বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর প্রভৃতির আত্মত্যাগ বৃথা। আমি বাংলার বাইরেই থাকি। বাইরেই আমার বিয়ে। আমার কর্মক্ষেত্রও বাইরে। বিয়াল্লিশে কিছুদিন কলকাতায় ছিলুম, এই যা সম্পর্ক। তোমরা কিছুতেই বাংলা ভাগ হতে দিয়ো না। দিলে ওটা হবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি বিট্রেয়াল। তোমার নিজের প্রতিও। নেতাজী নেই বলে কি আর কেউ নেই?" অশোকাদি বিস্মিত হন।

মিলি সেই মাপের আর কারো নাম করতে পারে না। মৌন থাকে।

সুকুমার যখন ভিতরের খবর সংগ্রহের জন্যে বেরিয়ে যায় তখন মিলিও বেরয় দিল্লী শহর ঘুরে ফিরে দেখতে। আগেও দেখা ছিল, কিন্তু তন্ন তন্ন করে নয়। অশোকাদি তাকে তাঁর নিজের গাড়ীতে করে নিয়ে যান। নিজেই চালান।

"আমাদের হাতে রাজক্ষমতা ফিরে এলে আমরা আবার লাল কেল্লায় ফিরে যাব। লাল কেল্লাই আমাদের ক্রেমলিন। পরিতাপের বিষয় মিউটিনির সময় ইংরেজরা তার আবাসিক অংশটা তোপ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আবার সেটা গড়ে তুলব। পুরাতন দিল্লীই আসল দিল্লী। সেটা আমাদের গৌরব। তার একটা ঐতিহ্য আছে। সেটা অন্তত এক হাজার বছরের। প্রথমে রাজপুত, তারপরে পাঠান বা তুর্ক, তারপরে মোগল। মহাভারত যদি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বলে গণ্য হয় তবে এই দিল্লীই সেই ইন্দ্রপ্রস্থ। তা হলে এর উদ্ভব তিন হাজার কি চার হাজার বছর পূর্বে। কার সঙ্গে কার তুলনা! বাঘের সঙ্গে বিল্লীর। পুরাতন দিল্লীর সঙ্গে নতুন দিল্লীর! নতুন দিল্লী আমাদের অগৌরবের নিদর্শন। এটা হচ্ছে ব্রিটিশ অকুপেশনের প্রতীক। যতদিন ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের মাটিতে থাকবে ততদিন ভারত একটি অকুপায়েড কাণ্ট্রি। নাৎসী অকুপেশনে ফরাসীদের মতো আমরা বাস করছি ব্রিটিশ অকুপেশনে। ওই বড়লাট ভবনে আমাদের সম্মানের স্থান নেই। ওই নর্থ ব্লক আর সাউথ ব্লকেও আমাদের শীর্ষস্থান নয়। ওই আইন সভাতেও একদল ইউরোপীয় বসে আছে, তারা এ দেশের লোকের প্রতিনিধি নয়। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী। উর্দু কবি আকবর যথার্থই বলেছেন,

'মহ্‌ফিল উনকী সাকী উনকা
আঁখো মেরি বাকী উনকা।'

ওদেরই ভোজ, ওদেরই পরিবেশক। চোখ শুধু আমাদের। আর সব ওদেরই। আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে নতুন দিল্লীকে আমরা তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেব। না, তার সমস্তটা নয়। তার খাঁটি বিলিতী অংশটাকে। যেখানে বাস করে ওরা ভাবে ওরা বিলেতে বাস করছে।" অশোকাদি রাগত স্বরে বলেন।

মিলি চিন্তা করে বলে, "তা হলে গত তিনশো বছর ধরে বণিক বা শাসক হিসাবে ওরা যেখানে যা কিছু গড়েছে তা তোপ দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। আর এটা কেবল ইংরেজদের বেলা কেন, পাঠান বা তুর্কদের বেলা কেন নয়? মোগলদের বেলা কেন নয়? লাল কেল্লাটাই বা কেন বাদ যাবে?"

অশোকাদি একটু চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলেন, "তফাৎ আছে। ইংরেজরা এদেশে বাস করতে আসেনি, এদেশের অধিবাসী হয়নি। ধন সঞ্চয় করে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। আর মোগল পাঠান

তুর্করা এদেশে বাস করতেই এসেছে, এদেশের অধিবাসী বনে গেছে। ওরা যেন এদেশের অ্যাংলো-স্যাকশন ও নরম্যান। আর ইংরেজরা যেন রোমান। রোমান অপসরণের মতো ব্রিটিশ অপসরণও একদিন ঘটবে। কিন্তু মোগল পাঠান বা তুর্ক অপসরণ কোনো দিন ঘটবে না। কাজেই লাল কেল্লা আমাদের গৌরবের বস্তু, নতুন দিল্লী তা নয়। ওই পঞ্চম জর্জের মূর্তির উপযুক্ত স্থান তাঁর স্বদেশ। সেটা এদেশের মাটিতে কেন? সেটাকেও ওখান থেকে সরাতে হবে। মোগল পাঠান তুর্ক আমল হিন্দুদের পক্ষে অগৌরবের হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে ভারতের পক্ষে গৌরবের। দেশের বহু অংশে হিন্দু রাজারাও রাজত্ব করতেন। তামিলরা, মালয়ালীরা, অহোমরা, আসামের পার্বত্য জাতিরা বরাবরই সুলতান ও বাদশাদের ধারা অবিজিত। ভারতবর্ষ সামগ্রিক অর্থে পরাধীন হয় ব্রিটিশ অধিকারের সময়ই। ইংরেজরাই একটার পর একটা খণ্ড ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করেছে। জুড়ে জুড়ে অখণ্ড করেছে। তার জন্যে তাদের ক্রেডিট দিই। যদি অখণ্ড রেখে যায় তবে আরো ক্রেডিট দেব। কিন্তু পরাধীনতার চিহ্ন মুছে ফেলব। ভাবীকালকে জানতে দেব না যে পরাধীন ছিলুম।"

"কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ভারত জুড়ে ইংরেজদের যেসব কীর্তি আছে, যেমন দিল্লীর বড়লাট ভবন বা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এসব কি ওদের আমলের পরে আমরা সংরক্ষণ করব না?" মিলি জানতে চায়।

"ওদের আমল আবার কী? ওদের অকুপেশন, বলো। যত দীর্ঘ হোক না কেন ওটা একটা বহিঃশক্তির অকুপেশন বই তো নয়। ওদের প্রত্যেকটি স্ট্যাচুকেই ধূলিসাৎ করা উচিত। কলকাতার গড়ের মাঠের উট্রামের সেই অশ্বারোহী স্ট্যাচুকেও। ওই যে অক্টারলোনী মনুমেন্ট ওটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে। অক্টারলোনী যখন দিল্লীতে ছিল তখন তার হারেমে থাকত তেরোজন বিবি। ব্রিটিশ অকুপেশনের কোনো চিহ্নই আমরা রাখব না। তবে সেনেট হাউস সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সম্পর্কেও। শিল্পমাত্রেই বিশ্বজনীন। যেখানেই দেখবে শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সেখানেই তা সংরক্ষণ করবে। অকুপেশনের আমলের হলেও।" অশোকাদি ব্যতিক্রম মানেন।

"উট্রামের অশ্বারোহী স্ট্যাচুটাও কি উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়?" মিলি প্রশ্ন করে।

"ঘোড়াটা, হ্যাঁ। সওয়ারটা, না। ঘোড়াটা রেখে তার উপর নেতাজীকে বসাতে হবে।" অশোকাদি উত্তর দেন।

"তা ওদের অকুপেশনে কত ভালো কাজ হয়েছে, কতক ওদের দ্বারা, কতক ভারতীয়দের দ্বারা, আমরা কি আস্ত আমলটাকেই ইতিহাসের বই থেকে মুছে ফেলব? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ এঁদের কীর্তিকেও?" মিলির জিজ্ঞাসা।

"ইতিহাসে ব্রিটিশ আমল বলে কিছু থাকবে না। লেখা হবে বিদেশী অকুপেশন। যেমন ফ্রান্সে নাৎসী অকুপেশন। নাৎসী অকুপেশনেও পিকাসো অপূর্ব সব ছবি এঁকেছেন, তা বলে কি ফ্রান্সের ইতিহাসে নাৎসী অকুপেশনের জন্যে একটা অধ্যায় নির্দিষ্ট থাকবে? ভারতের ইতিহাসের এই দেড়শো বছর ফ্রান্সের ইতিহাসের পাঁচ বছরের মতোই মন থেকে মুছে ফেলার যোগ্য। তবেই আমাদের ছেলেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আমাদের মতো মাথা হেঁট করে নয়।" অশোকাদির উত্তর।

মাউন্টব্যাটেন দম্পতির নিমন্ত্রণে সুকুমার ও মিলি বড়লাট ভবনের সংলগ্ন মোগল উদ্যানে অনুষ্ঠিত গার্ডেন পার্টিতে যায়। কি নেই সেখানে? হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বাঙালী, মারাঠা, দক্ষিণী, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, নারী, পুরুষ। ছোটোখাটো একটা মাঘমেলা। মাঘমেলায় ভিন্ন ধর্মের লোক থাকে না। এখানে তাও আছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে ভিন্ন ধর্মের লোক থাকে, কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা থাকে না।

"মিলি, এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। ইংরেজরা যত জাতের, যত ধর্মের, যত ভাষার, যত অঞ্চলের স্ত্রী

পুরুষকে একত্র করতে পেরেছে ভারতের ইতিহাসে আর কেউ তত পারেনি। এই একাত্মতা ওদের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। আর ফিরে আসবে না। ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে ব্রিটিশ আমলই একমাত্র অধ্যায় যখন এটা সম্ভব হয়েছিল। আমরা কেবল ঝগড়া করতেই জানি। মিলতে ও মেলাতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শুধু কবিতায়।" সুকুমার আবেগের সঙ্গে বলে।

মিলি লক্ষ করছিল মাউন্টব্যাটেন দম্পতিকে। সকলের সঙ্গে সমানে মিশছেন। কোনো হামবড়া ভাব নেই। ভিড়ের মধ্যে তাঁরা অকুতোভয়। খুন করতে চাইলে ঠেকাত কে? কিন্তু সে ভাবনাই মাথায় আসে না। ওঁরা এসেছেন হৃদয় হরণ করতে। রেশমের ডোরে বাঁধতে। ক্লাইভের স্মৃতি মুছে দিতে।

লেডী মাউন্টব্যাটেন মিলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুশলপ্রশ্ন করেন ও বলেন, "আপনি কি যুদ্ধের সময় লণ্ডনে ছিলেন?"

মিলি থতমত খেয়ে মাথা নাড়তেই তিনি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সুকুমার তো হাঁ।

॥ পনেরো ॥

সুপ্রকাশ পাকড়াশী যূথিকার কাছে মাফ চায়। "সেবার সময় করে উঠতে পারিনি বলে আপনাকে সেলাম দিয়ে যেতে পারিনি, মিসেস মালিক। আশা করি কিছু মনে করেননি।"

যূথিকা অভিমান করে। "জানি কারণটা কী। আমরা চা, কফি, ফলের রস ভিন্ন আর কিছু অফার করিনে। তাও দ্রাক্ষাফলের রস নয়। ওসব আমরা রাখিনে।"

হাসাহাসি পড়ে যায়। সুপ্রকাশ বলে, "কিন্তু আপনার বাড়ীতে স্মেলিং সল্টতো রাখেন। না তাও রাখেন না?"

যূথিকা চমকে ওঠে। "কেন? স্মেলিং সল্ট কার দরকার?"

"মানসের দরকার হতে পারে। আমারও দরকার হয়েছিল। লাখ দুয়েক টাকা হাতছাড়া হলে কে না মূর্ছা যায়।" সুপ্রকাশ রহস্য করে।

"লাখ দুয়েক টাকা!" যূথিকা অবাক। "বুঝতে পারছিনে।"

মানস বুঝতে পেরেছিল যে ক্ষতিপূরণের কথা হচ্ছে। "ক্ষতিপূরণ তা হলে আমরা কেউ পাচ্ছিনে?"

"কেউ পাচ্ছে না ঠিক নয়। পাচ্ছে যাদের রং ধলা। পাচ্ছে না যাদের রং কালো। স্বাধীনতার আরম্ভ হচ্ছে বর্ণবৈষম্য দিয়ে। আহা, কী আছে দিন না একটু! কমলালেবুর রস? তাই সই।" সুপ্রকাশ কপট কাতরোক্তি করে।

যূথিকা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মানস বলে, "আমি জানতুম আমার কপালে শিকে ছিঁড়বে না। আমাকে আনুপাতিক পেনসন নিয়েই সরে পড়তে হবে। কোথায় বসব সেইটেই ভাবনা। যেখানে সব কিছু সস্তা।"

"তেমন স্থান ভূভারতে নেই। তুমি ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে পারো। পেনসনটা সেখানেও ড্র করতে পারবে। পাউণ্ডের দাম আছে। টাকার দাম তো দিন দিন কমছে।" সুপ্রকাশ বলে।

"নাঃ। তা হয় না। আমি বাংলাভাষার লেখক। পাঠকের সঙ্গে, প্রকাশকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চাই। লোকে বলবে দেশদ্রোহী।" মানস অনিচ্ছুক।

"যাক, তুমি মূর্ছা যাওনি, এই যথেষ্ট। আমার সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে। লাখ দুয়েক টাকা ইনভেস্ট করে কোনো একটা বনেদী ফার্মের পার্টনার বা ডিরেক্টর হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব স্থির করেছিলুম। কিন্তু বাদ সাধলেন বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব শুনে আকাশ থেকে পড়েন। ক্ষতিপূরণ!

কিসের ক্ষতিপূরণ? নতুন সরকার তো পুরাতন সরকারের প্রত্যেকটি অফিসারকে বহাল রাখতে রাজী। ইউরোপীয় ভারতীয় নির্বিশেষে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ যেতে চান ক্ষতিপূরণ তো তিনিই দেবেন। কারণ তিনিই নতুন সরকারের ক্ষতি করে যাচ্ছেন। বহুদর্শী অভিজ্ঞ অফিসার আমরা পাব কোথায়? সে শূন্যতা পূরণ হবে কাকে দিয়ে? তিনি কিছুতেই ধরাছোঁয়া দেবেন না। পরে ভেবেচিন্তে বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হয় দেবেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্ট নয়। কভেনান্ট তো সেক্রেটারি অভ্ স্টেটের সঙ্গে। ব্রিটেন স্বীকার করে যে কথাটা ঠিক। কিন্তু ব্রিটিশ ট্রেজারি জানিয়ে দেয় ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড না কত বহন করার সামর্থ্য ব্রিটিশ ট্রেজারির নেই। শুধু ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তো নয়, ইণ্ডিয়ান পুলিশ, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, আরো দুটো একটা সার্ভিসও সংশ্লিষ্ট। ফাইল আবার ভারত সরকারের কাছে ঘুরে আসে। অনেক ধস্তাধস্তির পর এই স্থির হয় যে ক্ষতিপূরণ শুধু ইউরোপীয় অফিসাররাই পাবেন।'' সুপ্রকাশ বিবরণ দেয়।

যূথিকা ততক্ষণে কিছু খাদ্য পানীয় নিয়ে ফিরে এসেছে। পরিবেশন করতে করতে বলে, ''ওই লুটেরাদের বরাবরের জন্যে বিদায় দেওয়া হচ্ছে, এর মতো সুখবর আর কী আছে? ন্যায্য বিচারই হয়েছে।''

''আপনি বলছেন ন্যায্য বিচার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী পর্যন্ত বলেন ফেয়ার নয়। ভারতীয়রাও সমান যোগ্যতার সঙ্গে কাজকর্ম করেছেন, সমান ঝুঁকি নিয়ে বেআইনী কার্যকলাপ দমন করেছেন, চুক্তিও তো উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তবে একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? আপনিই বলুন, মিসেস মালিক।'' সুপ্রকাশ শুনতে চায়।

''তা হলে অ্যাটলী মহোদয়ই বা হস্তক্ষেপ করেন না কেন? কিছুই তো তাঁর অমতে হতে পারে না।'' যূথিকা তর্ক করে।

''ঠিক। কিন্তু ব্রিটিশ ট্রেজারি প্রতিকূল। তার চেয়েও প্রতিকূল বল্লভভাই প্যাটেল, ভারত সরকারের হোম মেম্বর ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের প্রধান। সর্দারজী সাফ জানিয়ে দেন যে তিনি থাকতে একজনও ভারতীয় ক্ষতিপূরণ পাবে না। মজার কথা লিয়াকৎ আলী খান্‌ও তাঁর সঙ্গে একমত। যদিও আর সব বিষয়ে ভিন্নমত। সর্দারজী বলেন, ভারতীয় অফিসারদের মতলব ভালো নয়। ওরা ক্ষতিপূরণের টাকা পকেটে পুরে সরকারের সঙ্গে আরো তেজের সঙ্গে বার্গেন করবে। মাথায় চড়ে বসবে। ওরা যে মাস্টার নয়, সার্ভ্যান্ট এটা ওদের সমঝিয়ে দেওয়া দরকার। ইউরোপীয় অফিসাররা ইণ্ডিয়ানও ছিল না, সিভিল ছিল না, সার্ভ্যান্টও ছিল না। ইণ্ডিয়ান অফিসাররাও তাদেরি ধারা ধরেছিল। এখন থেকে ইণ্ডিয়ানও হবে, সিভিলও হবে, সার্ভ্যান্টও হবে।'' সুপ্রকাশ শোনায়।

যূথিকা হাততালি দিয়ে বলে, ''সাবাশ। সর্দারজী, সাবাশ!''

মানস কিন্তু শুনে সুখী হয় না। বলে, ''সিভিল মানে এক্ষেত্রে অসামরিক। অর্থাৎ মিলিটারি নয়। আর সার্ভ্যান্ট মানে এক্ষেত্রে সেবক। গোখলের সার্ভ্যান্টস অভ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য। তাঁরা কারো চাকর নন। তেমনি, আমরাও চাকর হইনি, সেবক হয়েছি। নতুন সরকার যদি চাকরের মতো ব্যবহার করেন তো আমার সরে যাওয়ার সেটাও হবে একটা কারণ। যারা মাথা হেঁট করে শাসনকার্য চালায় কেউ তাদের ভয়ও করে না, ভক্তিও করে না। কংগ্রেসেরই মাথা হেঁট হবে।''

এর পরে অন্য প্রসঙ্গ। যূথিকা জানতে চায় পার্টিশন হলে বাংলাদেশও কি বিভক্ত হবে? তাই যদি হয় তবে কলকাতা কার ভাগে পড়বে?

''এ নিয়ে তীব্র মতভেদ। হিন্দুরা অবশ্য চায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ুক। যেহেতু কলকাতা হিন্দুপ্রধান শহর। মুসলমানরা বলে, বঙ্গভঙ্গ আদৌ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি হয় কলকাতা পূর্ববঙ্গকে দিতে হবে। যেহেতু কলকাতা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে। আর হুগলী নদীই দুই বঙ্গের প্রাকৃতিক সীমান্ত

রেখা। গভর্নরের মতে কলকাতা গড়ে উঠেছে পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তের ধনসম্পদে। তার উপর উভয় প্রান্তের ন্যায্য দাবী। সুতরাং কলকাতা হবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রী সিটি। উভয় প্রান্তই অবাধে আমদানী রফতানী করবে। আমদানী শুল্ক রফতানী শুল্ক উভয়েই সমানভাবে ভাগ করে নেবে। আয়করের টাকারও দুই সমান ভাগ হবে। কলকাতার শাসন পরিষদে দুই প্রান্তের প্রতিনিধিসংখ্যাও হবে সমান সমান।" সুপ্রকাশ বলে।

যূথিকা আবার হাততালি দেয়। "সাবাশ, লাটসাহেব।"

মানস হেসে উড়িয়ে দেয়। "কলকাতা হবে আরো একটা বার্লিন। সেখানে রুশে মার্কিনে ইংরেজে ফরাসীতে এই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে। শেষে শহরটা দু'ভাগ হয়ে না যায়। জার্মানী দেশটার মতো। যেখানে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ সেখানে প্রত্যেকটি শক্তিকেন্দ্র নিয়ে ঝড় উঠবে। ভোটের জোরে যার নিষ্পত্তি হবে না গায়ের জোরে তার নিষ্পত্তি হবে। একপক্ষ ডেকে আনবে আজাদ হিন্দুস্থান ফৌজকে, আরেক পক্ষ ডেকে আনবে আজাদ পাকিস্তান ফৌজকে। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ তো হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ফৌজ দুটো থাকবে আনাচে কানাচে। গায়ের জোরেও যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে ফের সেই ইংরেজকেই ডাক পড়বে। তার যুদ্ধজাহাজও তো আনাচে কানাচে।"

সুপ্রকাশ তর্ক করে না। "কলকাতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত একান্ত কঠিন বলেই মাউণ্টব্যাটেন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের উপর ছেড়ে দিতে চান। তাঁরাই স্থির করবেন বাংলাদেশ বিভক্ত হবে না অবিভক্ত থাকবে। অবিভক্ত থাকলে কলকাতা নিয়ে ঝড় ওঠার উপলক্ষ নেই। গভর্নমেণ্ট হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার, হাইকোর্ট যেমন আছে তেমনি থাকবে। প্রশ্ন উঠবে ফোর্ট উইলিয়াম, জেনারল পোস্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, হাওড়া ও শিয়ালদা রেল স্টেশন, দমদম এয়ারপোর্ট নিয়ে। এসব হলো কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা। কিন্তু কোন্ কেন্দ্রীয় সরকারের? হিন্দুস্থান না পাকিস্তান না দুই? বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম যদি হয় তবে বাংলাদেশ সরকারের। এই পয়েণ্টে পণ্ডিত জবাহরলালের তীব্র আপত্তি। প্রদেশগুলো এক এক করে বেরিয়ে যেতে পারে। দেশীয় রাজ্যগুলো তো বাইরেই রয়েছে। তবে কি ইংরেজ বর্জিত ভারত হবে আরো একপ্রস্থ বলকান রাষ্ট্র? তাঁর কথা হলো, বাংলাদেশ যদি অবিভক্ত থাকে তবে তাকে হয় ভারতের সামিল হতে হবে। পাকিস্তানের সামিল হতে দিতে হিন্দুরা নারাজ। আর হিন্দুস্থানের সামিল হতে দিতে মুসলমানরা। যেমন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ বিভক্তই হবে। এবার রাজার ইচ্ছায় নয়, প্রজার ইচ্ছায়।"

"কিন্তু তা হলে কলকাতার কী হবে? সে কার ভাগে পড়বে? এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের কী সিদ্ধান্ত?" যূথিকা সুধায়।

"এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের উপর। সেটা এখনো অনিশ্চিত। বাংলাদেশ ভাগ করাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে সীমান্তরেখা নির্ণয়ের জন্যে কমিশন বসবে। কমিশনের রায় যে কেমন হবে তা কে বলতে পারে? কমিশনের চেয়ারম্যান যদি উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে থাকেন তবে কলকাতা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গই পাবে। কারণ জনসংখ্যাই প্রধান নিয়ামক। জনসংখ্যার ভিত্তিতেই দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ হচ্ছে। হুগলী নদীর দুই তীরেই হিন্দু মেজরিটি। এক মুর্শিদাবাদ ব্যতীত। তবে এই পয়েণ্টে কতকটা অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে।" সুপ্রকাশ স্বীকার করে।

"যেমন দেখছি কলকাতা নিয়ে একটা যুদ্ধটুদ্ধ না বাধে! কমিশনের রায় যে পক্ষের বিরুদ্ধেই যাবে সে পক্ষই হুঙ্কার ছাড়বে, লড়কে লেঙ্গে কলকত্তা। এবার শুধু দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়, কামান বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ। শুনছি সেটা হবে ব্যাটল অব ক্যালকাটা। তার প্রস্তুতি এখন থেকেই চলেছে। দিনও নাকি ধার্য হয়েছে দোসরা না তেসরা জুন।" যূথিকা বলে।

"হ্যাঁ, গভর্নরও বলছেন তিনি এবার বসে আছেন বারুদের পিপের উপর নয়, গোলাগুলীর

ভাণ্ডারের উপর। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তার কাছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং তুচ্ছ। গ্রেটার ক্যালকাটা ম্যাসাকার আসন্ন। আমরা ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছি।" সুপ্রকাশ বলে।

"কলকাতা যদি জ্বলে ওঠে তার আগুনের হল্কা লেগে পূর্ববঙ্গের গ্রাম গঞ্জ জ্বলে উঠবে। সে দাবানল নির্বাপন করবে কে? পাকিস্তান যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন মুসলিম অফিসারদের সহযোগিতা সুনিশ্চিত ছিল। এখন তাঁরা মুসলিম মহলে আনপপুলার হতে চান না। পাকিস্তান হলে চাকরি হারাবার ভয়। আর হিন্দু অফিসারদের মনের কথাটা চাচা, আপনা বাঁচা। যেখানে শতকরা পঁচানব্বই জন মুসলমান সেখানে শতকরা পাঁচজনকে বাঁচাতে গেলে নিজেরাই বাঁচবেন না। একমাত্র ইউরোপীয় অফিসারদেরই মনোবল অটুট। তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তবু তাঁরা তাঁদের রাজত্বের শেষদিনটি অবধি দাপটের সঙ্গে শাসন করে যাবেন। তাঁদের খুঁটির জোর ততদিন ব্রিটিশ বেয়োনেট যতদিন। তারপরে তাঁরাও অসহায়। তুমি এসেছ সব দেখে শুনে রিপোর্ট পেশ করতে। ফিরে গিয়ে কর্তাদের বোলো দোসরা কি তেসরা জুন কলকাতায় যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা না বাধে।" মানসের অনুরোধ।

"পূর্ববঙ্গ এখন মুসলম্যান'স ল্যান্ড। কলকাতা কিন্তু নো-ম্যান'স ল্যান্ড। কলকাতা গেলে তুমি চিনতে পারবে না যে এই সেই কলকাতা, দেড়শো বছর ধরে যে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। কলকাতায় গেলে যা দেখবে তা ব্রিটিশ রাজ নয়, হিন্দু রাজ নয়, মুসলিম রাজও নয়, গুণ্ডা রাজ। আমরা জানি মনার্কি কাকে বলে, অ্যানার্কি মানে কী, কিন্তু এখন যা চলছে তার জন্যে একটা নতুন ইংরেজী শব্দ কয়েন করতে হবে। গুণ্ডার্কি। বস্তুটা শহীদ সুহরাবর্দীর পেটেন্ট। কিন্তু সে পেটেন্ট জাল হয়েছে। দিনের বেলা যিনি ভদ্রলোক রাতের বেলা তিনি গুণ্ডা। পুলিশের কাছে প্রোটেকশন চাইলে তুমি পাবে না, তোমাকে যেতে হবে গুণ্ডার কাছে প্রোটেকশন চাইতে। গুণ্ডারাই এখন সমাজের রক্ষক। রক্ষকবেশী ভক্ষক। কলকাতা থেকে অস্ত্র আইন উঠে গেছে। লাইসেন্স না নিয়ে যে-কোনো লোক পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, স্টেন গান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে। তাকে পাকড়াবে কে? পুলিশের ঘাড়ে ক'টা মাথা? লাটসাহেব মিলিটারি মোতায়েন করেছেন। কিন্তু মিলিটারি তো ঘরে ঘরে গিয়ে সার্চ করতে পারে না। সেটা পুলিশেরই কাজ। গভর্নর বলছেন কলকাতা হবে ফ্রী সিটি। তার মানে কি সেখানে 'ফ্রী ফর অল'? যার খুশি সে অস্ত্র নিয়ে যাকে খুশি তাকে খুন করবে, জখম করবে? তার বাড়ী লুট করবে, দোকানে আগুন দেবে? কলকাতাকে ঠাণ্ডা করলে পূর্ববঙ্গও ঠাণ্ডা হবে, এটা তো অতি সরল যুক্তি। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? ধরতে পারত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, যদি ল অ্যান্ড অর্ডার তার সাবজেক্ট হতো। কিন্তু সে ক্ষমতা হোম মেম্বর বল্লভভাই পাটেলের নেই। ইন্টারিম গভর্নমেন্টটা কংগ্রেস গভর্নমেন্টও নয়। কলকাতাকে কন্ট্রোল করতে হলে দিল্লীতে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে তার এলাকাভুক্ত করতে হবে। আর কলকাতাকে করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সামিল। মুসলিম লীগের দাবী সরাসরি নস্যাৎ করতে হবে। লীগ মন্ত্রীদের কলকাতা থেকে হটাতে হবে। ঢাকায় তাঁরা নতুন করে সংসার পেতে বসুন। পূর্ববঙ্গ হয়েছে ও হবে মুসলমান'স ল্যান্ড। হোক তার নতুন নাম পূর্ব পাকিস্তান, লোকে যদি পছন্দ করে। নামে কী আসে যায়! আমি অত খুঁতখুঁতে নই। মোট কথা কলকাতা পেতে হলে ও তাকে সভ্য মানুষের বাসযোগ্য করতে হলে বাঙালী হিন্দুদের পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাতে হবে। আমি অনেক দুঃখেই একথা বলছি। আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গেই। আমার পক্ষে এটা একটা ফুসফুস কেটে ফেলারই সামিল।" সুপ্রকাশের গলা ধরে আসে।

"পূর্ববঙ্গের মায়া কাটানো কি এতই সহজ? আমার যৌবনের সেরা বছরগুলি কাটিয়েছি এখানে। আর তোমার আমার মতো যাদের বদলীর চাকরি তারাই তো সবাই নয়। সওয়া কোটি হিন্দু যাবে কোথায়? যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। প্রোটেকশনের জন্যে মুসলমান প্রতিবেশীদের কাছেই যাবে। পুলিশের কাছে নয়, মিলিটারির কাছে নয়। আর ওরাও তো মুসলমান। হিন্দুকে মুসলমান না

বাঁচালে কে বাঁচাবে? সাধারণ মুসলমান এখনো সহৃদয়। জানিনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কতদিন সহৃদয় থাকবে। যখন তার পাঞ্জাবী, গুজরাটী, বিহারী ভাই সাহেবরা এসে জুটবেন। আমার সাধ্য থাকলে আমি তাকে বোঝাতুম যে এটা বাঙালীদের সকলের শ্যাও। তাই এর নাম বাংলাদেশ। একে মুসলমানদের দেশে পরিণত করাটা বাঙালীদের সবাইকে তাদের জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা। হাজার হাজার বছর পরে কেন তারা তাদের জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে? বাঙালী মুসলমানরা যদি ধর্ম ছাড়া আর কিছু না বোঝে তবে তারা নিজেদের প্রতিই শত্রুতা করবে। আরব বলো,ইরানী বলো, তুর্ক বলো সকলেরই স্বকীয় সংস্কৃতি আছে। শুধু এদের নেই, যেহেতু এরা বাঙালী নয়, পাকিস্তানী।" মানস দুঃখিত।

অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুপ্রকাশ বলে, "আমি কিন্তু তোমার মতো আশাবাদী নই। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং স্বচক্ষে দেখেছি। এ জগতে কেউ অপরকে বাঁচায় না। ঋষি বঙ্কিমের উক্তিই সত্য। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? কিন্তু কী করে, যদি এরা পূর্ববঙ্গের মায়া না কাটায়? যদি পাকিস্তান না ছাড়ে? মরার বাড়াও দুর্গতি আছে। এদের পূর্বপুরুষদের মতো এরাও দলে দলে কলমা পড়বে, আরবী নাম নেবে, ভুলে যাবে যে এরা একদিন বাঙালী ছিল। এদের নিপাত করার মতো আহাম্মক মুসলমানরা নয়। এদের মুসলমান করেই অদের সংখ্যাবৃদ্ধি। সংখ্যার জোরেই তারা পাকিস্তান পেতে চলেছে। সংখ্যার জোরেই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাবে। এটা গণতন্ত্রের যুগ। এক একটি মানুষের এক একটি ভোট।"

"তুমি কি মনঃস্থির করে ফেলেছ যে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ স্বীকার করবে? যার কুফল সুদূরপ্রসারী।" মানস চিন্তিতভাবে সুধায়।

"আমি মনঃস্থির করবার কে? মনঃস্থির করেছেন কংগ্রেস নেতারা। গান্ধীজীও তাঁদের টলাতে পারেননি, তাঁর সে বল বয়সও নেই। অনেক দেরিতে তিনি বলছেন ক্যাবিনেট মিশন স্কীম বিনা শর্তে মেনে নিতে। আগে যদি বলতেন তা হলে জিন্নাসাহেব ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব পাশ করাতেন না। শত অনুরোধেও জিন্নাসাহেব সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করেননি, যেমন গান্ধীজী করেননি আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার ইংরেজদের মাথার উপর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের খাঁড়া ঝুলছে, তাই তারা সময় থাকতে কুইট করছে। তেমনি, হিন্দুদের মাথার উপরেও ঝুলছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাবের খাঁড়া। তাই কংগ্রেস নেতারা মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো সময় থাকতে ছেড়ে দিচ্ছেন। ইংরেজদের মতো কংগ্রেস নেতারাও রিয়ালিস্ট। আজকের রিয়ালিটি সাত বছর আগেকার রিয়ালিটি নয়। জবাহরলালকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি হিংসার কাছে নতিস্বীকার করছ?' নেহরু বলেন, 'আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করছি।' ইংরেজরাও তাই করছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিনকের দিন খারাপ হচ্ছে। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গান্ধীজীর উপর ছেড়ে দিলে তিনিও কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? তেমন ইলিউশন তাঁর হয়তো আছে, কিন্তু আর কারো নেই। তাই কংগ্রেসও এক হিসাবে কুইট করছে। কুইট ইস্ট বেঙ্গল, কুইট ওয়েস্ট পাঞ্জাব, কুইট সিন্ধু। তোমরা যদি পূর্ববঙ্গে থাকতে চাও থাকতে পারো, আমি কিন্তু স্থির করে ফেলেছি যে আর মায়া বাড়াব না, মায়ার ডোর কাটব।" সুপ্রকাশ ওঠে।

দিল্লী থেকে মানসকে লিখেছে সুকুমার। "মিলিকে অশোকাদির ওখানে রেখে আমি ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ঘুরে এসেছি। খিজর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট সরকার ওই প্রদেশটাকে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। সেটা মুসলিম লীগের চাঁইদের বরদাস্ত হলো না। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও শিখবিরোধী প্রচারকার্য চালিয়ে ওরা মুসলমানদের গরম করে তোলে। রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে মুসলমানদেরই মেজরিটি। তারা সংখ্যালঘু শিখদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু শিখ মারা যায়, তাদের ঘরবাড়ী দোকানপাট লুট হয় বা পোড়ানো হয়। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুসলমান করা হয়। পুরুষদের শুধু যে মুসলমান করা হয় তাই নয়, মুসলমানিও করা হয়। তার মানে সারকামসাইজ। গোঁফ দাড়ি ও মাথার কেশ ক্ষৌরি করা

হয়। যাতে শিখ বলে কেউ চিনতে না পারে। বসতবাড়ী ধ্বংস করে বাস্তুতে লাঙল দেওয়া হয়। হিন্দুরাও বাদ যায় না। কতক মেয়ে আত্মহত্যা করে ধর্ষণ এড়ায়।

বিশে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার পর থেকে মুসলিম লীগ মরীয়া হয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক ব্রিটিশ অপসরণের পূর্বে সারা পাঞ্জাব অধিকার করা চাই। ওদিকে শিখরাও পণ করেছে কিছুতেই মুসলিম লীগকে পুরো পাঞ্জাব অধিকার করতে দেবে না, হিন্দুদেরও পণ তাই। ওরা চায় অর্ধেক পাঞ্জাব। ইতিমধ্যেই শরণার্থী সমাগম শুরু হয়ে গেছে। হিন্দু-শিখরাও দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলিম খেদাচ্ছে। লোকবিনিময় তো জিন্না সাহেবেরই দাবী। সামলান এখন ঠেলা। আইনসভায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে খিজর হায়াৎ খান্ পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু গভর্নর মুসলিম লীগকে একক দল হিসাবে ক্ষমতায় আসতে দেননি। তফশীলী হিন্দুদের সাহায্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও গভর্নর শাসনক্ষমতা দেবেন না। শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে। লীগ তাতে নারাজ। লীগ নেতা বলেন, আগে তো অন্যান্য প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার হোক। তার পরে এখানেও হবে। গভর্নর কড়া লোক। তিনি ও যুক্তি শুনবেন না। অন্যান্য প্রদেশের মামলা অন্যান্য প্রদেশের। পাঞ্জাবের মামলা পাঞ্জাবের। তাই পাঞ্জাবে এখন গভর্নরের শাসন। মাউন্টব্যাটেন এর সমর্থক। জিন্না ঠকে গেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব পার্টিশন চান। গান্ধীজী চান না। জিন্না যে চান না এটা না বললেও চলে। মাউন্টব্যাটেনকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিতে হবে বাংলাদেশের পার্টিশন সম্বন্ধেও। সেখানেও কি পার্টিশন, না স্বাধীন বাংলা?

স্বাধীন বাংলা হলে তিলোত্তমা কলকাতা নিয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই বাধবে না। নয়তো ব্যাটল ফর ক্যালকাটা। শোনা যায় রোগজীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার। আশা করি গুজবটা মিথ্যা। সত্য হয়ে থাকলে হিন্দুদের অস্ত্রে হিন্দুরাও মরবে। স্বখাত সলিল।

মাউন্টব্যাটেনের চার্ম এমন যে নেহরু প্যাটেল ঘায়েল, গান্ধী আধা ঘায়েল, বাকী কেবল জিন্না। তাঁকে ঘায়েল না করতে পারলে মাউন্টব্যাটেনকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। কঠিনতম কুস্তিটা লর্ড মাউন্টব্যাটেন বনাম মহম্মদ আলী জিন্না। সেটা দেখবার জন্যেই আমি দিল্লীতে রয়েছি। চাকরির আশা দুরাশা। আমাকে বিলেত ফিরে যেতেই হবে। মিলির কথা মিলিই জানে।

গান্ধীজী যে ক'দিন এখানে ছিলেন মিলি রোজ তাঁর প্রার্থনাসভায় যেত। সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভজন গাইত। 'জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গাইতে শুনে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি কি সত্যি সত্যি রামরাজ্যে বিশ্বাস করো?' ও জবাব দেয়, 'ইংরেজদের কতরকম কমিউনিটি সং আছে। আমাদের নেই। থাকা উচিত। কংগ্রিগেশনাল ওয়ারশিপও নেই। থাকা উচিত। গান্ধীজী হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও কি তিনি কয়েকটি গান নেননি? ওসব গান উনিই তো ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।'

গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় শুনে আশ্চর্য হবে মাউন্টব্যাটেনের কন্যা পামেলাও নিয়মিত যায়। ওর মুখখানি দেখলে সত্যি বিশ্বাস হয় যে ও একজন সাধুসন্তের সান্নিধ্য লাভ করতে এসেছে। কিন্তু আমার মতো সীনিকরা বলে ওটা কূটনৈতিক চাল। অমনি করে ওঁরা আমাদের হৃদয় জয় করতে চান। মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর স্ত্রী কন্যা। জানেন না গান্ধী একটা পুরনো ঘুঘু। পয়লা নম্বর বেনে। আসল মুক্তা বলে নকল মুক্তা বাড়িয়ে দিলে তিনি নেবেন না। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা না চালিয়ে তাঁর অনুগামী জবাহরলাল ও বল্লভভাইয়ের সঙ্গে চালানো হচ্ছে। এঁরা নকলকে আসল বলে ভ্রম করতে পারেন। তবে বল্লভভাইও সেয়ানা ঘুঘু। আর জবাহরলালও অনেক পোড় খেয়ে বাস্তববাদী হয়েছেন জবাহরলাল ইতিমধ্যেই মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান বদলে দিয়েছেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাসে তিনি রাজী, যদি দুটোর বেশী ডোমিনিয়ন না হয়। যাঁরা যুক্তবঙ্গ চান তাঁদের তিনি বলেছেন, যুক্তবঙ্গকে ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নে

যোগ দিতে হবে। তাঁরা পেছিয়ে গেছেন। এটা ভালো হলো কি মন্দ হলো তা তর্কসাপেক্ষ। তোমার কী মনে হয়? আমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি। গান্ধীজী ভালো মনে করেন না বলে মিলিও ভালো মনে করে না। কৃষ্ণ মেনন ভালো মনে করেন বলে আমিও ভালো মনে করি।"

চিঠিখানা মানস যূথিকাকে দেখতে দেয়। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "নোয়াখালীতে যা ঘটেনি রাওলপিণ্ডিতে তা ঘটেছে। শিখ নারীদের ধর্ষণ এড়াতে আত্মহত্যা আর শিখ পুরুষদের মুসলমান করার সময় খাতনা। এই দুই পাপের ফলে পাঞ্জাব পুড়বে। যদি ব্রিটিশ রাজত্ব থাকতে এর প্রতিকার না হয়। বিয়াল্লিশ সালে বাপুকে ও কংগ্রেস নেতাদেরকে ঢের কম অপরাধে জেলে পোরা হয়েছিল। জিন্নাকে ও মুসলিম লীগ নেতাদেরকে জেলে পোরা হচ্ছে না কেন? ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব কি কম হিংসাত্মক? জিন্না কি বলেননি যে তাঁর হাতে পিস্তল এসেছে? শিখরা এখন পাঞ্জাব ভাগের রব তুলেছে। ভাগ হয়ে গেলে মুসলমানদের ভাগাবে ও নিজেরা ভাগবে। সে রকম কিছু বাংলাদেশেও হতে পারে, যদি কলকাতায় সত্যি সত্যি গৃহযুদ্ধ বাধে।"

"কই, আমাদের এখানে তো তার প্রতিক্রিয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি নেই। লীগপন্থীরা চুপচাপ। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে গভর্নর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিও লীগপন্থী বলে কাউকে রেয়াৎ দিচ্ছেন না। কিন্তু কলকাতায় যদি গৃহযুদ্ধ বাধে অবস্থাটা রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সেটাও নির্ভর করবে দিল্লীর সিদ্ধান্তের উপরে। মাউন্টব্যাটেন তারিখ ফেলেছেন তেসরা জুন। সেইদিন তিনি জানাবেন কী তাঁর সিদ্ধান্ত। না, সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। প্ল্যান। প্ল্যান যদি কোনো পক্ষ অগ্রাহ্য করেন তা হলেই তাঁকে একতরফা একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা যে কী তা কেউ ঠাহর করতে পারছে না। সেটা এতই গোপনীয়। যেটা ততটা গোপনীয় নয় সেটা এই যে, নেতাদের বলা হবে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিতে, নতুবা পার্টিশনে রাজী হতে। শুধু ভারতের নয়, পাঞ্জাব ও বাংলারও পার্টিশন। আইনসভার সদস্যদের দুই সম্প্রদায়ের ভোটে সেটা পাকাপাকি হবে। মুসলিম তথা অমুসলিম। শুধু একটি জায়গায় একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যদি বাংলাদেশের মুসলিম তথা অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই পার্টিশন না-মঞ্জুর করে তা হলে বাংলাদেশ কোন্ ডোমিনিয়নে যোগ দেবে? এটা তর্কের খাতিরে বলা। সকলেই জানে মুসলিম সদস্যরা বলবেন পাকিস্তানে। অমুসলিম সদস্যরা বলবেন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে বা হিন্দুস্থানে। দ্বিমত কেবল কলকাতা নিয়ে। সেটা যদি সদস্যদের ভোটের উপর ছেড়ে না দেওয়া হয় তবে তর্কযুদ্ধের বা অসিযুদ্ধের উপলক্ষ থাকে না। কলকাতা তাদেরই পশ্চিমবঙ্গ যাদের। সেখানকার শতকরা আশিজন নাগরিক হিন্দু। আর আশে পাশেও হিন্দু সংখ্যাধিক্য। যাক, এসব আমার অনুমান।" মানস নিজেই নিশ্চিত নয়। তেসরা জুনের আগে কেউ নিশ্চিত নয়। নেতারাও না।

গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে পাঁচজনে মিলে ভারতভাগ্য বিধাতা হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন, জবাহরলাল নেহরু, বল্লভভাই পাটেল, মহম্মদ আলী জিন্না ও বলদেও সিং। তাঁদের বিধানে ভারত ধরণী দ্বিধা হবে। দ্বিধা হবে একই কালে বঙ্গ ও পাঞ্জাব। পাকিস্তান নামে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবে। তার অঙ্গীভূত হবে পূর্ববঙ্গ তথা পশ্চিম পাঞ্জাব। সিন্ধু ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। গণ ভোটের রায় অনুকূল হলে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তথা সীলেট। আর সব থেকে যাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে।

তেসরা জুন সন্ধ্যাবেলা বল্লভভাই বাদে বাকী চারজন বেতার ভাষণ দেন। বিচলিত হয়ে শোনে মানস ও যূথিকা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর কিছুদিনের মধ্যে ওরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হবে। আইনের ভাষায় এলিয়েন।

দীপক উদ্বিগ্ন হয়ে সুধায়, "কী হয়েছে, বাবা?"

মানস উত্তর দেয়, "আর কিছুদিন পরে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। পাকিস্তান থেকে ইণ্ডিয়ায়।"

"কেন, এটাও তো ইণ্ডিয়া।" দীপক জেরা করে।

"মুসলিম ইণ্ডিয়া বলে একটা কল্পনা বরাবর ছিল। এবার সেটা রূপ ধারণ করছে। নাম নিচ্ছে পাকিস্তান। আমরা যেখানে আছি সেটা পাকিস্তানে পড়বে। কারণ যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী।" মানস ব্যাখ্যা করে।

মণি অত কথা বোঝে না। সে সম্প্রতি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বেশ মেয়েতো স্কুলে তার অনেক বন্ধু হয়েছে। তাদের ছাড়তে কি তার মন চায়? সে কেঁদে ফেলে। "আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।"

যূথিকা তার চোখ মুছিয়ে দেয়। "তোমার বন্ধুরাও কি সকলে এখানে থাকবে? অনেকেই ওপারে যাবে। কিন্তু একই জায়গায় নয়।"

হঠাৎ বঙ্কিমবাবু এসে হাজির। "শুনেছেন? ঘোষণাটা শুনেছেন?"

"শুনেছি। খুব ভালো আর খুব খারাপ খবর। স্বাধীনতা আসছে। এক হাতে সুধাভাণ্ড। অন্য হাতে বিষকুম্ভ। লীগপন্থীদের দিক থেকেও তাই। জিন্নার কণ্ঠস্বরেও বিষণ্ণতার আভাস। জবাহরলালের কণ্ঠস্বরেই বা আনন্দের রেশ কোথায়? কিন্তু এখনো একটা বিষয়ে দ্বিমত। এটা কি সেটলমেণ্ট না কম্প্রমাইজ? জিন্না বলছেন কম্প্রমাইজ। বলদেও বলছেন সেটলমেণ্ট।" মানস অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

"ব্রিটেনের সঙ্গে সেটলমেণ্ট। লীগের সঙ্গেও তাই। ব্রিটিশ অপসরণ তথা লীগ সহ-অপসরণ একই কালে ঘটবে। তার পরে আর লীগের সঙ্গে কথাবার্তার প্রশ্ন ওঠে না। কথাবার্তা চলবে পাকিস্তানের সঙ্গে। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের নয়। জিন্না সাহেব যদি সাম্প্রদায়িক সেটলমেণ্ট চাইতেন তবে একই নিঃশ্বাসে পাকিস্তান চাইতেন না। তাঁকে বার বার বলা হয়েছিল আগে ইংরেজরা যাক, তার পরে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘরোয়া মিটমাট হবে। তিনি সেকথায় কান দিলেন না। ঘরোয়া সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করলেন। তৃতীয় এক নেশনকে জড়ালেন। এর পর আর ভাইয়ে ভাইয়ে মিটমাট নয়। নেশনে নেশনে যুদ্ধ বা সন্ধি। যুদ্ধে পাকিস্তানের কী লাভ হবে বুঝিনে। সমগ্র বঙ্গ জয় করতে বেরিয়ে পূর্ববঙ্গটাই হারাতে হবে। সমগ্র পাঞ্জাব জয় করতে বেরিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাবটাও হারাতে হবে। তেসরা জুনের এইটুকুই ভালো যে যুদ্ধ দিয়ে হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হবে না। আর সেইজন্যেই তো আমরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থেকে যাচ্ছি।" বঙ্কিমবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

"পাকিস্তানের সঙ্গে মিলনভূমি তা হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ? ইংরেজের সঙ্গে এতকাল ধরে সংগ্রাম করার নীটফল ইংরেজের কোলেই আশ্রয়?" যূথিকা চমৎকৃত।

"কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।" মানসের মন্তব্য।

॥ ষোল ॥

তেসরা জুনের ঘোষণা শুনে সৌম্য এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে। সে যন্ত্রণা একাধারে কায়িক, মানসিক, আত্মিক। এতকাল একসঙ্গে বাস করে মুসলমানরা কি হিন্দুদের কাছ থেকে শুধু দুঃখই পেয়েছে, সুখ একটুও পায়নি, আর হিন্দুরাও কি মুসলমানদের কাছ থেকে কেবল অন্যায়ই পেয়েছে, ন্যায় একটুও পায়নি? তা হলে বিবাহবিচ্ছেদ কেন? এরা কি পরস্পরকে ছেড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে? সেটা একটা মোহ আর মিথ্যা।

সৌম্যর অস্থিরতার খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন মুস্তাফী ছুটে আসেন। পরীক্ষা করে বলেন, "ওটা হয়েছে শক থেকে। আপনি সেরে যাবে। বিশ্রাম করো।"

সৌম্য ঠিক উল্টোটি করে। কলকাতা যায়, সেখানে জুলিদের সঙ্গে একবেলা কাটিয়ে দিল্লীর ট্রেন

ধরে। আগে থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে স্টেশনে আসে সুকুমার ও মিলি। তারা ওকে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ওরা হোটেল ছেড়ে দিয়েছে।

সৌম্যর প্রথম কাজ বাপুকে দর্শন করা। প্রণাম করতেই তিনি বলেন, "আশ্রমের কী সমাচার? পরিবারের কুশল তো?"

সৌম্য সব খবর জানায়। দু'চার কথার পর তিনি বলেন, "বাঙালীরা কি বুঝতে পারছে না কী বিপত্তি তারা ডেকে আনছে? ওরা যদি পার্টিশনে রাজী হয় তো আমি একা কী করতে পারি? আমার কথা আজকাল শোনে কে? আমি একটা ব্যাক নম্বর। যা করবার তা জবাহরলাল আর বল্লভভাই করছেন। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দশা কী হবে বুঝিয়ে বলো।"

সর্দারজীর সঙ্গে সৌম্যর বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। তার আশ্রমের দু'জন ট্রাস্টী গুজরাটী। বল্লভভাই তাঁর সুপরিচিত হাসিমুখে যা বলেন তার মর্ম, "ভাগ না করলে কি ভোগ করা যায়? ত্যাগের দিন গেছে, ভোগের দিন এসেছে। অখণ্ড ভারত নিয়ে আমরা করব কী, যদি দেখি যত্রতত্র দাঙ্গা বাধছে আর অবস্থা চলে যাচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে? নিয়ন্ত্রণের জন্যে আমরা তাকাচ্ছি ইংরেজদের মুখের দিকে আর ইংরেজরা মুসলিম লীগের মুখের দিকে? মুসলিম লীগকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে বনবাসে গেলে কী লাভ হবে, যদি পাকিস্তান অর্জনের জন্যে ওরা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে লোকের উপর গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়? কলকাতায় যা করেছিল। বঙ্গদেশের সর্বাঙ্গে পচন ধরেছিল। যতই দিন যেত পচন আরো বাড়ত। তাই সময় থাকতে একটা অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হলো। এটা পার্টিশন নয়, অ্যাম্পুটেশন। পাঞ্জাবেও তার দরকার। অ্যাম্পুটেশনের সিদ্ধান্ত কি কেউ স্বেচ্ছায় নেয়? কিন্তু সময় থাকতে না নিলে মরণ। বড়লাটের সাহায্যে জিন্নাকে রাজী করানো গেছে। কিন্তু বাপুকে রাজী করানো শক্ত। তিনি চান অ্যাম্পুটেশন নয়, অ্যাবডিকেশন। আর আমরা চাই অ্যাবডিকেশন নয়, অ্যাম্পুটেশন।"

সৌম্য এর পরে যায় পণ্ডিতজীর সন্নিধানে। অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। দেখা পেতে একটু দেরি হয়। জবাহরলাল যা বলেন তার মর্ম, "অখণ্ড না হলেও দেশের নাম তো ইণ্ডিয়াই থাকছে। অতীতের সঙ্গে ব্রেক তো হচ্ছে না। ব্রিটেনের সঙ্গেও না। আমরা চাই কন্টিনিউইটি। ইংরেজরা তাতে রাজী। মুসলিম লীগ যদি রাজী হতো তা হলে পার্টিশনের দরকার হতো না। আর পার্টিশনের দরকার না হলে একই যুক্তিতে প্রদেশ ভাগ করতে হতো না। আমরা কি সাধে রাজী হয়েছি? ইন্টারিম গভর্নমেণ্ট কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। যেন এক ক্যাবিনেট নয়, দুই ক্যাবিনেট। সেখান থেকে না হয় পদত্যাগ করে সরে আসতুম, কিন্তু কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী থেকে তো সরে আসা যেত না। সেখানে বসে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হতো, কিন্তু সে শাসনতন্ত্র কি গ্রহণ করত ভারতের সব ক'টি প্রদেশ? অনিচ্ছুকদের উপর চাপিয়ে দেবার নৈতিক অধিকার কি থাকত আমাদের? ওদের সিসিড করতে দেওয়াই কি উচিত হতো না? আমরা হিন্দু ও শিখপ্রধান অঞ্চলগুলি হাতে রেখে বাকীটা ছেড়ে দিচ্ছি। ওরা একজোট হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করছে। আমরাও নিষ্কণ্টক হয়ে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন গঠন করছি। ব্রিটিশ রাজের আমরাই অব্যবহিত উত্তরাধিকারী। রাজার যেমন যুবরাজ।"

সৌম্য এর পরে যায় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকাশে। পুরাতন সহকর্মীকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কুশলবিনিময়ের পর যা বলেন তার মর্ম, "জুলিয়াস সীজারের স্বভাব জিন্নায় বর্তেছে। সীজার বরং তাঁর নিজের গ্রামে পয়লা নম্বর হতেন, তবু রোমে দোসরা নম্বর নয়। তেমনি, জিন্নাও বরং তাঁর নিজের মাপে তৈরি পাকিস্তানে পয়লা নম্বর হবেন, তবু সারা হিন্দুস্থানে দোসরা নম্বর নয়। বাপু এটা বুঝতেন, তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল জিন্নাকে সারা হিন্দুস্থানের পয়লা নম্বর করা। বাপু কিন্তু বুঝতেন না যে সারা হিন্দুস্থানের ডালে বসে জিন্না সেই ডালটাকেই কাটতেন। পাকিস্তান অর্জনই তাঁর লক্ষ্য। সারা হিন্দুস্থান সংরক্ষণ তাঁর লক্ষ্য নয়। আমরা বোকা বনে যেতুম, যখন দেখতুম তিনি কাটতে কাটতে গোটা

বাংলাদেশ ও গোটা পাঞ্জাব কেটে নিয়েছেন। উপরন্তু গোটা আসাম। আমরা তাঁকে ডাল থেকে নামাতুম কী করে, তাঁর হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তাঁকে থামাতুম কী করে? বাধ্য হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাহায্য নিতে হতো। তাঁর সাহায্যে আমরা জিন্নাকে তাঁর নিজস্ব গ্রাম দিয়েছি। কিন্তু রোম দিইনি। বাপুর নীতি হলো হিন্দু মুসলমানের ঘরোয়া মামলায় ব্রিটিশ মধ্যবর্তিতা পরিহার করা। আমরা কিন্তু ব্রিটিশ মধ্যবর্তিতা প্রয়োজন বোধ করেছি। বাপু তাই নিজেকে শূন্যে পরিণত করেছেন। কী করে তাঁকে বোঝাব যে অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বঙ্গ বা অখণ্ড পাঞ্জাব কোনোটাই হিন্দু মুসলমান একমত না হলে ইতিহাসের ধোপে টিকত না? আমরা গৃহযুদ্ধ পরিহার করেছি। সে যুদ্ধের অহিংস বিকল্প অজানা। দেশ বরং ধ্বংসে হয়ে যাক, তবু হিংসার কাছে নতিস্বীকার কখনোই নয়, এটা হলো হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ঠাণ্ডা মাথা এটা সমর্থন করে না। আমরা হিংসার কাছে নতি স্বীকার করিনি। কিছু দিয়েছি, কিছু পেয়েছি। আমরা ইচ্ছামতো শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারব। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি, ওয়েটেজ প্রভৃতি রদ করার স্বাধীনতা আমাদের হাতে।"

সৌম্য এর পরে তার দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে। তাঁরা যা বলেন তার মর্ম, "হাঁসের জন্যে যে চাটনি হাঁসীর জন্যে সে চাটনি নয়। ইংরেজের জন্যে যে অহিংস রণপদ্ধতি মুসলিম লীগের জন্যে সে অহিংস রণপদ্ধতি নয়। কারাবরণ ইত্যাদিতে কোনো ফল হবার নয়। চাই গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো শত সহস্র শহীদ। চাই বীরের অহিংসা। কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। আমরা দেখি মুসলিম লীগের রণপদ্ধতির অনুসরণ হিন্দুরাও করছে। নরহত্যা, নারীহরণ ইত্যাদির বদলা নিতে গিয়ে আটাশ বছরের তপস্যার ফল বিসর্জন দিচ্ছে। তাই একটা রাজনৈতিক সমাধানে রাজী হতে হলো। এর চেয়ে ভালো বার্গেন আশা করলে ভুল হতো।"

বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ করে সৌম্য। তারা যা বলেন তার মর্ম, "ব্রেককে এত ভয় কিসের? ব্রিটেনের সঙ্গে ব্রেক না হলে কি মার্কিন স্বাধীনতা সম্ভব হতো? অতীতের সঙ্গে ব্রেক না হলে কি রুশ বিপ্লব সম্ভব হতো? নেহরুর নার্ভ ফেল। গান্ধীজীও মিস্টার জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জবাব দিতে অক্ষম। তাই এই বিলি বন্দোবস্ত। বুর্জোয়াতে বুর্জোয়াতে ক্ষমতার হস্তান্তর। জনগণের মাথার উপর দিয়ে। দ্বিতীয় এক কানচোরা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ছাড়া আর কী?"

সৌম্যর মুখে বিবরণ শুনে সুকুমার চিমটি কাটে, "ইংরেজকে ইংরেজ চেনে। নেহরুকে মাউন্টব্যাটেন। আঁচল থেকে গান্ধীজীর প্রিয় পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছেন লর্ড লুইস। লেডী এডউইনারও টান আছে।"

সৌম্য হতভম্ব। তা দেখে মিলি বলে, "একটা মজার কথা শুনবে, দাদা? লেডী এডউইনাকে পুলিশ থেকে নাকি ওয়ার্নিং দিয়েছে যে আমি নাকি একটি ন্যাশনাল বেঙ্গল টাইগ্রেস। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে তাঁর স্বামীকে গুলী করে মারার তালে আছি। কথাটা লর্ড লুইসের কানে যেতে তিনি নাকি বলেন, ওই ইয়াং লেডীর মতো বিউটির হাতে গুলী খেয়ে মরা তো পরম সৌভাগ্য। শুনে আমি তো লজ্জায় মরি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ।"

সৌম্য কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, "হেরে গেলুম, বোন। ইংরেজের কূটনীতির কাছে আমরা হেরে গেলুম। ওদের দমননীতি আমাদের হারাতে পারেনি। কিন্তু ওদের তোষামোদ আমাদের ভুলিয়েছে। বাপুকে তো দেখলুম ওঁদের দু'জনের উপর বেশ খুশি। লেডী পামেলাও তো দেখি প্রার্থনা সভায় যান। গান্ধীভক্তি না ডিপ্লোমেসী কে বলতে পারে?"

"না, না, পামেলা মেয়েটি নিরীহ আর অবলা।" মিলি প্রতিবাদ করে।

সুকুমার খেই হাতে নিয়ে বলে, "এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশনের কথাবার্তা ডিপ্লোম্যাটিক হবে না তো কী হবে? সেটাই তো নিয়ম। মহাত্মাজী মহাখুশি। লর্ড লুইসের সাহায্যে জিন্নাকে চালমাত

করেছেন। জিন্না কি রাজী ছিলেন নাকি? লর্ড লুইস আলটিমেটাম দিয়ে রাজী করিয়েছেন। রাজন্যদেরও তিনি বুঝিয়েছেন যে ব্রিটেন তার সৈন্য অপসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্যারামাউন্টসি প্রত্যাহার করবে। রাজন্যরা এখন থেকে স্বাধীন, কিন্তু পরস্পরের আক্রমণ থেকে বা বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে অথবা পাকিস্তানে যোগ দিলে ভালো হয়। তার মানে ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও রেলওয়ে ইত্যাদি সমর্পণ করতে হবে। রাজন্যরা এক এক করে প্যাটেলের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। অধিকাংশ রাজ্যই তো হিন্দুপ্রধান। মুসলিমপ্রধান রাজ্য আর ক'টাই বা? তবে হায়দরাবাদ আর কাশ্মীরকে নিয়ে মুশকিল। হায়দরাবাদের প্রজা হিন্দু, নিজাম মুসলিম। কাশ্মীরের প্রজা মুসলিম, রাজা হিন্দু। এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

সৌম্যর মুখে একটু হাসি ফোটে। "কূটনীতিতে সর্দারজীও কম যান না। সৈন্যসামন্ত দিয়ে এতগুলো রাজ্য জয় করতে কতকাল লাগত? রাজাদের অনেকের সিপাহী আছে। অপরপক্ষে কংগ্রেস সমর্থিত প্রজামণ্ডলও আছে বেশীর ভাগ রাজ্যে। সেই প্রজামণ্ডলগুলি সর্দারজীর ঘুঁটি। তারা চাইবে নির্বাচিত সরকার। সকলের জন্যে একই শাসনতন্ত্র।"

মিলি খেই হাতে নিয়ে বলে, "লেডী এডউইনার ধারণা নেহরুর মতো স্টেটসম্যান আর হয় না। হবে কী করে? হ্যারোর মতো পাবলিক স্কুলে কি পড়েছে? কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মতো কলেজে? সত্যি, নেহরু হচ্ছেন ম্যান অভ্ দি আওয়ার। আর লেডী এডউইনা তাঁর অ্যাডমায়ারার।"

সুকুমার তির্যক হেসে বলে, "অ্যাডমিরেশনটা একতরফা নয়।"

মিলি ওর বরের এক গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। "চুকলি কাটতে চাও তো প্রকাশ্যে কাটো। গোপনে কেন? কাপুরুষ!"

"চৌধুরী, শুনলে তো? সেই বিপ্লবিনী এখন বিমোহিতা।" সুকুমার নালিশ করে।

সৌম্য ওদের দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনার জন্যে বলে, "ইংরেজরা হলো দোকানদারের জাত। দোকানদার বিস্তর চাটুবাক্য দিয়ে খরিদ্দারকে ভোলায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তলে তলে একজন দোকানদার। ঝুটা মুক্তা সাচ্চা মুক্তা বলে আমাদের নেতাদের গছিয়ে দিয়ে যেতে চাইলে বাপু ছাড়া আর কে চিনতে পারবেন? বেনেকে বেনেই চেনে। খতিয়ে দেখতে হবে সত্যিকার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে। ইংরেজদের কমনওয়েলথের হাতে না ভারতীয়দের ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের হাতে। মাউন্টব্যাটেন নাকি কবুল করিয়ে নিয়েছেন যে কমনওয়েলথে যোগ দেওয়া হবে। এই মরেছে! সর্বস্ব তোমার চাবীটি আমার।" সৌম্য দোকানদারদের বিশ্বাস করে না।

সুকুমার আমতা আমতা করে বলে, "কমনওয়েলথে যোগদান বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। পাকিস্তান কমনওয়েলথে যোগ দিলে আর ভারত না দিলে দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্য হবে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বেধে গেলে ইংরেজরা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকবে। তবে নেতারা কড়ার করিয়ে নিয়েছেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগ দিলেও ভারত সর্বতোভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। সে রাশিয়ায় দূত পাঠাবে, আমেরিকায়ও। তার ফরেন পলিসি ব্রিটিশ পলিসির অনুরূপ না-ও হতে পারে। তবে ব্রিটিশবিরোধী হবে না।"

"কেন হবে না? ব্রিটেন যদি ভারতবিরোধী পলিসি অনুসরণ করে ভারতেরও ব্রিটিশবিরোধী পলিসি অনুসরণের অধিকার থাকবে। তা নইলে তার সোভরেনটি কিসের? এসব বাজিয়ে নেওয়া চাই, সুকুমার। অমন চতুর জাত আর দ্বিতীয় নেই। ওরা বেনে। বেনের সঙ্গে বেনের মতো কারবার করতে পারতেন একমাত্র বেনের ছেলে গান্ধী। ওটা বামুনের ছেলের কাজ নয়। তবে তাঁর সঙ্গে পটিদারের ছেলে আছেন বলেই ভরসা হচ্ছে যে আমরা ঠকে যাইনি। ঠকে গেলে বাপু ইতিমধ্যেই টের পেতেন।" সৌম্য বলে।

"মাফ কোরো, ভাই চৌধুরী। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে। ভিতরের খবর তো তুমি রাখো না। গান্ধীজী গোঁ ধরে বসেছিলেন বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখতে হবে। বাঙালী হিন্দু মুসলমান স্থির করবে অবিভক্ত বঙ্গ কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দেবে। ভারতের ইউনিয়নে না পাকিস্তানে। ওটা যেন একটা দেশীয় রাজ্য আর কী! লর্ড লুইস বাংলাদেশের জন্যে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের একটি ধারা তাঁর প্ল্যানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। জবাহরকে জানতে না দিয়ে। তার পর কী মনে করে সিমলায় নেহরুকে বিশ্বাস করে দেখান। পণ্ডিতজী তো রেগে টং। 'বাংলাদেশ যদি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন হয় তবে হায়দরাবাদ কেন নয়? মৈসুর কেন নয়? ত্রিবাঙ্কুড় কেন নয়? বড়োদা কেন নয়? অন্তত এক ডজন ডোমিনিয়ন হবে। আপনি কি ভারতবর্ষকে বলকান বানাতে এসেছেন? আমরা এ প্ল্যান অগ্রাহ্য করব।' লর্ড লুইস দেখেন মহাবিপদ। তিনি ভি.পি. মেননকে দিয়ে আরেকটা প্ল্যান তৈরি করান। নেহরু অনুমোদন করেন। লর্ড লুইস রাতারাতি বিলেত গিয়ে অ্যাটলীকে দিয়ে সংশোধিত প্ল্যান মঞ্জুর করিয়ে আনেন। মহাত্মা তো বলকানের ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন। এখন বোকা বনে গেছেন। তবে এটাও ঠিক যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান কখনো একমত হতো না। পণ্ডিতজীর বৃথা আতঙ্ক। 'হিন্দু মুসলমান এক হো' বলে চেঁচালেই কি ওরা এক হবে? গান্ধীজী চাইলেও না, লর্ড লুইস চাইলেও না। বঙ্গভঙ্গটা কিন্তু লর্ড লুইসের আইডিয়া নয়। ওঁর আসার আগেই বিলেতে বসে আমি খবর পেয়েছিলুম যে ওটা ওয়েভেলের মাথায় ছিল।"

সৌম্য বিরক্ত হয়ে বলে, "আরো আগে লর্ড কার্জনেরও মাথায় ছিল। হিন্দু মুসলিম সমস্যার ওটা একটা পুরনো সমাধান। লর্ড পেথিক-লরেন্স একটা নতুন কিছুর সন্ধান দিয়েছিলেন। আমরাও আশা করেছিলুম যে ওইরকম কিছু মাথায় নিয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এদেশে পদার্পণ করেছেন। ওমা, সেই মান্ধাতার আমলের সমাধান! ইনি তো কার্জনকেও আউট-কার্জন করলেন। তিনি ভারত ভাগ করেননি। ইনি তাও করলেন। বাপু চেয়েছিলেন আগে ইংরেজ বিদায় হোক, তারপর আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিটমাট করব। মিটমাট দেশ ভাগাভাগির শর্তেও হতে পারত, প্রদেশ ভাগাভাগির শর্তেও হতে পারত, পাকিস্তানও যে হতো না তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটা শর্ত থাকত। সেই মীমাংসাই চূড়ান্ত। মুসলিম লীগ পরে আর কোনো দাবী উত্থাপন করতে পারবে না। দফায় দফায় ঝগড়া ও দফায় দফায় মিটমাট করতে হবে না। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ চিরকালের মতো নিঃশেষ। যেমন ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিবাদ চিরকালের মতো নিঃশেষ। তুমি কি বুঝতে পারছ না, সুকুমার, যে জিন্নার আস্তিনে আরো কয়েকটা তাস লুকনো রয়েছে? সেসব তাস এক এক করে বেরবে। গৃহযুদ্ধ এড়ানো গেছে বলে নিশ্বাস ফেলতে পারো, কিন্তু শেষপর্যন্ত গৃহযুদ্ধ লড়তেই হবে। নয়তো চিরকাল কমনওয়েলথে থাকতে হবে।"

সুকুমার ও মিলি শিউরে ওঠে। ওদের নিজেদের ঝগড়াও নিঃশেষ। সুকুমার বলে, "কিন্তু, নেহরু ও পাটেল বলেছেন এটাই ফাইনাল সেটলমেন্ট। গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে। তবে জিন্না তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এটা একটা কম্প্রমাইজ।"

"তা হলেই বোঝ। কার হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছ? সেসব দিয়ে সে কার সঙ্গে লড়বে? কেন লড়বে? কোথায় থামবে?" সৌম্য হুঁশিয়ারি দেয়।

আরো কয়েকদিন দিল্লীতে থেকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সে বার বার ওই একই কথা শোনে, ভারতভাগ্য বিধাতা এই পাঁচজন যেন অভ্ ডেস্টিনি—নেহরু, পাটেল, জিন্না, বলদেও সিং আর মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধী বাদ। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয়। আহা, কী নিষ্ঠুর রঙ্গ!

কলকাতায় দু'দিন কাটিয়ে জুলিকে সব কথা শুনিয়ে বাচ্চাদের কোলে পিঠে করে সৌম্য আবার

রওনা দেয় পদ্মাপারে। এবার একটু ঘুরে মানসের ও যূথিকার সঙ্গে দেখা করে। অনেকদিন পরে।

"ও কী, সৌম্যদা। তোমার গোঁফ দাড়ি কোথায়। দীপক আর মণি চিনতে পারছে না তুমিই কি ওদের জ্যাঠামশায়।" যূথিকা বলে।

'দীপক তো এখন ইয়াং ম্যান। তবে মণি এখনো ইয়াং লেডী হয়নি। আয় তোরা, আমার কাছে আয়। আমিই তোদের জ্যাঠামশায়। তোদের দুটি ভাই বোন হয়েছে। ওদের ফোটো দেখাব।" সৌম্য সস্নেহে বলে।

"জুলি আর বাচ্চারা কেমন আছে? ওরা কি এখনো কলকাতায়? কবে ওদের আনছ?" যূথিকা জানতে চায়।

"এ প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই দিতে হবে, যূথী। তুমি কি মনে করো ওদের এই ডামাডোলের মধ্যে এপারে আনা উচিত?" সৌম্য চিন্তাকুল।

"বাপু নোয়াখালীতে থাকতে ভয়ের কী আছে?" যূথিকা বলে।

"হাতে নিয়ে লণ্ঠন নোয়াখালী হণ্টন। মানুষের খোঁজ বৃথা, করো দেশ বণ্টন। ছড়াটা কার রচনা, জানো? সোনাদির।" সৌম্য হাসির ভান করে।

তিনজনাতে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়। সৌম্যর কণ্ঠে হতাশার সুর। "এরই জন্যে এতকালের তপস্যা। এত স্বপ্ন। এত ধ্যান।"

মানস সান্ত্বনা দেয়। "অহিংস সংগ্রাম দিয়ে সাম্রাজ্য ভাঙা যায়, কিন্তু নেশন গড়া যায় না। যেখানে বহু ধর্ম, বহু ভাষা সেখানে একপক্ষের ইচ্ছায় এক নেশন হবে কী করে? তার জন্যে অত্যাবশ্যক একটা সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। তেমন একটা শাসনতন্ত্র রচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আমাদের নেতাদের। কিন্তু তার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে আপস করতে কোনো পক্ষই রাজী নন। জবাহরলাল ও বল্লভভাই চান মেজরিটি রুল, জিন্না কিছুতেই সেটা হতে দেবেন না, কারণ মেজরিটি মানে হিন্দু মেজরিটি। জিন্না চান কংগ্রেস লীগ প্যারিটি, কিন্তু কংগ্রেস তাতে কিছুতেই রাজী হবে না। বিকল্পে জিন্না চান পাকিস্তান। কংগ্রেস তাতে রাজী, যদি পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ হাতে পায়, সায় কলকাতা। লোকে বলে, গান্ধীজী তো ইংরেজকে বিদায় করতেই জন্মেছেন, ইংরেজ বিদায় হলেই তাঁর ভূমিকা শেষ। ইংরেজের পরে কে? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। বিরোধ এড়ানোর জন্যে তাঁর আত্মত্যাগী-পরামর্শ। কংগ্রেস মন্ত্রীদের অ্যাবডিকেশন। এবার কিন্তু ইংরেজ অফিসাররা থাকবেন না শাসনভার নিতে। অথচ ইণ্ডিয়ান অফিসাররা তো দ্বিধাবিভক্ত। অতএব দেশ দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য।"

সৌম্য বিষণ্ণভাবে বলে, "গান্ধীজীর ভূমিকা শেষ হয়নি, মানস। তাঁকে অকালে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি তো জানো আমাদের দেশে দশ বারো বছর অন্তর জনগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার আসে। সেই একবার অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তার পরে লবণ সত্যাগ্রহের সময়, তার পরে 'কুইট ইণ্ডিয়া' সংগ্রামের সময়। মাঝামাঝি সময়টা জোয়ারবিহীন। সে সময় গঠনমূলক কর্ম বা পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপ। সেটা জনগণের জোয়ার নয়। তার জন্যে বাপুকে অপেক্ষা করতে হয়। তেমনি একটা অপেক্ষার সময় কংগ্রেস হাই কমাণ্ড পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপের দ্বারা সময়ক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। বাপুর মত নিয়ে। বাপুর দৃঢ়বিশ্বাস ইংরেজ কখনো বিনা শর্তে ভারতত্যাগ করবে না, সে অনির্দিষ্টকাল পায়চারি করবে, ততদিনে আবার জোয়ারের সময় এসে পড়বে। জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে গণসংগ্রামের শেষ তরণী। লক্ষ্য নিঃশর্ত স্বাধীনতা। নিঃশর্ত স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করতুম না তা নয়। পাকিস্তান চাইলে সে পাকিস্তানও পেত। কিন্তু আমাদের হাত থেকে। ইংরেজদের হাত থেকে নয়। এ যা হলো এতে ওরা ইংরেজদের কাছেই

কৃতজ্ঞ। আমাদের কাছে নয়। লীগপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের আসল কারণ ওরা চায় অখণ্ড ভারতে ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। আমরা রাজী হই কী করে? দ্বিগুণ ভারতেরও ওরা চায় ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। আমরা নারাজ। মাউন্টব্যাটেন এর মীমাংসা করেছেন লীগপন্থীদের ব্যালান্স না দিয়ে। পাকিস্তান যে কখনো আমাদের মিত্র হবে তার স্থিরতা নেই। তার স্বাধীনতার অর্থ আমাদের সহযোগী স্বাধীনতা নয়, প্রতিযোগী বা বিরোধী স্বাধীনতা। আর পাঁচটা বছর সবুর করলে এই অনর্থটা হতো না। কিন্তু সময় দিচ্ছে কে? মিটমাট না হলে মাউন্টব্যাটেন কলকাল বানিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। আর ওদিকে জিন্নাও জেহাদের জন্যে তরোয়ালে শান দিচ্ছেন। জনগণ দাঙ্গার দ্বারা বিভ্রান্ত। বাপু আগুন নেবাতেই ব্যস্ত। তাঁর কাছে সেটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ। কংগ্রেস নেতারা চান একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত। তাই মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে তাঁরা বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করিয়ে নিলেন। অমন একজন নিরপেক্ষ বড়লাট এর আগে আসেননি। তিনি তো বলেন তিনি ভারতভাগ করতেই চাননি। জিন্না হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে কিছুতেই ভোলানো যায় না বা টলানো যায় না। তাঁকে উপেক্ষা করাও ব্রিটিশ পলিসি নয়। কৈকেয়ীর কাছে দশরথের ওয়াদা।"

"বোঝা গেল মুসলিম 'মাস' হচ্ছে মেষ। ওই জিন্নাই মেষপালক। এত বড়ো একটা সম্প্রদায় গড্ডলিকার মতো অন্ধভাবে একজনের দ্বারা চালিত। জেহাদেও উদ্যত। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ইতি নেহরু।" মানস মন্তব্য করে।

সৌম্য সেদিনটা থেকে যায়। অর্ধেক রাত অবধি কথাবার্তা গড়ায়। মানস জানায় তার বহুদিনের বাসনা সে ইংরেজীতে একখানা বই লিখবে, নাম রাখবে 'দি আনরিয়ালিস্টস'। যারা পার্টিশন চায় তারা আনরিয়ালিস্ট। নদনদী কখনো ভাগ হতে পারে না। পাহাড় পর্বত কখনো ভাগ হতে পারে না। কোথাও একটা প্রাকৃতিক সীমান্তরেখা নেই। যেখানেই লাইন টানবে সেটা শুধু কাগজের উপরেই হবে। কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে দেখবে দেওয়া যায় না।

মানস দুঃখ করে। "যেটা আনরিয়াল সেটাই হলো রিয়াল। হিন্দু শিখরাও চায় পার্টিশন। আমিই হলুম আনরিয়ালিস্ট। সৌম্যদা, তোমার কী মনে হয়? এই যে পার্টিশন এটা কি ইনেভিটেবল নয়?"

"অহিংসাবাদীর কাছে কিছুই ইনেভিটেবল নয়। যুদ্ধবিগ্রহও নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামাও নয়, পার্টিশনও নয়। তুমি যদি আমার গালে চড় মারো আমি তোমার গালে চড় না-ও মারতে পারি। তুমি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করো আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া নাও করতে পারি। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা করো আমি তোমাকে ঘৃণা না-ও করতে পারি। তুমি যদি আমাকে শত্রু ভাবো আমি তোমাকে শত্রু না-ও ভাবতে পারি। সব সময়েই আর একটা অপশন রয়েছে। সেটা একই মুদ্রায় শোধ না দেওয়ার। তোমার মুদ্রা আমার মুদ্রা নয়। আমার মুদ্রা ত্যাগের, তপস্যার, প্রেমের, মৈত্রীর। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য এঁরা তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমরা তাঁদের দুর্বল উত্তরপুরুষ। দুর্বল বলেই আমরা অহিংসাকে পরিণত করেছি দুর্বলের অহিংসায়। বীরের অহিংসা গান্ধীজীর মতো অল্প কয়েকজনের মধ্যেই নিবদ্ধ। দোষটা অহিংসার নয়, দোষটা আমার মতো দুর্বল মানুষের। তবে যতই দুর্বল হই না কেন আমার চেয়ে যে দুর্বল তার গায়ে আমি হাত দেব না। তার জাতিরা যদি অন্যায় করে তবে সে অন্যায়ের শোধ আমি তার উপর তুলব না। নিরীহ মানুষের উপর বদলা নেওয়া অধর্ম। যে-কোনো ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। আমরা বীর হতে না পারি গুণ্ডা হব কেন? আজকের দিনে গুণ্ডারাই হয়েছে বীর। আর বীরদের দেখা নেই। এমন এক লজ্জাকর অধ্যায় আমাদের ইতিহাসে খুঁজে পাইনি। আমার প্রাচ্য, আমার প্রাচীন, আমাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ এসব উক্তি এখন আত্মপ্রতারণা। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে, মানস। আমি জানি এই পার্টিশন ইনেভিটেবল নয়, কিন্তু এটাও জানি যে হিংসা প্রতিরোধের শক্তি আমাদের কারোই নেই, বাপুই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁকে আমরা মরতে দিতে পারিনে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু হিন্দু মুসলমানকে বাঁচানোর জন্যে তাঁর বেঁচে

থাকা দরকার। ব্রিটিশ বেয়োনেট তাদের বাঁচাতে পারবে না, ইন্ডিয়ান বেয়োনেট তাদের বাঁচাতে পারবে না, বাঁচাতে পারবে একমাত্র বাপুর আত্মিক শক্তি। সোল ফোর্স। বাপু তো যে-কোনো দিন মরতে প্রস্তুত। মরণকুণ্ঠ তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। কিন্তু যতদিন একজনও সংখ্যালঘু হিন্দু বা মুসলমান তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে ততদিন তাঁকে বাঁচাতে হবে।" সৌম্য মানসকে যত্ন করে বোঝায়। যূথিকা ততক্ষণে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুতে গেছে।

"যাক, তুমি পিতৃভক্তি কাসাবিয়াঙ্কা হতে তৈরি হচ্ছ না তো, যদি তাঁর হঠাৎ কিছু একটা হয়? ভগবান না করুন।" মানস জিব কাটে।

"তার আগে আমরা তাঁর পুত্ররা চেষ্টা করব আগুন যাতে না লাগে। বাংলাদেশের পাটাতনে।" সৌম্য আর কী করতে পারে?

দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপ গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছয়। মানস বলে, "সৌম্যদা, এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। সত্যের স্থান অহিংসারও পূর্বে। ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। সত্যটা এই মুহূর্তে কী? সত্যটা কি এই যে হিন্দু মুসলিম সমস্যার মূলে তৃতীয় পক্ষের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি? এয়ো যায়, আগে কহ আর। সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে ইসলাম প্রবর্তনের পর কেবলমাত্র ভারতে নয়, ঈজিপ্টে, সীরিয়ায়, মেসোপোটেমিয়ায়, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়। ইসলাম যে দেশেই গেছে সে দেশের মানুষ নতুন ধর্মকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধর্মকে বর্জন করেছে। পুরাতন ইতিহাসকে অস্বীকার করেছে। পুরাতন ঐতিহ্যকে বাতিল করেছে। আরবী ভাষায় নামকরণের ফলে নিজেদের আরব বা আরবতর মনে করেছে। আরবদের পূর্বপুরুষরাই তাদের পূর্বপুরুষ, ভারতীয়দের বা ইরানীদের বা ঈজিপসিয়ানদের পূর্বপুরুষরা তাদের পূর্বপুরুষ নয়। অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করেছে যারা তাদের নাম হয়েছে হিন্দু বা পার্শী বা কপ্ট। তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী বা পলাতক। হাজার বছর পরে দেখা যাচ্ছে ইসলাম ভারতের সমস্তটাকে বা সবাইকে ইসলামাইজ করতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ ও অধিকাংশ অঞ্চল ভারতীয় রয়ে গেছে। অপর পক্ষে ভারতও বহিরাগত গ্রীকদের মতো, বহিরাগত শক হূণ কুষাণদের মতো, বহিরাগত আরব, তুর্ক, মোগলদের ইন্ডিয়ানাইজ করতে পারেনি। ভারতের আত্মীকরণের শক্তিও ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক, মোগলদের বেলা নিস্তেজ হয়েছে। ফলে ওরা ভারতীয় হয়নি। তাই এখন পাকিস্তানী হচ্ছে।"

সৌম্য নীরবে শুনে যায়। মানস বলে যায়, "এখানে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ভারতীয় হওয়া আর হিন্দু হওয়া এক নয়। হিন্দু না হয়েও পার্শীরা ভারতীয় হয়েছে। কেউ তাদের হিন্দু হতে বলেনি, তারাও তাদের স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বর্জন করেনি। যে হিন্দু সে ভারতীয় হতে পারে, কিন্তু যে ভারতীয় সে হিন্দু না-ও হতে পারে। মুশকিলটা এইখানে যে ইন্ডিয়ান আইডিয়া সফল হলে ইসলামিক আইডিয়া সফল হয় না। তেমনি, ইসলামিক আইডিয়া সফল হলে ইন্ডিয়ান আইডিয়া সফল হয় না। ইন্ডিয়ান বনাম ইসলামিক এই দুই আইডিয়া দুটি স্রোতের মতো মিশে যায়নি। যে যার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সহ-অবস্থান করে এসেছে। সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদেই এল স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী। সেই একই তাগিদে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ইংরেজদের হাত ছিল এটা যেমন সত্য ওটাও তেমনি সত্য যে প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলিম নেতাদেরও আগ্রহ ছিল। ইংরেজরা চলে গেলেও প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলিম নেতারা থেকে যান। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌথ নির্বাচন বা যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা চলে না। ইন্ডিয়া বনাম ইসলাম এই দুই শক্তির সংঘর্ষ রোধ করার অন্য কোনো উপায় ছিল না বলেই ভারতভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ, পাঞ্জাবভঙ্গ। মাঝখানে লৌহ প্রাচীর।"

"তুমি কি বলতে চাও ভাঙা দেশ আর কখনো জোড়া লাগবে না? ভাঙা প্রদেশও আর কখনো জুড়ে যাবে না?" সৌম্য আহত স্বরে সুধায়।

"উভয় রাষ্ট্র যদি সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ না হয় তা হলে এটাই হচ্ছে ফাইনাল তথা পারমানেন্ট সেটলমেন্ট। তবে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধেও একই কথা। প্রেমও কাজ করছে, কেবল ঘৃণা নয়।" মানস ভরসা দেয়। অন্ধকার রাত্রে আকাশভরা তারার দিকে তাকায়।

।। সতেরো ।।

সেদিন মাঝরাতে শুতে যাবার আগে সৌম্য বলে, "আমার আশা ছিল অহিংস ভারত হবে অখণ্ড ভারত। ভারত অহিংস থাকেনি, তাই খণ্ডিত হয়েছে। তবু সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের জনগণ অহিংস। এখন বলো পাকিস্তান সম্বন্ধে তোমার কী গণনা? পাকিস্তানের বাঙালীরা কি আবার ভারতীয় হবে?"

"হিন্দুরা হতে চাইবে। মুসলমানরা হতে চাইবে না। ওদের বিবর্তন অন্য ধারা ধরবে। বিবর্তন সূত্রে ওরা বাঙালী হতে পারে। কিন্তু ফের ভারতীয় হবে না। মাইনরিটি হতে তারা নারাজ। ভারত ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক দেশ নয়। তার ভিত্তি ঐতিহাসিক পরম্পরা। যে পরম্পরায় ছেদ কোনোদিন পড়েনি। পড়বেও না। বিচ্ছিন্ন হলে বাঙালী মুসলমান তার সঙ্গে খাপ খাবে কী করে? জোড় মেলাবে কী করে? পরম্পরাভঙ্গের পর খেই হারিয়ে যাবে। খেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙালী হিন্দুও অভারতীয় হতে রাজী হবে না। বাঙালী মুসলমান যদি ভারতীয় হতে নারাজ হয় তো এই বিচ্ছেদই চূড়ান্ত ও চিরন্তন। তবে পরিপূরণের আশা আছে।" মানস সাঙ্গ করে।

"সৌম্যদা", পরের দিন ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করতে করতে যূথিকা বলে, "যে ব্যক্তি নিজের একমাত্র কন্যাকে ত্যাজ্যকন্যা করতে পারে সে কি মানুষ না মনস্টার? পাকিস্তান হতে যাচ্ছে সেই মনস্টারের মুলুক, মনস্টারিস্তান। সময় থাকতে সব হিন্দুকেই, অন্তত সব বর্ণ হিন্দুকেই, মানে মানে অপসরণ করতে হবে। যারা পড়ে থাকবে তারা দফায় দফায় মুসলমান হবে। কী করবে? প্রাণ বড়ো না ধর্ম বড়ো?"

সৌম্য বুঝতে পারে ওটা যূথিকার নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মিলে যায়। সেও তো ত্যাজ্যকন্যা। বলে, "জিন্না সাহেব যাঁকে বিয়ে করেছিলেন সেই রতনপ্রিয়া পেতিতও ত্যাজ্যকন্যা হয়েছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস রতনপ্রিয়ার কন্যা দীনাকেও ত্যাজ্যকন্যা হতে হলো। ট্র্যাজেডীর পর ট্র্যাজেডী। জিন্না সাহেবের জীবনটাও কম ট্র্যাজিক নয়। পত্নীহারা হয়ে তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজেন। লোকে যেমন আফিমের মধ্যে। লেনিন বলতেন ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। আমি হলে বলতুম, ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু, বোন, মনস্টার কেন তাঁকে বলব? পাকিস্তানও মনস্টারিস্তান নয়। সেখান থেকে হিন্দুদের গণ অপসরণ হবে গণ পলায়ন। আমরা কি গণ পলায়ন সমর্থন করতে পারি? বাপুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথাও হয়েছে আমার। তিনি নোয়াখালী ফিরে আসছেন গণ পলায়ন রোধ করতে। পাকিস্তানই বলো আর মনস্টারিস্তানই বলো, দেশটা তো পূর্ববঙ্গ। শিকড় তো সেইখানকার মাটিতে। শিকড়শুদ্ধ টেনে তুললে আর কোথাও কি শিকড় লাগানো সম্ভব হবে? এটাই একটা মনস্ট্রাস রেমিডি। রোগের চেয়ে দাওয়াই ভয়ঙ্কর।"

যূথিকা মনে মনে চটে যায়। বলে, "নোয়াখালী হবে বাপুর জীবনের ওয়াটারলু। সেখানে তাঁর না যাওয়াই শ্রেয়।"

"সেকথা বললে তিনি জেদ করে যাবেনই। আমরাও বুঝতে পারছি যে বর্তমান অবস্থায় নোয়াখালী গিয়ে বিশেষ কোনো ফল হবে না। যারা পালাবার তারা পালাবেই। যদি না মুসলিম নেতাদের শুভবুদ্ধি

জাগ্রত হয়। হতে পারে, যদি কলকাতা শান্ত হয়। নোয়াখালী নির্ভর করছে কলকাতার উপরে। আর কলকাতা নির্ভর করছে সেখানকার হিন্দুদের শুভবুদ্ধির উপরে।" সৌম্য বিশ্বাস করে।

"জ্যাঠামশায়, আমার জন্যে তুমি কী এনেছ?" মণি মনে করিয়ে দেয়।

"ঐ যাঃ! ভুলে গেছি। তোদের জন্যে এনেছি দিল্লীকা লাড্ডু। যা দেশবাসী এখন খুশি হয়ে খাচ্ছে। পরে পশতাবে।" সৌম্য তার ঝোলা উজাড় করে এই বলে বিদায় নেয়।

ভারত ভেঙে পাকিস্তান হতে যাচ্ছে বলে মুসলমানরা খুশি, হিন্দুরা অখুশি। বাংলাদেশ ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ হতে যাচ্ছে বলে হিন্দুরা খুশি, মুসলমানরা অখুশি। যেখানে হাসি বা কান্না এক নয়, সেখানে পরিবার বা নেশন এক নয়। এখন থেকেই তার লক্ষণ স্পষ্ট। আরো স্পষ্ট হবে আরো দু'মাস পরে পনেরোই আগস্ট।

"লক্ষ করেছ কি না, জানিনে, আগস্ট মাসের নয়ই তারিখে কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব পাশ আর পনেরোই তারিখে সত্যি সত্যি ভারত ত্যাগ। মাঝখানে পাঁচবছর ব্যবধান। তেমনি আগস্ট মাসের ষোলই তারিখে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা আর পনেরোই তারিখে সত্যি সত্যি পাকিস্তান লাভ। মাঝখানে এক বছর ব্যবধান। আগস্ট মাসটার কী মহিমা। স্বাধীনতার সঙ্গে আসছে পার্টিশন, যেন আলোর সঙ্গে ছায়া।" মানস বলে যূথিকাকে।

"যত হাসি তত কান্না বলে গেছেন রাম শর্মা।" যূথিকার মন্তব্য।

"কান্নার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু হাসির জন্যে নয়। জানিনে পনেরোই আগস্ট কোন্‌খানে থাকব। যেখানেই থাকি হিন্দুর দুঃখ বা মুসলমানের দুঃখ দেখতে হবে। সে দুঃখ মোচন করতে পারব কি না জানিনে। হিন্দু অফিসাররা সবাই যদি ওপারে চলে যান এপারে আমি একা থেকে ক'জন হিন্দুকে রক্ষা করতে পারব? তেমনি, মুসলিম অফিসাররা সবাই যদি এপারে চলে আসেন ওপারে আমি একা থেকে ক'জন মুসলমানকে অভয় দিতে পারব? পেছনে সরকার থাকা চাই। সরকার যদি সরষে হয় ও তার ভিতরেই যদি ভূত থাকে তবে নিজে বাঁচব কি না সন্দেহ। আমার পদত্যাগই শ্রেয়, কিন্তু তা হলে সেটা হবে সেইসব নিরীহ মানুষকে ত্যাগ যারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তা ওরা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। সেটা হবে একপ্রকার বিট্রেয়াল। কারণ বিচারক হিসাবে আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমি তার ঊর্ধ্বে।" মানস উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

"হ্যাঁ, তোমার সামনে বিবেকের সঙ্কট।" যূথিকা সহমর্মী।

মানসের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করতে আসেন। পার্টিশনের প্রসঙ্গ ওঠে। সাবজজ হরনাথ কাঞ্জিলাল দুর্বল গোবেচারি মানুষ। কেউ কখনো তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখেনি। তিনিই আগুন হয়ে বলেন, "আমাদের সেই সোনার চাঁদ ছেলেরা আজ গেল কোথায়? গান্ধীকে কেউ গুলী করতে পারে না?"

মানস শক পেয়ে বলে, "সে কী, সাবজজ সাহেব। আপনি কি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের কথা বলছেন? ওরা কেন গান্ধীজীকে গুলী করে মারবে?"

"উনি কেন বাঙালী হিন্দুকে বাঁচতে দিচ্ছেন না? বাঙালী হিন্দু কেমন করে বাঁচবে, বাংলাদেশ যদি পার্টিশন না হয়, পশ্চিমবঙ্গ যদি হিন্দুর ঘাঁটি না হয়? সংযুক্ত বঙ্গ একটা বর্ণচোরা পাকিস্তান।" সাবজজ রায় দেন।

"প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীরা তো তাঁকে দোষ দিচ্ছে, কেন তিনি পার্টিশন সমর্থন করছেন। ভারতের পার্টিশন।" মানস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"তার মানে তিনি পাকিস্তান সমর্থন করছেন। সেই খেলাফত আন্দোলনের মতো। তিনি মুসলমানের মিতা। হিন্দুর দুশমন। কেউ তাঁকে মারে না কেন?" সাবজজ বিস্মিত।

একদিন আফগান সাহেব আসেন কর্ম উপলক্ষে মানসের চেম্বারে। কাজ সারা হলে বলেন, "এ কী হলো, সার? এমন তো কথা ছিল না। সেবার সেটলড ফ্যাক্টকে আনসেটল করতে গিয়ে জেলে গেলেন যাঁরা, দ্বীপান্তরে গেলেন যাঁরা, ফাঁসী গেলেন যাঁরা এবার তাঁরা বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনরাই কিনা তাকে রিসেটল করলেন! আবার বঙ্গভঙ্গ! এখন একে আনসেটল করবে কারা?"

মানস সকৌতুকে উত্তর দেয়, "কেন? আপনারা? আপনারা আওয়াজ তুলতে পারেন, পার্টিশন রদ হোক, বাংলার পার্টিশন, ভারতের পার্টিশন।"

"ভারতের পার্টিশন রদ হলে তো পাকিস্তান থাকবে না, সার। আমরা যে পাকিস্তানও চাই, বাংলাদেশও চাই।" আফগান সাহেব খোলসা করেন।

"সেইখানেই তো গোল। বাংলাদেশ বলতে বোঝায় বাঙালীদের দেশ। আর বাঙালী বলতে বোঝায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, সবাই। অপর পক্ষে পাকিস্তান বলতে বোঝায় মুসলমানদের স্থান, আর মুসলমান বলতে বোঝায় বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বিহারী মুসলমান, সবাই। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের সামিল হয় বাঙালী হিন্দুকে দেশত্যাগ করতে হবে। তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসবে নানা প্রদেশের অবাঙালী মুসলমান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন হবে উর্দূভাষী, গুজরাটীভাষী, পাঞ্জাবীভাষী। তারা বাংলার ধার ধারবে না, উর্দূ চাপিয়ে দেবে। আমরা দেখি আপনারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সেলফ-ডিটারমিনেশন মানুষের জন্মগত অধিকার। আপনাদের বাধা দেওয়া নিষ্ফল। সংখ্যায়ও আপনারাই বেশী। আমরা তা হলে করি কী? দেশত্যাগ না দেশভাগ? দুটোই মন্দ। বেছে নিতে হলে দেশভাগই কম মন্দ।" মানস মনে করে।

"ওটা হলো অভিমানের কথা। রাগের কথা। আপনারাও বাঙালী, আমরাও বাঙালী। বাঙালী বাঙালীকে খেদিয়ে দিতে পারে? আমরা কি আসামী যে বঙ্গালখেদা করব? আর ওই বেটা বিহারীদের চায় কে? হলোই বা মুসলমান। ওরা শুনছি এর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। পাঁচ লাখ না কত। আপনারা রজ্জুতে সর্পভ্রম করছেন। আমরা সর্প নই। সর্প হচ্ছে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, খোট্টা। ওরাই পশ্চিমবঙ্গে গেড়ে বসবে।" আফগান সাহেব হুঁশিয়ারি দেন।

"কিন্তু আগা সাহেব," মানস সসম্মানে বলে, "বাঙালী নেশনের জন্যে বাংলাদেশ আর মুসলিম নেশনের জন্যে পাকিস্তান এ দুটোর ভিতরেই যে গরমিল। কোন্‌টার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন? ঝগড়াঝাটি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, নারীহরণ ইত্যাদি তো লেগেই থাকবে।"

আফগান সাহেব হেসে ফেলেন। "ওঃ! এই কথা! বার লাইব্রেরীর ইয়ারদের আমি বলি, আরে বাবা, আমরা যদি তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে থাকি তোমরাও আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাও না কেন?"

মানস হাসি চাপতে পারে না। "শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়েছেন? শ্রীকান্তর কাবুলী সহযাত্রীরা রসগোল্লার হাঁড়ি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় রেখে যায় কাবুলী রুটি। আপনি দেখছি সত্যি একজন কাবুলী। বিশুদ্ধ আফগান।"

প্রথমটা পুলকিত হলেও এর মর্ম অনুধাবন করে আফগান সাহেব ক্ষুণ্ণ হন। "একটা কথা বলে যাই, সার। মনে রাখবেন। অন্তর্বিবাহ বিনা এক নেশন হয় না।"

"আমিও একটা কথা বলি, আগা সাহেব। মনে রাখবেন। অন্তর্হরণ অন্তর্বিবাহ নয়। এটা শুভ, ওটা অশুভ। পার্টিশনের ওটাও একটা নিমিত্ত।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

আর একদিন শ্রদ্ধা জানাতে আসেন মুনসেফ আবুল কাসেম চৌধুরী। বলেন, "আমাদেরও কিছু জমিদারি আছে। জমিদারি কর্মচারীরা কিন্তু সকলেই হিন্দু। কেন, জানেন?" মুচকি হেসে বলেন, "হিন্দুরা

খায়, কিন্তু মালিকের জন্যে রেখে খায়। আর মুসলমানরা খায় লুটে পুটে।"

মানস আশ্চর্য হয়। "তা তো জানতুম না। মুসলিম জমিদারের হিন্দু ম্যানেজার দেখেছি। তেমনি হিন্দু জমিদারের মুসলিম বরকন্দাজ।"

"সেইভাবেই মুসলিম আমলে একটা ডিভিসন অভ্ লেবার হয়েছিল। দেওয়ানি বিভাগটা ছিল হিন্দুদের হাতে। তারাই খাজনা আদায় করত, হিসাব রাখত। ফৌজদারি বিভাগটা ছিল মুসলমানদের হাতে। তারাই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করত, বিদেশীর সঙ্গে লড়ত। মুসলিম আমল যাকে বলা হয় আসলে সেটা হিন্দু মুসলমান উভয়ের এজমালী আমল। নইলে কি তা পাঁচশো বছর টিকত? বলা বাহুল্য, সৈন্যদলেও হিন্দু নেওয়া হতো, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও মুসলমান। ব্রিটিশ আমলে একটা বিপর্যয় ঘটে যায়। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা তাদের ভাগটা বাড়িয়ে নেয়। মুসলমানরা ইংরেজের উপর রাগ করে ইংরেজী শিক্ষাকেও বয়কট করে। পরে যখন হঁশ হয় তখন দেখে হিন্দু খরগোশ এত দূর এগিয়ে রয়েছে যে প্রতিযোগিতায় মুসলিম কচ্ছপের জেতার আশা নেই। একমাত্র ভরসা সেপারেট কোটা, নমিনেশন ইত্যাদি। সেইসূত্রে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মনোমালিন্য। ঝগড়া। দাঙ্গা। পার্টিশন। পাকিস্তান। হিন্দু অফিসাররা শুনছি সদলবলে পাকিস্তান পরিত্যাগ করবেন। সেটা কি ঠিক হবে? ভবিষ্যতে মেলামেশার সুযোগ কোথায়? মিলনের সেতু কোথায়?"

মানস এর উত্তর দিতে পারে না। জাহাজডুবির সময় ইঁদুররাই সকলের আগে পালায়। চাকুরে হিন্দুর অবস্থাটা ইঁদুরের মতো। মাথার উপরে ইংরেজ থাকতে যারা দাপটের সঙ্গে শাসন করেছে, বিচার করেছে, ধরপাকড় করেছে, খাজনা আদায় করেছে মাথার উপর থেকে ইংরেজ নেমে গেলে তাদের দাপটও ধূলিসাৎ। হিন্দু অফিসার যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসেন তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই কুইট করতে উদ্‌গ্রীব। নয়তো মানসম্মান থাকবে না। মানস নিজেও তাঁদের একজন। সে মনে মনে স্থির করে রেখেছে যে পাকিস্তানী নিশানকে স্যালিউট করবে না।

একদিন অভ্যাগত হন পুলিশ সাহেব ফজলে রাব্বি। তাঁর সঙ্গেও এই নিয়ে কথাবার্তা। তিনি বলেন, "আপনারা দেশকে ভালোবেসেছেন, কিন্তু দেশের মানুষকে ভালোবাসেননি। সেই অভিমান থেকেই পাকিস্তান। আপনাদের ধারণা বাঙালী বলতে বোঝায় কেবল বাঙালী হিন্দু। বাঙালী মুসলমান বাঙালী নয়। সে শুধু মুসলমান। প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ধারণাও তার অনুরূপ। আপনারাই বাঙালী, আমরা শুধু মুসলমান। দেশ ভাগ হবার আগে থেকেই মানুষ ভাগ হয়ে রয়েছে। মানুষ ভাগ হয়ে রয়েছে বলেই দেশ ভাগ সম্ভব হচ্ছে। খুব যে কেউ কাতর তা মুখ দেখে মনে হয় না। কিন্তু তলে তলে সকলেই দুঃখিত। যেমন আপনারা তেমনি আমরাও। যাক, আমাকে অপশন দিলে আমি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নকেই পছন্দ করব। কারণ পাঞ্জাবী আর হিন্দুস্থানী মুসলমানরাই পূর্ব পাকিস্তানের হর্তা কর্তা হবে, আর আমাকে হয়তো অন্য কোনো প্রদেশে পাঠাবে। ধর্মের চেয়ে ভাষার টানটাও কম প্রবল নয়। আমি বাংলাদেশেই থাকতে চাই, তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যদি সত্যিকার সেক্যুলার স্টেট হয় তবে মুসলমান বলে আমার প্রমোশন আটকাবে না।"

মানস তাকে আশ্বাস দেয় যে কংগ্রেস সরকার কখনো ধর্ম নিয়ে বাছবিচার করবে না। কংগ্রেসে বহু মুসলমান আছেন। তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব।

"কিন্তু কী দরকার? বাঙালী হিন্দু অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি তাঁরা কেউ পাকিস্তানে চাকরি করতে রাজী নন। তাঁদের খালি পদগুলো আপনারা বাঙালী মুসলমানরাই তো পাবেন। আপনাদের না দিয়ে অবাঙালীদের দিলে তার প্রতিফল একদিন পেতে হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যথাকালের পূর্বে ডি. আই. জি. হবেন।" মানস স্তোক দেয়।

তিনি মাথা নাড়েন। "আপনি বুঝতে পারছেন না, পাকিস্তান দুই নয়, এক। অন্তত উচ্চতর

পদগুলোর বেলা। আমাকে যে-কোনোদিন কোয়েটার বা ডেরা গাজীখানে বদলী করে দিতে পারে। সেখানে আমি মাছভাত খেতে পাব না, বাংলায় কথা কইবার লোক পাব না। বাংলা গান শুনতে পাব না। সবচেয়ে কষ্ট হবে আমার ওয়াইফের, যদি আমি বিয়ে করি।"

"ওমা, সে কী?" যূথিকা বলে, "আপনি এখনো বিয়ে করেননি? চারটির একটিও নেই? আপনি কী রকম মুসলমান?"

রাব্বি হেসে বলেন, "তার জন্যে খোঁটা খেতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। আমি যাঁর সঙ্গে এনগেজড তিনি কলকাতার মেয়ে, ধর্মে খ্রীস্টান। স্কুলমিস্ট্রেস। তিনি আমার জন্যে কলকাতা ছাড়বেন না, আমাকেই কলকাতায় পোস্টিং জোগাড় করতে হবে। সেটা হতেও যাচ্ছিল। এমন সময় রসভঙ্গ করল বঙ্গভঙ্গ। বাঙালী হিন্দুর যে এমন কূটবুদ্ধি তা আমি কেমন করে জানব? আমার ধারণা ছিল সমগ্র বাংলাদেশই পাকিস্তানের সামিল হবে। ইংরেজরাও কম কুটিল নয়। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ওদের জন্যে আমরা মুসলমানরা কী না করেছি? কত হিন্দুকে ধরপাকড় করে জেলে পুরেছি। পাকিস্তানে থাকলে ওরা শোধ নিতে পারবে না, সেইজন্যেই তো চেয়েছিলুম পাকিস্তান। পেলুম পাকিস্তান, কিন্তু পোকায় কাটা, বিকলাঙ্গ। না আছে কয়লা, না লোহা, না পেট্রল। কী এর ভবিষ্যৎ। সাতদিনের বিস্ময়। আর ওদিকে দেখুন ইণ্ডিয়া। কী নেই সেখানে? আর পশ্চিমবঙ্গ? কলকাতা একটি সোনার খনি। হিন্দুরাই সমস্তটা ভোগ করবে। তা করুক। ওরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। ত্যাগের পুণ্যে ভোগ। আমি ওদের ঈর্ষা করিনে, দিদি। তবে আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে।"

"বলুন, কী জিজ্ঞাসা।" যূথিকা সহানুভূতিতে গলে যায়।

"হিন্দুরা বলে ওরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি। বিজ্ঞতমও বটে। এই কি তাদের বিজ্ঞতার নিদর্শন? দেশভাগ, প্রদেশভাগ। বরাবরের মতো।" রাব্বি সুধান।

মানসই উত্তর দেয়। "গরডিয়ান নট কাকে বলে জানেন তো? যে গিঁট হাত দিয়ে খুলতে পারা যায় না। যাকে এক কোপে কাটতে হয়। হিন্দু মুসলিম সমস্যা তেমনি একটি গরডিয়ান নট। তাই দেশের ও প্রদেশের মানচিত্রটাকে কাঁচি দিয়ে কচ করে কাটতে হলো। এটা যদি সমাধান হয়ে থাকে তবে এর মুখ্য কৃতিত্ব কায়দে আজম জিন্নার, গৌণ কৃতিত্ব কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের। বড়লাটের কী দোষ? তিনি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কাঁচি না চালাতে। বিজ্ঞ মানুষ গান্ধীজী এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু দাঙ্গা থামাতে না পারলে তাঁর কথার কী দাম? আর বড়লাটেরই বা কী ক্ষমতা? প্রয়োজন ছিল একটা রাজনৈতিক মীমাংসার। সেটা নিখুঁত না হলেও অধিকাংশ হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমানের সম্মতি পেয়েছে। বরাবরের মতো কি না ভাবীকাল জানে।"

রাব্বি ওঠেন। বলেন, "আশ্চর্য হবেন না যদি দেখেন আমিও কলকাতায় পোস্টেড হয়েছি। পাকিস্তানী নাগরিকরূপে নয়, ভারতীয় নাগরিকরূপে। সেটাই আমার অপশন। বাকীটা তদ্বির। আমার নয়, আমার ফিয়াসীর।"

অধ্যাপক শরফুদ্দীনকে মানস কট্টর মুসলমান বলেই জানত। তা হলেও তিনি ছিলেন তার বহুদিনের সাহিত্যিক বন্ধু। বাংলাসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। কাছাকাছি অন্য এক জেলায় তাঁর চাকরি। একদিন ছুটি নিয়ে মানসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলেন, " কে জানত যে পাকিস্তান হলে আপনারা বাঙালী হিন্দুরা সবাই আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? তাই এলুম বিদায় দিতে ও নিতে।"

দু'চার কথার পর তিনি বিমর্ষভাবে বলেন, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা সেকালে ছিল ধর্মীয় বিরোধ। একালে কিন্তু তা নয়। একালের বিরোধটা জমিদারে আর প্রজায়, মহাজনে আর খাতকে, পলিটিসিয়ানে আর পলিটিসিয়ানে, চাকুরেতে আর চাকুরেতে। এটা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা।

জমিদারি যদি উঠে যায়, মহাজনী যদি বন্ধ হয়, পলিটিসিয়ানরা যদি যে যার এলাকায় মন্ত্রিত্ব করেন, চাকুরেতে চাকুরেতে যদি প্রতিযোগিতা না হয় তবে এ বিরোধ ক্রমশই এর সার্থকতা হারাবে। তখন দেখবেন হিন্দুতে হিন্দুতে বিরোধ, মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ। আমার ছাত্রের কাছে আমি একজন বুর্জোয়া, আপনার পিয়নের কাছে আপনিও একজন বুর্জোয়া।"

মানস বলে, "ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়? ইতিহাস তো একঠাঁই পায়চারি করতে পারে না। একটা ঝামেলা মিটতে না মিটতে আরেকটা শুরু হবে। এপারেও, ওপারেও, এ সমাজেও, ও সমাজেও। একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? ইংরেজের পর যেমন ভারতীয় বা পাকিস্তানী, জমিদারের পরে কে? মহাজনের পর কে?"

তিনি আমতা আমতা করে বলেন, "মহাজনের পর কে তা আমার অজানা। কিন্তু জমিদারের পর জোতদার এটা স্বতঃসিদ্ধ। স্টেট নয়, স্টেট কিছুতেই নয়। জোতদারই হচ্ছে আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জোতদার না থাকলে গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। শহর ভরে যাবে গ্রামের বুভুক্ষু মানুষে। তাদের কে জোগাবে খাদ্য? ফসল ফলাবেই বা কে?"

"আপনিও কি জোতদার নাকি?" মানস জেরা করে।

"জী। আমরা বর্ধিষ্ণু জোতদার। প্রতিবেশী হিন্দু জোতদারদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্প্রীতি। সেইজন্যে গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নেই। মামলা বাধলে মুসলমানে মুসলমানে বাধে, হিন্দুতে হিন্দুতে বাধে। শরিকানা মামলা। কাজিয়ার মামলা নিশ্চয়ই আপনার কোর্টে এসেছে। দু'পক্ষই মুসলমান। হিন্দু উকীলদেরও মওকা। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরোয়াল, কোচ, বন্দুক নিয়ে সে কী লড়াই! হুঙ্কার ছেড়ে দুই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসে দুই দল জোয়ান। প্রথমে বাক্যবর্ষণ, তারপরে উরু চাপড়ানি, তার পরে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই।" অধ্যাপক আশ্বাস দেন।

মানস তার পুরনো প্রশ্নে ফিরে যায়। "জোতদার কি চিরস্থায়ী না তার পরেও কেউ আছে? যেমন ভূমিহীন কৃষক। রুশদেশে ওরা জমিদারদের পর জোতদারদেরও উচ্ছেদ করেছে, জানেন। লিকুইডেশন অভ্ দ্য কুলাকস। এদেশেও কি তেমন কিছু ঘটবে না?" মানস চেপে ধরে।

"ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে। এই হচ্ছে পন্থা। কিন্তু কোথায়? আসাম তো আপনারা আমাদের ছেড়ে দিলেন না?" তিনি অনুযোগ করেন।

"সিন্ধুপ্রদেশ তো ছেড়ে দিয়েছি। সেখানে ভূমির অভাব নেই, লোকের অভাব। একই পাকিস্তান। ভূমিহীনরা না হয় সেখানেই যাবে।" মানস তাঁকে ভাবতে বলে।

আপিস আদালতের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগেই হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কেরানীর পর্যায়ে পর্যন্ত। এরা সবাই একসঙ্গে দেশান্তরে গেলে সব ক'টা আপিস আদালত বিপর্যস্ত হবে। মুসলিম লীগ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের মুখপাত্রদের অভয় দেন যে ব্রিটিশ সরকারের নিয়মকানুন তাদের বেলাও বলবৎ থাকবে। কারো চাকরি যাবে না। কারো প্রমোশন আটকাবে না। জিন্না সাহেব স্বয়ং বিবৃতি দেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী নাগরিক ও সম অধিকারী। ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্রের ব্যাপার নয়।

তা সত্ত্বেও একধার থেকে প্রায় সকলেই ইণ্ডিয়ার অনুকূলে অপশন দেয়। এমন কী, চাপরাসী আর্দালী প্রোসেস সার্ভার দপ্তরী পর্যন্ত। মানস তো অবাক!

"তোমরা কী করে ওদেশে গিয়ে সংসার চালাবে? তোমাদের তো মাইনেয় কুলায় না। জোত জমি আছে বলেই সংসার চলে।" মানস বলে।

"কোনো মতে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পেলেই বর্তে যাই। আর সব পরে হবে। কিন্তু এই

পাণ্ডববর্জিত দেশে আর নয়। সরকার আশ্বাস দিলে কী হবে, মুসলমানের মুরগী পোষা। ঘাড় মটকাবার ভয় দেখাবার লোকও তো কম নেই। আমরা গেলেই ওদের হাড় জুড়ায়। আমাদের পদগুলো ওরাই পায়।'' তারা একবাক্যে নিবেদন করে।

''তোমাদের জায়গা জমির কী হবে?'' মানস সুধায়।

''ওসব গেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি গেলে আবার হবে না। তখন তো পালাতেই হবে। আগে থেকে কেন নয়?'' তারা উত্তর দেয়।

তাদের হয়ে হেড ক্লার্ক নবীনকিশোর শর্মা সরকার বলেন, ''সার, সেই তিনটি মাছের গল্প নিশ্চয়ই পড়েছেন। জেলেরা মাছ ধরতে আসবে শুনে অনাগতবিধাতা একটা দিনও সবুর করে না। সঙ্গে সঙ্গে পালায়। প্রত্যুৎপন্নমতি ধরা পড়ে। কিন্তু তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে জালটাকে কামড়ে ধরে মরার ভান করে। জেলেরা যখন জালসুদ্ধ মাছ ধুতে নিয়ে যায় তখন সে ডুব মেরে বেঁচে যায়। দীর্ঘসূত্রী গড়িমসি করে। কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারে না। জেলেরা তাকে বাড়ী নিয়ে যায় ও মেরে খায়। আমরা যারা কালবিলম্ব না করে অপশন দিয়ে চলে যাচ্ছি তারা অনাগতবিধাতা। যারা কিছুদিন থেকে নতুন সরকারকে একটা সুযোগ দিতে চায় তারা প্রত্যুৎপন্নমতি। বিপাকে পড়লে সব ছেড়ে ছুড়ে উধাও হয়ে যাবে। আগে থেকেই পরিবারকে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওপারে। বাকী থাকে যারা তারা শত অন্যায় সহ্য করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। তারা দীর্ঘসূত্রীর মতো মরবে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।''

''না, না, বাঙালী মুসলমান কি অত নিষ্ঠুর হবে?'' মানস মাথা নাড়ে।

''বাঙালী মুসলমান কি একমাত্র মুসলমান? বিহারী মুসলমানও আসছে। পাঞ্জাবী মুসলমান অফিসারে ভরে যাবে।'' তিনি যতদূর জানেন।

''না, না, ওরাও কাউকে মারবে না।'' মানস বিশ্বাস করে।

''সার, ইতিহাস কী বলে? ওদের একহাতে কোরান, আরেক হাতে তলোয়ার। এই সাতশো বছরে ওরা কি একটুও বদলেছে? ইংরেজ ছিল বলেই মুখোশ পরেছিল। এখন মুখোশ খুলবে। আমাদের সামনে হয় ধর্মান্তর, নয় দেশান্তর। আবার মূর্তিভঙ্গ, মন্দিরভঙ্গ।'' নবীনবাবু হাত জোড় করেন।

একদিন পুলিশ দু'ভাগ হয়ে মিছিল করে বেড়ায়। একদল হাঁকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। আরেকদল 'জয় হিন্দ'। একদলের হাতে সবুজ নিশান। আরেক দলের হাতে তেরঙা ঝাণ্ডা। ওরাও অপশন দিয়েছে।

আমরা কোথায় আছি? ত্রিভঙ্গ সিভিল সার্ভিস। একভাগ রাজত্ব গুটিয়ে নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছে। আপাতত নিরপেক্ষ। আরেক ভাগ পাকিস্তানের জন্যে দিন গুনছে। আরো একভাগ স্বাধীন ভারতের দায়দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বার্থের মিল কারো সঙ্গে কারো নয়। তিনটি পাখী যেন একই গাছের ডালে একটা রাত কাটাচ্ছে। ভোর হলেই কে কোথায় উড়ে চলে যাবে। আর দেখা হবে না।

বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্যে মাউন্টব্যাটেনকে উভয় রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারল করার প্রস্তাব হয়। জিন্না সাহেব গোড়ায় রাজী হলেও পরে পেছিয়ে যান। তাঁর রাষ্ট্রের তিনিই হবেন গভর্নর জেনারল। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ইকুয়ালিটি। যেমন গান্ধীজীর জীবনের মূলমন্ত্র লিবার্টি। জিন্না সাহেব এইবার প্রমাণ করবেন যে তিনি রাজবংশীয় গভর্নর জেনারল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সমান মর্যাদাবান। তিনিও এক বড়লাট। সাধারণ মুসলমান জয়ধ্বনি করবে। বাদশা বনে গেলেও যে কেউ আরো উৎফুল্ল হতো না তা নয়। তবে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতো। সেটা মুসলিম লীগ পলিসি নয়। হিন্দুদের চেয়ে বেশী লয়াল হওয়াটাই মুসলিম লীগের আজন্ম অনুসৃত নীতি। কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাইবার আগে লীগ সেটা চেয়ে রেখেছে। কংগ্রেসকেও বাধ্য হয়ে সেটা চাইতে হয়েছে। নইলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। পার্লামেন্টে চার্চিলের দল বিনা প্রতিবাদে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ করে দেন। সেটা কি তাঁরা করতেন, যদি ভারত প্রথম দিনেই

রেপাবলিক হতো? পাকিস্তানের দিক থেকে যতদিন যুদ্ধের আশঙ্কা থাকবে ভারতকে ততদিন কমনওয়েলথে থাকতে হবে। তবে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর এই বন্দোবস্ত হয় যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী যদি রেপাবলিকান কনস্টিটিউশন পাশ করে ব্রিটেন সেটা মেনে নেবে। তখন স্বাধীন ভারত কমনওয়েলথে থেকে যাবে।

কথাবার্তায় 'হিন্দুস্থান' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আইন অনুসারে স্বাধীন ভারত হয় ইউনিয়ন অভ্ ইণ্ডিয়া। এতদিন ছিল এম্পায়ার অভ্ ইণ্ডিয়া। এম্পায়ার থেকে ইউনিয়ন একটা মস্ত বড়ো পরিবর্তন। এটার জন্যে দুইভাবে দাম দিতে হয়। প্রথমত, মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বা প্রদেশাংশগুলিকে পৃথক হতে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে। ছিন্ন যেটা হলো সেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক। ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ করার পর ভারত সংক্রান্ত আর কোনো বিল পাশ করার এক্তিয়ার সে পার্লামেন্টের রইল না।

বাকী রইল আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। সেটার আগে বাউণ্ডারি কমিশন বসবে। ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাউণ্ডারি লাইন নির্ধারিত হবে। সার সীরিল র‍্যাডক্লিফকে সে ভার দেওয়া হয়। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের উপর নির্ভর করছে কয়েকটি জেলার ও মহকুমার ভাগ্য। মুসলিম লীগ এখনো কলকাতা দাবী করে। সেইজন্যে কলকাতার হিন্দুরা এখনো হাতিয়ারে শান্ দিচ্ছে। স্বপনদার বাড়ীতে কোলাপসিবল আয়রন গেট লাগানো হয়েছে। দীপিকাদি লিখেছেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে একটা ছায়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়েছে। এঁরাই অফিসার নির্বাচন করছেন। কাকে কোথায় বসাবেন স্থির করবেন। লীগ মন্ত্রীরা পূর্ববঙ্গ নিয়েই থাকবেন। লাটসাহেব কায়া ও ছায়া উভয় মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে সেতুবন্ধন করবেন। সুহরাবর্দী সাহেব অর্ধেক ক্ষমতা হারিয়েছেন। সেটা লাভ করেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ত্যাগী দেশসেবকে ইতিহাস তাঁকে একটা সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তাঁর জন্মস্থানের মাটিতেই তিনি ক্ষমতাশূন্য বিদেশী। মালিকান্দাও তাঁর কাছে বিদেশ।

॥ আঠারো ॥

গভীর আনন্দ ও প্রগাঢ় বিষাদ মানসকে একই কালে অভিভূত করেছিল। দুই শতক পরে দাসত্ব দূর হচ্ছে, সেই সঙ্গে দাস মানসিকতাও, যা প্রচ্ছন্নভাবে সকলের জীবনে সক্রিয় ছিল। মানসও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজভক্তি ও দেশপ্রেমের জোড় মেলাতে গিয়ে সে নিজের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারেনি। এখন থেকে তার দ্বিচারিতার অবসান। তাই আনন্দ।

অথচ এ কী অদ্ভুত বিধিলিপি যে ইংরেজ যতদিন ইণ্ডিয়াও ততদিন। ইংরেজ চলে গেলে ইণ্ডিয়া বলে যা থাকবে তাতে না থাকবে পশ্চিম পাঞ্জাব, না সিন্ধুপ্রদেশ, না পূর্ববঙ্গ। 'জনগণমন অধিনায়ক' এই মহান সঙ্গীত কেমন করে তার জাতীয় সঙ্গীত হবে? অংশত অসত্য হবে না? তেমনি, 'বন্দে মাতরম্'? সপ্তকোটি কণ্ঠের বেশীর ভাগই তো এখন থেকে পাকিস্তানী। তাদের জাতীয় সঙ্গীত আর যাই হোক 'বন্দে মাতরম্' নয়। চর্মগত ভেদ যদি বা গেল ধর্মগত ভেদ এল। তাই বিষাদ।

"মীনিংলেস। অর্থহীন।" মানস রাত জেগে পায়চারি করে।

"চল, শুতে চলো। তুমি যার অর্থ খুঁজছ তা কোনোকালেই পাবে না। বৃথা তোমার শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ। মেনে নাও। মেনে নাও।" বৃথিকা বলে।

"কেমন করে মেনে নেব, জুই? শুধু বাংলাদেশ নয়, বাঙালী জাতি দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওদের সাহিত্য দু'ভাগ হয়ে যাবে, সঙ্গীত দু'ভাগ হয়ে যাবে, শিল্প দু'ভাগ হয়ে যাবে, সংস্কৃতি দু'ভাগ হয়ে যাবে, পরে যারা জন্মাবে তারা দেখবে তাদের উত্তরাধিকার দু'ভাগ হয়ে গেছে। উত্তরপুরুষের

জন্যে আমরা কী রেখে যাচ্ছি, যা সার্বজনীন, যা কমন? বাংলাভাষা? তার একভাগও তো উর্দুর মতো আরবী ফারসীবহুল হবে। অপর ভাগ হিন্দীর মতো সংস্কৃতবহুল। জনমনের কাছাকাছি যেতে এত যে সাধনা করলুম সব বৃথা। ভাষাই হচ্ছে মানুষের মনের রক্ত। সে রক্ত হিন্দুর রক্ত বা মুসলমানের রক্ত নয়। বাঙালীর রক্ত। তাকে বিভক্ত করা যায় না। গেলে দু'পক্ষেরই রক্তশূন্যতা। সাহিত্যও হবে রক্তশূন্য।" মানস বিলাপ করে।

"তা হলে কি তুমি চেয়েছিলে সারা বাংলা পাকিস্তানের পাকস্থলীতে তলিয়ে গিয়ে পরিপাক হয়ে যাক?" যূথিকা সকৌতুকে সুধায়।

"কক্ষনো না। আমি পাঁচহাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমি কেন দেড় হাজার বছরের ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে যাব! আমি অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করব।" মানস উত্তর দেয়।

"তা হলে কি তুমি চেয়েছিলে স্বাধীন ও সার্বভৌম যুক্তবঙ্গ? যার শাসনতন্ত্রের মূলে যৌথ নির্বাচন।" যূথিকা জেরা করে।

"তাই বা কেমন করে বলি? সেই নজির অনুসরণ করত স্বাধীন ও সার্বভৌম আসাম, স্বাধীন ও সার্বভৌম ওড়িশা, স্বাধীন ও সার্বভৌম হায়দরাবাদ ইত্যাদি বলকান রাষ্ট্র। জবাহরলালের এই শঙ্কা আমারও শঙ্কা। দেশটাকে বলকান না বানিয়ে ইংরেজ একটা মহৎ কীর্তি করেছে। আমরা যদি বলকান হতুম তবে ইণ্ডিয়ান নেশন বলে কিছু থাকত না। ফেডারেশনই ছিল আমাদের অভীষ্ট। কিন্তু তার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হলে হিন্দুপ্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। জিন্না সাহেব তার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ডাইরেক্ট অ্যাকশন তাঁর সহিংস প্রতিরোধ। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের চেয়ে সেপারেটিস্ট মুসলিমদের জোর বেশী। মুসলিম জনমত তাঁদের দিকে। পাকিস্তানের মূলে একটা ভাইটাল আর্জ। যুক্তি তার কাছে পরাস্ত।" মানস আক্ষেপ করে।

"সেপারেটিস্ট বলতে কি কেবল মুসলমান বোঝায়? শিখ বোঝায় না? পাঞ্জাবী হিন্দু বোঝায় না? বাঙালী হিন্দু বোঝায় না? যেখানেই মেজরিটির প্রাধান্য সেখানেই মাইনরিটির জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমার ধারণা সেপারেট ইলেকটোরেট থেকে সেপারেটিস্ট মুসলমান। তা নয়। সেপারেটিস্ট মুসলমান থেকেই সেপারেট ইলেকটোরেট। প্রথমবার বঙ্গভঙ্গ যে হয়েছিল সেটাও সেপারেটিস্ট মুসলমানদের খাতিরেই। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তার বিরোধী ছিলেন তাঁরা জানতেন যে বাংলাদেশ জোড়া লাগলে মুসলমানরাই হবে মেজরিটি। ঢাকার বদলে তাঁরা কলকাতা পাবেন। নইলে কলকাতা পাবেন না। তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সুনিশ্চিত ছিল। চাকা ঘুরে গেছে। মুসলিম প্রাধান্যের ভয়ে বাঙালী হিন্দু আজ সেপারেটিস্ট। হিন্দুর ছেলে ফোর্থ হয়েও ডেপুটি হবে না, মুসলমানের ছেলে ফিফথ হয়েও ডেপুটি হবে। তারপর সেই হিন্দুর ছেলে যদি চাকরি চায় তো সাব-ডেপুটি হয়ে সেই ডেপুটির অধীনে কাজ করবে। হিন্দু এই অন্যায়ের হাত থেকে উদ্ধার পেতে বাংলাদেশের পার্টিশন চাইবে না? অথচ সে ন্যাশনালিস্ট। কারণ সে ব্রিটিশবিরোধী। এই মাপকাঠিতে মুসলমানদের অধিকাংশ ন্যাশনালিস্ট নয়। যারা ব্রিটিশবিরোধী তারা পাকিস্তানবিরোধী। তাদের জোর আর কতটুকু?" যূথিকা যতদূর বোঝে।

মানস চিন্তা করে বলে, "হিন্দুর হামবড়া ভাব ও মুসলমানের হামছোটা ভাব, সুপিরিয়রিটি ও ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, সাত আট দশক ধরে কাজ করে এসেছে। কংগ্রেসের আদিপর্ব থেকেই মুসলমানদের অনীহা। ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর বিবাদে মুসলমানের কী? বিবাদটা যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের এটা যে কয়েকজন বোঝেন তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। যেমন, জিন্না সাহেব। তিনিও পরে বলে বসেন, আগে হিন্দু মুসলিম মিটমাট, পরে ইঙ্গ ভারতীয় মিটমাট! গান্ধীজীর মত এর বিপরীত। পরাধীন দেশের প্রথম কাজ স্বাধীনতা অর্জন। পরে সাম্প্রদায়িক মিটমাট। দেখা গেল কিপলিং-এর পূর্ব

ও পশ্চিমের মতো হিন্দু ও মুসলিম 'নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট।' দেশ দু'ভাগ, প্রদেশ দু'ভাগ। আমার তো আশঙ্কা ভারত ও পাকিস্তান 'নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট।' তবে আশারও কারণ আছে। হিন্দু একদিন হিন্দুত্বের ঊর্ধ্বে উঠবে। মুসলমান ইসলামের ঊর্ধ্বে। ধর্মীয় অর্থে নয়, রাজনৈতিক অর্থে। অর্থনৈতিক অর্থে। অন্তঃপরিবর্তন বলতে আমি এই বুঝি। এর একটা আভাসও দেখতে পাচ্ছি। কোথায়, জানো?"

যূথিকা সংশয়ের স্বরে সুধায়, "কোথায়? তোমার মাথায়?"

"জিন্না সাহেবের ভাষণে। অবিশ্বাস্য, তবু সত্য।" মানস ড্রয়ার থেকে কাগজটা বার করে এনে পড়ে শোনায়। জিন্না বলেছেন :

"We are starting the State with no discrimination, no distinction between one community and another, between caste or creed. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State. We should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time the Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual but in the political sense as the citizens of the Nation."

শুনতে শুনতে যূথিকার চোখে জল দেখা দেয়। সে বলে, "হ্যাঁ, ইনি আমার ছেলেবেলার সেই জিনা। তবে এঁর মেয়েটির কী অপরাধ?"

"পার্টিশনের ফলে হিন্দুর হামবড়া ভাব ও মুসলমানের হামছোটা ভাব যদি দূর হয় তবে এর একটা মিনিং আছে। এটা একটা ছদ্মবেশী আশীর্বাদ।" মানস অবশেষে মেনে নেয়।

একদিন দেবাদিদেব গুহ আসেন দেখা করতে। সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সুনীলবরণ রক্ষিত। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পেয়ে ইন্দোনেশিয়ায় গবেষণা করছেন।

গুহ বলেন, "শুনছি কলকাতার হিন্দুরা স্বাধীনতাদিবসে সেখানকার মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করবে। পার্ক সার্কাস নাকি পাকিস্তান হয়েছে। সেটাকে হিন্দুরা হিন্দুস্থানে পরিণত করবে। মুসলমানদেরও দোষ আছে। র‍্যাডক্লিফ কমিশনের কাছে সওয়াল করেছে যে হুগলী নদীটাই নাকি নৈসর্গিক সীমান্তরেখা। কলকাতা তার পূব দিকে। অতএব পূর্ববঙ্গে। লড়াই করে ওরা যা পায়নি অ্যাওয়ার্ড হিসাবে পাবে। র‍্যাডক্লিফ যেন দ্বিতীয় এক ম্যাকডোনাল্ড। র‍্যাডক্লিফ তো পলিটিসিয়ান নন, তিনি একজন জজ। তিনি কি অমন একটা রোয়েদাদ দিয়ে আরেক দফা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ঘটাবেন?"

"না, বোধহয়। বোধহয় কেন, নিশ্চয়। ম্যাকডোনালডের অ্যাওয়ার্ড শুনেছি গোড়ায় সে রকম ছিল না। বড়ো বড়ো ঝানু সিভিলিয়ানরা তাঁকে বলেন, স্যার, আপনি কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চান? ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মতো বেঙ্গল গভর্নমেন্টও টেররিস্টরা হাতের মুঠোয় পাবে। কংগ্রেসে এখন তাদেরই পাল্লা ভারী। ম্যাকডোনাল্ডের কলম বেঁকে যায়। এবারকার পরিস্থিতি সেবারকার মতো নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এমনিতেই ধ্বংসের মুখে। ব্রিটিশ স্বার্থ বলতে যদি বাণিজ্যিক স্বার্থ বোঝায় তবে সেটা কংগ্রেসের কৃপায় সুরক্ষিত হতে পারে। কাজেই কংগ্রেসকে তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেওয়া ব্রিটিশ পলিসি নয়। কংগ্রেস তো গোটা বাংলাদেশটা দাবী করছে না। পশ্চিমবঙ্গ পেলেই সে খুশি। বলা বাহুল্য, কলকাতা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয় না। হুগলী নদীকে সীমান্তরেখা কার্জনও তো করেননি। ব্রিটিশ জজেরা প্রিসিডেন্ট দেখে বিচার করেন। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়বেই।" মানস নিঃসংশয়।

"আমরা কিন্তু ভাবছি আমাদের পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু ভাইবোনদের কথা। কলমের একটি খোঁচায় ওদের ভাগ্যের এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। ইংরেজদের তাতে কি। র‍্যাডক্লিফই বা কেমন করে বুঝবেন কলকাতার এদিক ওদিক হলে কার কী আসে যায়? নদী যে একটা নৈসর্গিক সীমান্তরেখা এটা কী ইউরোপের ইতিহাসে বিতর্কিত হয়নি? ফ্রান্স কি বরাবর রাইন ফ্রন্টিয়ার দাবী করেনি? তাই নিয়ে

লড়েনি? হুগলী নদী যদি সীমান্তরেখা না হয় তবে আর কোন্ নদী হবে সীমান্তরেখা? পদ্মা, গোরাই, মধুমতী? ল্যাণ্ড ফ্রন্টিয়ার পাহারা দেওয়া মোটেই কার্যকর হবে না। এপারের লোক ওপারে, ওপারের লোক এপারে নিত্য যাতায়াত করবে। চোরা চালান করবে। চুরি ডাকাতী করে এপার ওপার করবে। শেষপর্যন্ত লোকবিনিময় না করে উপায় থাকবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হবে। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এসে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা।" গুহ অনুমান করেন।

"লোকবিনিময় কারো পক্ষে ভালো হবে না, মিস্টার গুহ। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ তো তুরস্ক আর গ্রীস নয়। হিন্দু মুসলমান যদি একসঙ্গে বসবাস না করে তবে হিন্দু মুসলমানের মিটমাট হাজার বছরেও হবে না। উল্টে হাজার বছরের সাধনা মাটি হবে। ক্ষমতার বাঁটোয়ারা না হয়ে রাজ্যের বাঁটোয়ারা হচ্ছে। এই যথেষ্ট নয় কি? এর পরিণাম কি প্রজারাও বাঁটোয়ারা? তাও কি কখনো হয়?" মানস বিশ্বাস করে না।

রক্ষিত বাধা দিয়ে বলেন, "কেন? হল্যাণ্ডে বেলজিয়ামে হয়নি? যারা পেরেছে তারা পা দিয়ে ভোট দিয়েছে। তাই হল্যাণ্ড প্রায় প্রটেস্টান্ট, বেলজিয়াম প্রায় ক্যাথলিক। তবে পুরোপুরি হয়নি, এটা ঠিক। এদেশেও পুরোপুরি মুসলিম বা পুরোপুরি হিন্দু হবে না। কিন্তু বহুপরিমাণে হতে পারে।"

"না, ডক্টর রক্ষিত, তুলনাটা ঠিক হলো না। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা ল্যভ্ হেট রিলেশনশিপ। পরস্পরকে আমরা ভালোও বাসি, শুধু যে ঘৃণা করি তা নয়।" মানস তর্ক করে।

এবার রক্ষিত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, "ইণ্ডোনেশিয়ায় তো আমি কেবল প্রেমই দেখেছি। ও দেশের মুসলমানরাও রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পাগল। একদা এ দেশের মুসলিম শাসকরাও রামায়ণ মহাভারতের তর্জমা করিয়ে এ দেশের লোকের সঙ্গে মন মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। আর এ দেশের লোকও ফার্সী ভাষা শিখে পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল। মালিক মহম্মদ জায়সী যে পদ্মিনীর উপাখ্যান রচনা করেন তাতে পদ্মিনী ছিলেন রূপে গুণে অদ্বিতীয়া আর আলাউদ্দীন ছিলেন ভিলেন। গোড়ায় নামকরণ ছিল হিন্দু বনাম তুর্ক, তুর্ক বনাম মোগল। হিন্দু বনাম মুসলমান এই নামকরণ সাতশো বছরের নয়, চারশো বছরের। মোগলরা আসার পর মোগল আর তুর্ক ক্রমশ একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের মিলিত নাম হয় মুসলমান। তখন থেকেই হিন্দু বনাম মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্র এক নয়, দুই। তবু পুরোপুরি দুই হয়নি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, কথক নৃত্য, উর্দু সাহিত্য, মহরম আর হোলি ছিল উভয়েরই মিলনসেতু। আকবর বাদশাহ দুই সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরও তাঁরই নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু শাহ্ জাহানের আমল থেকেই শুরু হলো বিপরীত নীতি। তার পরাকাষ্ঠা আওরংজেবের আমল। দারা শিকোর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের একাত্মবোধের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। দুই নেশন তত্ত্বের শিলান্যাস তখন থেকেই। ব্রিটিশ আমলে শাসক শ্রেণী এর সুযোগ নিয়ে গোড়ার দিকে পক্ষপাত দেখায় হিন্দুর উপরে, শেষের দিকে মুসলমানের উপরে। মুষ্টিমেয় বিদেশী অন্য কোনো উপায়ে এত বড়ো একটা দেশকে পায়ের তলায় রাখতে পারত না। বিশেষত তার পলিসি যখন নয় এদেশেই বসবাস করা ও বিস্তর লোককে খ্রীস্টান করে ক্রমে ক্রমে সংখ্যাবহুল হওয়া। মিউটিনির দিন হিন্দু মুসলিম এক জোট হয়েছিল, এক হয়নি। খেলাফত আন্দোলনের দিনও তাই। একজোট হওয়া এক হওয়া নয়। জোট একদিন ভেঙে যায়। কোয়ালিশন করে পাঁচ দশ বছর চালানো যায়, কিন্তু পার্মানেন্ট কোয়ালিশন বলে কোনো শাসনব্যবস্থা সম্ভব নয়। পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট বলতে পার্টিশনই বোঝায়। কেউ যদি কাউকে ভালো না বাসে, কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস না করে, তবে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ বাঁটোয়ারাই শ্রেয়। আবার কবে সেতুবন্ধন হবে, কেমন করে হবে এসব ভেবে লাভ আছে কি? আমি তো দেখছি পার্টিশনও শেষ কথা নয়, এর পরে লোকবিনিময়।"

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "দিস্ কান্ট্রি ক্যান নট লিভ হাফ হিন্দু অ্যাণ্ড হাফ মুসলিম। লিঙ্কন যা

বলেছিলেন এটা তারই অনুসরণ। তবে সিদ্ধান্ত যখন একবার নেওয়া হয়ে গেছে যে পার্টিশন হবে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত তখন আমাদের কাজ সেটাকে মান্য করা। কিন্তু লোকবিনিময় তার সামিল নয়। মহম্মদ তুঘলকের ফারমান ছিল দিল্লী থেকে লোক অপসরণের। মহম্মদ আলী জিন্নার ফারমান যদি হয় দুই রাষ্ট্র থেকে লোক অপসরণের কে সেটা মান্য করবে? হিন্দু মুসলমানের বিবাদ কি এমন এক বিবাদ যা পার্টিশনেও মিটবে না?"

এর উত্তর দেন গুহ। "এই বিবাদের আরো এক ডাইমেনসন আছে, মল্লিক সাহেব। পাকিস্তানে হিন্দু জমিদারদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে। হিন্দু মহাজনদের পাওনা সুদ মুছে ফেলা হবে। আসলটাও অস্বীকার করা হতে পারে। ইসলামে সুদ হারাম। হিন্দু আমলাদের পঞ্চম বাহিনী অপবাদ দিয়ে যদি বরখাস্ত না করা হয় তবে এক পদ নামিয়ে দেওয়া হবে। যেমন, জজকে সাব-জজ পদে।"

মানস লাল হয়ে যায়। "নেভার!"

গুহ মাফ চান। "ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

মানস ঠাণ্ডা হয়ে বলে, "ঠিক। পার্টিশনটা কেবল রাজনৈতিক বাঁটোয়ারা নয়, এটা একপ্রকার সমাজতান্ত্রিক ওলটপালট। জমিদার ও মহাজনকে উৎখাত করা হবে, আমলাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। বিপ্লবের দিন ওটাও সম্ভবপর, এটাও সম্ভবপর। কিন্তু আমার কী? আমি মুক্তি চাই। আমাকে মুক্তির স্বাদ দিতে পারে এমন পদ এখনো সৃষ্ট হয়নি, পরেও হবে না। যত উচ্চ পদই হোক না কেন, আমাকে তা বেশীদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। আমার মনে পড়ে যাবে যে আমি অন্য রাজ্যের মানুষ, যে রাজ্য এ রাজ্য নয়। আমাকে খুঁজে নিতে হবে সেই রাজ্য যেখানে আমি রাজা, যেখানে আমার প্রত্যেকটি লিপিকর্ম এক একটি সৃষ্টি। জীবনের বেশ কিছু অংশ বনবাসেই কেটে গেল আমার। এখন স্বরাজ্যে ফিরতে হবে। কিন্তু সে স্বরাজ্য জাতীয়তাবাদীদের স্বরাজ নয়। যদিও আমি একজন ভারতীয় হিসাবে তেমন স্বরাজের জন্যেও অপেক্ষা করছি।"

"জানিনে আপনি কিসের স্বপ্ন দেখছেন। আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল কেমব্রিজ থেকে র‍্যাংলার হয়ে ফেরার পর ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে নিযুক্তি। আমি, মশায়, সে পদ প্রাণ থাকতে ছাড়তুম না, যদি একবার পেতুম। আমার অনুরোধ আপনি পদত্যাগ ইত্যাদির কথা স্বপ্নেও ভাববেন না, নয়তো সারাজীবন পশতাবেন। তবে এটাও ঠিক যে স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান হলে অনেকেই মানে মানে পদত্যাগ করতে চাইবেন, যদি না পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বদলীর সুযোগ পান। তাঁদের কাছে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় পাকিস্তান ত্যাগের স্বাধীনতা, হিন্দুস্থানে উপযুক্ত পদলাভের স্বাধীনতা। এক অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ করছি বাঙালী হিন্দু অফিসারদের জীবনে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ ভাগ হয়ে গেলে তাঁরা কোথায় দাঁড়াবেন? বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা? আমি অফিসার নই। তাই আমার মনে অস্থিরতা নেই। আমি এইপারেই থাকব, যাই থাক না কপালে। জমিদারি কেড়ে নিলে ক্ষতিপূরণ তো দেবে। না শুধু মুসলিম জমিদারদেরই দেবে, হিন্দু জমিদারদের দেবে না? এখন থেকে আমি অতটা নৈরাশ্যবাদী না। আমি আশাবাদী।" গুহ উচ্চস্বরে চিন্তা করেন।

রক্ষিত বলেন, "আমার মতো পুরাতত্ত্ববিদের স্থান পাকিস্তানে নয়, যদিও মোহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা পাকিস্তানেই পড়বে। আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ জোগাড় করে নিয়েছি। ভাবনা কেবল পৈত্রিক সম্পত্তিটুকুর জন্যে। জানেন তো পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা শুধু চাকরি দেখে কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা দেয়। চাকরি আজ আছে, কাল নেই। আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আছে, মাটিতে স্টেক আছে। আমরা সলিড বুর্জোয়া। সেটা আমি প্রমাণ করব কী করে যদি, বাস্তুচ্যুত হই?"

মানস তাঁকে আশ্বাস দেয়। "জিন্না সাহেবের স্টেটমেণ্ট কি পড়েননি? পাকিস্তানের হিন্দুরা

সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে সম-অধিকারী হবে। মুসলমানের সম্পত্তি যদি থাকে তো হিন্দুর সম্পত্তিও থাকবে। আর দেরি না করে শুভকর্মটা সেরে নিন, ডক্টর রক্ষিত। আমার দৃঢবিশ্বাস পাকিস্তানী মুসলমানদের অচিরেই অন্তঃপরিবর্তন হবে। আমি তো আমার অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ওপারে যাবেন না, এপারেই থেকে যান। পাকিস্তান হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানের অন্তঃপরিবর্তন হবে। 'ভাই রে' বলে মুসলমান হিন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।"

যূথিকা টিপ্পনী কাটে, "ওঃ কী আমার দয়াময় ভাই রে?"

"অন্তঃপরিবর্তনে আমিও বিশ্বাস করি।" গুহ বলেন, "তবে সেটা সহসা আসে না। আসে কঠোর অভিজ্ঞতার পরে। যখন দেখা যাবে জমিদার একজনও নেই, মহাজন একজনও নেই, হিন্দু আমলাদের একজনও নেই, তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের মুসলমান নিষ্কণ্টক নয়, তার কষ্টার্জিত ধন লুটেপুটে খাচ্ছে পাঞ্জাবী ফৌজ, পশ্চিমা আমলা ও গুজরাটী সওদাগর তখন এক ও অবিভাজ্য মুসলিম নেশনের বুলি ফাঁকা শোনাবে। তার পরে এক ও অবিভাজ্য বাঙালী জাতির উপর নজর পড়বে।"

রক্ষিত বলেন, "তার আগে যে পদ্মা আর ভাগীরথী দিয়ে বহৎ পানি গড়িয়ে গিয়ে থাকবে। চোখের পানি থেকে আরো একটা নদী সৃষ্টি হয়ে থাকবে। যার কূল নেই, কিনারা নেই। শত চেষ্টা করেও যার উপর সেতুবন্ধন করতে পারা যাবে না। ইণ্ডোনেশিয়ার মুসলমানরা কিছু কম মুসলমান নয়, কিন্তু তারা তার চেয়ে বেশী ইণ্ডোনেশিয়ান। তারা দেশের বৈশিষ্ট্য, জাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু এদেশের মুসলমানদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এদের শিকড় কোথাও নেই, শিকড় গাড়বার জন্যে এরা চায় নিজেদের জন্যে এটা হোমল্যাণ্ড। এরা যেন একদল জিপসী কি বেদে কি বেদুইন। ইংরেজরা যাবার সময় এই বেদুইনদের সেটল করে দিয়ে যাবে যেখানে সেটা কোথাও একটা গোটা প্রদেশ, কোথাও আধখানা প্রদেশ, কোথাও প্রদেশের দশ আনা, কোথাও প্রদেশের সিকিভাগ। সব মিলিয়ে পাকিস্তান। একদল বেদুইনকে সেখানে সেটল করাতে গিয়ে আরেকদল মানুষকে বেদে বানাতে হবে। যাদের শিকড় হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ও গভীর। ছিন্নমূল এই বেদের দল যেখানে যাবে সেখানে কি শিকড় গেড়ে বসতে পারবে? সে শিকড় গভীর হতে কতকাল লাগবে? অন্তঃপরিবর্তন হয়তো একদিন হবে, কিন্তু কত দাম দিয়ে? রক্তমূল্য তো বটেই, কিন্তু সেই একমাত্র মূল্য নয়। যারা বেঁচে থাকবে তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য, তাদের পারিবারিক কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তোমার গুরু, তোমার পুরোহিত, তোমার ঠাকুর, তোমার চাকর, তোমার ধোপা, তোমার নাপিত এরাও কি তোমার সঙ্গে গিয়ে অন্য কোথাও বসত করবে নাকি? সেখানকার সমাজে তুমি খাপ খাবে কী করে? পার্টিশন বাঙালীকে কাঙালী করবে। বঙ্গভূমি হবে দুই নেশনের রঙ্গভূমি। এর চেয়ে ইণ্ডোনেশিয়া কত ভালো! বালী দ্বীপে হিন্দুও আছে, কিন্তু একই নেশন।"

"আমি কিন্তু এখান থেকে নড়ছিনে, ভাই। জন্মভূমি থেকে পলায়ন বীরের ভূমিকা নয়। কতক হিন্দু স্বস্থানে থেকে যাবে। আমরা হব বালীদ্বীপের হিন্দু। তাদেরই মতো সসম্মানে বেঁচে থাকব।" গুহ আশা করেন।

যূথিকা টিপ্পনী কাটে, "তাদেরই মতো মিউজিয়াম পীস। দেশবিদেশ থেকে পর্যটকরা আসবে দেখতে। বাটিক বস্ত্র কিনবে।"

গুহ মৃদু হেসে বলেন, "হিটলারী আমলে বিস্তর শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক দেশত্যাগী হন। কিন্তু কতক থেকে যান, অথচ নাৎসী হন না। তাঁরা যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থার নাম ইণ্টার্নাল মাইগ্রেশন। তাঁদের মাইগ্রেশনটা বাহির থেকে ভিতরে। আমিও আমার মনোজগতে দেশান্তরী হব। হিটলার ও তার নাৎসীরা আজ কোথায়? ধূমকেতুর মতো তাদের উদয় আর অস্ত। তেমনি, জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগেরও। সাধারণ মুসলমানের উপর আস্থা রাখতে হয়। সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে তার

প্রতিযোগী সম্পর্ক নয়, পরিপূরক সম্পর্ক। বাঁ হাতের সঙ্গে যেমন ডান হাতের। সে যদি উম্মত্ত হয় তবে তা অল্পকালের জন্যে।"

মানস স্মরণ করিয়ে দেয়, "সব লোককে তুমি কিছুকাল বোকা বানাতে পারো, কিছু লোককে চিরকাল, কিন্তু সব লোককে চিরকাল নয়।"

সেই যে কামালউদ্দীন সাহেব, যিনি কলকাতায় মীর আবদুল লতিফ সাহেবের বাড়ীতে স্বপনদাকে ও মানসকে বলেছিলেন, "পাকিস্তান না গোরস্থান" তিনি একদিন আসেন কথাটা মানসকে মনে করিয়ে দিতে। বলেন, "গোরস্থান তা হলে সত্যি সত্যি হতে চলল। এর জনক নিজেই নালিশ করছেন এই রাষ্ট্র ভায়েবল নয়। এই বিজোড় শিশুটি তবে বাঁচবে কোন্ বায়ুবলে? আমার লীগপন্থী বন্ধুরা তো আমাকে বয়কট করেছিলেন। এখন তাঁরাই আমার কাছে এসে বলছেন, 'পারফিডিয়াস অ্যালবিয়ন'। কারণ সে কংগ্রেসকেই দিল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব, আর কলকাতাকে করল পশ্চিমবঙ্গের সামিল। আমি ওঁদের বোঝাই যে রাজনীতিতে কেউ চিরশত্রু নয়, কেউ চিরমিত্র নয়। কংগ্রেস একদা শত্রু ছিল ঠিকই, কিন্তু তার কারণ ব্রিটেন ছিল ভারতের স্বাধীনতার শত্রু। বিশেষ করে চার্চিল গোষ্ঠী। লীগের দুর্ভাগ্য যে চার্চিল এখন প্রধানমন্ত্রী নন। জিন্না সাহেব এখন মুরুব্বিহীন।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয় না। বলে, "না, না, গোরস্থান নয়। জিন্না সাহেব পেয়ে গেছেন বেলুচীস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। যেটা সব চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল। বেলুচী আর পাঠানদের মতো বিশ্বস্ত কমরেডদের কংগ্রেস নেতারা পথে বসিয়েছেন। আমার মতে কংগ্রেসও পারফিডিয়াস। কে যে পারফিডিয়াস নয় তাই ভাবছি। জিন্না সাহেবও তো চার কোটি মুসলমানকে পথে বসিয়ে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন। তবে শুধু অ্যালবিয়নকেই পারফিডিয়াস বলা কেন? আমাদের নেতারাও তাই।"

কামালউদ্দীন স্বীকার করেন। "জী। পেছন ফিরে তাকাচ্ছি আর দেখছি ইংরেজদের দোষ নয়, আমাদের নেতাদেরই দোষ। বছর দশেক আগে কংগ্রেস যখন আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে কেন্দ্রের দিকে হাত বাড়ায় তখন আমরা কয়েকজন গিয়ে মহাত্মাজীকে বলি, 'কই, বাংলাদেশে তো কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিল না। তবে কেমন করে ক্ষমতার অংশ পাব?' আমি তখন কংগ্রেসে। তিনি বলেন, 'মুসলমানরা সবাই কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না কেন? তা হলে তো কংগ্রেস আরো জোরদার হয়। স্বরাজ অর্জন করে। তারপরে ক্ষমতা ভাগের প্রশ্ন ওঠে।' আমরা বুঝতে পারি যে তিনি চান আমরাও যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুসলমানদের মতো কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বরাজের পর মন্ত্রিত্বের ভাগ পাই। তাঁকে বোঝানো শক্ত যে বাংলার কংগ্রেস হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের কুক্ষিগত। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমরা একটিও ভোট পাব না। তার চেয়ে কৃষক প্রজা দলে যোগ দেওয়াই সুবুদ্ধি। আমি তাই করি। কিন্তু পরে দেখা যায় মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়ছে। হক সাহেব লাহোরে গিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখন জিন্না সাহেবের তারকা ঊর্ধ্ব গগনে। কৃষক প্রজা পার্টির আকাশ অন্ধকার। তখন আমরা কয়েকজন যাই কায়দে আজমের সকাশে। লজ্জার সঙ্গে কবুল করছি যে আমিও। তাঁরও দেখি গান্ধীজীর মতো মনোভাব। বলেন, 'মুসলমানরা সবাই মুসলিম লীগে যোগ দেয় না কেন? তা হলে তো লীগ আরো জোরদার হয়। পাকিস্তান কেড়ে নেয়।' তার মানে কৃষক প্রজা দলকে মুসলিম লীগে বিলীন হতে হবে। মুসলিম লীগ তো নাইট আর নবাবদের দল। খান বাহাদুর আর খান সাহেবদের কুক্ষিগত। আমরা সেখানে পাত্তা পাব কেন? হতাশ হয়ে ফিরে আসি। হতাশ কণ্ঠে বলি, 'পাকিস্তান না গোরস্থান।' না, গোরস্থান নয়, তবে কলকাতা না থাকলে খাঁকিস্তান। এর জন্যে দায়ী যেমন লীগ তেমনি কংগ্রেস। কারো হাতই পরিষ্কার নয়।"

মানস তাকে সান্ত্বনা দেয়। "পাকিস্তানের যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে। ঠিকমতো ব্যবহার করলে পাকিস্তানীরা সকলেই খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবে। কলকাতার জন্যেই তো মন্বন্তরটা হলো।

আর মন্বন্তর হবে না। কত বড়ো বাঁচোয়া।"

বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা দিব্যেন্দু চক্রবর্তী শহরে এসেছেন শুনে মানস তাঁকে নৈশ ভোজনের আমন্ত্রণ জানায়। তিনি গ্রহণ করেন। সাহিত্যসূত্রেই আলাপ পরিচয়। তিনিও একদা সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনীতি সাহিত্যকে গ্রাস করেছে। পূর্ণ গ্রাস।

ভদ্রলোক আটটার জায়গায় এগারোটা বাজিয়ে দেন। মানস ও যূথিকা অভুক্ত। তিনি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আহারে বসে যান। খেতে খেতে বলেন, "আজকের পরিস্থিতিতে আমরা একান্ত অসহায়। যে শহরেই যাই একটার পর একটা মীটিং। ইটিং ভুলে যাই। সর্বত্র ওই একই প্রশ্ন। আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ কী? আমাদের মেয়েদের বিয়ে হবে কোন্‌খানে? আমি আশ্বাস দিই, আমরা থাকতে আপনাদের ভয় কিসের? পশ্চিমবঙ্গ একটা শক্ত ঘাঁটি। যখন খুশি যাবেন, যখন খুশি আসবেন, যতদিন খুশি থাকবেন। পাশপোর্ট লাগবে না, ভিসা লাগবে না। একই মুদ্রা। মুদ্রাবিনিময় করতে হবে না। কাস্টমসের বালাই থাকবে না। মালপত্র যার যেমন দরকার তিনি তেমন আনাবেন, তিনি তেমন পাঠাবেন। পার্টিশন তো উভয় পক্ষের ভোটেই হয়েছে। হয়েছে শান্তির জন্যে, হয়েছে প্রগতির জন্যে। প্যানিকের কোনো কারণ নেই। অহেতুক স্থানত্যাগ করবেন না। ঘরবাড়ী, জায়গা জমি ছেড়ে গেলে বেদখল হয়ে যায়। পরে আর দখল ফিরে পাওয়া যায় না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকুন।"

"খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন, মিস্টার চক্রবর্তী।" মানস তারিফ করে।

" কে কার কথা শোনে!" তিনি একটু দম নিয়ে বলেন, "প্রত্যেক সভাতেই দু'চারজন ত্যাঁদড় থাকে। আমাকে জেরা করে। 'আপনিই না জানুয়ারি মাসে আমাদের বলেছিলেন পার্টিশন হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে? সর্দারজীই না পণ করেছিলেন, পাকিস্তান তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না? মহাত্মাজীই না ঘোষণা করেছিলেন যে পার্টিশন হলে সেটা হবে তাঁর জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ, ভিভিসেকশন? পশ্চিমবঙ্গের ঘটির স্বার্থে আপনারা পূর্ববঙ্গের বাঙালকে বলি দিলেন। ধিক্ আপনাদের! বাঙাল আপনাদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু ভুলতে পারে না। গ্রেট ডিভাইড শুধু নয়, গ্রেট বিট্রেয়াল।' আমি তো হাঁ।" তিনি ছুরি কাঁটা তুলে রাখেন।

"ও কী! খাওয়া বন্ধ করলেন যে।" যূথিকা অনুযোগ করে।

"গ্রেট বিট্রেয়াল! আমরা ট্রেটর!" তিনি কপালে হাত দিয়ে বলেন।

"তারপরে যা বলে তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। 'নেতাজীর সঙ্গে আপনাদের তুলনা! তিনি থাকলে সারা ভারত ও সারা বাংলা জয় করে নিতেন। রফা করে ভারতের একাংশ বাংলার একাংশ নয়। আপনারা আপস করছেন।' নাই বাংলার চেয়ে কানা বাংলা ভালো। আপস না করলে এর চেয়ে ভালো বার্গেন পেতেন না। এটা হাতছাড়া করলে পরে পশতাতে হতো। বাট্ অ্যাট্ হোয়াট্ কস্ট্? আপনারা যে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকছেন তার অন্ত কোথায় তা কি ঠাহর করতে পারছেন?' আমিও ভড়কাবার পাত্র নই, দিয়েছি মুখের মতো জবাব। বলেছি, 'সুড়ঙ্গের অন্তে কী? ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ? আমরা তার জন্যে প্রস্তুত হতে চাই বলে টাইম কিনলুম, স্পেস বেচলুম। যেমন লেনিন করেছিলেন ব্রেস্ট লিটোভস্কে সন্ধিসূত্রে। আজ আমরা প্রস্তুত নই, অসময়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে হারব না জিতব কোন্ জ্যোতিষী গণনা করে বলতে পারে? নেতাজী অতুলনীয়। কিন্তু তিনিও কি যুদ্ধে জিতলেন? যেখানে জয় পরাজয় অনিশ্চিত সেখানে এই বার্গেনই বেস্ট বার্গেন। বার্গেন যত ভালোই হোক না কেন তার জন্যে কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। আমরা নাচার হয়ে ছেড়েছি। যেমন লেনিন ছেড়েছিলেন। ইতিহাস আমাদের অপরাধ ক্ষমাও করবে, ভুলেও যাবে।" তিনি আহারে মন দেন।

"তা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধল না, আপনারা বিনা যুদ্ধে পঞ্চগ্রাম সমর্পণ করলেন। এযুগে যার নাম পাকিস্তান।" যূথিকা পরিহাস করে। "আমরা আর একটা মহাভারত হারালুম। না, আপনাদের

কেউ মনে রাখবে না। মনে রাখবে মহাত্মা গান্ধীকে ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে।"

।। উনিশ ।।

পাঞ্জাব থেকে মর্মান্তিক খবর আসতে আরম্ভ করে। সেসব শোনার পর মানস আর স্থির থাকতে পারে না। আবার রাত জেগে পায়চারি শুরু করে। যূথিকা তাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। সুধায়, "তোমার কী হয়েছে, বলো তো?"

"মরাল সিকনেস। কায়িক নয়, মানসিক নয়, নৈতিক অসুখ। এর কোনো চিকিৎসা নেই, জুঁই। আমাকেই আমার ভিতর থেকে প্রতিরোধ শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। 'আপনি অবল হলি যদি, বল দিবি তুই কারে?' কিন্তু কোথায় সেই বল? ভাবছি। পায়চারি করতে করতে ভাবছি।" মানস উত্তর দেয়।

যূথিকা বুঝতে পারে না নৈতিক অসুখ কী ও কেন। জানতে চায়।

"জুঁই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই দুর্ভাগা দেশে বহুবার হয়েছে। তার বেলা কী করতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু এর বেলা আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যা শুনছি তা যদি সত্য হয় তবে একটা সম্প্রদায় আর একটা সম্প্রদায়কে মেরে কেটে, তার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে, তার সম্পত্তি লুটেপুটে, তার নারীদের বেইজ্জত করে তাকে তার জন্মভূমি থেকে বিলুপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। এ দেশ আধ্যাত্মিক দেশ বলে আমরা গর্ব করি। কোথায় থাকে সেই গর্ব? এই যদি হয় ধর্ম তবে অধর্ম কী? এই যদি হয় সভ্যতা তবে অসভ্যতা কী? এই যদি হয় সংস্কৃতি তবে অসংস্কৃতি কী? এই ব্যাধি যখন বাংলাদেশে সংক্রামিত হবে তখন কেমন করে এর সঙ্গে মোকাবিলা করব আমি? আইনে এর কী প্রতিষেধ বা প্রতিকার? এটা একজাতের মাস হিস্টিরিয়া। প্লেগও বলতে পারো।" মানস যতদূর বোঝে।

যূথিকা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। "দুই যমজ শিশু জন্ম নিচ্ছে। নাড়ীর বাঁধন কেটে যাচ্ছে। রক্তস্রাব তো হবেই। এতদিন আমরা যা দেখলুম তা গর্ভযন্ত্রণার পর প্রসবযন্ত্রণা। এখন যা দেখছি তা প্রসবের পর রক্তস্রাব। তুমি কী করতে পারো, আমি কী করতে পারি? নেতারাই বা কী করতে পারেন? করতে পারত ইংরেজ, তাও মার্শাল ল দিয়ে। সাধারণ আইনে কুলোত না। কিন্তু সে তো যাচ্ছে। সে যাচ্ছে বলেই তো এসব ঘটছে। সে না গেলে এসব ঘটত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চাপা থাকত। ঘটে গিয়ে বরাবরের মতো চুকে যাক।"

মানস জবাব দিতে পারে না। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন দিল্লী থেকে চিঠি। সুকুমার লিখেছে, "সহযোগী আর্মিটেজ আমার চেয়ে আরো বেশী ভিতরের খবর রাখেন। তাঁর কাছে শুনলুম মিস্টার জিন্না নাকি পণ করেছিলেন যে পাকিস্তান হাসিল করার জন্যে তিনি দরকার হলে এক কোটি মুসলমানকে স্যাক্রিফাইস করবেন। ওরা যে কেবল হিন্দু ও শিখদেরই মেরে মরত তা নয়, ইংরেজদেরও রেহাই দিত না। ওদের মতো ফ্যানাটিকদের পক্ষে সবই সম্ভব। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। জিন্নার ওস্তাদী। না জওয়াব জিন্না। তাই ইংরেজরা ভয় পেয়ে তাড়িঘড়ি রাজ্য ত্যাগ করে দেয়। কংগ্রেস রাজী না হলেও পাকিস্তান হতো। তবে প্রকারান্তরে। আর লীগ রাজী না হলেও পাঞ্জাব ভাগ, বেঙ্গল ভাগ হতো। তবে প্রকারান্তরে। জিন্না যতটা আশা করেছিলেন ততটা পেতেন না। আর কংগ্রেসও যতটা হারাবে আশঙ্কা করেছিল ততটা হারাত না। মাউন্টব্যাটেনের সাফল্যের গুপ্ত সঙ্কেত তাঁর নিরপেক্ষতার মধ্যেই নিহিত। তিনি কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বিফল হয়েছেন। সেটা শিখদের ক্ষেত্রে। তিনি শিখিস্থান দিতে পারেননি, তার দরুন শিখরা হতাশ। শিখিস্থান না পেলেও পাকিস্তানের মধ্যেই নানকানা সাহেবকে তারা করতে চেয়েছিল তাদের ভ্যাটিকান। মাউন্টব্যাটেন সাহসই পেলেন না জিন্নাকে এ বিষয়ে বলতে। পাছে আবার অপমানিত হন। হয়েছেন তো একবার, যখন জিন্না তাঁকে

পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারল না করে নিজেকেই করেন। শিখরা অবুঝ। তারা মুসলমানদের উপর আক্রোশ মেটাতে গিয়ে মহামারী বাধিয়ে দিয়েছে।"

মানস পড়ে শোনায়, বৃষ্টিকা শোনে। "বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল। যেমন শিখ তেমনি মুসলমান। এক হাতে তালি বাজে না। লেগে গেছে অঘোষিত গৃহযুদ্ধ। এর মধ্যে হিন্দুরাও জড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুও মার খাচ্ছে, মার দিচ্ছে। শুনছি এর প্রস্তুতি চলছিল সাত আট বছর ধরে। মহাযুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেলে পাঞ্জাব হবে কার? হিন্দু না মুসলমানের না শিখের? হিন্দুর, কারণ মুসলিম আমলের আগে হিন্দু আমল ছিল। মুসলমানের, কারণ শিখ আমলের আগে মুসলমান আমল ছিল। শিখের, কারণ ব্রিটিশ আমলের আগে শিখ আমল ছিল। সাত আট বছর ধরে এরা তিন দাবীদার লোহা কিনে নিয়ে হাতিয়ার বানিয়েছে। হাতিয়ার হাতে পাবার জন্যে যুদ্ধের রংরুট হয়েছে। সেই সূত্রে লড়াইয়ের তালিম পেয়েছে। যুদ্ধের পর বেকার হয়ে মারামারির জন্যে সবার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে। যদি কাড়াকাড়ি করে কিছু পাওয়া যায়। মুসলমানরা তবু তো পাঞ্জাবের একাংশ পেয়েছে, শিখেরা কী পেয়েছে? হিন্দুদের সঙ্গে জোট বেঁধে পাঞ্জাবের বাকী অংশ। সেটাও তাদের একার নয়। হিন্দুরাই পাবে তার সিংহভাগ। শিখদের মেজাজ এখন মণিহারা ফণীর। নানকানা সাহেব এখন বিদেশে। সেখানে তীর্থ করতে গেলে ছাড়পত্র লাগবে। ভাবা যায়? মুসলমানের যেমন মক্কা শরীফ শিখের তেমনি নানকানা সাহেব। মক্কা যদি খ্রীস্টানদের দখলে যেত মুসলমানরাও মারমুখো হতো।

ভাই মল্লিক, এর কোনো প্রতিকার নেই। মাউন্টব্যাটেন কল্পনাও করতে পারেননি যে এরকম বিভ্রাট ঘটবে। পাঞ্জাবের গভর্নর জেঙ্কিন্স তাঁকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন যে পাঞ্জাব অবিভাজ্য। ওয়েভেল বেঙ্গল ভাগ করার কথা ভেবে রেখেছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের বেলা তিনি নীরব। অথচ পাঞ্জাব ভাগ না করলে তাঁকে ভারতেই থেকে যেতে হতো। সমস্তটা তো মুসলিম লীগকে দিয়ে যেতে পারতেন না। শিখরা প্রত্যেকটি ইংরেজের গলা কাটত। জিন্নার জেহাদের ভয়ে যদি পাকিস্তান দিতে হয়ে থাকে তো শিখ সর্দারদের ভয়ে পূর্ব পাঞ্জাব দিতে হয়েছে। কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে এই যে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে শিখ আর হিন্দু।

ওদিকে রাজন্যদের কী দুর্দশা! সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, অগ্নিবংশী ক্ষত্রিয় বলে যাঁদের দর্প তাঁরা এখন দিল্লীতে ধর্না দিচ্ছেন পণ্ডিত নেহরু আর সর্দার প্যাটেলের দুয়ারে। বিশেষ করে সর্দার প্যাটেলের। মুখে তিনি বলছেন তিনি রাজন্যকুলের বন্ধু। কাজে কিন্তু তাঁদের প্রজাকুলের স্বজন। রাজন্যরা নামেই রাজা মহারাজা থাকবেন, তাঁদের আসল ক্ষমতা চলে যাবে প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে, তার মানে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে, তার মানে সর্দারজীর হাতে। আপাতত তাঁরা ডিফেন্স ও ফরেন অ্যাফেয়ার্স দিল্লীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। আগে থেকেই ছিল দিল্লীর হাতে। সন্ধিসূত্রে। এবার অ্যাকসেসন সূত্রে। বাদ বাকী ক্ষমতা তাঁদের হাতেই থাকছে, কিন্তু সেটা কাগজপত্রে। সর্বত্র মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। মন্ত্রীরা তাঁদের মনোনীত নন, সর্দারজীর। তার মানে ইংরেজের প্যারামাউন্টসী গেল, কংগ্রেসের প্যারামাউন্টসী এল।

আমি ইদানীং মিলির তদবিরে লেডী মাউন্টব্যাটেনের সৌজন্যে একটা ঠিকে চাকরি পেয়েছি। মাউন্টব্যাটেনরা যতদিন আমি ততদিন, যদি না চাকরিটা পাকা হয়। মিলির পিছুটান আছে। সে এদেশেই থাকবে, ছেলেকে দুন স্কুলে পড়াবে, যদি পণ্ডিতজীর সৌজন্যে তার অ্যাডমিশন হয়। স্বাধীন ভারতে মিলি ওকে জেনারল কি অ্যাডমিরাল বানাবে। এয়ার মার্শাল কেন নয়?"

"ওমা, শান্তিনিকেতন পছন্দ হলো না!" বৃষ্টিকা ঠেস দিয়ে বলে, "এই তোমার বিপ্লবী নায়িকা?"

মানস সহাস্যে বলে, "বিপ্লবের পর বিপ্লবীরাই তো হয় নতুন শাসকশ্রেণী। 'ডটারস অভ্‌ দি আমেরিকান রেভোলিউশনের নাম শুনেছ? আমেরিকার স্বাধীনতা সমরকে বলা হয় আমেরিকান

রেভোলিউশন। বিপ্লবীদের কন্যাদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় ডটারস অভ্ দি আমেরিকান রেভোলিউশন। তাঁদের কন্যারাও হন সেই গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারিণী। উত্তরাধিকারসূত্রে কন্যাদের কন্যারাও, তাঁদের কন্যারাও, কন্যাপরম্পরাক্রমে একালের কন্যারাও সেই আদি গোষ্ঠীর ধারাবাহিনী। এঁদের চেয়ে রক্ষণশীল সেদেশে আর কেউ নয়। আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স, পুলিশ, আদালত, প্রতিনিধিসভা, বড়ো ব্যবসায় সর্বত্র এঁদের অদৃশ্য অঙ্গুলি। সেদেশের মতো এদেশেও একটি নতুন শাসকশ্রেণীর পত্তন হতে যাচ্ছে। একটি নতুন রাজন্যশ্রেণীর। দেড়শো বছর বাদেও এই শ্রেণীর হাতেই শাসনক্ষমতা থাকবে। এঁদের কন্যারাও হবে ঘোর রক্ষণশীল।"

"তা কি কখনো হয়?" যূথিকা মানতে চায় না। "বিপ্লবী বলতে আরো একদলকেও বোঝায়। তারা সমাজতন্ত্রবাদী। মিলি তা নয়। আজ মিলিদের সুদিন এসেছে। ত্রিশ বছর বাদে বাবলীদেরও সুদিন আসতে পারে। মিলিরা বামপন্থী জাতীয়তাবাদী হতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্য দূর না করতে পারলে জনগণ তাদের পরিত্যাগ করবে। তখন সমাজতন্ত্রবাদীরাও একটা সুযোগ পাবে। ত্যাগের ঐতিহ্য থেকে জাতীয়তাবাদীরা যতই সরে যাবে, যতই ভোগবিলাসে আসক্ত হবে, যতই অদের প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবে ততই তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে।"

"অসম্ভব নয়।" মানস স্বীকার করে। "ভারতের সীমান্তের ওপারেই সোভিয়েট রাশিয়া। চীনের বিপ্লবীরা যদি সফল হয় তবে কমিউনিস্ট চীন। এই দুই শক্তির আদর্শ এদেশের জনগণকেও আকর্ষণ করবে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে শুধুমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলেই কংগ্রেস বেশীদিন গণসমাদর পাবে না। তাকে সর্বতোভাবে গান্ধীপন্থী হতে হবে। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র গান্ধীবাদ। কংগ্রেস যদি গান্ধীকে পরিত্যাগ করে তবে জনগণও কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করবে।"

"এইবার তুমি যা বলেছ ঠিক বলেছ। এখন একটু সংসারের দিকে মন দাও দেখি। আর ক'টাই বা দিন বাকী? এর মধ্যে এখান থেকে ঘরকন্না গুটিয়ে নিতে হবে। তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে। কী কী সঙ্গে নেবে? কী কী বিক্রী করবে? কী কী দান করবে?" যূথিকা জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, ভাববার সময় এসেছে। কলকাতা থেকে ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি পেয়েছি। অর্ডার আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে। আমার আদালতের কাজকর্ম আমি গুটিয়ে এনেছি। নাজিরকে বলেছি বিলগুলো একত্র করে নিয়ে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেব। মালপত্র বাঁধাছাঁদার জন্যেও তিনি লোক পাঠাবেন। মালগাড়ী বন্দোবস্ত করবেন, মাল বুক করবেন। পনেরোই আগস্টের আগে তো কলকাতায় যোগ দিতে পারছিনে, পোস্ট খালি হবে না। আপাতত হাওড়ায় যাচ্ছি। পোস্ট খালি। সার্কিট হাউসের জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখেছি। কিন্তু কলকাতায় বাসা কোথায় পাব, কবে পাব, এসব এখান থেকে চিঠি লিখে স্থির হবার নয়। এই ডামাডোলের মধ্যে কে কার জন্যে ভাববে? পূর্ববঙ্গ থেকে একটা বিরাট বাহিনী যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে। হিন্দু অফিসার, কেরানী, পিয়ন, পুলিশ, প্রফেসর। যেন মিলিটারি ইভাকুয়েশন।" মানস বিয়াল্লিশ সালের উপমা দেয়।

বদলীর হুকুম পাওয়ার পর বাবুর্চিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে।

"কলকাতার হিন্দুরা আজকাল অসভ্য হয়েছে, শুনছি। রাস্তার মাঝখানে ওকে দিগম্বর করে চিনতে চাইবে হিন্দু না মুসলমান। তারপর যা করবে তা তুমি অনুমান করতে পারো। আমার সাধ্য নেই যে ওকে আমি বাঁচাই। বাধা দিলে আমাকেই না শ্মশানে পাঠায়।" মানস শিউরে ওঠে।

"তাই যদি হয় তবে ভারতপসন্দ মুসলমানদের তোমরা রক্ষা করবে কী করে? ওরা প্রাণের ভয়ে পাকিস্তানে পালাবে। সেখানে ইসলামপসন্দ মুসলমানরা ওদের মুখ দেখবে না। ওরা হিন্দুরও অধম। কলকাতার হিন্দুদের এসব বোঝা উচিত। এত বড়ো ট্র্যাজেডীতেও ওদের শিক্ষা হয়নি। আরো বড়ো

ট্র্যাজেডী ডেকে আনবে যখন দুই পারের মানুষ প্রাণের মায়ায় এপার ওপার করবে। আর কেউ কেউ হয়তো সম্পত্তির মায়ায় ইসলাম কবুল করবে।" যূথিকা আশঙ্কা করে।

"হ্যাঁ, কলকাতার হিন্দুদের এসব বোঝা উচিত। দেশ ভেঙে গেছে, কিন্তু জাতি ভেঙে যায়নি। জাতিও ভেঙে যাবে, যদি ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিমশূন্য ও পাকিস্তান হিন্দু-শিখশূন্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এ হেন পরিণতি আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। এর কোনো প্রয়োজনও নেই। তা ছাড়া এর শেষ পরিণতি হবে হিন্দু রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে বিশ্ব-মুসলিম পাকিস্তানের পেছনে দাঁড়াবে। হিন্দু রাষ্ট্রের পেছনে দাঁড়াবে কে? একমাত্র নেপাল। ফলাফল হবে আরো বড়ো ট্র্যাজেডী। স্বাধীনতা একটা আশীর্বাদ না হয়ে হবে একটা অভিশাপ।" মানস এ বিষয়ে নিশ্চিত।

নাসেরকে সঙ্গে নেওয়া হবে না শুনে দীপক বিস্মিত হয়। "কেন, নাসেরদা যাবে না কেন? ওর অপরাধটা কী?"

"অপরাধটা ওর নয়, বাবা।" মানস উত্তর দেয়। "কলকাতা এখন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এমনিতেই আমাদের যথেষ্ট ঝুঁকি। নাসেরের ঝুঁকি আরো বেশী। কখন মুখ ফসকে জলকে 'পানি' বলে বসবে আর অমনি মারা পড়বে। বাপুর মিশন যদি সফল হয়, মুসলমানদের প্রাণ যদি নিরাপদ হয় তা হলে পরে আমরা ওর কথা ভাবব। ওকে মাস তিনেকের মাইনে দিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আর কোথাও কাজ পেয়ে যাবে। এখানে না হোক ঢাকায়। সেখানেই হচ্ছে রাজধানী।"

মণিও তার মাকে একই প্রশ্ন করে। "নাসেরদা যাচ্ছে না কেন?"

"দেশ ভাগ হয়ে গেলে নাসেরদা হবে পাকিস্তানী। পাকিস্তানীরা হিন্দুস্থানে বিদেশী। বিদেশীকে কলকাতায় থাকতে দেবে না। ওকে ফিরে আসতে হবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।" যূথিকা দশ বছরের মেয়েকে বোঝায়।

মণি বোঝে না। দুঃখ পায়। দীপক বোঝে। সেও দুঃখ পায়। আরো দুঃখ পায় নাসের। এত ভালোবাসা সে আর কোথায় পাবে?

হিন্দু আমলারা বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসেন না। কারণ তাঁরাও পশ্চিমযাত্রী। মুসলমান আমলারা একে একে আসেন ও দুঃখ প্রকাশ করেন। আর দেখা হবে না। হলেও একে অপরের কাছে বিদেশী। বেশীক্ষণ থাকেন সেরেস্তাদার ওমর আলী খোন্দকার। উদারপন্থী মুসলমান। ব্রাহ্মসমাজে যান। হিন্দুরাও তাঁকে সমীহ করে। পরেন ইউরোপীয় পোশাক।

বলেন, "হিন্দুরা সদলবলে চলে গেলে আপিস আদালত কানা হয়ে যাবে, স্যার। এঁদের জায়গায় যদি বিহার থেকে একদল আসে তবে বারোটা বাজবে।"

মানস তাঁকে আশ্বাস দেয় যে বিহার সরকার কারো উপর চাপ দেবেন না। মুসলমানরাও সমান নাগরিক। উন্নতির আশায় যদি কেউ আসেন সেটা আলাদা। তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

ওমর আলী সাহেব বলেন, "অনুমতি দেন তো নিবেদন করি, হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা ধর্মের ঝগড়া নয়। হিন্দুরাও পীরদের কাছে যায়, মুসলমানরাও জ্যোতিষীর কাছে। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এই সত্যটা একদিন না একদিন মেঘমুক্ত হবে। আমরা হয়তো ততদিন বেঁচে থাকব না। তা হলে এটা কিসের ঝগড়া? এর মূলে কী আছে? এক কথায় বৈষম্য। মোগল আমলে বিস্তর হিন্দু আমলা ছিলেন, কিন্তু মুসলিম আমলাদের স্থান তাঁদের উপরে। সাড়ে পাঁচশো বছর সেইভাবে চলেছিল। আরো দু'শো বছরও চলত, যদি না ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে বসত। ইংরেজ আমলে দেখা গেল হিন্দু আমলারাই উপরে, মুসলিম আমলারা নিচে। এত নিচে যে লোয়ার ডিভিসন কেরানীর পদেও মুসলমানদের দেখতে পাওয়া যেত না পঞ্চাশ বছর আগে। এখনো আপার ডিভিসন কেরানীর পদে মুসলিম সংখ্যা খুব

কম। ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুরাই তাদের শূন্য পদ পূরণ করবে, মুসলমানদের তাতে কী? এই চিন্তা থেকেই এসেছে দেশ ভাগ। কিন্তু প্রদেশ ভাগের কথা মুসলমানদের কারো মাথায় আসেনি। এর জন্য দায়ী হিন্দুরাই। এর জন্যে সাজা পেতে হবে হিন্দুদেরই বেশী। প্রত্যেকেরই জমি আছে, বাড়ী আছে। সেসব তারা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। এপারেই ফেলে রেখে যাবে। সেসব ক্রমে ক্রমে বেদখল হবেই। তখন ওপার থেকে সিংহের মতো গর্জন করবে। ওরাই যেন ব্রিটিশ সিংহের উত্তরাধিকারী, তেমনি বলবান। ফাঁকা আওয়াজ। মরলে মরবে ওপারের মুসলমান, এপারের মুসলমানদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না। অমন করে মানুষের মনে লোভ জাগিয়ে দেওয়াও পাপ। তা ছাড়া জমি অনাবাদী রাখলে ফসলে টান পড়বে। লোকে না খেতে পেয়ে মরবে। কোন্ রাষ্ট্র এটা বরদাস্ত করবে?"

মানস স্বীকার করে যে কথাটা ঠিক। সেইজন্যেই গান্ধীজী বলেছেন যে যেখানে আছে সে সেইখানে থাকবে। তাঁর আবার নোয়াখালী আগমনের উদ্দেশ্যও তাই। একই উদ্দেশ্য কলকাতায় যাত্রাভঙ্গের। জিন্না সাহেবও ইতিমধ্যে মত পালটেছেন। তিনিও লোক বিনিময় চান না।

সেরেস্তাদার মানসকে অনুরোধ করেন একজন চাপরাশিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কলকাতা থেকে ফিরে আসবে। খরচ সরকার থেকে পাবে। চারদিকের অবস্থা থমথমে। কখন কী হয় বলা যায় না। পথে কে জানে কী বিপদ ঘটবে। মানস দ্বিধা করে। তিনি বলেন, "এটা আপনার ন্যায্য অধিকার।"

একজন চাপরাশি যাবে শুনে আব্বাস আলী পা বাড়ায়। এই তার কলকাতা দেখা প্রথম ও শেষ সুযোগ। সে ট্রামে চড়বে, চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখবে। কলকাতায় নাকি বাঘের দুধও কিনতে পাওয়া যায়।

"কলকাতায় আবার দাঙ্গা বাধতে পারে। তোমার ভয়ডর নেই?" নাজির সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

"আমার উর্দি আর চাপরাশ দেখলে গুণ্ডারা ভয় পাবে। এখনো তো ইংরেজ রাজত্ব খতম হয়নি। তার আগেই আমি ফিরে আসব।" আব্বাস বলে।

যূথিকার কষ্ট হচ্ছিল তার মহিলা সমিতির কাটুনী শাখার মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। শাখাটা তারই প্রবর্তন। এরা মাসে মাসে কিছু রোজগার করত। সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? যদি আর কেউ তাদের সহায় না হন?

"দিদি, আবার কবে আসবেন?" জানতে চায় ওরা।

"কী করে আসব? আমি যে বিদেশী।" যূথিকার চোখে জল।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রস্থানের পূর্বসন্ধ্যায় মানস তার ক্লাবে গিয়ে পার্টিং কল করে। সেখানে সেদিন বিলিয়ার্ডস খেলছিলেন কলকাতার কৌসুলি আখতারউজ্জামান। মানসকে দেখে খেলা ছেড়ে আলাপ জুড়ে দেন। বলেন, "জীবনটা আমার তছনছ হয়ে গেল, মিস্টার মল্লিক। ক্যালকাটা হাইকোর্টে আমার প্র্যাকটিস সবে জমতে শুরু করেছিল, এমন সময় এই ব্রেক। ড্যাম ইওর পার্টিশন।"

"আপনাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলের কী হলো?" জানতে চায় মানস।

"জানেন না বুঝি?" তিনি হুইস্কির ছোটা পেগে চুমুক দিয়ে বলেন, "জিন্নার আপত্তি ছিল না। গান্ধীর আশীর্বাদ ছিল। সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। কোয়ালিশনে মুসলিম লীগ নারাজ। সেপারেট ইলেকটোরেটে কংগ্রেস নারাজ। নেহরু তা ছাড়া বাংলাদেশকে বলকান হতে দেবেন না। পাছে চারদিকে বলকানীকরণের ধুম পড়ে যায়। দুই ডোমিনিয়নই ঢের। তৃতীয় কোনো ডোমিনিয়ন গড়তে দেওয়া চলবে না। এখন নেহরুই তো মালিক। তিনি যা করতে বলেন মাউন্টব্যাটেন তাই করেন।"

মানস মাউন্টব্যাটেনের পক্ষ নিয়ে বলে, "তাঁর কথা হলো, যে যুক্তিতে ভারত ভাগ হবে সেই যুক্তিতে বাংলাদেশও ভাগ হবে। ভারতের বেলা এক যুক্তি বাংলাদেশের বেলা আরেক যুক্তি মেনে

নেওয়া যায় না। জিন্না যদি এ যুক্তি না বোঝেন তো ভাগবাঁটোয়ারা না করেই মাউন্টব্যাটেন ভারত ত্যাগ করবেন, আর-কোনো ভাইসরয় তাঁর জায়গায় আসবেন না। ব্রিটিশ শাসনও থাকবে না। তখন বল্লভভাই পাটেলের ভাষায় 'কেওস অ্যাণ্ড অ্যানার্কি'। আমরা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসাররাও তার আঁচ পাচ্ছিলুম। মাউন্টব্যাটেনের কাছে আমাদের রিপোর্টও পৌঁছচ্ছিল। তিনি যে শুধু নেহরুর কথাই শুনছেন তা নয়, আমাদের কথাও শুনছেন। আমরা চাই একটা সেটলমেণ্ট। তা সে ভাগবাঁটোয়ারা করে হোক আর না করেই হোক। ভাগবাঁটোয়ারার জন্যে পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মাউন্টব্যাটেনও নন, ব্যুরোক্রাটরাও নন। আর পলিটিসিয়ানদের পেছনেই তো জনতা।"

অর্ধেক কথা মিস্টার জামানের কানে যায় না। তিনি আপনার চিন্তায় বিভোর। বলেন, "জীবনটা আমার তছনছ হয়ে গেল। তবে ঢাকা হাইকোর্টে তেমন কোনো প্রতিযোগিতা থাকবে না। অনায়াসে উপরে উঠতে পারব। রুটিও কিছু জুটবে। কিন্তু, জানেন তো, 'ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এলোন'। ব্রেডের সঙ্গে ওয়াইনও চাই। এই মুসলমানের রাজ্যে আমি ওয়াইন পাব কোথায়? এই ক্লাবও তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রাণভরে পান করছি।"

মানসের হাসি পায়। সে জিজ্ঞাসা করে, "প্রতিযোগিতা থাকবে না কেন? মীর আবদুল লতিফও কি আসবেন না?"

"না, মিস্টার মল্লিক। তিনি মরে গেলেও কলকাতা ছাড়বেন না। এতকাল ন্যাশনালিস্ট থেকে, স্বরাজের জন্যে জেল খেটে, তিনি পাকিস্তানের জন্যে ভোল পাল্টাবেন না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যেদিকে তিনিও সেদিকে। ভারতে চার কোটি মুসলমান পড়ে থাকবে। তিনিও তাদের একজন দুর্দিনের সাথী। তাদের ফেলে পাকিস্তানে চলে আসা তাঁর মতে গুনাহ্।" জামান সাহেব বলেন।

মানস শুনে মুগ্ধ হয়। বলে, "তাঁর দিক থেকে সেটাই ঠিক। ভয় নেই, মদও বন্ধ হবে না, ক্লাবও বন্ধ হবে না। মদ মোগল আমলেও ছিল। পাকিস্তানী আমল তো মোগল আমলেরই নবপর্যায়। আমার শুভেচ্ছা রইল। খোদা হাফেজ।"

এর পরে সে যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে।

ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ দিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে রাজী হয়ে গেছে। তাঁরা ভারত কিংবা পাকিস্তান যে কোনো এক সরকারের কাছ থেকে যে যার সুবিধা অনুসারে পাবেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নয়। এটা একটা ত্রিপাক্ষিক বন্দোবস্ত। ভবিষ্যতে ভারত বা পাকিস্তান এর খেলাপ করতে পারবে না। মানস যদি চায় সেও ভারত কিংবা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে পেনসন পেতে পারবে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কারো কাছ থেকে নয়। একযাত্রায় পৃথক ফল। ইউরোপীয়দের জন্যে এক বন্দোবস্ত, ভারতীয় বা পাকিস্তানীদের জন্যে অন্য বন্দোবস্ত। মানস মনে মনে স্বীকার করে যে নিজের দেশের সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করা অন্যায়। বড়ো জোর পেনসন দাবী করা যায়। অকালে অবসর নিলে আনুপাতিক পেনসন।

জেলা শাসক রিকম্যানের চাকরি আরো কম দিনের। তিনিও পাবেন আনুপাতিক পেনসন। সেই টাকায় সংসার চালাবেন কী করে? দেশে ফিরে গিয়ে অন্য এক চাকরি খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু সেখানে তাঁর মুরুব্বির জোর নেই। আজেবাজে চাকরিও তিনি চান না। এই যেমন ম্যাঞ্চেস্টার পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান পদ। কিন্তু এতকাল দাপটের সঙ্গে ভারত শাসন করার পর ওটা কি একটা অ্যান্টিক্লাইমাক্স হবে না?

"আপাতত নিউজীল্যাণ্ডেই আমি যাচ্ছি। আমার স্ত্রী সেই দেশের মেয়ে। তিনি আমার আগেই গেছেন। দেখা যাক বরাতে কী আছে। আমি খুব একটা আশাবাদী নই, জজ।" রিকম্যান বলেন।

লোকটি কেবল কর্মপটু নন, নিয়মিত পড়াশুনা করেন। তাঁর নিজেরই এক প্রাইভেট লাইব্রেরী।

বিচিত্র পুস্তকসংগ্রহ। মানস মাঝে মাঝে ধার করে পড়ে। তিনি বিক্রী করতে নারাজ। নইলে মানস খানকয়েক কিনত। বাজারে দুষ্প্রাপ্য।

কথাপ্রসঙ্গে ব্রিকম্যান বলেন, "পাকিস্তান কি জিন্নার কথায় হয়েছে? তার পেছনে আছে ব্রিটিশ মিডল ইস্টার্ণ পলিসি। মিডল ইস্টের মুসলিম দেশগুলিকে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে হলে সেসব দেশের মুসলমানদের সেন্টিমেন্ট গণ্য করা চাই। নইলে মিডল ইস্ট থেকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে। তাছাড়া ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণের পর প্রয়োজন হলে পাকিস্তানী সৈন্যই তো ভরসা। ভারতীয় সৈন্যরা ভারতের বাইরে কোথাও যাবে না। এটাই গান্ধী, নেহরু, পাটেলের পলিসি। জিন্নার পলিসি তেমন নয়। পাকিস্তানী সৈন্য মিডল ইস্টের যে কোনো দেশে যেতে পারবে। সেটা মুসলিম স্বার্থও বটে। প্যান-ইসলামিজম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। আর যা দেখেছেন তা বাহ্য। ব্রিটেনের পক্ষে পাকিস্তানই সুবিধের।"

মানস দুঃখ পায়। বলে, "তা হলে ব্রিটেনই নাটের গুরু?"

"না, না, বিশ্বাস করুন। ভারত ছেড়ে যাবার সময় আমাদেরি হাতে গড়া ভারতকে আমরা টুকরো টুকরো করে যেতে চাইনি। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ হলে আমাদের আর কিছু করবার থাকে না। বলা বাহুল্য লীগকে অন্যভাবে তুষ্ট করলে মুসলিম লীগই ব্রিটিশ স্বার্থের পাহারাদার হতো। প্রয়োজন হলে সৈন্য সরবরাহ করার জন্যে চাপ দিত। মিডল ইস্ট সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত থাকতুম। ভাবী মহাযুদ্ধ সম্বন্ধেও, যদি বাধে। আমাদের মনে এককোঁটাও হিন্দুবিদ্বেষ নেই। মুসলিম প্রেমে যে আমরা অন্ধ তাও নয়। লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেন্ডস।" তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দেন।

মানস জোরসে নাড়া দিয়ে বলে, "নট অ্যাজ রুসার্স অ্যাণ্ড রুসাড।"

পরের দিন সন্ধ্যায় ট্রেন। স্টেশনে পৌঁছে মানস শোনে পনেরো মিনিট লেট। ওয়েটিং রুমে যূথিকা, দীপক ও মণিকাকে বসিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়ায়। তার সঙ্গে যোগ দেন বঙ্কিমবাবু, তাঁর হাতে ফুলের তোড়া। বলেন, "পুনর্দর্শনায় চ।"

"পুনর্দর্শনায় চ।" মানস প্রতিধ্বনি করে। "আবার দেখা হবে বইকি। কিন্তু পাকিস্তানে নয়। এখানে আমি বিদেশী।"

"তা হলে কোথায়? ভারতে? সেখানে যে আমিও বিদেশী।" তিনি করুণ স্বরে বলেন। "বোধহয় তৃতীয় কোনো দেশে, যেখানে আমরা উভয়েই বিদেশী। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সেইযুগ যে যুগে আমরা দু'জনেই এক দেশে স্বদেশী ছিলুম।"

"আপনি কি মনস্থির করেছেন যে পাকিস্তানেই চিরজীবন থাকবেন? ভারতে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হবেন না?" মানস জিজ্ঞাসু।

"আমিই হব শেষতম সেই হিন্দু পূর্ববাংলার মাটিকে যে 'মা'টি বলে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর সকলে চলে গেলেও আমি অচল। কে আমার কী করাতে পারে? রাখবে তো জেলে। তার জন্যে আমি সাতাশ বছর ধরে সদা প্রস্তুত।" বঙ্কিমবাবু বলেন।

তাঁর ওই জীর্ণ শীর্ণ চেহারা দেখে মানসের বিশ্বাস হয়। বার বার জেল খেটে তিনি যে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছেন। মানস বলে, "না, না, জেলে রাখবে না। কেনই বা রাখবে? আপনি তো পঞ্চম বাহিনীর একজন নন। অহিংসাবাদী গঠনকর্মী। বাপুও তো বলেছেন তিনি আজীবন নোয়াখালীতে থাকবেন।"

ট্রেন এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওঠে উৎকট আওয়াজ ও উন্মত্ত হল্লা। ট্রেনের একটা কামরা লক্ষ করে ছুটতে থাকে শত শত মানুষ। সবাই কি সেই কামরায় উঠবে?

সেরেস্তাদার ওমর আলী সাহেব মানসের খোঁজে আসেন। বলেন, "ও কিছু নয় স্যার। নতুন স্টেশন মাস্টার এই ট্রেনে এলেন। এই প্রথম একজন মুসলমান এই প্রাইজ স্টেশনের ভার পেলেন।

আশি বছর ধরে এটা ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একচেটে। সেই শর্তে মহারাজা জমি দিয়েছিলেন। ও যা শুনছেন তা বোমার আওয়াজ। গান স্যালিউট। সরকার থেকে নয়, পাবলিক থেকে।"

মানস তো চিন্তিত। তার খেয়াল হয় এই সেদিন তার অধীনস্থ চণ্ডীপুর চৌকীতে একজন মুসলিম মুনসেফ নিযুক্ত হয়েছেন। একদিন সেটা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটে। সেই শর্তে অপর এক মহারাজা বাড়ী ভাড়া দিয়েছিলেন।

"নেমেসিস।" তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। বঙ্কিমবাবু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান। মানস বোঝায়, "অন্যায়ের প্রতিকার একভাবে না একভাবে হয়। তার জন্যে দেশ ভেঙে যায়, প্রদেশ ভেঙে যায়, মানুষ মরে, মানুষ পালায়, মানুষ তার পূর্বপুরুষের ভিটা হারায়।"

ট্রেন ছেড়ে দেয়। কামরায় আর কোনো যাত্রী ছিলেন না। ওরা চার জনে যে যার বার্থে পা মেলে দেয়। দীপক ও মণিকা ঘুমিয়ে পড়ে। মানস ও যূথিকা জেগে থাকে। পদ্মা পার হবার সময় মানস বলে, "পদ্মা এক পাড় ভাঙে, আরেক পাড় গড়ে। ইতিহাসও তেমনি। ভারত না ভাঙলে পাকিস্তান গড়া হয় না। তাই সে ভারত ভাঙে। বাংলাদেশ না ভাঙলে পশ্চিমবঙ্গ গড়া হতো না, তাই সে বাংলাদেশ ভাঙে। স্বপ্নভঙ্গ হয় গান্ধীর, তা না হলে জিন্নার স্বপ্ন সার্থক হতো না। পদ্মা নির্বিকার। ইতিহাসও তেমনি। কিন্তু এই শেষ নয়। এর পরে আরো আছে। বিচ্ছেদ থেকে আসবে বিরহ। বিরহ থেকে মিলন।"

॥ বিশ ॥

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে যূথিকার প্রথম কথা, "চল, নন্দন ও নন্দিনীকে দেখতে যাই।" তার মানে জুলির বাচ্চা দুটোকে।

"চাচী, আপনি বাঁচি!" মানস বিরক্ত হয়ে বলে, "আগে তো নিজের বাচ্চাদুটোকে বাঁচাও। কলকাতা এখন কুরুক্ষেত্র।"

প্ল্যাটফর্মে কেউ রিসিভ করতে আসেনি, কিন্তু বাইরে যেতেই পুলিশের লোক সেলাম করে। ব্ল্যাক মারিয়া না কী বলে ওকে। বন্ধ ভ্যান। ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাতে হয়। সামনে ও পেছনে সশস্ত্র পুলিশ গার্ড ভদ্র পরিবারকে নিয়ে যায় চোর ডাকাতের মতো। অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দেয় হাওড়া সার্কিট হাউসে।

সেখানে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশ বন্ধু ফিদা হোসেন। তিনিই পুলিশ থেকে যানের ব্যবস্থা করেছিলেন। মানস তাঁকে ধন্যবাদ দেয়। সার্কিট হাউসটা মানসের নামে রিজার্ভ করা হয়েছে দেখে তিনিই পুলিশ ওয়্যারলেসে মেসেজ পাঠান, যাতে সে তাঁকে একদিনের জন্যে সেখানে একটু ঠাঁই দেয়। তার মেসেজ পেয়ে সেও মেসেজ পাঠায় তিনি যেন তার জন্যে যানের ব্যবস্থা করেন। এই হলো ইতিহাস। জীবনে কে যে কখন কোন্ কাজে লাগে তা কে বলতে পারে? সাধারণ ট্যাক্সি সে সময় নিরাপদ নয়। খুনোখুনি থামেনি। গান্ধীজী আসছেন আসন্ন মহামারী নিবারণ করতে। গভর্নর তো যাবার মুখে। পুলিশেও অদলবদল।

ফিদা হোসেন বলেন, "আমি এখন হোমলেস, মিস্টার মল্লিক। পরিবারকে ঢাকায় রওনা করে দিয়ে কলকাতায় কোয়ার্টার্স খালি করে দিয়েছি। খালি পেয়ে এই সার্কিট হাউসেই উঠেছিলুম, কিন্তু শুনি এটা আপনার জন্যেই রিজার্ভড। তাই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। একখানা ঘরই যথেষ্ট।"

মানস খোশ মেজাজে বলে, "একখানা কেন, দু'খানা নিন।"

"নো, থ্যাঙ্কস। কালকেই আমার ভারী মালপত্তর রওনা হয়ে যাবে। ভাঙা মাসের মাইনেটাও কালকেই পেয়ে যাব। কালকেই হিন্দুস্থান থেকে চির বিদায়।" তাঁর কণ্ঠস্বরে খেদ। হিন্দুস্থান থেকে

মুসলিম অফিসারগণের ঐতিহাসিক এক্সোডাস।

সার্কিট হাউসে পুলিশ পাহারা ছিল। পরিবারকে সেখানে নজরবন্দী রেখে মানস যায় আদালতে চার্জ নিতে ও তার পরে সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে তার পরবর্তী পদের ও বাসস্থানের খোঁজখবর নিতে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ লোকারণ্য। সাহেবরা না থাকায় পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে, তাই যারা কখনো ঢুকতে পারত না তারাও ঢুকে বারান্দা গুলজার করছে। থেকে থেকে এঁর ওঁর ঘরে ঢুকে তদ্বির। বড়ো বড়ো রাঘব বোয়ালদেরও চুনোপুঁটির হাল। কেউ কেয়ার করে না কার কী মর্যাদা। গোটা পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু কর্মচারীকুলের এক্সোডাস। থুড়ি, মাগরিবি পাকিস্তান থেকে। অফিসার, কেরানী, পিয়ন ঘেঁষাঘেঁষি করে চলাফেরা করছিল।

ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল একজনমাত্র ইংরেজকে। মানসের একই বছরের সহযোগী। এই সেক্রেটারিয়াটেই একদা ইনি সেলাম কুড়িয়েছেন। এখন এঁকে ঘণ্টা কয়েক ধরে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কে একজন কেরানীবাবু। তাঁর হাত থেকে লাস্ট পে-সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ইনি কেনিয়ায় না নাইজেরিয়ায় পাড়ি দেবেন। ভারত থেকে ইউরোপীয় অফিসারবৃন্দের ঐতিহাসিক এক্সোডাস।

একই কালে তিন তিনটে এক্সোডাস দর্শনের সুযোগ কম ভাগ্যে মেলে। তিনটে স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম ভেঙে আবার তিনটি ধারা ত্রিপথগামী হলো।

একজন মুসলিম আণ্ডার-সেক্রেটারি তখনো চার্জ দেননি। ফাইল নিয়ে বসেছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন হিন্দু অফিসার তাঁদের নিয়োগের আদেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। মানস ঘরে ঢুকে শুনতে পায় তিনি বলছেন, "হোয়াট আ ফল, মাই কানট্রিমেন!" তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। মানসেরও মন কেমন করে। আর ক'দিন বাদে আর 'মাই কানট্রিমেন' বলতে পারা যাবে না। কত বড়ো পতন।

বাসার জন্যে সেক্রেটারিয়াটের অন্য এক কক্ষে যায়। তার বন্ধু পালিত বলেন, "বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। এর মধ্যেই সব ক'টা বাড়ী বিলি হয়ে গেছে। খালি আছে মাত্র দুটো। একটা টালিগঞ্জে। সেটা দূরে। আর একটা বালিগঞ্জে। এটাই সুবিধের, কিন্তু দু'দিন আগে বর্ডারলাইনে খুন হয়ে গেছে। রক্তের দাগ এখনো শুকোয়নি। কাছেই সাপের গর্ত। শত শত সাপ। আপনার যদি সর্পভীতি না থাকে তবে আপনি সেই বাড়ীতে গিয়ে পুলিশ পাহারায় বাস করতে পারেন। আর নয়তো —"

মানস এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে বালীগঞ্জের বাড়ীটাই তার নামে বুক করে। কারণ সেটা স্বপনদার বাড়ীর খুব কাছে। সাপ কলকাতায় কোন্‌খান থেকে এল তা অবশ্য সে বুঝতে পারে না। বন্ধুর দিকে তাকায়। তিনি বলেন, "এতদিন মানুষ বলেই জানতুম। ষোলই আগস্টের দিন দেখি মানুষ নয়, সাপ।"

মানস যায় বাড়ী দেখতে। তার পূর্ববঙ্গের কুঠির আউটহাউসও এর চেয়ে বড়ো। তা হলেও কলকাতা শহর আর খানদানী মহল্লা। এই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে। সে স্বপনদার সন্ধানে যায়।

কোলাপসিবল আয়রন গেট। সামনে গুর্খা দারোয়ান। সে চ্যালেঞ্জ করে। মানস বলে, "ফ্রেণ্ড।" তখন দারোয়ান তার হাতে একটা স্লিপ বই দিয়ে পূরণ করতে বলে। মানস হাঁক ছাড়ে, "রামধীন।" অমনি বেয়ারা ছুটে এসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করে। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে গিয়ে মানস দেখে আবার এক কোলাপসিবল আয়রন গেট। "বৌদি" বলে ডাক দিতেই তিনি বেরিয়ে এসে গেট খুলে দেন। সেই শেষ নয়। আরো এক কোলাপসিবল আয়রন গেট। সেটা স্বপনদার স্টাডির। "স্বপনদা" বলে ডাক দিতেই সেটাও চিচিংফাঁক হয়।

"এ কে? তুমি! মানু!" স্বপনদা কোলাকুলি করে ভিতরে টেনে নিয়ে যান। "দেখছ তো বাঙালীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বাঙালীকে গুর্খা পুষতে হচ্ছে। বাঙালীরা এক আত্মঘাতী জাতি। পরকে আপন করতে জানে না, আপনকে পর করতে জানে। বুঝতে পারছি আমরা মূলত বাঙালী নই, বঙ্গভাষী

হিন্দু ও মুসলমান। দুর্যোগের আলোর এটা একটা রিভিলেশন।"

মানস জানায় সে এ পাড়ায় বাসা পেয়েছে। কলকাতায় চাকরি।

"বাঃ। তা হলে আর দেরি কেন? ঝটপট এসে পড়ো। গোলমাল তো মিটে আসছে। তবে পনেরোই আগস্ট ভালোয় ভালোয় পার না হলে বিশ্বাস নেই। সেদিন শুনছি হিন্দুরাই মুসলমানদের উপর শোধ তুলবে। ইংরেজ তো থাকবে না, কোন্ বাবা বাঁচাবে? তাই শহীদ গিয়ে গান্ধীজীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। বলেছে, কলকাতা একটা অগ্নিকুণ্ড। তার উপর এক কলসী পানি ঢালুন। ছায়ামন্ত্রীরা প্রকৃতপক্ষে কায়ামন্ত্রী হয়েছেন। শহীদ এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। গভর্নরেরও সে গুমর নেই। তিনি এখন মানে মানে সরে পড়তে পারলেই সুখী হন। এখন হিন্দুরাই তুঙ্গে।" স্বপনদা উদ্বিগ্ন।

মানস জানতে চায় মীর সাহেবও কি নিরাপদ। না তিনিও মানে মানে সরে পড়বেন। স্বপনদা বলেন, "না, তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ছাড়বেন না। টুকটুক আর তার দলবল তাঁর বাড়ীঘর পাহারা দিচ্ছে। হিন্দুরাই সেসব দখল করতে চায়। চকোলেট আর তার দলবল অন্যত্র পাহারা দিচ্ছে। হিন্দুরাই সর্বত্র অ্যাগ্রেসিভ।"

ফলের রস খেতে খেতে মানস সুধায়, "বৌদি, আপনিও কি আপনার দলবল নিয়ে আপনার চেনা মুসলমানদের রক্ষা করছেন?"

বৌদি ফিক করে হাসেন। "হ্যাঁ, আমিও রক্ষা করছি বইকি। আমি যাঁকে রক্ষা করছি তিনি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। অথচ মুসলমানদের হাত থেকে তাঁর সুরক্ষার জন্যেই কোলাপসিবল আয়রন গেট, গুর্খা দারোয়ান, স্টেন গান। তারপর তিনি কি শুধু একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান? তিনি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজও বটে। তাঁর স্বজাতি তাঁর সুরক্ষার জন্যে গোরা সৈনিক পাঠায়নি বলে তাঁর কী অভিমান। এমন কী, গোরা সার্জেন্ট পর্যন্ত আসে না। সবাই এক একটি চাচা। যাদের নীতি আপনা বাঁচা। তা হলে ইনিই বা আপনাকে বাঁচাবেন না কেন? তাই এটা তাঁর আপন খাঁচা।"

মানস হাসি চাপতে পারে না। স্বপনদার দিকে তাকায়। তিনি ধরা গলায় বলেন, "মানু, এটা হাসির ব্যাপার নয়। আমার পক্ষে জীবন মরণের ব্যাপার। আমি যার ধ্যান করেছিলুম তা ইস্ট ওয়েস্ট সীন্থেসিস। কিন্তু ওয়েস্ট যদি চলেই গেল তবে ইস্টের সঙ্গে সিন্থেসিস হবে কী করে? বিরোধ থেকেও সিন্থেসিস হতে পারে। কিন্তু বিচ্ছেদ থেকে নয়। তারপর আমার আরো একটা ধ্যান ছিল। সেটা হিন্দু মুসলিম সীন্থেসিস। মুসলমানরা যদি চলেই গেল তবে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সীন্থেসিস হবে কী করে? আবার বলি, বিরোধ থেকেও সীন্থেসিস হয়। কিন্তু বিচ্ছেদ থেকে নয়। আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে। বৃথাই আমার নাম স্বপনমোহন। তাই আমার জীবনও ব্যর্থ হয়েছে। এখন এ জীবনের অর্থ কী? শুধুমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থ দিয়ে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে সন্তোষ? আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট এসেছে। কোন্ দিকে টার্ন করব বলতে পারো।"

মানস সহসা এর উত্তর খুঁজে পায় না। বৌদির দিকে তাকায়। বৌদি গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, "আমিও কি জানি? আমারও তো কত আশা ছিল। স্বাধীনতা বলতে বোঝাবে এক সুখস্বর্গ। কিন্তু চারিদিকে যা দেখছি তাতে সুখের ভাগ কতটুকু? মুসলমান প্রতিবেশীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে নতুন গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী সকলেই যাতে আছেন। মুসলিম সংখ্যা কম বলে মুসলমানদের ওজন কম নয়। মৌলানা আজাদ একাই একশো। জিন্না সাহেব থাকলে তিনিও হতেন একাই এক হাজার। প্রভাব কি সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়? মীর সাহেবকে পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী করা উচিত ছিল। তা হলে মুসলিম সাধারণের আস্থা জন্মাত। আমার তো কোনো ভয়েস নেই। আমি চীৎকার করলেও কেউ কান দেবে না। আমার চেনা মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে আমি কীই বা করতে পারি? তবে টুকটুক করছে। বাবলী করছে। জুলিও করত, যদি

তার বাচ্চা দুটোকে মাই দিতে না হতো।"

"নিজে মাই দিয়েছে?" মানস অতটা প্রত্যাশা করেনি।

"নিজে না দিলে আর কে দেবে, বলো? দুধ মা? ওসব জমিদারবাড়ীতে দেখা যেত। জমিদারপত্নীরা তাঁদের রূপযৌবন বাঁচাতে তৎপর ছিলেন। বাচ্চা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমরা আধুনিকারা ফীডিং বটল পছন্দ করি। জুলিকে আমি ফীডিং বটল দিয়ে এসেছি। কিন্তু সে বলে অতে মাতৃত্বের সুখ পাওয়া যায় না। শোন কথা। অমন করলে কি ব্রেস্টের শেপ থাকে? ওই ফীডিং বটলই একালের দুধ মা। জুলি মেয়েটা দু'দুটো বাচ্চাকে মাই দিতে দিতে পেত্নী বনে যাবে। ওকে উদ্ধার করতে হবে। যূথিকা যদি একবার বলে।" বৌদি ফরমাস দেন।

মানস মুচকি হাসে। "আমাদের ছেলেমেয়ে মায়ের দুধ খেয়েছে।"

ফীডিং বটলের প্রসঙ্গ শুনে স্বপনদা বলেন, "জামালকে বিদায় দেবার পর থেকে আমার কষ্টের সীমা নেই। ওকে আমি চন্দননগর থেকে ফরাসী রান্না শিখিয়ে এনেছিলুম। ও ছিল পয়লা নম্বর ফরাসী শেফ। শেখ জামাল নয়, শেফ জামাল। আমরা ওকে হিন্দুস্থান পার্কে নিয়ে যেতে পারিনে, সেখানে ওর জীবন বিপন্ন। ওর জন্যে আমাদেরও। মুর্শিদাবাদ শুনছি পাকিস্তানে পড়েছে। ওর নিবাস নূরপুরে আমার মামাদের জমিদারিতে। এদিকে আমার দশা দ্যাখ। আমাকে ফীড করে কে? কোথা থেকে এক ঠাকুর জোগাড় করা হয়েছে। ওর রান্না ঠাকুর দেবতাদেরই মুখে রুচতে পারে। আমি তো ঠাকুর কি দেবতা নই। ওর হাতে খেতে খেতে আমার অগ্নিমান্দ্যের উপক্রম হয়েছে।"

"ও ঠাকুর আমার বাপের বাড়ীর ঠাকুর। ওর মতো রাঁধুনি সারা কলকাতা শহরে নেই। ওকে আমি ছাড়িয়ে দিতে রাজী আছি। কিন্তু জামালকে বহাল করতে অক্ষম। পাড়ার ছেলেরা ওকে সাপের মতো সাফ করবে। আমরা যদি বাঁচাতে যাই আমরাও মরব।" বৌদি সন্ত্রস্তভাবে বলেন।

"তা হলে, মানু, দেখছ তো দেশের অবস্থা। এটা কি একটা সভ্য দেশ? মানুষকে সাপের মতো সাফ করবে। এ দেশ কখনো সেকুলার হবে? জবাহরলাল বললেই হলো। ষোলই আগস্ট একটা সেট-ব্যাক হয়ে গেছে। পনেরোই আগস্ট যদি সেট-ফরওয়ার্ড না হয় তবে এ দেশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যাবে। তখন কি দেশ স্বাধীন ছিল না? স্বাধীনতাই কি সব? চাই প্রগতি। ইংরেজরা আমাদের প্রগতি বিধান করেছে। সেটাও তো কম মূল্যবান নয়।" স্বপনদা নিঃসন্দেহ।

"তোমার বোন বাবলী তো বলে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। তোমারও কি সেই মত? এ স্বাধীনতা মূল্যহীন?" দীপিকাদি জেরা করেন।

"না, না, মূল্যহীন কেন হবে? এর জন্যে কম মূল্য দিতে হয়নি। গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, আজাদ কি কম ত্যাগ করেছেন? আর আমাদের সৌম্য? চকোলেট তাদেরই একজন যারা বলে সোভিয়েট রাশিয়াই তাদের ফাদারল্যাণ্ড। ফাদারল্যাণ্ডের মুক্তি তাদের কাছে সাচ্চা। মাদারল্যাণ্ডের মুক্তি তাদের ভাবনা নয়, তাই স্বদেশের স্বাধীনতা তাদের কাছে ঝুটা। মানু, তুমি কী বলো?" স্বপনদা মানসের দিকে তাকান। "ভাঙা বাংলায় কি কখনো বিপ্লব হতে পারে?"

"এ অঙ্গুর খাট্টা হ্যায়।" মানস বিকৃত মুখভঙ্গী করে।

"শেয়াল যা বলেছিল।" বৌদি হাসেন ও হাসান।

স্বপনদা দার্শনিকতা করেন। "মহামায়ার মায়া! ষোলই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন। পনেরোই আগস্ট দেশ দু'ভাগ ও ব্রিটিশ অপসরণ। বলতে পারো জিন্নার ওস্তাদী। ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। তিনি ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু না করলে কি পার্টিশন হতো? আর পার্টিশন না হলে কি দেশ স্বাধীন হতো? গান্ধীজী বলেন, "কুইট ইণ্ডিয়া।" জিন্না সাহেব বলেন, "ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট।" দু'জনের মধ্যে জিন্নারটাই ফলেছে। কিন্তু আমার মতে কারণ থেকে কার্য নয়, কার্যের জন্যেই কারণ। এক নির্ধারিত পরিণাম

ঘটনাবলীকে করেছে চুম্বকের মতো আকর্ষণ। জিন্নাই বলো, গান্ধীই বলো, নেহরুই বলো, মাউন্টব্যাটেনই বলো, সকলেই নিমিত্তমাত্র। ইনস্ট্রুমেন্ট অভ্ ডেস্টিনি।"

"আর তুমি কিসের নিমিত্তমাত্র? এই বিরাট বিষয় নিয়ে একটি বিরাট উপন্যাসের? ট্র্যাজেডী আর কমেডী মিলে ট্র্যাজি-কমেডীর?" মানস জিজ্ঞেসা করে।

"আমি দেখে যাচ্ছি। আমি দর্শক। মহামায়ার মায়া এসব। যার রহস্যভেদ করতে পারছিনে। তাই লিখছিনে।" স্বপনদার কৈফিয়ৎ।

মানস সেবার তর্ক করেছিল। এবার করে না। প্রসঙ্গ পালটে দেয়। জানতে চায় স্বপনদার হাত পায়ে কাঁপুনি আছে না গেছে।

"জলের মাছ ডাঙায় গেলে ছটফট করে। জলে ফিরে এলে তা করে না। আমিও আমার মানস সরোবরে ফিরে এসেছি। নিয়মিত অবগাহন করছি, সন্তরণ করছি। এই লাইব্রেরীই হচ্ছে আমার মানস সরোবর। আর আমি এই সরোবরের মরাল। হাত পা কাঁপছিল হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হয়ে। এখন আর কাঁপে না, তবে আবার কাঁপবে যদি প্রাণের দায়ে আবার পালাতে হয়।" স্বপনদা আশঙ্কা করেন।

"আর পালাতে হবে না।" অভয় দেন তাঁর তারিণী। "র‍্যাডক্লিফ আমাদের কলকাতা না দিয়ে পারবেন না। যদি বেইমানী করে পাকিস্তানকে দেন তবে আমরা সিভিল ওয়ারের ডাক দেব।"

"তা হলে আবার আমার হাত পা কাঁপবে, রানু।" স্বপনদা আর্ত স্বরে বলেন।

"না, তোমাকে আমি লাইব্রেরী থেকে সরাব না। ওইখানেই তালাবন্ধ করে রাখব। কলকাতা জিতে নিতে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। যদি প্রতিরোধ আসে। আসবে না, আশা করি।" বৌদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"র‍্যাডক্লিফ অমন কোনো উপলক্ষ দেবেন না, বৌদি। কলকাতা পাচ্ছে বলেই কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিচ্ছে। এর মধ্যেই কলকাতার পুলিশ পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেছে। মুসলিম অফিসাররা পাকিস্তানে চলে গেছেন। অস্ত্রশস্ত্র সমেত। চেয়ার টেবিলও সঙ্গে নিয়ে। যে দু'একজন আছেন তাঁরাও যাবার মুখে। ইংরেজ দেখলুম একজনমাত্র, তিনিও যাত্রী। হাঁ, লাট সাহেব এখনো রয়েছেন, কিন্তু তিনিও সাক্ষীগোপাল। তবে তাঁর পরেই প্রাধান। তিনি বিশ্বাস করেন না যে আমরা বাঁচতে ও বাঁচাতে পারব। এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যে গান্ধীজী তাঁর নোয়াখালী যাত্রা ভঙ্গ করেছেন। স্বাধীনতা দিবস রক্তপাতে কলুষিত হবে না। হলে আমরা বাপুকে হারাব।" মানস কাতর স্বরে বলে।

"আমরাও কি হারাতে চাই? তা বলে আমরা হারাতেও চাইনে। মনে রেখো এটা একটা লড়াই। ওরা লড়কে নিয়েছে পাকিস্তান, কিন্তু লড়কে নিতে পারেনি কলকাতা। এটাও যদি লড়কে নিতে যায় তবে রক্তপাত অনিবার্য। ওরা তো একদিন আগে স্বাধীন হচ্ছে। কী মজা। দিল্লীর বদলে করাচী পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম।"

এটা স্থির হয় যে পনেরোই আগস্ট ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে পরে মানস সপরিবারে তার নতুন বাড়ীর দখল নেবে। সেদিন আহারের নিমন্ত্রণ রইল। পরে একদিন সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যাওয়া যাবে।

সার্কিট হাউসে ফিরতেই যূথিকা জানতে চায়, "এত দেরি কেন?"

"স্বপনদাদের সঙ্গে দেখা করে এলুম। একই পাড়ায় থাকেন। বাড়ীটা বর্ডার লাইনে। তাই কেউ এখনো দাবী করেনি। সাপের উপদ্রব শুনে পেছিয়ে গেছে। অর্থাৎ গুণ্ডা মুসলমানের। পনেরো তারিখটা দেখে খোলই আমরা যাচ্ছি। সেদিন বৌদির নিমন্ত্রণ। পরে একদিন সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যাওয়া যাবে। এই ক'টা দিন সবুর করো।" মানস সাধে।

"এখানে নজরবন্দী হয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা অস্থির। যে যাই বলুক আমরা

পনেরোই নতুন বাসায় যাচ্ছি। বর্ডার লাইন বলে ভয় করব না। ওসব সাপ টাপ বাজে অজুহাত। তোমাকে না দিয়ে আর কাউকে দেবার মতলব। সেইদিনই জুলির বাচ্চাদের মুখ দেখব।'' যূথিকা তার সিদ্ধান্ত জানায়।

মানসের খেয়াল ছিল না যে রাত বারোটায় ইংরেজী মতে তারিখ বদল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজকুলের প্রস্থান। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিদের প্রবেশ। রঙ্গমঞ্চ এক মুহূর্তের জন্যেও শূন্য থাকবে না। বাইরে বোমার আওয়াজ ও মানুষের চিৎকার শুনে সে ঠাওরায় অন্যান্য রাতের মতো আবার দাঙ্গা। একটি অমোঘ মুহূর্ত পার হয়ে যায়। যূথিকা এসে তার তন্দ্রা ভাঙায়। বলে, "শুনছ তো? দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই হৈ হল্লোড়। বোমার ধূম।"

আলো ফুটতেই শহরের গণ্যমান্যরা মানসকে ধরে নিয়ে যান ময়দানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করতে। অপ্রত্যাশিত সম্মান। পতাকা উত্তোলনের পর অনুরোধে পড়ে সে সমবেত জনতাকে বলে, "এই শুভদিনটি এমনি আনন্দ নিয়ে বার বার ঘুরে আসুক। এর সঙ্গে যে বেদনা জড়িয়ে আছে সে বেদনা দূরে যাক।" এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ভয়ার্ত মুসলমানকে সে অভয় দেয়। তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।

সেখান থেকে একদল আদালতের কর্মচারী তাকে ধরে নিয়ে যান আদালত প্রাঙ্গণে। সেখানেও পতাকা উত্তোলন। সে বলে, "লোকে এখন থেকে আমাদের কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করবে। পূরণ করতে না পারলে আবার পালাবদল। এতজনের এতকালের সাধনার ফল যেন হেলায় না হারাই।''

এর পরে সে সপরিবারে রওনা হয় কলকাতায় তার নতুন আস্তানার অভিমুখে। লক্ষ করে রাজপথে মিছিলের পর মিছিল, মুহুর্মুহু ধ্বনি, প্রচণ্ড উদ্দীপনা। যেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে দেশসুদ্ধ লোক পাগল হয়ে গেছে। যে যার সঙ্গে পারে কোলাকুলি করছে। হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। ধনিক শ্রমিক ভেদ নেই। আছে শুধু নরনারী ভেদ। সেটা ক্লাস নয়। নইলে মেয়ে পুরুষে হাত ধরাধরি করে রাস্তার মাঝখানে নাচানাচি করত। মুসলমানরা হিন্দুদের গায়ে গোলাপপানি ছিটাচ্ছে। হিন্দুরা মুসলমানদের কপালে রক্তচন্দনের টীকা দিচ্ছে। কে বলবে একদিন আগেও এরা খুনখারাপি করেছে? এ কি ক্লান্তি থেকে শান্তি? না স্বাধীনতার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে রূপান্তর?

মানস লক্ষ করে লাটভবনের চূড়ায় রাজাজীর ব্যক্তিগত নিশান। আপিসে আদালতে কোথাও ইউনিয়ন জ্যাকের নিশানা নেই। সর্বত্র ত্রিবর্ণ পতাকার ছড়াছড়ি। ইংরেজরা অদৃশ্য। এক ইংরেজ মহিলা গড়ের মাঠে আপন মনে গল্ফ খেলছেন, কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি কি খবর রাখেন না যে পটপরিবর্তন হয়েছে?

সেই আশ্চর্য দিনটির সন্ধ্যায় আবার আহ্বান। এবার কংগ্রেস কর্মীদের ঘরোয়া সমাবেশ। সেখানে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। আর সবাইকে নিম্নাসনে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। সে-ই একমাত্র ভাষণ দেয়। বলে, "শুনে এসেছিলুম কলকাতায় আজ এক লঙ্কাকাণ্ড হবে। তার বদলে যা হয়েছে তা অভাবিতপূর্ব। মানুষের অন্তরে এত ভালোবাসা, এত সৌহার্দ্য নিহিত ছিল। পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ, ইচ্ছা করলে আমরা কী না করতে পারি? পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে পারি। ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবি তখন ভারতের গৌরবময় অতীতও ম্লান হয়ে যায়। অতীতের সঙ্গে একশোবার অন্বয় রক্ষা করব। আমরা ভুঁইফোঁড় নই। কিন্তু পূর্বানুবৃত্তি করতে গিয়ে যেন পুনরাবৃত্তি না করি। স্বাধীনতা এনে দিয়েছে পুনর্নবায়নের সুযোগ। স্বাধীনতা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। এর পরবর্তী পদক্ষেপ সাম্য। লিবার্টির পর ইকুয়ালিটি। অন্য কথায় সামাজিক ন্যায়, সোসিয়াল জাস্টিস। এই প্রাচীন দেশকে রাতারাতি নবীন করা বিপ্লবেরও অসাধ্য। একে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দিনে দিনে নবীন করতে হবে। শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থেও। বেদ বেদান্ত,

রামায়ণ মহাভারত মহান হলেও শেষ কথা নয়। চাই নতুন ধ্যান, নতুন দৃষ্টি, নতুন সৃষ্টি। নতুন অথচ উচ্চ মানের। শুধু রাজনীতিক ও সৈনিকদের নিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নয়। কবি ও মনীষীদেরও চাই।"

দিনমান মানসের মনে থাকে যে স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী সেদিন বেলেঘাটার হাইদারী নিবাসে চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী অনশনরত। স্বাধীনতার অমৃত সেবন তাঁর জন্যে নয়, তিনি দেশভাগ তথা প্রদেশভাগের বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেছেন। তাঁর আজকের ভাবনা কেমন করে কলকাতা শহরকে ভ্রাতৃরক্তপাত থেকে বিরত রাখবেন। কলকাতা নিবৃত্ত থাকলে পূর্ববঙ্গও নিবৃত্ত থাকবে। পাকিস্তানের স্বাধীনতাও রক্তপাত থেকে মুক্ত হবে।

শহর যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো শান্ত হয়। অন্তত একটা দিনের জন্যে লোকে ভুলে যায় যে তারা গোটা বছর ধরে মারামারি করেছে। স্বপনদা মিরাক্লে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেন যে গান্ধীজী না থাকলে ও অনশন না করলে ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। গান্ধীজীর মতো ব্যক্তি থাকতে পরিণামের চুম্বক যে ঘটনার পর ঘটনাকে লোহার শলার মতো আকর্ষণ করবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

সেদিন যূথিকা তার নতুন ঘরদোর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে। আসবাবপত্র সাজায়। পিয়ানো বাজায়। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয় স্বপনদার বাড়ী এলফের সঙ্গে খেলা করতে। পরে একসময় সেও যায় একবেলা খেতে। রাতের রান্না নিজের বাড়ীতেই হয়।

পরের দিন ওরা সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যায়। যূথিকা একটিকে কোলে নেয়। দীপিকাদি আরেকটিকে। জুলি হাঁ হাঁ করে ওঠে। যেন তার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। দুই মাসীর আদরে বাচ্চা দুটো কিন্তু দিব্যি আরামে থাকে। মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।

যূথিকা বলে, "এটার নাম গুণ্ডা। ওটার নাম গুণ্ডী। কিন্তু অমন নাম তো ভদ্রসমাজে চলে না। তাই নাম রাখছি নন্দন আর নন্দিনী।"

জুলি খুশি হয়। "কিন্তু ওর থেকে বোঝা যাবে না যে ওরা যমজ। যেমন কৃপ আর কৃপী। ওদের বাপের দেওয়া নাম। তবে এখনও পাকা হয়নি। হবে অন্নপ্রাশনের সময়। ওদের বাপ খালাস পেলে।"

দীপিকাদি অবাক হন। "সে কী? আবার কবে জেলে গেল?"

"না, জেলে যাবে কেন? জ্বলন্ত জাহাজের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপটেনের হুকুমে কাসাবিয়াঙ্কার মতো। ক্যাপটেন আপনি বাঁচবেন কি-না সন্দেহ। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এবারকার পণ হয়েছে এপারে মুসলমানকে বাঁচানো, ওপারে হিন্দুকে বাঁচানো।" জুলি ব্যাখ্যা করে।

"করেঙ্গে বড়ো শক্ত ব্যাপার, জুলি। বাকীটা আমি নাই বা বললুম। সৌম্যকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে।" দীপিকাদি বলেন।

"মাউন্টব্যাটেন এমন খেলা খেলেছে যে ইংরেজরা একজনও বিপন্ন নয়, বরং জনপ্রিয়। দিল্লীতে জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, মাউন্টব্যাটেনকী জয়। অথচ যাঁর জন্যে দেশ স্বাধীন হলো সেই নেতাজী দেশের মাটিতে পা দিতে পারলেন না। তাঁর সমূহ বিপদ। কী করে মানুষ আনন্দ করবে? বাপু তো অনশন করছেন। ইচ্ছে করে বেলেঘাটা গিয়ে তাঁর সেবা করতে। কিন্তু আমার বাচ্চাদের দেখবে কে? মা'র কত কাজ। আর এ দুটো কি কম দুষ্টু?" জুলি তার বাচ্চাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়।

ওদিকে মিসেস সিন্‌হা কথা বলছেন স্বপনদার সঙ্গে। "নতুন গভর্নর এলেই তাঁর লেডী আমাকে লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ করতেন। বছরে একবার করে বাঁধা নিমন্ত্রণ। সেসব দিন কি আর আসবে। আহা, ফ্রেঞ্চ মেনু।"

"Gone with the wind! দু'শো বছরের সাম্রাজ্য একটি রাতের স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। আহা, ফ্রেঞ্চ মেনু।" স্বপনদা সমবেদনা জানান।

ফ্রেঞ্চ শুনে মানসের মনে পড়ে ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

" Bliss was it in that dawn to be alive,

And to be young was very heaven."

"ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন তরুণ ছিলেন। আমরা তো আর তরুণ নই।" স্বপনদা করুণস্বরে বলেন, "তরুণ হলে তরুণীদের সঙ্গে প্যারিসের মতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাচতুম। ফরাসী বিপ্লবের দেড়শো বছর পরেও চোদ্দই জুলাই ওরা নাচে। পনেরোই আগস্ট কই কাউকে জোড়ে জোড়ে পথে ঘাটে নাচতে দেখা গেল না। যারা নেচেছে তারা ক্যালকাটা ক্লাবে বা স্যাটারডে ক্লাবে নেচেছে।"

"কী ঘেন্না।" মিসেস সিন্‌হা রুমাল দিয়ে হাসি চাপেন। তার পর সেই রুমালে চোখ মুছে বলেন, "নাচবে কোন্ আহ্লাদে? যার স্বামী জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে কি মনের আনন্দে নাচতে পারে? না হলে কার সঙ্গে নাচবে? যার গুরু বিষ পান করে নীলকণ্ঠ সে কি অমৃত পান করে নাচতে পারে? রাতের মাঝখানে চিৎকার করে বলেছে, আমি যদি এমনভাবে আটক না হতুম তা হলে দেখতুম কেমন করে পার্টিশন হয়। থাকতেন যদি নেতাজী তা হলে তিনিও দেখতেন কার সাধ্য দেশ ভাগ করে, প্রদেশ ভাগ করে।"

"হ্যাঁ, ওর মুখখানি দেখে মায়া হয়। বেচারি যেন কালি মেখেছে। কিন্তু ওটা ওর ভুল ধারণা। দেশের লোকই পার্টিশন চেয়ে নিয়েছে। কেউ ভারতের পার্টিশন, কেউ পাঞ্জাবের পার্টিশন, কেউ বাংলার পার্টিশন। যে যা চেয়েছে মাউন্টব্যাটেন তাকে তা দিয়েছেন। যীশুকে ওঁর দেশের লোকই ক্রুশে বিঁধতে চেয়েছে। পাইলেট কী করবেন? তিনি হাত ধুয়ে ফেলে বলেছেন, এই নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তপাতের জন্যে আমি দায়ী নই।" স্বপনদা মনে মনে হাত ধুয়ে ফেলেন।

ওদিকে যূথিকা বলছে জুলিকে, "তোমার খোকাখুকুর মুখ দেখার আনন্দে দু'জনের জন্যে দুটি গিনি দিয়ে যাচ্ছি। ওরা দীর্ঘজীবী হোক। বাপমায়ের যোগ্য সন্তান হোক।"

দীপিকাদি ও কাজ আগেই সেরে রেখেছিলেন। জুলি খুশি হয়। কিন্তু কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, "ওটা তো ইংরেজদের মুদ্রা। ওতে ওদের রাজার মাথা।"

"কী করা যায়, বলো। তোমরা যেদিন নতুন মুদ্রা বার করবে সেদিন আরেক দফা মুখ দেখব। হয়তো আরেক জুটির।" যূথিকা রঙ্গ করে।

"না, না, যূথিদি। আর নয়। এবার বৌদির পালা।" জুলি হাসে।

"আমার যদি হয় তো একটিই হবে।" বৌদি ঠিক জানেন।

"সেটির জন্যে আমি এখন থেকেই একটি গিনি জমিয়ে রাখব, যদি স্বদেশী মুদ্রা না পাই।" জুলি কথা দেয় গম্ভীর মুখে।

"আমিও।" যূথিকা হাসে। "বৌদির খোকা হবে স্বাধীন দেশের সন্তান। ওর জন্যে গিনি নয়, সোনার মোহর।"

দীপিকাদির মুখে হাসি নেই। বলেন, "কোথায় সে?"

ওদিকে স্বপনদা বলছেন মানসকে, "এই মুহূর্তে আমরা ফরাসীদের চেয়েও স্বাধীন। আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ দখলদার সৈন্য অপসরণ করছে। ফ্রান্সে এখনো মার্কিন সৈন্য মজুত। ফরাসীদের নৃত্য প্রাণশূন্য।"

"ব্রিটেন থেকে রোমান সৈন্য অপসরণের মতো ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ। ইতিহাসের দুই অসাধারণ ঘটনা। দুই বিস্ময়। পার্টিশন না হলে, পা কাটা না গেলে আমরা তাণ্ডব নৃত্য করতুম। ভৈরবীদের নিয়ে।" মানস চুপি চুপি বলে।

।। একুশ ।।

কথাটা দীপিকাদির কানে যায়। তিনি বৃশ্চিকাকে বলেন, "আমাদের গোলামি দু'শো বছরের নয়, সাতশো বছরের। মুসলমান আর ইংরেজ একের পর এক আমাদের গোলাম করে রেখেছে। সাতশো বছরের দাসত্ব থেকে অবশেষে আমাদের মুক্তি। তবু আনন্দ কই? পূর্ববঙ্গ এখনো পরাধীন।"

জুলির মা মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। এলাহি বন্দোবস্ত। স্বপনদা বলেন, "আমরাও এত সহজে ছাড়ব না, মাসিমা। দুই নাতি নাতনির খাতিরে দু'বার ভোজ দিতে হবে। একবার যথেষ্ট নয়।"

"তা তো বটেই। কিন্তু আগে ওদের বাপটিকে আসতে দাও। ও বেচারা হয়তো ওর গুরুর মতো অনশন টনশন কিছু করছে।" মিসেস সিন্‌হা বলেন।

"ইংরেজ রাজত্ব শেষ।" স্বপনদা জুলিকে বলেন, "তোমাদের ভূমিকাও শেষ। এখন থেকে তোমরাও আমাদের পাঁচজনের মতো ঘরসংসার করো। বাচ্চা দুটো রোজ একটু একটু করে বাড়ছে। তা তো স্বচক্ষেই দেখছি। এদের দাবী আগে, না পাবলিকের দাবী আগে? আর পাবলিকের দাবীর কি অন্ত আছে? স্বাধীনতা হলো, এখন বলবে স্বর্গ হলো না কেন?"

"ওই কথাটা ওকে আর ওর বরকে বুঝিয়ে দাও, বাবা স্বপন। ওই বাচ্চা দুটোকে মানুষ করবে কে? আমার কি আর সে বয়স আছে? সৌম্যর গুরুভাইয়েরা তো এখন গভর্নমেন্ট গঠন করেছেন। যেমন দিল্লীতে তেমনি কলকাতায়। ওঁদের ধরলে কি একটা চাকরি মেলে না?" মিসেস সিন্‌হা জিজ্ঞাসা করেন।

"মেলে। মেলে। চাইলেই মেলে। স্বাধীনতার অর্থ কী? স্বাধীনতার অর্থ, অর্থ। স্যাক্রিফাইসকে ক্যাশ করাই স্বরাজের মর্ম। সৌম্য যদি চাকরি করতে রাজী থাকে তো ওর জন্যে একটা জাঁকালো পদ সৃষ্টি করতে হবে। সাব-অ্যাসিস্টান্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল অভ্ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন।" স্বপনদা ইঙ্গিত করেন।

"ধ্যেৎ!" জুলি চটে যায়। "ও কখনো ওরকম ছোট চাকরি নেবে না। ওকে ডাইরেক্টর জেনারেল করলেও না। চাইলেই ও মন্ত্রী হতে পারে। বাপুর একটা ইশারাই যথেষ্ট। কিন্তু তাও না। ওর সামনে আরো বড়ো ভূমিকা। স্বাধীনতার পরের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোদয়। তার জন্যে সঙ্ঘ গঠন করতে হবে। সেকালে যেমন বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ একালে তেমনি গান্ধী, ধর্ম, সঙ্ঘ। ধর্ম অবশ্য হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম বা খ্রীস্টান ধর্ম নয়। ধর্ম হচ্ছে নীতিধর্ম। সত্য ও অহিংসা। বুদ্ধের যেমন সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন গান্ধীর তেমনি বিনোবা ও বাদশা খান্। দুঃখের বিষয় বাদশা খান্‌কে ভারতে পাওয়া যাবে না। তিনি পাকিস্তানের ভার নেবেন। সৌম্য যেন একনিষ্ঠ এক ভিক্ষু। আর আমি যেন ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া।"

"কিন্তু ওদের তো ছেলেমেয়ে ছিল না।" বৃশ্চিকা রসভঙ্গ করে।

"কী করে জানব? বুদ্ধের তো ছিল। ব্যবস্থা একটা কিছু হবে। তা বলে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল। খাদিকর্মী বলে কি এতই গরিব? নেই নেই বলেও ওর যা আছে তা খায় কে? তার সঙ্গে আমার যা আছে তা জুড়লে আমরাই কত লোককে খাওয়াতে পারি।" জুলি ঠাট্টাও বোঝে না।

তখন মানস তার পক্ষ নেয়। "জুলি বৌদির যা বক্তব্য তা বোধ হয় সৌম্যদারও বক্তব্য। এককালে আমাদের রাষ্ট্রও ছিল, সঙ্ঘও ছিল। তা নইলে সম্রাট অশোককে শান্তির পথে প্রবর্তিত করত কে? পরিচালিত করত কে? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়ে আমাদের একালের রাষ্ট্রনায়করা যে যুদ্ধবাদী হবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? গান্ধীজী যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনিই গ্যারান্টি। কিন্তু গান্ধীজীর পর কে?

বুদ্ধ না থাকলে সম্ভব। তেমনি গান্ধী না থাকলে সম্ভব। তার নিতে হবে আরো কয়েকজন অনুগত শিষ্যের মতো সৌম্যদাকেও। অতএব জুলি বৌদিকেও।"

জুলি তা শুনে আনন্দে হাততালি দেয়। "হীয়ার। হীয়ার!"

"শহীদ হতে হবে না তো?" জুলির মা হকচকিয়ে যান।

"কে বলতে পারে? অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। দেশের নেতারা যদি গান্ধীজীর অবর্তমানে নীতিভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, দেশের লোকও যদি তাঁদের সংযত না করে নিজেরাই উচ্ছৃঙ্খল হয়, তা হলে সৌম্যদার মতো সত্যাগ্রহীরা শুধু জেলে গিয়ে সন্তুষ্ট হবেন না, আরো দূরে যাবেন।" মানস বাকীটা চেপে যায়।

"বুঝেছি।" জুলির মা মুখ ভার করেন। "সে তখন দেখা যাবে। এখন ওসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাক। খুশি হয়ে মিষ্টি মুখ করো তোমরা। আর এই দুটি প্রাণীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করো।"

সকলে একবাক্যে দীর্ঘায়ু কামনা করেন ও মিষ্টান্ন ভোজনে মন দেন।

যূথিকা প্রস্তাব করে, "ঘটা করে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ যাতে হয় তার জন্যে পিতার উপস্থিতি চাই। তাঁকে চিঠি লেখা যাক।"

"হ্যাঁ। পূর্ববঙ্গ এখন শান্ত। অবশ্য বলতে নেই। টাচ উড। কাঠ ছোঁও। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা হয়তো ঠাণ্ডা, কিন্তু করাচী থেকে ফরমান কি ফতোয়া এলে গরম হতে কতক্ষণ। এটা যদি শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমানের শরিকী মামলা হতো তবে কবে মিটে যেত। কিন্তু তা তো নয়। এর পেছনে আরব আছে, ইরান আছে, তুরস্ক আছে, গোটা ইসলামী দুনিয়া আছে। আর আছে ইংলণ্ড, আমেরিকা, পর্টুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আমরা নিতান্তই নিঃসঙ্গ। ওই ক'টি ন্যাশনালিস্ট মুসলিম আমাদের সম্বল। স্বাধীন হয়েও কি আমাদের সোয়াস্তি আছে? মুসলিম লীগকে বহিষ্কার করতে পেরেছি। কিন্তু একই কাজ করছে হিন্দু মহাসভা। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী লবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" দীপিকাদি দুঃখ করেন।

"কংগ্রেসের উপরেই ওদের রাগ। কংগ্রেস কেন একাই রাজ্যভোগ করছে? ওদের ভাগ দিচ্ছে না? কী করে দেবে, যদি পলিসি এক না হয়? পরের বারের নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোটে হারিয়ে দিতে পারলে রাজ্য তো ওদেরই। না পারলে বুঝতে হবে লোকে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক নীতি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি, আর্থিক সমাজতন্ত্র অভিমুখী নীতি পছন্দ করে।" মানস যতদূর বোঝে।

"সমাজতন্ত্র দূর অস্ত্‌! আমি জার্মানীতে ছিলুম। সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে মিশেছি। ডেমোক্রাট হয়ে সোশিয়ালিস্ট হওয়া শক্ত। সোশিয়ালিস্ট হয়ে ডেমোক্রাট হওয়া শক্ত। এটা যেন একই কালে দুই ফ্রন্টে লড়াই। কংগ্রেস যদি সোশিয়াল ডেমোক্রাট হয় তাকেও দুই ফ্রন্টে লড়তে হবে। তার হাতে সমাজতন্ত্র সফল হলে গণতন্ত্র বিফল হবে। গণতন্ত্র সফল হলে সমাজতন্ত্র বিফল হবে। এ সমস্যা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চেয়েও জটিল।" স্বপনদার মতে।

"হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মূলে রয়েছে নারীহরণ ও ধর্মান্তরীকরণ সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব। এ দুটি বিষয়ে মতান্তর থাকতে ওরা কখনো এক হবে না। বাংলাদেশেও না। নোয়াখালীর ঘটনাই উভয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। গান্ধীজী এখনো বিশ্বাস করেন যে হিন্দুরা আল্লা হো আকবর আর মুসলমানরা বন্দে মাতরম্‌ বলে মন্ত্র পড়লে হিন্দুর হৃদয় মুসলমানের হবে, মুসলমানের হৃদয় হিন্দুর হবে। তিনি এই আটাশ বছরে কিছুই শেখেননি, কিছুই ভোলেননি। ফরাসী দেশের Bourbon রাজাদের মতো। তাঁর বেঁচে থাকা না থাকার উপর কিছুই নির্ভর করে না।" দীপিকাদি বলেন।

জুলি মর্মাহত হয়। "বাপুকে আমরা অকালে হারাতে চাইনে। তিনি চলে গেলে রাষ্ট্র থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ গড়ে উঠবে না। অন্তত বাংলাদেশে। অহিংসার সাধনা উঠে যাবে। সত্যাগ্রহ বলে যা চলবে তার মধ্যে সত্যের ভাগ কম। অসত্যের ভাগ বেশী। আমরা তা হলে কিসের পত্তন করে যাব?

লোকে আমাদের দিকে তাকাবে কেন? তাকাবে বাবলীদের দিকে। ওদের প্রোফেটের দিকে। মার্কসবাদ এখন একটার পর একটা দেশ জয় করে চলেছে। চীনও শুনছি ওদের দিকে ঝুঁকছে। তা হলে কি লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাবে?"

"কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী?" দীপিকাদি প্রশ্ন করেন।

"লেনিন বলেছিলেন কমিউনিজম পিকিং-এর পথ দিয়ে কলকাতায় যাবে আর কলকাতার পথ দিয়ে প্যারিসে। চীন যদি লাল হয় তবে ভারতের একাংশ কেন সমস্তটাই লাল হতে পারে, বৌদি। নীলের পক্ষ আমরা নেব না। গান্ধীপন্থীরা পুঁজিপতি বা জমিদারদের শিবিরভুক্ত নয়। তাঁদের নিজেদের একটা শিবির আছে। তাতে দু'চারজন পুঁজিপতি ও জমিদার আছেন। বুদ্ধের শিবিরেও অনাথপিণ্ডদ ছিলেন। সেকালের একজন সেরা শ্রেষ্ঠী। আমাদের কাছে কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। ছোটও না, বড়োও না। সব শ্রেণীকে নিয়ে আমরা কাজ করি। কিন্তু সে কাজ আমাদের মতবাদসম্মত কাজ। শ্রেণীযুদ্ধে আমরা বিশ্বাস করিনে। যেমন করিনে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে নেমেছিলুম তারা ইংরেজ বলে নয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী বলে। যেই ওরা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিল অমনি ওরা আমাদের বন্ধু বনে গেল। মাউন্টব্যাটেনকে আমরাই আমাদের প্রথম গভর্নর জেনারেল মনোনয়ন করেছি।" জুলি একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

"তার মানে তোমাদের নেতারা ধড়িবাজ পলিটিসিয়ান। হেরডকে আউট-হেরড করার মতো জিন্নাকে আউট-জিন্না করেছেন। মাউন্টব্যাটেনকে বসিয়ে দিয়েছেন দিল্লীর সিংহাসনে। দুনিয়ার দৃষ্টি তাঁর উপরেই। জিন্নার উপরে নয়। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। হা হা। কোথায় হাজার বছরের দিল্লী আর কোথায় একশো বছরের করাচী। বারো বছর আগে প্রদেশের রাজধানীও ছিল না। আর মাউন্টব্যাটেনও কম ধড়িবাজ নন। কংগ্রেস নেতাদের এমনভাবে বশ করেছেন যে তাঁরা কমনওয়েলথে যোগ দেবার জন্যে লীগ নেতাদের চেয়েও ব্যাকুল। ফলে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনায়াসে লাভ করেছেন। কমনওয়েলথের মাথার উপরে ইংলণ্ডের রাজা থাকবেন, তাই রাজন্যদেরও মান থাকবে। নইলে কি তাঁরা বিনা প্রতিরোধে যোগ দিতেন? রেপাবলিকের প্রস্তাব পাশ করার পর নেতাদের খেয়াল হয় যে ডোমিনিয়ন হওয়াই লাভজনক। বুদ্ধির যুদ্ধে জিন্না সাহেব যা পেয়েছেন নেহরু ও প্যাটেল তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছেন। বেচারা মৌলানা আজাদের জন্যে দুঃখ হয়। আরো দুঃখ হয় খান্ আবদুল গফ্‌ফার খানের জন্যে।" দীপিকাদি ব্যথিত।

"সব চেয়ে ট্র্যাজিক ফিগার কিন্তু গান্ধীজী।" স্বপনদা বলেন। "সারা জীবনটাই ত্যাগ করে এলেন, কিছুই ভোগ করলেন না। ওঁরই তো মাউন্টব্যাটেনের আসনে বসার কথা। পড়ে আছেন বেলেঘাটার হায়দারী মঞ্জিলে। এক পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ী। আবর্জনায় ভরা। শহীদকেও সাথী করেছেন। তাতে হিন্দুদের প্রচণ্ড আপত্তি। তবে মুসলমানদের প্রবল আস্থা। পাঞ্জাবে পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের বাউণ্ডারি ফোর্স থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে বা পালাচ্ছে। এখানে ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স। তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মাউন্টব্যাটেন তো অবাক! ওই একটি মানুষের জন্যে কত লোক বাঁচল। তবে তাদের ঘরবাড়ী বহুক্ষেত্রেই বেদখল। হিন্দুরা সরকারের হুকুম মানবে না। পুলিশকে ভয় করে না। বেদখলকারীরা মালিক হয়ে বসে আছে। ওঠাতে গেলে বোমাবাজি।"

মানস জানতে চায়, "মীর সাহেবের উপরেও কি বোমাবাজি?"

"না, সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে যশোবিকাশ রায়ের কন্যা যশোধরা ওরফে টুকটুক। আর তার দলবল। তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান আছে। জানো তো, ও মেয়ের প্রথমে বিয়ে হয়েছিল বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে, তার পরে আমেরিকান খ্রীস্টানের সঙ্গে। ও একাই একটা হস্‌পিস চালাচ্ছে। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান লাঞ্ছিতারা অতিথি। মাদার সুপিরিয়র অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। একদিন যেয়ো

দেখতে। নৈতিক সমর্থন চাই।" স্বপনদা বলেন।

"আচ্ছা, আমরা একটু গুছিয়ে নিই।" যূথিকা আগ্রহ দেখায়।

"আমাদের সাধ্য থাকলে আমরা নোয়াখালীতেও হস্‌পিস চালাতুম। বিহারেও। পাঞ্জাবেও। কিন্তু কর্তাদের ছেড়ে যাই কী করে? আমার তো চাকরিও আছে। তার উপর এক কুকুর। সন্তানের মতোই প্রিয়। শুনছি মধুমালতী পাঞ্জাবে খুব কাজ করছে। লেডী মাউন্টব্যাটেনের উৎসাহে ও সাহায্যে। বিস্তর মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। করেছেন প্রধানত মৃদুলা সারাভাই। জবাহরলালের উৎসাহে ও সাহায্যে।" দীপিকাদি সংবাদ দেন।

"মধুমালতী কে? আমাদের মিলি? ও নাকি এখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে হাসপাতালে হাসপাতালে রেফুইজী ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরছে। ওর সেবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা আছে। ও একজন পাকা নার্স। বিলেতেও জার্মানদের ব্লিৎস ক্রীগের সময় জখমী ব্যক্তিদের নিজে অ্যাম্বুল্যান্স চালিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিত। তার আগে ফার্স্ট এড দিত। ব্যাণ্ডেজ বাঁধত। লেডী মাউন্টব্যাটেন তো ওকে ভালোবাসবেনই। তবে ও সব খুলে বলেছে। কেমন করে টেররিস্ট হয়। কেমন করে রিভলভার জোগাড় করে। কেমন করে গুলী চালায়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বহু বছর জেলে আটক থাকে। টি. বি. সন্দেহ করে সরকার তাকে ভাওয়ালীতে পাঠায় ও পরে ছেড়ে দেয়। তার বাবা যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার। তিনিই জামিন হন, সে আর কখনো অমন কাজ করবে না। সন্ত্রাসবাদের উপর থেকে তারও বিশ্বাস উঠে যায়। ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর সংঘর্ষের বেনিফিসিয়ারি হয় মুসলমান। সে রাজনীতিই ছেড়ে দেয়। বিয়ে করে। বিলেত যায়। সেখানে যুদ্ধের কাজে ইংরেজদের সাহায্য করে। ওদের পুরনো রাগ পড়ে যায়। দেখেশুনে ওর ধারণা জন্মায় যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র সাম্রাজ্য ওরা প্রত্যর্পণ করবে না। তাই ওর নিজের রাগ পড়ে না। ও দেশে ফিরে এসে যাদের সঙ্গে মেশে তারা মিউটিনির চক্রান্ত করছিল। ধরা পড়ে বিলেত চালান যায়। তার পর ওর প্রত্যয় হয় যে মাউন্টব্যাটেন ভারতে স্বাধীনতা দিতেই আসছেন। সেও তার বরকে ও ছেলেকে নিয়ে ফেরে। ছেলেকে শান্তিনিকেতনে দিয়ে ওরা চলে যায় দিল্লী। সেখানে সুকুমার হয়েছে কংগ্রেস নেতাদের পার্শ্বচর আর মিলি লেডী মাউন্টব্যাটেনের সহচরী।" জুলি সব খবর রাখে।

মানস বলে, "স্বাধীনতার যোদ্ধারা সবাই আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। বাকী থাকবেন কেন মধুমালতী দত্তবিশ্বাস? ছেলেকে মানুষ করতে হবে না?"

"আমার মেয়েকে আমিও সেই কথা বলি।" জুলির মার উক্তি।

"বাপু বেঁচে থাকতে সৌম্যকে ও কথা ভাবতে হবে না। পরে অবশ্য ভাবতে হবে। তার এখন বাইশ তেইশ বছর বাকী।" জুলি সুনিশ্চিত।

বিশ্বাসে মিলয়ে আয়ু, তর্কে বহুদূর। সবাই মৌন।

গান্ধীজী নোয়াখালী যাবার জন্যে বিষম ব্যগ্র। কথা দিয়েছেন, কথা রাখতে হবে। কিন্তু নোয়াখালী থেকেই হিন্দুরা এসে বলে, "আপনি এখন যাবেন না। আগে কলকাতা শান্ত হোক। এখানে মুসলমান মরলে ওখানে হিন্দু বাঁচবে না।"

শহীদ সুহরাবর্দীও তাঁকে কলকাতা ছাড়তে দেন না। যতক্ষণ কলকাতার মুসলমানদের মনে ত্রাস আছে ততক্ষণ তাঁকে কলকাতায় থেকে তাদের ত্রাণ করতে হবে। কতক্ষণ? তা কেউ বলতে পারে না।

তারপরে সেই গান্ধীই নোয়াখালীতে গিয়ে হিন্দুদেরও ত্রাস থেকে ত্রাণ করবেন। বাকী জীবনটা নাকি তিনি সেইখানেই কাটাবেন, যদি দরকার হয়। হিন্দুও বাঙালী, মুসলমানও বাঙালী। বাঙালীকে বাঙালী না বাঁচালে বাঁচাবে কে? একজন গুজরাটী হিন্দু?

"আবার মজা দ্যাখ।" স্বপনদা বলেন, "বাঙালী মুসলমানকেই ইংরেজের তথা হিন্দুর হাত থেকেই মুক্ত করেছেন কে? এক গুজরাটী মুসলমান। ওরা নাকি একদিন আগে পাকিস্তান পেয়েছে। যদিও

পার্লামেন্টের আইন অনুসারে রাত বারোটার পর ভারত তথা পাকিস্তান উভয়ের স্বাধীন সত্তা।"

"আমি যতদূর জানি ওরাও আমাদেরই মতো চোদ্দই আগস্টের মাইনে কলকাতার ট্রেজারি থেকেই ড্র করেছে। চোদ্দই আগস্ট ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন। মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিন নয়।" মানস জানায়।

পরের দিন স্বপনদাকে নিয়ে মানস মীর সাহেবের সন্ধানে বেরয়। পায়ে হাঁটার দূরত্ব। তবু স্বপনদার খাতিরে গাড়ীতেই যেতে হয়। তাঁর পায়ের কাঁপুনি তিনি বাইরে প্রকাশ করতে চান না। সেটা বাড়ীতে বোঝা যায় না। সেখানে তিনি ষোল আনা নিরাপদ।

মীর সাহেব উৎফুল্ল হয়ে অভ্যর্থনা করেন। "আইয়ে হজরত, তশরিফ লাইয়ে। কবে এলেন? কিছুদিন থাকবেন তো?"

"এবার বদলী হয়ে এসেছি, মীর সাহেব। কাছেই বাসা। একদিন আপনাকেও তশরিফ আনতে হবে।" মানস অনুরোধ করে।

"টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। হ্যামলেটের মতো আমারও এই প্রশ্ন। আমি যদি এই ডোমিনিয়নে থাকি তো ঘরের ছেলের মতোই থাকব। পরের ছেলের মতো নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও তো কিঞ্চিৎ কনট্রিবিউশন ছিল। তা হলে স্বাধীনতার পর আমাকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে কেন? আমি ধর্মে মুসলমান। এই জন্যেই কি কোথাও বেরতে পারব না? আপনি যেমন ফ্রী আমি তেমন ফ্রী নই, মল্লিক সাহেব। কী করে আপনার দৌলতখানায় তশরিফ আনব?" তিনি অভিযোগ করেন।

মানসের মাথা কাটা যায়। সত্যিই তো সে যেমন ফ্রী তিনি তেমন নন। টুকটুক বা তার দলের একটি মেয়ে পাহারা দেয়, তা ছাড়া পুলিশের লোক দেখে যায়।

"আপনি যে একজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান তা কে না জানে? তা সত্ত্বেও এমন ভোগান্তি!" মানস বিস্ময় প্রকাশ করে।

"জাতীয়তাবাদী এই বিশেষণটা ওরা বেমালুম ভুলে গেছে। মনে রেখেছে মুসলমান এই বিশেষ্যটা। কিছুদিন আগে শোনা যেত পলাশীর পরাজয় থেকেই পরাধীনতার সূচনা। এখন পলাশীর বিজেতারা প্রস্থান করেছে, তাই এদেশ স্বাধীন। কিন্তু ইতিমধ্যে থীসিসটা বদলে গেছে। সাতশো বছর আগে থেকেই পরাধীনতার সূচনা। সেদিনকার বিজেতারা তো প্রস্থান করেনি। তাদের যদি না বিদায় করি তবে তো পরাধীনই রয়ে গেলুম। এই যে মীর আবদুল লতিফ ইনিও সেদিনকার বিজেতা বংশধর। অতএব এঁকেও ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে। তারপর এঁর গরিবখানা আমাদের। একেবারে নিখরচায়। মাথার উপর সরকার নেই, হাইকোর্ট নেই, আইন নেই, কানুন নেই। একমাত্র যুক্তি মুসলমানদের আদি নিবাস ভারতে নয়, আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায়। আপাতত পাকিস্তানে। পরে সেখান থেকেও খেদাব। ইংরেজ যখন গেছে তখন মুসলমানই বা না যাবে কেন?" মীর সাহেব বিষাদভরা কন্ঠে বলেন।

"কুযুক্তি! কাপুরুষের কুযুক্তি!" স্বপনদা চাঙ্গা হয়ে বলেন। "লড়তে হবে। হাইকোর্টে লড়তে হবে। আইনসভায় লড়তে হবে। আর মন্ত্রীপরিষদে তো লড়তে হবেই। আমাদের এই সেকুলার স্টেট আপনাকে নিয়েই সেকুলার। আপনি না থাকলে সেকুলার নয়। আমরা একে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেব না।"

"আপনারা কারা? আপনারা ক'জন? আপনারা কি জানেন ওয়ার্কিং কমিটির সরষের ভিতরেই ভূত? জবাহর ও সরোজিনী ভিন্ন আর কে সেকুলার শুনি? হ্যাঁ, ছিল বটে সুভাষ। ও যদি থাকত আমার প্রাণে ভরসা থাকত। আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আপনিও তাই। কিন্তু আপনার কি নেতাজীর মতো প্রভাব? আজ আমি পদে পদে ওর অভাব অনুভব করছি। তার মানে কিন্তু এ নয় যে আমি ওর

পলিসির সমর্থক।" মীর সাহেব বলেন।

স্বপনদা দুঃখিত হন। চুপ করে থাকেন। মানস জবাব দেয়, "আমরা মাত্র জনা দুই ইনটেলেকচুয়াল হলেও আমাদেরকে খাটো করবেন না। আমরাই এ দেশের রুপো তলতেয়ার। আপনিও আমাদেরই মতো একজন ইনটেলেকচুয়াল। থাকুন, আপনি এদেশের দিদেরো। আপনার মাথায় চিন্তা আছে, হাতে কলম আছে। চিন্তা ব্যক্ত করার স্বাধীনতা আছে। 'যার তরে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' আপনাকে তো আমরা সাহসী মানুষ বলেই জানতুম। আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে এক পা নড়বেন না। এটা আপনারই সরকার। হাই কমাণ্ডের সদস্য মৌলানা আজাদ এঁদের উপরওয়ালা। আর তিনি আপনার অগ্রজ। কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

এমন সময় টুকটুক এসে হাজির। মানসের সঙ্গে আলাপ হয়। টুকটুক বলে, "মহাত্মাকে আপনার কথা জানিয়ে এলুম। তিনি রাজাজীকে বিশেষ করে বলেছেন কলকাতার প্রত্যেকটি মুসলমানকে অভয় দিতে। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষকে বলেছেন প্রত্যেকদিন রিপোর্ট দিতে। কলকাতা অশান্ত হলে পূর্ববঙ্গ তো অশান্ত হবেই, সারা ভারত ও পাকিস্তান অশান্ত হবে। তার জীবিত সাক্ষী হবার জন্যে তিনি বেঁচে থাকবেন না। আবার অনশনের ধমকি দিচ্ছেন। আমি সৌম্যদাকে ট্রাঙ্ককল করতে চাই। কোন্ ঠিকানায় করব?"

"ক্যাপটেন মুস্তাফীকে কল করলে তিনিই ওকে জানাবেন। হ্যাঁ, সৌম্য এসে ওর বাপুকে নিরস্ত করুক। যদি পারে।" স্বপনদার মনে সংশয়।

মীর সাহেব বলেন, "আসল সমস্যাটা মহাত্মাকে বুঝিয়ে বলতে হলে আমাকেই বেলেঘাটা যেতে হয়। কিন্তু বাড়ীতে আর কোনো পুরুষ নেই। মহিলারা ভয় পাবেন। আমার ছেলে তো, জানেন, পাকিস্তানে চলে গেছে। বৌমা যেতে চাননি, কিন্তু নিরাপত্তার জন্যে যেতে বাধ্য হন। যে কথাটা মহাত্মাকে আমি বুঝিয়ে বলতে চাই সেটা এই যে গুণ্ডা কলকাতায় চিরকাল ছিল। কিন্তু ইদানীং ওরাই বনেছে সমাজের রক্ষক। সমাজপতিদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক যেন মন্ত্রীদের সঙ্গে পুলিশের। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। বেঁধে আনতে বললে পেটায়। পেটাতে বললে খুন করে। গুণ্ডা বলতে আগেকার দিনে বোঝাত নিকৃষ্ট একটা স্তর। এখন ভদ্রলোকের ছেলেরাও গুণ্ডামি করে বেড়ায়। এত রকম এত হাতিয়ার কোনো কালেই কারো হাতে পড়েনি। আজকাল তো বোমা রিভলভারের লেখাজোখা নেই, পাইপ গান যত্রতত্র, স্টেন গানও বিরল নয়।"

একথা শুনে স্বপনদা থর থর করে কাঁপেন। কেন তা কেউ বুঝতে পারে না। মানস ভাবে তাঁর হাত পায়ের কাঁপুনি ফিরে এসেছে।

"আমি কি তা হলে আবার বেলেঘাটায় গিয়ে মহাত্মাকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করব, লতিফ চাচা?" টুকটুক সুধায়।

"উনি আমাকে চেনেন। আমার কাছ থেকে একটা সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন। তুমি নির্মল বোসকে বলে একটা ইন্টারভিউয়ের বন্দোবস্ত করো। গাড়ী আছে আমার। শুধু আর্মড গার্ড দরকার। শহীদ থাকলে ওকেই ফোন করতুম। প্রফুল্লকে আমি চিনি, কিন্তু ততখানি অন্তরঙ্গতা নেই। এই এক সমস্যা। আরেক হচ্ছে আমার বাড়ীতে একজন পুলিশ অফিসার না থাকলে চলবে না। ওৎ পেতে রয়েছে বেদখলকারী দল।" মীর সাহেব চোখের ইশারা করেন।

মানস বলে, "স্পেশাল ব্রাঞ্চে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁকেই ফোন করে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা উনিই করবেন। কেবল ইন্টারভিউটা বাদে।"

মীর সাহেব বার বার ধন্যবাদ দেন। টুকটুকও।

বাড়ী ফেরার পথে স্বপনদা বলেন, "আমাকে থর থর করে কাঁপতে দেখে তোমার মনে কোনো

সন্দেহ হয়নি তো?"

"সন্দেহ কী হবে? তোমার হাত পায়ের কাঁপুনি ফিরে এসেছে। আমার তো মনে হয় পারকিনসন্স।" মানস চিন্তিত।

"ওটা তোমার ভুল ধারণা। বড়ো বড়ো ডাক্তার সবাই দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে পারকিনসন্স নয়। রাতের মাঝখানে বাড়ীতে দাঙ্গাবাজরা চড়াও হলে আর তোমার বৌ বন্দুক ধরে ওদের শাসালে তোমারও হাত পা কাঁপত। হয়তো হার্টই ফেল করত। তোমার বৌদি বন্দুকে সন্তুষ্ট নন। তাঁর স্টেন গান চাই। অমন একটি দশপ্রহরণধারিণী বধূ থাকলে শিবেরও হাত পা কাঁপত। কালীর হাতের খাঁড়া দেখে শিব তো বেহুঁশ। গুণ্ডারা কবে একদিন আসবে। এদিকে বৌ যে সব দিন হাতিয়ার নিয়ে বসে আছেন। মাছ কোটার বঁটি নয়। সাক্ষাৎ স্টেন গান। সেটা তিনি আমাকেও বিশ্বাস করে দেখাবেন না। সেটা সত্যি সত্যি কেনা হয়েছে কি না জানিনে। তবে সেটার নাম তিনি রামদীনকে শুনিয়েছেন, রামদীন পাড়ার মুসলমানদের শুনিয়েছে, পাড়াটা প্রায় মুসলিমশূন্য। এখন তো আর কলকাতার জন্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা নেই। র‍্যাডক্লিফ রায় দিয়েছেন যে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের। তা হলে আর স্টেন গান কেন? যদি সত্যি থাকে। কে জানে কবে কমিউনিস্টরা টের পেয়ে লুট করবে।" স্বপনদা ভীত।

মানস প্রথমে একদফা হাসে। তারপরে বলে, "কংগ্রেস গভর্নমেন্টও তো একটা গভর্নমেন্ট। কোনো গভর্নমেন্টই স্টেনগানের মতো একটা মারণাস্ত্র প্রাইভেট ব্যক্তির হাতে রাখতে দেয় না। সে ব্যক্তি বিদ্রোহী হলে গোটা মন্ত্রীমণ্ডলীকেই একসঙ্গে সাবাড় করতে পারে। গান্ধীজী এসেছেন, বৌদিকে বোলো তাঁর দর্শন পেতে গিয়ে তাঁর পায়ে ওই স্টেন গান প্রণামী দিতে।"

"আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমার সে সাহস নেই। তুমি কি এ কাজটা করতে পারবে?" স্বপনদা সুধান।

"দেখি। যূথিকার সঙ্গে পরামর্শ করি।" মানসও বেড়ালকে ভয় করে।

ট্রাঙ্ককল পেয়ে সৌম্য ছুটে আসে। কলকাতার হালচাল শুনে তার আশঙ্কা হয় যে-কোনো উপলক্ষে আবার দাঙ্গা বাধবে ও বাপু তা চলতে দেবেন না। কলকাতা জ্বললে নোয়াখালীও জ্বলবে, শুধু নোয়াখালী কেন, সারা পূর্ববঙ্গ। অর্থাৎ সারা পূর্ব পাকিস্তান। সারা পূর্ব পাকিস্তান জ্বললে সারা পশ্চিম পাকিস্তানও জ্বলবে। তার প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারত।

না, এ দাবানলকে একদিনের জন্যে জ্বলতে দেওয়া যায় না। সৌম্য তার কংগ্রেসী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বোঝায় যে কলকাতায় মুসলমান মরলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুও মরবে। প্রাণের ভয়ে তারা কলকাতায় এসে জড়ো হবে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ভিড় করবে। তখন স্বাধীনতা উপভোগ করা ঘুচে যাবে। শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতে ও পাকিস্তানে। যে গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যেই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ সেই গৃহযুদ্ধই বিরাট আকারে বাধবে। বাপুকে বাঁচানো যাবে না। কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও ছত্রভঙ্গ। বিদেশীরা আবার জয় করবে।

মানসের সঙ্গে দেখা হলে সে বলে, "তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে এই জন্যে যে তুমি অনশন থেকে বাপুকে নিরস্ত করবে।"

"তিনি নিরস্ত হবেন তখনি, যখন শুনবেন যে গুণ্ডারা নিরস্ত্র হয়েছে। তাঁর শেষ অহিংস অস্ত্র অনশন। সে অস্ত্র তিনি কেমন করে ত্যাগ করবেন, যদি গুণ্ডাদের হাতে প্রভূত মারাত্মক অস্ত্র থাকে? পুলিশের কাজ তাদের নিরস্ত্র করা। পুলিশ যদি তার কর্তব্য করে বাপুকে অনশন করতে হবে না। কিন্তু পুলিশের চেয়ে গুণ্ডাদের প্রেস্টিজই এখন বেশী।" সৌম্য তা দেখে ক্ষুব্ধ।

যেসব পাড়া হিন্দুশূন্য হয়েছিল সেসব পাড়া আবার হিন্দুপূর্ণ হয়েছে, যারা বেদখল করেছিল তারা ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের পাড়ায় ফিরে গিয়ে দেখে বেদখলকারী

হিন্দুরা তাদের কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। সেসব পাড়া হিন্দুর পাড়া ও সেসব বাড়ী হিন্দুর বাড়ী বনে গেছে। নতুন সরকার জোর খাটাতে চান না। গান্ধীজীর কানে মুসলমানদের অভিযোগ গেলে তিনি প্রতিকারের জন্যে অস্থির বোধ করেন। গণ্ডগোল ধোঁয়াতে থাকে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা।

গান্ধীজীকে আরেকবার অনশন থেকে নিরস্ত করতে পারা গেল না। একত্রিশে আগস্টের রাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর মাথা তাক করে লাঠি ছোঁড়ার পর তাঁর মোহভঙ্গ হয়। কোথায় পনেরোই আগস্টের মিরাক্ল? কলকাতা তেমনি অশান্ত। এ আগুন জলবামাত্র না নেবালে ভারত ও পাকিস্তানময় বিস্তৃত হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর তাঁর অনশন শুরু হয়। পরের দিন নোয়াখালী যাত্রার তোড়জোড় চলছিল। সুহরাবর্দী সাহেব ভার নিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন কলকাতার সাফল্যের পর নোয়াখালীর সাফল্য। কিন্তু কোথায় কলকাতার সাফল্য। সেটা একটা মায়া। হিন্দুরা এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। তারা এখন বন্য। ওয়াইল্ড, ব্রুটাল। মুসলমানের জান বাঁচানোর চেয়ে বড়ো সমস্যা হিন্দুর মনুষ্যত্ব বাঁচানো। "Little man, what now?" নাৎসী জমানার পূর্ব লক্ষণ দেখে প্রশ্ন করেছিলেন হান্স ফালাডা। হিন্দুরাও নাৎসী বনে যাচ্ছে দেখে মানস প্রশ্ন করে মনে মনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে।

।। বাইশ ।।

স্বপনদা সৌম্যকে ডেকে পাঠান। বলেন, "শাসকের রাজদণ্ড শর্বরী পোহালে দেখা দিল মানদণ্ড রূপে। ইংরেজ এখন বণিক। আবার সেই জোব চার্নক। তোমাদের সংগ্রামী ভূমিকা এখন শেষ। সৈনিকেরা চিরকাল যা করে থাকে তোমরাও তাই করবে। তরোয়ালকে লাঙলের ফলা বানাবে। উৎসাদন নয়, উৎপাদন। ভাবার্থে সন্তান উৎপাদন।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। "দুটিই যথেষ্ট, স্বপনদা।"

"যা বলেছ। ক্যারামেল আর বইতে পারবে কেন? যা দুষ্টু হয়েছে ওর দুই বাচ্চা। আমাকে দেখলেই তাড়া করে আসে। আমার কোলে পচ করবে, হিজি করবে। আমি তো ভয়ে সাত পা পেছিয়ে যাই।" স্বপনদাও শিউরে ওঠেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বপনদা আবার বলেন, "তোমাকে ডেকে পাঠানোর আসল কারণটা এই। তোমরা এখন লড়াই টড়াই ছেড়ে ঘর সংসার করো, ছেলে মানুষ করো। চাকরি বাকরি একটা জুটিয়ে নাও। তুমি একজন ওয়ার ভেটেরান। তোমাদেরই তো সরকার। চাকরি বাকরি তুমি পাবে না তো পাবে কে?"

"রক্ষে করো, স্বপনদা। আমার যেন তেমন দুর্মতি না হয়।" সৌম্য হাত জোড় করে। "এ জীবনে আমার ছুটি নেই, বাপুকে আমি কথা দিয়েছি স্বরাজের পরেও আমি সমানে কাজ করে যাব, যাতে দেশের দীনতম মানুষটিও স্বরাজের সুফল ভোগ করতে পারে। আমাদের স্বরাজ বড়লোকের স্বরাজ নয়, যাতে গরিবদের কোনো অংশ নেই। তাদের হাতে একটা ভোট ধরিয়ে দিয়ে তার পরে সেই ভোট নানা ছলে চেয়ে নেয় যারা আমরা গান্ধীপন্থীরা তাদের থেকে ভিন্ন। আমরা জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে অভিন্ন হয়ে যেতে চাই। ওদের সঙ্গে ওদের মতো জীবন যাপন করব। শ্রমের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি সেই মুক্তিই আমাদের আদর্শ। বারো মাস শ্রম। প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সত্যাগ্রহ করতে করতেই সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর কোনো পন্থা নেই, স্বপনদা। পার্লামেন্টারি পন্থা গোড়ায় কিছু ফল দেখালেও পরিশেষে নিষ্ফল। আর কমিউনিস্টদের বাঞ্ছিত প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ তো অন্য একপ্রকার 'মাইট ইজ রাইট'। জনগণের সামনে অমন একটা আদর্শ রাখলে তারা মাইটের ভক্ত হবে, রাইটের ভক্ত নয়। আমরা জনগণকে শেখাব রাইট ইজ মাইট। অহিংসভাবে ফাইট করতে করতে তারা তাদের রাইট বুঝে নেবে।"

স্বপনদা আফসোস করেন। "তোমাকে বিয়ে করতে বলা বকমারি হয়েছে। ক্যারামেলকেও তুমি চাষানী কি ধোপানী বানাবে। বাচ্চা দুটোর যে কী ভাগ্য তা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। মাটির কাছাকাছি থাকতে গিয়ে ওদের জীবন মাটি হবে। না, কমিউনিস্টরাও এত নিচে নামতে রাজী নয়। চকোলেটদের মাছের ভেড়ি আছে। সে কিন্তু একদিনও মেছুনির কাজ করে না। বিপ্লবের পরেও কি করবে? না, তার দরকার হবে না। মাছগুলো আপনা আপনি ভেড়ি থেকে বাজারে আসবে।"

সৌম্য এর পর তার আশ্রমের কথা পাড়ে। "ওটাও একটা কমিটমেন্ট। আমার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা — যেমন মধুমালতীর বাবা ক্যাপ্টেন মুস্তাফী — আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন আশ্রমটাকে ওপার থেকে এপারে উঠিয়ে নিয়ে আসতে। তারপর সপরিবারে আশ্রমিক হতে, যদি তেমন ইচ্ছা হয়। কিন্তু আপাতত আমি অত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত নই। ভাবছি আমার সতীর্থ বঙ্কিমকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এপারে চলে আসব। জুলিকে ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। নিজের আপত্তি না থাকলেও ওর মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি।"

"আমাদেরও। রানুর আর আমার।" এই বলে স্বপনদা তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝুলতে থাকা নতুন এক মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বলেন, "ওই দ্যাখ র‍্যাডক্লিফের দ্বারা চিহ্নিত সীমান্তরেখা। সীমান্তরেখা তো নয়, গ্রেট ওয়াল অভ্ বেঙ্গল। থুড়ি, গ্রেট ওয়াল অভ্ চায়না। এই প্রাচীরের ওপারে যারা বাস করে তারা এপারের লোকের চোখে হিংস্র বর্বর যবন। তেমনি, প্রাচীরের ওপারে যারা বাস করে তাদের চোখে এপারের লোক হিংস্র বর্বর কাফের। ইংরেজরা যাবার সময় নতুন এক পারমানেন্ট সেটলমেন্ট জারি করে গেছে পুরনোটার বদলে। কংগ্রেসের মতে ফাইনাল সেটলমেন্ট। আমার মতে পারমানেন্ট সেটলমেন্ট।"

সৌম্যর খেয়াল ছিল না যে ফাইনাল মানে পারমানেন্ট। সে কংগ্রেস নেতাদের দোষ ধরে। বলে, "বাপু এর জন্যে দায়ী নন। বল্লভভাই আর জবাহরলাল দায়ী। গ্রেট ওয়াল অভ্ বেঙ্গল? হ্যাঁ, এক অর্থে তাই বটে। কী দুর্ভাগ্য।"

"শোন, তোমাকে একটা মজার গল্প বলি। সত্যি গল্প।" স্বপনদা সহাস্যে শোনান। "আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন সেখানকার এক বোর্ডিং হাউস চালাতেন এক হোয়াইট রাশিয়ান ল্যাণ্ডলেডী। বিপ্লবের দশ বছর পরেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে চাকা উল্টে যাবে। তাই তিনি বলতেন, আমাকেও বলেছেন, 'স্টালিন ডায়, আই গো, এগেন প্রিন্সেস।' হা হা হা! স্টালিন আজও বেঁচে। প্রাক্তন প্রিন্সেস বেঁচে আছেন কি না জানিনে, কিন্তু রাশিয়ায় ফেরেননি। প্রিন্স ও প্রিন্সেসরা চিরকালের মতো নির্বাসিত বা নিপাতিত।"

সৌম্য পরিহাস করে, "আমরা তাঁদের তাড়িয়েও দিইনি, প্রাণেও মারিনি। তাঁদের ক্ষমতা শূন্য করে নির্বিষ ও নির্বীজ করেছি। আমাদের পদ্ধতি লিকুইডেশন নয়, স্টেরিলাইজেশন। একদিন আমরা শ্রেষ্ঠীদেরও স্টেরিলাইজ করে ট্রাস্টি বানাব।"

"তোমারও রসবোধ আছে দেখছি। তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ নও। আচ্ছা, শোন। আর একটা গল্প বলি। এটাও সত্যি। মানিকগঞ্জের মহারাজা আমাদের প্রতিবেশী। মেজকুমারও ব্যারিস্টার। সেইসূত্রে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ পাই। এই সেদিন ওঁরা আমাদের দু'জনকে তাঁদের বাড়ীর এক সন্ধ্যা পার্টিতে ডেকেছিলেন। মহারানী টুটি ফুটি ইংরেজী বলেন। যুদ্ধের মরসুমে পর্দা থেকে বেরিয়েছেন। যুদ্ধ ব্যাপারটা খারাপ হলেও তার প্রয়োজনে পুরানো সংস্কারের বাঁধ ভেঙে যায়। মহারানী বাইরে এসে ত্রাণ কার্যে যোগ দেন। লঙ্গরখানা চালান। মহীয়সী মহিলা। কিন্তু ভীষণ কমিউনাল। মুসলমানদের যেমন ভয় করেন তেমনি ঘৃণা। দাঙ্গার ভয়ে মানিকগঞ্জে ফেরেননি। কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করায় কী উত্তর দিলেন, জানো? হা হা হা! অবিকল সেই রাশিয়ান রাজবংশীয়ার ভাষায়। 'জিন্না ডায়, আই গো, এগেন মহারানী।' আমি

চুপ করে ককটেলে চুমুক দিই। কী দরকার তাঁর মনে আঘাত দেবার? স্টালিন বলো, জিন্না বলো, বল্লভভাই বলো, এঁরা অর্জুনের মতো নিমিত্তমাত্র? নিমিত্তমাত্রো ভব, সব্যসাচী। এইসব প্রিন্স আর প্রিন্সেস, মহারাজা আর মহারানী নামেই রয়েছেন। এঁদের জমিদারি যাবেই। প্রাণ যাবে না, যদি সময়ে পা দিয়ে ভোট দেন।" স্বপনদা বলেন।

সৌম্য চিন্তান্বিত ছিল। গান্ধীজী আবার অনশন শুরু করেছেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজাজীও পারেননি তাঁকে নিবৃত্ত করতে। গুণ্ডাদের সঙ্গে, তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে তিনি বলপরীক্ষায় নামবেন। কলকাতাকে গুণ্ডামুক্ত করবেন। ইংরেজ সরকারও যা পারেননি তিনি তা পারবেন। আবার সেই করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। সৌম্য স্বপনদাকে বলে, "আমরা এদিকে হাসাহাসি করছি আর ওদিকে বাপুর জীবনসঙ্কট। হিংসার প্রেস্টিজ এখন আইনের প্রেস্টিজকেও ছাড়িয়ে গেছে। উকীল ব্যারিস্টাররও এখন গুণ্ডার উকীল ব্যারিস্টার। পুলিশ যাদের হাজতে পোরে এঁরা তাদের বার করে আনেন, আবার রাস্তায় ছেড়ে দেন। প্রফুল্লদা প্রধানমন্ত্রী হয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তাই বাপুর পণ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

"ওহে আনন্দমঠের সন্ন্যাসী, ওই মানচিত্রের দিকে চেয়ে দ্যাখ মা যাহা হইয়াছেন।" স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "ছিন্নমস্তা দেবী আজ আপনি আপনার রক্ত পান করছেন। করেঙ্গে বললেই করা যায় না, মরেঙ্গে বললেই মরা যায় না। সময় এসেছে, যখন নির্মমভাবে আত্মসমীক্ষা করতে হবে। অনশনের দ্বারা আত্মহনন হতে পারে, আত্মসমীক্ষা হয় না। তোমরা চেয়েছিলে আনন্দমঠের হিন্দুরাজ্য। তাই পেয়েছ। তার সীমানার বাইরে যখন রাজ্য, তাকে জয় করার সাধ্য নেই। সঙ্কট পুনঃ পুনঃ বাধবেই। গান্ধীজীর তো একটিমাত্র প্রাণ। তোমারও তাই। তিনি কি বার বার প্রাণ দিতে পারবেন? তুমিও কি তা পারবে? হাজার চেষ্টা করলেও তোমরা হাজারটা শহীদ খুঁজে পাবে না। সেইখানেই তোমাদের লিমিটেশন। অথচ সহিংসে যুদ্ধে হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ মরণপণ সৈনিক পাওয়া যায়। তারা মরেও যেমন মারেও তেমনি। মারব না, শুধু মরব, এই পণ নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু যাদের বেলা স্বতঃস্ফূর্ত তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তোমরা একটা লেজেণ্ড সৃষ্টি করে যেতে পারো। কিন্তু সেটা ব্যর্থতার লেজেণ্ড।"

"ক্ষতি কী, স্বপনদা, ক্ষতি কী? আমরা বাঁচি আর না বাঁচি কতকগুলি প্রাণ তো বাঁচবে। অহিংসা মানে আর কিছু নয়, প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। অপরের প্রাণের প্রতি। তেমনি, নিজের প্রাণের মায়া না রাখা। মরতেই তো হবে একদিন। তবে দু'দিন আগে নয় কেন? তাতে যদি অপরের প্রাণ বাঁচে।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"তুমি দেখছি পুরোপুরি আদর্শবাদী। তা হলে তুমি রাজনীতিতে এসেছ কেন? রাজনীতিতে যারা আসে তারা কেউ অসাধ্যসাধন করতে আসে না। কারণ পারে না। গান্ধীজী চেয়েছিলেন একটা অসাধ্য সাধন করতে। ত্রিভুজকে দ্বিভুজ করতে। ত্রিকোণকে দ্বিকোণ করতে। পারবেন কেন? সেটা যে শিবেরও অসাধ্য। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, ইংরেজ ছিল না। কিন্তু সেটা হলো দু'শো বছর আগেকার রিয়ালিটি। ইংরেজ আসার পর দেখা গেল হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ এই তিনটি ভুজ নিয়ে একটি ত্রিভুজ বা তিনটি কোণ নিয়ে একটি ত্রিকোণ। ইংরেজ আর হিন্দু একজোট হলে মুসলমানের চেয়ে বড়ো। ইংরেজ আর মুসলমান একজোট হলে হিন্দুর চেয়ে বড়ো। হিন্দু আর মুসলমান একজোট হলে ইংরেজের চেয়ে বড়ো। হিন্দু আর মুসলমান একজোট হলে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্কিক্ষণে বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ রাজকে সিংহাসনচ্যুত করা অসম্ভব ছিল না। তার জন্যে গান্ধীজীর ও তাঁর রণপদ্ধতির আবশ্যক হতো না। কিন্তু যেটা না হলে চলত না সেটা দুই সহযোদ্ধার মধ্যে একটা অগ্রিম বন্দোবস্ত। নয়তো ব্রিটিশ অপসরণের দিন রাজসিংহাসনের দুই দাবীদারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। মুসলমানের আশঙ্কা হিন্দুর হাতে সে হেরে যেত। তাই যদি হবে তো হিন্দুর স্বার্থে ইংরেজকে হারিয়ে দেওয়া কেন? ইংরেজের হাতে হেরে যাওয়ার ঝুঁকি কেন? অগ্রিম বন্দোবস্তে হিন্দু নারাজ, সুতরাং হিন্দুর সঙ্গে হাত

মিলিয়ে লড়তে মুসলমানও নারাজ। সে লড়বে এককভাবে, যখন দেখবে ইংরেজ চলে যাচ্ছে ও যাবার সময় হিন্দুকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানকেও সংযুক্ত রাষ্ট্রে সমান অংশীদার করতে হবে, নয়তো তাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিক করতে হবে। দুটোর একটা না করা হলে সে পাকিস্তানের জন্যে লড়বে। হিন্দুকে তো মারবেই ইংরেজকেও ছাড়বে না। আস্ত একটা সম্প্রদায় ক্ষেপে না গেলে না করতে পারে হেন দুষ্কর্ম নেই। একই রকম দুষ্কর্ম দিয়ে তাকে হারিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তা যদি হয় তবে তার সঙ্গে কোনোদিনই মিটমাট হবে না। মিটমাট যদি অভীষ্ট হয়ে থাকে তো কালবিলম্ব না করে ইংরেজ থাকতে ইংরেজের মধ্যস্থতায় পার্টিশনের ভিত্তিতে মিটমাট করাই শ্রেয়। এর নাম রিয়াল পলিটিক। বাস্তববাদী হলে তুমিও মানবে যে এটাই আপদ্ধর্ম।" স্বপনদা মনে করেন।

"গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে মিটমাট যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। বাপুর বুক ভেঙে গেছে, স্বপনদা। কোথাও গান্ধী-আরউইন চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি, গান্ধীই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি! আর কোথায় এই শিবহীন যজ্ঞ!" সৌম্য বিলাপ করে।

"ভাই সৌম্য", স্বপনদা তার হাতে সস্নেহে চাপ দেন, "তোমার বেদনা আমারও বেদনা। তুমি এই নাটকের অন্যতম অভিনেতা আর আমি এর অন্যতম দর্শক। যেটা কমেডীতে সমাপ্ত হবার কথা সেটা সমাপ্তির পূর্বে ট্র্যাজেডীর দিকে মোড় নিয়েছে। ইংরেজ ছিল বলেই ঐক্য ছিল। ইংরেজ নেই বলেই ঐক্য নেই। আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছি। কলকাতার মুসলমানরা এখন ত্রিশঙ্কুর মতো ভারতের আসমানে ঝুলছে। থেকে যেতেও পারে, চলে যেতেও পারে। তার থেকে অনুমান করতে পারি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরও ত্রিশঙ্কু দশা। নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা আছে এর? চুম্বক আর লৌহশলাকা। ট্র্যাজেডীর আকর্ষণ দুর্বার। জার্মানদের দিকে চেয়ে দ্যাখ। আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এবার ক্যাথলিকে প্রটেস্টান্টে নয়, কমিউনিস্টে ক্যাপিটালিস্টে। তিনশো বছরেও ক্যাথলিক প্রটেস্টান্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটেনি। কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটতে দুই শতাব্দী তো লাগবেই। দর্শক আমি। হাহাকার ছাড়া আর কী করতে পারি। নিজের দেশের লোকের একই নিয়তি দেখে হায় হায় করছি।"

সৌম্য সুধায়, "কেন? এ ছাড়া কি আর কিছু হতে পারত না?"

"সেইখানেই তোমাদের মোহ। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্ট একই বংশের সন্তান। তাদের ত্রাণকর্তাও এক। ধর্মগ্রন্থও এক। কিন্তু চার্চ এক নয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রস্থল দেশের বাইরে। তার অনুশাসন মানতে প্রত্যেকটি ক্যাথলিক বাধ্য। তার যিনি মহাগুরু তিনি ত্রাণকর্তার পার্থিব প্রতিভূ। তিনি শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয়, রাজনৈতিক অনুশাসনও জারি করেন। রাষ্ট্রের আদেশ বনাম চার্চের অনুশাসন এর কোন্‌টা অগ্রমান্য? একজন জার্মান যদি পোপকে উচ্চতর স্থান দেয় তবে সে রাজার সন্দেহের পাত্র হয়। তেমনি, একজন জার্মান যদি রাজাকে উচ্চতর স্থান দেয় তবে সে পোপের অপ্রীতিভাজন হয়। আনুগত্যের সঙ্গে আনুগত্যের বিরোধ বাধবেই। গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। ত্রিশবছর ধরে জার্মানরা জার্মানদের সঙ্গে লড়ে। মোট জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ মরে। অন্যেরা পালিয়ে বাঁচে। অমনি করে জার্মানীর দুই অংশের মধ্যে একটা লোকবিনিময় ঘটে যায়। একই ব্যাপার চলেছে কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট শাসিত অঞ্চলের মধ্যে। মস্কোই হয়েছে রোম। স্টালিনই হয়েছেন পোপ। আমাদের আশঙ্কা হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা ক্রমশ প্রটেস্টান্ট ক্যাথলিকের বা ক্যাপিটালিস্ট কমিউনিস্টের সম্পর্কের অনুরূপ হতে যাচ্ছে। মুসলমান যেখানেই থাকুক তার কাছে ইসলামিক ব্রাদারহুডই অগ্রগণ্য। মক্কা থেকে যে অনুশাসন আসবে সেই অনুশাসনই তার কাছে শ্রেয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব বাধবে না, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে সেকুলার রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ বাধতে পারে। যেসব মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে থাকা পছন্দ করবে তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারা শক্ত। তেমনি, যেসব হিন্দু পাকিস্তানে থাকা পছন্দ করবে তাদের আনুগত্যও সন্দেহের অতীত

নয়। তা হলে কি লোক অপসরণই এই সমস্যার সমাধান? মাস মাইগ্রেশন?" স্বপনদা সুধান।

"জনগণ অবিভাজ্য।" সৌম্য দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম কারো কারো বেলা হবে। একদিন না একদিন দেশ আবার জুড়ে যাবে, প্রদেশ আবার জুড়ে যাবে। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে জবাহরলাল ও বল্লভভাই জাতির জনককে তাঁর বিজয়ার দিন বিসর্জন দিলেন।"

"তা যদি বলো, যাঁর দৌলতে জার্মানরা হলো এক জাতি, সেই জাতির জনক বিসমার্ককেও জাহাজ থেকে পাইলটের মতো নামিয়ে দিলেন তাঁরই হাতে গড়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। এর নাম ড্রপিং দ্য পাইলট। সেই বিখ্যাত কার্টুনটা দেখেছ নিশ্চয়।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

"অ্যান ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং অভ্ আ গ্লোরিয়াস স্ট্রাগল!" গান্ধীজীর উক্তির পুনরুক্তি করে সৌম্য। তার চোখে জল।

স্বপনদা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। "স্ট্রাগল বলতে যদি বোঝায় ওয়ার অভ্ লিবারেশন তবে তার এণ্ডিং গ্লোরিয়াসই হয়েছে, সৌম্য। এ নিয়ে একদিন এপিক উপন্যাস লেখা হবে। আর যদি বোঝায় ওয়ার অভ্ সাক্সেসন তবে এর মধ্যে বীরত্বের কতটুকুই বা দেখা গেল? দাঙ্গার পর দাঙ্গা, নরহত্যার পর নরহত্যা, নারীহরণের পর নারীহরণ, অগ্নিকাণ্ডের পর অগ্নিকাণ্ড, ধর্মান্তরীকরণের পর — না, ধর্মান্তরীকরণ নয়। তবে দুই পক্ষেরই ক্রটালাইজেশন। জয় কোনো পক্ষেরই হতো না, সিংহাসন ভাগ করতেই হতো। সিংহের ভাগটা কংগ্রেসই পেতো, কংগ্রেসই পেয়েছে। বাঘের ভাগটা লীগই পেতো, লীগই পেয়েছে। এটা একপ্রকার ডিভিজন অভ্ স্পয়েলস্। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মতো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদও একটা এলিমেন্টাল ফোর্স। ফেডারেশন, সাব-ফেডারেশন কোনোটাই তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারত না। প্যারাডক্স এই যে বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ আছে, বাঙালী মুসলমানদেরও ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু বাঙালী জাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

চায়ের ট্রে হাতে দীপিকাদির প্রবেশ। তিনি বিষণ্ণ সুরে বলেন, "এইমাত্র রেডিওতে শুনলুম সেই শচীন ছেলেটি বাঁচল না। ওর বৌ অংতরানী আমার আত্মীয়া। আমাব একবার যাওয়া উচিত। কী বলো?"

সৌম্যর দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। সে দুই হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ান দু'মিনিট নীরবতা পালন করতে। দীপিকাদির চোখে জল। স্বপনদার চোখ ছলছল।

"কী দরকার ছিল ওর শান্তিমিছিল নিয়ে জাকারিয়া স্ট্রীটে নাখোদা মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার? এ যেন মরণকে বরণ করতে যাওয়া। ওর মুসলমান বন্ধুরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জীবনের আশা ছিল। অকস্মাৎ —" দীপিকাদির কণ্ঠরোধ।

সৌম্য আত্মসংবরণ করে বলে, "আমিও ওকে ভালো করে দেখে এসেছি কাল সন্ধ্যায়। তবে আঁচ করতে পেরেছি যে ট্র্যাজেডী আসন্ন। এতগুলো আঘাত! শচীন শহীদ হতেই চেয়েছিল। অহিংসাবাদী আর কী ভাবে তার বীরত্ব প্রমাণ করতে পারে? আফসোস এই যে মানুষ শচীনকে ওর আততায়ীরা চিনল না। চিনল কেবল হিন্দু শচীনকে। কাফের শচীনকে। এরাও তো মানুষকে চিনছে না, চিনছে বিধর্মীকে, ম্লেচ্ছকে। মানুষ হিসাবে কত মহৎ ছিল শচীন!"

"তোমার বন্ধু ছিল?" স্বপনদা সুধান।

"আমার গুরুভাই। নিবেদিতপ্রাণ। নির্ভীক। ওর প্রিয় গান ছিল 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।' মাস কয়েক আগে ত্রিপুরা জেলার হৈম চরে বিপন্ন হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে সে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এবার ঝাঁপ দিল বিপন্ন মুসলমানদের বাঁচাতে। বিপন্নকে

বাঁচানোই তো ধর্ম। বীরধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। শচীন্দ্রনাথ মিত্রের মতো বীররাই ধরিত্রীর লবণ। ওর সহধর্মিণী অংশুরানীকে আমি এছাড়া আর কী বলে সান্ত্বনা দেব? চলি ওদের ওখানে।" সৌম্য আসন ছেড়ে ওঠে।

"দাঁড়াও, ভাই। আমি কাপড় ছেড়ে আসি।" দীপিকাদিও সঙ্গে যাবেন।

"আমার সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমিও যেতুম। আমার সমবেদনা জানিয়ো। তুমি কিন্তু শচীনের মতো আগুনে ঝাঁপ দিতে যেয়ো না। তোমাকে বাঁচতে হবে, দুটি দুধের বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে। এ জগতে এনেছ যখন তাদের দাবীই আগে। দেশের দাবী পরে। স্বাধীনতা অর্জনের পরে তোমার কর্তারই বা কিসের?" স্বপনদা বোঝান।

দীপিকাদি যাবার সময় বলেন, "যাব আর আসব। তুমি ততক্ষণ তোমার এই পরিপাটি খাঁচাটিতে বন্ধ থেকো। চল, সৌম্য। বেচারি অংশু।"

স্বপনদা ওদের এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, "যেমন রাজা ক্যানিউট তেমনি তাঁর পুত্র। সমুদ্রকে হুকুম দেবেন, হট যাও। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, 'আমার পরেই প্লাবন'। আমরা দেখছি ইংরেজের পরেই প্লাবন।"

দীপিকাদির সেদিন ফিরতে বেশী দেরি হয়। কথা বলতে গিয়ে বার বার কণ্ঠরোধ হয়। অতি কষ্টে বলেন, "স্মৃতীশ বলে একটা ছেলে ছিল, সেও বাঁচল না। আর ক'জনকে শহীদ হতে হবে। সৌম্যকে বোঝাতে গিয়েই আমার এত দেরি হলো। যাতে সেও শহীদ না হয়।"

"ভালোই করেছ। আমি জানতুম তুমি অকারণে দেরি করবে না। আমার কথা না ভেবে হোক, এদ্দের কথা ভেবে। কিন্তু ওই স্মৃতীশ ছেলেটি কে? ঘটনাটার বৃত্তান্ত কী?" স্বপনদা জানতে চান।

"স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার বন্ধু সুশীল দাশগুপ্ত মোটরে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। পথে দেখতে পায় একদল স্কুলের ছাত্রছাত্রী শান্তিমিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। তারা একটু এগিয়ে গিয়ে মোটর থেকে নামে ও মিছিলের উপর নজর রাখে। মিছিল লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছে দেখে থামায়। পার্ক সার্কাসের মুসলমান জনতার মুখ দেখে মনে হয় ওরা জোর করে বাধা দেবে। স্মৃতীশ মিছিলকে নিরাপদ রাস্তায় যেতে ইঙ্গিত করে। ছাত্রছাত্রীরা পালায়। জনতা তাড়া করে। স্মৃতীশ ও সুশীল ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে গিয়ে চোট পায়। ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্মৃতীশ বাঁচে না। সুশীল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।" দীপিকাদি বিবরণ দেন। যেমন শুনেছেন।

স্বপনদা উঠে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালন করেন। প্রার্থনায় তাঁর বিশ্বাস নেই। দীপিকা একাই প্রার্থনা করেন।

"নিয়তি।" স্বপনদা বলেন, "নিয়তি কেন বাধ্যতে। স্মৃতীশ মোটরে করে যাচ্ছিল। গেলেই পারত। নামতে গেল কেন?"

"ওই নিরীহ ছেলেমেয়েগুলিকে বাঁচাতে। আমি হলেও তাই করতুম। ওটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য।" দীপিকাদি বিষণ্ণ স্বরে বলেন।

"এতে কী ফল হবে? দাঙ্গা কি বন্ধ হবে? সৌম্যকে যেমন করে পারো আটকাও।" স্বপনদা বিধান দেন।

"সৌম্যর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। গান্ধীজীকে বাঁচাতে হবে। তা নইলে কেউ বাঁচবে না। এখানকার মুসলমান, ওখানকার হিন্দু। আর গান্ধীজীকে বাঁচাতে হলে গুণ্ডাদের ও তার সমর্থকদের নিরস্ত্র করতে হবে। তারা যদি স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে সরকার তাদের বেআইনী অস্ত্র রাখার জন্যে আদালতে সোপর্দ করবে না। আমি ভাবছি এই আমার সুযোগ। স্টেন গান রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওটা গান্ধীজীর পায়ে সমর্পণ করলে ওঁকে বাঁচানোর পুণ্যও হবে। আইনের

হাত থেকে নিজেও বাঁচব।" দীপিকা ফাঁস করেন।

"ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। বিক্রীও করতে পারবে না, ব্যবহারও করতে পারবে না। লাইসেন্স চাইতে গেলে সরকার কেড়ে নেবে। খেসারৎ যদি দেয় তো নামমাত্র খেসারৎ। তার চেয়ে সমর্পণ করাই ভালো। তবে নাম প্রকাশ করতে দিয়ো না। গান্ধীজী আবার গোপনতা পছন্দ করেন না।" স্বপনদা হুঁশিয়ার করে দেন।

"সৌম্যর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে আরো অনেকে যখন অস্ত্র সমর্পণ করবে তখন আমার স্টেন গানও সেই স্তূপের মধ্যে থাকবে। কোনটা কার তার লেবেল থাকবে না। সরকারও কাউকে নাম প্রকাশ করতে বলবে না। অস্ত্রটা একটা সৎকাজে লাগবে। মহাত্মার প্রাণরক্ষা। তুমি অনুমোদন করো তো?" দীপিকাদি সুধান।

"আমার অনুমোদন চাইলে কি আমি ওই অস্ত্র বাড়ীতে রাখতে দিতুম? কমিউনিস্টরা ওটা প্রথম সুযোগেই হাত করত।" স্বপনদা সন্দেহ করেন।

সে রাতে দীপিকাদি নিজেও ঘুমোননি, স্বপনদাকেও ঘুমোতে দেননি। তাঁকে আকুল করেছিল এই চিন্তা যে রোজ রোজ শচীন ও স্মৃতীশের মতো আদর্শবাদী যুবকরা শান্তির জন্যে আত্মদান করবে আর তাদের মায়েরা আর স্ত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়বে। কেন? কেন? কেন? হিন্দু মুসলমানের শরিকী মামলার তো নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তার জের টেনে কার কী লাভ?

"তা নয়।" স্বপনদা বলেন, "হিন্দুদের মতলবটা এখন কলকাতাকে মুসলিমশূন্য করা ও মুসলমানদের সম্পত্তি গ্রাস করা। ওপারের মুসলমানদেরও সেই একই মতলব। পূর্ববঙ্গকে হিন্দুশূন্য করা ও হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করা। এপারে গান্ধীর কথায় কেউ কান দিচ্ছে না, ওপারে জিন্নার কথায়ও কেউ কান দিচ্ছে না। পাঞ্জাব জুড়ে চলেছে গায়ের জোরে লোকবিনিময়। খবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ লাখ হিন্দু মুসলিম শিখ পরস্পরের হাতে মরেছে আর ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় এক কোটি, দুই বিপরীত অভিমুখে। গান্ধীজী যদি অনশনে মারা যান দুই বাংলায় কী কাণ্ডটা হবে তুমি অনুমান করতে পারো, রানু।"

"না, গান্ধীজীকে মরতে দেওয়া হবে না। সৌম্য আমাকে বুঝিয়েছে ওঁকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায় গুণ্ডাদের ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নিরস্ত্র করা। ও জানত না যে আমার কাছে মোক্ষম অস্ত্র রয়েছে। স্টেন গান। কিন্তু দেখলুম ওকে জানালে চলবে না। ওর সহযোগিতায়ই আমি অস্ত্র সমর্পণ করব। ওকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। অস্ত্র সমর্পণ করেছি বলে আমি নাম যশ চাইনে। গান্ধীজীকে বাঁচাতে, শচীন স্মৃতীশদের মতো ছেলেদের বাঁচাতে আমি এই ত্যাগ স্বীকার করতে চাই। তুমি যথাকালে জানবে। কাল সকালেই আমি বেরিয়ে পড়ব। এলফকে দেখো। নিজেকেও।" দীপিকাদি বলেন।

"ওটা গঙ্গায় বিসর্জন দিলে হয় না? কাজ কী কাউকে জানিয়ে? সেও তো আর কাউকে জানাবে।" স্বপনদা বলেন।

"না, না, গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলে মরাল এফেক্ট হবে না। গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখুন যে একজন অজানা কেউ স্টেন গান সমর্পণ করেছে। পাবলিকের মধ্যেও এর সুফল ফলবে। শান্তি আসবে।" দীপিকাদি দৃঢ়মতি।

পরের দিন হিন্দু মুসলমানের মিশ্র মিছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। কেউ বাধা দেয় না। ছোরা ছুরি চালায় না। শচীন ও স্মৃতীশের প্রাণদানই পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হাজার জন পুলিশম্যান যা করতে পারত না দু'জন শহীদের আত্মদান তা সম্ভব করে। অবশ্য গান্ধীজীর অনশনও। লোকের মনে শঙ্কা জাগে মহাত্মাও হয়তো ওই যুবকদের মতো আত্মদান করবেন। তাঁকে বাঁচাতে হলে গুণ্ডাদের নিরস্ত্র

করা চাই।

বেলেঘাটার সেই গুণ্ডারা তাঁর কাছে গিয়ে অস্ত্রসমর্পণ করে ও অনুশোচনায় কাঁদে। বলে, "আপনি আমাদের যে শাস্তি দিতে চান সেই শাস্তি দিন। তিনি বলেন, "আমি তোমাদের এই শাস্তি দিচ্ছি যে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ী দখল ফিরিয়ে দেবে ও এখন থেকে তাদের প্রাণরক্ষার ভার নেবে।" তারা রাজী হয়ে যায়। মুসলমানরা ঘরে ফেরে।

এর চেয়েও বড়ো মিরাক্ল ঘটে যখন এক ট্রাক-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর সামনে হাজির হয়। তাতে ছিল হ্যাণ্ড গ্রেনেড, স্টেন গান, পিস্তল, ছোরা ছুরি প্রভৃতি হরেক রকম হাতিয়ার। সবাই অবাক। অবাক হন না শুধু দীপিকাদি, সৌম্য ও তার বন্ধু পুলিশ অফিসার তপন জোয়ারদার।

দীপিকাদি অনশনভঙ্গ নিরীক্ষণ করে বাড়ী ফিরলে স্বপনদা বলেন, "তা হলে সব ভালো যার শেষ ভালো। রেডিওতে শুনেছি।"

"হ্যাঁ, কলকাতা বেঁচে গেল। তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলাও। সৌম্যকে আমি আটক করেছি। কঙ্ক আর কৃষ্ণার মুখে ভাত দিতে হবে। বৃদ্ধের অন্নপ্রাশনের পর শিশুর অন্নপ্রাশন।" দীপিকাদি মিষ্টি হাসেন।

চমৎকার একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে এমন সময় জুলিদের বাড়ীর পুরনো বাবুর্চি আবু তালিব মুশকিল বাধায়। বলে, "পাকিস্তান আমার আপনার দেশ। হিন্দুস্থান আমার পরদেশ। এখান থেকে একদিন আমাকে তাড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে আগে থেকে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু যাব কোন্ পথে? শুনছি দিল্লী হয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। মুসলমান দেখলেই শিখেরা কেটে ফেলছে। হিন্দুরাও দুশমনি করছে। একদল মুসলমান বোম্বাই থেকে জাহাজে করে করাচী যাচ্ছে, সেখান থেকে পাঞ্জাবে যে যার জায়গায় যাবে। আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী। এই তো মওকা। আবার গান্ধী বাবা কবে আসবেন, কলকাতাকে ঠাণ্ডা করবেন। কলকাতা কি বেশী দিন ঠাণ্ডা থাকবে? আমাকে মেহেরবানি করে ছেড়ে দিতে মর্জি হয়, মেমসাহেব। শুধু রাহা খরচাটা দিলেই চলবে।"

এই বাবুর্চিকেই এক বছর আগে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে জবাব দেওয়া হয়েছিল। তার হাতে দেওয়া হয়েছিল রাহা খরচ আর তিনমাসের তলব। পেনসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে একদিন ফিরে আসে। দেশে তার মন লাগে না। জুলি তাকে লুকিয়ে রাখে। বাইরে বেরতে দেয় না। বাজার করাটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। ওরই নিরাপত্তার খাতিরে। তাতে ওর উপরি রোজগার বন্ধ হয়। সেকথা ও মুখ ফুটে জানাতে পারে না। জুলির মাথায় ঢোকে না। কিন্তু তার মা সব বোঝেন। কী করবেন? প্রাণরক্ষা ও বাজার করা দুই একসঙ্গে চলে না। তিনি ওর মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেন।

আবু তালিবকে আগের মতো টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। তাহলে বাবুর্চিখানার দায়দায়িত্ব নেবে কে? দীপিকাদি বলেন, "তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। আমাদের পুরনো বাবুর্চি জামাল এসে সাধাসাধি করছে তাকে ফিরিয়ে নিতে। তোমার দাদা তো মুসলমান বলতেই অজ্ঞান। বিশেষত সেই মুসলমান যে ফরাসী রান্না শিখেছে। তোমার দাদারই কাছে থাকতে তিনি ওকে চন্দননগরে পাঠিয়ে কয়েকটা পদ শিখিয়ে এনেছিলেন। আমার কিন্তু জামালকে ফিরিয়ে নিতে সাহস হচ্ছে না। তোমার যদি সাহস থাকে তুমিই ওকে আপাতত দু'মাসের জন্যে ধার নাও। পরে আমরা ওকে ফিরিয়ে নিতে পারি, মুসলমান সম্প্রদায়ের মন ও মেজাজ বুঝে। হিন্দু সম্প্রদায়েরও মন ও মেজাজ বুঝতে হবে। হিন্দুরাই হয়তো একদিন ওকে খতম করবে, ওর নিজের দোষে নয়, ঢাকার বা চাটগাঁর বদলা নিতে। গান্ধীজী পাঞ্জাব না গিয়ে পূর্ববঙ্গে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু পাঞ্জাব যাবার জন্যে দিল্লী থেকে জরুরি ডাক এসেছিল। নেহরু, প্যাটেল, মাউন্টব্যাটেন হৈ হৈ করে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ করে এখন হালে পানি পাচ্ছেন না। ডাক গান্ধীকে। যিনি পই পই করে বারণ করেছিলেন। গান্ধী না হলে এ আগুন

নেবাবে কে? যেমন বাংলাদেশে তেমনি পাঞ্জাবে।" দীপিকাদি অন্নপ্রাশনের সব ঠিক করেন।

জামাল এসে রান্না করার ভার নেয়। বাজার করারও। ওকে লুকিয়ে রাখতে হয় না। ইতিমধ্যে ও দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দেখতে হিন্দুর মতো হয়েছে। কিন্তু পায়জামার বদলে ধরেছে প্যান্ট। হিন্দু সাজাও বিপজ্জনক। সাহেবের মার নেই।

।। তেইশ ।।

অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে মীর সাহেবের সঙ্গে দেখা। "কেমন আছেন, মীর সাহেব?" মানস সুধায়।

"জান আছে। মান গেছে।" মীর সাহেব আক্ষেপ করেন। "আমি বাংলাদেশের সন্তান। বাংলাভাষার লেখক। দেশবন্ধুর আমলের জাতীয়তাবাদী মুসলমান। আমাকে বলে কিনা, আপনি এদেশে আছেন কেন? আপনি কি পাকিস্তানের পঞ্চমবাহিনী? চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এ বাড়ী খালি করে দিন। নয়তো আপনাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে। টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন কাটা। মোটরে উঠতে গিয়ে দেখি টায়ার ফুটো। ঘরে বসে ভাবছি কী করা যায় এমন সময় মা টুকটুক এসে হাজির। ওরা তর্ক করে। বলে, এটা হিন্দুস্থান। এখানে মুসলমানদের থাকা চলবে না। টুকটুক বলে, এটা ইণ্ডিয়া। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান সকলেরই থাকার অধিকার। কাউকে বহিষ্কার করতে হলে সরকার করবেন আইন অনুসারে। আপনারা কি সরকারের পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন? ওরা শাসায়। সাপকে মারতে লাঠি লাগে। আইন লাগে না। টুকটুক তখন তার দলবল ডেকে নিয়ে আসে। পালা করে পাহারা দেয়। পুলিশ এসে পড়ে।"

"আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন?" মানস বলে, "আপনি একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। আপনার উপর এমন উৎপাত!"

"যারা গান্ধীজীর মাথা তাক করে লাঠি ছুঁড়তে পারে, ইট ছুঁড়তে পারে ওদেরই তো রাজত্ব। রুল অভ্ ল বলে কিছু আছে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গেছে, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ এসেছে। মহাত্মারও সাধ্য নেই যে এইসব হামলাকারীদের আইন দিয়ে রুখবেন। তিনি অনশন দিয়ে হৃদয় জয় করেছেন কতক লোকের কতক সময়ের জন্যে। কিন্তু গুণ্ডারা এখন সমাজে অচল হয়েছে। পার্টিতে আমল পেয়েছে। কংগ্রেস কি আর সেই কংগ্রেস আছে? পুলিশেও গুণ্ডাদের লোক ঢুকেছে। কলকাতার চেয়ে দিল্লী তো আরো ভয়ানক। সরকার সামলাতে পারছেন না, গান্ধীজীকে ডেকে নিয়ে গেছেন। তাঁর মন্ত্র করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মরেঙ্গের আশঙ্কাই বেশী।" মীর সাহেব শিউরে ওঠেন।

"না, না, তা কখনো হতে পারে না। মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো দিল্লীও কলকাতার মতো শান্ত হবে।" মানস অভয় দেয়।

"হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা লাখে লাখে জুটেছে। মুসলমানদের তারা তিষ্ঠতে দেবে না। তাদের বাড়ী বেদখল করবে, মসজিদ বেদখল করবে, কবরস্থান বেদখল করবে। এর নাম নাকি লোকবিনিময়। জিন্না যখন লোকবিনিময়ের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তখন সকলেই একবাক্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এখন প্রতিবাদকারীদের মুখেও সেই বাক্য শোনা যাচ্ছে। দুই নেশনতত্ত্ব ছিল সকলের নিন্দনীয়। এখন বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবে। যাঁরা এটা সমর্থন করছেন তাঁরা কি ভবিষ্যতে কী আসছে তা দেখতে পাচ্ছেন না? একদিন হিন্দু ও শিখ হবে দুই নেশন। দেখবেন কী করে? হিন্দু সাম্রাজ্যবাদই তাঁদের চোখে চিরন্তন সত্য। তাঁরা আপাতত মুসলমানদের এদেশ থেকে খেদাবেন। পরে আরো বলবান হলে পাকিস্তান জয় করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করবেন। তখন মুসলমানরা হবে হিন্দুদের কৃপার পাত্র। যদি না বিতাড়িত হয়। ফিরবে তো সেই আরবে, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়।" মীর সাহেব আবেগের

সঙ্গে বলেন।

মীর সাহেব যে মর্মাহত হয়েছেন তা উপলব্ধি করেন স্বপনদা। বলেন, "ওটা অশুভ চিন্তা, মীর সাহেব। কংগ্রেসের এত বল নেই যে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। পাকিস্তানকে গ্রাস করার জন্যে ভারত যদি যুদ্ধে নামে করাচীর দিক থেকে ছুটে আসবে আমেরিকা আর খাইবারের দিক থেকে সোভিয়েত রাশিয়া। পাকিস্তান তো ভাগ হয়ে যাবেই, ভারতও ভাগ হয়ে যেতে পারে আবার। হিন্দু সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ওটা একটা বস্তাপচা মামুলী মতবাদ। বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মুসলমানরা যার যেখানে খুশি সেখানে বাস করবে। হিন্দুরাও যার যেখানে খুশি সেখানে। রাষ্ট্র ভাগ হয়েছে বলে অধিবাসীদেরও ভাগ করতে হবে এটা বিংশ শতাব্দীতে অচল। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। পাকিস্তান চিরকাল মধ্যযুগে পড়ে থাকবে না।"

মানস বলে স্বপনদাকে, "তোমার ওকথা পূর্ব পাকিস্তানের বেলা খাটতে পারে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান হচ্ছে আর একটা আফগানিস্থান। ওর ভৌগোলিক অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে আর ঐতিহাসিক অবস্থান মধ্যযুগে। আফগানিস্থানও এককালে অন্য নামে ভারতের সামিল ছিল। সেটা ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেশ। ইসলাম গ্রহণ করার পরও ভারতের সামিল থেকে যায়। কিন্তু দু'শো বছর আগে নাদির শাহ্ তাকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তখন থেকেই সে বিচ্ছিন্ন। একই কাজ করলেন পাকিস্তানের বেলা মহম্মদ আলী জিন্না। দু'শো বছর পরে যারা জন্মাবে তাদের চোখেও পাকিস্তান আফগানিস্থানের মতো মুসলমানদের দেশ, যেখানে একদা হিন্দু ও শিখ বাস করত। তফাতের মধ্যে এই যে ভাষাগত কিছু মিল আছে।"

"ভাষাগত মিল আফগানিস্থানের সঙ্গেও আছে, মল্লিক সাহেব। পশ্‌তু কি একটি আর্যভাষা নয়? তা সত্ত্বেও আফগানরা ভারতীয় মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। দু'শো বছর আলাদা থাকার ফল। পাকিস্তানী মুসলমানদের সঙ্গেও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের বিয়ে সাদী বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। আত্মীয়তাবন্ধন ছিন্ন হলে ইসলামও তাকে জোড়া দিতে পারে না। তুর্ক ও আরবদের দিকে তাকান। ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানী মুসলমানদের সামাজিক বিচ্ছেদ অনিবার্য। ইংরেজরাও যেটা করতে পারেনি লীগ সেটা করল।" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

"আপনি কি মনে করেন পাশপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তিত হবে? যেমন হয়েছে আফগানিস্থানের সঙ্গে।" মানস সুধায়।

"অবশ্যম্ভাবী। কোনো রাষ্ট্রই লোক চলাচল অব্যাহত রাখে না। সীমান্ত খোলা রাখলে মাল পাচার হবে।" মীর সাহেব বলেন।

"বাংলাদেশ যে দুই দেশ হবে এটা আমি ভাবতেই পারিনি, মীর সাহেব। এত মিল আমাদের মধ্যে। অমিল কতটুকু?" মানস বলে।

"কেউ ভাবতে পারেনি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আর নোয়াখালীর হাঙ্গামার থেকে এর সূচনা। মুসলিম লীগের ভুল চাল থেকেই এই বিচ্ছেদ। এখন আর পেছনে ফেরা চলবে না। সেবার কাটা বাংলা জোড়া লেগেছিল। এবার আর জুড়ে যাবে না। এখন শুধু দেখতে হবে লোকবিনিময় যাতে না হয়। তা যদি হয় তবে হিন্দুশূন্য পূর্ববঙ্গ তৃতীয় এক আফগানিস্থানই হবে। আর মুসলিমশূন্য পশ্চিমবঙ্গ সেকুলার স্টেটের অঙ্গ থাকতে পারবে না। নেপালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" মীর সাহেব আশঙ্কা করেন।

মানস বলে, "হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের ব্যর্থতার নিদর্শন এই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ। এর উপর যদি কেউ বলেন লোকভাগ করলেই এ সমস্যা চিরকালের মতো মিটে যাবে তা হলে আমি বলব, তাই হোক। কিন্তু তাতেও কি মিটবে? তখন এঁরাই বলবেন যুদ্ধ বাধাতে। হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে যুদ্ধ। আমি বলব, বেশ, তাই হোক। কিন্তু তাতেও কি

মিটবে? শেষপর্যন্ত এক তৃতীয় পক্ষকে খাল কেটে ডেকে আনা হবে। আবার পরাধীনতা। সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পরাধীনতায় অভ্যস্ত। তারা সেটা সহজেই মেনে নেবে। মানবে না তারাই যারা স্বাধীন দেশে বাস করেছে, স্বাধীনতার স্বরূপ দেখেছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু আরো একবার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করার মতো বল বয়স তাঁদেরও নেই। তাই মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফের সহায়তায় এই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ। এটা আদর্শ সমাধান নয়। এটা বাস্তবের কাছে নতিস্বীকার। যারা নতিস্বীকারে নারাজ হয়েছে তারা ঘরবাড়ী জায়গা জমি ছেড়ে পূর্ব পাঞ্জাবে বা পশ্চিম পাঞ্জাবে দলবলে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাড়ি দিয়েছে। মারামারি করে মরেছেও বিস্তর। এধারেও তেমন কিছু হতে পারত। কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি। যাতে না হয় তার জন্যেই উভয় সম্প্রদায়ের শুভার্থীরা সচেষ্ট। কিন্তু মানুষের দুর্মতিরও তো সীমা নেই। সে তার দুর্মতি দিয়ে দুর্গতি ঘটাবে আর বিপাকে ফেলবে তার প্রতিপক্ষকে। গান্ধীকে, জবাহরলালকে, কংগ্রেসকে। যেহেতু সরকার এখন এঁদের হাতে। পশ্চিম প্রান্তে যাই হোক না কেন পূর্বপ্রান্তে লোকবিনিময় একটা কৃত্রিম প্রয়াস। একে প্রতিহত করা কর্তব্য। বাংলাদেশ যেন পাঞ্জাব না হয়।"

"কথাটা সত্যি। কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে এক হাতে তালি বাজে না। বিস্তর বিহারী মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়ে জুটেছে। বাঙালী হিন্দুকে তারা মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে। শিকড়হারা বাঙালী হিন্দু যদি শিকড়ের সন্ধানে পশ্চিমমুখী হয় তবে সেটা নিতান্ত নাচার হয়েই। সেরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বাধানোর প্রস্তাব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? জবাহরলাল নন। গান্ধী তো ননই। যুদ্ধ যদি না বাধে কিংবা বাধলেও সফল না হয় তবে লোকসমাগম পশ্চিমবঙ্গকে বাসের অযোগ্য করবে। বদলা নিতে গেলে পূর্ববঙ্গও বিহারীতে ভরে যাবে, বাঙালী সংখ্যানুপাত কমে যাবে। ওখানেও জীবনযাত্রা দুর্বহ হবে, মল্লিক সাহেব।" মীর সাহেব বলেন।

স্বপনদা বলেন, "অমনি করেই শিক্ষা হবে কে নিকটতর আত্মীয়। বাঙালী হিন্দু না বিহারী মুসলমান। কে আরো আপন। বাঙালী মুসলমান না অসমীয়া হিন্দু। ধর্মের মতো ভাষাও এক প্রবল শক্তি। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের পরে ভাষাভিত্তিক দ্বন্দ্ব এসেছে। নেশন বলতে এখন বোঝায় সাধারণত ভাষাভিত্তিক নেশন। তিন শতাব্দী পূর্বে জার্মান প্রটেস্টান্টরা যেত ফরাসী প্রটেস্টান্টদের হয়ে লড়তে। আর ফরাসী ক্যাথলিকরা যেত জার্মান ক্যাথলিকদের হয়ে লড়তে। চাকা ঘুরে গেছে। আর সে রকম হয় না। এখন জার্মান প্রটেস্টান্ট ও জার্মান ক্যাথলিক লড়ে জার্মান জাতির হয়ে ফরাসী ক্যাথলিক ও ফরাসী প্রটেস্টান্টের সঙ্গে। জাতি এখন ভাষাভিত্তিক। কয়েক শতক পরে এ দেশেও তাই হবে। রাজনীতিতে শেষকথা বলে কিছু নেই। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ, লোক ভাগ, গৃহযুদ্ধ কোনোটাই না। ব্রিটিশ আমল এখন একটা বিস্মৃত অধ্যায়। হিন্দু মুসলিম বিরোধও আরেকটা বিস্মৃত অধ্যায় হবে। নতুন অধ্যায় হবে ক্যাপিটাল বনাম লেবার। দেশ আবার দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে। ইস্ট জার্মানী, ওয়েস্ট জার্মানী।"

সৌম্যর বিয়েতে তার গুরুজনরা কেউ যোগ দেননি। কিন্তু তার ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে তার ছোটকাকা আপনা হতে এসে অগ্রণী হন। কথা ছিল স্বপনদা মুখে ভাত দেবেন ছেলের আর মানস মেয়ের। কিন্তু ছোটকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকেই সে ভার দেওয়া হয়। তবে নামকরণটা তাঁকে দিয়ে হবে না। তিনি ভেবেছিলেন ছেলের নাম হবে হরিনারায়ণ আর মেয়ের নাম কাত্যায়নী। সৌম্য তাঁকে থামিয়ে নাম রাখে মোহন ও নিবেদিতা। যে দু'জনকে সে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করে।

দীপিকাদি ক্ষুব্ধ হন। "কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা কী দোষ করল?"

"নন্দন আর নন্দিনী কেন খারিজ হলো?" যূথিকাও স্তব্ধ।

জুলি তাদের মান ভঞ্জন করে। "তোমরা তোমাদের দেওয়া নামেই ডেকো। গোলাপকে যে নামেই

ডাকবে সে তেমনি সৌরভ বিতরণ করবে। কিন্তু সৌম্যর কাছে মোহনদাস গান্ধীই আদর্শ পুরুষ আর ভগিনী নিবেদিতাই আদর্শ নারী। ওর দিক থেকে ও ঠিকই করেছে। আমার উপর ছেড়ে দিলে আমি আমার মেয়েকে জোন অভ্ আর্কের আদর্শেই মানুষ করতুম। নামটাও তার কাছাকাছি হতো। জীয়ন।"

"জীয়ন?" দীপিকা ও যূথিকা দু'জনেই মাথা নাড়েন। কিন্তু বাবলী তা শুনে বলে, "জীয়ন হবে এই মরা দেশের জীয়ন কাঠি। আহা, কী মধুর নাম। কোথায় পেলি রে তুই এ নাম?"

"আর ছেলের নাম কী রাখতে?" দীপিকাদি সুধান।

"আমার ছেলে হবে ওর বাপের মতো অবিকল্প পুরুষ। ওর বাপ দায়ে পড়ে রাজনীতি করছে, কিন্তু রাজনীতি ওর প্রকৃতিগত নয়। আমার ছেলের বেলা সে রকম কোনো দায় থাকবে না। সে গীতা কিংবা উপনিষদ্ লিখবে। এমন কিছু দিয়ে যাবে যা হাজার বছর পরেও লোকে পড়বে। অত্রি নামটি কেমন? ও কী? হাসছ যে?" জুলি অপ্রস্তুত হয়।

"প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন বৃথা। উপনিষদ্ ওই একবারই হয়েছে, গীতাও একবার। আড়াই হাজার বছরেও যা আর হয়নি তা আর হবার নয়, জুলি।" দীপিকাদি বলেন।

কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না। ও প্রসঙ্গ চাপা পড়ে।

টুকটুক বলে, "আমার হস্‌পিস আর চালাতে পারছিনে। ভাবছি ওটা আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমার হাতে তুলে দেব। যার কর্ম তারে সাজে। আমার কর্ম নাচ গান অভিনয়। এ বয়সে আর পেশাদার হতে পারব না। কিন্তু এ্যামেচার তো হতে পারি। কিন্তু হিন্দু আর মুসলিম মেয়েদের ভাগ্য খ্রীস্টানদের হাতে সঁপে দেওয়া কি ঠিক হবে? ওদের যদি আপত্তি থাকে? বাচ্চাও হয়েছে দুটি মেয়ের। একটি হিন্দু, একটি মুসলিম। হিন্দুদের তো হরেক প্রতিষ্ঠান আছে। ওরা নিয়ে গেলে পারে। তেমনি, মুসলমানদেরও তো প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। তারাই বা নিয়ে যায় না কেন? হ্যাঁ, দুটিই মেয়ে। মেয়েদের কেউ নেবে না। এক বেশ্যা ছাড়া। ওদের যখন অন্য গার্জেন নেই, আমিই গার্জেন, তখন আমি যা করব তাই হবে। কেবল হস্‌পিসবাসিনীদের সম্মতি চাই।"

"হিন্দু মুসলমানের জাতিবিবাদের ফলে রোমান ক্যাথলিকদের প্রভাব বৃদ্ধি। কিন্তু আমি, ভাই, এ দায় বইতে পারব না।" দীপিকাদি বলেন।

"আমিও না। আমার হাত জোড়া।" জুলি অমত জানায়।

টুকটুক যূথিকার দিকে তাকায়। যূথিকা বলে,"আমাদের তো বদলীর চাকরি। ইচ্ছে থাকলেও আপনার হস্‌পিসের দায়িত্ব নিতে পারিনে। যে কোনো দিন বদলীর হুকুম আসবে আর আমাদের তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।"

এবার বাবলীর পালা। সে বলে,"খুশি হয়েই এ ভার নিতুম। যত সব সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টান কনভেন্ট খুলে ইস্কুল খুলে হাসপাতাল খুলে এদেশে জমিয়ে বসেছে। কিন্তু প্রথম কাজটা প্রথমে। প্রথম কাজ হলো সমাজবিপ্লব। শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক বলতে কৃষকও বোঝায়। বিপ্লবের পরে দেখবে মিশনারীদের কাজ আমরাই চালাব।"

"ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না, দিদি। যে কাজ আমার নয় সে কাজে একটা বছর দিয়েছি। আর নয়। আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমার হাতেই আমার হস্‌পিস সঁপে দেব।" টুকটুক জানায়।

দীপিকাদি বলেন, "ধীরে, টুকলি, ধীরে। এ চ্যালেঞ্জ এখন কলকাতায় বা নোয়াখালীতে নিবদ্ধ নয়। সুকুমার দিল্লী থেকে লিখেছে পাঞ্জাবে যা হয়েছে তা এর শত গুণ কি সহস্র গুণ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ তিন সম্প্রদায়ের কুমারী, সধবা, বিধবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষদের কবলে পড়েছে। মুসলমানরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে সাদী করেছে। শিখরাও শিখ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বিয়ে করেছে। হিন্দুরা কিন্তু হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিয়ে জাতে তুলতে পারে না। তাই বধ করে।"

"কী করে? কী করে? কী করে?" টুকটুক, জুলি, বাবলী চেঁচিয়ে ওঠে।

"আমাকে জেরা করে কী হবে? সুকুমার স্বপনকে যা লিখেছে আমি তাই বলেছি। হিন্দুরা মুসলিম কন্যাদের বিয়ে না করে বধ করে। বাঁচিয়ে রাখলে পাছে ধরা পড়ে।" দীপিকাদির কণ্ঠে ক্রোধ।

"না না, এটা কখনো সত্য হতে পারে না। আর কী লিখেছে সুকুমারদা?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"লিখেছে সব সম্প্রদায়ের নারী উদ্ধারের জন্যে মহিলারা একটা টীম গঠন করেছেন। মৃদুলা সরাভাইয়ের নেতৃত্বে। মিলিও জুটে গেছে তাঁর সঙ্গে। তাঁরই মতো পুরুষালি জীন্স পরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। জীপে চড়ে বিপজ্জনক জায়গায় যায়। পকেটে রিভলভার। পাকিস্তান গভর্নমেন্টও তাঁদের এলাকায় ঢুকতে দেন। কারণ কাজটা তো মুসলিমদের স্বার্থে। মোট ক'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলতে পারা যাচ্ছে না। গোপন রাখতে হচ্ছে। তবে কলকাতার চেয়ে নোয়াখালীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাদের আপনজনদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। কিন্তু আপনজনদেরই অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বা পাওয়া যায় হিন্দুরা সাধারণত অনিচ্ছুক। বড়ো ঘরের হয়ে থাকলে শিখ ও মুসলমানরাও তাই। বড়ো ঘরের মেয়েদের ছোট ঘরে বিয়ে দেওয়াই বোধহয় সমীচীন। কিন্তু তেমন এক সমাজবিপ্লবের জন্যে কোনো সমাজই প্রস্তুত নয়। তা হলে কি উদ্ধার আশ্রমই তাদের স্থায়ী আবাস? তার ভার কে নেবে? গান্ধীজীকে তো লোকে প্রোফেট বলে। যেমন বুদ্ধকে আর যীশুকে। তা হলে তাঁর শিষ্যদেরই কর্তব্য এই নিগৃহিতা নারীদের জন্যে বিহার বা কনভেন্ট স্থাপন করা। এঁদের শিশুদের জন্যেও, যদি সন্তান হয়। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এর মুখোমুখি হতে হবে। মিশনারীদের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। যদিও তারা আগ্রহী।" দীপিকাদি ধর্মান্তরীকরণকে ভয় করেন।

"সমুদ্রমন্থনে অমৃতের সঙ্গে গরলও উঠেছিল। এখন দেখছি সকলি গরল ভেল। কে এত গরল কণ্ঠে ধারণ করবে? বেচারা বাপু!" যূথিকা দুঃখ করে।

ওদিকে সৌম্য ব্যস্ত ছিল ওর খুড়োকে নিয়ে। তিনি বলেন, "আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন? পূর্ববঙ্গ এখন পূর্ব পাকিস্তান। দেশে ফিরে চল, সবাই দেখতে চাইছে বৌমাকে আর নাতিনাতনীদের। আহা, ছেলে নয় তো, সোনার চাঁদ, মেয়ে নয় তো, হীরের টুকরো। সমাজ কে? সে তো আমি।"

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই যেমন বলেছিলেন, "রাষ্ট্র কে? সে তো আমি।"

খুড়োই যে গ্রামের সমাজ এতদিন এটা সৌম্যর মালুম ছিল না। সে বলে, "একে বিধবাবিবাহ, তার উপর অসবর্ণ। অসধর্মও বটে। ওঁরা ব্রাহ্ম। তোমার সমাজ নেবে?"

"নেবে না তো কী? কানু গান্ধী আর আভা গান্ধী কি সবর্ণ? বেনে আর ব্রাহ্মণ। এখন স্বরাজ এসেছে। তার সঙ্গে নতুন জোয়ার এসেছে। মন্ত্রীরা তো আমাদেরই লোক। একজনকে ধরে নিয়ে আসব। বৌমা পরিবেশন করবেন। কেমন না খায় দেখব। মস্ত বড়ো ভোজ দেব। সব জাতের মানুষ একসঙ্গে বসে খাবে। তবে মুসলমান সম্বন্ধে একটু খুঁত খুঁত করবে। ওরা গোরু খায় কিনা। ওটুকু তোমাকে সহ্য করতে হবে, বাবাজী।" ছোটকাকা অনুরোধ করেন।

"ওইটুকু তো আসল। ওর জন্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল। বাপু বেলেঘাটায় মুসলমানের বাড়ীতে অতিথি হন। ওরাই রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু এমন কিছু খাওয়ায় না যা তাঁর ধর্মবিরুদ্ধ। মুসলমানের বাড়ীতে অতিথি হলে আমিও ওদের হাতে খাই। তবে নিষিদ্ধ মাংস খাইনে। থাক, ছোটকাকা, এযাত্রা থাক। বাচ্চা দুটো রেলের ধকল সইতে পারলেও গোরুর গাড়ীর ধকল পোহাতে পারবে না। ওরা আর একটু বড়ো সড়ো হোক। ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে আসুক।" সৌম্য বোঝায়।

খুড়ো আহত হন। বলেন, "তোমাকে সংসারী দেখব আশা করিনি কোনোদিন। দেশকে স্বাধীন দেখব তাও আশা করিনি। তুমি বিবাহ করেছ, আমাদের বংশরক্ষা হয়েছে। কত বড়ো আনন্দের কথা! কিন্তু আরো এক দফা অন্নপ্রাশনে তুমি এমন একটা শর্ত আরোপ করছ কেন? হিন্দু মুসলমানের

সম্প্রীতি। সেটা কি চারটিখানি কথা? আগে তো গোহত্যা বন্ধ হোক।"

"আজ তুমি যাঁর সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেলে তিনি কে, জানো? মীর আবদুল লতিফ, ব্যারিস্টার।" সৌম্য বোমা ফাটায়।

"সর্বনাশ। মুসলমান! লোকে টের পেলে আমাকে একঘরে করবে। শেষে কি পিরিলী বামুন হব!" খুড়োর খেদ।

"ওই যে দেখছ যশোধরা রায় ও পিরিলী বামুনের মেয়ে। ওর এক বিয়ে মুসলমানের সঙ্গে, আরেক বিয়ে আমেরিকানের সঙ্গে।" সৌম্য হাসে।

"হাসির কথা নয়, বাবাজী। আমি বজ্রাহত।" খুড়ো হতভম্ব।

"আর রান্না করেছে কে শুনবে? শেখ জামাল। স্বপনদা বলেন, শেখ জামাল অবশ্য একা নয়। বাড়ীর মেয়েরা সাহায্য করেছেন।" সৌম্য জুড়ে দেয়।

"কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং। রাম রাঘব পাহি মাং।" মথুরানাথ বাবু জপ করেন। "এখন এক চুমুক গঙ্গাজল পাই কোথায়?"

পাশের বাড়ী থেকে গঙ্গাজল আনিয়ে নেওয়া হয়। খুড়ো শান্ত হন।

দেশে ফেরার সময় তিনি বলেন, "দ্যাখ, সোমু, গান্ধী মহারাজের সব ভালো, কিন্তু ওই এক দোষ। যুধিষ্ঠির মহারাজের যেমন জুয়াখেলা, গান্ধী মহাত্মার তেমনি মুসলমানপ্রীতি। তুমিও তাঁর চেলা। সবাই যদি মুসলমানের হাতে খায় তো সবাই যে কালক্রমে মুসলমান হয়ে যাবে! তার বেলা?"

এর পরে মীর সাহেবও এক পাল্টা ভোজ দেন। ক্যালকাটা ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজন। বাড়ীতে বিষম অব্যবস্থা। অপমান সহ্য করতে না পেরে বেগম সাহেবা চলে গেছেন পাবনা জেলার ভদ্রাসনে। সঙ্গে কন্যা রাবেয়া। পুত্র ও পুত্রবধূ তো স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী নাগরিক হয়ে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

মীর সাহেবই কথাবার্তা শুরু করেন। "মহাত্মাজী পরামর্শ দেন পাকিস্তানে গিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে লীগকে ভিতর থেকে সংশোধন করতে। কিন্তু মিথ্যাকে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা যায় না। আমার কালচার বিশুদ্ধ ইসলামিক নয়, কম্পোজিট ইণ্ডিয়ান। আমার হেরিটেজ বিশুদ্ধ সারাসেনিক নয়, কম্বাইণ্ড ইণ্ডো-সারাসেনিক। ইণ্ডিয়ান বলে আজন্ম নিজেকে ভাবার পর এই প্রৌঢ় বয়সে নন-ইণ্ডিয়ান বলে ভাবতে পারিনে। ভাবতে গেলে আমার মনের মধ্যে দারুণ এক ডিস্‌কন্টিনিউইটি হবে। সেটা যেন মানসিক পার্টিশন। এপারে থাকলেই বরং আমি মনের দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন থাকব। ওপারের জন্যে মন কেমন করবে, কিন্তু সেইপর্যন্ত, তার বেশী নয়।"

মানস অভিভূত হয়। সামলে নিয়ে বলে, "মন কেমন তো আমারও করবে, মীর সাহেব। আমাদের সকলেরই করবে। আমাদের কালচার, আমাদের হেরিটেজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার বছর এক খাতে বইবার পরে। আদিতে এটা ছিল আর্যপূর্ব কালচার, আর্যপূর্ব হেরিটেজ। আর্যরা বা আর্যভাষীরা এসে এর সঙ্গে তাদের ধারা মেশায়। সেই মিশ্র ধারাই হয় হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু উত্তরাধিকার। হিন্দু একটা ধর্মের নাম ছিল না, ছিল একটা দেশের অধিবাসীদের নাম। যেমন ইরানী, যেমন আরব। ইরানী ও আরবদের মুখে যেটা হিন্দ্ গ্রীকদের মুখে সেটা ইণ্ড্। ইণ্ডিয়া থেকে ইণ্ডিয়ানরা সাগরপারে গিয়ে বাণিজ্য করে, বসতি করে, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার করে। সেই থেকে ইণ্ডোনেশিয়া, ইণ্ডো-চায়না। একটা স্রোত যেমন বাইরে থেকে ভিতরে এসেছে তেমনি আরেকটা স্রোত গেছে ভিতর থেকে বাইরে। ইণ্ডিয়া হচ্ছে সেই লিঙ্ক যা গ্রীস রোমকে গেঁথেছিল ইণ্ডোনেশিয়া ইণ্ডো-চায়নার সঙ্গে। এর পরে আসে ইসলাম নিয়ে আরব, তুর্ক, মোগল। এক কথায় মধ্য প্রাচ্য। কয়েক শতাব্দী যেতে না যেতে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ। এরা যত না খ্রীস্টান তার চেয়ে বেশী বিভিন্ন নেশন। এদেরই সংস্রবে এসে আমরাও নেশন হয়ে উঠতে চাই। কিন্তু সেই যে সেকালের হিন্দু তার সঙ্গে পরবর্তীকালের সারাসেনিক ঠিক খাপ খায়

না। কারণ ধর্মসূত্রে তা এক বিস্তীর্ণ ইসলামিক জগতের অঙ্গ। জন্মসূত্রে সুবিশাল ইণ্ডিয়ান জগতের অঙ্গ নয়। প্রথমে ইণ্ডিয়ান না প্রথমে মুসলিম এই দোটানার এখনো কোনো সমাধান হয়নি। যাঁরা প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয়, তাঁরা ভারতকে অস্বীকার করে ইসলামকেই একান্ত করেছেন। তাঁদের চিন্তানায়ক মহাকবি ইকবাল। পাকিস্তান তাঁরই কল্পরাজ্য। ইণ্ডোনেশিয়ায় তবু ইণ্ডিয়া আছে, পাকিস্তানে ইণ্ডিয়া নেই।"

উর্দুভাষী ব্যারিস্টার সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম খান্ চৌধুরী বলেন, "মরক্কো থেকে ইণ্ডোনেশিয়া অবধি বিস্তৃত যে ধর্মীয় শৃঙ্খল বা চেন হিন্দুস্থান ছিল তার একটি মিসিং লিঙ্ক। দারুল হারব। পাকিস্তান পয়দা হওয়ার একটা নয়া লিঙ্ক তৈয়ার হলো। দারুল ইসলাম। এতে ইসলামের দিক থেকে লাভ, কিন্তু খণ্ডিত হিন্দুস্থানে যে চার কোটি মুসলমান থেকে যাচ্ছে তাদের দিক থেকে লোকসান। আমরা চলে গেলে এদের সংখ্যা ও সংখ্যানুপাত আরো কমবে। এরা হজম হয়ে যাবে। শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে উর্দু ছেড়ে হিন্দি বলবে। কী আফসোস!"

"আপনি তা হলে পাকিস্তানে যাচ্ছেন না?" স্বপনদা সুধান।

"যেতুম, যদি মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে পড়ত। র‍্যাডক্লিফের উল্টো বিচার। তিনি পাকিস্তানকে খুলনা দিয়ে ভারতকে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ আমার পূর্বপুরুষের গৌরব। তাঁদের প্রতি আনুগত্য আমার কাছে ফরজ।" তিনি উত্তর দেন।

"সময় এসেছে যখন আপনারা পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা না ভেবে উত্তর পুরুষের প্রগতির কথা ভাববেন। অতীতের পুনরাবর্তনই মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়। যাদের অতীত ছাড়া আর কিছু নেই তাদের ভবিষ্যৎ বলেও বিশেষ কিছু নেই। সেকালের সেইসব দিগ্বিজয়ী আরবরা ও তুর্করা আজ কোথায়? ইতিহাসের মঞ্চে তাদের স্থান নিয়েছেন দিগ্বিজয়ী মার্কিন আর রুশ। অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ, যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, কোথায় তারা আজ? গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কত বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। হিন্দুরা তবু পা মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। মুসলমানরা কি এক পাও এগোবে না? বরং কয়েক পা পেছোবে? আপনার পাকিস্তানেই যাওয়া উচিত। সেখানে গিয়ে লীডারশীপ দেওয়া উচিত। ব্যারিস্টার লীডার না হলে কি ভারত স্বাধীন হতো, পাকিস্তান পয়দা হতো? পার্টিশন হবার ছিল হয়েছে। পদ্মার এক পাড় না ভাঙলে আরেক পাড় গড়ে ওঠে না। ভাঙনের জন্যে শোক করা বৃথা। গড়নের জন্যেই আনন্দ করতে হয়। আসুন, আমরা সব আগে কায়দে আজম জিন্নাহের স্বাস্থ্যপান করি। লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আই প্রপোজ দ্য টোস্ট অভ্ দ্য মেকার অভ্ পাকিস্তান—"

"তোমার কি মাথা খারাপ?" দীপিকাদি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "মীর সাহেবের পার্টিতে এসে জিন্না সাহেবের স্বাস্থ্যপান। মেকার অভ্ পাকিস্তান না ব্রেকার অভ্ ইণ্ডিয়া। যাঁর জন্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল, কোটিখানেক লোক নিরাশ্রয় হলো! তার চেয়ে বরং সার সীরিল র‍্যাডক্লিফের টোস্ট প্রপোজ করো। যিনি আমাদের কলকাতা দিয়ে, কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে, গঙ্গার পূর্বকূল দিয়ে নিষ্কণ্টক করেছেন।"

গ্লাস হাতে তাই করেন স্বপনদা। দীপিকাদি টেবল চাপড়ান।

মীর সাহেব গুম হয়ে বসে থাকেন। মানস পীড়াপীড়ি করলে বলেন, "কলকাতা একদিক থেকে নিষ্কণ্টক, আরেক দিক থেকে নয়। দিল্লীতে আর. এস. এস. নিরঙ্কুশ হয়েছে। আশ্চর্য হব না, যদি কলকাতাতেও বর্গীর হাঙ্গামা হয়।"

বাবলী একগাল হেসে বলে, "ওদের রোখটা আসলে মুসলমানদের উপরে নয়, কমিউনিস্টদের উপরে। ওরা জানে আমরাই ইংরেজের শূন্য স্থান পূরণ করতে আফগানিস্থান দিয়ে নেমে আসছি।

পশ্চিম পাকিস্তানই প্রথমে লাল হবে। তার সাযুজ্যে ও প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানও হবে দ্বিতীয়ত লাল। শেষে ভারতও লাল। অখণ্ড লালিমা।"

জুলি উদ্বেগের সঙ্গে বলে, "না, ভাই, ওদের রোষটা আসলে গান্ধীর উপরে। অহিংসার উপরে। অস্পৃশ্যদের উপরে। নারীদের উপরে।"

টুকটুক ফোঁস করে ওঠে। "এ নারী সে নারী নয়। এ লড়তে জানে। একে পরাস্ত করা সহজ হবে না। এ ঘর জ্বালিয়ে দেবে।"

যূথিকা তাকে ঠাণ্ডা করে। "ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া নয়, নারীর কাজ ঘর বাঁধা। ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তার পরে বাইরের কর্তব্য করা। গঠনের দিকটা জুলির মতো মেয়েরা দেখবে। সংগ্রামের দিকটা সৌম্যদার মতো ছেলেরা। সব কাজ সকলের জন্যে নয়। যার কর্ম তার সাজে।"

"যূথিকাদি, তোমাকে এখন থেকে আমি ঠানদি বলে ডাকব।" টুকটুক রাগ করে।

।। চব্বিশ ।।

সৌম্য পূর্ববঙ্গে ফিরে যাবার আগে একবার বিহার ও দিল্লী ঘুরে আসে। লক্ষ করে ব্রিটিশ সরকারের মতো কংগ্রেস সরকারও সৈন্য ও পুলিশ ব্যবহার করছেন। কোনো তফাৎ নেই। কালো ইংরেজরা গোরা ইংরেজের আইন মোতাবেক কাজ করছেন। গান্ধীর দেওয়া অহিংস অস্ত্র শিকেয় তোলা রয়েছে। তার উপর কেউ নির্ভর করতে চান না। না মন্ত্রী, না অফিসার। ব্রিটিশ বেয়োনেটের স্থানে এখন ইণ্ডিয়ান বেয়োনেট। কার্যত হিন্দু-শিখ বেয়োনেট। কত বড়ো গর্ব।

হিন্দু পুলিশ ও হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ঢুকেছে। তারা মুসলমানকে বাঁচাবার জন্যে হিন্দু বা শিখকে মারবে না। মরুক বেটা মুসলমান, নয়তো পালাক পাকিস্তানে। কে তাকে এদেশে থাকতে বলছে? সে নিজেই তো পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

দিল্লীর একটা মহল্লায় কৃপাসিন্ধু মিশ্র নামে একজন আই. সি.এস. অফিসারের উপর মুসলিম রক্ষার ভার ছিল। তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁরই পরিচালনাধীন এক হিন্দু সৈনিক তাঁকে গুলী করে মারে। আর একটা মহল্লায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষার জন্যে সৈন্য বা পুলিশ কেউ যাচ্ছে না দেখে জবাহরলাল মাদ্রাজী সৈন্য পাঠান। তারা চেনে না কে হিন্দু কে মুসলমান। কিংবা চিনলেও গ্রাহ্য করে না। হামলাকারীদের মেরে হটায়। মরে হিন্দুরাই। শোরগোল ওঠে।

কংগ্রেসের বুনিয়াদটা কি হিন্দু বুনিয়াদ না ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় বুনিয়াদ? এটাই হলো প্রশ্ন। এর উত্তরে নেহরুর সমালোচকরা বলেন, "পাকিস্তানের বুনিয়াদটা যদি মুসলিম বুনিয়াদ হয় তো হিন্দুস্থানের বুনিয়াদও হিন্দু বুনিয়াদ হবে।" তাঁরা ভুলে যান যে এ রাষ্ট্রের নাম হিন্দুস্থান নয়, ইউনিয়ন অভ্ ইণ্ডিয়া। এ যদি হিন্দুস্থান হয় তো আসামের খ্রীস্টান উপজাতিরাও বিচ্ছিন্নতার দাবী তুলবে। নাগারা ইতিমধ্যেই তুলেছে। ভারত আরো এক দিক থেকে ভাঙবে।

বাপুকে দেখে মনে হলো তিনি যারপর নাই অসুখী। যাঁরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ করেছেন তাঁরা এখন লোকভাগের জন্যেও প্রস্তুত। তা করতে গেলে কিন্তু কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাবে। জবাহরলাল কংগ্রেস ছাড়বেন, যদি তাঁর সেকুলার পলিসি অমান্য করা হয়, কংগ্রেসের স্বরূপ যদি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল না হয়ে হিন্দু কমিউনাল হয়। কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে সামনের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ধ্রুব। এই শঙ্কা জবাহরলালের সমালোচকদের আয়ত্তের মধ্যে রেখেছে।

ওপারে রব উঠেছে 'হস্‌কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' এপারেও পাল্টা রব 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। পাকিস্তান যে পথে চলেছে তা সংঘর্ষের পথ। গান্ধীজী পর্যন্ত চেতাবনী

দিয়েছেন যে যুদ্ধ বাধতে পারে। যুদ্ধের জন্যে ভারত সরকার তৈরী হচ্ছেন। ওদিকে পাকিস্তান সরকারও। মাউন্টব্যাটেন থাকতে কেউ ততদূর যাবেন না। সেইজন্যে তাঁকে গভর্নর জেনারেল পদে মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর পেছনে ব্রিটিশ বেয়োনেট নেই। গোরা সৈন্য তল্পিতল্পা গোটাতে ব্যস্ত। তাদের অস্ত্র ধরা বারণ।

সৌম্যকে নানা দিক থেকে চিন্তা করতে হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ যদি বেধে যায় তবে দুই যুধ্যমান রাষ্ট্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্তির জন্যে আত্মদান করতে কি সে প্রস্তুত? না, সে প্রস্তুত নয়। নিজেকে প্রতারণা করা অন্যায়। তা হলে সে কী করবে? পাকিস্তানে থেকে ভারতের জয় কামনা করবে? না, সেটাও অন্যায়। গান্ধীজীর সমস্যা আর তার সমস্যা একই সমস্যা নয়। তিনি তো ইচ্ছা করলে নোয়াখালী ত্যাগ করতে পারবেন। সৌম্য কি ইচ্ছে করলে আশ্রম ত্যাগ করতে পারবে? তা যদি করতে হয় তো এখন থেকে করাই শ্রেয়। সোজা কৈফিয়ৎ সে এপারের নাগরিক, তার শিকড় এপারের মাটিতে। তার স্ত্রীরও তাই।

"তোমার মনে থাকতে পারে," সৌম্য বলে মানসকে, "আমার আদি আদর্শ ছিল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। সস্ত্রীক ধর্মাচরণ। দেশে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে আমি সন্ন্যাসীর আদর্শ গ্রহণ করি। এখন সে সংগ্রাম শেষ হয়েছে। আমি বিবাহ করেছি। এখন থেকে আমি হব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। আশ্রমের দায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে ভালো হয়। আমার বন্ধু বঙ্কিম যদি সে ভার নিতে রাজী হয় তা হলে মসৃণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। নইলে আশ্রমটাই উঠে যাবে। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গ থেকে বিদায় নিতে হবে। আমি সেখানকার বাসিন্দা নই। আমার তেমন কোনো নাড়ীর টান নেই। হিন্দু মুসলমানের যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যেই সেখানে যাওয়া। হিন্দুরা যদি স্থানত্যাগ করে তা হলে যৌথ প্রতিষ্ঠানের অর্থ কী?"

"হিন্দুরা যাতে স্থান ত্যাগ না করে সেটার জন্যেও তোমাকে ওপারে থাকতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে যে, এপারেতে সব সুখ নয়। এপারকে ভারাক্রান্ত করলে যেটুকু সুখ আছে সেটুকুও থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গ যেন ছোট একটি নৌকা। বোঝা ভারী হলে গঙ্গায় ডুববে।" মানস উপমা দেয়।

"আমি নিজে হয়তো থাকতুম, কিন্তু জুলি একেবারেই নারাজ। শিশু দুটির স্বার্থেই ওকে আপাতত কলকাতায় বাস করতে হবে। যেতে রাজী হতো, যদি মুস্তাফীরা ওখানে থাকতেন। ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু অভিজিত বম্বেতে, মিলি দিল্লীতে, রণ শান্তিনিকেতনে, মাঝখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত, যে-কোনো দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সব কারণে তাঁরা চলে আসতে চান।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

সৌম্য এক রাষ্ট্রে, জুলিরা আরেক রাষ্ট্রে, এ ব্যবস্থা সাময়িক হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী হতে পারে না। জুলি এখন 'হোম' গড়ে তুলতে চায়। আশ্রম গড়ে তোলা তার কাছে আশা করা যায় না।

মানস বলে, "বেশ, মুস্তাফীরা যদি চলে আসেন তুমিও চলে আসবে। বঙ্কিমবাবু যদি চালাতে পারেন তো আশ্রম চলবে। হিন্দুরা যদি থাকে তবে যৌথ প্রতিষ্ঠান হবে। না থাকলেও মুসলমানদের নিয়ে গান্ধীনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ চলবে। অবশ্য মুসলিম লীগ যদি চলতে দেয়। গান্ধী বলতে তারা হিন্দু বোঝে না। আর হিন্দু হলেই তাকে মুসলিমবিদ্বেষী হতেই হবে, মুসলিমদরদী হতে মানা। হিন্দু ও মুসলমান যেন শীত আর গ্রীষ্মের মতো পরস্পরবিরোধী। দক্ষিণ ও বাম বাহুর মতো পরস্পরের পরিপূরক নয়।"

সৌম্য গভীর বিষাদের সঙ্গে বলে, "বাপুর দিন খারাপ যাচ্ছে, ভাই। পাকিস্তানের হিন্দুরাও বলছে পার্টিশনের জন্যে তিনিই দায়ী। দিল্লীর হিন্দুরা তো তাঁকে হিমালয়ে পাঠাতে চায়। তিনি আছেন বলেই জবাহরলালের জোর আছে। জবাহরলালের জোর আছে বলেই মুসলমানের অস্তিত্ব আছে। অথচ পাকিস্তান যে এর জন্যে বাপুর কাছে বা জবাহরলালের কাছে কৃতজ্ঞ তা নয়। লীগ নেতারা বিশ্বাসই করেন না যে মাউন্টব্যাটেনকে সালিশ মেনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের এটা একটা ফাইনাল

সেটলমেন্ট। যথারীতি জিন্না সাহেবের আস্তিনে আরো কয়েকটা তাস ছিল। সেসব খেলা হলো না। গান্ধীর কথা অনুসারে কাজ হয়নি, তবু যত দোষ গান্ধী ঘোষ।"

মানস হেসে ওঠে। "যাকে বলে স্কেপগোট।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। স্কেপগোটকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

"তোমার ভূমিকা তা হলে আর কাসাবিয়াঙ্কার হবে না?" মানস সুধায়।

"কী দরকার? বাপুর কলকাতা মিশন সফল হয়েছে। ফলে পূর্ববঙ্গ শান্ত। তাঁর দিল্লী মিশন যদি সফল হয় সারা ভারত-পাকিস্তান শান্ত হবে। কিন্তু দূর দিগন্তে এক বিঘৎ পরিমাণ একটা কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। সেই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যেতে পারে। কাশ্মীর। পাকিস্তানের 'ক'। কাশ্মীর না পেলে পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ হবে না। অথচ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা নাকি তিন চার হাজার বছর ধরে সেই উপত্যকার অধিবাসী। জবাহরলাল চান কাশ্মীর ভারতের হোক। এ দ্বন্দ্ব মেটাবে কে? কারও সাধ্য নয়। না বাপুর, না মাউন্টব্যাটেনের। বাংলাদেশের মতো একটা পার্টিশনও সম্ভবপর নয়। দু'পক্ষেরই লক্ষ্য শ্রীনগর। পাহাড় পর্বত নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট নয়। রাজ্যটা মুসলিমপ্রধান বটে, কিন্তু মুসলমানদের বেশীর ভাগ শেখ আবদুল্লার দলে আর শেখ আবদুল্লার দল যেন সেখানকার কংগ্রেস-মুসলিম। তার দলে বহু হিন্দু। জবাহরলালের সঙ্গে আবদুল্লার দীর্ঘকালের মৈত্রী। শেখের হাতে পড়লে সেটা হবে সেকুলার স্টেট। চড়া স্টেকের খেলা। কাজেই সশস্ত্র যুদ্ধের আকার নিতে পারে। কাসাবিয়াঙ্কা যদি কেউ হয় তো সে আমি নই। কোনো একজন কাশ্মীরী মুসলমান কি হিন্দু।" সৌম্যর মনে হয়।

"দিল্লী নিয়ে যারা লড়ল না, কলকাতা নিয়ে যারা লড়ল না, শ্রীনগর নিয়ে লড়বে? তেমনি লাহোর নিয়ে যারা লড়ল না, পেশাওয়ার নিয়ে যারা লড়ল না তারা শ্রীনগর নিয়ে লড়বে? বিশ্বাস হয় না মিটমাট একটা হয়ে যাবে। ওই মাউন্টব্যাটেনই করবেন।" মানস ভাবে।

"তখন কোনো পক্ষের নিজস্ব সৈন্য ছিল না। তা যদি থাকত তবে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ বাধত। যেটা ছিল আভ্যন্তরিক বিরোধ সেটা হবে আন্তর্জাতিক বিরোধ। এখন ওদের হাতে অস্ত্র এসেছে, সৈন্য এসেছে, যুদ্ধ চালাবার অর্থ এসেছে, কেই বা ওদের যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছে? মহাত্মার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কেননা অহিংস অস্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনিও এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তিনি যা বলেন তা নেতাদের এক কানে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্রদ্ধা করেন সবাই, ভালোবাসেন সবাই, এমন কী মাউন্টব্যাটেন পরিবারও। কিন্তু মানছেন কে? দিল্লীর পরিস্থিতি যদি আরো খারাপের দিকে যায় তবে বাপুকে বোধ হয় আরো একবার অনশন করতে হবে। এতদিনে তাঁর নোয়াখালীতে ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লীর কাজ না সেরে যাবেনই বা কী করে? আশা করি কাশ্মীর নিয়ে লড়াই বাধবে না। বাধলে অবস্থা আরো জটিল হবে।" সৌম্য দুর্ভাবনা প্রকাশ করে।

"সুকুমার আর মিলির খবর কী?" মানস জানতে চায়।

"সুকুমার একটা চাকরি জোগাড় করেছে। বিদেশী ডিপ্লোমাটদের রিসিভ করা, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা। আর মিলি তো মৃদুলাবেনের সহকর্মী। দু'জনেরই ঘোরাফেরার কাজ। একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। আচ্ছা, তুমি ক্যাপ্টেন লা'কে চিনতে? সিভিল সার্জন ছিলেন। এখন দিল্লীতে ব্রিগেডিয়ার লা'। হেলথ ডিপার্টমেন্টে উচ্চপদস্থ। তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণকলির সঙ্গেও আলাপ হলো। তোমার আর যূথিকার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ডাকনাম ঝরনা বললে মনে পড়বে। ওয়াকিতে যোগ দেন। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মহিমা!" সৌম্য জানায়।

"যূথিকা শুনে খুব খুশি হবে।" মানস যূথিকাকে ডেকে শোনায়।

সে তখন জুলির সঙ্গে অন্য ঘরে গল্প করছিল আর তার বাচ্চাদের আদর। সুখবর শুনে সেও কৌতুক করে। "ঝরনা, আমার ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী!"

হাসাহাসির পর যূথিকা জানতে চায় বাপু আবার কবে কলকাতা আসবেন। সে তাঁকে দর্শন করতে চায়। এখনো করেনি।

"আসবার জন্যে ব্যাকুল। নোয়াখালীর কাজ সমাপ্ত না করে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। প্রত্যেকদিন এক্সারসাইজ বুক নিয়ে বাংলা হাতের লেখা মক্স করেন। ছোট ছেলেদের মতো। এবার থেকে তিনি বাংলায় কথা বলবেন। যাতে সাধারণ হিন্দু মুসলমানের অন্তর স্পর্শ করতে পারেন।" সৌম্য বলে।

"উদ্দেশ্য মহৎ। উপায়ও মহৎ।" মানস মন্তব্য করে, "কিন্তু, সৌম্যদা, তিনি যদি না বুঝে থাকেন তোমাদেরই কর্তব্য তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যে নোয়াখালীর সমস্যাটা পুরোপুরি হিন্দু মুসলিম সমস্যা নয়। তার আধখানাই হচ্ছে শোষক শোষিত সমস্যা। বঞ্চক বঞ্চিত সমস্যা। মুসলমান চাষীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের মুখের অন্ন জোগায়, কিন্তু নিজেরা আধপেটা খেয়ে থাকে। এই যে মুসলমান চাষী এরা কারা? এরা তাদের সন্ততি যাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু থাকতে ধোপানাপিত পায়নি, মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধোপানাপিত পায়। এতে তাদের মর্যাদা বাড়ে, তাদের কেউ নিম্ন বর্ণ বলে অপমান করতে সাহস পায় না। কিন্তু ম্লেচ্ছ বলে, যবন বলে। সেটা তারা মুখ বুজে সহ্য করে। যেটা তারা সইতে পারে না সেটা হলো অর্থনৈতিক অবিচার। ইসলাম গ্রহণ করেও তো তার থেকে পরিত্রাণ নেই। তোমরা কি চাও যে এরা দলে দলে মার্কসবাদ গ্রহণ করে কমিউনিস্ট বনে যায়? সেটাও তো একপ্রকার নামান্তর। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আমি অফিসার হিসাবে কিছু কম দশ বছর কাটিয়েছি। নোয়াখালীর সমস্যা অন্যান্য জেলারও সমস্যা। তুমি কি মনে করো অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস ছাড়া এর কোনো স্থায়ী প্রতিকার আছে? মুসলিম লীগের পন্থা অবশ্য ভ্রান্ত পন্থা। হিন্দুমাত্রেই শোষক নয়, মুসলমান মাত্রই শোষিত নয়। অত্যাচার যাদের উপর হয়েছে তাদের অর্ধেক ভাগই শোষিত শ্রেণীর হিন্দু। মুসলিম লীগের স্লোগান তো ওই ইসলাম বিপন্ন। তেমনি হিন্দুমহাসভার স্লোগান হয়েছে হিন্দুত্ব বিপন্ন। তার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে দুই শিবিরে বিভক্ত। ভেবে দেখছি অর্থনৈতিক অবিচার অব্যাহত থাকলে অধিকাংশ মুসলমান কমিউনিস্ট বনে যেত। পূর্ববঙ্গ হতো তাদের ইয়েনান। আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি, নোয়াখালীর অতিরঞ্জিত বিবরণ শুনে ব্যালান্স হারিয়েছি। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছি যে মানুষকে যদি মুসলমান না ভেবে চাষী বা ক্ষেত মজুর ভাবি তবে এর অর্থ অতি পরিষ্কার। এটা ধর্মের নাম করে শ্রেণী সংগ্রাম। জমিদার, মহাজন, জোতদার বা পুলিশ যদি প্রধানত হিন্দু না হতো এটা হতো মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম। হিন্দুরা যদি সবাই দেশান্তরী হয় বা মুসলমান বনে যায় তবে মুসলমানে মুসলমানে বেধে যাবে। কিন্তু কেউ দেশান্তরী হবেই বা কেন? গান্ধীজীর হিতোপদেশ শুনে ট্রাস্টী হলেই পারে। যাদের সম্পত্তি আছে তারা শোষণ বন্ধ করুক। শোষণ বন্ধ হলে হিংসা বন্ধ হবে। ধর্ম এক না হলেও মানুষ একই গ্রামে বা শহরে মিলে মিশে থাকতে পারে। যদি না মোল্লা ও পুরোহিতরা হিংসার প্ররোচনা দেয়।"

"সব সত্যি। কিন্তু প্রথম কাজটি প্রথমে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্ট বৃত্ত ছেদ। নোয়াখালীতে, বিহারে, দিল্লীতে, পাঞ্জাবে। অহিংস উপায়েই লক্ষ্যভেদ করতে হবে। শহীদ হতে হবে, যদি দরকার হয়।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

"না, সৌম্যদা।" যূথিকা আর্ত স্বরে বলে, "তুমি শহীদ হবে না। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৈনিকের ভূমিকা সাঙ্গ হয়েছে। আর তার জের টানতে যেয়ো না। এক জীবনে একটা যুদ্ধই যথেষ্ট। তরোয়ালকে ভেঙে লাঙলের ফলা বানাও।"

"অহিংসাকে দেশের লোক ভুলে যেতে বসেছে। এর পর আসছে সত্যের পালা। সত্যকেও যদি লোকে ভুলে যায় তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পর্যবসিত হবে হিন্দু জাতীয়তাবাদে। তখন এপারের মুসলমানদের সবাইকে ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। আর ওপারের হিন্দুদের সবাইকে এপারে

পালিয়ে আসতে প্ররোচনা দেওয়া হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যদি হিন্দু জাতীয়তাবাদের ছদ্মনাম হয়ে থাকে তবে কাশ্মীর পাবার নৈতিক অধিকার কি আর থাকবে? পেলেও কি সে রাখতে পারবে? না সেটাও হবে নৈতিকতাবর্জিত রিয়াল পলিটিক?" সৌম্য বলে কাতর কণ্ঠে।

মানস তার সঙ্গে একমত হয়। তবু সতর্ক করে দেয়, "পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা সমুদ্রের ঢেউ আসছে। বাপু যদি রাজা ক্যানিউটের মতো আদেশ দেন, 'সমুদ্র হট যাও' তবে সমুদ্র তো হটবেই না, উল্টে বাপুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হিন্দুর স্রোত তোমরা রোধ করতে পারবে না, সৌম্যদা। কিন্তু মুসলমানের পাল্টা স্রোত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে রোধ করতে পারো। তার দ্বারাই প্রমাণ হবে এটা ভারতীয় রাষ্ট্র, না হিন্দু রাষ্ট্র। তোমাদের জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ না হিন্দু জাতীয়তাবাদ?"

বাপুই ভেসে যেতে পারেন শুনে সৌম্য মর্মাহত হয়। "বাপু কি তা হলে বাঁচবেন? তিনি যদি না বাঁচেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবে কে?"

"হিন্দু মুসলমানের শুভবুদ্ধি।" যূথিকা অভয় দেয়।

সৌম্য আশ্রমে ফিরে গিয়ে লক্ষ করে লোকের মধ্যে একটা স্বদেশী বিদেশী মনোভাব এসে গেছে। ওরা একটা স্বদেশ চেয়েছিল, একটা স্বদেশ পেয়ে গেছে। হিন্দুতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিদেশী হিন্দুতে আপত্তি। তারা কলকাতা কেড়ে নিয়ে বেইমানি করেছে। সৌম্যও তাদের একজন। বেইমান সেও। হিন্দুরাও তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে ডরায়। পাছে তাদেরও সন্দেহ করা হয়। সৌম্য তাদের একটু বাজিয়ে দেখে তারা থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে হ্যামলেটের মতো দোলায়মান। কায়িক কোনো অত্যাচার হচ্ছে না। কিন্তু কাউকে যদি 'জিম্মি' বলা হয় সেটাও তো একপ্রকার মানসিক অত্যাচার। ইসলামের আদিপর্বে ইহুদী তথা খ্রীস্টান আরবদের জিম্মি বলা হতো। তারা প্রতিমাপূজক ছিল না। যারা প্রতিমাপূজক তারা কিন্তু জিম্মি হওয়ারও যোগ্য ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল তিনটির একটি — হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় রাজ্যত্যাগ, নয় মৃত্যুবরণ। অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে ধনপ্রাণ রক্ষা করে। যারা পালিয়ে বাঁচে তারা সম্পত্তি ও বাস্তুভিটা হারায়। কতক লোক পালায় না, পূর্বপুরুষের ধর্ম ছাড়েও না। প্রাণ হারায়। পূর্ব পাকিস্তানের খ্রীস্টানরা জিম্মি হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধরা জিম্মি হবে কোন্ নজীরে? ইসলামের ইতিহাসে তারা কি হবে একমাত্র ব্যতিক্রম? সুলতানী আমলে বা মোগল আমলে এ সমস্যার উদয় হয়নি, কারণ মুসলিমশাসিত হলেও হিন্দুস্থান ছিল দারুল হারব। দারুল ইসলাম নয়। পাকিস্তান হচ্ছে দারুল ইসলাম।

সৌম্য বঙ্কিম করকে ডেকে পাঠায়। আশ্রমের ভার নিতে বলে। "ভাই বঙ্কিম, দাড়ি কামিয়ে আমি মস্ত ভুল করেছি। আমার মুসলিম সহকর্মীরাও আমাকে পর ভাবছে। ওরা এখন নতুন আত্মীয় পেয়েছে। পাঞ্জাবী মুসলমান। বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামতে চায় না। আমি বিদেশী। সারাজীবন স্বদেশীর সাধনা করেও আমার স্বদেশেই আজ আমি বিদেশী। কলকাতা কেড়ে নিয়ে বেইমানি করেছি। আমি বেইমান। বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামছে না।"

"কী বোঝ, সৌম্যদা?" বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসু।

"রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। সাত শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। সাত শতাব্দী ধরে এর আয়োজন চলেছিল। আমরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছোটজাত বা ছোটলোক বলে যাদের ছায়া লাগলে স্নান করেছি, যাদের ঘৃণা করেছি, যাদের জল অচল করেছি তারা মুসলিম সমাজে আশ্রয় নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সামাজিক স্তরে উন্নত হলেও অর্থনৈতিক স্তরে শোষিত হয়েছে। আমরা জমিদার হয়ে তাদের ভূমিহীন করেছি, মহাজন হয়ে তাদের সম্পত্তিহীন করেছি। ধর্মান্তরও তাদের শোষণমুক্ত করতে পারেনি। মরীয়া হয়ে তারা কমিউনিস্ট হতে পারত,

কমিউনিস্ট হয়ে বিপ্লব করতে পারত। তা না করে তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে, দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তান হাসিল করেছে। এ তোমার, এ আমার পাপ। সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অন্যায়ের পাপ। বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামে না। আমি বিদেশী! আমার আপন দেশে আমি বিদেশী। যেমন ইংরেজ, যেমন জাপানী, তেমনি আমি। হৈ হৈ করে বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছি যাদের মুখ চেয়ে তারাই এবার বিদেশী কাপড় বলে আহমদাবাদের কাপড় পোড়াবে। সোদপুরের খাদিও। একই উদ্দেশ্য নিয়ে। নিজেদের শিল্পের সংরক্ষণ।" সৌম্য কাতর স্বরে বলে।

বঙ্কিমবাবু তাকে প্রবোধ দেন। "মিটমাট হয়ে যাবে। দুই দেশ পরস্পরের প্রত্যঙ্গ হবে। দুই সম্প্রদায়ও পরস্পরের প্রত্যঙ্গ হবে।"

"হলে তো বাঁচি। যাই হোক, তুমি আশ্রমের ভার নাও। আমাকে কন্যাদায় থেকে বাঁচাও।" সৌম্য হাসির ভান করে।

"যেসব অঞ্চল ছিল আর্যদের কাছে অপবিত্র সেই সব অঞ্চলকে মুসলমানরা বলছে পাকিস্তান বা পবিত্র স্থান। ইতিহাস এইভাবে ন্যায়কে ফিরিয়ে আনে। ভাই সৌম্যদা, তুমি যে আমাকে এই গুরু দায়িত্বের জন্যে নির্বাচন করেছ এর জন্যে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি কি এর যোগ্য? তোমার মাপে তুমি যে আলখাল্লা তৈরি করিয়েছ আমার মাপে সেটাকে কাটছাঁট করতে হবে। সে অনুমতি কি তুমি দিচ্ছ? এতগুলো বিভাগ চালাবার জন্যে এতজন কর্মী দরকার। কিন্তু হিন্দু কর্মীরা তো এপারে থাকার চেয়ে ওপারে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। আমাকে বলছে আশ্রমটাই ওপারে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। সেটা তো তুমি অনুমোদন করবে না। তা ছাড়া আশ্রমকর্মীদের সুস্পষ্ট একটা লক্ষ্য থাকা চাই। তারা ভারত সেবাশ্রমের সেবাকর্মী নয়। তারা এতদিন ছিল গান্ধীজীর ননভায়োলেন্ট আর্মি। লক্ষ্য স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার। দেশ এখন স্বাধীন, যদিও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত। এখন এই আর্মির নতুন লক্ষ্যটা কী? অহিংস মতে সমাজবিপ্লব? যার অন্য নাম সর্বোদয়? এ কাজে মার্কসবাদীরা তো বাদ সাধবেই, বাধা দেবে কট্টর শরিয়ৎপন্থীরাও। পার্টিশন আমাদের খুবই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। যাদের জন্যে সমাজবিপ্লব তারাই আমাদের সন্দেহ করবে। সরকার তো হাতকড়া পরাবেই। যেখানে লক্ষ্য সুস্পষ্ট নয় কিংবা লক্ষ্য সুস্পষ্ট হলেও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এ জীবনে হবার নয় সেখানে আমাদের প্রগতি সুদূরপরাহত। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি পূর্ববঙ্গের সামনে দুটিমাত্র মার্গ। একটি তাকে নিয়ে যাবে মস্কোয়, আরেকটি মক্কায়। মস্কো আর মক্কার দ্বন্দ্বে মক্কারই জিৎ হবে।" বঙ্কিমবাবু অনুমান করেন।

"তোমার বিশ্লেষণটাই বোধহয় ঠিক। তা হলেও আমাদের কাজ তৃতীয় একটা পন্থার ইশারা দেওয়া। বলা বাহুল্য, আমাদের তৃতীয়পন্থী অহিংসক শিবিরে মুসলমান সৈনিকও থাকবে। নয়তো আমাদের শিবির গুটিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। না, ওপারে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। ওপারে শিকড় লাগবে না। ওপারে আরো অনেক আশ্রম আছে। স্বয়ং মহাত্মা রয়েছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার প্রবণতা ভালো নয়। আমরা এতে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। যার যেখানে শিকড় তার সেখানে স্থিতি। ঝড় কেটে যাবে।" সৌম্য বলে প্রতীতির সঙ্গে।

বঙ্কিমবাবু গান্ধীজীর সংবাদ জানতে চাইলে সৌম্য জানায়, "বাপুর বিশ্বাস কলকাতা শান্ত হলে সারা বাংলাদেশ শান্ত হবে। পূর্ব তথা পশ্চিম বঙ্গ। কলকাতাকে শান্ত করে সারা বাংলাদেশকে তিনি শান্ত করে গেলেন। এখন তাঁর বিশ্বাস দিল্লী শান্ত হলে সারা ভারতবর্ষ শান্ত হবে। ভারত তথা পাকিস্তান। কিন্তু এত চেষ্টা করেও দিল্লী শান্ত হচ্ছে কই? পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা দলে দলে এসে তাদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে শোনাচ্ছে। আর দিল্লীর হিন্দুরা উত্তেজনায় টগবগ করছে। তার সুযোগ নিচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। প্রধানত মারাঠাদের শিবির। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে হেরে যাবার পর থেকে মারাঠাদের স্বপ্ন আবার কবে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ বাধবে, তারা মুসলমানদের হারিয়ে দিয়ে

তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে। এবার দিল্লীতে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে বলপরীক্ষা করবে। সেইজন্যে দিল্লীকে শান্ত করা কলকাতাকে শান্ত করার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন। বাপুরও তেমনি জেদ, তিনি ব্যর্থ হয়ে দিল্লী থেকে ফিরবেন না। নইলে তাঁর তো এতদিনে নোয়াখালী ফিরে আসার কথা। তাঁর হৃদয় পড়ে আছে নোয়াখালীতে। দেহ দিল্লীতে। চড়া পণের খেলা। জিতলে বিরাট জয়। হারলে বিরাট পরাজয়। সারা দুনিয়া সে খেলা দেখছে। তিনি তাঁর জীবন পণ রেখেছেন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। তাই আমরা ভয়ে ভয়ে আছি।" সৌম্য উদ্বিগ্ন।

"সৌম্যদা," বঙ্কিমবাবু উদ্বেগের সুরে বলেন, "বাপুর সংগ্রাম এবার ইংরেজের সঙ্গে নয়, মুসলমানের সঙ্গেও নয়, হিন্দুর সঙ্গে। এটাই সব চেয়ে দুঃখের, সব চেয়ে বেদনার, সব চেয়ে বিপদের। বেশীর ভাগ হিন্দুর সহানুভূতি তিনি পাবেন না। উল্টে পাবেন বিরাগ। ক্ষমতার আসনে বসে কংগ্রেস নেতাদেরও আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন নেই। তিনি এখন একক সত্যাগ্রহী। তাঁর সত্যাগ্রহের এখন চরম পরীক্ষা। জয়ী তিনি হবেনই, কিন্তু তাঁর জয়টাই হবে প্রতিপক্ষের উষ্মার কারণ। ওরা কি তাঁকে বাঁচতে দেবে? স্বপক্ষও কি তাঁকে বাঁচাবে? কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরালে পাজী।"

বঙ্কিম করকে নিয়ে সৌম্য ক্যাপ্টেন মুস্তাফীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তিনি বলেন, "মিলির কাণ্ড শুনেছ? পাঞ্জাবের গ্রামে গঞ্জে মৃদুলার সঙ্গে ও নারী উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। আমিও একসময় পাঞ্জাবে ছিলুম। আর্মির সঙ্গে যুক্ত। জুলির বাবা ক্যাপটেন সিন্‌হাও ছিলেন। সেইসূত্রে ওদের দু'জনের ভাব। মাঝে মাঝে আড়িও হতো। সেই জুলি এখন মা হয়েছে। একসঙ্গে দুই যমজ সন্তানের। শুনে দ্বিগুণ আনন্দ বোধ করছি। ওদের আপাতত না এনে তুমি ভালোই করেছ, সৌম্য। ধীরে সুস্থে এনো। আমার যাওয়া এখন অনিশ্চিত ব্যাপার। এ তো আর সিভিল সার্জনের বদলী নয় যে একমাস নোটিসই যথেষ্ট। সেবাপ্রতিষ্ঠানের যথাবিহিত না করে আমি যাচ্ছি কী করে? 'ট্রাস্ট' গঠন করতে চাই, কিন্তু ট্রাস্ট করব কাকে? সরকারকে দান করতে চাই, কিন্তু সরকারের মূলমন্ত্র 'সব মুসলিম হো জায়েগা'। মুসলিম ডাক্তার তবু মেলে, কিন্তু মুসলিম নার্স কোথায়? ফিমেল নার্সের কথা বলছি। মেল নার্স অবশ্য মেলে। প্রতিষ্ঠানের চরিত্রই বদলে যাবে। এদিকে আমার নার্সরাও পশ্চিমবঙ্গে পালাবার তালে আছে। স্তোক দিচ্ছি, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কী? এক গুজরাটী মুসলমান ব্যবসাদার আমার প্রতিষ্ঠান কিনে নিতে চান। তার মায়ের নামে চালাবেন। বম্বে থেকে ফিমেল নার্স আনিয়ে নেবেন। মুসলিম মেয়ে। তা শুনে আমার মুসলিম বন্ধুরা তটস্থ। 'ওরা আমাদের ভাষা বুঝবে না, আমরা ওদের ভাষা বুঝব না। কোন্ রোগের কী দাওয়াই খাওয়াবে? শেষে কি মারা যাব?' প্রতিদিন মফঃস্বল থেকে দলে দলে লোক আসছে দরবার করতে। আমি যেন ওদের ফেলে চলে না যাই। আমার যে এত ভক্ত আছে তা আমার জানা ছিল না। তাদের মুখে চোখে কী ভালোবাসা! ভালোবাসার জাত ধর্ম নেই। আমিও তো ওদের ভালোবাসি। কী করে ওদের পরের হাতে তুলে দিয়ে যাই? তোমাকে অনুরোধ, তুমিও থেকে যাও। তোমারও তো অনেক ভক্ত আছে। মায়া কাটাবে কেমন করে? মুসলমানরা তো কেউ তোমার কাজে বাধা দিচ্ছে না।"

সৌম্য বলে, "না, ওরা বাধা দিচ্ছে না। তবু আমাকে যেতে হবে। আমি একরাত্রেই বিদেশী বনে গেছি। ওপারে স্বদেশী হওয়া মানে এপারে বিদেশী হওয়া। এপারে যদি থেকে যাই ওপারে বিদেশী বনে যাব। অন্তত আইনের চোখে। জুলিকে আর বাচ্চাদের আমি এই ভজকটের মধ্যে টানতে চাইনে। আর ওদের টান এড়াতে না পেরে আমিও ওদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। আপনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার আশ্রমের তুলনা হয় না। আমার আশ্রম তো সরকারের কৃপায় চার বছর বন্ধ ছিল। আপনার প্রতিষ্ঠান একটা দিনের জন্যেও বন্ধ থাকেনি। বড়দিনের আগেই আমি কলকাতা ফিরছি। তারপর মনঃস্থির করব কোথায় আস্তানা গাড়ব। আপাতত আমার কাজ লোকক্ষয় রোধ করা। পার্টিশন পলিটিকাল লেভেলে হয়েছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে হয়েছে। মাস লেভেলে হয়নি। না হওয়াই ভালো।"

মুস্তাফী সমর্থন করেন। "ইংরেজরা চলে যাবে বলে হিন্দুরাও চলে যাবে কেন? মুসলমানরাই বা চলে আসবে কেন? তা হলে তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে ইংরেজদের থাকার জন্যেই আমরা একসঙ্গে ছিলুম। যাকে বলে পর্বতের আড়ালে থাকা।"

সৌম্য হেসে বলে, "আমার শাশুড়ী ঠাকরুনও তাই বলতেন। পরম রাজভক্ত। শ্বশুর মশাই শুনেছি তার বিপরীত।"

"জালিয়ানওয়ালাবাগ তাঁর মনে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। সেখানে যারা মারা যায় তাদের কেউ কেউ তাঁর চেনা লোক।" মুস্তাফী বলেন।

"এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে, যে কংগ্রেসের আড়ালও হিমালয়ের আড়াল। লীগও আমাদের দেখে শিখবে।" সৌম্য বিশ্বাস করে।

মোহিনীবাবু সৌম্যকে দেখে খুশি হন। "তোমাকে একটা খবর দেবার ছিল, সৌম্য। জিন্না সাহেবকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। ভেনি, ভিডি, ভিসি। জুলিয়াস সীজারের পর একথা বলতে পারেন কে? একমাত্র কায়দে আজম জিন্না। আইলাম, চাইলাম, পাইলাম। পাকিস্তান সাত বছরের মধ্যে হাসিল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। বলেন, 'ধর, আপনি তো জানেন আমি কারো তাঁবেদার হইনি। না কংগ্রেসের, না ইংরেজের। ওরা যোগসাজস করে আমাকে এই পোকায় কাটা ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান ধরিয়ে দিয়েছে। এ আমার স্বাধীনচিত্ততার জন্যে সাজা। এখন এর জন্যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। আপনি তো জানেন আমি অ্যান্টি-হিন্দু নই, আমি থাকতে পূর্ব পাকিস্তানে আপনাদের ভয়ের কী আছে? তবে আমি চলে গেলে কী হবে বলা যায় না। সেইজন্যে আমি যে শাসনতন্ত্র তৈরি করে যেতে চাই তাতে আপনাদের জন্যে যথেষ্ট সেফগার্ড থাকবে। আমি চাই যে আপনিও তাতে হাত লাগান।' আমি রাজী হই। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান যতদিন থাকবে তার নিশানও ততদিন থাকবে। সে নিশানের এক-তৃতীয়াংশ শাদা। হিন্দুদেরই খাতিরে। পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হলে তার কী সার্থকতা? ধর, আমি অ্যান্টিকংগ্রেসও ছিলুম না। আমি চেয়েছিলুম দ্বিতীয় এক কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট। সেটার জন্যে আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি। কিন্তু ওঁরা চেয়েছিলেন দ্বিতীয় এক গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। আমাকে বিফল করেছেন, নিজেরাও বিফল হয়েছেন। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে বাঙালীরা। আমার ধারণা ছিল ওরা পেট্রিয়ট।' জিন্না শেষ করতে ব্যথা পান।"

বাসুদেব হালদার ইতিমধ্যে রায় বাহাদুর খেতাব ও উকীল সরকার পদ ছেড়েছেন। সৌম্যকে তার বাগান দেখাতে নিয়ে যান। বলেন, "এই যে দেখছ বট আর অশ্বত্থ এরা দুই যমজ ভাই। কে যে কবে এদের বীজ বুনেছিল বা চারা লাগিয়েছিল তা আমারও অজানা। কারণ আমি এ বাগান জন্মসূত্রে পাই। জন্মে অবধি আমি দেখে আসছি এরা জড়াজড়ি করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়েছে। এদের পাতা একরকম নয়, ফল একরকম নয়, বেড় একরকম নয়। আমি যদি বলি, 'বট অশ্বত্থ, এক হো', এরা এক হবে না। আমি যদি বলি, 'বট অশ্বত্থ, তফাৎ রহো,' এরা তফাৎ রইবে না। এই বট অশ্বত্থ সমস্যার কি কোনো সমাধান আছে? নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট। নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল পার্ট। গান্ধীজী বট অশ্বত্থকে এক করতে পারেননি। জিন্না সাহেব বট অশ্বত্থকে তফাৎ রাখতেপারবেন না। দুটোর একটাকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলে সব সমস্যা মিটে যেত, কিন্তু একের সঙ্গে অপরের শিকড় এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে একটাকে ওপড়াতে গেলে অন্যটাও উপড়ে আসবে। লোকবিনিময় একটা তুঘলকী পরিকল্পনা। স্বাধীনতা না হলে পার্টিশন হতো না, পার্টিশন না হলে স্বাধীনতা হতো না। এই পর্যন্ত ঠিক। পার্টিশন হয়েছে বলে লোকবিনিময় হবে এটা কিন্তু বেঠিক। আমি থাকছি।"

অধ্যাপক মাহমুদ শরীফের সঙ্গেও দেখা করে সৌম্য। তিনি বলেন, "দেশকে আপনারা মাতা বলেন। সেই মাতাকে বন্দনা করেন। তা হলে কোন্ প্রাণে সেই মাতাকে কেটে দু'খানা করলেন? 'বন্দে

মাতরম্' এর পর আপনাদের কণ্ঠে মানাবে? সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার প্রায় সবটাই তো পড়ল আমাদের ভাগে। ওপারে এমন কী আছে যে আপনাদের কণ্ঠে ঠিক সুরটি বাজবে? চৌধুরীজী, আমি জানি আপনি আমাদের দোষ দেবেন। মানছি আমরাই ভারতের একভাগ চেয়ে বাংলার একভাগ হারিয়েছি। কিন্তু আপনারা তো দেশগত প্রাণ, আপনারা রাজী হতে গেলেন কেন? অনশন করলেন না কেন? প্রাণ দিলেন না কেন? এমন একটা কানা খোঁড়া পাকিস্তান নিয়ে কী করব আমরা?"

সৌম্য স্বীকার করে, "হ্যাঁ, প্রাণ দেওয়াই উচিত ছিল। তা হলে কিন্তু আপনারা আপনাদের হোমল্যাণ্ড থেকে বঞ্চিত হতেন। আপনাদের বঞ্চিত করে কি আপনাদের হৃদয় জয় করা সম্ভব? তা বলে আমরাই বা আমাদের মায়ের কোল থেকে বঞ্চিত হব কেন? তাই এই পরিণতি।"

"চৌধুরীজী", অধ্যাপক সাহেব বলেন, "একটা কথা মনে রাখবেন। পাকিস্তান বলতে বোঝায় পবিত্র মানুষদের স্থান। আর পবিত্র মানুষ বলতে আপনাদেরও বোঝায়। 'পাক' শব্দটি এসেছে প্রাচীন পারসিক 'পাবক' শব্দটির থেকে। সংস্কৃত পাবকের মতো তারও অর্থ অগ্নি। অগ্নিই পবিত্র করে। যেমন প্রাচীন ভারতে তেমনি প্রাচীন পারস্যে বা ইরানে। আমরা অগ্নিপূজক না হলেও অগ্নি বা পাবকের মহিমা মানি। কালক্রমে পাবক হয়েছে পাক। আর্যভাষীরা যেসব অঞ্চলকে অপবিত্র জ্ঞান করতেন— যেমন পাঞ্জাবকে ও বাংলাদেশকে — সেই সব অঞ্চলকে নিয়েই পাকিস্তান। এখন সেই সব স্থানই পবিত্র হয়েছে। ইতিহাস এতকাল পরে ন্যায়বিচার করেছে। পাকিস্তানের উৎপত্তির মূলে হিস্টরিকাল জাস্টিস। এ রায় আপনারা মেনে নিন, চৌধুরীজী। এদেশেই থেকে যান আপনারা।"

"হ্যাঁ, এই ঐতিহাসিক রায়টা মেনে নিতে হবে আমাদের। তবে আমি ওপারের লোক, ওপারেই ফিরে যাব।" সৌম্যর মন স্থির।

সে এর পরে যায় তার অসহযোগ আমলের সহবন্দী মৌলানা ইসমাইল হোসেন জালালাবাদীর সকাশে। তিনি তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বেশ কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করেন। বলেন, "আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না, সৌম্য ভাই। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক সাতশো বছরের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কিনা একটা বছরের মধ্যেই ছিন্ন হলো! কোথাও এতটুকু যোগসূত্র রইল না! ওদিকে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র দুই শতকের। সে সম্পর্ক কিন্তু পুরোপুরি ছিন্ন হলো না। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান দুই স্থানই থেকে গেল কমনওয়েলথে। হিন্দু মুসলমান কেউ কারো আপন নয়, ইংরেজরাই উভয়ের আপন। এই পরোক্ষ সম্পর্কটুকু না থাকলে ফল আরো শোচনীয় হতো। তা হলে এটাও কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঙ্গ? হিন্দুস্থানে মুসলমান না থাকলেও চলবে, পাকিস্তানে হিন্দু না থাকলেও চলবে, কিন্তু দুই রাষ্ট্রের মাথার উপরে ইংরেজ রাজা না থাকলে চলবে না। যুদ্ধ বেধে যাবে। একেই কি বলে স্বাধীনতা?"

'দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী নয়নে জল ঝরে অনিবার।'

।। পঁচিশ ।।

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে সৌম্যকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই আশ্রমকে গুটিয়ে নিতে হবে। এর দেনা শোধ ও পাওনা আদায়ের পর এর সম্পত্তি যা থাকবে তা দান করতে হবে নতুন এক আশ্রমকে। সেটি শুধু হরিজনদের জন্যে। বঙ্কিমবাবু তার ভার নেবেন। প্রধান ট্রাস্টী মোহিনীবাবু। তিনি থাকতে অর্থাভাব হবে না। তেমন আশ্বাস তিনি দিয়েছেন।

এইসব করতে গিয়ে বড়দিন পেরিয়ে যায়। সৌম্য আরো একমাস সময় নেয়। জুলিকে সেই মর্মে চিঠি লেখে। হঠাৎ বারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায় রেডিওতে খবর পায় যে তেরোই থেকে গান্ধীজীর অনশন। অনির্দিষ্টকালের জন্যে। তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আটাত্তর বছর বয়সে আবার অনশন। এ যে

মরণের সঙ্গে খেলা। সৌম্য তিষ্ঠতে পারে না। সেই রাত্রেই কলকাতা রওনা হয়। বঙ্কিমবাবুকে বলতে পারে না কবে ফিরবে।

কলকাতায় শুধু দিল্লীর ট্রেন ধরার জন্যেই অপেক্ষা। জুলি কাতর হয়ে বলে, "বাপু যদি না বাঁচেন তা হলে কী হবে, সৌম্য?"

"ভগবানকে ডাকো।" সৌম্যও তেমনি কাতর স্বরে বলে।

বাচ্চা দুটোকে আদর করে সৌম্য বাপুর কথা ভুলতে চেষ্টা করে। বাপকে দেখে ওরা দু'জনেই খুব খুশি। বিদায় নেবার সময় দু'জনেরই মুখ আঁধার। জুলির প্রশ্নের উত্তরে সৌম্য বলতে পারে না কবে ফিরবে। সব নির্ভর করছে বাপুর অবস্থার উপর। "ভগবানকে ডাকো।" এই বলে বিদায় নেয়।

টেলিগ্রাম পেয়ে সুকুমার এসেছিল স্টেশনে। সঙ্গে মিলি। তার পরণে স্ল্যাক্‌স্। চুল খাটো করে ছাঁটা। দারুণ কর্মচঞ্চল। কিন্তু বিষাদের প্রতিমা।

"বাপু কেমন আছেন?" সৌম্যর প্রথম উক্তি।

"ইউরিনে অ্যাসিটোন বডি দেখা গেছে। ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন। তুমি যাও, ওঁকে যেমন করে পারো থামাও। আমরা কী অপরাধ করেছি? আমাদের সুদ্ধু কেন কষ্ট দিচ্ছেন? রাত্রে ঘুম আসবে না। কখন শুনব তিনি আর নেই। চৌধুরী, তুমি আমাদের ওখানেই উঠছ।" সুকুমার উত্তর দেয়।

"আমি আগে বিড়লা হাউসে যাব। তার পর তোমাদের ওখানে। বাপুর কাছেই থেকে যেতে পারি, যদি অবস্থা গুরুতর বুঝি।" সৌম্যর তর সয় না।

মিলিই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায়। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে, "জুলি কেমন আছে? বাচ্চারা আছে কেমন?"

সৌম্য অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, "ভগবান যেমন রেখেছেন।"

সেখানে সোনাদির সঙ্গে দেখা। খবর শুনে তিনি সেবাগ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন। আরো অনেকের মতো। বলতে গেলে সারা ভারতের গান্ধী পরিবারের মতো।

"সোনাদি," সৌম্য সুধায়, "কেন এই বিনা মেঘে বজ্রপাত?"

"বিনা মেঘে নয়। যে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য বাপু দেশভাগে সায় দেন সেই গৃহযুদ্ধ আসন্ন, যদি পাকিস্তানকে তার পাওনা পঞ্চান্ন কোটি টাকা না দেওয়া হয়। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধও গৃহযুদ্ধ। সে যুদ্ধ বাপু বেঁচে থাকতে নয়। তাই এ অনশন। অনশন ভঙ্গ করতে আমিও অনুনয় করেছি। এ বয়সে অনশন মরণকে আমন্ত্রণ। জৈন মুনিরাও তো অনশনে দেহত্যাগ করেন। উনি জৈন নন, বৈষ্ণব, তবু গুজরাটে জৈন প্রভাবে মানুষ হয়েছেন। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মও বরণ করেছিলেন। এটাও যেন ভীষ্মের শরশয্যা। ডাক্তাররাও ভীত।" সোনাদিও সন্ত্রস্ত।

"আমি রাত জাগতে তৈরি হয়ে এসেছি। যদি দরকার হয়।" সৌম্য বলে।

"আপাতত দরকার হবে না। তুমি যাও, বিশ্রাম করো।" তাঁর অনুজ্ঞা।

রাত আড়াইটের সময় হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গরম জলের গামলায় গা ডুবিয়ে গান্ধীজী প্যারেলালজীকে ডেকে পাঠান। বলেন, "লিখে নাও।" ভারত সরকারকে তিনি পরামর্শ দেন পাকিস্তানের পাওনা অ্যাসেটসের ভাগ পঞ্চান্ন কোটি টাকা অপৌণে মিটিয়ে দিতে। কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ বেধেছে, টাকাটা পেলে পাকিস্তান যুদ্ধের জন্যে খরচ করবে এই অজুহাতে পরের পাওনা আটক করা হচ্ছে সত্যভঙ্গ। তা ছাড়া এটা আন্তর্জাতিক সদাচারবিরুদ্ধ।

ভারত সরকার সে পরামর্শ মান্য করেন, অনশন তবু চলতে থাকে। সৌম্য সোনাদিকে সুধায়, "কেন?" তিনি বলেন, "আরো নিগূঢ় কারণ আছে, ভাই। বাপু একমাসের মধ্যে কলকাতাকে শান্ত করতে পারলেন, অথচ চারমাস অক্লান্ত সাধনা সত্ত্বেও দিল্লীকে শান্ত করতে পারেননি। মুসলমানদের

ঘরবাড়ী মসজিদ কবরস্থান হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরাও বেদখল করে ভোগ করছে। আর মুসলমানরা এই শীতে হি হি করে কাঁপছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, তাদের বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্যে ভোট দিয়ে হিন্দুস্থানে পড়ে আছো কেন? ওদিক থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু ও শিখ আসছে। এদিক থেকে কাতারে কাতারে মুসলমান না গেলে ওদের ঠাঁই হবে কোথায়? ওরা যদি ভালোয় ভালোয় না যায় তবে ওদের মেরে খেদাও। ইংরেজরাও যবন। মুসলমানরাও যবন। ওদেরও খেদিয়েছি। এদেরও খেদাব। কলকাতায় এ সমস্যা ছিল না, দিল্লীতে আছে ও বাড়ছে। সেখানে কংগ্রেসের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, এখানে আছে ও বাড়ছে। ক্যাবিনেটের ভিতরেই দ্বিমত। একভাগ স্পষ্ট বলছেন, 'একটু ভয় দেখাতে হয়। ভীতমে প্রীত হোতা হ্যায়। মুসলমানকে খেদালে হিন্দু খেদানো বন্ধ হবে। পাকিস্তানের যে রীতি ভারতেরও সেই রীতি। ভারতের ভদ্রতাকে পাকিস্তান মনে করছে হিন্দুদের মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা আর দুর্বল নই। আমরা সশস্ত্র।' বুঝতেই পারছ ভাই, বাপু কেমন নিঃসঙ্গ। রাজনীতিকে তিনি নীতির স্তরে তুলতে চান। নিজের দেশের নাগরিকদের বিনা দোষে বলপূর্বক বিতাড়ন অন্যায় ও অধর্ম। পাকিস্তান যদি তেমন কাজ করে ভারত তার অনুকরণ করবে না। ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখবে। এটা বিবেকের নির্দেশ।"

সৌম্য বলে, "যথার্থ। পূর্ববঙ্গে সওয়া কোটি হিন্দুর বাস। ভারতের মুসলমানদের খেদালে তারা পূর্ববঙ্গে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদেরও খেদাবে। হিন্দু খেদা আন্দোলন শুরু হবে। নোয়াখালীতে বাপুর কাজ পণ্ড হবে। বাপু কেন সহ্য করবেন?"

"তার চেয়ে বড়ো কথা দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ হলেও জাতি ভাগ হয়নি। ভূমি বণ্টন হয়েছে, লোক বণ্টন হয়নি। আমরা হিন্দু মুসলমান যেখানেই থাকি না কেন একই জাতি। কিন্তু বলপূর্বক লোকবিনিময় করলে জাতি ভাগ হয়ে যাবে। বাপু তার জীবন্ত সাক্ষী হবেন না।" সোনাদি আক্ষেপ করেন।

সাত শতাব্দী ধরে দিল্লী ছিল মুসলিমশাসিত বা মুসলিমপ্রধান মহানগরী। এখন তাকে রাতারাতি হিন্দুশাসিত তথা হিন্দুপ্রধান মহানগরীতে পরিণত করতে হলে লোকবিনিময়ই লক্ষ্য। বলপ্রয়োগই লক্ষ্যভেদের মোক্ষম উপায়। কলকাতায় এ সমস্যা ছিল না। সেখানে হিন্দু এমনিতেই সংখ্যাগুরু। তাকে সংখ্যাগুরুতে পরিণত করার জন্যে দিল্লীর মতো তাগিদ ছিল না। দিল্লীকে হিন্দুপ্রধান করতে মহাসভাপন্থীরা কৃতসংকল্প। সোনাদি বোঝান।

সৌম্য শান্তি মিছিলে যোগ দিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘোরে। সুকুমার তার সঙ্গে যায় না, মিলি যায়। মিছিলে সবাই সবাইকার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। মিলিও সৌম্যর সঙ্গে। কারো মুখে হাসি নেই। কথা নেই। শুধু "মহাত্মা গান্ধীকী জয়।"

পাল্টা মিছিলও বেরোয়। উদ্দেশ্য মুসলমানদের মনোবল নষ্ট করা। যারা পাকিস্তানকে হাত দিয়ে ভোট দিয়েছে তারা এখন পা দিয়ে ভোট দিক। গান্ধী বাধা দিচ্ছেন, তাই সে মিছিলের কণ্ঠে "পাপাত্মা গান্ধী মুর্দাবাদ।" তিনি হিন্দুর শত্রু, মুসলমানের মিত্র।

সৌম্য পীড়া বোধ করে। এ যেন বিষ্ণুদূতের সঙ্গে যমদূতের টাগ অভ্ ওয়ার। বাপুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সংখ্যায় যত কমই হোক ভারতের মাটিতে এমন মানুষও যে জন্মেছে এটাই তার কাছে এক প্রহেলিকা।

"তুমি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথাসাধ্য করবে না? শুনেছি কলকাতায় তুমি গুণ্ডাদের নিরস্ত্র করতে গেছলে।" মিলি তার কানে কানে বলে।

"তুমি যাদের কথা বলছ তারা কেউ গুণ্ডা নয়। তারা একদল অন্ধ জাতীয়তাবাদী। জাতি বলতে তারা বোঝে হিন্দু জাতি। যেমন লীগপন্থীরা বোঝে মুসলিম জাতি। লীগপন্থীরা সফল হয়েছে।

মহাসভাপন্থীরা সফল হয়নি। এইখানে তাদের মনের ক্ষত। এর জন্যে তাদের বিশ্বাস বাপুই দায়ী। কেন তিনি পার্টিশনের বিরুদ্ধে অনশন করলেন না? কেন তিনি সায় দিলেন? কী করে ওদের বোঝাব যে পার্টিশন হয়েছে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছায়, তারাই অধিকাংশ ভারতীয়ের প্রতিনিধি। তথা অধিকাংশ হিন্দুরও। বাপুর পেছনে লোকবল থাকলে কি তিনি সায় দিতেন? যেটা নেই সেটা আছে মনে করাটা অবাস্তব। আমার চেয়ে পার্টিশন বিরোধী কে? আমিও ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করেছি যে বাপুর মতো আমিও একটি ক্ষুদ্র মাইনরিটির একজন। আমরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করিনে, লগ্ন উপযুক্ত বুঝলে করি। লগ্ন উপযুক্ত ছিল না বলে বাপু অনশন করেননি। তা ছাড়া পার্টিশনের পেছনে কোনো মরাল ইস্যু ছিল না। দ্বন্দ্বটা শুভ আর অশুভের দ্বন্দ্ব নয়। কিন্তু প্রবলের দ্বারা দুর্বলের উচ্ছেদ নিঃসন্দেহে অশুভ। তাই এই অনশন। এই অনশন ব্যর্থ হলে নিশ্চিত মরণ।" সৌম্য শঙ্কিত।

গান্ধীজীর অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যায়। মিছিলে মিছিলে দিল্লী ছয়লাপ। শুধু দিল্লী কেন, ভারতের প্রত্যেকটি শহর। দেশের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে, বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শত শত তারবার্তা আসে। একই বয়ান: 'গান্ধীজী, আপনি আপনার অনশন ভঙ্গ করুন।' তিনি কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় অনড়। তাঁর শর্ত দিল্লীর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের সঙ্গে নির্ভয়ে বসবাস করবে, পুলিশের উপর নির্ভর করবে না। সমস্যাটা হচ্ছে কেমন করে একসঙ্গে থাকতে হয়। একসঙ্গে বাঁচতে হয়। সমাধান পরস্পরের উপর বিশ্বাস। মুসলমানদের ঘরবাড়ী, মসজিদ ইত্যাদি খালি করে দিতে হবে। তাদের মহল্লাগুলিতে তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও খাজা সাহেবের দরগায় মেলা বসবে। এইরকম প্রায় সাতটি শর্ত পূরণ করলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দেবেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকরা।

আর সকলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেও হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন। তা শুনে গান্ধীজীও তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ় হন। অনশন যদি আরো একটা কি দুটো দিন গড়ায় তবে আরো অনেকরকম উপসর্গ দেখা দেবে। এযাত্রা বেঁচে গেলেও তিনি মারাত্মক অসুখে ভুগবেন। শরীরযন্ত্রেরও স্থায়ী ক্ষতি হবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীরা স্বাক্ষরবিমুখদের কাছে বিস্তর সাধ্যসাধনা করেন। অবশেষে জনমতের চাপে তাঁরাও স্বাক্ষর দেন। শান্তির নিশ্চিতি পেয়ে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন।

সকলের মতো সৌম্যও নিশ্চিন্ত হয়।

এর পরে মিলি বলে, "সৌম্যদা, অনশনের বার্তা পেয়ে আমিও মৃদুলাবেনের সঙ্গে পাঞ্জাব ছেড়ে এসেছি। আমরা আবার ফিরে যাব বলে কথা দিয়েছি। নারী উদ্ধারের কাজ নিয়েই আমরা ব্যাপৃত। নইলে তোমার সঙ্গে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে মসজিদ উদ্ধারের কাজ দেখতুম।"

"এখানেও কি নারী উদ্ধারের কাজ করতে হচ্ছে না?" সৌম্য সুধায়।

"না, এখানে সে রকম কোনো কেস নেই। তবে যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হচ্ছে। করছেন মৃদুলাবেন। রাজকুমারী অমৃত কওর খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ওদের বাপ মায়ের ঠিকানা থাকলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যারা বিবাহিতা তাদের শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গেও। তাঁরা ফিরিয়ে নিতে রাজী হলে সে-ই সব চেয়ে ভালো। নয়তো সরকারী বা বেসরকারী হোমই ভরসা। তবে ওরা চায় নিজস্ব হোম। তার মানে বিয়ে। বিবাহিতা হয়ে থাকলে সেটা কেমন করে সম্ভব? বিবাহবিচ্ছেদ তো হিন্দুধর্মে বারণ। মহা ঝামেলা।" মিলি উত্তর দেয়।

"মুসলমান মেয়েদের নিয়ে কী করছ?" সৌম্য জিজ্ঞাসু।

"শিখরা তাদের কনভার্ট করে বিয়ে করে ফেলে। ডিভোর্সের জন্যে কেয়ার করে না। হিন্দুরা না পারে কনভার্ট করতে, না পারে ডিভোর্স করিয়ে নিতে। ওদের নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে —" মিলি থেমে যায়।

"কী করে?" সৌম্য মিলির মুখ দেখে ভয় পায়।

"বলব না। তুমি মূর্ছা যাবে।" মিলি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"বল না, লক্ষ্মীটি। শুনলে হয়তো একটা কিছু কিনারা করতে পারি। আর কিছু না হোক ওদের সমাজপতিদের জিম্মা দিতে পারি।" সৌম্য ভরসা দেয়।

"আহা বেঁচে থাকলে তো?" মিলি দুঃখের সঙ্গে বলে।

"বল কী! ওরা কি আত্মহত্যা করে?" সৌম্য শঙ্কিত।

"ওই আত্ম শব্দটা বাদ দাও।" মিলি থর থর করে কাঁপে।

জুলির সঙ্গে কথাবার্তা যা রাত্রেই হয়। জুলিই ট্রাঙ্ক কল করে। জানতে চায় বাপু কেমন আছেন। বিপদ কেটে গেছে কি না। সৌম্য নিজে কেমন আছে। কবে ফিরবে। জানায় বাচ্চারা ভালো আছে, খুব দুষ্টুমি করছে। আকারে ইঙ্গিতে বাবাকে চাইছে। বাপুর অনশনভঙ্গের পর সে যেন একটা দিনও দেরি না করে।

অনশনভঙ্গ তো হলো। তবে দেরি কেন? কিন্তু বাপুর সঙ্গে একবার দেখা না করে তো সে ফিরতে পারে না। পূর্ববঙ্গের অবস্থাটা তিনি জানবেন কী করে, যদি সে না জানায়? তিনি কি চান যে সৌম্য সেখানে আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকে? হিন্দুদের সাহস দিতে? না তার নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক জেলায় সেখানকার মুসলমানদের সাহস দিতে? তারাও তো বিপন্ন।

এই নিয়ে সোনাদির সঙ্গে কথা। তিনি বলেন, "বাপুর অনশনভঙ্গে সকলে সুখী হয়নি। হিন্দু মহাসভা ও আর. এস. এস. যে হবে না সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরেই গুঞ্জন উঠছে যে বাপু থাকতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারা যাবে না। অহিংসার যুগ গেছে। তবে আর অহিংসার পরীক্ষা কেন? তাঁর হিমালয়ে প্রস্থান করাই শ্রেয়। এই যে মুসলিম সম্প্রদায় এর মধ্যে লয়াল মুসলিম আর ক'জন? সবাই তো মনে মনে পাকিস্তানী। ডিসলয়াল অফিসারদের মতো এদেরও পাকিস্তানে চালান দেওয়া উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই বাধলে এরা হবে দুর্গের ভিতরে ট্রোজান হর্স। ভারত হেরে যাবে। ওদিক থেকে যারা আসবে তারা লয়াল হিন্দু ও শিখ। তাদের আসতে দেওয়া সমীচীন। যা করবার তা এই ধাক্কাতেই করা সঙ্গত। লোহা ডগডগে লাল যখন থাকে তখনি তার উপর হাতুড়ি পিটতে হয়। এই যেমন একপক্ষের যুক্তি তেমনি অপর পক্ষের যুক্তি হলো, কাশ্মীর রাখতে হলে মুসলমানদের অভয় দিতে হবে। কেবল কাশ্মীরে নয়, ভারতের সর্ব প্রান্তে। নইলে কাশ্মীরী মুসলমানরা বিদ্রোহী হবে, হিন্দুদের মেরে তাড়াবে, তাদের রক্ষার জন্যে আরো সৈন্য পাঠাতে হবে। গোটা ইণ্ডিয়ান আর্মিটাই কাশ্মীরে মোতায়েন করতে হবে। এর পাল্টা যুক্তি, কাশ্মীরের এমন কী গুরুত্ব যে তাকে যক্ষের ধনের মতো পাহারা দিতে হবে? তার মুসলিমপ্রধান অংশটা ছেড়ে দিলেই হয়। হিন্দুরা শ্রীনগর অঞ্চল থেকে জম্মু অঞ্চলে চলে আসবে ও মুসলমানরা সেখান থেকে সরে যাবে। জবাহর কিন্তু একথা শুনলে লাল হয়ে যান। কাশ্মীর উপত্যকা তাঁর পূর্বপুরুষের তিন চার হাজার বছরের জন্মভূমি। তার জন্যে তিনি শেষ ভারতীয় সৈন্যটি পর্যন্ত লড়বেন। শেষ রক্তবিন্দুটি পাত করবেন। কাশ্মীরী মুসলমানরা তাঁর বন্ধু। শেখ আবদুল্লার কাছে তিনি দায়বদ্ধ। আর কোনো কারণ না থাকলেও কাশ্মীরী মুসলমানদের খাতিরে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করবেন। সেই সুবাদে কাশ্মীরী হিন্দুরাও রক্ষা পাবে। বাপুর এখন উভয়সঙ্কট! তিনি কোন্ পক্ষ নেবেন?"

সৌম্য বিষম আঘাত পায়। সরষের ভিতরেই ভূত। কংগ্রেসের ভিতরেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি।

লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে তাকে লবণাক্ত করবে কে? তাকে ফেলে দিতে হয়। দেশের বিবেককে নির্মল রাখতে হবে। এটা বিবেকের সঙ্কট। সৌম্য সোনাদির কাছে শোনে যে বাপু কংগ্রেসকে গুটিয়ে নেবার কথাই ভাবছেন। দেশের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের আর কী দরকার?

আঠারো তারিখে অনশনভঙ্গ। বিশ তারিখে প্রার্থনাসভায় বিস্ফোরণ। বাপু বুঝতে পারেন না কিসের আওয়াজ। বিচলিত হন না। সৌম্যও না। মিলি এসে তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, "হাঁ করে কী দেখছ? ওটা যে বোমা!"

"বোমা! বাপুর উপরে বোমা!" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"বোমা নয়তো কী? বোমা কী জিনিস আমি যত জানি আর কে তত জানে? যুদ্ধের সময় বিলেতে ছিলুম না? বাপুও যেতেন, তুমিও যেতে। অত কাছাকাছি বসতে যাও কেন? দূরে দূরেই বোসো। জুলিকে এত কথা জানতে দিয়ো না।" মিলি বলে।

সোনাদি পাগলের মতো ছুটে আসেন। "অনশন তাঁকে মারতে পারেনি। বোমা তাঁকে মারতে পারেনি। তিনি প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদকে জল্লাদ মারতে পারে না।"

মিলি যায় মদনলালকে দেখতে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে চালান দেয়।

মুঙ্গের থেকে এসেছেন ফুলনপ্রসাদ সিন্‌হা, কলকাতা থেকে বিনয়গোপাল দত্ত, মেদিনীপুর থেকে মধুসূদন সাঁতরা। যত সব কট্টর গান্ধীপন্থী জেলবার্ড। সৌম্য সকালবেলাটা তাঁদের সঙ্গে কাটায়। বাপু বেঁচে গেছেন বলে তাঁরা সবাই খুশি। তবে মদনলালের জন্যে দুঃখিত। বিশ বছর মাত্র বয়স। গৃহহারা শরণার্থী। বাপু ক্ষমা করেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ফুলনভাই বলেন, "বাপুর স্বস্তি কোথায়? গভর্নমেন্টের ভিতরেই যা অশান্তি চলছে বাইরের অশান্তির চেয়ে কিসে কম? টীম ওয়ার্ক সম্ভব হয় না বলে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ভেঙে যায়। এখন ফের সেই একই ব্যাপার।"

সৌম্য অত কথা জানত না। বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়। ফুলনভাই বলেন, "বাপু আলটিমেটাম দিয়েছেন। একজনকে ক্যাবিনেট ছাড়তে হবে। ক্যাবিনেট ক্রাইসিস। কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ এখন তুঙ্গে। বল্লভভাইয়ের বক্তব্য হলো পার্টি হাইকমাণ্ডের নির্দেশ সবাইকে মানতে হবে। জবাহরলালকেও। অপর পক্ষে জবাহরলালের যুক্তি হলো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পার্টি হাই কমাণ্ডের ঊর্ধ্বে। ক্যাবিনেটকে তাঁরই নির্দেশ মানতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বেলাও একই রীতি অনুসরণ করতে হবে। বাপুর তো ওই পুরনো প্রেসক্রিপশন। অ্যাবডিকেশন। দু'জনের একজনকে অ্যাবডিকেট করতে হবে। কাকে?"

পরের দিন তিরিশে জানুয়ারি ফুলনভাই একগাল হেসে বলেন, "সৌম্য ভাই, সঙ্কট কেটে গেছে। দু'জনেই থাকবেন। জাতীয় স্বার্থে। পণ্ডিতজী ও সর্দারজী দু'জনেই অত্যাবশ্যক। মাউন্টব্যাটেনও সেই কথা বুঝিয়েছেন।"

তা শুনে সৌম্যর মনের উপর থেকে ছায়া সরে যায়। সে উল্লসিত হয়। বলে, "মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজ বড়ো শুভদিন। দিনটি শান্তিতে কাটবে।"

সেদিন প্রার্থনাসভায় বাপুর আসতে দেরি দেখে সোনাদি বলেন, "এ কী অঘটন! বাপুর তো কখনো একটা মিনিটও দেরি হয় না। বল্লভভাইয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী এমন কথাবার্তা হচ্ছে? তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা?"

"পাঁচটা বেজে দশ। দশ মিনিট দেরি।" উত্তর দেয় সৌম্য। চিন্তিত মুখে।

একটু পরে কলরব ওঠে। "আ রহে হ্যায়।" "কামিং।" সৌম্য পেছনের সারি থেকে দেখতে পায় নাতনী মনু আর নাতবৌ আভার কাঁধে হাত রেখে ভিড়ের ভিতর রাস্তা করে নিয়ে প্রার্থনাসভার দিকে ক্ষিপ্র পদে ছুটে আসছেন বাপু।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে ঘটে গেল। ফুলনভাই চেঁচিয়ে ওঠেন, "সত্যানাশ হো গয়া।" সৌম্যর কানে আসে গুলীর আওয়াজ আর বাপুর কণ্ঠের "হে রাম।" তার চোখে আঁধার নেমে আসে। তার পা অবশ হয়ে যায়। লোকজন "হাঁ, হাঁ" করে দৌড়িয়ে যাবার সময় তাকেও টেনে নিয়ে যায়। তার পর "হায়, হায়" করে ওঠে। বাপুকে ধরাধরি করে বিড়লা ভবনে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

সকলের নজর বাপুর উপরেই। কেবল একজনের নয়। সে বিড়লাদের বাগানের মালী রঘু। উৎকর্ণীয়। সে এক খাকী পোশাক পরা পিস্তলধারী বলিষ্ঠ যুবাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে। রঘু যদি বাধা না দিত ভক্তরা সেদিন ওই পিতৃহন্তাকে পীঞ্চ করত। ফুলনভাইয়ের মতো অহিংসাবাদীর চোখেও হিংসার আগুন।

বল্লভভাই এসে বাপুর নাড়ী টিপে দেখেন। বলেন, "একটু যেন ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।" ঘটনার দশ মিনিট বাদে ডাক্তার ভার্গব এসে পরীক্ষা করে বলেন, "দশ মিনিট আগেই হয়ে গেছে।" তখন কান্নার রোল ওঠে। মেয়েরা মেজেতে লুটিয়ে পড়ে। কে একজন রামধুন ধরিয়ে দেয়। অমনি সবাই গায়, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।"

জবাহরলাল হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাপুর শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলেন, "এখনো উষ্ণ।" মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারা একে একে আসেন ও চোখে রুমাল চাপা দেন। বড়লাট একটু আগেই মাদ্রাজ থেকে ফিরেছেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন। আততায়ী মুসলমান ভেবে মারমুখো হিন্দু জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, "আপনারা কি জানেন না যে আততায়ী হিন্দু?" যদিও নিজেই জানতেন না সে কে ও কী। তাঁর উপর জনতার অসীম আস্থা। তিনিই পরিস্থিতি হাতে নেন।

সৌম্য তো একেবারে পাথর। কান্না তার বুক ঠেলে ওঠে, তবু সে কাঁদে না। কাঁদতে পারে না। ভাবে, শহীদ হওয়ার অধিকার কি সকলের আছে? বুকভরা প্রেম, বুক পেতে গুলী, মুখে ইষ্টনাম, দুই হাত জোড় করে বিদায় নমস্কার। মৃত্যুর পরে পরমা শান্তি, পরমা তৃপ্তি। জগন্মাতার কোলে ঘুমিয়ে পড়া শিশু। মৃত্যু, কোথায় তোমার জয়? শ্মশান, কোথায় তোমার জ্বালা। এ যেন ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। সৌম্য একটু দূর থেকে বাপুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সোনাদি ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, "ভাই, এমন দৃশ্য দু'হাজার বছরে একবার দেখতে পাওয়া যায়। ক্রুসিফিকশন। এবারেও সেই শুক্রবার। আমরা ধন্য। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী।"

ফুলনভাই খবর নিয়ে আসেন আততায়ীর নাম নাথুরাম গোঁড়সে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। সাভারকর শিষ্য। সোনাদি তা শুনে বলেন, "ওমা, তাই নাকি। এই সেই জমাদার, বাপুর পেছনে যে লেগেছে সাত আট বছর ধরে। বাপু খারাপ। অহিংসা খারাপ। ভালো কিনা হিংসা আর শাঠ্য।"

সুকুমার আর মিলি নীরবে এসে সৌম্যর দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মোটরে তোলে। মিলিই চালায়। বাসায় নিয়ে গিয়ে মুখে কিছু দিতে অনুরোধ উপরোধ করে। সৌম্য শুধু এক গ্লাস জল চেয়ে নেয়। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শোয় না। চেয়ারে হেলান দিয়ে রাত জাগে। আজ তার শিবরাত্রির জাগরণ।

রাত দুপুরে খোঁজ নিতে এসে মিলি সুধায়, "কী, দাদা? ঘুম আসছে না?"

"না, বোন। আসবেও না।" সৌম্য থেমে থেমে বলে, "কত কথাই না মনে পড়ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা। সালটা বোধহয় ১৯০৯। বাপু তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে গেছেন ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। কাজের ফাঁকে তিনি সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও আলাপ করেন। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন ওঠে। একদিন এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় সাভারকরের সঙ্গে কথোপকথন।

সাভারকর বলেন, 'গান্ধী, মনে করুন এক বিষধর সর্প আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আপনার হাতে একখানা লাঠি। আপনি কি সেই লাঠি দিয়ে সাপটাকে মারবেন না?' বাপু উত্তর দেন, 'লাঠিখানা আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব, পাছে সাপটাকে মারতে প্রলুব্ধ হই।' তখন সাভারকর বলেন, 'গান্ধী, আপনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক গুরু কদাচ নয়।' সেই সময় থেকেই তাঁরা উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু।"

মিলি বলে সমবেদনার স্বরে, "আমরা বিপ্লবীরাও তো উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। তা বলে আমরা কি কখনো তাঁর মৃত্যু কামনা করেছি? ধিক, ধিক, শত ধিক অমন রাজনীতিকে যা জনগণের অভিশাপ ডেকে আনে।"

সৌম্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পরে আবার থেমে থেমে বলে, " ভগবান আমাকে এ কী পরীক্ষায় ফেলেছেন। কোথায় আমার অহিংসা? আমি যে ওই মূঢ়টাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনে। বাপু বেঁচে থাকলে ক্ষমা করতেন, জানি। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারছিনে ওই যমদূতটা আমার সামনেই আমার বাপকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমি অপদার্থের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। নিজেকেও আমি ক্ষমা করতে পারছিনে। ভাবতে আরো খারাপ লাগছে যে হিন্দুই হিন্দুর পরম শত্রু। হাজার বছর পরে হিন্দুকে যিনি স্বাধীন করে দিলেন, অথচ আপনি রাজা হলেন না, হিন্দুর হাতেই তাঁর নিধন হলো। মুসলমান ও ইংরেজও যা করেনি হিন্দু তা করেছে। মহাগুরু নিপাত!"

"আ স্রোরিয়াস এণ্ডিং।" মিলি তাকে প্রবোধ দেয়।

মিলি চলে গেলে সৌম্য তার নির্জন কক্ষে অঝোর ধারায় কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে রাত পোহায়। তাতেই সে কতকটা শান্তি পায়।

শেষ রাত্রে মিলি আবার আসে খোঁজ নিতে। "ও কী, দাদা, তুমি এখনো জেগে। রাত যে ভোর হয়ে এল।"

সৌম্য তখন আকাশের দিকে চেয়ে। বাপু এতক্ষণে তারা হয়ে ফুটেছেন। আর একটি ধ্রুবতারা। সারা পৃথিবীর লোক এর উপর দৃষ্টি রেখে পথ চলবে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। হিন্দুর হৃদয় মুসলমানের হবে। মুসলমানের হৃদয় হিন্দুর হবে। উভয়ের মিলিত হৃদয় ভারত পাকিস্তানের হবে। কিন্তু বাপু আর ফিরবেন না। ও হো হো। সে আকুল হয়ে কাঁদে।

আলো ফুটলে ওরা তিনজনে খালি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বিড়লা ভবনের সামনে অসংখ্য পদযাত্রীর সমাবেশ। ওরাও লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে অন্তিমযাত্রার আয়োজনের ভার দেওয়া হয়েছে প্রধান সেনাপতি সার রয় বুচারকে। সামরিক পদ্ধতিতে ফিউনারাল মার্চ। যেমন যুদ্ধে নিহত মহারথীদের বেলা হয়। শুরু হতে এগারোটা বাজে। সব আগে চারটে সাঁজোয়া গাড়ী। তার পরে বড়লাটের সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী। তার পরে আড়াইশো জন নাবিক, সৈনিক, বৈমানিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সবাই পদাতিক। সকলের হাতে রথের দড়ির মতো ওয়েপন্স-ক্যারিয়ারের গায়ে বাঁধা শিকল। তার ইঞ্জিনটাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই রথের উপর শায়িত গান্ধীজীর মরদেহ। দুই পাশে উপবিষ্ট নেহরু ও প্যাটেল। পশ্চাতে জনসমুদ্র। রাজপথের দুইধারেও তাই। চার পাঁচ হাজার সৈনিকও পদযাত্রীদের সামিল।

"হা ভগবান!" সৌম্য কপালে হাত দেয়। "সমরবিরোধী সত্যাগ্রহের অদ্বিতীয় পথিকৃৎ যিনি তাঁর কিনা সামরিক ঠাটে শেষযাত্রা!"

"চৌধুরী", সুকুমার নিচু গলায় বলে, "দেশের রাজাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেইভাবেই করা হচ্ছে গান্ধী মহারাজকেও। দশ লক্ষ লোকের জনতাকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাড়ে পাঁচ মাইল মার্চ করিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি আর কারো আছে?"

"দাদা", মিলি ফিস ফিস করে বলে, "এই সামরিক ব্যবস্থা হচ্ছে অহিংসার প্রতি হিংসার নজরানা। হিংসা যেন বলতে চায়, অহিংসা, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার কাছে আমি মাথা নত করি।" সৌম্যর কাছে মিলিও মাথা নোয়ায়।

"বোন", সৌম্য বলে ধরা গলায়, "মৃত্যুরও সান্ত্বনা আছে। কিন্তু স্বজনপরিত্যক্ততার সান্ত্বনা কোথায়? বাপুকে আজ সাড়ম্বরে ও ষোড়শ উপাচারে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র সান্ত্বনা ইংরেজরাও আমাদের সহযাত্রী। আমরা উপেক্ষিত শিষ্যরা যদি ডাক পেতুম তো বাপুর চারপাইতে পালা করে কাঁধ দিয়ে আমরাই সাড়ে পাঁচ মাইল রাম নাম করে বয়ে নিয়ে যেতে পারতুম।"

যমুনাতীরে রাজঘাটে অপেক্ষা করছিল আরো দশ লক্ষ লোকের জনতা। চিতায় অগ্নিসংযোগের সময় বিউগলে রণিত হয় 'লাস্ট পোস্ট'। ধ্বনিত হয় 'লাস্ট স্যালিউট', কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ। অভ্র ভেদ করে বিশ লক্ষ কণ্ঠের সমবেত আকিঞ্চন "মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে।" চিতার পাশে চলতে থাকে বৈদিক মন্ত্রপাঠ।

"Greater love hath no man than this, that he lay down his life for his friends", বলে ওঠেন পার্শ্ববর্তিনী এক মার্কিন মহিলা।

"তোমার একটু অংশ আমাকে দিয়ে যাও, বাপু। আমিও যেন তোমার মতো বাঁচতে ও তোমার মতো মরতে পারি।" সৌম্য প্রার্থনা করে অস্ফুট স্বরে।

পরিশিষ্ট

ক্রান্তদর্শী/ তৃতীয় পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক - শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা - ৬
প্রচ্ছদপট : প্রণবেশ মাইতি
মূল্য : ৩০ টাকা

উৎসর্গ — শ্রীঅরুণকুমার দত্ত
করকমলেষু

রচনাবলীতে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, সেই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত লেখকেব ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূল গ্রন্থের সঙ্গে।

ক্রান্তদর্শী/ চতুর্থ পর্ব

অন্নদাশঙ্কর বায়
প্রকাশক - শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদাব
ডি. এম লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা - ৬
প্রচ্ছদপট : প্রণবেশ মাইতি
মূল্য : ৩০ টাকা

উৎসর্গ — স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসু
স্মরণে

রচনাবলীতে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, সেই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূল গ্রন্থের সঙ্গে।

=